U.G.C. - CARE List-I 2021 Approved Journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 16 pages placed in Page 3 & No. 60 out of 319

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal
23 rd Year, 141 Volume
November, 2021

Edited, Printed and Published by
Dr. Madanmohan Bera, Editor.
Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101.W.B.
Mob.-9153177653
madanmohanbera51@gmail.com
kohinoor.bera @ gmail.com

Rs. 500

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা
এবং মহুয়া
১৪১ সংখ্যা, নভেম্বর, ২০২১
কে.কে. প্রকাশন

'এবং মহুয়া' –বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-I 2021) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২১সালে প্রকাশিত ১৬পৃ.তালিকার (৩১৯টির মধ্যে) ৩ পৃ.৬০নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া



(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৪১ সংখ্যা, নভেম্বর, ২০২১

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

‘এবং মহুয়া’-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ(UGC-CARE list-I 2021)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

২০২১সালে প্রকাশিত ১৬পৃ.তালিকার (৩১৯টির মধ্যে) ৩ পৃ.৬০নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৪১ সংখ্যা

নভেম্বর,২০২১

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক

পায়েল দাস বেরা

মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :

ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।

গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

U.G.C.- CARE List-I 2021 approved journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 16 pages placed in Page 3 & No.60 out of 319

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

23th Year, 141 Volume

Nov, 2021

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

স ম্পা দ কী য়

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বর্তমানে বিশাল বৃক্ষের ন্যায় পল্লবিত বহুল শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ ও বিকশিত। সারা বিশ্বে সমাদৃত। শাখাগুলির মধ্যে প্রবন্ধ,গল্প-উপন্যাস,কাব্য,নাটক, ভ্রমণ কাহিনী, লোক সাহিত্য, পত্র সাহিত্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রবন্ধ সাহিত্য। যে সাহিত্যে মূলত নানান আঙ্গিকের প্রবন্ধ বা মননশীল রচনা যেমন লিপিবদ্ধ থাকে,প্রকাশিত হয় তেমনই গবেষণামূলক বিষয়, অনুসন্ধানমূলক বিষয়, আলোচনা-সমালোচনা এবং সমকালীন বহু ঐতিহাসিক তথ্য, দেশ-কালের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ও প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

প্রাসঙ্গিকভাবে এসে যায় পত্র-পত্রিকার কথা। উক্ত প্রবন্ধসাহিত্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রচার বস্তুত সব রকম পত্র-পত্রিকার দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

‘এবং মহুয়া’ মাসিক সাহিত্য পত্রিকা এমনই নানান আঙ্গিকের মননশীল বহু অনুসন্ধানমূলক, গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ ও পরিবেশন কর্মে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

মেদিনীপুর
নভেম্বর ২০২১

ড. মদনমোহন বেরা
সম্পাদক

(জ্ঞাতার্থে-পত্রিকায় প্রকাশিত সমূহ বিষয় স্রষ্টার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা প্রসূত। এর কোন অংশের জন্য প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট কেউই দায়বদ্ধ নয়। লেখা প্রকাশের নিয়মাবলী অনুসৃত হয়। কেবলমাত্র স্ব-মননজাত, প্রথম প্রকাশযোগ্য মৌলিক রচনাই আহ্বান করা হয়। মুদ্রণ প্রমাদ মার্জনীয়।)

সূচিপত্র

মহাভারতের দীর্ঘতমা ঋষির কথা
অদিতি ভট্টাচার্য্য

দীর্ঘতম ঋষি বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদে তাঁর দৃষ্ট বেশকিছু সূক্তের অন্যতম হল অস্যবামীয় সূক্তা বেদে দীর্ঘতমা ঋষি মামতেয় আর ঔচথ্য [১] এই দুই নামে উল্লিখিত আছেন। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে [২] বলা হয়েছে, তিনি রাজা ভরতের পুরোহিত ছিলেন। বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে [৩] ঋগ্বেদের আখ্যান অনুসরণে এক আখ্যান পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে, তিনি আজন্ম অন্ধ ছিলেন এবং পরে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিলেন। অন্ধ বৃদ্ধ দীর্ঘতমাকে তাঁর এক ভৃত্য নদীতে ফেলে দেয়। নদীতে পড়ে প্রাণ যায়নি তাঁর। স্রোতে বয়ে যেতে যেতে অঙ্গদেশে পৌঁছান। সেখানে উনিশ নামে শূদ্রাকে বিবাহ করেন তিনি। সেই শূদ্রার গর্ভজাত পুত্ রহলেন কক্ষীবান। ঋগ্বেদ পড়লে জানা যায়, দীর্ঘকাল ঘন অন্ধকারে যার বাস তিনিই দীর্ঘতম। অগ্নির আরাধনা কে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। ঋগ্বেদের এমন উক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ এমন হতে পারে যে, দীর্ঘতমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয় অধিক বয়সে। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তিনি।

মহাভারতের বেদের এই ঋষির আখ্যান পাওয়া যায়। তবে মহাভারতের আখ্যান ঋগ্বেদ এর আখ্যান থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র।

'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' [৪] মনুর এই কথা কোথাও যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে নারীকে আজও। আজও অধিকাংশ নারী মেনে প্রাণে হয়তো মনে করে, যে সে কারো অধীন, ভালোবেসে কারো ছায়ায় থাকতে, বাঁচতে। অন্যথা করে যে গুটিকতক, তাদের আজো সমাজ হয়তো দেখে আড়চোখে, বাঁকা হাসে, ভিনগ্রহের জীবে ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। অথচ এমনটা তো চিরকাল ছিল না। কে তবে হরণ করে নিল স্বাতন্ত্র্য, পুরুষের মতো একইভাবে বাঁচার অধিকার ? দীর্ঘতম হলেন সেই ঋষি, যাঁর উচ্চারিত অমোঘবাণীর ভার আজও বহন করে চলেছে নারীকুল।

তখনও কৌরব পাণ্ডব ভাইদের জন্ম হয়নি। কথোপকথন চলেছে পুত্রশোকে কাতর সত্যবতী ও রাজা শান্তনুর বড় ছেলে ভীষ্মের। গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, সুপুরুষ, বীর, যে কোন নারীরই ঈর্ষার পাত্র হতে পারেন তিনি । কিন্তু তিনি যে কঠিন পণ করে বসে আছেন, বিবাহ করেন না। শুধু তাই নয় সত্যবতীর পিতা দাসরাজা বুঝি বা কিছুটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যে, ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করবেন। পিতার স্বার্থে তাতেই রাজি হন যুবরাজ। এদিকে সত্যবতীর গর্ভে শান্তনু রাজার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ অসময়ে মৃত্যুবরণ করেন। বিচিত্রবীর্য বসেন সিংহাসনে। শান্তনুর অবর্তমানে তাঁর অভিভাবক হলেন ভীষ্ম। কাশীরাজের কন্যাদুটির সাথে ভাইয়ের বিয়েও দিলেন ভীষ্ম। কিন্তু

ভবিতব্যকে খণ্ডাবে কে ? প্রাণক্ষয়ী যক্ষ্মা কেড়ে নিল বিচিত্রবীর্যকে। পুত্রশোকে কাতর হলেন সত্যবতী। সময় শোকের ওপর কিছুটা প্রলেপ দিল, কিন্তু ততক্ষণে তাঁর মনে চেপে বসেছে নানান আশঙ্কা। রাজ্যের তো এই হাল! একে ভীষণ প্রতিজ্ঞার অটল থাকা বড় ছেলে ভীষ্ম, অন্যদিকে তাঁর নিজের সন্তানের সুন্দরী বিধবা দুই পত্নী। এত বড় রাজ্যসভা কে সামলাবে ? দিশাহারা হয়ে পড়েন রাজমাতা। আকুল হয়ে বড় ছেলেকে নানাভাবে বোঝাতে থাকেন। সেইসময় সমাজ আর আজকের সমাজকে একখাতে ফেললে হবে না। নিঃসন্তান রমণী নিয়োগপ্রথার মাধ্যমে সন্তানবতী হতেন। সেই ক্ষেত্রজ সন্তান সমাজে বৈধ ছিল। তবে হ্যাঁ সেই প্রথাতেও মেয়েটির আদৌ সায় ছিল কিনা জানা যায় না। ধরেই নিতে পারি ছিল না। সত্যবতীর বক্তব্য ছিল এই যে, ভীষ্ম যদি রাজি থাকেন, তবে তাঁর দুই সুন্দরী পুত্রবধূ সন্তানবতী হতে পারেন। পিতা হিসেবে ভীষ্মের কোনো বিকল্প হতে পারে না। না, এটা ভেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে, সেই ক্ষেত্রেও স্বামীহারা দুই নারীর কোনোরকম মত নেওয়া হয়েছিল। গুরুজনেরা তাঁদের জন্য যে বিধান দেবেন তাই তাঁদের মাথা পেতে নিতে হবে, সেক্ষেত্রে যদি পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে হয়, সেটাও। এদিকে ভীষ্ম তো কঠোর প্রতিজ্ঞায় অবিচল। সত্যবতীর অনেক অনুরোধ উপরোধ তাঁকে চুলমাত্র টলাতে পারেনা। রাজা শান্তনুর বংশ কি তবে নির্বংশ হবে ? না, ভীষ্মও তা চাননা। পুত্রশোকাতুর উৎকণ্ঠিতা মাকে সান্ত্বনা দিলেন তিনি। বললেন, এমন নিদর্শন তো অতীতে রয়েছে, যখন ক্ষত্রিয় রমণীরা বংশরক্ষার খাতিরে বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণের সাথে মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদন করেছেন। সে তো সমাজের নিরিখে দোষের নয়, বিশেষত ক্ষেত্রজ পুত্র যখন সমাজে স্বীকৃত। আর ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণ, সুতরাং দোষের কারণও নেই। তবুও চিন্তাকুল সত্যবতী জানতে চান, কি সেই নিদর্শন ? অন্ততঃ একটা উদাহরণ না শুনলে বুঝি তিনি মনে জোর পাননা।

তখন ভীষ্ম তাঁকে বলা শুরু করেন প্রাচীন আখ্যান। হয়তো পিতার আদেশে পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেন। ক্ষত্রিয় পরিবারগুলো অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। তখন বংশের সন্তানকামী নারীরা সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণের দ্বারা নিয়োগ প্রথায় সন্তনা উৎপাদন করতেন। ভীষ্ম বলেন, এতে দোষের কিছু নেই। বরং এ শাস্ত্রসম্মত।

ততঃ সম্ভূয় সৰ্ব্বাভিঃ ক্ষত্রিয়াভিঃ সমস্ততঃ।।
উৎপাদিতান্যপতান্যানি ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ।
পাণিগ্রাহস্য তনয় ইতি বেদেযু নিশ্চিতম্।।[৫]

ভীষ্ম সত্যবতীর অনুরোধে আবার বলা শুরু করেন এক প্রাচীন ইতিহাস। প্রাচীনকাল উতথ্য নামের এক ঋষি ছিলেন। তাঁর পত্নী মমতা ছিলেন সন্তানসম্ভবা। উতথ্যের ছোটভাই ছিলেন দেবপুরোহিত বৃহস্পতি। একদিন কামনার বশবর্তী হয়ে বৃহস্পতি উপস্থিত হন ভ্রাতৃজায়া মমতার কাছে। মমতা বারংবার তাঁকে বিরত করার চেষ্টা করলেও তিনি বিরত হলেন না। হ্যাঁ, ধর্ষণের সংস্কৃতি সেকালেও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। বৃহস্পতি, দেবপুরোহিত, তায় আবার নিজের দেবর, তাঁকে বাধা দিতে পারলেন না দুর্বল মমতা। ক্ষীণকণ্ঠে অনুরোধ করলেন, আমার গর্ভস্থ শিশু গর্ভে থেকেই ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করেছে। তার ক্ষতি হতে পারে। এদিকে আপনিও

অব্যর্থরেতা। দয়া করে এসময় এমন আচরণ থেকে বিরত হন। কামুক বৃহস্পতি সে কথা শুনলে তো! প্রতিবাদ করে উঠল গর্ভস্থ শিশু। তাতেও নিরস্ত হলেন না তিনি। মমতার গর্ভস্থিত ঋষিবালক বীর্য্যপাতের মুহূর্ত্তে নিজের পাদুখানি দিয়ে বীর্য্যপ্রবেশের পথ আটকে রাখল। বীর্য্য প্রবেশের পথ না পেয়ে পড়ল মাটিতো ক্রুদ্ধ হলেন বৃহস্পতি। অভিশাপ দিলেন, মমতার গর্ভস্থিত শিশুকে। নিজের কাম চরিতার্থ না হওয়ায় বৃহস্পতি, দেবপুরোহিতও আচরণ করলেন প্রাকৃতজনের মতো। বৃহস্পতির আভিশাপে জন্মান্ধ হলেন দীর্ঘতমা। জন্মান্ধ দীর্ঘতমা বেদজ্ঞ পণ্ডিত হওয়ায় প্রদ্বেষীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। প্রদ্বেষী ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। দীর্ঘতমার ঔরসে প্রদ্বেষী গৌতম প্রভৃতি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এই অবধি সব ঠিকঠাক চলছিল। ছেলেরা বড় হতে লাগল। স্বামী অন্ধ। সংসার চালানো, সন্তানপালন ইত্যাদি সব কাজ ভালোবেসেই পালন করতেন প্রদ্বেষী। গোল বাধল অন্য জায়গায়। দীর্ঘতমা পণ্ডিত, ধার্মিক, আবার বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। কিন্তু আদতে তো তিনি রক্তে মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ। স্ত্রীপুত্র নিজের পরিবারের কথা ভুলে গেলেন। সুরভিপুত্রের কাছে গোধর্ম শিক্ষা করলেন। নিজের পরিচয়, বিদ্যাবত্তা সবকিছু ভুলে গিয়ে প্রকাশ্যমৈথুনে প্রবৃত্ত হলেন। স্বাভাবিভাবেই ক্রুদ্ধ হলেন প্রদ্বেষী, পুত্ররাও প্রবল ক্ষুব্ধ হল। প্রদ্বেষী বললেন, আপনি অন্ধ, তাই কিছুটা সহানুভূতি কিছুটা বা দায়িত্বের খাতিরে এতকাল ছেলেদের সাথে আপনরাও ভরণ করে এসেছি। কিন্তু আর নয়। আর আমি এ দায়িত্ব পালন করতে নারাজ। দীর্ঘতমার পৌরুষ জেগে উঠল যেন। যতই তিনি অসমর্থ হন না কেন, নারীর কাছে কেন হার মানবেন ? যতবড় অপরাধই তিনি করে থাকুন না কেন, কেনই বা অপরাধ স্বীকার করবনে তিনি ? তাও একজন অবলা নারীর কাছে ? তিনি বলে উঠলেন, 'কোনো ক্ষত্রিয়ের বাড়ি নিয়ে চল আমায়। সেখান থেকে যে ধন মিলবে তাই দিয়ে আমাদের দিব্যি কেটে যাবে দিন।' প্রদ্বেষী আত্মমর্যাদাসম্পন্না নারী। তিনি ভিক্ষা চাইতে রাজি নন।

ক্রুদ্ধ পুরুষ, নারীকে ভরণ করতে পারেন না, কিন্তু অভিশাপবাণী উচ্চারণে কোথাও গলাটা একটুকুও কেঁপে উঠলো না। বলে উঠলেন –

অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিত।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্।।
মৃতে জীবতি বা তস্মিন্ নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অবিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।
অপতীনান্ত নারীণামদ্যপ্রভৃতি পাতকম্।
যদ্যস্তি চেদ্ধনং সর্ব্বং বৃথাভোগা ভবন্ত তাঃ।
অকীর্ত্তিঃ পরিবাদাশ্চ নিত্যং তাসাং ভবন্ত বৈ।।[৬]

আজ থেকে আমি জগতে স্ত্রীগণের জন্য এই নিয়ম প্রতিষ্ঠা করছি, যাবজ্জীবন পতিই একমাত্র অবলম্বন হবে তাদের। সে যদি বিধবাও হয়, তথাপি অন্যপুরুষসঙ্গ করলে পতিত হবে, পতির ধনে তাদের কোনো অধিকার থাকবে না। সমাজে তারা নিন্দিত হবে, আত্মীয়স্বজন তাদের ত্যাগ করবে।

না, বিধানটা কোনো পুরুষের জন্য ছিল না। এক অন্যায়কে ঢাকা দেওয়ার জন্য, নিজের পৌরুষের প্রমাণ দিতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিও এমন অভিশাপবাণী উচ্চারণ করতে পিছপা হলেন না। ঋষিরা যে আদতে রক্তমাংসের আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতই, এ নিদর্শন তো কতই মেলে। এখানে আরো একবার তা প্রমাণিত হল। এরপর ক্রুদ্ধ পুত্ররা মায়ের আদেশে পিতাকে ভেলায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। তাঁকে উদ্ধার করেন বলিরাজা। বলিরাজা নিঃসন্তান ছিলেন। রাজা বংশবিস্তারের জন্য দীর্ঘতমাকে অনুরোধ করলেন, যাতে ঋষির ঔরসে তাঁর ভার্যার গর্ভে ধার্মিক পুত্র জন্ম হয়। রানী সুদেষ্ণা ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধ জেনে তাঁর ধাত্রীকে পাঠিয়ে দেন ঋষির কাছে। সেই ধাত্রীর গর্ভে কক্ষীবান প্রমুখ পুত্রের জন্ম হয় এবং পরে রাণী সুদেষ্ণার গর্ভের দীর্ঘতমার ঔরসে আরও পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়।

ভীষ্মের গল্প বলার উদ্দেশ্য এখানেই চরিতার্থ হল। সত্যবতীর সামনে তিনি নিয়ে এলেন বেদের মন্ত্রদষ্টা ঋষির উদাহরণ রাজার ক্ষেত্রজ জনক ছিলেন যিনি।

এই সেই দীর্ঘতম ঋষি, যিনি জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়েছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে বেদে, মহাভারতে তাঁরই প্রাকৃতজনোচিত আচরণ কোথায় বিস্মিত করে। বিস্মিত করে তাঁর অভিশাপবাণী যা উচ্চারিত হয়েছিল সমগ্র নারীজাতির প্রতি। ভর্ত্তা তাঁকে ভরণ করছেন না, তাঁর কষ্টার্জিত অন্নে দিনযাপন করে নিন্দনীয় আচরণ করছেন। কিন্তু প্রদ্বেষী যখন সামান্য প্রতিবাদ করলেন, গর্জে উঠল পৌরুষ। কোপ নেমে এল সেই নারীকুলের ওপর। সেই নারীকুল, হারালো তার স্বাতন্ত্র্য, পছন্দ অপছন্দ প্রকাশ করবার অধিকার। সমাজের প্রয়োজনে, বংশরক্ষার খাতিরে সে মেনে নিল অনেক অন্যায় অবিচার। খোঁজও রইল না তার, পুত্রার্থে পরের শয্যাসঙ্গিনী হতে সে কতবার চোখের জল ফেলেছে। যুগের পর যুগ এলো গেল। কত দেশরাজপাটের উত্থান পতন হল, কত না শাস্ত্রকার যুগের প্রয়োজনে নিত্যনতুন বিধান দিলেন, সমাজে তা বলবত্ হল, আবার কালের নিয়মে তাও পুরোনো হল নতুনের কাছে। কিন্তু নারীর স্বাতন্ত্র্য রয়েই গেল বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে। আর তার সাথে জুড়ে গেল দীর্ঘতমার নাম।

তথ্যসূত্র:

১। ঋগ্বেদসংহিতা ১৫৮.১,৬

২। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৮.২৩

৩। বৃহদ্দেবতা ৪.১১১৫, ২১২৫

৪। মনুসংহিতা ৯.৩

৫। মহাভারতম্, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ (সম্পা), আদিপর্ব: ৯৮; ৫৬

৬। ঐ, আদিপর্ব, ৯৮; ৩৩-৩৫

দাঙ্গার অমানবিকতার করুণ কাহিনী - 'করুণকন্যা'

বিপ্লব কুমার ভট্ট

সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর জীবন কর্মময়, চড়া-উৎরাই ও কান্না-হাসির দোলায় দোলায়িত। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী। ১৯৪০ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর লেখার উন্মেষ কাল। এই সময়েই ঘটে যাওয়া বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা সমাময়িক কালেতো বটেই, সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল আমাদের দেশে, অবিভক্ত বাংলায় এমনকি সর্বব্যাপী বিশ্বে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদধ (১৯৩৯-১৯৪৪), ১৯৪২ খ্রীঃ ভারত ছাড় আন্দোলন, ১৯৪৬ খ্রীঃ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, ১৯৪৭ খ্রীঃ বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি প্রভৃতি ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে চল্লিশের দশক ছিল উত্তেজনায় উদ্বেল।

উত্তেজনা উদ্বেল এইরকম সময়ে চল্লিশের দশকের বাংলা ছোটগল্পের ধারায় আবির্ভূত প্রায় সকল গল্পকারগণের গল্পে তাই আমরা পাই হতাশা, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা আর চাপ চাপ রক্তের দুঃস্বপ্ন। সমাজ সচেতন দায়বদ্ধ এক ঝাঁক, তরুণ লেখক নব নব চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যিকে হাতিয়ার করে সমাজ বদলের স্বপ্নে বাংলা ছোটগল্প রচনায় অগ্রণী ভূমিকা নেন। এই ধারার উল্লেখযোগ্য গল্পকারগণ - সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নবেন্দু ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল জানা, সোমেন চন্দ্র চন্দ, সোমনাথ লাহিড়ী, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর প্রমুখ।

১৯৪৬ খ্রীঃ ২৯শে জুলাই ডাক ও তার কর্মীদের ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘটের দিনেই বম্বেতে সারা ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভায় 'স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র' অর্জনের লক্ষ্যে ১৬ই আগষ্ট 'ডিরেক্ট অ্যাকশন' বা প্রত্যক্ষসংগ্রামের আহ্বান করা হয়।

১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে সামনে রেখে ২৯শে জুলাই-এর পরের দিন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়। বাঙলার লীগ সভাপতি নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা ছিল আর দেরি নয়, সময় এসে গেছে। কলকাতায় গঠিত হয় মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড। জেলায় জেলায় প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। বাঙালার লীগ প্রধানমন্ত্রী সোহরাবার্দি মুসলমান যুব সমাজকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ নিয়ে লীগ নেতারা। স্পষ্ট করে কিছু না

বললেও নাজিমুদ্দিন বলেন লীগ অহিংসায় বিশ্বাস করে না। আবার এও বলা হচ্ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হবে। সোহরাবর্দি আশ্বাস দেন লীগ হিংসা বা হুমকির আশ্রয় নেবে না। জিন্নাহ দিনটিকে শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে পালনের আবেদন করেন অথচ তলায় তলায় এক ভয়ানক প্রস্তুতি চলছিল।

হিন্দুরাও ঐ অবস্থায় আশঙ্কায় দিন কাটায়। তারা এর বিরুদ্ধে নিজেদের মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়তে থাকে। হিন্দু মহাভা হিন্দুদের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি করে হিন্দুদের তৈরি থাকার আহ্বান জানায়। হিন্দু মহাসভা মুসলিম লীগের ডাকা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' এর ঘোষণা এবং ধর্মঘটের বিরোধিতা করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত।

১৬ই আগষ্ট সকাল থেকে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয়ে যায় ছেচল্লিশের ভয়ংকর দাঙ্গা। এই দাঙ্গা ধীরে ধীরে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশ কিছু দিন এই দাঙ্গা স্থির হয়। দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকম সত্য-মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ ঘর বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। উভয় সম্প্রদায়ের প্রচুর মানুষ দাঙ্গায় নিহত হয়, নিখোঁজ হয়, মহিলারা অপহৃত হয়, ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পাস্পরিক বিদ্বেষ, ঘৃণা, অবিশ্বাসে সাধারণ মানুষের মন কলুষিত হয়। সম্প্রদায় ভিত্তিতে কলকাতার নাগরিক সমাজ কার্যত দু'ভাগে ভাগ হয়। এমনকি এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের এলাকায় ঢুকতেও সাহস পেত না।

এই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার প্রেক্ষিতেই লেখা রমাপদ চৌধুরীর 'করণকন্যা'। গল্পটি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। পরে গল্পটি লেখকের 'আপন প্রিয়' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়। 'করুণকন্যা' গল্পটি 'গল্পসমগ্র' এর বাই শতম গল্প যোগ হয়েছে।

গল্পটিতে প্রবেশের পূর্বে আমরা সংক্ষেপে 'করুণকন্যা' গল্পটির বিষয়বস্তু আলোচনা করে নিতে পারি –

বিস্তীর্ণ পদ্মার ভাঙা ঢেউ আর চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকারকে পাথেয় করে হিজল ঝোপের আড়ালে আড়ালে অরুন্ধতী তার বাবা, মা, ভাই, বোন গা ছমছমে দাঙ্গার স্মৃতি নিয়ে ঘর বাড়ি ছেড়ে অনিশ্চিত গন্তব্য পথের যাত্রী হয়। অজানা আশঙ্কায় চলতে চলতে একসময় সবাই থেমে যায় উন্মত্ত একদল বিভীষিকার সামনে ঃ ''হ্যাঁ, থেমে পড়তেই হল শেষ অবধি। হইহই করে একটা উন্মত্ত বিভীষিকার দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অরুন্ধতীর জীবনে শুরু হল নতুন একটি পরিচ্ছেদ। একটি নয় কয়েকটি পরিচ্ছেদ।''[১] - অরুন্ধতী সেই দাঙ্গা উন্মত্ত বিভীষীকা বাহিনীর হাতে অপহৃত হয়ে বিধর্মী ঘৃণার স্বামীর অসুর প্রেমের অযাচিত সন্তানকে বুকে চেপে পাতাল পুরীর বন্দিনীর জীবন কাটাচ্ছিল।

হঠাৎ একদিন দারোগা পুলিশ অরুন্ধতী ও তার ছেলেকে পৌঁছে দেয় মা-ভাইবোনদের কাছে। শুরু হয় অরুন্ধতীর জীবনের আর এক অধ্যায়। বহু প্রশ্ন বুকে চেপে রেখে মা ও ভাইবোনদের ফিরে পাওয়ার আনন্দে জড়িয়ে ধরে। এত বছর বাদে মেয়েকে ফিরে পেয়েও অরুন্ধতীর মা খুশিতে উজ্জ্বল হতে পারেনি। অরুন্ধতীর কোলের ছোট্ট শিশু মা-মেয়ের মাঝখানে মস্ত দেওয়াল তুলে দেয়।

ছেলে কোলে অরুন্ধতীর ফিরে আসার খবর মুহূর্তে প্রতিবেশীদের রটে গেলে তাদের মধ্যে আদিখ্যেতা শুরু হয়ে। মজা করে গায়ে পড়ে অরুন্ধতীর মা'কে কেউ জিজ্ঞাসা করে - ''শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়ে এসেছে বুঝি ?''[২] উত্তরে অরুন্ধতীর মা মাথা হেঁট করে চোখের জল চেপে বলে – ''দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিল।''[৩]

অরুন্ধতীর মা এর এই কথায় কেউ কেউ সহানুভূতি প্রদর্শনের ছলে তির্যক মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছে আর অরুন্ধতীর মা সব বিদ্রুপ নীরবে সহ্য করেছে। কপাটের আড়াল থেকে এই সব বিদ্রুপ শুনে শুনে অরুন্ধতী লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চেয়েছে। একসময় এইসব বিদ্রুপ সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে অরুন্ধতী প্রতিবেশিনী এক প্রৌঢ়ার মন্তব্যের প্রতিবাদে দৃঢ় ক্রোধে কপাটের আড়াল থেকে ছেলে কোলে বেরিয়ে দেখিয়ে বলে – ''ভালোয় ভালোয় যে আসিনি তার সাক্ষীও এনেছি''।[৪]

অরুন্ধতীর এই তীব্র প্রতিবাদ তাদের সহ্য হয়নি, তাই তারা বলে – ''ও মা, তেজ কেন মেয়ের এত, ভাবলে সবাই। পাঁচ বছর ধরে জাতজন্ম খুইয়ে কোলে একটা ছেলে নিয়ে ফিরতে হল যাকে, কোথায় সব সময় মুখ লুকিয়ে থাকবে, চোখাচোখি হলে মাথা হেঁট করবে, তা নয় স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব।''[৫]

আবার প্রতিবেশীরা যখন বলে –''এখনতো বলছে দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিল, দাঙ্গায় না কিসে ভগবান জানেন।''[৬]

এইসব আচরণে অরুন্ধতী মনে মনে প্রচুর ব্যাথা পেলে তার মা লোকের কথায় কান দিতে না বলে। একথা বলে সান্ত্বনা দিলেও স্বামীহীন অরুন্ধতীর মা লোকলজ্জার ভয়ে তটস্থ তাই অরুন্ধতীর ছেলেকে অনাথ আশ্রমে রাখার প্রস্তাব দেয়। মায়ের এই কথা অরুন্ধতী আরও রেগে বলে ঃ ''তার চেয়ে বলো না এক আছাড় মেরে শেষ করে দিই ওকে, তোমরা শান্তিতে থাকতে পাবে।''[৭]

জীবনের একমাত্র সম্বল নিজের প্রাণাধিক প্রিয় কোলের রক্তশিশুকে অরুন্ধতী তার ঘৃণার স্বামীর কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়ে এনেছে তাই অরুন্ধতী মায়ের প্রস্তাবে সম্মত হয় না। অরুন্ধতীর মা তার বাকি দুই সন্তান বিজু ও কলির ভবিষ্যতের চিন্তায় বাসা বদলের কথা বললে অরুন্ধতী রাজি না হয়ে বলে আসলে সব পাড়াই একই রকম। কোন কথাতেই অরুন্ধতী রাজি না হলে তার মা তাকে হিন্দু বিধবার রীতি মেনে থান কাপড় পরতে বললে অরুন্ধতী মা-এর এই কথায় পাগলের মত হাসতে হাসতে ভাবে - কোনদিন যে সধবা হল না তাকে বিধবা সাজতে হবে!

দাঙ্গায় বাস্তুচ্যুত হওয়ায় অরুন্ধতীর মা এর শেষ সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়ে আসে। অরুন্ধতী সংসারের খরচ সামাল দিতে একটা চাকরির চেষ্টায় এ অফিস সে অফিস ঘুরতে ঘুরতে এক অফিসের সিঁড়িতে প্রাক্তন প্রেমিক সুবিমলের দেখা পায় অভাবনীয়ভাবে। অরুন্ধতীর জীবনে আরেক অধ্যায় শুরু হয়।

দীর্ঘ অদর্শনের পর সুবিমল দর্শনে অরুন্ধতীর মনে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে। অরুন্ধতী সুবিমলকে নিয়ে গলির গলি তস্য গলি পেরিয়ে নিজেদের বাড়িতে এলে অরুন্ধতির মা দরজা

খুলে সুবিমলকে দেখে বলে – ''কোত্থেকে কোথায় এসেছি দেখে যায়।''[৮]

সুবিমলদের পরিবারও দাঙ্গায় ভিটেমাটি ছাড়া। প্রথম সাক্ষাতের আড়ষ্টতা কাটিয়ে অরুন্ধতী দর্শনে ও কাছে পেয়ে সুবিমল অরুন্ধতীর মায়ের কথায় ভাবে - ''অনেক সমুদ্র পার হয়ে নতুন বন্দরে।''[৯]

সুবিমলের কাঁধে হাত রেখে অরুন্ধতী পুরোণো প্রেম সম্পর্কে জানতে চায়ঃ ''আমাদের সব স্বপ্ন কি মিথ্যে হয়ে গেছে সুবিমলদা ?''[১০] সুবিমলও একইভাবে অরুন্ধতীর কাছে জানতে চেয়েছে : ''যা হারিয়েছে তা ফিরবে না'' ?[১১]

এই অবস্থা দু'জনে পরস্পরের কাছাকাছি এসে পুরোণো প্রেমের স্বীকৃতিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে গলা মিলিয়ে বলেছে ঃ ''আমাদের মন যখন বদলায়নি, পৃথিবী বদলে গেলেও ক্ষি নেই'' ।[১২]

অরুন্ধতী নিজের গ্লানিময় ইতিহাস সুবিমলের কাছে প্রাণপণ লুকোনোর চেষ্টা করে। সুবিমলকে চা দিতে এলে অরুন্ধতী মাকে আড়ালে ডেকে কিছু ফাঁস করতে নিষেধ করে।

সুবিমলের সাথে যখন অরুন্ধতির পুরণো প্রেম জোড়া লাগতে চলেছে সেই খুশিতে গঙ্গার পাড়ে এক মনোরম বৈকালিক সময় অতিব হিত করে দুজনে। ঐ দিনই বাড়ি ফিরে ডাকে আসা চিঠি পড়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার দশা হয় অরুন্ধতীর চিঠিতে তার 'ঘৃণার স্বামী' অরুন্ধতীকে স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে বলেছে। যদি একান্তই অরুন্ধতী ফিরতে না চায় তবে অরুন্ধতী যেন তার সন্তানকে ফিরিয়ে দেয়। নিজের সন্তানকে নিয়ে অরুন্ধতীকে সে ভূলে থাকবে। তাও যদি অরুন্ধতী না মানতে পারে অন্তত একটি দিনের জন্য শিশুটিকে যেন দেখতে দেয়। চিঠিটি অরুন্ধতীর কাছে যেন অভিশাপ স্বরূপ। তাই চিঠিটি পড়ে সে হিংস্র কুটিল হাসিতে কুচিকুচি করে।

দ্বিতীয়বার অরুন্ধতীর বাড়ি এসে সুবিমল তাদের বাড়িতে যাওয়ার আহ্বান জানালে অরুন্ধতী সানন্দে সুবিমলদের বাড়িতে গেলে সুবিমল জানায় তার বোন মাধুরী নেই। অরুন্ধতী তার বাল্যবান্ধবী সম্পর্কে জানতে চাইলে সুবিমল জানায় ঃ ''মাধু-মাধু খারাপ হয়ে গেছে অরুণি'' ।[১৩]

আরও জানতে পারে সুবিমলরা দাঙ্গার সময় যখন ট্রেনে আসছিল, সেই রাতে ট্রেনে হঠাৎ আগুন লাগলে মাধুকে হারাতে হয়।

মাধুরীর পরিণতির সাথে নিজের পরিণতির মিল খুঁজে পেয়ে শিউরে উঠে অরুন্ধতী। মাধুরীকেও একদিন হঠাৎ পুলিশ ফিরিয়ে দিয়ে গেলে সব কিছু গোপন রেখে মাধুরীর বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মাধুরী নিজের কলঙ্কে চেপে না রেখে বিয়ের পর স্বামীর কাছে সব কিছু প্রকাশ করলে তার স্বামী কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়। মাধুরী মা ও দাদাদের বাড়িতে ফিরলে সবাই মাধুরীকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করলে সে অভিমানে বাড়ি ছাড়ে।

মাধুরীর পরিণতির সাথে নিজের জীবনের একটা পরিচ্ছেদের মিল থাকায় অরুন্ধতী তীব্র কথা অনুভব করলেও তার থেকে আরও বেশি কষ্ট পায় সুবিমলের কুৎসিৎ মানসিকতায়।

সুবিমল যখন বারে বারে নিজের বোন মাধুরীর খারাপ হওয়াকে মানতে না পেরে কসাঘাত করেছে ঃ ‘‘মন তো শরীরে বশ অরুণি। শরীর অশুচি হলে....কথা শেষ করতে পারলে না সুবিমল।’’[১৪]

সুবিমল এই কথায় অরুন্ধতীর মনে হয়েছে সে যেন নীতিবাগীশ কোনও গ্রাম্য টুলো পন্ডিতের কথা শুনছে। তার মনে হয়েছে শিক্ষায়, পোশাক, পরিচ্ছদে মানুষ যতই পৃথক হোক আসলে সব মানুষের মন এক। সুবিমলের প্রতি অরুন্ধতীর মোহ ভঙ্গ হয়। সে ভাবে নিজের গ্লানিময় ইতিহাস সুবিমলের কাছে প্রকাশ না করে ভালোই করেছে।

সুবিমল ত্যাগ এবং অরুন্ধতীর দাঙ্গার ঘৃণার স্বামীর বারংবার চিঠিতে দেখা করার চাপ অরুন্ধতীর মনে বিভীষিকাময় সেই রাতের পাশবিকতার দগদগে স্মৃতি ভেসে উঠলে তার আক্রোশ শতগুণ বেড়ে যায়। শেষ চিঠিতে গলির মোড়ে গ্যাস পোস্টের তলায় একটি বার শিশু সন্তানকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছা প্রকাশ করলে অরুন্ধতী ভাবে সে কোনমতেই ক্ষমা করতে পারবে না তার ঘৃণার স্বামী এবং সুবিমলকে। কারন - ‘‘একজন শুধুই ঘৃণা পেয়েছে অরুন্ধতীর, আরেকজন অরুন্ধতীকেই ঘৃণা করে।’’[১৫] অরুন্ধতী তাই উভয়কেই যেন হিংস্র আনন্দে ছিঁড়ে ফালাফালা করতে চেয়েছে। প্রবল মানসিক দ্বন্দ্বে অবশেষে নির্জন, নিঝুম রাত্রির অন্ধকারে অরুন্ধতী তার সন্তানসহ ঘৃণার স্বামীর সাথে ফিরে গেছে।

‘করুণকন্যা’ গল্পের মুখ্য চরিত্রগুলি - অরুন্ধতী, সুবিমল, অরুন্ধতীর মা। উল্লেখমাত্রে বর্ণিত অরুন্ধতী কথিত তার ঘৃণার স্বামী, অরুন্ধতীর ছেলে এবং মাধুরী।

অরুন্ধতী দাঙ্গায় হারিয়ে যাওয়া মেয়ে। অবশ্যই এই গল্পের মুখ্য চরিত্র। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার প্রবল উপস্থিতি। গল্পের ঘটনাক্রম তাকে কেন্দ্র করেই এগিয়েছে।

দাঙ্গায় উন্মত্ত একদল বিভীষিকার হাতে পড়ে অরুন্ধতীর জীবনে শুরু হয় একটি অবর্ণনীয় দুঃসহনীয় পরিচ্ছেদ। এরপর তার জীবনের ঘটনা প্রবাহ বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদে এগিয়েছে।

অপহৃত অরুন্ধতী পাতালপুরীর বন্দিনী জীবন কাটিয়েছে। দিনের পর দিন অত্যাচার, আঘাত, অপমানে ক্ষত-বিক্ষত অরুন্ধতীর সারা জীবনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে।

বিধর্মী ঘৃণার স্বামীর আসুরিক কামনার ফসল অযাচিত রক্তশিশুকে বুকে জড়িয়ে মায়ের নিখাদ স্নেহে শেষ অবলম্বনকে আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছে। বন্দিনী জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে মা এর কাছে ফিরলে অরুন্ধতীর মা এর মুখ অনুজ্জ্বল হয় শিশুটিকে দেখে। অনাগত অযাচিত আগন্তুক মা-মেয়ের মাঝে মস্ত দেওয়াল তুললে এবং প্রতিবেশীদের নিরন্তর তির্যক মন্তব্যে অরুন্ধতীর মা ছেলেটিকে অনাথ আশ্রমে রাখার প্রস্তাব দিলে অরুন্ধতী ক্রোধান্বিত হয়ে মাকে বলে – ‘‘তার চেয়ে বলো না এক আছাড় মেরে শেষ করে দিই ওকে....’’।[১৬] অরুন্ধতীর এই কথায় সন্তানের প্রতি প্রবল মাতৃস্নেহ প্রকাশিত।

সুবিমল দর্শনে অরন্ধতীর পুরোনো প্রেম পাপড়ি মেলে। হৃদয়তন্ত্রীতে গুনগুনিয়ে উঠে সুবিমলকে ফিরে পাওয়ার প্রবল আকাঙ্খা। সুবিমলের ভালোবাসাই ছিল ওর অলঙ্কার। সেই সুবিমলের কাছে তাই কলঙ্কময় পরিচ্ছেদ লুকিয়ে রাখার প্রাণপণ প্রয়াস করেছে অরুন্ধতী।

মাধুরীর করুণ পরিণতিতে অরুন্ধতী শিউরে উঠলেও সুবিমলের রক্ষণশীল মনের হাদিস পেয়ে অরুন্ধতী হতাশ হয়েছে। নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুবিমলের কাছে আর ফিরে যাবে না, কারণ সুবিমল অরুন্ধতীর অতীত কলঙ্ক জানতে পারলে তাকেও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে। সুবিমলের মানসিকতা ও বক্তব্যকে তাই অরুন্ধতী গ্রাম্য টুলো পন্ডিতের সাথে একই পংক্তিতে বসিয়েছে।

দাঙ্গাবাজ আসুরিক স্বামীকেও অরুন্ধতী ক্ষমা করতে পারে না। একদিকে সুবিমল এবং অন্যদিকে ঘৃণার স্বামীর প্রতি নিয়ত ফিরে যাওয়ার আহ্বানে অরুন্ধতীর প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। তার মধ্যে জেগে উঠে অতীতের সমস্ত অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা। সুবিমল ও বিধর্মী ঘৃণার স্বামী - কাউকেই ক্ষমা করতে পারে না অরুন্ধতী। তার কেবলই মনে হয়েছে - ''একজন শুধু ঘৃণা পেয়েছে অরুন্ধতীর, আরেকজন অরুন্ধতীকেই ঘৃণা করে।''[১৭]

ঘৃণার স্বামীর ক্রমাগত ফেরার আহ্বানে দেখা করতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে নিতে তার কেবলই মনে হয়েছে জীবনের চরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়ে এতদিনের ব্যর্থ আক্রোশের জ্বালা সে মিটিয়ে নেবে। অরুন্ধতীর রক্ত গরম হয়ে যায় ভাবতে ভাবতে ঃ ''যে শুধু ঘৃণাই পেয়েছে আর যে শুধু ঘৃণাই দিয়েছে অরুন্ধতীকে, আজ এই চরম মুহূর্তে তাদের দুজনকেই যেন হিংস্র আনন্দে ছিঁড়ে ফলতে চায় ও।''[১৮]

অবশেষে নিশুতি রাতে অরুন্ধতী তার ঘৃণার স্বামীর সাথে ছেলে নিয়ে দেখা করতে গিয়ে নাটকীয়ভাবে ফিরতে চেয়েছে সে তার ঘরে। তার এই আকস্মিক পরিবর্তনের ঘৃণার স্বামীর বিস্ময় জাগে - সত্যিই অরুন্ধতী তার বাড়িতে ফিরে যাবে তো! অনেক ঘৃণা, ক্রোধ সংবরণ করে অরুন্ধতী তাই স্বামী-সন্তান-সংসারকে মেনে নিয়ে বলেছে - ''সে তো ফিরে যেতে চায়নি, সমস্ত পৃথিবীই যে ফিরে চলেছে। পিছনের পথে তাকে, সব মানুষকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে।''[১৯]

সুবিমল অরুন্ধতীর প্রাক্তন প্রেমিক। দাঙ্গায় তারাও ছিন্নমূল পরিবার। অরুন্ধতীর সাথে বহুদিন বাদে হঠাৎ দর্শনে অরুন্ধতীর প্রশ্নে বিব্রত ও বিষণ্ণ সুবিমল ম্লান হাসিতে জানায় : ''আর বলবারকি আছে''![২০]

দাঙ্গায় ছিন্নমূল বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিচিত কাউকেই অরুন্ধতী দেখতে পায় না, সুবিমলকে সে কথা জানালে সুবিমল ব্যঙ্গ করে বলে – ''চেনা লোক হয়তো অনেকেই আছে অরুণি, কিন্তু সবাই লুকিয়ে থাকতে চায়'' ।[২১]

সুবিমলের এইরকম উক্তিতে অরুন্ধতীর বুকটা ব্যাথায় মোচড় দেয় - সেভাবে সুবিমল বোধ হয় তার অতীত কলঙ্কের ইতিহাস জেনে তাকেই পাল্টা আঘাত করছে।

এই কথার পরেও অরুন্ধতীর বাড়িতে দুজনে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে কাঁধে কাঁধ রেখে, চোখে চোখ রেখে নিজেদের পুরোণো প্রেমের প্রতি দৃঢ় ব্যক্ত করে বলতে চেয়েছেঃ ''আমাদের মন যখন বদলায়নি, পৃথিবী বদলে গেলেও ক্ষতি নেই'' ।[২২] সুবিমল ও অরুন্ধতীর পুরণো প্রেম যখন বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে সুবিমলের নিজেরই বোন এবং অরুন্ধতীর

বাল্য বান্ধবী মাধুরী সম্পর্কে সুবিমলের বারংবার নোংরা মন্তবঃ ''মাধু-মাধু খারাপ হয়ে গেছে অরুণি''।[২৩]

এইকথায় সুবিমলের অতি রক্ষণশীল মনের হদিস পেয়ে অরুন্ধতী যার পর নাই ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত।

সুবিমলের এই মন্তব্য অরুন্ধতীকে নতুন করে ভাবায়। যে নিজের বোন সম্পর্কে এত নোংরা নোংরা কথা বলতে পারে, সেই সুবিমল অরুন্ধতীর অতীত কলঙ্কের কথা জানতে পারলে তাকে কী মেনে নেবে ? বা তার প্রেমের যে ফল্গুধারা বয়ে চলেছে তা কি বয়ে যাবে ? এই দ্বিধায় যখন অরুন্ধতীর মন ক্ষত বিক্ষত ঠিক সেই মুহূর্তে সুবিমল নারী দেহের শুচিতা নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছে তাতে সুবিমলের প্রতি অরুন্ধতীর মোহ ভঙ্গ হতে সময় লাগেনি : ''মন তো শরীরের বশ অরুণি। শরীর অশুচি হলে....''।[২৪]

সুবিমল এই অসমাপ্ত বাক্য তার নোংরা মনের গোপন কথাকেই প্রকাশ করে। সুবিমলের এই কথায় এক নীতিবাগীশ গ্রাম্য টুলো পণ্ডিতের পরিচয় ফুটে উঠেছে। সুবিমলের কাছ থেকে অরুন্ধতী সরে আসতে তাই একটুকুও কালবিলম্ব করেনি। সুবিমল সম্পর্কে ভেবেছে সে অরুন্ধতীকে ভালোবাসে না, শুধুই ঘৃণা করে। সুবিমলের ভালোবাসাই ছিল অরুন্ধতীর অলঙ্কার অথচ অলঙ্কার অথচ সেই সুবিমলের ভালোবাসার প্রতিই অরুন্ধতীর মনে সন্দেহ জেগেছে। অরুন্ধতী সুবিমলকে দেখে ভেবেছেঃ ''বয়সে, পোশাক-পরিচ্ছদে, শিক্ষায়-যত পৃথকই হোক, সব মানুষের বুঝি বা একই মন''।[২৫]

দাঙ্গায় বিধ্বস্ত ছিন্নমূল পরিবারগুলির অসহায় জীবনচর্যা ফুটে উঠেছে অরুন্ধতীর মা এর লড়াই এর কাহিনীতে। দাঙ্গার বিভীষিকায় নিজের স্বামীকে হারিয়েছেন অরুন্ধতীর মা। বিভীষিকার সেই রাত্রিতে বড় মেয়ে অরুন্ধতীকে অপহরণ করেছিল একদল উন্মত্ত দাঙ্গাবাজ। তারপর ছোট ছোট দুই ছেলে-মেয়ে বিজু ও কলিকে নিয়ে কলকাতার গলিরগলি তস্য গলির সবচেয়ে কোণের উপেক্ষিত বাড়িতে বসবাস করতে বাধ্য হয়। সুবিমলের কাছে দুঃখ করে তিনি জানানঃ ''কোত্থেকে এসেছি দেখে যাও''।[২৬]

অরুন্ধতীও তার বাবাকে হারিয় ফিরে পাওয়ার জন্য প্রচুর মানত করেন। যখন ফিরে পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন, এমনি এক সময়ে অরুন্ধতীকে ফিরে পেয়ে মা খুশিতে উজ্জ্বল হতে চাইলেও অরুন্ধতীর কোলের শিশুটির জাত-ধর্মের বেড়াজাল মা ও মেয়ের মাঝখানে একটা মস্ত দেওয়াল তুলে দেয়।

অরুন্ধতীর ফিরে আসার সংবাদ পাড়ায় ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবেশীদের তির্যক বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তায় চোখের জল চেপে সে অনেক কষ্টে জানায় ঃ ''দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিল''।[২৭]

স্বামীহীন মহিলার দুর্গতির ছবি গল্পের পরতে পরতে ধরা পড়েছে অরুন্ধতীর মায়ের চরিত্রে। প্রতিবেশীদের ভয়ে তাই একসময় পাড়া ছাড়তে মনস্থ করেন কিন্তু অরুন্ধতীর বাধায় সেই পরিকল্পনা বাতিল করেন। প্রতিবেশীদের ভয়ে এতটাই কাঁটা যয়ে থাকতেন যে তিনি একপ্রকার বাধ্য হয়েই অরুন্ধতীর ছেলেকে অনাথ আশ্রমে রাখার কথা বলেন। সেই প্রস্তাব

অরুন্ধতী নাকচ করলে নিজের মেয়েকে থান কাপড় পরে বিধবার সাজ নিতে বলতে বাধ্য হন।

মাধুরী সুবিমলের বোন এবং অরুন্ধতীর বাল্য বান্ধবী।অপরূপা মাধুরীকে অরুন্ধতী গভীরতম বন্ধু বলেই চিনেছে। মাধুরীও দাঙ্গার বিভীষিকার শিকার এবং বিপর্যস্তও ক্ষতবিক্ষত। ট্রেনে আগুন লাগার পর মাধুরী অপহৃতা হয়। বাড়ির লোকেদের অনেক খোঁজাখুঁজিতে তার কোন হদিশ না পাওয়ায় সবাই তখন তার ফিরে আসার আশা এক প্রকার ছেড়ে দিয়েছিল – ঠিক সেই সময় একদিন পুলিশ মাধুরীকে তার মা-দাদাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়।

মাধুরী ফিরে এলে পরিবারের মান-সম্মান ও তার পরের তিনটি বোনের বিয়ের কথা ভেবে মাধুরীর অতীত কলঙ্কের কাহিনী গোপন রেখে তার মা ও দাদারা মাধুরীর বিয়ে দেয়। মাধুরী বাড়ির সবাইকে আগেই জানিয়েছিল সে তার অতীত কলঙ্ককে সারা জীবন লুকিয়ে রাখতে পারবে না, তাই নিজের সততার নিদর্শন বজায় রেখে বিয়ের পরেই নিজের স্বামীর কাছে সব প্রকাশ করে। সব ঘটনা জেনে স্বামী নিরুদ্দেশ হলে মাধুরী মা-দাদাদের বাড়িতে ফিরে এলে সবার ভর্ৎসনা মাথায় নিয়ে ও পরিবারের মান সম্ভ্রম রক্ষায় বাড়ি ছেড়ে অন্ধকার জগতে পা বাড়াতে বাধ্য হয়।

এই গল্পে দাঙ্গার যে বিষময় ফল অরুন্ধতী মাধুরীর মত মেয়ের জীবনে নেমে এসেছে তার মূলে অরুন্ধতীর ঘৃণার স্বামীর মত উন্মত্ত নারকীয় হিংসায় মত্ত একদল বিভীষিকা। তাদেরই অন্যতম অরুন্ধতীর ঘৃণার স্বামী।

গল্পে আমরা তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না পেলেও তাকে ব্যতিরেকে এই গল্পের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অরুন্ধতীর মত নিষ্পাপ কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীকে দাঙ্গার দিনে অপহরণ করে তার জীবনকে কলঙ্কিত ও কলুষিত করে তাকে একপ্রকার পাতালপুরীর বন্দিনীর জীবন যাপনে বাধ্য করেছে এই বিধর্মী পুরুষ চরিত্রটি।

এই বিধর্মী পুরুষ চরিত্রটির জন্যই অরুন্ধতীর জীবনের সুখ, স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। তার আসুরিক প্রেমের অযাচিত সন্তান কোলে নিয়ে অরুন্ধতী মা-ভাই-বোনদের বাড়িতে ফিরেও শান্তি পায় না, সেখানেও সে একের পর এক চিঠি লিখে শেষ পর্যন্ত অরুন্ধতীকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে তার বাড়িতে।

মৌসুমী পাল যথার্থই লিখেছেন ঃ ''যুদ্ধ পরবর্তী হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কুফল এদেশীয়দের জীবনযাত্রাতে বিশেষত নারীদের জীবনের কেমন প্রভাব ফেলেছিল, তাঁর 'অঙ্গপালি', 'করুণকন্যা' 'তিনটি প্রশ্ন' ইত্যাদি গল্পগুলি পাঠে সহজেই অনুমেয়। অপহৃতা মেয়েরা দুঃখময় জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল, চরম বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছিল এরা। নির্দোষ হয়েও সমাজমানসিকতার কারণে অবলম্বনহীন হয়ে পড়েছে তার।''[২৮]

আমাদের আলোচ্য 'করুণকন্যা' গল্পটির সাথে দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখা লেখকেরই অপর গল্প 'অঙ্গপালি'র বেশ সাজুয্য রয়েছে। যেখানে সবিতাও একদল উন্মত্ত রক্তপায়ী বিভীষিকার কোলাহলে অপহৃতা হয়ে অরুন্ধতীর মত পাতালপুরীর বন্দিনীর জীবন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে অবাঞ্ছিত, অযাচিত সন্তান কোলে দাঙ্গায় হারিয়ে যাওয়া পিতৃহীন ভাই বোন ও

মায়ের কাছে ফিরে এসেছে। নিজের সন্তান সবিতাকে তার মা মেনে নিলেও, সবিতার কোলের সন্তানকে নিয়ে সবিতার মা শুচিবায়ুগ্রস্ত হন; সবিতার অস্পৃশ্য সন্তানকে নিয়ে সারাদিন মাখামাখি করার গ্লানিতে অসুস্থ শরীরেও রাতের বেলা স্নান করেন।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সাঙ্ঘাতিক বিষময় পরিণাম অবিভক্ত বাংলায় এবং ভারতীয়দের জীবনযাত্রায় বিশেষত নারীদের জীবনে ও মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। 'করুণকন্যা' গল্প থেকেই তা সহজেই অনুমেয়। অরুন্ধতী ও মাধুরীর মত মেয়েরা বিভীষিকার কাছে কিভাবে দুঃখময় জীবনযাপনে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে - সেই চূড়ান্ত অমানবিকতার করুণ ছবিই এই গল্পের পরতে পরতে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

তথ্যসূত্র:

১। চৌধুরী রমাপদ - 'গল্পসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। সপ্তম মুদ্রণ। সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৭৯।

২। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮০।৩। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮০। ৪।তদবে, পৃষ্ঠা-১৮০।

৫। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮০।৬। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮০। ৭।তদবে, পৃষ্ঠা-১৮১।

৮। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৩। ৯। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৩। ১০।তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৪।

১১। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৪। ১২। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৪। ১৩।তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৬।

১৪। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৭। ১৫। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৮। ১৬।পূর্বোক্ত-৭নং, পৃষ্ঠা - ১৮১।

১৭। পূর্বোক্ত-৭নং, পৃষ্ঠা - ১৮৮।১৮।তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৮।১৯। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৯।

২০। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮২। ২১।তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৩। ২২।তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৪।

২৩। তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৬। ২৪।তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৭। ২৫।তদবে, পৃষ্ঠা-১৮৭।

২৬। পূর্বোক্ত-৮নং, পৃষ্ঠা-১৮৩।২৭।পূর্বোক্ত-৩নং, পৃষ্ঠা-১৮০।

২৮। পাল মৌসুমী - রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প ঃ বিষয় ও রূপরীতি। অক্ষর পাবলিকেশানস্। জগন্নাথবাবি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১।জানুয়ারি-২০১৫।পৃষ্ঠা-১০৩

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা

দশরথ পাল

ভূমিকা :

বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করছে। ভোগ ও ঐশ্বর্যের যেমন কোনও অভাব নেই, তেমনি মানুষ ক্ষমতা ও গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করে চলেছে নিরন্তর। আর এই করতে গিয়ে ভারত সহ সারা পৃথিবীতে মূল্যবোধ ও নৈনিকতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অরাজকতা, দুর্নীতি প্রভৃতি সমাজকে কলুষিত করে তুলছে। সেই সাথে নৈরাশ্য, হতাশা ক্রমশ বাড়ছে। এই মহা সংকট থেকে মুক্তির পথ খোঁজার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উদ্যোগ দেখা যায়। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি অন্যতম হল বিভিন্ন মনীষীদের জীবনচর্চা করা ও তাদের আদর্শ ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা। ভারতসহ সারা বিশ্বের এই সংকট থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণে বিবেকানন্দ চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধুমাত্র একজন মানবপ্রেমিক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। শুধুমাত্র ধর্ম নয়, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি সব বিষয়ে তার ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। তার সমস্ত ভাবনার মূলে মানুষ। মানুষই তার একমাত্র আরাধ্য দেবতা। মানুষের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি তার সমস্ত জীবন বন্যায় করেছেন। মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সীমাবদ্ধতাগুলিকে খণ্ডন করে নতুন আদর্শের কথা প্রচার করেছেন। তিনি মূলত সমন্বয়বাদের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তা প্রচারও বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগীও হয়েছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার আদর্শ প্রচার করেন তিনি। তিনি আধ্যাত্বিক চেতনাকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর সমাজ গঠনের কথা বলছেন। সংক্ষিপ্ত জীবনী, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তার ভাবনা আলোচনার মধ্য দিয়ে এই নিবন্ধে তার সমাজ চেতনা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী :

১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাল্য নাম বিলে। তার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবীর গভীর ভক্তি, দৃঢ় চরিত্র ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখা যায়। তাঁর কাছ থেকেই নরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শৈশব থেকেই নরেন্দ্রনাথের চঞ্চল স্বভাব, প্রখর স্মৃতিশক্তি, সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি আকর্ষণ, বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা স্পষ্ট হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী, হিন্দু দেবদেবীর কথা ও ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বরূপ তিনি শৈশবের আদর ভালোবাসার

মাধ্যমেই আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করেছিলেন।[১] তিনি পাঠশালায় গুরুমশাই-এর পাঠ খুব সহজেই আত্মস্থ করতে পারতেন। ১৮৭১ সালে আট বছর বয়স হলে বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে তিনি ভর্তি হন। সংস্কৃত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি সঙ্গীত, খেলাধুলা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন খুব অল্প সময়ে। তিনি শরীরচর্চার জন্য নিয়মিত নবগোপাল মিত্রের আখড়ায় যেতেন।

১৮৮০ সালে নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের সাধারণ বিভাগের প্রবেশ করলেও প্রথম বর্ষের শেষে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। এই কারণে উপস্থিতির হার কম থাকায় এফ. এ. পরীক্ষায় বসার অনুমতি পাননি। তাই বাড়ীর নিকটবর্তী জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন-এ (বর্তমান নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) তিনি ভর্তি হন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮৮১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ পরীক্ষায় পাশ করেন এবং ১৮৮৪ সালে সেখান থেকে বি.এ পাস করেন। এরপর মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন এর আইন বিভাগে বি. এল পড়তে আরম্ভ করলেও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারেন নি। কেননা ইতিমধ্যে তার ধর্ম জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

কলেজে পড়ার সময় থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে মানসিক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল তারই তাড়নায় তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে, ''তখন তিনি নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম-এ বিশ্বাসী ছিলেন এবং ঐ রূপ ধ্যানে অনেককাল কাটাইতেন।''[২] কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে তার সংশয়-অসংশয়ের দ্বন্দ্ব সমাধানের কোনো পথ নির্দেশ ব্রাহ্মসমাজে পাননি। এইরকম এক পরিস্থিতিতে কলেজের অধ্যাপক উইলিয়াম হেস্টির কাছ থেকে রামকৃষ্ণের নাম শুনতে পান, যিনি তার মানসিক যন্ত্রণার সমাধান করতে পারবেন বলে তিনি মনে করেছিলেন। ১৮৮১ সালে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে ভক্তবৃন্দসহ রামকৃষ্ণ উপস্থিত হলে নরেন্দ্রনাথ সেখানে সকলকে ভজন গান শুনে পরিতৃপ্ত করেন। ''নবাগত গায়কের শারীরিক লক্ষণ, ভাবতন্ময়তা প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ্য করিলেন এবং সেই মিলনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তাহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।''[৩]

নরেন্দ্রনাথ ধর্ম সম্বন্ধে তার সংশয় দূর করতে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে ১৮৮১ সালে দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার উপস্থিত হন। ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের সহজ-সরল কিন্তু প্রত্যয়যুক্তি বিশ্বাস তাকে প্রবল আকর্ষণ করেছিল। রামকৃষ্ণের আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘনঘন যেতে শুরু করেন। তিনি তাকেই আধ্যাত্মিক জীবনের পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করেন বিভিন্ন যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে। 'ঈশ্বরের এক রূপ হিসাবে মানুষকে করুণা করা নয়, সেবা করাই পরম ধর্ম'— রামকৃষ্ণের এই উপদেশ তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণের শরীর যাওয়ার পর বরানগরে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসের শপথ গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী রূপে সারা ভারত পরিব্রাজন করে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে যেমন পরিচিত হয়েছিলেন তেমনি তিনি ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, দুর্বলতা, পশ্চাৎপদতা লক্ষ্য করেছিলেন।

হিন্দু ধর্মের সার্বজনীন ও সহিষ্ণুতার আদর্শ ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় তিনি তুলে ধরেন। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রচার এর সাথে সাথে ওইসব অঞ্চলের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেন। ১৮৯৭ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বিভিন্ন সম্বর্ধনা সভায় তিনি তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ওই বছরই ত্যাগ ও সেবার আদর্শে জনকল্যাণের লক্ষ্যে গুরুভ্রাতা সহ অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'র আদর্শে শিক্ষার বিস্তার, বৈদান্তিক আদর্শ প্রচার, নারী কল্যাণ, রোগীর সেবা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের জয়যাত্রা শুরু হয়। ১৯০২ সালে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিবেকানন্দের চিন্তাচেতনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনার মূল্যায়ন করার পূর্বে সমকালীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট গভীরভাবে অনুধাবন করা দরকার। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকাল থেকে বিভিন্ন বিদেশী জাতি আক্রমণ ও শাসন করলেও ভারতের স্বকীয়তা পুরোপুরি নষ্ট হয়নি; বরং গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে একটা মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতকে সারা ভারতে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার পাশাপাশি সামাজিক, ধর্মীয় ও শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগতি রোধ হয়েছিল। এই সময় ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠী ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসে ভারতীয়দের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের যুদআধ, পলাশী ও বক্সারের যুদআধের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট আভাস মিলেছিল। ক্ষমতা দখলের প্রথম থেকেই তারা তাদের অনুগত একটা শ্রেণী গঠন করতে চেয়েছিল। ভারতীয় অভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহায্যে ভারতে তাদের শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সচেষ্টও হয়েছিল। উপনিবেশিক শিক্ষা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পরিকল্পনা মতো এই উপনিবেশিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রাচ্যকে তারা পুরোপুরি হেয় ও অবজ্ঞা করে তুলেছিল। সি. ই. ট্রেভেলিয়ানের মতে ''ইংরেজি শিক্ষা সকলের জন্য নয়, ধনী, শিক্ষিত ও কাজের মানুষের জন্য।''[৪] উপনিবেশিক শিক্ষায় সাধারণ মানুষের যোগ না থাকলেও কলকাতাকে কেন্দ্র করে এর প্রভাবে এক অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে।

উনিশ শতকে ইউরোপে লক, স্টুয়ার্ট মিল, মিল্টন, বেন্থাম, কোৎ প্রমুখ দার্শনিক ও চিন্তাবিদের উদারনৈতিক চিন্তাভাবনা প্রচারিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। উপযোগবাদকে হাতিয়ার করে ইংরেজরা ভারতে উপনিবেশিক শাসন দৃঢ় করতে চেয়েছিল। সেন্ট সাইমন, চার্লস ফুরিয়ার, রবার্ট আওয়েন লুই ব্ল্যাঙ্ক প্রমূখ ইউটোপিয়ান ইউরোপে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করেন। এমনকি কার্ল মার্কসের আবির্ভাব ও তার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রকাশ ও প্রচার উনিশ শতকে ঘটেছিল ইংরেজ শাসনের সুবাদে ভারতীয়রা এইসব আদর্শের সাথে পরিচিত হয়ে পশ্চিমী আধুনিকতা, যুক্তি ও বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছিল। এরা নিজেদের প্রগতিশীল বলে মনে করত। এরাই বাংলা তথা ভারতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শআরেণী নামে

পরিচিত।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে উনিশ রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্র সেনের মতো সংস্কার করা প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও সমাজের অযৌক্তিক দিকগুলির পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এই সময় ব্যক্তিদের পাশাপাশি ব্রাহ্মসমাজ, আর্য সমাজ ও প্রার্থনা সমাজের মত সংগঠনগুলিও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছিল। এরা মূলত ভারতীয় ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। একই সময়ে রক্ষণশীল মনোভাবী হিন্দু ধর্ম ও সমাজ নেতাদের দেখা যায়, যেমন— রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখার্জী প্রমুখ। তারা হিন্দু ধর্মের সংস্কার করতে রাজি ছিলেন না। ঐতিহ্যকে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিলাম। আবার এই সময়কালে ডিরোজিওপন্থীদের দেখা যায়, যারা হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে ধ্বংসাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। একই সঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারীরা হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচার করেছিল।

খ্রিস্টান মিশনারীরা ভারতে সাম্রাজ্যবাদীর সহচর হয়ে ''প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল পবিত্র খ্রীষ্ট সাম্রাজ্য।''[৫] মিশনারীদের তীব্র আক্রমণ ও খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরকরণ হিন্দুদের ব্যথিত ও হীনমন্য করে তুলেছিল।

এইরকম এক সংকটময় পরিস্থিতিতে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর ভাষায়— ''যুগের প্রয়োজনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এলেন বুদ্ধের করুণা, চৈতন্যের প্রেম এবং উভয়ের শুচিতা নিয়ে।''[৬] গুঢ় ধর্মতত্ত্ব সকলের সামনে সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশ করে বলেন— 'যত মত তত পথ' আবার 'যত্র জীব তত্র শিব'। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহাবাক্য তার আদর্শ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন এবং তিনি আরও এগিয়ে বলেন— 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

সামাজিক ন্যায় সম্পর্কে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি :

সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতাকে একই স্থানে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। সন্ন্যাস জীবনের শুরুতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্রাজন ও বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় সমাজের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জাতিগত সমস্যা, নারীদের দুর্দশা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেন। নিজস্ব মানবদরদী মন, দুর্বল ও দুঃস্থদের সেবা করার জন্য গুরু রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও পূর্ববর্তী সংস্কারকদের সংস্কারমূলক উদ্যোগ তাকে সামাজিক অন্যায়গুলি দূরীকরণের পথ খুঁজতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তবে তিনি অন্ধভাবে বিদেশি অনুকরণ না করে ভারতীয় সভ্যতার মূল সুর উপলব্ধি করে সুপ্রাচীন ভারতীয় আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন।

জাত সমস্যা :

বিবেকানন্দের মতে ভারতীয় সমাজ গঠনের প্রথম পর্বে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আর্য জাতি নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

আর্য জাতির প্রতিষ্ঠাতারা সমাজ সংগঠনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য 'ব্রাহ্মণত্ব'-এর ধারণা প্রচার করেন। যেখানে 'ব্রাহ্মণত্ব' অর্জনকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে রেখে মানুষকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চার বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছিল। বিবেকানন্দের কাছে
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চার বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছিল। বিবেকানন্দের কাছে
ব্রাহ্মণ শুধুই একটি বর্ণ অস্তিত্বের পরিচায়ক ছিল না; তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ, যে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে মানুষের পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব। এই বর্ণাশ্রম প্রথাকে তিনি যেমন সমর্থন করেছেন তেমনি এর থেকে সৃষ্ট জাত ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসাম্য ও অন্যায়কে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

তিনি জাত সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন জাত ব্যবস্থা ধ্বংস না করে এবং উঁচু জাত ও নীচু জাতের মধ্যে সংঘর্ষের পতে না গিয়ে। এই কারণেই তিনি বলেছেন ''বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদের প্রয়োজন নাই। বিবাদে কী ফল হইবে ? উহা আমাদিগকে আরও বিভক্ত করিবে, দুর্বল করিয়া ফেলিবে, আরো অবনত করিয়া ফেলিবে।''[৭] তার মতে, ''উচ্চতর বর্ণকে নিচে নামাইয়া এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্ন জাতিকে উন্নত করিতে হইবে।''[৮] তিনি নিম্ন জাতিকে উপরে ওঠার চেষ্টা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, ''জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণস্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা; তাহা যদি করিতে পার, তবে তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইবে।''[৯] মোটকথা জাত সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি প্রচারের কথা বলেছেন বিবেকানন্দ। তিনি এক্ষেত্রে এই সংস্কৃতি বিস্তারের দায়িত্ব ব্রাহ্মণদের নিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, ''এই জাত-অসাম্য দূরীকরণের প্রধান দায়িত্ব ব্রাহ্মণদের, যারা সমাজের অবশিষ্ট মানুষদের মুক্তিলাভের জন্য সচেষ্ট হবেন। ব্রাহ্মণদের উচিত তারা একচেটিয়াভাবে যে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন সেগুলি নিজ বর্ণের মানুষদের মধ্যে সীমিত না রেখে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া।''[১০]

সমাজের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল শ্রেণীকে এই প্রান্তিক মানুষের উন্নতিতে সহায়তা করার পিছনে স্বামীজী বিভিন্ন রকম যুক্তি দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক যুক্তি দিয়ে তিনি বলেছেন যে, বেদান্ত মতে জজতের সবকিছুই এক ব্রহ্মের অংশ। তাঁর মতে এই আত্মিক ঐএকাত্মবোধ জাগ্রত হলে গুণ ও কর্মকে কেন্দ্র করে সমাজে য বৈষম্য আছে তা ধ্বংস হবে। তিনি নৈতিকতার যুক্তি দিয়ে বলেছেন নিম্ন শ্রেণীর মানুষের পরিশ্রমের ফলে উচ্চশ্রেণী যাবতীয় সুখ ভোগ করে। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর উচিত তাদেরকে শিক্ষিত করা ও অধিকার অর্জনে সহায়তা করা। এই জন্যই তিনি 'বর্তমান ভারত'-এ উল্লেখ করেছেন, ''সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন। সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়া ব্যাষ্টির অস্তিত্ব অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য— জগতের মূল ভিত্তি।'' তাছাড়া তিনি বাস্তব রাজনৈতিক যুক্তি দিয়ে বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে যদি সমাজের একটি বড় অংশকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয় তাহলে তারা থাদের অধিকার ফিরে পেতে আগ্রাসী পদক্ষেপ নিতেও পিছপা হবে না।

বিবেকানন্দ নিম্ন বর্ণের মানুষদের সামাজিক দুবস্থার জন্য আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃত

শিক্ষা অর্জনের প্রতি বিমুখতাকে দায়ী করেছেন। তার মতে, যে জাতি সংস্কৃত শিক্ষায় পাণ্ডিত্য লাভ করবে, সেই জাতি অপর সকলের উপরে উঠবে এবং পূর্বের মতোই প্রভূত্ব করবে। তাই তিনি নিম্ন জাতির উদ্দেশ্যে বলেছেন, ''তোমাদের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা, আর উচ্চতর জাতির বিরুদ্ধে এই যে লেখালেখি ও দ্বন্দ্ব-বিবাদ চলিতেছে উহা বৃতা; উহাতে কোনওরূপ কল্যাণ হয় নাই, হইবেও না; উহাতে অশান্তির অনল আরও জ্বলিয়া উঠিবে, আর দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব হইতেই নানা ভাগে বিভক্ত এই জাতি ক্রমশ আরও বিভক্ত হইয়া পড়িবে।''[১১] মনে হয় তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে ধর্মশিক্ষা লাভ করার মধ্য দিয়ে 'ব্রাহ্মণত্ব 'অর্জনের কথা বলেছেন। জাত বৈষম্য দূরীকরণে এভাবেই তিনি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন।

নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন :

যে কোন জাতির প্রগতি নারীদের প্রতি সেই জাতির মনোভাবের উপর নির্ভর করে। সুদীর্ঘকাল থেকেই পুরুষতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজের সকল বর্ণ, শ্রেণী ও স্তর জুড়েই নারীরা বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অত্যাচার, বঞ্চনা ও অধিকারহীনতার মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করে চলেছে। অথচ হিন্দু ধর্মে নারী দেবীরূপে পূজিতা হন। নারীদের এই সামাজিক দুরবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী সাবেকি অনুশাসন, নারী শিক্ষার প্রসার না হওয়া, অসচেতনতা প্রভৃতি। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা পেলেও ক্রমে সামাজিক বিধিনিষেধের ফলে নারী ও পুরুষ বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারবাদীরা রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রশাসনের সহায়তায় বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, সতীদাহ প্রথা রদ; বিধবা বিবাহ প্রচলন, অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন, নারী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে ঊনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন অ। আইন পাস করে খুব অল্প সময়ে এগুলি কার্যকরী করার চেষ্টা করাই বৃহত্তর সমাজের (দরিদ্র ও গ্রামীণ সমাজ) উপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। স্বামী বিবেকানন্দ দীর্ঘ পরিব্রাজক জীবনে ভারতীয় সমাজে নারীর করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। অন্যদিকে আমেরিকার মেয়েদের ক্ষমতায়ন লক্ষ্য করে ভারতীয় নারীর দুর্দশা মোচন ও উন্নতির বিষয়ে উদ্যোগী হন। এ বিষয়ে তিনি তার গুরুভ্রাতাদের চিঠি লিখেছেন বেশ কিছু। তিনি ভারতের নারীর মর্যাদা ও উন্নতিকে সমাজের সার্বিক উন্নতির আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করেন।

নারীর অধিকার হীনতা ও মর্যাদাহীনতার কারণ হিসেবে হিন্দু সমাজের বিবাহ জনিত সমস্যার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে ১৮৯৫ সালে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন— ''বাল্যবিবাহ আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। এজন্য ভয়ানক ভুগেছি, আর এই মহাপাপে আমাদের জাতকে ভুগতে হচ্ছে। ... বাল্যবিবাহরূপ এই আসুরিক প্রথার উপর আমাকে যথাশক্তি দৃঢ়ভাবে পদাঘাত করতে হবে।''[১২] তিনি মনে করেন বাল্যবিবাহ ও অকাল মাতৃত্ব লাভ স্ত্রী ও শিশু সন্তানের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। অন্যদিকে তিনি সমকালীন বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত সংস্কারের প্রগতি ও নারী কল্যাণ প্রসঙ্গে বিরক্ত ছিলেন। তিনি মনে করেন যে, আইন করে বিধবা বিবাহ প্রচলন করলে তা সফল হবে

না। বরং বিধবাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে হবে। তিনি মনে করেন, ‘‘শিক্ষিত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল বিধবা মহিলারা নিজেরাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ভারতীয় নারী সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবেন।’’[১৩]

বিবেকানন্দ মনে করেন উনিশ শতক থেকে নারী মুক্তি ও ক্ষমতায়নের যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা সফল না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো এই উদ্যোগগুলি ভারতীয় সমাজের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের পরিবর্তে পাশ্চাত্য অনুকরণে পরিচালিত। তিনি মনে করেন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সমাজের মূলগত পার্থক্য বিরাট। তাই পাশ্চাত্যকে অনুকরণ না করে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। তার মতে উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন নারীর স্বাধীনতা। তিনি নারী সমস্যা সমাধানের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন শিক্ষা বিস্তারের উপর। তিনি বলেছেন, ‘‘নারী দিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।’’[১৪] এই শিক্ষা বলতে প্রচলিত শিক্ষার কথা তিনি বলেননি। তিনি এমন শিক্ষার কথা বলেছেন যাতে চরিত্র তৈরি হয়, মনের বিকাশ ঘটে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং তাদের মধ্যে বীরত্বের ভাবটা প্রকাশ পায়। আর এ কারণে তিনি সীতা, সাবিত্রী, সংঘমিত্রা, লীলা, মীরাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ, রানী পদদিনী এমনকি আধুনিক যুগের শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনকে ভারতীয় নারীর সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা :

শ্রমজীবী মানুষের অসহায়তা ও দারিদ্র্য বিবেকানন্দকে ব্যথিত করে তুলেছিল। ভারতের শ্রমজীবী মানুষকে তিনি হিন্দু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার শূদ্রদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইতিহাস জ্ঞান ও সারা ভারত পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ভারতীয় শ্রমজীবীদের আর্থসামাজিক দুরবস্থা উপলব্ধি করেন। তবে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমজীবীদের সঙ্গে ভারতীয় শ্রমজীবীদের চিন্তা-চেতনা ও প্রেক্ষিতের পার্থক্যের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ভারতীয় শ্রমজীবীদের দুর্দশার জন্য সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী ধনিশ্রেণী ও বিদেশী শাসকদের যেমন দায়ী করেছেন তেমনি প্রচলিত ধর্মকেও ছাড়েননি। তার মতে দীর্ঘদিন ধরে শোষিত হওয়ার ফলে শুধু শ্রমজীবী মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাই নয়, এজন্য সমগ্র দেশও দুর্বল হয়েছে। শুধু ভারতেই নয়, সর্বদেশে সর্বকালে শ্রমজীবী মানুষ তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয় বলে তিনি মনে করেন। তবে চীন, জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশের সমকালীন সমাজ প্রত্যক্ষ করে তার মনে হয়েছিল। পৃথিবী জুড়ে শূদ্র জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। তিনি এই শূদ্র শাসনের অনিবার্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন ‘‘তোমরা আমার কঅছ থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে যাও শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এর পরে চিনে। ভারতে অভ্যুত্থান ঘটবে তার পরেই . . .।’’[১৫]

বিবেকানন্দ ভারত ইতিহাসের চক্রাকার যুগ বিভাজনের বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত শ্রেণি, ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা শ্রেণী ও বৈশ্য বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর চক্রাকার

শাসনের শেষে শূদ্র বা শ্রমিক শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। তবে আসন্ন শূদ্র শাসনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন শূদ্র শাসনের যুগে সভ্যতার অধঃপতন ঘটবে। অর্থাৎ সব কিছুর মান নেমে যাবে। এই কারণে তিনি শূদ্র সংস্কৃতির উন্নতি ঘটানোর কথা বলেছেন। তিনি শূদ্রদের উচ্চতর শিক্ষা সংস্কৃতি দিতে বলেছেন উচ্চতর শ্রেণীকে, যাতে শূদ্র শাসনের আধিপত্যের যুগেও জ্ঞান-গরিমা উন্নতি লাভ করতে পারে। আসলে তিনি একসাথে দুটি বিপ্লব কামনা করেছেন। একটি হলো — বিশেষ সুবিধার অবসানে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। আর অপরটি হলো সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক বিপ্লব। এই দিক থেকে স্বামীজীর সমাজ বিপ্লবের পরিকল্পনা মার্কস প্রভৃতি সমাজ বিপ্লবীদের পরিকল্পনা থেকে ব্যাপকতর বলে অধ্যাপিকা সান্তনা দাশগুপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দ শ্রমজীবী মানুষের উন্নতির ভিত্তি হিসেবে ধর্মকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে লিখেছেন— ''এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম, আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!'' তিনিই আবার বলেছেন ''কুবেরের ঐশ্বর্য যদি কেউ ভারতের হাতে তুলে দেয়, তবুও ধর্ম পথ ত্যাগ করিলে ভারতের মৃত্যু অনিবার্য।'' তাই তিনি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শ্রমজীবী মানুষের উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা বললেও মূলত শিক্ষা বিশেষ করে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের কথা বলেছেন। এই মূলত শিক্ষা বিশেষ করে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের কথা বলেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বেদ, উপনিষদ, পুরাণের মত ধর্মগ্রন্থগুলিকে মঠ-মন্দিরের সংকীর্ণ চৌহদ্দি থেকে মুক্ত করে আপামর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন।

উপসংহার :

বিবেকানন্দ ভারতীয় জনজীবনের মূল সুর-ধর্ম, তা উপলবন্ধি করে সামাজিক কুপ্রথা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কিন্তু তার এই ধর্মের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের কারণে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ও সমালোচকরা তার সমালোচনা করেছেন। আসলে মার্কসবাদীদের মতে উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিতরণ প্রণালী কর্তৃক প্রত্যেক যুগের রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন ও কলা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। তাদের ব্যাখ্যায় ধর্মের কোনো গুরুত্ব নেই। বরং ''ধর্ম একটি মধ্যযুগীয় কুসংস্কারমাত্র, যা অত্যাচার ও শোষণের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।''[১৬] বিবেকানন্দ যেহেতু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রচারের যুগেও ভারতে ধর্মকেই সমাজ সভ্যতার উন্নতির মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তাই মার্কসবাদীরা তাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে অভিহিত করেন। অধ্যাপক বিনয় কুমার সকরার বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের পিছনে সহানুভূতি ছাড়া কোন যুক্তি কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা ইতিহাসের সমর্থন দেখতে পাননি। এই কারণেই বিবেকনন্দকে তিনি 'খ্রীষ্টিয়ান সোশালিস্ট' এর গোত্রভুক্ত করে 'রোমাণ্টিক সোশালিস্ট' আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

মার্কসীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় সমাজশাস্ত্রবিদ ও বিবেকানন্দের অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'বিবেকানন্দ দ্য সোশালিস্ট' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ : দা প্যাট্রিয়ট - প্রোফেট' গ্রন্থদ্বয়ে বিবেকানন্দকে 'ক্রিস্টিয়ান সোশালিস্ট' বলতে রাজি হননি। তার মতে বিবেকানন্দ ধর্মের দিক থেকে যাই হোন না কেন সমাজ ক্ষেত্রে তিনি একজন প্রকৃত বিপ্লবপন্থী সমাজতান্ত্রিক এবং তিনি প্রগতিশীল, কোনও মতেই প্রতিক্রিয়াশীল নন।

মার্কসবাদীদের মতে বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে তিনি এই আদর্শে প্রভাবিত ও সম্পৃক্ত হয়েছেন। আসলে মার্কসবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যায় অর্থনীতির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় অন্য বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে। ফলে ইতিহাসের সত্যতা অনেকাংশে বিঘ্ন হয়। অর্থনৈতিক উপাদান ছাড়াও দেব-দেবী, শিল্প-সৃষ্টি, ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন মৌলিক উপাদানও সমাজে সক্রিয় থাকে। তাই কোনও একটি উপাদানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ যেমন যুক্তিযুক্ত নয় তেমনি কম গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। তাই বিবেকানন্দ ধর্ম ও আধ্যাত্মিক দর্শন নির্ভর যে সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলেছেন তা মার্কসীয় ইতিহাস দর্শনে বিশ্বাসী পণ্ডিতরা মেনে নিতে পারেননি। বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য ছিল বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ স্থাপন করা এবং তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অধিকার প্রদান করে এক ঐক্যবদ্ধ ও মজবুত ভারত গঠন করা।

তথ্যসূত্র :

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (১ম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়,কোলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৩৭।

২। ঐ, পৃ. ৫৩। ৩।ঐ, পৃ. ৭৯।

৪। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়,'পলাশি থেকে পার্টিশন',ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান,কল. ২০১০,পৃ.১৭৬

৫। অমলেশ ত্রিপাঠী, 'ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃ. ৬৫।

৬। ঐ, পৃ. ৬১।

৭। 'ভারতে বিবেকানন্দ', উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৫৩।

৮। ঐ, পৃ. ১৫৩। ৯।ঐ, পৃ. ১৫৩।

১০। সত্যব্রত চক্রবর্তী(সম্পা.), 'ভারতবর্ষ: রাষ্ট্রভাবনা',প্রকাশন একুশে,কল. ২০০৩,পৃ. ১৬৪।

১১। 'ভারতে বিবেকানন্দ', পৃ. ১৫০। ১২।পত্রাবলী, পৃ. ৪০১-০২।

১৩। 'ভারতবর্ষ : রাষ্ট্রভাবনা', পৃ. ১৬৬।

১৪। সন্দীপন সেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা : একটি সাম্প্রতিক পর্যালোচনা' উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১২৯।

১৫। 'ভারতবর্ষ : রাষ্ট্রভাবনা', পৃ. ১৬৮।

১৬। অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, 'বিবেকানন্দের সমাজ দর্শন, 'উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৩২।

রাজবংশী পূজা-পার্বণে বাঁশ পূজা ও মদনকামের গান

দীপক বর্মণ

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের এক বৃহত্তম জনজাতি হল ক্ষত্রিয় রাজবংশী। সংস্কৃতির শিকড় মানুষের মননে বদ্ধমূল, যা পরবর্তী প্রজন্মকে সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনায় সমৃদ্ধ করে তোলে তেমনি এই ক্ষত্রিয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের জনজীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাঁদের ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, লোকাচার, লোকধর্মভাবনা, ব্রত-পার্বণ ও লৌকিক-পৌরাণিক দেবদেবীর পূজার্চনা। 'মনসামঙ্গলে'র পুরাণ কাহিনীকে মুখে মুখে গেয়ে গিদাল-গিদালীর দল রচিত করেছে 'বিষহরি' পালাগান আবার 'রামায়ণ'কে অবলম্বনে করে 'কুষাণ গান'। এরই পাশাপাশি বিভিন্ন লোকদেবতার পূজা উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছে নৃত্য-গীতি-নাট্য সম্পন্ন পূজার্চনা। যেমন 'গারাম ঠাকুর', 'মাশান ঠাকুর' এরা আসলে লৌকিক দেবতা হিসেবে শিবেরই আরাধনা। আবার বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবীকে মর্ত্য ভূমিতে টেনে এনে লৌকিক অবয়ব দেওয়া হয়েছে। যেমন— পুরাণের মদনদেব বা কামদেবকে রাজবংশী জনজাতির মানুষেরা 'বাঁশ পূজা'য় রূপ দিয়েছে।

মদনকাম দেবের পূজা উপলক্ষে যে মিথ (Myth) আমরা পাই তা 'শিবপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ', 'বিষ্ণুপুরাণ' পাওয়া সম্ভব। 'শিবপুরাণে' মদনদেব ভস্ম অংশের সঙ্গে এর যোগ, সেখানে মদনদেব তাঁর কাম বাণে (পঞ্চবাণ) ধ্যানস্থ শিবকে জর্জরিত করলে রুষ্ট শিব ধ্যানভঙ্গের অপরাধে ত্রিনয়নাগ্নি দ্বারা কামদেবকে ভস্মিভূত করে। পরিশেযে সমস্ত সৃষ্টি রক্ষার্থে ও দেবতাগণের অনুরোধে শিব মদনদেবের পুনর্জাগরণ ঘটান ও অশরীরি রূপ দান করেন। পুরাণের এই কাম জাগরণের ঘটনাই রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছে 'মদনকাম জাগরণের গান' বা 'বাঁশ পূজার গান' নামে পরিচিত। রাজবংশী সমাজে মদনকামদেব 'বাঁশ' রূপেই পূজিত হন। 'বাঁশ' এখানে কামদেবের প্রতীকী বিগ্রহ রূপ। এখানে স্মরণীয় যে সংস্কৃত মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর সঙ্গে এই মদনভস্ম অংশের পৌরাণিক যোগ রয়েছে। রাজবংশী লোকেদের কাছে মদনদেবের প্রতীকীরূপ বাঁশ এখানে পৌরুষত্বের প্রতীক। মদনদেব প্রমের দেবতা-কামনার দেবতা রূপে পূজিত হলেও বাঁশ পূজা আসলে আদিম বৃক্ষোপাসনা; যৌন প্রতীকার্চনা। অশুভ-অলৌকিক শক্তিকে প্রতিরোধ, রোগ-ব্যাধি দূরীকরণ এবং সৃষ্টিমূলক ধ্যান ধারণাই এই বাঁশপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

রাজবংশী সমাজে 'বাঁশপূজা'র পশ্চাতে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলীয় ভাবনা ক্রিয়াশীল এতদ্ অঞ্চলের একটি লৌকিক ছড়ায় পাই—

''উত্তরে বাঁস
দক্ষিণে হাঁস।
পশ্চিমে গুয়া
পুবে ধুয়া।''

অর্থাৎ কিনা— উত্তরে বাঁশ ঝাড় থাকলে একই সঙ্গে বাড়ির অন্তর মহলের আব্রু বজায় রাখবে এবং শীতকালীন উত্তরে প্রবল কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসকে ঠেকাবে। দক্ষিণে পুকুর— যেখানে হংসরা গরমের দিনে সাঁতরাবে আসবে ঠাণ্ডা হাওয়া। পশ্চিমে সুপারি (গুয়া) গাছের সারি প্রচণ্ড রৌদ্র, ঝড় আটকাবে এবং পূর্বে থাকবে ফাঁকা চাষের জমি। এটি রাজবংশীদের বাস্তু শাস্ত্রের নিদর্শন।

প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচুর পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির বাঁশ জন্মায়— বড় বাঁশ, মাকলা বাঁশ, মূলী বাঁশ আরো অনেক, যা এখানকার বসবাসকারী রাজবংশী লোকেদের আর্থ-সাংস্কৃতিক জীবনে নিত্য ব্যবহার্য। সমগ্র অঞ্চলের মানুষের জীবনচর্চার নানা পর্যায়ে বাঁশের প্রয়োজনীয়তা কতখানি ব্যাপক তা এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জনজীবনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরাই জানেন। আর সেই প্রেক্ষিতেই এ অঞ্চলে বাঁশ রাজবংশী সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মবিশ্বাস ও আচার-সংস্কারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। একটি প্রবাদে আছে—

''হাঁস যদি হতে পারে হংস।
বাঁশ তবে কেন নয় বংশ।''

এই প্রবাদটিতে বাঁশ = বংশ, তাহলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকদের বিশ্বাস বাঁশ বংশের চিহ্ন বা কূলচিহ্ন। লোকধারণায় যেভাবে বাঁশ তার বংশ বিস্তার করে চলে সেই রূপ ভাবে যেন তাঁদের লোকদেরও বংশ বৃদ্ধি হোক। যে কারণে রাজবংশী পূজা-পার্বণে ব্যাপকভাবে বাঁশেরই ব্যবহার। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে 'বেষমা পূজা'তে রাজবংশী গৃহস্থ লোকেদের ঠাকুর বাড়িতে মাকলা বাঁশের তৈরি নিশান বানিয়ে তাতে বাঁশের মাথায় লাল বা সাদা শালু কাপড়ের ত্রিকোণাকৃতি অংশ লাগিয়ে দেওয়া হয়। আবার 'বাস্তুদেবতা'র চিহ্নও বাঁশদণ্ড। রাজবংশীরা যে ক্ষত্রিয় বংশজাত তা বাড়িতে বাড়িতে এই বাঁশের ধ্বজ বা নিশানেই বোঝা যায়। তাহলে বাঁশ এখানে ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতীক বিশেষ।

মদনকাম উৎসব রাজবংশী সমাজে সুদীর্ঘকালব্যাপী কিছু বিশ্বাস-সংস্কারের পরিচয়বাহী উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ কিছু াঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশীদের কাছে মদনকামকে বাঁশের প্রতীকে পূজা করার পশ্চাদে সমাজ মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন বাঁশ, গাছ, পর্বতচূড়া, স্তম্ভ বা ওই রকমের সমুন্নত কোনো কিছুকে আদিম মানুষেরা পুরুষত্বের প্রতীক বলে ভেবেছিলেন আর সে ভাবনা ছিল বিশ্বজনীয়। ঠিক একইভাবে গুহা, গহ্বর, হ্রদ, নদী প্রভৃতির গভীরত্ব সম্পন্ন কোন কিছুকে নারীত্ব সূচক প্রতীক রূপে চিহ্নিত হয়েছে। আর রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকবিশ্বাসে বাঁশ যে পুরুষত্বের প্রতীক বিশেষ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চৈত্র মাসে 'মদনচতুর্দশী'তে রাজবংশী সমাজে 'মদনকাম পূজা' বা 'বাঁশ পূজা' শুরু হয়। এই সময় এই সম্প্রদায়ের লোকেদের কাজকর্ম বলতে তেমন কিছু থাকে না বলে এই পূজোকে কেন্দ্র করে আমোদ প্রমোদ মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। ড.

চারুচন্দ্র সান্যালের 'দ্য রাজবংশী অব নর্থ বেঙ্গল' (১৯৬৫) বইটিতে জানা যায় যে — ধান কেটে গোলায় তোলা সারা হয়ে গেলে রাজবংশী যুবকেরা মদন চতুর্দশী তিথিতে 'বাঁশজাগাও' বা বাঁশ পূজা অনুষ্ঠানের উৎযাপন করে থাকেন। সাতটি করে চঙর বা চামর বেঁধে দেওয়া হয়। এই বাঁশের ধ্বজ বা নিশানগুলি আবার বিভিন্ন দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়— মদনকাম, কামাখ্যাদেবী, গারাম ঠাকুর, কালী ঠাকুর, মাশান দেবতা, বিষহরি, তোরষা প্রভৃতি। অঞ্চলভেদে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর নামেও নিশান উৎসর্গীকৃত করা হয়। বাঁশ পূজায় এই সকল লৌকিক-পৌরাণিক দেবদেবীর আরাধনার পশ্চাতে আছে ওই সকল দেবদেবীদের আরাধনায় সন্তুষ্ট করে কৃপালাভ করা। সাম্প্রতিককালে বেশিরভাগ এলাকায় ৭/৫ টি বাঁশের জায়গায় দুইটি বাঁশের নিশান দিয়ে মদনকাম পূজা হয়ে থাকে। বাঁস দুটির একটি পুরুষ বাঁশ (মদনদেব) অন্যটি নারীর প্রতীক (রতিদেবী)। বাঁশ দুটিকে নির্দিষ্ট পূজার বেদীতে স্থাপন করে তাদের মাঝখানে বাঁশের তৈরি 'কামলিঙ্গ' স্থাপন করা হয়।

চৈত্র মাসে যে বাঁশের পূজা তা মদনকাম বন্দনার গানেই ধরা পড়ে—

''রাম রে রাম রে হরি রাম নারায়ণ।
এই বার মোরে কর দয়া ঠাকুর মদনকাম।
ত্রয়োদশীতে বাঁশত কাপড় চতুর্দশীতে হোম
পূর্ণিমাতে বাড়ী বাড়ী বেড়ায় ঠাকুর মদনকাম।।
হস্তে ধনু কোচে বাটুল নামে মদনকাম।
রাম রে রাম রে হরি রাম নারায়ণ।।''

'হস্তে ধনু কোচে বাটুল'— মদনকাম দেবের অস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত। রাজবংশী লোকেরা যে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভুত এবং যুদ্ধবিদ্যা, শিকারে পারদর্শী তা এখানেই ইঙ্গিতবাহী। কোথাও কোথাও মদনদেবতা বুড়ামদনকাম নামে পরিচিত, লোকায়ত বিশ্বাসে এই বুড়া মদনকাম আসলে শিব। এই বুড়া মদনকামকে রাজবংশীরা 'বেষমা পূজা'র দিনে গৃহস্থ বাড়ির ঠাকুর তলায় একটি বাঁশদণ্ডে স্থাপন করে পূজা করে থাকেন।

'মদনকাম পূজা' পুরুষকেন্দ্রিক লোকাচারের অন্তর্গত। এই পূজায় পুরুষেরাই অংশ নিয়ে থাকেন, তবে গৃহস্থ বাড়িতে পূজিত হলে নারীরা শুধুমাত্র সহায়তা করে মাত্র। 'মদনকাম পূজা' রাজবংশীদের কাছে কোথাও কোথাও 'বাঁশের বিয়াও' নবামে পরিচিত। কেননা দুটি বাঁশকে (মদন-রতী) যেভাবে বেদিতে স্থাপন করে পূজা করা হয়, তাতে রাজবংশীদের বিয়ের রীতি পদ্ধতির দিকটিই ধরা পড়ে। এই পূজা পদ্ধতিতে প্রথমে বাঁশঝাড় থেকে নির্দিষ্ট নিয়মে দুটি নিখুঁত মাকলা বাঁশকে কেটে আনা হয়, তারপর বাঁশদুটিকে পরিস্কার করে গঙ্গাস্নান বা নদীতে স্নান করিয়ে গৃহস্থ বাড়িতে এনে পুরুষরূপী বাঁশটিকে সাদা শালু কাপড়ে আগাগোড়া মোড়ানো হয় আর নারীরূপী বাঁশটিকে লালশালু কাপড়ে। এখানে জানা আবশ্যক যে পুরুষ বাঁশটি নারীবাঁশের থেকে একটু লম্বা হবে। কাপড় পরানোর পর পুরুষ বাঁশটির মাথায় সাদা চামর আর নারীবাঁশটিকে কালো চামর বেঁধে দেওয়া হয়। অনেকের বিশ্বাস ও চামর দুটি আসলে যৌন কেশের প্রতীক বিশেষ। এরপর ওই সজ্জিত বাঁশকেই গৃহস্থ বাড়ির উঠোনের দক্ষিণ পূর্ব কোণে নির্দিষ্ট বেদিতে ঢিবি স্থাপন করে পূজা

দেওয়া হয়। একজন 'রাজবংশী দেউসি' বা মাড়েয়ার দ্বারাই এই পূজা হয়ে থাকে। এই পূজার উপকরণ যৎসামান্য— আতব চালের গুঁড়ায় চিনি, দুধ মিশিয়ে নাড়ু কিংবা ভাং মিশ্রিত নাড়ু, ফলমূল ইত্যাদির সঙ্গে এক কলসী চাল ও ফুল, পান-সুপারি, সিঁদুর ইত্যাদি এই পূজা নৈবেদ্য। পূজার প্রথম দিনটিকে বলা হয় 'বাঁশ জাগাও' কেননা ওই দিনে পুরুষ যুবকরো বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত হয়ে দোয়ারি-গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রের তালে তাল মিলিয়ে সারারাত ধরে নাচগান করে বাঁশকে জাগিয়ে রাখে। বাঁশের গানের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রগুলি হল– ঢোল, করতাল, মুখাবাঁশী, ব্যানা, মঞ্জিরা, দোতরা ইত্যাদি। বাঁশ পূজা উপলক্ষে তিন দিন ধরে গৃহস্থ বাড়ির লোকেরা ও অংশ গ্রহণকারী যুবকেরা সাত্ত্বিক নিয়ম নিষ্ঠা পালন করেন— আহারে নিরামিষ, রাত্রি জাগরণ, নারী সঙ্গ বর্জন করে থাকেন। চতুর্দশীতে পূজা দেওয়ার পর নৃত্য-গীত-বাদ্য সহকারে নদী বা নির্দিষ্ট জলাশয়ে জল খাওয়ানো হয়। এখানে শুধুমাত্র বাঁশের মাথায় অবস্থিত চামর দুটিকেই জলে তিনবার ছোঁয়ানো হয়। এরপর গৃহস্থ বাড়িতে এনে চালন বাতিতে বরণ করে পুনরায় বেদিতে স্থাপন করা হয়। পূর্ণিমার দিনে ওই বাঁশদুটিকে নিয়ে মারেয়া ও যুবকেরা বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত হয়ে সন্ধ্যার সময় কারকোণ ঘুরে ঘুরে গৃহস্থের বাড়িতে গান গেয়ে গেয়ে মাগন তোলা হয়। পূজার সাতদিন পর ওই বাঁশ দুটিকে বেদি থেকে মানিয়ে অলংকার বস্ত্রগুলিকে খুলে নিয়ে নির্দিষ্ট জলাশয়ে বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে কামদেবের পূজা উপলক্ষে গীত গানগুলি গ্রাম্য অশিক্ষিত চাষা-ভূষা মানুষদের মুখে মুখে নির্মিত যা মৌখিক ধারার অন্তর্গত। মদনকামের পূজা উপলক্ষে বাঁশের গানকে সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়— ক. কাহিনীযুক্ত বাঁশের গান, খ. মাগন গীত, গ. বিক্ষিপ্ত যৌনকথাযুক্ত গান বা মোটা জাগগান, ঘ. বাঁশের রাস বা মিছিল গান।

ক. কাহিনীযুক্ত বাঁশের গান :

মদনকামের পূজা উপলক্ষে গৃহস্থ বাড়িতে নৃত্য গীত বাদ্য সহকারে যে গানগুলি পরিবেশিত করা হয়েথেকে তাতে সাধারণত একটি করে কাহিনী যুক্ত থাকে। ১. মদনকামের বন্দনা গীত, ২. মদনকামের সিজ্জন / জন্মগীত, ৩. বাঁশের সিজ্জন, ৪. মালাগিরিবরের পাঁচালি যুক্ত গান, ৫. জাগরণ গান, ৬. ভাং ও নাড়ু সিজ্জনের গান, ৭. কানাই ধামালী পালাযুক্ত গান এছাড়াও শিবের বিবাহ উপলক্ষে দীর্ঘ কাহিনীযুক্ত গানও গাওয়া হয়। নিম্নে কয়েকটি গান সংক্ষেপে তুলে ধরা হল—

মদনদেব বন্দনা গান :

''আজি দেব দেবো কামদেব হে,
দেব দেব কাম দেব হে, ঠাকুর মদনকাম।
ভক্তি ভরে যে জন পূজে তার পুনরায় মনস্কাম হে...।''

জন্ম গান :

''মদন কামের জনম হইল বোলো হরি হরি।।
হরির পুত্র মদন কাম রুক্মিনী তার মাও।
চৈতের শুক্লা ত্রয়োদশীতে জন্মিলে সেই ছাও।।...

বাঁশ ও কাম লিঙ্গ স্থাপন গীত :

''হরি হরি বলিয়া দুই বাঁশ মণ্ডপে গারিল।
দুই বাঁশের মাঝখানত কামলিঙ্গ বসাইল।।
ঢাক বাজে ঢোল বাজে আরও বাজে কাঁসি।।
খ্যামটা সুরেতে বাজায় দোয়ারি মুখাবাঁশী।।...''
শিবের বিবাহ বিষয়ক গান :
''নারায়ণ নারায়ণ বলি নারদ মুনি।
আসিল গিরিরাজ রাজসভা মাঝে।
গিরিরাজের হস্তে গুয়াপান দিয়া।।
জানাইল শিবের বিয়ার প্রস্তাব খানি।।
সমাদরে গ্রহণ করিল রাগা গুয়াপান।
বামন ডাকিয়া ঠিক করে দিন ক্ষণ।''...

এই সব কাহিনী যুক্ত গানের থেকেও খুবই জনপ্রিয় পালাগান 'কানাই ধামালী' গান। সজ্জিত নর্তক নর্তকীরা রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলা বিষয়ে এই গানগুলি গেয়ে রাত্রি জাগরণ করে থাকেন।

কালই ধামালী গীত :
''জ্যাট আষাঢ়ে ঘন বরিষণ উজাই নাগিল মাচ।
হাতের বাঁশী ভূমে থুইয়া কানাই মারে মাচ।।
কানাই মারে মাঝ বরিষণ রাধে গাঁতে হালি।
এচিয়া বেচিয়া মারে কানাই কই মাগুরের জালি।।
শাল শৌল মারিয়া কানাই ডাঙাত ফেলায়।
চান্দা ধুতুরা মারিয়া কানাই এ খলাই ভরায়।।
মাচ মারিতে মাচ মারিতে ছাওয়াল কানাই গেইল বা কতদূর
আঞ্চলো ঘিড়িয়া রাধে কানাইর বাঁশী করে চোর।।
কানাই : বাঁশী দে বাঁশি দে মামী ভাল মানষির বেটি।
আমারপ বাঁশী চুরি করিয়া তোমার হবে কী ?
রাধা : আমার বস্ত্র আছে ভাগিনা ধুলায় লুটিয়া।
তোমার বাঁশী নিয়া গেইছে পশ্চিমায় উড়িয়া।।
কানাই : কোন বা কালের কথা মামী কোন বা কালে কয়,
সুতার বস্ত্র থাইকতে মামী বাঁশী উড়িয়া যায় ?
রাধা: আমার বাড়ি যান হে ভাগিনা কাটারী ধরিয়া।
কত নাগে বাঁশের আগাল আনেনও কাটিয়া।।
কানাই : বাঁশী নোমায় কম হে মামী বাঁশী নোমায় কম
বাঁশীতে ভরিয়া রাখছুং চৌদ্দ রাজার ধন।
কানাই : হস্তে দিব হস্ত কারা কোমরেপ পাটার ডোর

রাজ্যে রাজ্যে ঢোলাই দিবো রাধে মামী চোর।।

রাধা : অ্যাকে তো বাঁশের বাঁশী সাতে কিনা ফোঁড়।

কেবলে ডাকিয়া বেড়ায় রাধা নামটি মোর।।

এই কানাই ধামালী গানটির পর ধরা অন্তরা রূপে লোক শিল্পীরা ভাওয়াইয়ার সুরে এমনই একটি গীত গেয়ে থাকেন—

''কালা আর না বাজান বাঁশরি রে...

কালা আর না বাজান বাঁশরি

সাঁঝের বেলা আর ঘরেতে রইতে না পারি

ও কালা আর না বাজান বাঁশরী।''

এই কানাই ধামালী পালা গানে গায়কেরা কৃষ্ণের জন্ম, রাধার জন্ম, রাধা কৃষ্ণের মাছ ধরা, বড়াই কর্তৃক মিলন, রাধার ব্যাকুলতার দিকগুলিও কাহিনী পরম্পরায় শুনা যায়। শ্রীকৃষ্ণের যমুনার ধারে বাঁশী বাজানোর শব্দ শুনে রাধার যে ব্যাকুলতা তা এমনই একটি গানে ধরা পড়ে।

কদমতলায় থাকি কানাই বাঁশীত দিলেক সান।

বুক ধড়ফড় চন্দ্রানির আউলি উটিল মন।।

বাঁশীর সুরত শ্রীরাধিকার ঘরে না রয় মন।।

কোন ছলেতে ছাওয়াল কানাইক দেখং একবার গিয়া।। (ধ্রু)

''রাধা ভরা কলশীর জল মাঝিয়াত ফেলিল ঢালিয়া।

আর ধুমার ছলত ওই চন্দ্রানি বিরাইল কান্দিয়া।।

কানাইক দেখার ছলে চন্দ্রানি জল আইনতে যায়।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম জপিয়া সেই না রাধে ধায়।''

কানাই ধামালী গানগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটিকে, 'বংশীখণ্ডে' রাধার অবস্থার কথা—

''আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।

বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।'' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

খ. মদন গীত :

বাঁশ গানের লোকেরা প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি সন্ধ্যা বেলায় দল বেঁধে নাচে গানে বাদ্যে গান গেয়ে গেয়ে মাগন তুলে বেড়ায়। এই সময় শিল্পীদের কণ্ঠে মাগন গীতি, বন্দনাগীতি শুনতে পাওয়া যায়। যেমন—

''দেব দেব কামদেব ঠাকুর মদনকাম।

ভক্তি ভরে পূজিলে তার পুরায় মনস্কাম।

ত্রয়োদশীতে বাসত কাপড় চতুর্দশীতে হোম।

পূর্ণিমাতে বাড়ি বাড়ি বেড়াই মদন কাম।

কামত সামান্য না হয় শ্রী কৃষ্ণের নন্দন।

খোড়ায় চরণ পায় অন্ধ যে পায় দু নয়ন।

এক জোড়া গুয়া দাদা এক জোড়া পান।
ষোল আনা পইসা দাদা ঠাকুর বিদায় দেন।।
মনের আশা পূর্ণ করিবে ভাণ্ডারে ভরিবে ধান।
কোলের যদুয়া বাড়ুক ভর পূর্ণিমার চান।
মনের আশা পূর্ণ করিবে দাদা ঠাকুর মদনকাম।'

দাম্পত্য জীবনে পূর্ণতার সাথে সাথে পারিবারিক-আর্থিক জীবনের স্বচ্ছলতার আশীর্বাদ কামনাই এই সব গানের মূল বিষয়। এখানে ধান ধন গাবি পুত্র সন্তানের জন্মের কামনার মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত যে মদন কাম পূজা উর্বরতা কেন্দ্রিক লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত। মাগনগীত উপলক্ষে লোকশিল্পীদের কণ্ঠে শোনা যায় সমসাময়িক ঘটে যাওয়া ঘটনা বা সমস্যা বিষয়ক বিক্ষিপ্ত কিছু গান যা 'ভাঙার গান' নামেও পরিচিত। এইসব গানে দাম্পত্য সমস্যা, অবৈধ প্রেম, রোগ সংক্রান্ত কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিষয়ক (খরা, বন্যা) গানগুলিও প্রাধান্য পায়। বাঁশগানের লোকশিল্পীরা সমস্যা কেন্দ্রিক গানগুলিকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে তুলে ধরে থাকেন বলে এরা অনেকটা 'লোকসাংবাদিকতা' (Folk Journalism)-এর ভূমিকা পালন করে।

'ভাঙার গান বিষয়ক একটি গান :
''আই আই কিবা বলে পড়ে মানষি মলে মরে।
ওই ভয়েতে চপু রাতি মোক নিন্দে না ধরে।।
একটায় পুষং হাঁসরে ভাই, তিনটায় পুষং হাঁসী।
ওই ভয়তে মারিয়া খাইলং দেড় মাশিয়া খাঁসি।।''

১৯৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের আকাশে বোমাতঙ্কের শব্দে সাধারণ মানুষের মনে যে ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই সময় লোকশিল্পীরা এই গান বেঁধেছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিষয়ক একটি গান—

''ও ন্যাল ভেলুর মাও
সলাইটা ডাঙাও ডাঙও
গচাটা নাও নাগাও
বিছনা পাতি জোবরা নাগিল
ভিজিল ছাওয়ার গাও। (ধ্রু)
কয়দিন থাকি দেওয়ার সাতাও
এলাও না ধরে খরা।।
ধান উষাইলে ছাতা ধরে
কোষটা ধুইলে দাগ,
আর মুতরা ক্যাথাত্ বাদনাই পড়ে
ওরে বাপ্‌রে বাপ্।'' (ধ্রু)

গ. বিক্ষিপ্ত যৌনচেতনামূলক গান বা মোটা জাগগান :

বাঁশপূজায় বিক্ষিপ্ত যৌনচেতনামূলক গানগুলি গৃহস্থ বাড়ি থেকে দূরে কোন নির্জন স্থানে

গাওয়া হয়, যেখানে কেবল মাত্র পূর্ণবয়স্ক যুবক পুরুষদেরই প্রবেশাধিকার। এই গানগুলি অকথ্য অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি সহযোগে গাওয়া হয়। এই সব গানগুলি প্রতীকীমূলক এবং গূঢ়তত্ত্ব বিষয়ক। এই গানগুলি গাওয়ার পিছনে উদ্দেশ্য হল জৈবিককামনা বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে পরবর্তী সময়ে সুস্থ সবল সন্তান লাভ করা। বর্তমানে ওই যৌনচেতনা মূলক গানগুলি করা হয় না, হারিয়ে গেছে। মোটা জাগের গানগুলি কয়েকটি জনপ্রিয় বাঁশ গানের দলের মুখে শোনা যেত— এরা ১. ডাকালি ডাঙার দল, ২. টিঙ ডাঙার দল, ৩. ক্যাঙ বাজানির দল প্রভৃতি। এই সব গানগুলি তুলে ধরা অনাবশ্যক।

ঘ. বাঁশের মিছিল বা বাঁশের রাস :

রাজবংশী সমাজে বাঁশ পূজাকে কেন্দ্র করে একসময় খুবই ঘটা করে মেলা বা 'বাঁশের রাস'-এর আয়োজন করা হত, বর্তমানে তা কমই চোখে পড়ে। 'বাঁশের মিছিল' উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকা থেকে মাড়োয়ারা তাদের পূজার বাঁশ দুটিকে ছোকরা-ছুকরী সহ একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে আসে। নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ গান বাঁশ মিছিল উপলক্ষে গীত হয়ে থাকে। ভাওয়াইয়া, খ্যামটা, কানাই ধামালী আরও অনেক। এই বাঁশ মিছিলের উদ্দেশ্যই বিভিন্ন এলাকার লোকেদের সমাবেশ ঘটানো ও গানের মাধ্যমে লোকমনোরঞ্জন করা।

এখানে বলে রাখা ভালো যে বাঁশের পূজা শুধু চৈত্র মাসে হয় না, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতেও হয়ে থাকে। আর যে কারণে বাঁশের মিছিল ও এই তিন মাস হয়ে থাকে। বন্দনা গীতির মাধ্যমে মদনকাম দেবকে স্মরণ করার পর দলের লোকেরা তাদের পরিচয়জ্ঞাপক গন গেয়ে থাকেন। যেমন—

''হামরা কুচবিহার বাসি ভাই
রামঠেঙ্গা গেরামত হামার বাড়ি
থানা ঘোক্সাডাঙা।
এই মাটিতে জনম হামার
হামরা কুচবিহার বাসী ভাই
কামদেবের গান গাই।...''

এর পরই গায়কেরা চৈত্র, বৈশাখ, না জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঁশের মিছিল হচ্ছে সেই মাসকে উপলক্ষ্য করে গান গেয়ে থাকে। ধরা যাক, বৈশাখ মাসে বাঁশের মিছিল হলে—

''বৈশাখ মাসে বাঁশের গান হে
আজি, বৈশাখ মাসে বাঁশের গান হে
ভর পূর্ণিমার চান্দ
হস্তে ধনু কোচে বাটুল
নামে মদনকাম হে...।'' (চটকা সুরে)

এই বাঁশ মিছিল উপলক্ষ্যে লোকিশিল্পীরা লোকমন জয় করবার জন্য হাস্য কৌতুক, রঙ্গ-তামাশা পূর্ণ; চটকা গান, কাটা গান, খ্যাপার গান, ভাওয়াইয়া গান (মইষাল বন্ধু, গাড়িয়াল বন্ধু, বিয়াই-বিয়ানের গান প্রভৃতি) কিংবা কানাই ধামালী পালার গানগুলি চটকা— দরিয়া সুরে গেয়ে

থাকেন। এই সব গানে মূল গিদাল, দোয়ারি, ছোকরা-ছুকরী, বাজনাদার সবাই অংশ নেয়।

কয়েকটা গান এখানে তুলে ধরা হল—

খ্যামটাগান :

ব্যাঙে কয় মরলুং বাপ্
হর আসিলেক ঝোঁকা ছাপা,
এবার বুঝি প্রাণ বাঁচে না। (ধ্রু)
ব্যাঙ ধরিবার গেইলুং মুই
হাথত হ্যাচেক নিয়া
জ্যাচেকের আগুন দেখিয়া ব্যাঙ
থাকে চুপ করিয়া।
বড় দেখিয়া মুই দিলুং একটা ছাপ
ছাড়াৎ করিয়া মুথিয়া দিল
ওরে বাপ রে বাপ।...''

গাড়িয়াল বন্ধুর গান :

''হলদি বাড়ির তাঁতে শাড়ি হে...
গাড়িয়াল দেখিতে ঝিকি মিঁকি
সেই শাড়ি পড়িয়া নাইওর যাইম
দয়াল বাপের বাড়ি রে, গাড়োয়াল,
দয়াল বাপের বাড়ি...।'' (ধ্রু)

নারী মনের যন্ত্রণা বিষয়ক গান :

''আজি কালা দেখিয়া মোক
কাঙও না জোড়ে,
আবো, মরিম ঐ দুখে...
মোর কপালত বুড়া ভাতার
তাঙ, ও না জুটে।... (ধ্রু)

বিয়াই-বিয়ানের গান :

''যাঙ্ বিয়ানী বেলা গেইচে
আর না করঙ দেরী
চলি ফিরি ন্যান ছাওয়াটাক
নিজের মতন করি।''...

বাঁশের মিছিল উপলক্ষে আরো অসংখ্য গানই পাওয়া যায়, যে গানগুলিতে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনেরই মুখচ্ছবি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সারা বৎসর কাজ কর্ম করার পর বাঁশ পূজার গান উপলক্ষ্যে যেমন তাদের কিছু সময়ের জন্য কর্ম বিরতি ঘটে, তেমনি ঐ গানগুলির মধ্য দিয়ে হাসি-ঠাট্টা, আনন্দে মজে ওঠা রাজবংশীদের

জীবনস্মৃতিই ভেসে ওঠে।

প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনসমাজে মদনকাম পূজা উপলক্ষে বাঁশের গান ঐতিহ্যবাহী পুরুষকেন্দ্রিক লোক উৎসব, যা এই জনজাতির সংস্কৃতির মর্মমূলে আবদ্ধ। মদনকাম পূজা রাজবংশীদের কাছে পৌরাণিক ধ্যান-ধারণার লোকায়ত ভাবনায় যেমন ধরা পড়েছে। তেমনি এই প্রাচীন প্রতীকী মূলক উৎসব পালনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে উর্বরতা কেন্দ্রিক ধর্মীয় উপাসনা। লোকায়ত মৌখিক সাহিত্যে বাঁশ পূজায় গ্রাম্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত কৃষক-চাষা লোকশিল্পীদের কণ্ঠে ভেসে ওঠে তাঁদের প্রাণোস্পন্দন। লোকমানসে যুগ যুগ ধরে বয়ে নিয়ে আসা লোক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এই লোক উৎসবটি। বাঁশ পূজাকে কেন্দ্র করে রাজবংশীদের আমোদ-প্রমোদময় জীবনের কিছু আচার-আচরণ, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন পূর্ণ জীবনের রূপচিত্র সহজেই ফুটে ওঠে। বাঁশের মিছিল উপলক্ষ্যে যে মিলন মেলা অনুষ্ঠিত এতে ধরা পড়ে গ্রামীণ জীবনের সম্প্রীতি ও সংহতির দিকটি। এই পূজা উপলক্ষ্যে এদের ধর্মীয় নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলিও সহজেই ধরা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রামীণ জীবনে মদনকামের পূজা ও বাঁশের মিছিল আর তেমনভাবে চোখে পড়ে না। লোকশিল্পীদের মুখে মুখে বাঁধা গানগুলিও অতীতের অতলে ডুবে যাচ্ছে যেগুলিকে আর সম্ভবত সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। আধুনিক মিডিয়ার যুগে গ্রামীণ সমাজ জীবনের লোক উৎসব ও পূজাপার্বণগুলি আজ ধ্বংসের মুখে। যেটুকু বা বেঁচে আছে সেগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য লোকসংস্কৃতিপ্রেমি গবেষকদের সক্রিয় প্রচেষ্টা আবশ্যক।

তথ্যসূত্র :

১. বর্মন, সত্যন (৪৮) - 'মামা ভাগিনা বাঁশের দল', রামঠেঙ্গা, ঘোক্সাডাঙ্গা, কোচবিহার।

২. বর্মন, অনাথ (৫৫), ঐ।

৩. বর্মন, গণেশ (৫৮) 'শিঙ্গিজানি বাঁশের দল', ফুলবাড়ি, ঘোক্সাডাঙ্গা, কোচবিহার।

৪. বর্মন, চন্দ্রকান্ত (৭৫)-'বাবুরখামার বাঁশের দল, হরিমন্দির, ঘোক্সাডাঙ্গা, কোচবিহার।

৫. বর্মন, যাদব (৫২) - 'ভোগমারা বাঁশের দল', নিশিগঞ্জ, কোচবিহার।

৬. বর্মন, শচীমোহন (৬২)- গ্রাম- সিটকীবাড়ি, পো: নিশিগঞ্জ, কোচবিহার।

৭। শ্রী উপাসু (সম্পা.)- 'মদনকাম ও বাঁশপূজা', আনন্দ অফসেট, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ১৪১৬।

৮। বর্মন, সুবল চন্দ্র (সম্পা.)-'কোচ রাজবংশী সংস্কৃতির রূপরেখা' (প্রথম খণ্ড), দিপালী পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ২০১২।

৯। রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর – 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ', প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫।

১০। ভট্টাচার্য, আশুতোষ- 'বাংলার লোকিসাহিত্য' (প্রথম অধ্যায়, ক্যালকাটা প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৮।

১১। দাস, সুখেন্দু (সম্পা.)- কোচবিহার জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৬।

১২। বর্মা, ধর্মনারায়ণ— 'কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপরেখা', কুচবিহার ১৮০৭ বঙ্গাব্দ।

শাস্ত্রীয়নৃত্যের ফল্গুধারায় উত্তরবঙ্গ

দৃপ্তা মূখার্জী চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের শাস্ত্রিয় নৃত্যের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের নাম ক্রমেই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চায় উত্তরবঙ্গ ক্রমবর্ধমান নাম। কথক, ভরত নাট্যম, ওড়িশি, মণিপুরী ও মোহনীআট্টম নৃত্য চর্চায় উত্তরবঙ্গ উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে চলেছে। উত্তরে হিমালয় পর্বতে পাদদেশ থেকে দক্ষিণে মালদা জেলার গাঙ্গেয় উপত্যকা অবধি এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে প্রসারিত রয়েছে উত্তরবঙ্গের ভূখণ্ড। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা জেলা নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গ লোক সংস্কৃতিতে পৃথিবীর দরবারে অনেক আগেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। বৈরাতি, ধিমাল মেচ, রাভা, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি জনজাতি ও তাদের লোক সংস্কৃতি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। তার পাশাপাশি বর্তমান সময়কালে ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য চর্চা ও তার ব্যাপক প্রসারের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। উত্তরবঙ্গের মনোরম আবহাওয়া, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, চা বাগানের গালিচা বিছানো আঁকা বাঁকা পথে নৈসর্গিক শোভা পৃথিবীর ভ্রমণপিপাসু মানুষকে আকর্ষণ করেছে বরারর। তার সাথে মানুষের ভাবের আদান প্রদানে সহায়তা হয়েছে সংস্কৃতির মেলবন্ধন পর্ব। সাধারণ মানুষের সহজ সরল জীবনযাপনের মধ্যে লৌকিক সুর ও ছন্দই ছিল উত্তরের মানুষের মূল সাংস্কৃতিক উপাদান। কালের প্রবাহে উন্নত হয়েছে সমাজব্যবস্থা, পরিবর্তন হয়েছে মানুষের জীবন ও জীবিকার। তার প্রভাব পড়েছে সংস্কৃতির আঙিনায়। মানুষ লৌকিক সুর ও ছন্দের রাস্তায় চলতে চলতে আস্বাদ পেয়েছে শাস্ত্রীয় নৃত্য চর্চার।

নৃত্যের ক্ষেত্রে এই শাস্ত্র চর্চা উত্তরবঙ্গের ভূখণ্ডকে এক আলাদা সূচকে পরিণত করার পথে অগ্রসর করেছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে প্রথম প্রজন্মের নৃত্যগুরু সম্প্রদায় অনেক কষ্ট করে উত্তরবঙ্গের নৃত্যশিল্পী মহলে শাস্ত্রীয় নৃত্য চর্চাকে জনপ্রিয় করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। সেই চেষ্টা আজও অব্যাহত রয়েছে। উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার অন্তর্গত মহকুমার সংখ্যাও অনেক। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে প্রায় সব মহকুমায় শাস্ত্রীয় নৃত্য চর্চা করেন এরকম শিল্পীর খোঁজ পাওয়া যায়। তাদের যাত্রা কিভাবে শুরু হল, চলার পাথেয় কি, আগামী দিনে তাদের কি পরিকল্পনা আছে এই তথ্য সঙ্কলিত

করতে পারলে আগামী দিনে তা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সেই লক্ষ্যেই এই উত্তরের জনপদের বিভিন্ন সময়কালীন নৃত্যগুরুদের কথোপকথন, কার্যাবলী, নৃত্যচর্চা পর্যবেক্ষ করে তথ্য সংকলিত করে রাখার প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত নৃত্যগুরু শ্রী রুনু ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন উত্তরবঙ্গ কোনো দিক থেকেই নৃত্যক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চল থেকে উৎকর্ষতার মানদণ্ডে পিছিয়ে নেই। এই অঞ্চলের শিল্পীরা অনেক প্রতিকূলতা কাটিয়ে শাস্ত্রীয় নৃত্যের জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠ করেছেন। সুযোগের অপ্রতুলতা, শেখার সীমিত সুযোগ, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সঙ্গী করে এগিয়ে যেতে হয়েছে এই অঞ্চলের শিল্পীদের। তা সত্ত্বেও শেখার অদম্য স্পৃহা ও গুরুদের অক্লান্ত পরিশ্রম উত্তরবঙ্গের আনাচে কানাচে পৌঁছে দিয়েছে শাস্ত্রীয় নৃত্য শেখার সুযোগ। শাস্ত্রীয় নৃত্যের জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে ওঠার বাসনা জাগিয়েছেন প্রথম পর্যায়ের নৃত্য গুরুগণ। তাঁদের দেখানো স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে আজকের উত্তরবঙ্গের শাস্ত্রীয় নৃত্য আকাশে।

উত্তরবঙ্গের শাস্ত্রীয় নৃত্য তারকারা উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। তাদের কর্মজীবন প্রবাব বিস্তার করেছে আজকের শিল্পীদে জীবনে। নৃত্য মনোরঞ্জনের গণ্ডি অতিক্রম করে শিক্ষা ও সাধনার বিষয়ে উন্নীত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন শাস্ত্রিয় নৃত্যের প্রতি আনুগত্য রয়েছে ঠিক তেমনই ডুয়ার্সের চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা, পার্বত্য অঞ্চলের নেপালি, লেপচা, ভুটিয়া, লামা প্রভৃতি জনজাতির মানুষ ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রিত সমানভাবে অনুগত। যেসব জনজাতি শুধু নিজেদের লোকসংস্কৃতি ছাড়া আর কোনো কিছুতেই উৎসাহ প্রকাশ করতো না একটা সময় তারাও আজ শাস্ত্রীয় নৃত্যে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির কঠিন রূপ দেখা যায় উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে। শীত এবং বর্ষা প্রধান পার্বত্য অঞ্চলে ঘন কুয়াশা, পাহাড়ি এলাকায় ধস, পানীয় জল ও খাবারের অভাব সত্ত্বেও শিক্ষাগুরুরা যেমন পৌঁছে গেছেন শিক্ষার্থীর কাছে তেমন শিক্ষার্থীরাও সব বাধা উপেক্ষা করে সমতলে নেমে এসেছে নৃত্য শিক্ষার টানে। এই অঞ্চলের দিকপাল জনপ্রিয় নৃত্যগুরু হিসেবে পরিচিত গুরু রুনু ভট্টাচার্য মহাশয় উত্তরবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় পৌঁছে গেছেন তাঁর নৃত্য শিক্ষার ডালি নিয়ে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এই সব জেলাতেই তাঁর বিচরণ এক অদ্ভুত অধ্যায় হিসেবে ধরা দেয়। তাঁর পাশাপাশি আরো অনেক গুরুর নাম পাওয়া যায় যাঁরা উত্তরের পথে পথে শাস্ত্রীয় নৃত্য নিয়ে পৌঁছে গেছেন মানুষের কাছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বর্গীয় শ্রী অলোক মহাশয়, শ্রী সত্য দত্ত, স্বর্গীয় শ্রীমতী মমতা চক্রবর্তী, স্বর্গীয় শ্রীমতি পুষ্প সাহা, শ্রী প্রেম কুমার বিশ্বকর্মা, শ্রীমতী কৃষ্ণা চ্যাটার্জী সহ আরো অনেকে। জেলাভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক এনাদের বিচরণ ভূমিতে প্রচুর শিক্ষার্থী প্রধানতঃ কথক, ভরতনাট্যম নৃত্যের তালিম পেয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ে। পরবর্তী সময়ে মনিপুরী, ওড়িশি, মোহনীআট্টাম নৃত্যের তালিম উত্তরবঙ্গে প্রচলিত হয়। উত্তরবঙ্গের কিছু প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পীরা নিজেদেরকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। এদের প্রত্যেকেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার এক একটি শাখায় উত্তরবঙ্গ তথা

ভারতবর্ষের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এছাড়াও বর্তমান সময়ে প্রায় কয়েক হাজার শাস্ত্রীয় নৃত্য চর্চা কেন্দ্র সাড়া উত্তরবঙ্গের জনপদে ছড়িয়ে রয়েছে। ভারত সরকারের অধীনস্থ প্রাপক শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। যদিও এখানে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয় তবুও এটা একটা অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত।

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল সহ তরাই-ডুয়ার্স ও গাঙ্গেয় সমতল অঞ্চলে শাস্ত্রীয় নৃত্যচর্চা বিগত সত্তর বছর ধরে তার প্রাথমিক ইতিহাস রচনা করেছে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে এই ইতিহাসের লিখিত রূপের সেই অর্থে কোনও নিদর্শন নেই। বিভিন্ন লেখক, গবেষক, সাহিত্যিক, ভ্রমনপিপাসু মানুষ উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক শোভা, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ভ্রমণমূলক কাহিনী ও তথ্য এসব নিয়ে লিপিবদ্ধ করলেও নৃত্য বিষয়ক ইতিহাস বা চর্চা কোনোটারই কোনো লিখিত রূপ নেই। যেটুকু জানা যায় সবটাই সাক্ষাৎকার নির্ভর। প্রথিতযশা গুরু ও তাদের সুযোগ্য শিষ্য শিষ্যাদের সাথে নিরন্তর কথপোকথন চালিয়ে এক লিখিত রূপ পাওয়ার প্রচেষ্টায় এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে একটা সুনির্দিষ্ট আকার প্রদান করার চেষ্টায় ও উত্তরবঙ্গের নৃত্য চর্চার আদি ও বর্তমান পর্যায় সম্বন্ধে এক সুনির্দিষ্ট রূপরেখা গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করার ইচ্ছা জারিত হয় আমার মধ্যে। দীর্ঘদিন শাস্ত্রীয় নৃত্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে উত্তরের নৃত্যশিল্পী হয়ে এই কাজটি আমার আশু কর্তব্য বলে মনে হয়েছে। শাস্ত্রীয় নৃত্যের যে ফল্গুধারা প্রাণোচ্ছল গতিতে এগিয়ে চলেছে তার সঞ্জীবনী সুধা ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র। উত্তরের জনপদের শাস্ত্রীয় নৃত্যচর্চা এক নতুন দিশারী হয়ে উঠুক বিশ্বের দরবারে।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তরবঙ্গব্যাপী বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন উৎসব এর আয়োজন করা হয়। সেখানে উত্তরবঙ্গের নানা শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উৎসব এর অতিথি হিসেবে উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য গুরুসকল উপস্থিত থাকেন। এই উৎসবগুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে সরকারী উৎসব তেমনি ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগও সংগঠিত হয় নানা উৎসব। এছাড়াও সারা বছর ব্যাপী নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও নৃত্যশীল্পিদের পরিবেশনা থাকে। মহামারী পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে এই উৎসবেও তারতম্য ঘটেছে বিস্তর। মঞ্চের পরিবর্তে শিল্পীদের সামনে উপস্থিত হয়েছে আরো এক অন্য মঞ্চ। ইলেক্টনিক মিডিয়ার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের শিল্পীরাও বিভিন্ন অনলাইন উৎসব এর মাধ্যমে নিজেদের পরিবেশনা তুলে ধরেছেন বিশ্বের দরবারে। সারা বিশ্বের সাথে উত্তরবঙ্গের শিল্পীরাও পেশাগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু সব রকম বাধা বিঘ্ন কে সঙ্গী করেই শিল্পীরা শিল্প চেতনা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা চলছে নিরন্তর।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে নৃত্য বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে মাত্র দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও ভাবনা প্রয়োজন সেদিকে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। উত্তরবঙ্গের ক্রমবর্ধমান নত্যশিল্পী ও তাদের নৃত্য বিষয়টি নিয়ে

পড়ার যে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে উত্তরবঙ্গের মাটিতেও কমপক্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশু প্রয়োজন রয়েছে, যেখানে উত্তরবঙ্গের শিল্পীরাও তাদের পছন্দের বিষয়ে চারুকলা নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। কিন্তু এবার এই আবেদন কে আরো জোরালোভাবে উপস্থিত করার এটাই হয়তো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় যখন সব নৃত্যশিল্পী তার বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার একটা সুযোগ পাবে তার বাড়ির কাছে। নৃত্য বিষয়টি বর্তমান সময়ে নিছক একটি মনোরঞ্জনের বিষয় নয়, এটি একটি বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। তাই সরকারি ও অন্যান্য উদ্যোগী সংস্থাদেরও এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে উত্তরবঙ্গের মাটিতে নৃত্য বিষয়ে একটি পূর্ণ বিভাগ শুরু করা যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণা কার্যের তত্ত্বাবধায়ক গুরু শ্রীমতি ড: পুষ্পিতা মুখার্জী মহাশয়াকে, যাঁর নিরলস অনুপ্রেরণা ও পথপ্রদর্শনে উল্লেখিত বিষয় নিয়ে চর্চা ও গবেষণার সুযোগ পেয়েছি। গুরু রুনু ভট্টাচার্য মহাশয়কে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমি আমার হার্দিক কৃতজ্ঞা জানাই শ্রী মদনমোহন মহাশয় কে যিনি আমার এই লেখাটি তাঁর সুপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ''এবং মহুয়া''তে প্রকাশিত করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, ''উত্তরবঙ্গ পরিচয়''

২. সুকুমার দাস, ''উত্তরবঙ্গের ইতিহাস''

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রাষ্ট্রদর্শন ও নয়া মানবতাবাদ

জয়দেব নায়েক

সারসংক্ষেপ :

আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মানবেন্দ্রনাথ রায় এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও চিন্তা, প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে চলার বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক কর্ম এবং বিপ্লবী সংগঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। দেশ, কাল বা যুগের সীমানায় তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁ মতো ব্যাপক কর্মক্ষেত্র খুব কম মনীষীর জীবনেই দেখা যায়। স্বাধীনতা বা মুক্তির তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে কৈশোরে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ থেকে যৌবন মার্কসবাদের মধ্য দিয়ে অবশেষে নয়া মানবতাবাদে এসে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রাষ্ট্রচিন্তা পরিণত রূপ লাভ করে। রাজনীতিকে তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করেন। কোন বাঁধাধরা সীমাবদ্ধ গন্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁরই। এই গবেষণামূলক পত্রটি মানবেন্দ্রনাথ রায় এর রাজনৈতিক দর্শন ও নয়া মানবতাবাদের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছে। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আদর্শ, ধনতন্ত্র এবং সমজাতন্ত্র ভারতীয় প্রেক্ষিতে অসঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু পাশ্চাত্যের ধারনা ভারতে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, সেহেতু ভারতের জন্য একটি বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। নয়া মানবতাবাদই হল ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিকল্প সমাধান। এই নয়া মানবতাবাদ প্রয়োজন। নয়া মানবতাবাদই হল ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিকল্প সমাধান। এই নয়া মানবতাবাদ মানুষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। একজন দেশের নাগরিক হিসাবে তার স্বাধীনতাকে ধ্বংস না করে তার সর্বপ্রকার উন্নয়ন ঘটানোই হল নয়া মানবতাবাদের উদ্দেশ্য। এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূলে রয়েছে মানুষ এবং প্রকৃতি।

ভূমিকা: ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে যে সমস্ত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ তাঁদের অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা হল মার্কসবাদ, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি, নয়া মানবতাবাদ, দলবিহীন গনতন্ত্র ইত্যাদির এক সমন্বয়। ভারতীয় জাতীয় রাজনীতির উপর মার্কসবাদী বিশ্লেষণের সংগঠিত প্রয়োগ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আগে বিশেষ চোখে পড়েনি, যদিও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ অনেকেই কম-বেশি সমাজতান্ত্রিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনিই

হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের বাধা ও নানা প্রতিকূলতা সহ্য করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারাটিকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যান। কোন ধর্মীয় বা নৈতিক ভাবনা নিয়ে নয়, ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চেতনা নিয়ে। অসাধারণ বিশ্লেষণী শক্তি দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ভারতীয় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি। ভারতের অন্যান্য বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের মতো তাঁরও রাজনৈতিক চিন্তা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল কিন্তু অন্যান্য রাজনীতিবিদদের তুলনায় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রাজনৈতিক জীবন ছিল জটিল, বিচিত্র, বর্ণময় ও ঘটনাবহুল। কোলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ফণিভূষণ চক্রবর্তী বলেছেন, ''মানবেন্দ্রনাথ রায় এমন এক ব্যক্তি যিনি শুধুমাত্র একজন রাজনীতির অক্লান্ত যোদ্ধা হিসেবেই দেশ - দেশান্তরে তাঁর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ভ্রমণ করেননি, উপরন্তু বিশ্বের যে সব প্রতিষ্ঠিত অগ্রগন্য চিন্তানায়ক তাঁদের চিন্তার দ্বারা মানব ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন, তিনি তাঁদেরই একজন এবং তিনি যে চিন্তা-ভাবনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন ভাবনার সেই সূত্র অনুযায়ীই হয়তো একদিন মানুষের সমষ্টিগত ভবিষ্যৎ জীবনের রূপান্তরিত হবে।'' মানবিক বিকাশের দিক থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সমগ্র জীবনকে মোটামুটি চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা –

১। বাল্যজীবন ও বিপ্লবী চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদ;

২। আন্তর্জাতিক জগতে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিপ্লব;

৩। ভারতে প্রত্যাবর্তন ও ভারতের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদে অংশগ্রহণ: এবং

৪। নয়া মানবতাবাদী দর্শনের উদ্ভাবন।

বাল্যজীবন ও কর্মঃ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রকৃত নাম হল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ১৮৮৭ সালের ২১শে মার্চ অবিভক্ত বাংলার ২৪ পরগণা জেলার আরবালিয়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য ছিলেন একজন সংস্কৃত পন্ডিত। ছাত্রজীবন থেকেই বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন। মাত্র ১২ বছর বয়সেই তিনি অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিদের দ্বারা পরিচালিত। বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। বিপ্লবীরা যে রাজনৈতিক ডাকাতি করতো তাতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চাংরিপোতা রেলস্টেশনে তিনি প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতির কাজে লিপ্ত হন। তিনি কয়েকবার গ্রেপ্তারও হন কিন্তু প্রমানের অভাবে ছাড়া পেয়ে যান। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য বিদেশী সাহায্য লাভের আশায় তিনি বিদেশে রওনা হন। প্রথমে তিনি জার্মানি যান। বাটাভিয়ার জার্মান প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাতের পর স্থির হয় জার্মানি জাহাজে করে অস্ত্র, গোলাবারুদ বাংলায় পাঠাবে। কিন্তু তাঁর এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। এরপর তিনি জাপান, কোরিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে ছদ্মবেশে অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। অবশেষে ১৯১৬ সালে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে এসে উপস্থি হন। সেখানকার বিখ্যাত

র‍্যাডিকাল নেতা ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তিনি আশ্রয় নেন। ধনগোপালই নরেন্দ্রনাথের নতুন নামকরন করেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। এখানেই পরিচয় ঘটে এভেলিনের সঙ্গে যিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রথম পত্নীর স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

বিপ্লবী চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদ থেকে মার্কসবাদ উত্তরণ : মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চরমপন্থী ও বিপ্লবী কার্যকলাপ মার্কিন সরকার তাঁর প্রতি ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। ব্রিটিশ ও মার্কন গোয়েন্দা পুলিশের নজরদারি বাড়তে থাকায় তিনি মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে ১৯১৭ সালে সস্ত্রীক মেক্সিকোতে চলে আসেন। এখানেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপক পটপরিবর্তন ঘটে। তাঁর সঙ্গে রাশিয়ার বলশেভিক সমাজবাদী নেতা মাইকেল বোরোদিনের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই রুশ কমিউনিস্ট নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়কে হেগেরল তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বোরোদিনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই জাতীয়তাবাদী থেকে মার্কসবাদীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। মার্কসীয় চিন্তাধারা ও বৈপ্লবিক চিন্তাদর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি মেক্সিকোতে সমাজবাদী ও বৈপ্লবিক চিন্তাদর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি মেক্সিকোতে সমাজবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন এবং মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। মেক্সিকোতে তাঁর সমাজবাদী কাজকর্ম রাশিয়ার লেনিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২০ সালে কমিনটার্নের দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য লেনিন মানবেন্দ্রনাথ রায়কে আমন্ত্রণ জানালে তিনি ১৯২০ সালে মে মাসে মস্কোয় এসে পৌঁছান। দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে ভারতের মতো ঔপনিবেশিক দেশে কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে মানবেন্দ্রনাথের সাথে লেনিনের ব্যাপক বিতর্ক হয়। লেনিনের মতে, যতদিন উপনিবেশগুলির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী জনগনের মুক্তি সম্ভব নয়। উপনিবেশ থেকে অর্জিত উদ্বৃত্ত মুনাফা বন্ধ না হলে ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয়। এর জন্য উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন। কিন্তু এই পদ্ধতিকে কার্যকর করার প্রশ্নে লেনিনের সাথে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। লেনিনের মতে, উপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে সেই জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণিকেই বৈপ্লবিক শ্রেণি বলে মনে করে কমিউনিস্টরা সাহায্য করবে। লেনিনের এই তত্ত্ব মানবেন্দ্রনাথ রায় মেনে নিতে পারেননি। মানবেন্দ্রনাথের মতে, ভারতের মতো অনুন্নত ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়ারা শ্রেণি হিসাবে সামন্ততান্ত্রিক। সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও আদর্শের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন কখনোই বিপ্লবের আকার ধারন করবে না। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উপনিবেশগুলিতে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করার জন্য সেখানকার বুর্জোয়া শ্রেণিকে কিছু সুযোগসুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের হাতের পুতুলে পরিণত করতে পারে। তাই মানবেন্দ্রনাথের মতে, উপনিবেশগুলিতে বুর্জোয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও সেখানকার সর্বহারা শ্রেণিকে অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিকদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত রাখা প্রয়োজন। মতবিরোধ হলেও লেনিন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের তত্ত্বে অত্যন্ত খুশি হন এবং লেনিনের অনুরোধে দ্বিতীয় কংগ্রেসে দুটি তত্ত্বকেই গ্রহণ করা হয়। এশিয়াতে কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনার জন্য কমিনটার্ন একটি সংস্থা তৈরি

করে দেয়। মানবেন্দ্রনাথ রায় এই সংস্থার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। এই সংস্থা তাসখন্ডে 'সেন্ট্রাল এশিয়াটিক ব্যুরো' স্থাপন করলে তিনি তাসখন্ডে চলে আসেন। এই সময় ভারতে খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে অনেক মুজাহির ভারত থেকে ব্রিটিশ রাজত্ব ছেড়ে তাসখন্ডে এসে উপস্থিত হন। মানবেন্দ্রনাথ রায় এদের নিয়ে তাসখন্ডে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' স্থাপন করেন। এরপর ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক - এর তৃতীয় অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। কমিউনিস্ট আন্দোলন বিষয়ে অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। তিনি ১৯২২ সালে জার্মানির বার্লিনে উপস্থিত হন কিন্তু ১৯২৩ সালে লেনিনের মৃত্যু হলে তিনি বার্লিন থেকে বহিষ্কৃত হন। অবশেষে লুকসেমবার্গে তিনি উপস্থিত হন। এরপর ১৯২৭ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধিরূপে চিনের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য তিন চিনে এসে উপস্থিত হন। সেখানে সোভিয়েত প্রতিনিধি বোরোদিনের সাথে তাঁর মতবিরোধ হয়। মানবেন্দ্রনাথ রায় চিনে কৃষি বিপ্লবের নীতিকে সমর্থন করেন। কিন্তু বোরোদিনের অভিমত হল কমিউনিস্টরা কুয়োমিনতাং এর বামপন্থী গোষ্ঠীর সাহায্য নিয়ে পিকিং (বেজিং) অভিযান করুক। মানবেন্দ্রনাথের অভিমত গৃহীত হলেও চিন বিপ্লবে সাফল্য আসেনি। এই ব্যর্থতার ফলে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়। তিনি রাজনৈতিক দিক থেকে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়। ফলে কমিউনিস্ট জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

ভারতে প্রত্যাবর্তন ও ভারতের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদে অংশগ্রহণ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সুদীর্ঘ কমিউনিস্ট জীবনের সমাপ্তির পর নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেন এবং নতুন পথ খুঁজতে থাকেন। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে ডঃ মাসুদের ছদ্মবেশে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে নেতাজী সুভাভ চন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তিনি ভারতবর্ষে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সংঘটিত করার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ১৯৩১ সালের ২১শে জুলাই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ৬ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিনি জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটিগুলিকে প্রাণবন্ত করার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসে যোগদান করার পিছনে তিনি যুক্তি দেখান যে, কংগ্রেস হল এমন একটি সংগঠন যার প্রগতিশীল সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রগতিবিরোধী। গান্ধীজি ছিলেন প্রগতিবিরোধী নেতৃত্বের শীর্ষে। তাই মানবেন্দ্রনাথ রায় জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে কংগ্রেসের এমন এক বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি করতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ ঘটানো সম্ভ হবে। এই সময় গান্ধির নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাবার পক্ষে ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। গান্ধিপন্থীরা সুভাষচন্দ্রকে অসহযোগিতা করলেও কেবলমাত্র মানবেন্দ্রনাথ রায়ই সুভাষচন্দ্রকে পূর্ণ সমর্থন জানান এবং সুভাষচন্দ্রের পছন্দমতো কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি গঠনের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিজেই সরে দাঁড়ান। এই

ব্যর্থতার পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর অনুগামীদের নীয়ে 'দ্যা লিগ অফ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস' গঠন করেন। ১৯৪০ সালে কংগ্রেস সভাপতি পদে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু গান্ধিপন্থী আবুলকালাম আজাদের কাছে তিনি পরাজিত হন। সরাসরি গান্ধি বিরোধীতার কোন সম্ভাবনা না থাকায় ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি জাতীয় কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন। তাঁর অনুগামীদের নিয়ে 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' গঠন করেন।

নয়া মানবতাবাদী দর্শনঃ মানবেন্দ্রনাথ রায় আজীবকাল ধরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার চূড়ান্ত পরিণতি হল নয়া মতবাদ বা র‍্যাডিকাল হিউমানিজম। তিনি জীবনের শেষ পর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নয়া মানবতাবাদের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন। মানবতাবাদ শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ থেকে যার অর্থ হল এমন এক ধরণের চিন্তাধারা যা তার কার্যকলাপ এবং তার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর প্রাধান্য দেয়। মানবতাবাদ ধারনাটি মানবসভ্যতার মতোই একটি প্রাচীন ধারণা। কিন্তু প্রাচীন এই ধারণায় অনেক অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি - বিচ্যুতি ছিল। প্রাচীন সনাতনী মতবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলিকে আধুনিক চিন্তার আলোকে বিশ্লেষণ করে মানবেন্দ্রনাথ রায় নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচারিত মতবাদ বিজ্ঞানসুলভ বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার মাধ্যমে সমাজের আমূল সংস্কার সাধন করতে চায়। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, মতবাদই রাষ্ট্রের বেদীমূলে মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জন দিয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্র অথবা প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কয়েদখানায় মানুষকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নয়া মানবতাবাদী দর্শন গড়ে তোলার পিছনে কারণগুলি হল -

১। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা;

২। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের অতিপ্রয়োগ এবং অপপ্রয়োগ;

৩। সমকালীন বিশ্বের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা;

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ও অমানবিক পরিণতি; এবং

৫। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য উদ্বেগ ও আকুলতা।

নয়া মানবতাবাদের মূল নীতি ঃ মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর নয়া মানবতাবাদী সমাজবাদী গণতন্ত্রের কয়েকটি মূল নীতির কথা বলেন। এই নীতিগুলি হল -

১। নয়া মানবতাবাদ ব্যক্তি বা মানুষকেই সমাজের মূল আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত দেয়। ব্যক্তির যথার্থ বিকাশ ঘটলে তবেই সমাজের অগ্রগতি ঘটবে। আর সমাজের অগ্রগতি ঘটলে ব্যক্তিও তার সুফল ভোগ করতে পারবে। ব্যক্তির উপর সমাজের যৌথ দায়িত্বকে চাপিয়ে দিলে চলবে না। বরং তাকে দিতে হবে অংশীদারী অধিকার ও সমবায়িক স্বাধীনতা।

২। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নয়া মানবতাবাদে মূল বিষয় হল স্বাধীনতা। তাঁর মতে, স্বাধীনতা হল মানুষের জন্মগতঅধিকার। যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার স্বাধীনতা ভোগের পথের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে দূর করতে সক্ষম হবে। তিনি বলেছেন, ''বিশ্বে এ পর্যন্ত যতগুলি রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে, তার কোনোটিতেই মানুষের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়নি, একমাত্র তাঁর নয়া মানবতাবাদি তত্ত্বে সর্বপ্রথম মানুষের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়েছে।'' মানুষের

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্ত কাজেরই উদ্দেশ্য হল অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা অর্জন করা।

৩। প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক যুক্তি বোধ হল মানুষের জৈব প্রবৃত্তি। যুক্তিবাদীতার এই গুণটি মানুষ পেয়েছে জগতের সাম্য, ন্যায়বিচার ও ঐক্যের চেতনা থেকে।

৪। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, ইতিহাসের দ্বৈতবাদী অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা গড়ে ওঠার মূল কারণ হল বস্তুবাদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী অর্থনীতিই মানুষের মনকে প্রভাবিত করে। অথচ মার্কসবাদ অর্থনীতি ও মনকে দুটি পৃথক বিষয় বলে মনে করে। এইভাবে মার্কসবাদ দ্বৈতবাদকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ রায় মনে করেন বস্তুবাদ মনকে অর্থনীতিসহ সামগ্রিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম করে, কখনোই আলাদ করে না.

৫। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নয়া মানবতাবাদ বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন, নয়া মানবতাবাদ হল বিশ্বজনীন। ইহা কখনোই জাতীয় রাষ্ট্র সমূহের এলাকা দ্বারা সীমিত থাকবে না। পুঁজিবাদী, ফ্যাসিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, সাম্যবাদী বা অন্য যে কোন ধরনের রাষ্ট্রই হোক না কেন বিংশ শতাব্দীতে মানুষের নবজাগরণে এগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হবে।

৬। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নয়া মানবতাবাদে বিশ্বজনীনতা ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। মানবেন্দ্রনাথ একটি বিশ্বজনীন মানবতাবাদের স্বপক্ষে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। কিন্তু তিনি আন্তর্জাতিক তত্ত্বে বিশ্বাসী নন এই ধারণায় যে, বিভিন্ন জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির পৃথক অস্তিত্ব থাকে। তাঁর মতে, একটি প্রকৃত বিশ্ব-সরকার গঠনের পূর্বশর্তই হল রাষ্ট্রগুলির পৃথক জাতিসত্তার বিলুপ্তি।

৭। মানবেন্দ্রনাথ রায় যে সমাজ ও উন্নত গড়ে তুলতে চেয়েছেন সেখানে জাতিবিদ্বেষ ও প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদ স্থান পাবে না। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা হল সুসংগঠিত গনতন্ত্র যা সংসদীয় গণতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা সম্পূর্ণ আলাদ। এই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল স্থানীয় গনসমিতি। প্রতিটি গ্রামে গ্রামসভা থাকবে। গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গ্রামসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গ্রামসভা গঠিত হবে গ্রামের মানুষদের নির্বাচনের মাধ্যমে।গ্রামসভার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ থাকবে। গ্রামসভার সদস্যরা পঞ্চায়েতকে নির্বাচন করবে, তাদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে। পঞ্চায়েতের সর্বোচ্চ সীমায় বিরাজ করবে দেশের পার্লামেন্ট বা সর্বোচ্চ আইনসভা। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, এইভাবে এক নয়া মানবতাবাদী সমাজ গড়ে উঠবে।

৮। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, তাঁর নয়া মানবতাবাদী সমাজ এক নতুন ধরণের অর্থনৈতিক দর্শন দ্বারা পরিচালিত হবে। কারণ সমাজের সকলে মানুষের অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানই হল তাঁর এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর মতে, আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেমন ধনতান্ত্রিক হবে না তেমনি সমাজে প্রচলিত কোন সমাজতান্ত্রিক রূপও হবে না। তাঁর আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে এক ধরণের সমবায়মূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এখানে কোন রাষ্ট্রীয় মালিকানার ও পরিকল্পিত অর্থনীতির ভূমিকা থাকবে না। তাঁর পরিকল্পিত অর্থনীতির মূল কথা হল –

ক। ভারী শিল্পের পরিবর্তে কৃষি উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া;

খ। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে আধুনিক কলাকৌশলের পরিবর্তে শ্রমশক্তির ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া

গ। ব্যক্তি মালিকানাধীন ছোট ছোট জমিকে একসঙ্গে যৌথ কৃষির অধীনে নিয়ে আসা। অর্থাৎ উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগ সমস্ত কিছুকে সমবায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করা যাতে সামাজিক উদ্বৃত্তকে কেউ আত্মসাৎ করতে না পারে। সর্বজনীন সরকারী বিধিব্যবস্থাকে একেবারে নিম্নস্তর গড়ে উঠবে এবং সমবায়িক অর্থনীতি পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় গণসমিতিগুলির উপর অর্পিত হবে।

মূল্যায়ন: মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রাজনৈতিক চিন্তা ও নয়া মানবতাবাদ সম্পর্কে উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে তঁর তত্ত্ব বিভিন্ন দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাঁর তত্ত্ব কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সমালোচকদর মতে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দর্শন সমকালীন কোনো মতবাদেই আস্থা রাখতেই পারেনি। মার্কসবাদের ঘনিষ্ঠ সমর্থক হয়েও তিনি পরবর্তীকালে মার্কসবাদের সমালোচনা করেন। তিনি গান্ধিবাদেরও বিরোধীতা মেনে নিয়েও জীবনের শেষ প্রান্তে ভাববাদী ব্যক্তিস্বতান্ত্র্যবাদী দর্শনকে অনুসরণ করেছিলেন এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের বিকল্প হিসাবে সমবায়ের উপর গুরত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই তাঁর দর্শনকে কাল্পনিক ও অবাস্তব বলে সমালোচনা করা হয়। মানবেন্দ্রনাথ রায় দলহীন গনতন্ত্র ও ক্ষমতাহীন গণতন্ত্রকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সমালোচকদের মতে, রাজনৈতিক দল ছাড়া প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সাফল্যের সাথে কাজ করতে পারে না।মানবেন্দ্রনাথ রায় যে গণতন্ত্রের কথা বলেছেন তা কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে সম্ভব হলেও বৃহৎ গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ সমালোচনা করা হলেও ভারতীয় রাষ্ট্রভাবনায় তাঁর অবদান অপরিসীম। রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব কিছুটা কম হলেও চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা অপরিসীম। তাঁর দর্শনচিন্তার মানবিক ও বাস্তবসম্মত দিকসমূহ বর্তমান ভারতবর্ষের আর্থ - সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। তিনি মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে ভারতবর্ষে যে নতুন সংস্কৃতির সূচনা করেছেন তার গুরুত্বকে আমরা কখনোই অস্বীকার করতে পারি না।

তথ্যসূত্র:

১। Dr. V.P.Varma, Modern Indian Political Thought, Lakshmi Narayan Agarwal Publication, Agra, 1985.

২। Bidyut Chakraborty & Rajendra K. Pandey, Modern Indian Political Thought, Sage Publication, New Delhi.

৩। Radharaman Chakraborty, Aspects of Political Thinking in India, Society, Calcutta, 1980

৪।	N.C. Bhattacharya, Social and Political Ideas of M.N.Roy, Asiatic Society, Calcutta, 1980
৫।	V.B. Carnik, M.N. Roy: A Biography, National Book Trust, Dehlhi.
৬।	Sankar Ghose, Modern Indian Political Thought, Allied, 1984.
৭।	অনাদি কুমার মহাপাত্র, ভারতিয় দর্শন, সুহৃদ পাবলিকেসন, কলকাতা, ২০০৩।
৮।	ডঃ সুভাষ চন্দ্র সোম, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ২০০৪।
৯।	পি.জি. দাশ, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ও ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১২।
১০। রাধারমণ চক্রবর্তী (সম্পাদনা), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯।
১১। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার রূপরেখা, নবোদয় পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১০।
১২। দেবাশিস চক্রবর্তী, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলনের ধারা, নিউ সেন্টাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৬।
১৩। সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন ও জাতীয় আন্দোলন, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৭।
১৪। কল্যাণ কুমার সরকার, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, শ্রীভূমি, কলকাতা, ২০১২।
১৫। অভিষেক মিত্র (সম্পাদনা), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০

বিস্মৃত প্রায় রসায়নবিদ চুণীলাল বসুর 'জল' চর্চা

মৃদুলা আচার্য্য

রসায়নাচার্য্য শ্রী চুণীলাল বসু ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্য সভায় অধিবেশনে প্রথম এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি সভার সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও সম্মানীয় অতিথিবৃন্দদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জজ, ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা শ্রী বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রী সারদাচরণ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় শ্রী নীলমণি ন্যায়লঙ্কার প্রমুখ। আলোচনার বিষয়বস্তু শ্রোতাদের মনে এতটাই রেখাপাত করে যে, তাঁরা বক্তাকে এই আলোচনা মুদ্রিত আকারে প্রকাশের অনুরোধ করেন। তার ফল এই বই। জল বইটির মুদ্রণভার বহন করেন সাহিত্যসভা। ইংরেজ আমলে বিজ্ঞানচর্চা সীমিত ছিল গুটিকয়েক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মধ্যে। অথচ প্রাচীন ভারতে রচিত সংস্কৃত পুঁথির মধ্যে উন্নত বিজ্ঞানচর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের চর্চা যেদিন হতে বিদেশি ভাষাকে অবলম্বন করে, তখন থেকে সাধারণ মানুষের কাছে প্রাসঙ্গিকতা হারায়। বিজ্ঞানের প্রতি এই অনাদরের মারাত্মক প্রভাব পড়ে সাধারণ জনজীবনে। রোগ-জ্বালার প্রাদুর্ভাব যেমন বাড়তে থাকে, অপুষ্টি এবং অশিক্ষার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে লোকসমাজ।

রসায়নাচার্য্য শ্রী চুণীলাল বসু একদিকে যেমন চিকিৎসক ছিলেন অন্যদিকে ছিলেন বিজ্ঞান সাধক। বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অনীহা দেখা যায়, তা দূর করার কাজে ব্রতী হন। বাঙালী জাতির শারীরিক এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধন বিজ্ঞানের স্পর্শ ব্যতীত যে সম্ভবপর নয় তা তিনি উপলব্ধি করেন। বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে গেলে সর্বাগ্রে তাদের দৈনন্দিন পীড়ার উপশম করা নিতান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। তিনি লক্ষ্য করেন পাশ্চাত্য সমাজে বিজ্ঞানের কদর বেশি বলে তারা আত্মিক শিক্ষায় প্রাচ্যের তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও শারীরিক এবং মানসিক গঠনে উন্নত। রসায়নাচার্য্য তাই নিজের শিক্ষা-দীক্ষা এবং কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাঙালী জাতির উন্নতির কাজে নিযুক্ত হন।

অত্যন্ত সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে লেখক জলের গঠন-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন। সুপ্রাচীন চরক সংহিতায় উল্লেখ আছে, বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত হলেও জলের মূল গঠন এক এবং

অভিন্ন। শ্রী চূণীলাল বসু তড়িৎ বিশ্লেষণ করে দেখান হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুই মৌলিক পদার্থ দিয়ে জল তৈরি হয়। অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এর ধর্ম কি এবং জলের গঠনে এদের অনুপাত কত তা সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝিয়ে বলেন। আবার হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে জলকণা সৃষ্টি করেও দেখান। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সহজ হলে সাধারণ মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা বেশি হয়।

জল গবেষণা :

জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় জলের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। কিন্তু জল যদি বিশুদ্ধ না হয়, সেক্ষেত্রে প্রাণনাশের কারণও হতে পারে। সেকালে কলেরা, ওলাউঠা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের প্রভাবে বহু জীবনহানির উদাহরণ আছে। লেখক প্রতিটি জলবাহিত রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধের উপায় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এই পুস্তকে। জলবাহিত রোগ প্রতিরোধের অন্যতম উপায় হিসেবে পানীয় জলের উৎসগুলির বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুষ্করিণীগুলি সংস্কারের প্রণালী অত্যন্ত সহজ ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে এই আলোচনায়। কূপ খননের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ এবং ব্যবহারের সময় কি সাবধানতা অবলম্বন করলে কূপের জল দীর্ঘদিন ব্যবহারযোগ্য থাকবে সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য জলের উৎসগুলি ব্যতীত পরিবারভিত্তিক পানীয় জলের পরিশোধনকেও গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। সামান্য অর্থ খরচের বিনিময়ে কিভাবে পানীয় জলকে বিশুদ্ধ করা যেতে পারে, তার সচিত্র বর্ণনা রয়েছে।

জলবাহিত রোগ ছাড়াও অন্যান্য রোগ উপশমের ক্ষেত্রে খনিজ পদার্থ সম্বলিত বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়েছে। জল পরিশোধনের ক্ষেত্রে জলের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এই কারণে এই বইটি বর্তমান কালেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের হাতে পানীয় জল বিশুদ্ধিকরণের নানাবিধ হাতিয়ার যোগান দিয়েছে নিশ্চিতভাবে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অধিক ট্রিটমেন্ট এর ফলস্বরূপ জল তার স্বাভাবিক উপাদানগুলি হারিয়েছে। এর পরোক্ষ প্রভাবে নানাবিধ রোগ বাসা বেঁধেছে মানব শরীরে। শ্রী চূণীলাল বসু একদিকে যেমন জলের পরিশোধনকে গুরুত্ব দিয়েছেন, অন্যদিকে জলের গুণমান যাতে বজায় থাকে, সে দিকেও নজর রেখেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র এবং রসায়নবিদ্যা দুই এর ওপর দখল থাকায় এই সমতা সাধন সম্ভব হয়েছে তাঁর পক্ষে।

গ্রন্থটির মৌলিকতা ও বর্তমানকালে প্রাসঙ্গিকতা :

ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে ইউরোপ এর আদলে নবজাগরণ শুরু হয়। সমাজ সংস্কারক বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিবাদমূলক সভা ও সমিতি গঠন করেন। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ও নতুন শৈলীর বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব হয়। রাজনৈতিক চেতনা এবং আরও উদীয়মান অন্যান্য সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করেন বিদ্বৎজনেরা। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা

বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ওপরে বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

দৈনন্দিন জীবনে জলের গুরুত্ব অপরিসীম। জল জীবনদায়ী কিন্তু অপরিশোধিত জলের ব্যবহার বিভিন্ন রোগ-অসুখ এমনকি জীবনহানির কারণ। লেখক জলের গুরুত্ব এবং ব্যবহার বিধি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ধর্ম, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন রচনা করেছেন। মনুসংহিতায় বারংবার নিষেধ করা হয়েছে যাতে জল দূষিত না করা হয়। এই প্রসঙ্গ উল্লেখের একমাত্র কারণ যে সময়ে এবং যাদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত সেই সময় সাধারণ মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব ও গুরুত্ব যথেষ্ট। স্বয়ং বিদ্যাসাগরকেও সমাজ সংস্কারের জন্য ধর্মগ্রন্থের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয়েছে। লেখক সূচনাতেই তাই মনুসংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতায় জল সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

মূল বিষয় এর মধ্যে প্রবেশ কালে যে ২২টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেগুলির প্রতিটিই অত্যন্ত সহজ। খুব সাধারণ যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম পরীক্ষায় তড়িৎ প্রবাহের ব্যবহার করে জলের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন গ্যাসগুলি যে দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেন তা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পরবর্তী পরীক্ষাগুলির মাধ্যমে।

সহজলভ্য বস্তুর প্রতি অনাদরের মানসিকতা আমাদের প্রবৃত্ত করে জলের যতেচ্ছ ব্যবহারে। রসায়নাচার্য্য শ্রী চূণীলাল বসু অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন এই অমোঘ সত্য যে, এই সহজ লভ্য বস্তু কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা কতটা কঠিন। জল এর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এত সাবলীল বাংলা ভাষায় এর পূর্বে হয়নি। হয়নি বাংলায় জল নিয়ে স্বতন্ত্র কোনও গ্রন্থ রচনা। সেই দিক থেকে লেখকের চিন্তা-ভাবনা অবশ্যই কৃতিত্বের দাবী রাখে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয়ভাগে জলের ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে জলের বিভিন্ন রূপ, আকার এবং পরিবেশের ওপর তার প্রভাব গুরুত্ব পেয়েছে এই অধ্যায়টিতে। এই প্রসঙ্গে John Tyndall এর লেখা ''The Forms of Water in Cluds & Rivers, Ice & Glaciers'' বইটির উল্লেখ প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লেখা International Scientific Series এর অন্তর্গত এই গ্রন্থে জলের বিভিন্ন আকার এবং ধর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। জল বরফে পরিণত হলে তার আয়তন বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমের দেশগুলিতে প্রচণ্ড শীতে নদী, সমুদ্র ইত্যাদি জলাশয়গুলি যখন বরফের স্তরে আচ্ছাদিত জলজ প্রাণীরা সেই বরফের নীচে কিভাবে জীবন ধারণ করে, জলের এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থমালা ইউরোপ-এ পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান এবং পরিবেশ চেতনা বাড়ানোর লক্ষ্যে।

তৃতীয় ভাগে জলের ব্যবহারের দিকটি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। কূপ খনন বা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধর্মীয় কৃত্য পালনের ব্যাপারে সমাজ যতখানি নিয়মনিষ্ঠ

ছিল, স্বাস্থ্যবিধি পালনের ব্যাপারে ঠিক ততখানিই পিছিয়ে ছিল। এই প্রসঙ্গে লেখক সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন কূপের গভীরতা এবং উপযুক্ত পরিবেশ। পুষ্করিণী খননের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিধি নিষেধ উদাহরণ সহ বর্ণনা করেছেন সেগুলি বর্তমানকালেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ভূগর্ভস্থ জলের যতেচ্ছ ব্যবহার আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিপদের মুখে ফেলে দিচ্ছে। জল সংরক্ষণের প্রাকৃতিক উপায়গুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে মানবজাতিকে তার ফল ভোগ করতেই হবে।

গ্রন্থটির শেষভাগে লেখক জলবাহিত রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রতিটি রোগের কারণ নির্দেশ করে খুব সহজ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে রোগের প্রকোপ এড়ানো যাবে। রোগমুক্ত সুস্থ, সতেজ জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে রচিত এই গ্রন্থ রসায়নাচার্য্য শ্রী চূণীলাল বসুর একটি স্মরণীয় কীর্তি। এর পূর্বে বাংলা ভাষায় এই বিষয় নিয়ে এত গভীরে আলোচনা হয়নি। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা একটিও না ব্যবহার করে জলের ধর্ম, প্রকৃতি এবং ব্যবহার নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ এই গ্রন্থকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা যে সম্ভব এই গ্রন্থ তার প্রমাণ।

জীব জগতের অস্তিত্ব রক্ষায় জলের প্রয়োজনীয়তা সর্বকালীন। জলাশয় নির্মাণ এবং জল শোধনের যে পদ্ধতিগুলি লেখক উল্লেখ করেছেন তা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন এবং সাধ্য দুই বিষয়কেই মাথায় রেখে, তাই সেগুলির পুনর্বার মূল্যায়ণ প্রয়োজন। সুস্থ জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে রচিত এই পুস্তকটি সম্পাদনার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী যাঁরা করেছেন, বাঙালীর হাতে তুলে দিয়েছেন বিজ্ঞানসাহিত্য সেই মানুষগুলির সম্মাননা। ক্রান্তিকালে প্রকৃতি বিনষ্ট করার পাপ যখন করোনা হয়ে সর্বনাশা রূপ নিয়েছে, তখন চূণীলালদের আরও একবার স্মরণ করা প্রয়োজন।

সূত্র :

- লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে এই বইটির ফোকপি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার ছাত্র।

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ ঃ একটি তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা

প্রিয়ঙ্কা মাইতি (দাস)

সূচকশব্দ : সত্যাগ্রহ, সত্য, অহিংসা, প্রেম, বিশ্বশান্তি, Soul force, অনশন।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

গান্ধী মনীষার শ্রেষ্ঠ উপহার হল 'সত্যাগ্রহ'। বিভিন্ন বিশ্বপ্রতিভার সঙ্গমের পরিণাম এই 'সত্যাগ্রহ'। গান্ধীজি অনুধাবন করেন যে পৃথিবীর সব ধর্মই যুগে যুগে সত্য ও অহিংসার শিক্ষা প্রদান করে চলেছে। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, যিনি সত্যের পথে অবিচল থাকেন, তিনি অহিংস না হয়ে পারেন না। সত্যাগ্রহীর মধ্যেই সত্য এবং অহিংসার ধারণা মূর্ত হয়ে ওঠে, কেননা এ দুটি ধারণা পরস্পরের অবিচ্ছদ্য। ডঃ ডি ভার্মা 'Gandhi considered truth and non-violence to be absolutely binding'।

'সত্যাগ্রহ'- কথাটির অর্থ হল সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ। সত্যাগ্রহের ধারণাটি গান্ধীদর্শনের অমূল্য সম্পদ। 'সত্যাগ্রহ'-ধারণা 'সত্য' ও 'অহিংসা'-র মানদন্ডেই নিরূপিতা। 'সত্যাগ্রহ' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল 'সত্যের জন্য উপবাস', 'সত্যকে ধরে রাখা', 'সত্যের জন্য দৃঢ় থাকা'। গান্ধীজি নিজের জীবন ও বাণী দিয়ে এই ধারণাটিকে এক উন্নত মাত্রায় পর্যবসিত করেছিলেন। গান্ধীজির আত্মকথা অনুযায়ী ১৯০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নের পাঠকদের এক প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ সৎ + আগ্রহ (সদাগ্রহ) শব্দটি তাঁর কাছে আসে যা পরবর্তীকালে তিনি পরিমার্জিত করে 'সত্যাগ্রহ' শব্দটি সৃষ্টি করেন।

গান্ধীজির ভাষায় ''satyagraha is literally holding on to truth and it means, therefore and is known as soul force'' গান্ধীজি দেখান সত্যে স্থির থেকে সমবেতভাবে সবরকম অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ অহিংস প্রতিরোধই হল সত্যাগ্রহের মৌল ধারণা। তিনি একটি লেখায় বলেন ''Satyagraha is an inherent birth right of a person''সত্যাগ্রহ দুর্বলের হাতিয়ার নয়, সত্যাগ্রহের পথ খুব কঠিন। নির্ভীক ব্যক্তি এ পথে এগোতে পারে। কোন ভীরুতা ও সংস্কারের কোন স্থান নেই এতে। উন্নত শিরে অকুতোভয়ে সত্যের প্রতি লৌহদৃঢ় চিত্তে আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে অসত্য অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। কোন প্রলোভনে মথা নত হবে না একজন সত্যাগ্রহীর, গান্ধীজির মতে তাই ''প্রহ্লাদ হল সত্যাগ্রহী - মৃত্যুর কবলে প্রবেশ করবে, তথাপি সত্য ছড়াবে না - এ হল সত্যাগ্রহীর পণ''।

শৈশব থেকেই তাঁর সত্য ও অহিংসার বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং যা পরবর্তীকালে মহীরূহের

আকার ধারণ করে। তিনি পরিবারস্থ বৈষ্ণব ধ্যানধারণার প্রেম ও ভক্তি দ্বারা প্রভাবিত, বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলা হয় তরু হতে যে সহিষ্ণু হয় দীন হতে দীনতর হয় তাকেই বৈষ্ণব বলে। অন্যদিকে বৌদ্ধ এবং বিশেষতঃ জৈন ধর্মের অহিংসা নীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হতে থাকেন। তিনি প্রেরণালাভ করেন খ্রীষ্টধর্মের প্রেম ও মানবতার বাণী থেকে। খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে তাঁর যে তীব্র আকর্ষণ ছিল তা থেকে অনেকেই 'Anabaptized Christian' বলেছেন। সন্ত তুলসীদাসের বাণী, ভাগবদ্‌গীতা, মনুস্মৃতি তাঁর চিন্তার ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। উপনিষদের ঐতিহ্যকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন এইসব ধর্মীয় আদর্শ থেকেই তাঁর অহিংসা ও সত্যের ধারণা গভীরভাবে শক্তি সঞ্চয় করেছিল। পাশ্চাত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবও চিন্তাধারায় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর আত্মকথা থেকেই জানা যায় যে, রাসকিনের 'Unto the last' এবং টলস্টয়ের 'The Kingdom of God is within you'। এই দুটি গ্রন্থ তাঁর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা নির্মাণের দিশারী। গান্ধীজির কথায় 'The kingdom of God is within you' overwhelmed me।

যা সত্য তাই সৎ (Sat ro reality), সৎ কথাটি এসেছে অস্‌ + শতৃ থেকে। অর্থ হল যা আছে বা অস্তিত্বশীল তাই সৎ। অধ্যাপক ভার্মার মতে সৎ হল সর্বোচ্চ সত্ত্ব (Realiti ro ontological being)। অহিংসা একটি সর্ব্বাপক সাধারণ নীতি যা 'সত্য'র ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। গান্ধীজি তাঁর জীবন-চার্চা ও চর্যায সত্য ও অহিংসার নীতিকে প্রয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন ভারতের অহিংসার নীতিটিকে নিজস্ব চিন্তাধারায় বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং আন্দোলন ও সংগ্রামে যথাসাধ্য প্রয়োগ ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান মন্তব্য করেছেন - 'গান্ধীজির অহিংসা মানব প্রকৃতির উচ্চতর বিভূতির ওপর নির্ভরশীল যা অত্যাচার, অবিচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।'

বিখ্যাত গান্দী বিশেষজ্ঞ দাদা ধর্মাধিকারী 'গান্ধীজির অহিংসা' প্রবন্ধে বলেছেন নিহিত – এর ফলে বিরুদ্ধপক্ষেরও জীবন এবং আত্মমর্যাদা ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।' ধর্মাধিকারী মনে করেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বশান্তির প্রেক্ষিতে গান্ধীজির অহিংসা বড়োই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আবার অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতে " ....গান্ধীজির হাতে অহিংসা আর্ট ও বিজ্ঞান।একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতি। একইকালে জীবন-দর্শন ও রণনীতি, এমনটি ইতিহাসে আর কখনো কোথাও দেখা যায়নি"।

গান্ধীজি উপায়ের (means) এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, উদ্দেশ্য বা পরিণতির (End) এর ওপর নয়। তাই একজন সত্যাগ্রহী সবসময় উপায়ের উৎ কর্ষতার দ্বারাই চালিত হবেন তাতে পরিণতি যাই হোক না কেন।

Dr. Krishnalal Sridharanai সত্যাগ্রহের নামকরণ করেছেন 'War without Violence'।

গান্ধীজির প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বাধীন ভারতে সর্বোদয় সমাজ গড়ে তোলা। 'সর্বোদয়' হল সকলের উদয় বা উত্তরণ। আর এই আদর্শ লাভের উপায় বা পথ হল সত্যাগ্রহ। তাঁর মতে সত্যাগ্রহ হল কল্যাণ বিধায়ক অস্ত্র। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মন্তব্য করেছেন 'ধর্মকে রূপ দেওয়ার জন্যই তাঁর সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা'

গান্ধীজির মতে 'কোয়েকার' আন্দোলন থেকেও তিনি তাঁর রসদ সংগ্রহ করেন। এরপর তাঁরই উদ্যোগে টলষ্টয় প্রেম ও শান্তি এবং অহিংসার আদর্শে গড়ে ওঠে জোহনস্‌বার্গ ও 'টলস্টয় ফার্ম' । এখান থেকেই সত্যাগ্রহ-র ধারণার সৃষ্টি বলে গান্ধী বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে প্রেমের ধারণা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি ''ইয়ং ইন্ডিয়াতে'' বলেছেন - 'Love never claims, it ever gives, Love ever suffers, it never revenges'।

প্রতিপক্ষ বা শত্রুপক্ষকে জয় করতে হবে প্রেম শক্তির সাহায্যে, পেশীশক্তি বা পশুশক্তির মাধ্যমে কাউকে জয় করা গেলেও সই জয় সর্বতোভাবে সফল নয়। 'সত্যাগ্রহ' হল আত্মশক্তির জাগরণ। প্রত্যেক সত্যাগ্রহী মনে করেন সব মানুষ 'অমৃতস্য পুত্রা' প্রত্যেকের মধ্যেই অনেক সদ্‌গুন রয়েছে। স্বার্থপরতা ও অজ্ঞানতায় মানুষ সাময়িক পথভ্রষ্ট হলেও সত্যাগ্রহের আলোয় মনের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। মানুষেরঅর্ন্তনিহিত সত্তা পরিপূর্ণ বিকাশ হয়।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যেও শত্রুকে পরাভূত করা যায় ফলতঃ তাঁর মধ্যেও প্রতিপক্ষকে পরাজিত ও ধ্বস্ত করার বাসনা থাকে। সত্যাগ্রহী এরূপ জয়ের চিন্তা করে না। সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষের মানসিক উত্তরণ ঘটায়। যাতে প্রতিপক্ষ আর অন্যায় কাজ করতে না পারে। এখানেই সত্যাগ্রহের বিশেষত্ব। সত্যাগ্রহীর অন্তরে থাকবে অন্যায়কারীর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ও প্রেম। এ যুদ্ধ হল ভালোবাসা ও প্রেমবৃত্তির সমন্বয়ে এক মানবীয় সংগ্রাম পদ্ধতি। এই সংগ্রাম হল প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির মনোভাবসহ তার হৃদয়কে জয় করার লক্ষ্যে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

এই অহিংস প্রতিরোধ কোন বাহ্যিক শক্তির দ্বারা সংগঠিত নয় বরং তা আত্মিক শক্তির দৃঢ়তার দ্বারাই সংগঠিত। গান্ধীজির বিশ্লেষণে, প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করা সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য কিন্তু তা অত্যন্ত কঠিন পথ। প্রতিপক্ষের হৃদয়ে পরিবর্তন আনতে পারলে তবেই সে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব। একে তিনি Soul force বা Love force বলেছেন।

ব্যক্তিমন উন্নীত হলে সামগ্রিক সমাজ মনও উন্নীত হবে এবং ক্রমস সবরকম ভেদাভেদ দূরীভূত হবে। অবশেষে এমন অহিংসজ্ঞানেই মানুষ সাম্যবাদে উন্নীত হবে। এমন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাই সর্বোদয়ের আদর্শ। গান্ধীজি তাঁর একটি বিশ্লেষণে দেখান সত্যাগ্রহ নানা ধরণের হতে পারে। যেমন অহিংস অহসযোগ আন্দোলন, সরকারি অন্যায্য আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, শান্তিপূর্ণ ঘন আন্দোলন ইত্যাদি। অনশনও সত্যাগ্রহের একটি রূপ। সত্যাগ্রহীর চরম অস্ত্র হল অনশন।

অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিশ্লেষণে দেখান যে, একক ব্যক্তির সত্যাগ্রহ, গোষ্ঠীর দ্বারা সাধিত সত্যাগ্রহ, বড়ো জনতার দ্বারা পরিচালিত সত্যাগ্রহ এই তিন ধরণের সত্যাগ্রহের ধারার কথা গান্ধীজি বলেছেন। 'সত্যাগ্রহ' এমন একটি ধারণা যার সার্বজনীর প্রয়োগ সম্ভব, 'সত্যাগ্রহ' শুধু একটা আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্ব নয় তার প্রয়োগ ভারতের রাজনীতিতে ও স্বাধীনতা আন্দোলন এক অনন্য অধ্যায়ের সূচনা করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে গান্ধী রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মের সমন্বয়ের দ্বারা শাশ্বত ও সার্বজনীন নীতিবোধকে জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছিলেন।

সত্যাগ্রহের প্রয়োগ সম্বন্ধে গান্ধীবাদী অধ্যাপক রেজাউল করিম তাঁর প্রবন্ধে লেখেন ''সত্যাগ্রহের আদর্শ হল এক পরিপূর্ণ জীবনদর্শন তাই সত্যাগ্রহ বাস্তবতার সহিত সম্পর্কহীন Counsel of Perfection নয়। সত্যাগ্রহী নিজের পরাধীনতা শৃঙ্খল মোচনে যেমন অঙ্গীকারবদ্ধ

তেমনি প্রতিপক্ষের স্বাধীনতাকেও মর্যাদা প্রদর্শন করতে সক্ষম।

ইতিহাসের পাতায় ফিরে গেলে দেখতে পায়ও যায় সত্যাগ্রহ প্রয়োগের নানা রূপ। গান্ধীজি ১৯০৭ সালে কালা কানুনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অহিংস প্রতিরোধ সত্যাগ্রহ শুরু করেন। এরপর ১৯১৩ সালে ভারতীয় নারী ও খনি শ্রমিকরা সত্যাগ্রহে যোগদান করে কারবরণ করে। ২২২১ জন ভারতীয় নরনারী ও শিশু সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পদযাত্রা করে ট্রান্সভালে প্রবেশ করেন গান্ধীজি সহ অনেকে গ্রেপ্তার হন।

১৯১৭ সাল 'চম্পারন সত্যাগ্রহ' হয়। চম্পারণ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল গান্ধীজি যেভাবে সরকারী আদেশ উপেক্ষা করার দৃঢ়তা ও সাহস দেখিয়েছিলেন আর যে মনাসিক স্থৈর্যনিয়ে সত্যানুসন্ধানের জনসধারণের কাছে তাকে মহৎ করে তুলেছিল আর অন্যদিকে সরকারী কর্তৃপক্ষকে করে তুলেছিল বিমূঢ় ও হতবাক।

১৯১৮ সালে গুজরাটের 'খেড়া' অঞ্চলে সরকারকে কৃষকদের ভূমিকর না দেবার আবেদন খারিজ করে সরকার অনাবৃষ্টির দরুণ প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থায় তারা বাধ্য হয় এ আবেদন করতে। গান্ধীজি এই 'খেড়া সত্যাগ্রহ' পরিচালনা করেন এবং সফল হন। ১৯২৫ সালে কেরলের হিন্দু সমাজ অস্পৃশ্যতা ও বর্নবৈষম্যের বিরুদ্ধে ত্রিভানকরে (বর্তমান কেরালার ভারত অংশ) ভাইকোম সত্যাগ্রহ Vaikom Satyagraha (১৯৪২-৪৫) হয়। এই আন্দোলনটি বর্তমান কোট্টায়াম জেলার ভাইকমে শ্রী মহাদেব মন্দিরের যাতায়াতের রাস্তাগুলি যেন সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের চলাচলের জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ১৯২৫ সালে ফেব্রুয়ারী কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মার্চ মাসে গান্ধীজি ভাইকোমে পৌঁছেছিলেন ও সত্যাগ্রহীদের উদ্দীপ্ত করেছিলেন।

১৯২৮ সালের১২ ফেব্রুয়ারী 'বারদৌলি সত্যাগ্রহ' ৮০০০ কৃষক সত্যাগ্রহে অংশ নেন এবং দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে আন্দোলন চলে এবং অবশেষে নতিস্বীকার করে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। ১৯৩০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে বড় অহিংস প্রতিবাদ কর্মটি ছিল 'লবণ সত্যাগ্রহ'। এটা গুজরাটের সবরমতী আশ্রম থেকে শুরু হয়েছিল শেষ হয়েছিল ডান্ডীতে। এই ২৪১ মাইল ৭৯ জন সহকর্মী সহ গন্ধীজি পদব্রজে যান লবন আইন ভঙ্গ করেন।

তিনি দেখান ভারতে মতো বৈচিত্রময় দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে গান্ধীজি সত্যাগ্রহকে স্বার্থকভাবে প্রয়োগ করেন যেমন নোয়াখালি দাঙ্গায়। (অক্টোবর - নভেম্বর, ১৯৪৬)। গান্ধীজি নোয়াখালিতে চারমাস অবস্থান করে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সবার আগে বলি হয় ভারতীয় সমাজের পিছিয়ে পড়া স্তরটি, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন এর অন্যতম নিদর্শন। নর্মদা নদীর পাশাপাশি অঞ্চলে প্রচুর বৃহৎ আকারের বাঁধ নির্মাণ হয় ফলে প্রচুর মানুষ বসতিচ্যুত হয়। তাদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াটি খুবন ধীর গতিতে হয়। ফলে জনমানসে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আদলে। অসহযোগ, আইন অমান্য বয়কট কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে। তাঁরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য 'জল সমর্পণ' নামে একটা কর্মসূচীরও ঘোষণা করন। মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়া জেলায় ২০১৫ সালে ১১ই এপ্রিল জল সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। প্রবীন গান্ধীবাদী সমাজসেবী বাবা আমতে তাঁর আনন্দবন আশ্রম ছেড়ে এসে নর্মদা উপত্যকায় অবস্থান

শুরু করে এবং পরবর্তীকালে মেধা পাটেকর নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

পরমতসহিষ্ণু ভারতীয় মানসিকতায় এই সত্যাগ্রহের প্রয়োগ সাফল্য পেলেও সব সামাজিক পরিস্থিতিতে যে এটা প্রযোজ্য হবে তা নয়। পাশ্চাত্য মানসগঠনে সত্যাগ্রহের আবেদন খুব কম। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সত্যাগ্রহ কার্যকর হলেও কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার অবহেলিত সেখানে নৈতিক সংগ্রাম হিসাবে সত্যাগ্রহ কতটা কার্যকর যা প্রশ্নসাপেক্ষ। তেমন পরিস্থিতি না থাকলে সত্যাগ্রহের কার্যকারিতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তাঁর এই আন্দোলনে হয়তো ভ্রান্তি ছিল কিন্তু অহিংসা প্রয়োগে খামতি ছিল না।

গান্ধীজিস্বয়ং বলেছেন.....'Satyagraha ...... is a science in the making' পৃথিবীর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তথা সময়ের প্রেক্ষিতে বোঝা যাবে গান্ধীজি প্রণীত সত্যাগ্রহ কতটা প্রাসঙ্গিক। তবে সত্যাগ্রহ যে দুটি সার্বভৌম প্রত্যয়, সত্য ও অহিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিমনের পূর্ণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা , তথা সুষ্ঠ সুন্দর সমাজের জন্য এদুটি গুণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিমনের পূর্ণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, তথা সুষ্ঠ সুন্দর সমাজের জন্য এদুটি গুণ খুবই উপযোগী যা বর্তমান আনবিক যুগের মানুষের কাছেও খুবই প্রয়োজনীয়। Vincent Sheean বলেছেন, "Gandhi's supreme invention discovery or creation was Satyagraha"

সাম্প্রতিক পৃথিবী রাজনৈতিক হানাহানি, সন্ত্রাস ও হিংসায় দীর্ণ। রাজনীতি তো বটেই, দৈনন্দিন হানাহানি থেকেও সততা-নৈতিকতা বিদায় নিয়েছে। এই অবস্থার অনিবার্য পরিণতি এক ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বব্যবস্থা। এই অবস্থায় গান্ধীবাদের দিকে চোখ ফেরানো ছাড়া উপায় নেই। গান্ধীবাদি অহিংস সত্যাগ্রহ দিয়ে লড়তে হবে যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে। অনিয়ন্ত্রিত ভোগবাদের কবল থেকে বাঁচাতে হবে বিশ্ব পরিবেশকে ও মানবতাকে। ব্যক্তিগত লোভ, দুর্নীতি ও পাচারের পঙ্কিলতা থেকে টেনে তুলতে হবে সমগ্র মানবজাতিকে। ধর্মীয় হানাহানি মুক্ত করে পৃথিবীতে আনতে হবে শান্তি। একমাত্র গান্ধী ও গান্ধীবাদই পারে এই আপাত অসম্ভবগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে।

তথ্যসূত্র :

১। Gandhi, M.K. An Autobiography, The story of my experiments with truth, London, 1966

২। ঘোষ অতুল্য, অহিংসা ও গান্ধি, কোলকাতা, ১৯৮৬

৩। পশ্চিমবঙ্গ, মহাত্মা গান্ধি সংখ্যা, কোলকাতা, ১৯৯৫।

৪। ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব, Collected Works of 'Gandhi'।

৫। মুখোপাধ্যায় গৌতম, মহাত্মা গাঁধীর চিন্তাধারা-ঐতিহাসিক মুল্যায়ন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কোলকাতা, ২০১২।

৬। ভট্টাচার্য সুজিত কুমার, মহাত্মা গান্ধি, প্রগতিশীল প্রকাশক, কোলকাতা, জুলাই-২০১১।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলেশ, 'সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ-গান্ধী পরিক্রমা।

আধুনিক বাংলাকাব্য ও নাটকে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ

সঞ্জীব রজক

সারসংক্ষেপ :

আমাদের দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় ৪০% ভাগ শারীরিক বা মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অক্ষম বা প্রতিবন্ধী বলা হয়। প্রতিবন্ধকতার নানান ধরনগুলি হলো, দৃষ্টিগত, অস্থিগত, শ্রবণজনিত, মানসিক ইত্যাদি। তবে মানব সভ্যতার বিবর্তনের সাথেসাথে প্রতিবন্ধকতার ধারণাও বদলেছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগে প্রতিবন্ধকতা ছিল দেবতা বা ঈশ্বরের অভিশাপ। আধুনিক যুগে বিষয়টিকে একটি শারীরিক সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে প্রতিবন্ধী চর্চার তাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকে প্রতিবন্ধকতা বিষয়টিকে সাংস্কৃতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমরা উক্ত নিবন্ধে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ যেখানে এসেছে তা যেমন আলোচনা করবো তেমনই উক্ত প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করে সামাজিকও সাহিত্যিক নির্মাণ বোঝার চেষ্টা করবো। সে প্রসঙ্গে সমাজে ও সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে।

মূল শব্দ :

আধুনিকতা, বাংলা সাহিত্য, দৃষ্টিহীনতা।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

সাহিত্যের আধুনিকতা বিষয়টি তাত্ত্বিক ও কাব্য-সমালোচকগণ নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই আলোচনায় সব চেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে সময়ের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক। বাংলায় আধুনিক শব্দটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে সংস্কৃত অধুনা শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অধুনা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো 'এখন'। বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ তাত্ত্বিক ও সাহিত্য-সমালোচকগণ তুর্কি আক্রমণকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভাজন রেখা বলে মেনে নিয়েছেন। একইভাবে মধ্য ও আধুনিক যুগের বিভাজন রেখা বলা হয় ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কালপর্বকে। মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক বাংলা কাব্যের জয়যাত্রা শুরু হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের আগে সেভাবে বাংলা কাব্যে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বাংলা কাব্যের যে দুয়েকটি ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ পেয়েছি সে

সম্পর্কে পর্যালোচনা করবো।

সহজপাঠের আলোচনায় দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ :

উনিশ শতকের শেষভাগে শিলাইদহে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহজপাঠের খসড়া রচনা করেন। তার অনেক দিন পর বিশ শতকের তিনের দশকে সহজপাঠ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বইটিতে সহজসরল, অনাড়ম্বর ভাষায় টুকরো টুকরো গ্রামবাংলার ছবি, সাথে নন্দলাল বসুর দৃষ্টিনন্দন চিত্রকলা বইটিকে আকর্ষণীয় শিশুপাঠ্যের মর্যাদা দিয়েছে। শিশুদের ছবির সাহায্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটানো এই বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে বইটি শিশুপাঠ্যের উদ্দেশ্য পূরণ করলেও এর ছত্রে-ছত্রে লুকিয়ে আছে আমাদের গ্রামবাংলার কতশত চেনা ছবি। হয়তো শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার খেয়ালেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষ হিসেবে দৃষ্টিহীন মানুষের কথা বলেছেন। এইসব টুকরো-টুকরো জীবনের ছবি তৎকালীন সমাজে দৃষ্টিহীনদের অবস্থাকে বুঝতে কিছুটা সাহায্য করে।

'হাট' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

"অন্ধকানাই পথের পরে,
গান শুনিয়ে ভিক্ষা করে"।

সমাজের এই ছবি দেখে মনে হয় যে, জনবহুল স্থানে দৃষ্টিহীনদের গান গেয়ে ভিক্ষা করাই ছিল তৎকালীন সমাজের পরিচিত ছবি। এই পেশার সাথে জড়িয়ে আছে প্রান্তিকতা বা বিচ্ছিন্নতার ধারণা। 'অঞ্জনা নদীতীরে' শীর্ষক কবিতায় এই প্রান্তিকতার ধারণাটি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

অঞ্জনা নামক নদীর তীরে চন্দনি গাঁয়ে দৃষ্টিহীন কুঞ্জ আশ্রয় নিয়েছে।

"জীর্ণ ফাটল ধরা এক কোণে তারি
অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারি"।

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সমাজের মূল স্রোতে তার স্থান হয় নি। পরবর্তী ছত্রে বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তাই কবি লিখেছেন,

"আত্মীয় কেহ নাই নিকট কি দূর,
আছে এক লেজ কাটা ভক্ত কুকুর"।

একতারাই কুঞ্জবিহারির জীবনের সাথী। এর সাহায্যে সে গান শুনিয়ে উদরপূর্তির ব্যবস্থা করে। গঞ্জের জমিদার দয়া করে তাকে দুবেলা দুমুঠো অন্য দান করেন। তার গান শুনে কেউ-কেউ তাকে শীতবস্ত্র দান করে।

"ভঞ্জের পিসি তাই সন্তোষ পান,
কুঞ্জকে করেছেন কম্বল দান"।

সমাজের কাছাকাছি থেকেও দৃষ্টিহীনতার কারণে সে সমাজের মূল স্রোত থেকে আলাদা। গানবাজনা, ভিক্ষাবৃত্তি, দয়াদাক্ষিণ্য তার বেঁচে থাকার মূল উপাদান। বিশ শতকের তিনের দশকে দৃষ্টিহীনদের একাংশ আলোকপ্রাপ্ত হয়ে আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে

অংশ নিয়েছে। শতাব্দীসূর্য রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে অবগতও ছিলেন। 'দৃষ্টিদান' গল্পের কুমুর মধ্যে আমরা তীব্র সমাজ-সচেতনতা লক্ষ্য করেছি। তবে কুমু চরিত্রে প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করার মধ্যে সমাজ-সচেতনতা যেমন আছে তেমনই একে আমরা তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে এক ধরনের সাহিত্যিক নির্মাণও বলতে পারি। তবে সহজপাঠে অনাড়ম্বর জীবনের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কোনো সমাজভাবনার দ্বারা পরিচালিত হন নি। শিশুর মতো মন নিয়ে তিনি জীবনের ছবি এঁকেছেন।

অন্ধ বধূ :

জ্যোতীন্দ্রমোহন বাগচি (১৮৭৮-১৯৪৮) রবীন্দ্র যুগের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি বাংলার গ্রামজীবনের ছবি এঁকেছেন। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কথা তার কাব্যের আদর্শ। আমাদের আলোচ্য 'অন্ধ বধূ' কবিতাটি বাংলা আধুনিক কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রিক সাহিত্যভাবনার প্রথম নিদর্শন হলো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনি'। উক্ত উপন্যাসের রজনি দৃষ্টিহীনা। কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্যে 'অন্ধ বধূ' নতুন সংযোজন। এক দৃষ্টিহীনা গ্রাম্যবধূর জীবন-যন্ত্রণাকে কবি কাব্যের বিষয় করেছেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন লিঙ্গ-বৈষম্যের কারণে মানুষ যেমন সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয় তেমনই প্রতিবন্ধকতার কারণেও সে একইভাবে সামাজিক বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। প্রতিবন্ধকতা এবং লিঙ্গ-বৈষম্য দুটোয় সামাজিক নির্মাণ। কোনো ব্যক্তি যদি একই সাথে নারী ও প্রতিবন্ধী হয় তাহলে তাকে বেশী বৈষম্যের শিকার হতে হয়। রজনির ক্ষেত্রে আমরা একই বিষয় লক্ষ্য করেছি। উক্ত কবিতাতেও দৃষ্টিহীনা গ্রাম্যবধূর জীবন-যন্ত্রণা বড়ো হয়ে উঠেছে।

কবি আত্মকথনের ভঙ্গিটি ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টিহীনা বধূর জবানিতে তিনি তার জীবন-যন্ত্রণার কথা পরিবেশন করেছেন। রজনির মতো তার জীবনে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কোনো ভূমিকা নেই। তার জগৎ শব্দ-গন্ধ এবং স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের উপাদান দ্বারা গঠিত। কবিতার শুরুতেই তার তীব্র ইন্দ্রিয়সচেতনতার পরিচয় পাই।

"পায়ে তলায় নরম ঠেকলো কি!
আস্তে একটু চলনা ঠাকুরঝি
ওমা, এ যে ঝরাবকুল! নয়?"

এর পর বধূটি তার ঠাকুরঝিকে নানান প্রশ্ন করে। সেই প্রশ্ন করার মধ্যে দিয়ে যেমন তার সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই তার জগত যে অন্যদের চেয়ে কিছুটা আলাদা তাও বোঝা যায়। 'আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?' কিম্বা 'কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে' পঙক্তিগুলি লক্ষ করার মতো। দৃষ্টিহীনতার কারণে সে পরিবারের মধ্যে থেকেও নির্বাসিতা। 'তোমার ভাইয়ের সবই স্বতন্তর- ফিরে' আসার নাই কোন উদ্দেশ!'। বোঝা যায় যে সে স্বামীর কাছে অবজ্ঞার শিকার হয়েছে। ছত্রটি একই সাথে তার বিচ্ছিন্নতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। তার জীবনের একাকিত্ব

আরো তীব্র হয়ে ওঠে যখন সে বলে,

"টানিস কেন? কিসের তাড়াতাড়ি-
সেই ত ফিরে' যাব আবার বাড়ী,
একলা থাকা সেই ত গৃহকোণ-"।

পুকুরঘাটের পিছল পথে সে সাবধানে পা টিপে চলে। ঠাকুরঝীকে বলে, "এইখানেতে একটু ধরিস ভাই,"। কথাটির মধ্যে তার সজাগ মনোভাবটি লক্ষ করা যায়। একইসাথে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে নানান বৈষম্যের শিকার হলেও সে ভালোভাবে বাঁচতে চায়। তার জীবনপিপাসাও লক্ষ করার মতো। কিন্তু সমাজে ও পরিবারে শেষ পর্যন্ত সে বাঁচার ভরসা খুঁজে পায় না। তাই তার মনে হয়

"শেওলা-দীঘির শীতল অতল নীরে-
মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই ফিরে!"

কবিতাটি আমাদের সমাজে দৃষ্টিহীনা নারীর অবস্থান সম্পর্কে অবগত করে। নারীত্ব ও প্রতিবন্ধকতা বিষয়টির যোগসূত্রটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রাম্যবধূর জীবন-যন্ত্রণা চিত্রণে, অনুভূতির তীব্রতায় কবিতাটি তাই আধুনিক বাংলা কাব্যের নবতম সংযোজন।

রবীন্দ্রনাটকে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কাব্য সম্বন্ধে একদা লিখেছিলেন,

"আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী।।"।

এখানে শিল্পি ও স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবজীবনের সর্বস্তরে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি সাহিত্যের নানা শাখাতে যেমন অবাধে বিচরণ করেছেন তেমনই ব্যক্তিগত শ্রেণিচেতনা অতিক্রম করে মানবজীবনের বিচিত্র অবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। নিজে জমিদার পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও 'শাস্তি' গল্পে জমিদার শ্রেণির নৃশংসতাকে দেখিয়েছেন। আসলে তাঁর শিল্পসত্বা সচেতন ও অচেতনভাবে শ্রেণি, জাতি, দেশকালকে অতিক্রম করে গেছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা শাখায় বিভিন্ন সময় নানান প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। 'দৃষ্টিদান' গল্পের কুমু তার স্বামীর ভুল চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। দৃষ্টিহীনতার কারণে দাম্পত্যজীবনে সমস্যা এবং শেষ পর্যন্ত সেই সমস্যাকে অতিক্রম করে কুমু তার প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছে। 'সুভা' গল্পের জন্মগতভাবে মুখ ও বধির সুভাষিণী এবং 'শুভদৃষ্টি' গল্পের সুভা প্রতিবন্ধকতার কারণে সমাজে ও পরিবারে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কাব্য ও নাটকেও সমাজের প্রান্তিক মানুষ হিসেবে আমরা বেশ কয়েকটি প্রতিবন্ধি চরিত্রের দেখা পাই। 'সহজপাঠ'এর আলোচনায় আমরা দৃষ্টিহীনতা ও সঙ্গীতবিদ্যার প্রসঙ্গ পেয়েছি। এই নিদর্শনকে আমরা সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে পারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতাকে ধর্মীয়

দৃষ্টিকোণে দেখা হতো। তৎকালীন সমাজে গানবাজনাই ছিলো দৃষ্টিহীনদের অর্থোপার্জনের মূল অবলম্বন।

গান্ধারীর আবেদন :

মহাভারতের সভাপর্বের ঘটনা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্য রচনা করেন। মহাভারতের মূল বিষয়কে অক্ষুণ্ণ রেখে রবীন্দ্রনাথ গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন চরিত্রগুলিকে তাঁর প্রজ্ঞা ও মননশীলতা দিয়ে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। ১৮৯৭-৯৮ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত-বিরোধী সিডিশন বিল পাস করে। এই সময় থেকে ভারতীয় জনসমাজে শাসক-বিরোধী মানসিকতা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ দুর্যোধনকে নির্মাণ করেছেন শাসককুলের প্রতিনিধিরূপে। এই নাটকে আমাদের আলোচ্য দুটি চরিত্র হলো গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র। একজন জন্মগত-ভাবে দৃষ্টিহীন, আর একজন ছদ্মপ্রতিবন্ধকতাকে আশ্রয় করে জীবন অতিবাহিত করে।

ধৃতরাষ্ট্র :

পাণ্ডবরা ছলের দ্বারা দ্যূতক্রিড়ার পরাজিত হয়ে রাজ্য ও সম্মান হারিয়ে বনবাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের সাথে তার পুত্র দুর্যোধন এবং মহারানী গান্ধারীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নাটকটি নির্মিত হয়েছে। দুর্যোধন তার পিতাকে বলে এত দিনে তার রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। সুখ তার জীবনের কাম্য নয়, সে জয় চায়। তাই সে বলে, "আজ আমি সুখী নহি, আজ আমি জয়ী"। পিতা ধৃতরাষ্ট্র বলে, 'আজই ধর্ম পরাজিত' পুত্রের ছলনা ও কপটতা সম্পর্কে সে সচেতন। কিন্তু পুত্রকে নিবৃত করার ক্ষমতা তার নেই।এখানে তার পিতৃধর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে বিরোধ বেধেছে। তার গলায় তীব্র আক্ষেপের সুর শোনা যায়, "অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে চিরদিন,"। সে তার বাস্তবিক অন্ধতাকে অনুভব করে কিন্তু অতিক্রম করতে পারে না। অনেকটা 'সধোবার একাদশী' নাটকের নিমচাঁদ চরিত্রের মতো। নিমচাঁদ উনিশ শতকের আচারভ্রষ্ট যুবকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ইংরাজি সভ্যতাসংস্কৃতির অনুকরণে অতিরিক্ত মদ্যপান তার জীবনে সর্বনাশ বয়ে আনে। নিজের ভ্রষ্টাচারের জন্য সে অনুতপ্ত কিন্তু নিজেকে সংযত করতে পারে না।

স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা এখানেই তিনি চরিত্রটিকে মহাভারতের সীমানা অতিক্রম করে আমাদের কালে এনে দাঁড় করিয়েছেন।এখানে তার শারীরিক সমস্যা অপেক্ষা হৃদয়ের সমস্যা বড়ো হয়ে উঠেছে। পিতৃস্নেহ তাকে অন্ধ বানিয়ে রেখেছে।

গান্ধারী :

গান্ধারী চরিত্রটি ভারতীয় নারীসমাজের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সে পতির দৃষ্টিহীনতার কারণে সারাজীবন আলোর জগৎ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নিয়েছে। ত্যাগ ও সহমর্মিতার দৃষ্টিতে দেখলে বিষয়টি অন্য মাত্রা পায় কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে যদি বিষয়টিকে দেখা যায় তাহলে বলতে পারি তার ছদ্মপ্রতিবন্ধকতা তার স্বামী ও

পুত্রদের জীবনে নানান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। গান্ধারী তার ছদ্মপ্রতিবন্ধকতা ত্যাগ করলে তার দৃষ্টির সজাগ ব্যবহার স্বামী ও পুত্রদের সঠিক পথে পরিচালনার প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারতো। তবে এই নাটকে গান্ধারী তার স্বামীকে মানবধর্ম ও রাজধর্ম সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে। তার পরামর্ষ 'ত্যাগ করো এইবার'। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য হলো, 'আমি পিতা'। পুত্র অধর্মের পথে চলেছে ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেবে। গান্ধারী বারবার রাজধর্ম সম্পর্কে সচেতন করে বলেছে,

"দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার"।

দুরাচারী পুত্রকে শাস্তি দেওয়া তার কর্তব্য। কিন্তু স্বামীকে সঠিক পথে আনতে না পেরে সে সাধ্য মত প্রতিবাদ করেছে। একজন আদর্শবাদী স্ত্রী হিসেবে তার বিশিষ্টতা এখানেই। গান্ধারীকে নাট্যকার নির্মাণ করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের বিপরীতে। ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে পিতৃধর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে যখন বিরোধ বেধেছে তখন রাজধর্ম পরাজিত হয়েছে। কিন্তু গান্ধারী চরিত্রে মাতৃধর্ম ও মানবধর্মের মধ্যে বিরোধে ন্যায়ধর্ম বা মানবধর্ম প্রধান হয়ে উঠেছে। একে আমরা সাহিত্যিক নির্মাণ বলতে পারি। নাট্যকার এখানে পৌরাণিক ঘটনাকে তৎকালীন সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে নতুন দৃষ্টিকোণে নির্মাণ করেছেন। আবার পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর মধ্যে নারীর কণ্ঠস্বর কিভাবে অবদমিত হয় গান্ধারীর প্রতিবাদ ও পরামর্ষের ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে সেটাও দেখানো হয়েছে।

ফাল্গুনী :

ফাল্গুনী নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"ঋতুনাট্যের বৎসরে বৎসরে শীতবুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন"।

নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। এটি একটি তত্বনাটক। একই বছর তাঁর 'বলাকা' কাব্যটি প্রকাশিত হয় যেখানে যৌবনের জয়গান ঘোষিত হয়েছে। 'ফাল্গুনী' নাটকে নাট্যকার যৌবন ও বসন্ত উৎসবকে মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রাচীনের মধ্যেই তিনি চিরনতুনের সন্ধান করেছেন। আমাদের আলোচ্য চরিত্র হলো অন্ধ বাউল।

এই নাটকে মনে হয় অন্ধ ও বাউল দুটি বিপরীত সত্তা। সাধারণত অন্ধ বলতে বোঝানো হয় দৃষ্টিহীনতা। এই কথাটির মধ্যে না দেখা, বিচারবুদ্ধিহীনতা ও অজ্ঞানতার ব্যঞ্জনা লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু উক্ত নাটকে বাউলকে লোকে অন্ধ বলে বিশ্বাস করতে চায় না। নাট্যকার দেখিয়েছেন তার দৃষ্টি তথাকথিত দৃষ্টিমান অপেক্ষা প্রখর। কেউ যা দেখতে পাই না সে তাই দেখে। তাই সে যুবকদলকে পথ দেখাতে সম্মত হয় কিন্তু তারা তাকে বিশ্বাস করে না। চন্দ্রহাসকে সেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। শেষ্ পর্যন্ত তার দৃষ্টিকে সবাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়।

নাটকটি যেহেতু তত্বপ্রধান তাই এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ ধরনের

দর্শনচিন্তা গুরুত্ব পেয়েছে। সমাজবাস্তবতার প্রসঙ্গ এখানে গৌণ। তবে তাঁর দার্শনিক চিন্তার মধ্যে কোনো নেতিবাচকতা প্রাধান্য পায় নি।

বিজন ভট্টাচার্য : মরাচাঁদ

বিজন ভট্টাচার্যের জীবনের সময় কাল ১৯১৫-১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ। সাহিত্যিক চেতনার দিক থেকে তিনি ছিলেন মার্কসবাদী ধারার নাট্যকার। তিনি ছিলেন গণনাট্যসংঘের অন্যতম পথিকৃত। তার 'আগুন' নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে গণনাট্যসংঘের পথ চলা শুরু হয় ১৯৪৩ সালে। আমাদের আলোচ্য 'মরাচাঁদ' নাটকটি লেখেন ১৯৪৬ সালে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র পবন বৈরাগী জন্মগত-ভাবে দৃষ্টিহীন। সাংস্কৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তার শিল্পিজীবনের সংকট এই নাটকে রূপায়িত।

পবন বৈরাগী স্বভাবে একজন কবিয়াল। গানই তার জীবনের বেঁচে থাকার মূল প্রেরণা। স্ত্রী রাধার আগমনে তার জীবনে নতুন সংকট তৈরী হয়। সে রাধাকে নিয়ে সুখে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু দুজন মানুষের অন্নসংস্থান করার অবস্থা তার নেই। স্ত্রী রাধা সুন্দরী। এখানে তার দেহসৌন্দর্য হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার হাতিয়ার। বিষয়টি পবন কিছুতে মেনে নিতে পারে না। সে ভালোভাবে বাঁচতে চায় কিন্তু প্রচলিত সমাজকাঠামো তাকে ভালোভাবে বাঁচতে দেয় না। তার দাম্পত্যজীবনে সংকট ঘনিয়ে ওঠে। স্ত্রীকে সে মেনে নিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাধা তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কবিয়ালের গান গাওয়ার জৌলুস চলে যায়। কিন্তু গ্রামের মাথা শচিনবাবু বলে তাকে গ্রামের সভায় গান গাইতে হবে।

এই নাটকে পবনের বেঁচে থাকার মূল অবলম্বন গান। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে দৃষ্টিহীনরা ধীরে-ধীরে আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করেছে। এই নাটকে তার কোনো প্রতিফলন নেই। অবশ্য গ্রামীণ পটভূমিতে পবনের চরিত্রায়ন বাস্তবধর্মী হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দৃষ্টিহীনতা ও দাম্পত্য-সমস্যা এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দৃষ্টিহীনতার কারণে সে তার স্ত্রীকে বেশী মাত্রায় সন্দেহ করে। বাস্তবে বিষয়টি নেতিবাচক। পূর্ববর্তী অনেকগুলি রচনায় আমরা একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী' উপন্যাসে অলৌকিকতার সাহায্যে প্রতিবন্ধকতাকে লীন করে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যার কারণে ধীরার জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দৃষ্টিদান' গল্পের কুমু শেষ পর্যন্ত তার দাম্পত্য সমস্যাকে অতিক্রম করেছে নিজের শক্তিতে।

তৃতীয়ত, সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শিল্পিজীবনের সংকটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন। শিল্পিজীবনের যন্ত্রণা ও উত্তরণের সম্ভাবনা এই নাটকে গুরুত্ব পেয়েছে। পবনের শিল্পিসত্তার কাছে প্রতিবন্ধীসত্তা শেষ পর্যন্ত গৌণ হয়ে যায়। তবে দারিদ্র ও দৃষ্টিহীনতা তার জীবনের সংকটকে ত্বরান্বিত করেছে।

উপসংহার :

আধুনিক বাংলা কাব্য নাটকের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ এসেছে এমন সৃষ্টির সংখ্যা হাতে গোণা। তবু সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনটি বিশ্লেষণ করা জরুরি। তাই আমরা যেখানে-যেখানে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ এসেছে সেগুলিকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করেছি এবং পাঠ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও সাহিত্যিক নির্মাণকে বোঝার চেষ্টা করেছি। কাব্য ও নাটক বিশ্লেষণ করে আমরা কতগুলি নির্দিষ্ট প্রবণতা বা লক্ষণকে চিহ্নিত করেছি। সেগুলি হলো,

প্রথমত, সমাজে দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে নানান মিথ বা নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত আছে যেমন— তারা সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী এবং সমাজে দয়া বা দানের পাত্র, তারা সামাজিকভাবে অক্ষম ইত্যাদি। বাংলা কাব্য ও নাটকে আমরা তার প্রতিফলন লক্ষ করেছি।

দ্বিতীয়ত, সামাজিকভাবে তারা যে, বিচ্ছিন্ন বা প্রান্তেবাসী সাহিত্যিক নিদর্শনের মাধ্যমে সেটাই দেখানো হয়েছে। আমরা একে সমাজবাস্তবতা নির্মাণের ক্ষেত্রে কবিদের সমাজমনস্কতা বলতে পারি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সামাজিক নির্মাণকে অতিক্রম করে বৃহত্তর সাহিত্যিক নির্মাণের দিকে অগ্রসর হয়নি।

তৃতীয়ত, স্বাধীনতার কিছু কাল পূর্ব থেকেই দৃষ্টিহীনরা আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ধীরে-ধীরে প্রবেশ করেছে। বাংলা কাব্য ও নাটকে তার কোনো প্রতিফলন নেই। কবি ও নাট্যকারগণ উন্নয়নশীল নাগরিক প্রেক্ষাপট অপেক্ষা পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে দৃষ্টিহীনদের অবস্থা চিত্রণে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যা তাদের সমাজমনস্কতাকে চিহ্নিত করে কিন্তু কোনো সম্ভাবনা বা সাহিত্যিক নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব পায় নি।

চতুর্থত, কোথাও কোথাও তত্ব বা প্রতীকের আড়ালে দৃষ্টিহীনতাকে উজ্বলভাবে আঁকা হয়েছে কিন্তু সেখানে বাস্তব সমাজ বিবর্তনের সাথে তার বড়ো একটা সম্পর্ক নেই।

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সহজপাঠ সমগ্র, পত্রভারতী, কোলকাতা, ২০১৯।

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।

৩। বাগচী, জ্যোতীন্দ্রমোহন, জ্যোতীন্দ্রমোহন বাগচীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কোলকাতা, ২০০১।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব দর্শন : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সঞ্জিত মন্ডল

বঙ্গীয় বৈষ্ণব দর্শন হল জীবনমুখী ও মানবতাবাদী দর্শন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব দর্শন 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন' নামেও অভিহিত হয়। বৈষ্ণব-দর্শনতত্ত্ব, বৈষ্ণব-রসতত্ত্ব ও বৈষ্ণব-ধর্মতত্ত্ব একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বৈষ্ণব রস-সাহিত্যের মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে বৈষ্ণব দর্শন তত্ত্বের উপর। কারণ, ''এই সাহিত্যে যদি দর্শনের স্থান বদ্ধমূল না হত তাহলে সেই সাহিত্য তার কাব্য সুষমা ও তত্ত্ব সৌষ্ঠব নিয়ে স্বমহিমায় টিকে থাকতে পারতো না।''[১] পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উগ্রতা, কঠোরতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল, তা থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য শ্রী চৈতন্যদেব সর্বমানবিক প্রেমধর্ম প্রচার করেন এবং বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করে বাংলার ইতিহাসকে নতুন অভিমুখে প্রেরণ করেন। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি ও ভক্তি উদযাপনের জন্য নাম সংকীর্তন এই তিনটি আদর্শের উপর এই বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন প্রতিষ্ঠিত।

বাংলার বৈষ্ণব দর্শন-এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি যুক্তিতর্কের পথ অবলম্বন না করে বেছে নিয়েছিলেন মানুষদের হৃদয়ের পথ। কৃষ্ণপ্রেমের ডাক দিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। হরিনাম সংকীর্তন ছিল তাঁর শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। সাধারণ ভক্তদের তিনি ধর্মোপদেশের গুরুভার না দিয়ে ভগবানের নাম কীর্তন করতে বলতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রেম-ভক্তি দ্বারাই ভক্তের সাথে ভগবানের মিলন সম্ভব। এই জন্য তিনি জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ পরিত্যাগ করে ভক্তিমার্গে ভগবৎ সাধনা করতে বলেছেন। বৈষ্ণব রসসাহিত্যে শ্রী চৈতন্যের আদর্শকে সামনে রেখে যেভাবে বৈষ্ণবাচার্যগণ রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা সৌন্দর্যকে লৌকিক ভাষায় আভাসিত করেছেন; সেই রসতত্ত্বের অন্তর্নিহিত দার্শনিক কাঠামো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। যারা 'বিষ্ণুর আশ্রিত' তারাই বৈষ্ণব নামে খ্যাত। ঋগ্বেদ সংহিতায় বিষ্ণু উপাসনা মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্নিহিত সারসত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য নামে বিষ্ণু হলেও আসলে তা কৃষ্ণকথা। কারণ, বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম স্তরে বিষ্ণুকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ হলেও দ্বিতীয় স্তরে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার রূপে পরিগণিত হন এবং তৃতীয় স্তরে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।[২] কৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণের প্রামাণ্য গ্রন্থ হল শ্রীমদভাগবত। এই মহাগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জীবন লীলার চিত্র

উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবতে বলা হয়েছে, অদ্বয় জ্ঞানই কখনো ব্রহ্ম রূপে, কখনও পরমাত্মা রূপে, কখনো ভগবান রূপে অভিহিত হয়। ''স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বয় জ্ঞানই যে বাস্তব বেদ্য তাহাতে তত্ত্ববিদগণের সকলেরই ঐকমত্য আছে। কিন্তু তাহা এক হইয়াও সাধকের দৃষ্যিভেদে বশতঃ কখনো ব্রহ্মরূপে, কখনো পরমাত্মরূপে, কখনো বা ভগবানরূপে অভিহিত হইয়া থাকে-এ আর্যসিদ্ধান্ত, তাহা এমন সরলভাষায়, এমন সুস্পষ্টরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ববর্তী কোনও আর্যগ্রন্থে নির্দিষ্ট হয় না।''[৩] বাংলার বৈষ্ণব দর্শনে এই অদ্বয় জ্ঞানকে 'ভগবান' বলা হয়েছে। এই পরমসত্ত্বা পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম নন বরং তিনি ভক্তের ভগবান। তিনি প্রেমময় ও সবার প্রিয় বন্ধু। তিনি আদিতে এক কিন্তু জীবনলীলা সম্ভোগের জন্য তিনি নিজের সৃষ্টিকে নিজের থেকে পৃথক করে পরিণত হন পরম বন্ধুতে। মা যেমন গর্ভস্থ সন্তানকে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাৎসল্য সুখ অনুভব করেন, তেমনই রসরাজ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণও নিজের দেহ থেকে রাধাকে বিচ্ছিন্ন করে ভোগ করেন আপন লীলারূপ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এই যে সম্বন্ধ তা কেবল ভেদের নয়, আবার অভেদেরও নয়। এতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই বিদ্যমান। এই ভেদ ও অভেদের হেতু কোনও যুক্তিতর্কের দ্বারাই নির্ণয় করা যায় না বলে তা অচিন্ত্য। তাই বাংলার বৈষ্ণবদের এই তত্ত্বকে বলা হয় 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ তত্ত্ব'।

শ্রীচৈতন্য নিজে কোনও দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেননি। কিন্তু নীলাচলে শ্রী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট শংকরভাষ্য শ্রবণের সময়, কাশীধামে কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর মতবাদ খণ্ডনের সময় ও তাঁর শিষ্য শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বিভিন্ন শিক্ষাদানের সময় যে তত্ত্ব ব্যক্ত করেছিলেন তা হল 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ তত্ত্ব'। শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী চৈতন্য দেবের উপদেশাবলী ও শিক্ষাকে অবলম্বন করে এই 'অচিন্ত্য' শব্দের তাৎপর্য হল— 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলাৎ' (২।১১।১২৭) - শ্রী ভগবৎ সন্দর্ভ। অর্থাৎ 'যা যুক্তিতর্কের অগম্য হলেও শাস্ত্রগম্য বা শব্দমূলক শ্রুতার্থাপত্তিজ্ঞান, তাই হলো 'অচিন্ত্য'। ''এই তত্ত্ব অনুসারে পরমতত্ত্বের শক্তিসমূহ ও শক্তিতে পরিণত বস্তুসমূহের সঙ্গে পরমতত্ত্বের সম্পর্ক অচিন্ত্য, কারণ তা জীবের ক্ষুদ্র চিন্তাশক্তি দ্বারা যুক্তিতর্কগম্য নয়। যুগপৎ ভেদ ও অভেদের একত্রে অবস্থান এবং উভয়েই সমভাবে সত্য ও নিত্য— এরূপ বিষয় মানব চিন্তায় অচিন্ত্য, কারণ তা জীবের ক্ষুদ্র চিন্তাশক্তি দ্বারা যুক্তিতর্কগম্য নয়। যুগপৎ ভেদ ও অভেদের একত্রে অবস্থান এবং উভয়েই সমভাবে সত্য ও নিত্য— এরূপ বিষয় মানব চিন্তায় অচিন্ত্য হলেও তা শাস্ত্রোপদিষ্ট বলে তা অবশ্য স্বীকার করতে হয়। কারণ অপ্রাকৃত বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমা।''[৪] শ্রীচৈতন্যদেব এই 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত প্রচারও যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীচৈতন্যের মত অনুসারে, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব। অর্থাৎ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। ব্রহ্ম নির্বিশেষে চৈতন্য-স্বরূপ। তাই তাঁর মধ্যে সজাতীয়, বিজাতীয় এমনকি স্বগত ভেদও থাকতে পারে না। আমরা জানি দুটি নিরপেক্ষ বস্তুর মধ্যেই পরস্পর ভেদ হয়; যেমন একটি মানুষ ও একটি পর্বত এই দুটি বস্তু পরস্পর নিরপেক্ষ। ভেদ তিন প্রকার— সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। একটি বস্তুর সঙ্গে একই শ্রেণির সমজাতীয় বস্তুর যে ভেদ তা হলো সজাতীয় ভেদ; যেমন— গরুর সঙ্গে ঘোড়ার ভেদ; যেমন বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের ভেদ। একটি সমগ্র বস্তুর বিভিন্ন

অংশের মধ্যে যে ভেদ তা হল স্বগত ভেদ; যেমন বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের ভেদ। একটি সমগ্র বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ভেদ তা হল স্বগত ভেদ; যেমন বৃক্ষের কাণ্ড, ডালপালা, ফুল, ফল ইত্যাদির মধ্যে ভেদ। ব্রহ্ম অন্য নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু। ব্রহ্ম সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ থেকে মুক্ত। ব্রহ্মের তটস্থা শক্তি হল জীব। জীব চিৎশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ হলেও ব্রহ্ম নিরপেক্ষ নয়, তাই জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ নেই। সুতরাং ব্রহ্ম স্বজাতীয় ভেদমুক্ত। মায়াশক্তি থেকে জড়জগতের উৎপত্তি। মায়া ব্রহ্মের শক্তি হওয়ায় জগৎ অন্য নিরপেক্ষ নয়, তা ব্রহ্ম নির্ভর। তাই ব্রহ্মের সাথে জড় জগতের বিজাতীয় ভেদ নেই। সুতরাং ব্রহ্মবিজাতীয় ভেদমুক্ত। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ হওয়ায় তিনি পূর্ণচেতন পূর্ণ-আনন্দময়; তার মধ্যে কোনো উপাদানগত ভেদ নেই। সুতরাং ব্রহ্ম স্বগত ভেদমুক্ত।

ব্রহ্ম অনন্ত শক্তি সম্পন্ন। তার মধ্যে প্রধান তিনটি শক্তি হলো— চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিৎশক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মের স্বরূপে থাকে বলে একে স্বরূপ শক্তিও বলে। এই চিৎশক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম অন্তরঙ্গ লীলা করেন, তাই একে আবার অন্তরঙ্গা শক্তিও বলা হয়। স্বরূপ শক্তির তিনটি বৃত্তি আছে– সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। পরমব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। সন্ধিনী হল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সৎ অংশের শক্তি। এই শক্তি দ্বারা তিনি নিজের এবং অপরের সত্তা রক্ষা করেন। সংবিৎ শক্তি হল চিৎ অংশের শক্তি। এই শক্তি দ্বারা তিনি নিজের এবং অপরের সত্তা রক্ষা করেন। সংবিৎ শক্তি শক্তি হল চিৎ অংশের শক্তি, যার দ্বারা তিনি নিজে জানেন এবং অপরকে জানান। এবং হ্লাদিনী হল আনন্দ অংশের শক্তি, যার দ্বারা তিনি আনন্দ অনুভব করেন ও করান। এই শক্তি দ্বারাই প্রেমভক্তি প্রকাশিত হয়।

"সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে 'জ্ঞান' করি মানি।। শ্রী চৈ. চ. ১।৪।৫৮-৫৫।"

জীবশক্তির প্রভাবেই ব্রহ্ম বহুজীব-রূপে অভিব্যক্ত হন। অপরদিকে, মায়শক্তি ব্রহ্মের শক্তি হলেও জড়রূপা শক্তি হওয়ায় তা ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদ্ গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া। শ্রীমদ্ভাগবত। ১।১।৩৯।" অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বত্র থাকলেও মায়ার গুণের সঙ্গে পরব্রহ্মের যোগ বা স্পর্শ হয় না। মায়া সর্বদা ব্রহ্মের বাইরে অবস্থান করে বলে একে বহিরঙ্গা শক্তিও বলা হয়। এইজন্য জীব গোস্বামী তাঁর সর্বসম্বাদিনীতে ভগবৎ সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় লিখেছেন— "তদেবং সিদ্ধায়াং ভাবশক্তৌ সা চ ত্রিবিধা— অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা চ"।[৫]

শ্রীজীব গোস্বামীর মতে, শক্তিমানের সঙ্গে শক্তির যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের সম্বন্ধও সেইরূপ। কেননা জীবজগৎ ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত। জীব ব্রহ্মের তটস্থা শক্তির অংশ সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি। আবার জড়জগৎ ব্রহ্মের মায়া শক্তির পরিণাম সুতরাং জগৎও ব্রহ্মেরই শক্তি। এইভাবে সমস্তই ব্রহ্মের শক্তি বলে তাদের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ হবে শক্তিও শক্তিমানের সম্বন্ধ।

এখন প্রশ্ন ওঠে, এই শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধকটি কীরূপ ? গৌড়িয় দার্শনিকদের মতে, শক্তিমান থেকে শক্তিকে আলাদা করা যায় না। শক্তি ও শক্তিমানের মিলিত ফলই হল অদ্বিতীয় বস্তু বা তত্ত্ব। বস্তু বিশেষ্য, বস্তুশক্তি বিশেষণ। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম বিশেষ্য; স্বরূপ শক্তি, তটস্থা শক্তি, মায়া শক্তি, প্রভৃতি তার বিশেষণ। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বস্তু বললেই যদি বিশেষ্য ও বিশেষণের, শক্তিমান ও শক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বোঝায় তাহলে পৃথকভাবে শক্তি স্বীকার-এর প্রয়োজনীয়তা কী ? এর উত্তরে জীব গোস্বামী উপমা ব্যবহার করে বলেন, অগ্নি দাহ করে তাই তাকে দাহক বলা যায়; কিন্তু যখন দাহ্য বস্তু না থাকে তখন অগ্নি অগ্নিই থাকে, দাহক বলা যায় না। সুতরাং অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক ভেদ না অভেদের তা এ পর্যন্ত কেউ বিচার করে স্থির করতে পারেনি। সেই রকম শক্তিমান থেকে শক্তিকে যেমন আলাদা করা যায় না, তেমনই অভিন্ন বলাও যায় না, তাই তা অচিন্ত্য। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে সমস্তই ভাববস্তুই অচিন্ত্য। জল, অগ্নি প্রভৃতি ভাববস্তু। কোনও বস্তুর যে শক্তি বস্তুর সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে, তাকেই সেই বস্তুর স্বাভাবিক শক্তি বলে। যেমন: অগ্নির দাহিকা শক্তি হল স্বাভাবিক শক্তি, জলের অগ্নিনির্বাপক শক্তি হল স্বাভাবিক শক্তি। শ্রুতিতে বলা হয়েছে ব্রহ্মেরও এরূপ 'স্বাভাবিকী' শক্তি আছে। ''পরাহস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি।। ৬।।৮।।''[৬] আমরা জানি দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেনের মিলিত ফল হল জল। কিন্তু এই জলে কেন আগুন নেভাবার শক্তি আছে, তা বিজ্ঞানও বলতে পারে না, অথচ এই শক্তিকে জল থেকে আলাদা করাও যায় না। ''যে জ্ঞান কোনো যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা, অথচ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া যাহাকে স্বীকার না করিয়াও থাকিতে পারা যায় না তাহাই 'অচিন্ত্য' জ্ঞান গোচর।''[৭] এ কারণেই বলা হয় জলের এই শক্তি অচিন্ত্য। এই একই কারণে ব্রহ্মের যে ত্রিবিধ শক্তি আছে তা অচিন্ত্য জ্ঞান গোচর। ব্রহ্মের সাথে এই ত্রিবিধ শক্তির সম্পর্ক যুগপৎ ভেদ ও অভেদের, জীব গোস্বামী তা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ভারতীয় দর্শনে যে ছয় প্রকার প্রমাণের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে 'অর্থাপত্তি' হল অন্যতম প্রমাণ। অর্থাপত্তি শব্দের অন্তর্গত 'অর্থ' শব্দের অর্থ হল বিষয়, এবং আপত্তি শব্দের অর্থ হল কল্পনা। কোনো বাস্তব বিষয়ের মধ্যে অসংগতি লক্ষ্য করা গেলে সেই অসংগতি ব্যাখ্যার জন্য অন্য কোনও বিষয় কল্পনা করাই হল অর্থাপত্তি। যেমন: দেবদত্ত দিনে ভোজন করে না অথচ স্থূলকায়। 'দিনে ভোজন না করা' এবং 'স্থূলত্ব' এই দুটি বিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করার জন্য দেবদত্তের নৈশভোজন কল্পনা হল অর্থাপত্তি। অর্থাপত্তি দুই প্রকার - দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। উপরোক্ত উদাহরণে দৃষ্টি বিহয়ের মধ্যে অসংগতি ব্যাখ্যার জন্য যে নৈশভোজন কল্পনা তা হল দৃষ্টার্থাপত্তি। একই রকম, শ্রুত কোনও বিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য কল্পনা হল শ্রুতার্থাপত্তি। যেমন : জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই। এখানেই 'জীবিত' ও 'গৃহে না থাকা' এই দুই বিষয়ের মধ্যে অসংগতি ব্যাখ্যার জন্য 'দেবদত্তের বাইরে স্থিতি' কল্পনা করাই হল শ্রুতার্থাপত্তি।

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ এই শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারাই

নির্ধারিত হয়। 'দেবদত্ত আছেন ও নাই' এর মতো শক্তি ও শক্তিমানের যুগপৎ ভেদ ও অভেদের অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রমাণমূলক শ্রুতির অর্থের কল্পনা করতে হয়। এই কল্পনা শব্দমূলক। ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদিতে স্পষ্টভাষায় শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ ও অভেদ এর উল্লেখ আছে। এই শ্রুতার্থাপত্তি হল অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের দার্শনিক ভিত্তি। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর 'ভগবৎ সন্দর্ভ' গ্রন্থে এরূপ শ্রুতার্থাপত্তির অবতারণা করে বলেছেন— ''অগ্নির দাহিকা শক্তির মতো জাগতিক সমস্ত বস্তুতেই অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর শক্তি আছে। ওই শক্তির থেকে বস্তু ভিন্ন না অভিন্ন তা চিন্তার দ্বারা কেউই নির্ধারণ করতে পারে না। তা শ্রুতার্থাজ্ঞানগোচর।''

অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে কেবলাদ্বৈতবাদীদের আপত্তি

কেবলাদ্বৈতবাদী শংকরাচার্যের মতে, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সৎ। ভেদ মিথ্যা। জীব ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন। জগতের কেবল ব্যবহারিক সত্যতা আছে। তারা ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না। ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করলে সেই শক্তিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন ভেদ স্বীকার করতে হবে। তারা কেবল অভেদবাদী। এই কেবল অভেদবাদের সমর্থকগণ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, যদি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধকে 'অচিন্ত্য' বলা হয় অর্থাৎ চিন্তার বিষয় না হয় তাহলে জীব এর সম্পর্কে কীভাবে ধারণা পাবে ? এছাড়া শ্রুতিতে যা বলা হয়েছে তা যদি চিন্তার যোগ্য না হয়, তাহলে সেকথা বলে লাভ কি, আর ভেদ ও অভেদ এই পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞান একসঙ্গে কীভাবে সম্ভব ? সাধারণ জীব কোনটিকে গ্রহণ করবে ? তাছাড়া জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধে কোনও বিরোধমূলক শ্রুতিবাক্য পাওযা যায় না। তাই কেবলাদ্বৈতবাদীদের মতে, শ্রুতিবাক্যের কতগুলিকে পারমার্থিক প্রামাণ্য ও কতকগুলিকে ব্যবহারিক প্রামাণ্য বললে সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ হয়। এতে শ্রুতির উপদেশ ব্যর্থ ও অপ্রামাণ্য হয় না।

এর উত্তরে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদীগণ বলেন, 'অচিন্ত্য' শব্দের অর্থ উপলব্ধি করতে পারেনি বলেই অদ্বৈতবাদীগণ এরূপ মত পোষণ করেছেন। স্বয়ং শংকরাচার্য 'অচিন্ত্যের' লক্ষণে বলেছেন— ''যা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত তাই অচিন্ত্য। সুতরাং 'অচিন্ত্য' এর অর্থ অবাস্তব নহে, তাহা প্রকৃতির অতীত বা অপ্রাকৃত, তর্কের অগম্য, সসীম এবং মানব চিন্তায় অগম্য হইয়াও শব্দপ্রমাণবেদ্য। যদি অচিন্ত্য অর্থাৎ যাহা প্রাকৃত যুক্তি-তর্ক বা চিন্তার বিষয় নহে সেরূপ কোনও উপদেশ করিলে শ্রুতির উপদেশ ব্যর্থ হয় এবং তাহা ফলতঃ অপ্রামাণ্যই হয় তবে শ্রুতিতে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে শতশত বার 'অচিন্ত্য' শব্দের উল্লেখ থাকিত না এবং পরতত্ত্বকে অচিন্ত্যশক্তিও বলা হইত না।''[৮] মুণ্ডক শ্রুতিতে বলা হয়েছে ''বৃহচ্চতদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষাচ্চ তৎ সুক্ষতরং বিভাতি'' (৩।৭)। মাণ্ডুক্য শ্রুতিতে বলা হয়েছে — ''অচিন্ত্যঃ সং আত্মা সং বিজ্ঞেয়ং''। গীতায় যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পর-তত্ত্বের অচিন্ত্য রূপে কথা বলছেন তাহলে তাকেও ব্যর্থ উপদেশ বা প্রামাণ্য বলে স্বীকার করতে হবে।

''কবিংপুরাণমনুশাসিতারমনোরনীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। শ্রী গীতা। ৮-৯।''

এছাড়াও যারা মনে করেন ভেদ ও অভেদ যুগপৎ কল্পনা লোক-বঞ্চনা মাত্র, তাদের

মত খণ্ডন করার জন্য শ্রীজীব গোস্বামী ''বিজ্ঞান আনন্দং ব্রহ্ম'' (বৃ ৩।৯।২৮) এরূপ শ্রুতির অবতারণা করেছেন। এতে বলা হয়েছে ব্রহ্ম বিজ্ঞান বা জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। এখন জ্ঞান ও আনন্দ এ দুটিকে অভিন্ন অর্থে গ্রহণ করলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে, আবার ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করলে ব্রহ্মের স্বগতভেদ স্বীকার করতে হয়। সুতরাং ভেদ-অভেদের কোনও একটি গ্রহণ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে, সেই জন্য ভেদাভেদকে 'অচিন্ত্য' বলাই শ্রেয়।

ব্রহ্মের বা পরতত্ত্বের স্বরূপশক্তি, তটস্থ শক্তি ও মায়া এবং ঐ সকল শক্তির পরিণতি ভগবত পরিকর, ভগবদ্ধাম, মুক্ত ও বদ্ধ জীব, ও জড় জগৎ– এই সকল শক্তি পরিণত বস্তুর সঙ্গে পরতত্ত্বের যে সম্বন্ধ তা নিয়ে অন্যান্য বৈদান্তিক সম্প্রদায়, যেমন— শঙ্করাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভাচার্যের সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতপার্থক্য আছে। যেমন— বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে, ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন নয় আবার ভিন্নও নয়। তিনি করুণাময় ও ভক্ত বৎসল। তাঁর মতে ব্রহ্মের শরণাগতিতেই জীবের মুক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বলেন, জীবকে অংশরূপে স্বীকার করলে স্বগত-ভেদ স্বীকার করতে হয় এবং ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের হানি ঘটে।

মাধবাচার্য দ্বৈতবাদ এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মতে, ব্রহ্ম ও জীব উভয়ই সত্য। তাঁর মতে, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের আত্যন্তিক ভেদ আছে। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নন। ব্রহ্মের স্বরূপানন্দের উপলব্ধিতেই মুক্তি। মুক্ত অবস্থাতেও ব্রহ্ম-জীবে নিত্যভেদ বর্তমান থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে এই মতবাদ গ্রহণীয় নয়। কারণ স্মৃতি, শ্রুতি পুরাণে যে অদ্বয় ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে তা স্বীকার করা হয়নি।

বল্লভাচার্য শুদ্ধ দ্বৈতবাদ এর প্রতিষ্ঠাতা। তার মধ্যে জীব-জগৎ দুইই সত্য, দুইই ব্রহ্মময়। অগ্নির সাথে তার দাহিকা শক্তির যে সম্পর্ক, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যেও সেই সম্পর্ক। ব্রহ্ম জগতের উপাদানও নিমিত্ত কারণ। জীব গোস্বামী বল্লভাচার্যের শুদ্ধ দ্বৈতবাদ সম্পর্কে কোনোরূপ আলোচনা করেননি। তার কারণ সম্ভবত এই যে, জীব গোস্বামীর সময়কালের পরবর্তী সময়ে বল্লভাচার্যের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিম্বার্কচার্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ সত্য, নিত্য ও স্বাভাবিক। ব্রহ্ম কারণ, জীবজগৎ কার্য। কারণ কার্য থেকে গুণতঃ ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন। অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের সঙ্গে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-এর মিল থাকলেও ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের ভেদ-অভেদকে স্বাভাবিক বলে মনে করলে জীব ও জগতের দোষসমূহকে ব্রহ্মের স্বাভাবিক দোষ বলতে হবে। কিন্তু ব্রহ্মের দোষের কথা শুতিতে নেই।

উপরোক্ত বেদান্ত সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই নিজেদের দার্শনিক সিদ্ধান্তকে উপনিষদের সিদ্ধান্ত বলে প্রচার করেন। অথচ উপনিষদসমূহের মধ্যে এমন অনেক বাক্য দেখা যায়, যা দেখলে মনে হবে ঐ সকল বাক্যে বলা হয়েছে ব্রহ্ম হলেন নির্গুণ, নিরাকার, সচ্চিদানন্দ, স্বজাতীয়-বিজাতীয় ও স্বগতভেদবর্জিত, একমাত্র ও পরমার্থ সৎ। অন্যদিকে উপনিষদের এমন অনেক বাক্য রয়েছে যা দেখলে মনে হয় ব্রহ্ম সগুণ-সাকার এবং জীব থেকে ভিন্ন। অদ্বৈতবাদীগণ এই পরস্পর-বিরুদ্ধ উপনিষদ-বাক্যের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মবোধক বাক্যগুলির পারমার্থিক প্রামাণ্য

স্বীকার করেছেন, সগুণ ব্রহ্মবোধক বাক্যগুলির পারমার্থিক প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন, সগুণ ব্রহ্মবোধক বাক্যগুলিকে ব্যবহারিক প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করেছেন এবং তা করতে গিয়ে সগুণ ব্রহ্মবোধক বাক্যগুলিকে দুর্বল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। আবার সগুণ ব্রহ্মবাদীগণ সগুণ ব্রহ্মবোধক উপনিষদ-বাক্যগুলিকে বাস্তব প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন এবং নির্গুণ বোধক বাক্যগুলিকে দুর্বল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে নিজ নিজ মতের অভ্রান্ততা রক্ষা করার জন্য শ্রুতি-বাক্যগুলিকে দ্বিধাবিভক্ত করে একভাগের প্রবলতা এবং অন্যভাগের দুর্বলতা কল্পনা করেছেন। ''এই শ্রুতির মধ্যে প্রবল দুর্বলভাবের কল্পনা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইতে পারে। কিন্তু তাহা স্বতঃপ্রমাণশ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধা ও গৌরব-বৃদ্ধির পরিচায়ক হইতে পারে না। ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখ্যসিদ্ধান্ত। ইহা শ্রীজীব গোস্বামী ভগবতসন্দর্ভে অতি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়াছেন।''[৯]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় চৈতন্যদেব প্রবর্তিত একটি স্বতন্ত্র দর্শন। তারা ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদ-অভেদ উভয়ই স্বাভাবিক-কল্পনা না করে শ্রুতার্থপত্তি প্রমাণ বা শব্দমূলক প্রমাণ দ্বারা শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠা করে শ্রুতি ও বেদান্ত সূত্রের মধ্যে সমন্বয় বিধান করেছেন। বৈষ্ণবাচার্যগণের এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ।

তথ্যসূত্র :

১। উমা রায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের অলৌকিকতা, কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮।

২। সনাতন গোস্বামী, বৈষ্ণব পদাবলি পরিচয়, শম্পা বুক হোম, ১৯৯৪, পৃ. ২।

৩। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯, পৃ. ২২।

৪। শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, গৌড়ীয় মিশন, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১।

৫। শ্রী জীবগোস্বামী, সর্বসন্বাদিনী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬১।

৬। রাধাগোবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, প্রাচ্যবাণী মন্দির, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫০।

৭। শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, গৌড়ীয় মিশন, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.

৮। তদেব।

৯। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯, পৃ. ৮৫।

বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায় ও বর্তমান সমাজ।

সরোজ কুমার সরকার

সার সংক্ষেপ :

আগামী বছর ২০২২ সাল রাজা রামমোহন রায়ের ২৫০ তম জন্মবার্ষিকী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন ২৫০তম জন্মজয়ন্তী সারা ভারতে পালন করা হবে, রামমোহনের ভাবনা ও কর্মধারার মূল্যায়ণে। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দ্বিশত বৎসর পরেও তিনি আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনে, চিন্তা চেতনা ও মানবিকতার ক্ষেত্রে কতটা প্রাসঙ্গিক তা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। তিনি বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ। মহৎ সমাজ সংস্কার, বহু ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ, ভারতের প্রথম নারীবাদী ও একজন মানবতাবাদী।

প্রতিপাদ্যবিষয় :

রাজা রামমোহন রায় বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ। ইউরোপের নবজাগরণের ক্ষেত্রে সেই দেশের শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম দর্শন, বিজ্ঞান, যুক্তিনিষ্ঠা ভাবনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জীবন পদ্ধতি, প্রকৃতিবাদ ও মানবতাবাদী ভাবনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। রামমোহন রায়ের ভাবনা ও কর্মে ইউরোপের নবজাগরণের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ধর্মকে কেন্দ্র করেই আমাদের নবজাগরণের আন্দোলন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধর্ম কেন্দ্রীক ভারতবর্ষে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মান্দলোনের মূল উদ্দেশ্য হল একটি সুস্থ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা, এই সত্য ভূলে ধর্মের বহিরঙ্গ আলোচনায় এবং বিভিন্ন ধর্মের তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণে মত্ত ছিল মধ্যযুগীয় ধর্ম বেত্ত্বাগণ। পুরোহিত তন্ত্রের প্রাধান্য ও তাদের বেদ ও শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা, নানা আচার বিচার, কুসংস্কার জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা ছিল একমাত্র লক্ষ্য। ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন, পরে তা ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়। তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যায়ণ করে উপলব্ধি করেন 'একেশ্বরবাদী' ধারণা। তিনি ইসলাম, খ্রীষ্টানধর্মের সঙ্গে বেদান্তের মিলন ঘটিয়েছেন। তিনি বহুধাবিভক্ত হিন্দুধর্মের সংস্কার করে বেদান্ত ধর্মকে জাতিয় ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম চিন্তার মূল কথা হলঃ এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, মানবপ্রীতি প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার অঙ্গ, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক এবং অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বিষসমূহের অসারতা এবং নিরাকার ঈশ্বরকে পৌত্তলিকতা ও অর্থহীন আচারে আবদ্ধ না করা।[১] তিনি তাঁর ব্রাহ্মসভাকে সকল ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

সেখানে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা হত, ব্রহ্মসংগীত গাওয়া হত, ছিল না কোন নৈবেদ্যের ও বলির ব্যবস্থা। রায়ের নিজের উক্তিঃ 'আমি হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের গুঢ় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় ও তিনিই উপাস্য এই মূলমতে সকলেরেই ঐক্য আছে, কেবল অবান্দ ভেদ লইয়া বাদবিসম্বাদ!'[২]

যুক্তিনিষ্ঠ মানবিকতার (Humanism) উপরে নবজাগ্রত জাতির প্রতিষ্ঠা রামমোহন রায়ের কাঙ্খিত চিল। যেহেতু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত মূর্তিপূজক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর মধ্যে একটি সার্বভৌম ধর্মের প্রতিষ্ঠা ছাড়া জাতীয় জীবনে ঐক্যচেতনা আসবে না এবং ঐক্যচেতনা ছাড়া ভারতবর্ষের পক্ষে রাজনৈতিক অধিকার বা সামাজিক সুযোগসুবিধা লাভ সম্ভব হবে না, সেহেতুই বেদান্তকে নবজাগ্রত ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ১৮২৮ সালে মিস্টার ডিগবীর কাছে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন: – ''It is, I think necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort.''[৩] আজও ভারতবর্ষ সংকীর্ণ ধর্মীয় উন্মাদনা ও ধর্মীয় হিংসার কবলে। দেশের রাজনীতি ধর্মীয় মেরুকরনে বিভক্ত, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংহতি আজ বিপন্ন, জাতপাতের রাজনীতি, দলিত হিন্দুগণ উচ্চবর্ণের দ্বারা নির্যাতিত, অবহেলিত হচ্ছে। যা কিন্তু তিনি চাননি, প্রতিটি মানুষ পরমব্রহ্মের সন্তান, সকল মানুষের মধ্যে ভাতৃত্ববোধের কথা বলেন। তিনি অস্পৃশ্যতাকে ঘৃণা করতেন। তিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমতা ও সমদৃষ্টির কথা বলেন। তাতে উচ্চবর্ণের চক্ষুশুলে পরিনত হন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভায় বেদপাঠ করতেন শিবপ্রসাদ মিশ্র, গোবিন্দ মাল ব্রাহ্ম সংগীত গাইতেন, এই অনাচার দেখে জয়কৃষ্ণ সিংহ রামমোহন রায়ের সঙ্গ ত্যাগ করেন। তবে দ্বারকানাথ ঠাকুর, হলধর বসু, রাজনারায়ণ সেন রইল তাঁর সঙ্গে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভায় এক প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল জাতিভেদ ব্যবস্থার অনৈতিক ও সামাজিক কুফল। পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে এক মহাবিতর্কে রামমোহন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখান বর্ণভেদ একটি আর্থসামাজিক কাঠামো এবং তথাকথিত নিম্নবর্গের উচ্চবর্গের অধিষ্ঠায় কোন বাধা।[৪]

ব্যক্তস্বাধীনতা ও জাতিয় স্বাধীনতা ঃ রামমোহন রায় জন লক, বেন্থামদ ও মন্তেস্কুর উদারনৈতিক ভাবধারায় প্রভাবিত হন। বিশেষ করে জন লকের প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্বে জীবন সম্পত্তি ও স্বাধীনতা প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার। প্রত্যেক মানুষ এই অধিকার ভোগ করবে ও রাষ্ট্রের কর্তব্য হল তা রক্ষা করা। ব্যক্তির কল্যাণ সাধনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। তিনি হিতবাদী দর্শনের আলোকে ধর্মকে মানব কল্যাণে ব্যবহারে কথা বলেন। তিনি ইংলণ্ডের সংসদীয় ব্যবস্থা ও সিভিল রাইটের স্বীকৃতিকে ভূয়সী প্রসংশা করেন। ভারতীয়দের পৌর অধিকারের কথা উল্লেখ করেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র সম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা বাণী ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। মন্তেস্কুর ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে

অনুসরণ করে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের জন্য শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরন ও জুরির মাধ্যমে বিচার কার্যের কথা বলেন। ১৮২৭ সালের আইন অনুসারে খ্রীষ্টান অপরাধীদের বিচার ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান জরি বিচার করতে পারবে না কিন্তু দেশীয় অপরাধীদের বিচারের ভার রইল ইংরেজদের হাতে। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের সোচ্চার হন ও ইংলন্ডের পার্লামেন্ট একটি স্মারকপত্র প্রেরণ করেন। ইংল্যান্ডের ন্যায় ভারতে আইনে অনুশাসন কথা বলেন। আইনে অনুশাসন হল এ.ভি.ডাইসির তত্ত্ব, আইনের চোখে সবাই সমান, আইনের প্রাধান্য, আইন দ্বারা শাসক ও শাসিতকে নিযন্ত্রণ। তিনি মনে প্রানে স্বাধীনতার পূজারী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে William Adam এর মন্তব্য ''Love of freedom was perhaps the strongest passion of his soul, freedom not of action only but of thought.''[৫]

নারী স্বাধীনতা ও নারীর অধিকার ঃ মধ্যযুগে ভারতে নারীর অবস্থা ছিল করুণ ও বর্ণনাতীত যন্ত্রণাময়। তাদের ছিল না কোন স্বাধীনতা, তারা ছিল গৃহবন্দী, পর্দানসীন। সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দেবদাসী প্রথা, সতীদাহ প্রথা প্রচলন ছিল। রামমোহন ও নারীমুক্তির প্রসঙ্গ উঠলে অবশ্যই সতীদাহপ্রথা রোধ আন্দোলনের কথা এসে পড়ে। নিঃসন্দেহে সে এক বৈপ্লবিক অধ্যায়। তবে গভীরতর ভাবে বিচারে দেখা যাবে সমাজে নারীর স্থান, নারীর অধিকার, নারীর স্বাতন্ত্র্য এবং সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল আরও দূরপ্রসারী ও বিস্ময়জনকভাবে প্রগতিশীল। মনস্বী রাজনারায়ণ বসু তাই লিখেছেন, ''রামমোহন স্ত্রীজাতির যে রূপ উকিল ছিলেন, এমন বোধহয় সুবিখ্যাত মিল সাহেবও নন।''[৬] ঐতিহাসিক কে.এম. পানিক্কর তাঁকে আধুনিক ভারতের 'প্রথম নারীবাদী' (feminist) বলে অভিনিন্দিত করেছেন।[৭] প্রাচীন ভারতীয় নারীর স্থান ছিল মর্যাদাপূর্ণ। সেখানে মধ্যযুগে নারীর অবর্ণনীয় দুর্দশার কারণ পুরোহিততন্ত্র, শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা ও সমাজপতিদের সংকীর্ণ রক্ষণশীলতা। তার উপরে পুরুষশাসিত পরিবার ও সমাজে সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত চলেছে দীর্ঘকাল, যার নৃশংস প্রকাশ অসহায় বিধবাকে নিক্ষেপ মৃত স্বামীর চিতায়। তিনি নারীদের পৈতৃক ও স্বামীর সম্পত্তির উপরে অধিকারের কথা বলেন। Dr. V.P. Verma এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ''Rammohan Roy was a champion of the right of Hindu females to inheritance. He criticized the grave injustice done to women by the modern law of inheritance''[৮]

বর্তমানে নারীর স্বাধীনা, শিক্ষা, বিকাশ ও ক্ষমতায়ণের মাত্রা যদিও বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও নারীরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার। কন্যাভ্রূণ হত্যা, শিশুকন্যা পাচার, বিক্রয়, যৌনব্যবসায় নিয়োগ, পণপ্রথা জনিত বধূনির্যাতন, বধূহত্যা ও গার্হস্থ্য হিংসা, ধর্ষণ, যৌন হেনস্থার শিকার। নারী মুক্তি ও শিক্ষার জন্য রামমোহনের ন্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় চেষ্টা করেছিলেন বাংলার নবজাগরণের সূচনা লগ্নে। তবে ভারত সরকারের সফল দুটি পদক্ষেপ

হল মুসলিম মহিলাদের তিন তালাক রোধ আইন ও ২০০৫ সালে আইনানুসারে পৈতৃক সম্পতিতে নারীদের সমানাধিকার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা বিস্তারঃ রামমোহন রায় ছিলেন মেধাবী, বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী। তাঁর অগাধ পান্ডিত্ব ছিল সংস্কৃত, আরবি, ফার্সী ও ইংরেজী ইত্যাদি ভাষায়। তিনি ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করেন, ভারতে তা প্রচলন করার কথা বলেন। তিনি চেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক, যুক্তিনিষ্ঠ প্রগতিশীল শিক্ষার প্রচলন করতে। তিনি পাশ্চ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের কথা বলেন। যদিও সেই সময় বিতর্ক দেখা দেয় পাশ্চাত্য শিক্ষা নিয়ে। তিনি পাশ্চাত্যের ভাষা, জ্ঞানবিজ্ঞান সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় বেদ, দর্শন পাঠের কথা বলেন। লর্ড মেকলে ইংরেজী শিক্ষার পদক্ষেপ নেন, তা তিনি সমর্থন করেন। তিনি ১৮১৬ সালে ইংরেজী স্কুল, ১৮২৫ সালে বেদান্ত কলেজ স্থাপন করেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতগণ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, দর্শন জানতে পারবে। ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা, সংস্কারমুক্ত উদারনৈতিক ভাবধারার বিকাশ ঘটবে, এই ছিল তাঁর আশা। তিনি নারীদের শিক্ষা কথা বলেন।

সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতাঃ - রামমোহন রায়কে ভারতের সাংবাদিকতার জনক (Father of Indian Journalism) বলা হয়। তিনি তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেন - যথা ব্রাহ্মণ সেবধি, সম্বাদ কৌমুদি ও মিরাত-উল-আকবার। বাংলার নবজাগরণ প্রসারে সংবাদ পত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রামমোহন রায়ের সমসাময়িক কালে ও পরে বাংলায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। এইসকল পত্রপত্রিকার মাধ্যমে নানা ধরনের সংবাদ ও জনমত প্রকাশিত হয়। যা বাংলার জনমানসের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । রামমোহন যেমন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে মতব্যক্ত করেন ও জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। রক্ষণশীল সমাজপতিগণ আবার সতীদাহ প্রথার সপক্ষে ও রায়ের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেন। রামমোহন রায়ের 'সমহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ' ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংবাদ প্রকাশিত হয় পরের বছরে। 'ফেন্ড অব ইন্ডিয়া' পরপর তিনটি প্রবন্ধে সেই বক্তব্যকে সমর্থন করেন। সতীদাহের সমর্থকেরা 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ' পাল্টা 'বিধায়ক নিষেধকের সংবাদ' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন জনৈক কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ।[৬]

প্রগতিশীল রাজনীতির জন্য, কল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য আইনের প্রতি আনুগত্যকে জনমুখী করে তোলার জন্য, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হল অপরিহার্য। দেশবাসীকে এই মূল্যবান রাজনৈতিক ধারণায় দীক্ষিত করায় রামমোহনের ভূমিকা ছিল অসামান্য। যে গভীর সামাজিক আলোড়ন তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার জন্য সবচেয়ে কার্যককরী হাতিয়ার ছিল মুদ্রণ মাধ্যম। দেশীয় স্বার্থে জনমত গঠনের জন্য বঙ্গভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের প্রয়োজন ছিল অত্যধিক। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সংকোচন করার জন্য ১৮২৩ সালে কুখ্যাত Press Act আনে ইংরেজ শাসক। তিনি এই আইনের নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রথমে সুপ্রীমকোর্টের দ্বারস্থ হন, সেখানে বিচার না পেয়ে ব্রিটিশের রাজার নিকট পত্র লেখেন।

সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতা যে নাগরিক অধিকার সে সম্পর্কে তাঁর নির্ভীক ঘোষণাঃ ''The editor had the right to admonish the Governors of their duties, to warn them furiously of their faults and to tell disagreeable truths.''[১০] তিনি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছিলেন ভারতবাসীর জন্য। আজও ভারতে বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের উপর রাষ্ট্রিয় চরম নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। কোন ব্যক্তি সরকারের সমালোচনা বা বিরুদ্ধ কথা বললে তাঁদের বিরুদ্ধে ১২৪ (এ) ধারায় রাষ্ট্রদোহিতার মামলা জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

গত ৫ই জুলাই জেলে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু হল ফাদার স্ট্যান স্বামীর। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর আদিবাসী দলিত ও মহিলাদের অধিকার অর্জনের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ভীমা-কোরেগাও মামলায় ষোলজন মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজ আন্দোলনের অংশিদারকে গ্রেফতার করে মামলায় জড়ানো হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৮৪ বছর বয়সী ফাদার স্ট্যান স্বামী। UAPA আইনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, মাওবাদী সন্দেহে।

২০১৪-১৯ সালে মোট পাঁচ বছরে গোটা দেশে বিতর্কিত রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে ৩২৬টি মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ছয়জন দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। ভারতের সুপ্রীমকোর্টের প্রধানবিচারপতি এন ভি রমণা জানিয়েছেন এই আইনের চুড়ান্ত অপব্যবহার হচ্ছে। একই সঙ্গে কেন্দ্র সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মহাত্ম গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলকদের থামাতে ব্রিটিশরা ভারতীয় দন্ডবিধি যে ১২৪ (এ) ধারার প্রয়োগ করত। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়েও সেই আইন কেন বাতিল করা হয়নি।[১১] এই আইন নাগরিকদের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের পরিপন্থী।

মানবতাবাদ ও রামমোহন ঃ ইউরোপের নবজাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মানবতাবাদ। মধ্যযুগীয় দেববাদের পরিবর্তে মানবতাবাদের জাগরণ। দেবতার গুনকীর্ত্তন নয়, মানুষের জীবনজীবিকা, সুখশান্তি, শ্রীবৃদ্ধি ও মানুষের মর্যাদা নিয়ে ভাবনা হল মানবতাবাদ। অপার্থিব জগৎ নয়, পার্থিব জগৎ জীবন নিয়ে ভাবনা। ভারতীয় জীবন দর্শনে অর্থ নয় পরমার্থ হল মূল লক্ষ্য। ইংরেজজাতির লক্ষ্য অর্থ পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য। রামমোহন ইংরেজ জাতির কর্মোদ্দীপনা ভারতীয়দের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন, বৈষেশিক ও আর্থিক উন্নতিকল্পে। পরবর্ত্তীকালে বিবেকানন্দ কর্মযোগের কথা বলেন কর্মবিমুখ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। দেশ ও জাতির সম্পদ বৃদ্ধিতে চাই কর্ম ও কর্মদ্দোগ, মানবকল্যাণে চাই মানবতাবাদী কর্মকান্ড।

উপসংহার :

বর্তমান ভারতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, হিংসা, ও ধর্মীয় মৌলবাদীদের দৌরাত্ম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একবিংশ শতকে সমাজ কুসংস্কার মুক্ত নয়, বিজ্ঞান চেতনার অভার, মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব পরিলক্ষিত। দেশের রাজনীতি দুর্নীতিগ্রস্থ ও রাষ্ট্রীয়

নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন। এমত অবস্থায় রামমোহন রায় ভাবনাচিন্তা ও কর্মকে প্রেরণা হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

তথ্যসূত্র :

১। রাধারমণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯, পৃ-১৪৭।

২। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থের অন্তর্গত নচিকেতা ভরদ্বাজ রচিত ভারতের নবজাগরণঃ রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ, পৃ-৭৩৫

৩। ঐ, পৃ. ৭৩৭

৪। রাধারমণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯, পৃ- ১৪৯।

৫। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থের অন্তর্গত নচিকেতা ভরদ্বাজ রচিত ভারতের নবজাগরণঃ রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ, পৃ-৭৩৭

৬ । রাধারমণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভাতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯, পৃ-১৪৩

৭। ঐ

৮। Dr. V.P. Verma, Modern, Indian Political Thought, Lakshmi Narayan Agarwal, Agra, 2021, p.27

৯। ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-২১৪

১০। রাধারমণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯, পৃ- ১২৭।

১১। আনন্দবাজার পত্রিকা, তাং ১৯/৭/২১।

লোকশিক্ষক বিবেকানন্দ

শ্রাবণী চ্যাটার্জী

সারসংক্ষেপ :

স্বামী বিবেকানন্দ, উনিশ শতকের এক তরুণ দার্শনিক দেখেছিলেন নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন।

ভারতবর্ষ কি ? তার স্বরূপ কি ? জানার জন্য ঘুরেছিলেন আসমুদ্র হিমাচল। ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে এই পরিব্রাজক গিয়েছিলেন পাশ্চাত্যেও। পাশ্চাত্যের সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষাকে জেনেছেন। বুঝেছেন ভারতের সর্ব ক্ষেত্রেই এক প্রকারের সংস্কার প্রয়োজন। তিনি পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রাচ্যের বেদান্ত দর্শনের একটি সম্মিলিত রূপ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যার মূল ভিত্তি ছিল শিক্ষা। শিক্ষাই পারে একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতে।

কেবল পুঁথিগত শিক্ষা নয়, চাই মানুষ হওয়ার শিক্ষা। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে তিনি ভারতবর্ষকে মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন ভারত, ভারতবর্ষের শিক্ষা, দর্শনকে তিনি সমগ্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে। ভারতীয় মূল্যবোধ, সংস্কার ও দার্শনিকতাকে তিনি তাঁর আলোচনায় ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে, নীতি কথার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাঁর নীতিকথামূলক গল্পগুলিতে বারেবারেই শিক্ষার কথা, মূল্যবোধের কথা উঠে এসেছে। শিক্ষার পাশাপাশি চাই সঠিক শিক্ষাগুরু বা শিক্ষক। তিনিই পারেন একজন ছাত্র তথা সমাজের সঠিক নির্মাণ করতে। তিনি নিজেই ছিলেন শিক্ষকের আদর্শ স্বরূপ। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবনচর্যা শিক্ষক জীবনকেই প্রতিফলিত করে। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ভাবে শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য, শিক্ষকের কর্তব্য, ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের ব্যবহারের গুরুত্ব দিয়েছেন ও বিভিন্ন লেখায় তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী ও দার্শনিক মূল্যবোধের শিক্ষা ছাড়া কখনই জাতির উত্থান সম্ভব নয়, তাই তিনি নানাভাবে নানা বক্তৃতায় শিক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শিক্ষার কথাই বলে গিয়েছেন।

সূচক শব্দ : শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষামূলক গল্প, মূল্যবোধ

প্রতিপাদ্য বিষয় : 'শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান তারই বহিঃপ্রকাশ।' উনিশ শতকের এক তরুণ বাঙালি যুবক বুঝেছিলেন শিক্ষার এই গভীর মর্মবাণী। শিক্ষা বয়ে আনে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তোলে চেতনা। সেই চেতনার আলোকেই দেখতে চেয়েছিলেন নতুন ভারতবর্ষকে।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের সন্তান। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, হাইকোর্ট এর এটর্নি ছিলেন। বাড়িতে খ্রিস্ট ধর্ম ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রভাবিত পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা।

উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখে দেখেছিলেন নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন। পরাধীন ভারতের সেই গ্লানি, সেই দুঃখ মোচনে ব্রতী হয়েছলেন পঁচিশ বছর বয়সের সেই তরুণ সন্ন্যাসী। হয়ে উঠেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

কেন ভারতের এমন দুর্দশা, কেন ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে তার দেশ মেন পিছিয়ে ? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এই পরিব্রজক ঘুরে বেড়িয়েছেন আসমুদ্র হিমাচল। মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, মানুষকে জেনেছেন। বুঝেছেন ভারতকে শ্রেষ্ঠ রূপে গড়ে তোলার জন্য, সর্বক্ষেত্রেই এক ধরনের সংস্কার প্রয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল আকরকে খুঁজে বের করতে হবে। দেশবাসীকে সজাগ করতে হবে।

ছেলেবেলা থেকেই তার মনে সহজাত ধর্মানুরাগ ছিল। যত সময় এগোতে থাকে জীবন ও বিশ্ব সম্পর্কে জানার ইচ্ছা ক্রমশ বৃদ্ধিপেতে থাকে তাঁর। অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে কক্ষণো প্রশ্রয় দেননি। ধর্মে বিশ্বাস রেখেও কিভাবে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে তোলা যায় সেই দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে তিনিই ছিলেন প্রকৃত পথপ্রদর্শক।

সমাজ ও জীবনকে আদর্শরূপে গড়ে তোলার একজন স্বার্থক রূপকার ছিলেন তিনি। শিক্ষকই হল সমাজ তৈরির কারিগর। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক রূপে গড়ে তোলা, তাদের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়াই একজন শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। একজন শিশু শিক্ষার্থীই ভবিষ্যতের নাগরিক। তাই সঠিক শিক্ষাই পারে সমাজ তথা সমগ্র রাষট্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। বিবেকানন্দ ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের আধার। তার সঙ্গে শিখিয়েছিলেন জীবন যাপনের কৌশল। তাঁর বাল্যকালের বিভিন্ন কাহিনী তাঁর বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দেয়। তাঁর শিক্ষামূলক ছোট ছোট গল্পগুলি নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে।

শিক্ষকরূপে বিবেকানন্দ —

১। একজন আদর্শ শিক্ষকের সমস্ত গুণাবলিই ছিল তাঁর। ছেলেবেলা থেকেই বালক নরেন এর সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও তথ্য পেলে তা যাচাই না করে কিছুতেং মানতেন না। এক প্রতিবেশী চাঁপা গাছে ব্রহ্মহত্তযি আছে বলায় তিনি একাই গাছে উঠে পড়ান গাছে আদৌ কিছু আছে কিনা জানার জন্য এবং প্রমাণ করে দেন ভূত বলে কিছু হয় না। একজন শিক্ষক এর কাজই হচ্ছে অনুসন্ধান করা, পুরনো জিনিসকে নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করা ও ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা।

২। শৈশব থেকেই তাঁর মনে ছিল নেতাসুলভ মনোভাব। ছেলেদের খেলায় তিনি সব বিষয় এই নেতার আসন গ্রহণ করতেন। বন্ধুরা তা মেনেও নিত। ছেলেবেলায় তাঁর সবথেকে প্রিয় খেলা ছিল রাজদরবার বসানোর, সেখানে তিনিই হতেন রাজা। একজন শিক্ষক সর্ব ক্ষেত্রেই নেতা রূপে প্রতিফলিত হবেন তাঁর ছাত্রদের কাছে। তিনিই হবেন পথ প্রদর্শক।

৩। তেজস্বিতা ও স্বাধীন চিন্তার মনোভাব ছিল প্রথম থেকেই। আপসহীন এক মহাপ্রাণ ছিলেন তিনি। স্কুলে শিক্ষক একবার ভুল বুঝে বিনা দোষে তাঁর কান মলে দেওয়ায় শিক্ষকের এরকম অন্যায় আচরণের কারণ জাতে পিছুপা হননি। হুঁকা টানলে জাত যায় কিনা জানতে তিনি

সবার হুঁকো টেনে পরীক্ষা করেছিলেন। এইরকম স্বাধীন চিন্তার মনোভাব সমস্ত শিক্ষকের মধ্যে থাকতে হবে। ছাত্রদের সেই সুযোগ করে দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে ও নিজেদের মতো ধারণা গঠন করতে পারে। কোন চাপিয়ে দেওয়া বিষয় যেন তাদের বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা দান না করতে পারে। কোন চাপিয়ে দেওয়া বিষয় যেন তাদের বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা দান না করতে পারে। তার জন্য শিক্ষককেও হতে হবে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কোন বিষয়কে, একইভাবে ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে না দিয়ে তাদের ভাবনার পরিসর গড়ে দিতে হবে। স্বাধীন চিন্তার সুযোগ গড়ে দিতে হবে।

৪। তীক্ষ্ণ মেধা ও বহুমুখী প্রতিভা ছিল বিবেকানন্দের। তিনি একবার যা শুনতেন সহজেই তা মনরে রাখতে পারতেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, রামায়ণ অতি অল্প বয়সেই তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। শুনে শুনেই তিনি পড়া মুখস্থ করতে পারতেন এত অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। অসম্ভব ভালো তার্কিক ছিলেন তিনি। তার প্রধান কারণ ছিল তার অধ্যয়ন ও বিপুল তথ্য ভাণ্ডার। একজন শিক্ষককে এবসময়ই অধ্যয়ন করতে হবে, নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমে নতুন তথ্য বের করতে হবে, শিক্ষার্থীর মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

বিবেকানন্দের শিক্ষামূলক গল্প —

বিবেকানন্দের বাণী ও তাঁর ছোট ছোট লোকশিক্ষামূলক গল্পগুলি আমাদের আজও অনুপ্রেরণা যোগায়। ভ্রাতৃভাব, কর্তব্য, পরোপকার, অনাসক্তি, কর্মযোগ, প্রভৃতি ভারতীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক নীতিগুলি তিনি খুব সহজেই গল্পের মাধ্যমে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে।

১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে ধর্মমহাসভার পঞ্চম অধিবেশনে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে বচসা শুরু করলে, বিবেকানন্দ একটি গল্প বলেন— একটি ব্যাঙ কুয়োর মধ্যে বসবাস করত, সেই কুয়োই ছিল তার জগৎ। একদিন সেই কুয়োতে সাগরের ব্যাঙ এসে উপস্থিত হয়। কূপমণ্ডুক সেই কুয়োর ব্যাঙ কুয়োর সঙ্গে সাগরের তুলনা করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে বসে।মধ্যযুগে অস্পৃশ্যতা, ধর্মান্ধতা, পরধর্মে অবিশ্বাসী মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি। বর্তমানে সমাজ যত এগিয়েছে, তার সঙ্গে ধর্মান্ধতা কমে এলেও তা একেবারে মুছে যায় নি। ধর্ম নিয়ে হানাহানি, হিংসা আজও চলছে। সেই ধর্মান্ধ মানুষেরা আজও নিজের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে ও অন্য ধর্মের প্রতি নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' মনুষ্যত্বই প্রধান ধর্ম। শিক্ষক হলেন মানুষ তৈরির কারিগর। একটি ক্লাসরুমে বহুধর্ম, বহুভাষা, বহুসংস্কৃতির শিক্ষার্থী থাকে। একজন শিক্ষককে সবসময়ই ধর্মনিরপেক্ষ ও পরধর্মে বিশ্বাসী হতে হবে। সব ভাষা, সব মত, সব ধর্মকেই প্রাধান্য দিতে হবে। টেবিলের অপর প্রান্তে বসে থাকা শিশুর একটিই পরিচয়, সে একজন শিক্ষার্থী ব্যতিত আর কিছু নয়।

স্বার্থত্যাগ, দয়া, সহমর্মিতা – মানুষের মনের এই সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। আজ একবিংশ শতাব্দিতে দাঁড়িয়ে একথা বলতে খারাপই লাগে যে মানুষ আর মানুষের কথা ভাবে না। সহানুভূতি নিয়ে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সংকটে তাকে সাহায্য করার মানুষ খুবই কম। অথচ ভারতীয় সংস্কৃতি তো এমন নয়, ছিলও না কোনকালে। ভারতীয়দের কাছে

সেবাই হল পরম ধর্ম। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ একটি গল্প বলেছেন— এক গ্রামে, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ থাকতেন। শাস্ত্রচর্চা, ধর্মোপদেশ এর মাধ্যমে ভিক্ষা করে জীবন অতিবাহিত করতেন। গ্রামে একবার খুব দুর্ভিক্ষ হয়। চারিদিকে খাদ্যের অভাব দেখা যায়। চারদিন অনাহারে থাকার এই ব্রাহ্মণ পরিবার সামান্য কিছু ছাতু সংগ্রহ করে খেতে বসে। এমন সময় তাঁর ঘরে এক অতিথির আগমন ঘটে। তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকায় খাবার প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলে আস্তে আস্তে তাদের সব খাবার সেই অতিথিকে দান করেন। সেই রাত্রেই সেই ব্রাহ্মণ পরিবার ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণত্যাগ করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মত্যাগ, দয়া, সহমর্মিতা, সহানুভূতির এই প্রবৃত্তিগুলি ফুটিয়ে তোলার কাজ একজন শিক্ষকেরই। তিনি পথপ্রদর্শক। তিনিই শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলবেন এক যথার্থ মানুষ রূপে। পরোপকার, দয়া, করুণা মানুষকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে। মানুষ সামাজিক জীব তাই একটি বৃহত্তর ও বহুমতাদর্শব্যাপী সমাজ নির্মাণে পারস্রিক করুণা ও পরোপকারের ভাব থাকা খুবই প্রয়োজন।

একটি শিশু, একটি সুপ্ত বীজের মতো। শিক্ষকই সেই ব্যক্তি যিনি অনন্ত সম্ভাবনাময় একটি শিশুকে সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে বড় করে তোলেন। একটি শিশু বড় হয়ে সাধু ব্যক্তি হবে না অসৎ তা নির্ভর করে তার শিক্ষাগত পরিমণ্ডল ও সামগ্রিক পরিবেশের উপর নির্ভর করলেও তার নিজস্ব চারিত্রিক গতি প্রকৃতি তার চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। একটি শিশুর মধ্যে সৎ ও অসৎ দুই সম্ভাবনাই প্রবল, কিন্তু শিক্ষকের পথ প্রদর্শনেই একটি শিশু তারযাত্রাপথ নির্ণয় করে। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ একটি গল্পে বলেছেন— এক অসুর ও দেবতা 'আত্মা' কি এই প্রসঙ্গে জানতে ব্রহ্মার কাছে যায়। ব্রহ্মা তাদের আত্মানুসন্ধানের পথ বলে দেন। কিন্তু দেখা যায় দেবতা আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারলেও , অসুর তা পারে না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে গুরু বা শিক্ষক পথপ্রদর্শক হলেও শিশুর নিজস্ব স্বকীয়তাই তাঁরচরিত্র গঠনের প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। শিক্ষক সঠিক পথের সন্ধান বলে দিলেও শিশু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গঠন অনুযায়ীই বেড়ে ওঠে। শিক্ষক সঠিক পথের সন্ধান বলে দিলেও শিশু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গঠন অনুযায়ীই বেড়ে ওঠে। শিক্ষক এখানে পথনির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গঠন, আত্মপলব্ধি ও নিজস্ব ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিহার্য। বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে একটি গল্পে বলেছেন— একটি আসন্ন প্রসবা সিংহী শিকারের জন্য বেরিয়েছিল। দূরে একটি মেষের পাল দেখে সে আক্রমণ করতে যায় কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ মারা যায় ও একটি শিশু শাবক জন্ম নেয়। এরপর থেকে সেই শিশু শাবক সেই মাষপালের সঙ্গেই বড় হতে থাকে এবং আস্তে আস্তে তার আচরণও মেষের মতো হতে থাকে। এই গল্পটি ঠিক যেন 'The Jungle Book' এর মুংলির মতো। এইভাবে দিন কাটতে থাকে, সে আস্তে আস্তে বড় হয়। তার আকার আকৃতি সিংহের মতো হলেও তার স্বভাব মেষের মতই হয়। সে ক্রমশ তার সিংহ সত্তা হারিয়ে ফেলে। এমন সময় অন্য একটি সিংহ সেই মেষের পালে আক্রমণ করে ও সেই মেষরূপী সিংহকে দেখতে পায়। কিন্তু মেষরূপী সেই সিংহটি ভয়ে অন্যান্য মেষগুলির সঙ্গে পালিয়ে যায়। আক্রমণকারী সিংহটি পরবর্তীতে মেষরূপী সিংহটিকে জলাশয়ে নিয়ে যায় ও তার স্বরূপ সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করে। অনেক তুলনা ও উদাহরণের পর সিংহটি নিজের স্বরূপ সম্পর্কে

সচেতন হয় ও সিংহের গর্জন করে ওঠে। শিক্ষকের কাজ ওই দ্বিতীয় সিংহটির মতো। শিক্ষার্থীকে যাতে নিজের সক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে, নিজের আত্মবিশ্বাস গঠন করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা। ভবিষ্যতে যাতে শিক্ষার্থীরে নিজ নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী নিজ নিজ ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে তা সাহায্য করা।

শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন যে শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে থাকা উৎকর্ষতার ফল। অর্থাৎ আমরা বাইরে থেকে যা শিক্ষা বা জ্ঞানলাভ করি তার মূলবাণী আমাদের অন্তরেই নিহিত রয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের সেই অন্তরের শক্তিকে উন্মোচিত করা। একজন শিক্ষকই পারেন সেই দায়িত্ব নিতে। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ সত্যকামের গল্প বলেন— এত্যকাম শাস্ত্র ও বিদ্যাচর্চায় আগ্রহী। কিন্তু গুরুকুলে তার পিতার নাম জানতে চাওয়ায় সে বলতে পারে না কারণ তার মা কুমারী অবস্থায় তাকে জন্ম দেয়। সত্যকামের জ্ঞান পিপাসা নিবারণের জন্য গুরুদেব তাকে কয়েকশত গরু দান করেন ও বলেন গরুগুলি যখন সহস্র সংখ্যক হবে তখন আবার ফিরে আসতে। কয়েক বছর পরে সহস্র গরু হয়ে গেলে তাদের মধ্যে প্রধান যে বৃষ সে সত্যকামকে সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দেয়, অগ্নি কিছু শিক্ষা দেয় ও হংস কিছু শিক্ষা দেয়। এইভাবে সত্যকাম ধীরে ধীরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করল। সে যখন গুরুগৃহে যায় ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চায় গুরুর থেকে তখন দেখা যায় সত্যকাম ইতিপূর্বেই সেই ব্রহ্মজ্ঞান অধিকারী। অর্থাৎ বাহ্যিক জ্ঞান নয় আমাদের অন্তরেই নিহিত আছে শিক্ষার মূলধন। একজন শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীকে আত্মানুসন্ধান করতে দেওয়া ও নিজের অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করা।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সভাসদ ও অনুগতরা তাঁর জন্য সবসময়ই নিজেদের আনুগত্য প্রকাশের জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত থাকত। তাতে রাজা মনে মনে খুব গর্ববোধ করতেন। একদিন এক ঋষি রাজার কাছে আসায় রাজা সেই কথা তাকে জানায়। ঋষি, রাজার এ হেন কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করলে রাজা সে কথা তাকে জানায়। ঋষি, রাজার এহেন কতায় অবিশ্বাস প্রকাশ করলে রাজা সে কথা মানতে নারাজ হয়। ঋষি তখন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পুষ্করিণী খনন করতে বলেন। প্রত্যেক রাজঅমাত্য ও সভাসদকে সেই পুষ্করিণীতে এক ঘড়া করে দুধ ঢালার কথা বলেন। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা যায় যে দুধের পরিবর্তে পুষ্করিণীটি জলে পরিপূর্ণ হয়েছে, কারণ সকলেই ভেবেছে দুধের পুকুরে এক ঘড়া জল মেশালে তা বোঝা যাবে না। এইভাবে প্রায় সকলেই দুধের পরিবর্তে পুকুরে জল ঢেলেছে। অর্থাৎ এই পরনর্ভরতা, অসততা থেকে শিশু শিক্ষার্থীদের মুক্ত করতে হবে, নিজের কাজ নিজে করা, অসততাকে প্রশ্রয় না দেওয়া ইত্যাদি গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে শিক্ষককেই।

শিশু কিছু সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে সবকিছুকে জানতে চায়, বুঝতে চায় নিজের মত করে। সেই জানা ও চেনার কাজকে সহজ করে আনাই শিক্ষকের কাজ। কিন্তু কখনই তাঁর নিজের মতামত শিশুর ওপর বা শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেন— তাঁর ছেলেবেলায় তাঁর বাবা ঈশ্বর কে ? ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি ? সেই বিষয়ে বোঝাতে তাঁকে একটি বই দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তো ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়, তাকে কখনোই চাপিয়ে দেওয়া যায় না। একটি শিশু তাঁর নিজস্ব চাহিদা ও প্রকৃতি অনুযায়ী কোনও বিষয়ের সম্পর্কে

ধারণা গঠন করে। বাইরে থেকে কোনও মতামত বা ধারণা তার উপর চাপিয়ে দিলে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। একটি গাছ কখনোই তার অনুপযুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে না। তার উপযুক্ত পরিবেশ সে নিজেই গড়ে নেয়। শিক্ষকের কাজ হল তাকে উপযুক্ত মাটি দেওয়া, সে যাতে তার শিকড় ছড়াতে পারে, নিজের ইচ্ছে ও সামর্থ্য অনুযায়ী অঙ্কুরিত হতে পারে। প্রয়োজনে তার চারিদিকে বেড়া লাগানো যেতে পারে অর্থাৎ সে জাতে পথভ্রষ্ট না হয় তা দেখা যেতে পারে। শিক্ষকের কাজ এইটুকুই। বাকী সবটুকু শ্িকষার্থী নিজেই গড়ে তুলবে, তবেই তার আভ্যন্তরীণ বিকাশ সম্ভব হবে।

বিবেকানন্দের মতে শিক্ষাগুরু বা শিক্ষক—

শিক্ষক কতগুলি গুণের আধার। যে কেউ শিক্ষক বা শিক্ষাগুরু হতে পারেন না, তার জন্য চাই দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষমতা। বিবেকানন্দ এক্ষেত্রে কতগুলি গুণের কথা বলছেন যেমন—

ক। শিক্ষক হবেন আগুন জ্বলা মশালের মতো। শিক্ষার্থীরা দূর থেকে দেখলেই তার ভিতরে জ্বলতে থাকা জ্ঞানের আলোর উপলব্ধি করতে পারবে। তিনি হবে পথপ্রদর্শক, অন্ধকারের দিশারী। শিক্ষার্থীদের আলোর পথে নিয়ে যাওয়াই তার একমাত্র কাজ।

খ। শিক্ষককে হতে হবে মর্মজ্ঞানী। অর্থাৎ শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানই নয় তার সঙ্গে থাকতে হবে বিষয়ের প্রতি গভীর আগ্রহ ও অনুসন্ধানের ইচ্ছে। শুধু বাহ্যিক জ্ঞান ও বর্ণনা দিয়ে শিক্ষার্থীর মন আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন গভীর অধ্যবসায় ও অনুশীলন এর।

গ। ক্লাসে শিক্ষার্থীর মনযোগ আকৃষ্ট করে তোলেন শিক্ষকই। তাঁর কথা বলার ধরণ, পাঠ উপস্থাপন, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি শিক্ষার্থীর সামনে তাকে role model বা আদর্শ রূপে গড়ে তোলে। সেক্ষেত্রেশব্দ ব্যবহারের কৌশল, ভাষা ব্যবহার, বিভিন্ন ভঙ্গিতে কথা বলার উপায়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে পাঠদানের উপায় ইত্যাদি আয়ত্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রে।

ঘ। শিক্ষককে সবসময়ই একজন ভালো শ্রোতা হতে হবে। যদি কোনও শিক্ষক সবসময় নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতেই ব্যস্ত থাকেন, তাহলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মতামত তার শোনা হয়ে উঠবে না। এক্ষেত্রে অনেক প্রতিভাবান শিক্ষার্থী তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। তাই শিক্ষকের সবসময়ই উচিত নিজের কথা বলা ও শিক্ষার্থীর কথা শোনা। তবেই পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে একটি পাঠ সম্পূর্ণ হবে।

ঙ। শিক্ষককে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। তার বিষয়ের প্রতি, তার শিক্ষার্থীদের প্রতি তাকে সৎ থাকতে হবে অর্থাৎ অমূলক ও অবান্তর, মনগড়া কোনও বিষয় নয় তথ্য সহযোগে, উদাহরণসহ পাঠ্য বিষয় উপস্থাপন করতে হবে।

চ। শিক্ষকের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে, অর্থাৎ পাঠদান করতে হয় বলে করছি এমন মনোভাব নিয়ে চললচে কখনোই তা সফল হয় না। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা। তাকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।

ছ। সহানুভূতিশীল হতে হবে শিক্ষককে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে। কখনই নেতিবাচক কোন মন্তব্যের মাধ্যমে তার মনোবল ভেঙে দেওয়া চলবে না। সবসময়ই একটি গঠনমূলক ভাবের আদান প্রদান করতে হবে।

বিবেকানন্দের মতামতে এই ভাবেই শিক্ষকের আদর্শ, শিক্ষকের গুণাবলী, সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা, নীতিগল্পের মাধ্যমে মানুষের শিক্ষা ও অভিব্যক্তির কথা বলে গিয়েছেন। শিক্ষাই পারে একজন সমাজ তথা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর এই উপদেশগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দ নানাভাবে তার বিভিন্ন বক্তৃতা, রচনা ও গল্পের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতিও মূল্যবোধ এর এই সোপানগুলিকে ব্যক্ত করেছেন। শতাব্দী প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে তিনি সমগ্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে তিনিবুঝেছেন শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদণ্ড। কেবল অন্তর্কলহ, দৌর্বল্য, পরনির্ভরশীলতা দিয়ে একটি জাতি কখনোই উঠে দাঁড়াতে পারে না। তাঁর শিক্ষাদর্শন বেদান্ত ও বিজ্ঞানের একটি মিলিত রূপ। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের যে স্বরূপ তার সঙ্গে প্রাচ্যের মূল্যবোধ, দর্শনের মিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কখনও তিনি পুরাণের সহায়তা নিয়েছেন, কখনও বা বাস্তব অভিজ্ঞতার সহায়তায় প্রাচ্য ধর্ম, প্রাচ্য সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন ভারতীয় মূল্যবোধের নিরিখে। মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় শিক্ষা থেকেই। তাই শিক্ষার কথা, শিক্ষাগুরুর কথা উঠে এসেছে বারবার। পরাধীন, অভুক্ত, অসহায় ভারতবর্ষের উঠে দাঁড়ানোর একমাত্র ভরসা ছিল শিক্ষা। নিজের সংস্কৃতিকে, নিজের মূল্যবোধকে জানা, চেনা ও অনুধাবন করা ছিল অত্যন্তপ্রয়োজনীয় বিষয়। সেই চেনানোর চেষ্টাই করে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার জন্য সারা ভারতবর্ষ তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র :

১। স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৩, ৩২ তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬।

২। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (সমগ্র খণ্ড), ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৩, ৩৮ তম পুনর্মুদ্রণ ২০১৬।

৩। স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্তিযোগ, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৩, ৫৭ তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৮।

৪। স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৩, ২১ তম পুনর্মুদ্রণ ২০১৬।

৫। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৩, ৫৬ তম পুনর্মুদ্রণ ২০১৭।

৬। স্বামী গম্ভীরানন্দ, যুগনায়ক বিবেকানন্দ (দ্বিতীয় খণ্ড), ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৩ ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯৫।

৭। স্বামী গম্ভীরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা (অখণ্ড), ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৩, ১১ তম পুনর্মুদ্রণ ২০১৭।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি নাটক ও বিশ্বায়ন প্রসঙ্গ

সুদীপ মণ্ডল

সংক্ষিপ্তসার:

[প্রগতি আধুনিকতা তথা বিশ্বায়ণ মানুষের সুস্থ সংস্কৃতির ভাবনা চেতনা গ্রাস করে নেয়, পণ্য পৃথিবীর বিকৃত অগ্রগতি অবরুদ্ধ করে দেয় মানুষের বিবেক, মনুষ্যত্ববোধকে। হারিয়ে যায় মানুষের স্বাতন্ত্র্য। বর্তমান প্রযুক্তি ও বিশ্বায়িত পরিবেশে দ্রুত পরিবর্তমান মানসিকতায় আমাদের অর্থনীতি, সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিবাদী কর্পোরেট সংস্থাগুলি। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'সেলফোন', 'ভাইরাস' ও 'অক্টোপাস লিমিটেড'-এর মতো নাটকগুলি হয়ে ওঠে তার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদের দিশামুখ। প্রাত্যহিক প্রতিযোগিতামুখর আত্মকেন্দ্রিক পৃথিবীতে ক্রমশ মানবিকতা, ভালোবাসা প্রভৃতি অনুভূতিগুলি হারিয়ে যেতে থাকা অবস্থান থেকে মানুষকে সচেতন করার দায়বদ্ধতায় বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে উক্ত নাটকগুলির নিবিড় বিশ্লেষণই এ প্রবন্ধের অভিমুখ।]

সূচকশব্দ:

পণ্য,বিশ্বায়ন,বাজার,পুঁজিবাদ,ঐতিহ্য,সংস্কৃতি,প্রযুক্তি,মানবিকতা,প্রলোভন,কর্পোরেট

প্রতিপাদ্য বিষয় :

প্রাগাধুনিক দেববাদ নিয়ন্ত্রণ পেরিয়ে বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে একবিংশ শতকে আজ আমরা এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে যেখানে মানুষ একবিংশ শতকে যেখানে মানুষ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে তার মনন-চিন্তা-যুক্তি। দ্রুত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে উঠতে মানবিকতা, মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে মানুষ পরিণত হচ্ছে ফাঁপা মানুষে। মানুষের জীবন-যাপন, আচার- আচরণ, ভাষা ব্যবহারে লেগেছে বিশ্বায়নের ছোঁয়া। সময়ের সাথে সাথে পাল্টে যাচ্ছে ঐতিহ্য সংস্কৃতি সব কিছুই। মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে চলতি বাজারের নিরিখে। শৈশব থেকে মাল্টিপ্লেক্স কালচারে বিপন্ন হচ্ছে শিশুর সুস্থ ভবিষ্যৎ। সবই আজ বিপণনযোগ্য। বাজার, পণ্য, বিনিয়োগ, মুনাফা প্রভৃতি শব্দগুলি মানুষের চেতনে এমনভাবে ঢুকে পড়েছে যেখানে বিনষ্ট হচ্ছে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। নিষ্পক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ছে। মানুষ প্রলোভিত, প্রভাবিত হচ্ছে বিশ্ববাজার দ্বারা। প্রতিযোগিতার আড়ালে প্রায় বিলীয়মান মানুষের বিশ্বাসবোধ। মানবের কাঙ্ক্ষিত ক্রমমুক্তি তো নয়ই বরং মানব সমাজকে অক্টোপাশের থাবায় গ্রাস করে নিয়েছে এই বিশ্বায়ন বা বাজার। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের

উন্নয়নশীল দেশে এই বিশ্বায়ন ভাবনা ঢুকে পড়ে ১৯৯১ সালে মুক্ত অর্থনীতির হাত ধরে। ক্রমশ বদলাতে থাকে এদেশে জনজীবনের খোলনলচে। আর এই বিশ্বায়ন ভাবনা তথা দুর্ভাবনা কীভাবে ফুটে উঠেছে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে; ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের আগ্রাসন, বিশ্ববাজার তথা বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে তৈরি হওয়া মানুষের বিভ্রম কতটা বিচলিত করে, ভাবিয়ে তোলে তাঁকে, তাঁর লেখা 'সেলফোন', 'ভাইরাস' ও 'অক্টোপাশ লিমিটেড' নাটক তিনটির নিরিখে সে বিষয়েই আলোচনা করব আমরা পরবর্তী অংশে।

নয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারত তথা কলকাতায় টেলি যোগাযোগে বিপ্লব ঘটে যায় মোবাইল আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। ক্রমশ বিগত দুই দশকে এই মোবাইল প্রযুক্তির উন্নতি, মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও ব্যবহার্যতায় বর্তমান নবীন প্রজন্মের কাছে এই মোবাইল লাইফ স্টাইলের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। 'সেলফোন' নাটকে উঠে আসে সেই মোবাইল আসক্তির কথা। পার্কে হেঁটে যাওয়া দুই তরুণ-তরুণীর প্রেমের অবলম্বন হয়ে ওঠে আধুনিক এই যন্ত্রটি। সুস্থ-স্বাভাবিক প্রেমের সম্পর্কও কীভাবে যন্ত্রনির্ভর হয়ে ওঠে তা প্রকাশ পায় তরুণ যুবকের বক্তব্যে। পার্কে পাশাপাশি হাঁটা সত্ত্বেও মোবাইলে কথা বলার কারণ হিসেবে সে জানায়—

আমার তো ওর নর্মাল গলার চেয়ে ফোন-এর গলাটাই শুনতে ভালো লাগে। আমাদের ফোনে একটা ভয়েস চেঞ্জার সফটওয়্যার লাগানো আছে। তবে আমাদের ভয়েসের পিচ আর টিম্বার লেভেল অ্যাডজাস্ট করে একটা সুপার কোয়ালিটি আউটপুট পাচ্ছি। ফোনে ওর ভয়েসটা তাই দারুণ ভেলভেটি অ্যাণ্ড প্যাশোনেট লাগে।[১]

জীবনকে আরও স্পাইসি, আরও উপভোগ্য করে তুলতে বিনিময়ে তারা যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। অবশ্য আজকের 'ডিজিটাল এনভায়রোনমেন্টে' সেলফোনের ব্যবহারকে অস্বীকার করা যায় না। বিকুর কথাতেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

এটা আজকের মানুষের পার্সোনাল পোর্টাল— আমি দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি, পৃথিবীটাও আমার সঙ্গে কনটাক্ট রাখতে পারে। এ জিনিস ছেড়ে থাকার কথা ভাবা যায় ?[২]

যন্ত্রটি ভীষণ দরকারি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু যেভাবে এই 'ফোনসভ্যতা মানুষকে গ্রাস করছে, টেকনোলজি মানুষের ফোকাসকে নষ্ট করে দিচ্ছে, বিকারগ্রস্ত করে তুলছে, ধৈর্য্য, স্থিরতা হারিয়ে ফেলছে মানুষ প্রৌঢ় চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই দিকটাই তুলে ধরতে চেয়েছেন নাটককার।

এই ফোন অ্যাডিকশান -এর ফলে একটা সময় ফোন সমেত বিকুর ডান হাতটা কানে সেঁটে যায়। কিছুতেই সে ছাড়াতে পারে না। নাটকে আসে মগজহীন আনডেড জোম্বিদের প্রসঙ্গ। যারা বিকুকে নিজেদের দলের সদস্য করে নিতে চায়। এদের দয়া-মায়া নেই, ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই। আসলে এই জোম্বি তো পুঁজিবাদী শক্তির, বিশ্বায়ন তথা বাজারের নামান্তর-যারা মানুষের মানবাত্মাকে বিক্রি করে, স্বাধীনতাকে হরণ করে। আগ্রাসী বিশ্বায়নের বক্তব্য তুলে ধরে জোম্বি স্কোয়াড—

আমরা যা ভাবাই, কেবল সেটা ভাবে। তোমার ভাবনাচিন্তা আমরাই যুগিয়ে দেব। ভালোমন্দ কিছুই তোমাকে বুঝতে হবে না— আমরাই বুঝিয়ে দেব।[৫]

অস্বীকার করবার উপায় নেই আজ আমরা প্রত্যেকেই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় এই বিশ্বায়নের দ্বারা প্রভাবিত। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় তা এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যেখান থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় নেই। জীবনের প্রতিটি দিকের মতো গণমাধ্যমেও থাবা বসিয়েছে এই বিশ্বায়ন। বিশেষ করে টেলিভিশন নামক মিডিয়া দানব কীভাবে বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে রেখেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে একাধিক টেলিভিশন চ্যানেল, যেগুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মূলত বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা। যেখানে খবরের তুলনায় অধিক গুরুত্ব পায় চ্যানেলগুলির লাভ-লোকসানের দিকটি। তার ওপর আছে এই সমস্ত চ্যানেলগুলিতে নিত্যনতুন বিজ্ঞাপনের চমক। ফলত টেলিভিশন চ্যানেলগুলি এমনভাবে মানুষের অন্দরমহলে ঢুকে তাদের পণ্যমোহজাল বিস্তার করছে। তার ফলে আচ্ছন্ন হচ্ছে, সংক্রমিত হচ্ছে মানুষের চৈতন্য। আর মিডিয়ার এই ম্যাজিক্যাল তাণ্ডবের বিরুদ্ধেই দরদী প্রতিবাদ দেখি 'ভাইরাস' নাটকে। দেশ-কাল-সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যখন গভীরতর অসুখ ক্রমশ ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে মানুষের বিবেককে তখন এই বিকৃত, আতঙ্কময় পরিস্থিতিতে ফাঁপা অন্তঃসারশূন্য মিডিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আঘাত হানে মধ্যবিত্ত যুবক তাপস।

একদিন টেলিভিশনে সংবাদ পাঠক তাপস হঠাৎ করেই খবর পড়তে পড়তে তীব্র বিতৃষ্ণায় শ্রোতা দর্শকদের উদ্দেশ্যে ফিউরিসাসলি বলে ওঠে— 'আপনারা দয়া করে টিভি বন্ধ রাখুন'— তার কথামতো এই টেলিভিশন জি (জিউলিবিলিটি) ভাইরাস ছড়াচ্ছে বহুদিন ধরে এবং আমরা প্রত্যেকেই এই ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি। এই জিউলিবিলিটির অর্থ তাপসের মতে কোনো কিছু ভাবনা চিন্তা না করে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা— আমরা এই ভাইরাস দ্বারাই আক্রান্ত। আসলে যে গণমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভ মনে করা হয় সেই গণমাধ্যমও বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলির বাণিজ্যিক স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু তাই নয়, ভাবতে অবাক লাগে— 'নব্য উদার মুক্ত বাজার নীতির ফলে যেমন টেলিভিশন কেন্দ্রের এবং কেবল ও ডিজিটাল উপগ্রহ টেলিভিশন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও বহুজাতিক মালিকানা তৈরি হয়েছে।'[৬] তেমনি ' এই চ্যানেলগুলি বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলির আয়ের উৎস। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হলিউডের বড় স্টুডিওগুলো ২০০২ সালে তাদের চলচ্চিত্র গ্রন্থাগারের জন্য ১১ বিলিয়ন ডলার আয় করবে শুধু গ্লোবাল টেলিভিশন স্বত্ত্ব থেকে যা ১৯৯৮ সালে ছিল ৭ মিলিয়ন ডলার।'[৭]

টিভির পর্দায় আসলে যা দেখানো হয় তা এক বিশেষ এনভায়রোনমেন্ট ক্রিয়েট করে, 'তা রিয়াল নয়— তা একটা আর্টিফিসিয়াল ইমেজ, একটা টেকনিক্যাল ইভেন্ট।'[৮] এর ফলে মানুষ এমনভাবে প্রভাবিত হয় ও বিশ্বাস প্রবণতা গড়ে ওঠে দ্বারা টিভির পর্দায় ভেসে ওঠা বিজ্ঞাপনের কনটেন্দট নয়, তার টেকনিক্যাল দিকটই তাদের আকৃষ্ট করে ও অন্ধবিশ্বাসের ভাইরাস সুপরিকল্পিত ও সুকৌশলে ছড়িয়ে পড়ে। দিনরাত টিভিতে চলতে থাকা প্রোগ্রামগুলিতে সাংস্কৃতিক খাদ্য পরিবেশিত হয় যেগুলি— 'নিছকই এন্টারটেনমেন্ট, কোনোভাবেই এনলাইটমেন্ট নয়'।[৯] আর তাই—

দর্শককুল যখন নিজ অঞ্চলে প্রস্তুত অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করছেন তখন গ্লোবাল মিডিয়া কর্পোরেশনগুলি হতাশায় পলায়ন না করে তাদের প্রয়োজনাকেই বিশ্বায়িত করছে।[১০]

এর ফলে মানুষের বিচার বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে, রুচিও ভোঁতা হয়ে পড়ে। জীবনযাপনের হালচালে এক ধরণের সুপারফিসিয়াল লাইফস্টাইল আমদানি করা হচ্ছে এবং তাতে মদত দিচ্ছে এই মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি। ফলে—

কোনো বিশেষ ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশ্য ব্যতীত এবং নিজ অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়ে মিডিয়া মিশ্রণগুলি শুধুমাত্র অর্থরোজগার করার জন্য লঘু পলায়নমূলক বিনোদন প্রচার করে।[১১]

শুধু মিডিয়ার এই বিষময় ফলের প্রচারেই এ নাটক শেষ নয় বরং যুক্তি, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, বিবেকের অধিকারী তাপসের একক বিদ্রোহ আছে এই বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে। যদিও তার এই সামান্য প্রতিবাদে কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদের কিছু যায় আসে না উল্টে তাপসের ভাগ্যেই জোটে মস্তিষ্ক বিকৃতির তকমা। তবুও শেষ পর্যন্ত তাপসের কথায় থাকে আমাদের বোধশক্তি না হারিয়ে ফেলার কথা আর থাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সুস্ত সমাজ গড়ে তোলবার আকুতি। শিশুদের শৈশব থেকেই সর্বনাশ করবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের দিকে ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় জানান —

শিল্পীর সব থেকে বড় সম্পদ ছিলো যে, তাকে কেনা যায় না। তার এই অহংকারটা ছিল। কিন্তু আজকের বিজ্ঞাপনদাতারা, স্পনসররা প্রমাণ করেছে হ্যাঁ তাকে কেনা যায়। এইখানেই তার পতন। যে কোনো শ্রেষ্ঠ মানুষকে চড়া দাম দিতে পারলে তাকে এনে ধূপকাঠিও বিক্রি করানো যায়। আমি বলছি পরিণাম গিয়ে ওই দাঁড়ায় — দেখতে পাই যে সৌরভ গাঙ্গুলী ড্রিংকসের বিজ্ঞাপনে মরুভূমিতে গড়াচ্ছে আর কপিল বিজ্ঞাপনে জুতো বিক্রি করছে। এই বেদনা আমার মনের মধ্যে জাগে, এই বেদনা থেকেই লিখেছি 'অক্টোপাশ লিমিটেড।[১২]

যেখানে শিল্পীর শিল্পসত্তা বিক্রি হয়ে যায়, হারিয়ে যায় তার নিজস্ব স্বাধীনতা, বহুজাতিক ব্রান্ড, কর্পোরেট সংস্থার লোভনীয় আকর্ষণে আটকা পড়ে স্টার আইকনরা সেখানে সাধারণ মানুষ তো বটেই এমনকি মানুষের একান্ত নিভৃত অনুভূতি ভালোবাসাও যে পণ্যে পরিণত হবে সএটা অবাক হওয়ার মতো কিই-বা এমন কথা কর্পোরেট সংস্থাগুলির বাজার দখলের দাপটে ভালোবাসা আজ বিপননের সামগ্রী। তাই 'অক্টোপাস লিমিটেড' নাটকে অক্টোপাশ লিমিটেডের এজেন্ট মরালিটির পেটে গুলি মারতে বলে। চাকরিহীন বেকার যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যতের সংসারের সুখস্বপ্নকে তারা নিলামে চড়ায়। প্রলোভন দেখায় তাদের জীবন বদলে দেওয়ার—

১। দরিদ্র বেকার যুবক যুবতীর স্পনসর্ড বিবাহ, তৎসহ পাঁচ বছরের জন্য স্পনসর্ড বিবাহতি জীবন! আঃ, মারভেলাস।[১৩]

কোনো সংস্থা সাধারণ মানুষের কত কাছের সেই প্রতিযোগিতায় তারা মেতে ওঠে 'গিভ অ্যাণ্ড টেক পলিসি'র গেমে—

২। ভেবে দখুন আমরা কেবল নামী-দামীদের কথাই ভাবছি না— আমরা সবার জন্য। আপনাদের জন্যও দরজা খুলে দিলাম।[১৪]

বোঝা যায় এই বহুজাতিক সংস্থাগুলিই হয়ে উঠছে দেশের মানুষের ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রক। তাই গর্বের সাথে এজেন্ট তাদের বোঝায়—

৩। পৃথিবীর যত নামিদামী প্লেয়ারস, অ্যাথলিস্ট, অভিযাত্রী, শিল্পী— সব হাতে পায়ে গায়ে জামায় টুপিতে এই লোগো লটকে রেখেছে। পৃথিবীতে আজ সেরা অলংকার আমাদের লোগো। যাবতীয় শিল্পকর্মের ফেস্টিভ্যাল, ফাংশান, ওয়ার্ল্ডকাপ, মায় অলিম্পিকের আসরে আমাদের পতাকা তুলতে না চাইলে অমন জাঁকিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না। খালি শিল্পী, খেলোয়াড়— ভেবে দেখুন দেশটাও স্পনসররা চালাচ্ছে কি না![১৫]

অদ্ভুত সরস হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়ে উঠে আসে বর্তমান অর্থনীতি, পণ্য পৃথিবীর গভীর সত্য। যদিও নাটকের শেষে নাটককার মুক্তির কোনো দিশা দেখান না। অবশ্য নির্দেশক মলয় ঘোষের নির্দেশনায় এ নাটকের অভিনয় করে 'সুখচর পঞ্চম' নাট্যদল 'দিস প্রোগ্রাম ইজ স্পনসর্ড বাই' নাম দিয়ে। সেখানে অবশ্য নাটকের শেষে দেখা যায় ওই দুই যুবক যুবতী স্পনসরদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসে। আসলে কোনো কিছুর বিনিময়েই জীবন, মনুষ্যত্ব কেনা যায় না।

যন্ত্র সভ্যতা, হকারি মিডিয়ার অদ্ভুত দাপট, পুঁজিবাদি মদতপুষ্ট বিকৃত Multi culture -এর প্রকারান্তরে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের ভাবনা-চিন্তা, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ। চিন্তা ও বোধে ঘটছে যুক্তির বিশৃঙ্খলা যার ফলে পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মানবসভ্যতাই— 'ধুলোয় লুটাচ্ছে মানবতা, যুক্তি, প্রগতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঐক্যবোধ।[১৬] বর্তমান সময়ে অগ্রগতির জন্য আমাদের প্রযুক্তির প্রয়োজন কিন্তু বিশ্হরে আগ্রাসী শক্তি বাজারের কাছে আমরা যেন দাসত্ব না গ্রহণ করি— এ বিষয়ে বোধ যুক্তি ও সচেতনতা প্রয়োজন। গান্ধীজি বলেছিলেন, 'খোলা জানালা দিয়ে বাইরের বাতাস আসতে দেওয়া সেটা নিশ্চয় জরুরি, কিন্তু সে হাওয়ায় যেন আমাদের পায়ের তলার মাটি সরে না যায়, সেটা দেখাও সমান জরুরি।'[১৭]জানালা বন্ধ করা এখন সম্ভব নয় তাই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মতো আমরাও মনে করি পণ্য পৃথিবীর বিজ্ঞাপনী মোড়কের বিভ্রমে মোহিত না হয়ে সুস্থ ভাবনায় আগামী পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক; সেটাই হবে কাম্য নব জীবনের গান।

তথ্যসূত্র :

১। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সেলফোন, দশকথা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৯, কলাভৃৎ পাবলিশার্স, পৃ. ৭৬।

২। তদেব, পৃ. ৭৯।

৩। তদেব, পৃ. ৯৫।

৪। তদেব, পৃ. ৯৮।

৫। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ভাইরাস, পৃ. ১৩১।

৬। রবার্ট ডব্‌লু ম্যাকচেসান, বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম, অমিয়কুমার বাগচী (সম্পা.), বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা, পঞ্চম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৮, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৯৬।

৭। তদেব, পৃ. ১৯৬।

৮। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ভাইরাস, পৃ. ১৩৮।

৯। তদেব, পৃ. ১৩৮।

১০। রবার্ট ডব্‌লু ম্যাকচেসান, বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম, অমিয়কুমার বাগচী (সম্পা.) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৯।

১১। তদেব, পৃ. ১৯৯।

১২। সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, সাজাতে চেয়েছ তুমি মানুষেরে, মানুষের প্রিয় ঘরখানি, তপনজ্যোতি দাস (সম্পা.), মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, রঙ্গপট নাট্যপত্র, ২০১২, পৃ. ৩৭০।

১৩। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অক্টোপাস লিমিটেড, মোহিত চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত নাটক সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৮৩।

১৪। তদেব, পৃ. ৮৬।

১৫। তদেব, পৃ. ৮৩।

১৬। মোহিত চট্টোপাধ্যায় উত্তর আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিক নাটক, মোহিত চট্টোপাধ্যায় : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৬৬।

১৭। কে. এন. পানিক্কর, বিশ্বায়ন, সংস্কৃতি ও পণ্যায়ন, অমিয় কুমার বাগচী (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩২৩।

জাতীয় রাজনীতিতে বাঙালি নেতৃত্বের আধিপত্যের অবসানের কারণ (১৯১১-৪৭) : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

অলোক বিশ্বাস

সারসংক্ষেপ :

বঙ্গীয় নবজাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সূচনা। ফলে প্রাথমিক পর্বের জাতীয়তাবাদ ও মুক্তি আন্দোলনে বাঙালি নেতৃত্বের প্রভাব ও আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। ১৯০৫ খ্রিটাব্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল জাতীয় রাজনীতিতে বাঙালি নেতৃত্বের প্রভাব ও আধিপত্যের সর্বোচ্চ পর্যায়। কিন্তু এরপর থেকে জাতীয় রাজনীতিতে বাঙালি নেতৃত্বের গুরুত্ব কমতে থাকে। ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের ফলে এই আধিপত্যের অবসানের সূচনা। তবে জাতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর উত্থান বাঙালি নেতৃত্বের আধিপত্বের অবসানের মূল কারণ ছিল। ব্রিটিশ শাসনের শেষ দেড় দশকে বাঙালি নেতৃত্বের প্রাদেশিক বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ এই আধিপত্যের অবসানকে সুনিশ্চিত করে।

সূচক শব্দ :

উপনিবেশ, জাতীয়তাবাদ, রাজনীতি, প্রভাব, বাঙালি, নেতা।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা ও প্রসার এবং সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙ্গালি নেতৃত্বের অবদান সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। এক্ষেত্রে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাংলার জাগরণ-ই ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত হয়ে ভারতীয় জাগরণের রূপ নিয়েছিল। জাতীয়তাবাদ ও ভারতের মুক্তি আন্দোলন ওই জাগরণেরই ফসল। স্বাভাবিক ভাবেই উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে বাঙ্গালি নেতৃত্বের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসবিদরা সাধারণভাবে একমত যে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল জাতীয় রাজনীতিতে বাঙ্গালি নেতৃত্বের আধিপত্যের সর্বোচ্চ বিন্দু। কিন্তু বিশ শতকের শুরু থেকে, বিশেষ করে ১৯১১ সালের পর থেকেই

কংগ্রেস সংগঠনে ও কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনে বাংলা তথা বাঙালি নেতৃত্বের গুরত্ব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। গান্ধী যুগের শুরু থেকেই (১৯১৭) ওই চিত্র আরও সুস্পষ্ট হতে থাকে। ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন করা পর্যন্ত তিন দশকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া জাতীয় রাজনীতিতে অন্য কোনও বাঙ্গালি নেতার তেমন প্রভাব বা গুরুত্ব ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দেড় দশকে সর্ব-ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙ্গালি নেতৃত্ব তার প্রাধান্য হারিয়ে জাতীয়তাবাদী মূল স্রোতধারার রাজনীতি থেকে ছিটকে পড়ে। কেন ও কীভাবে জাতীয় রাজনীতিতে বাঙালি নেতৃত্বের ভূমিকা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল বর্তমান প্রবন্ধে তা অনুসন্ধান করা হবে।

মূল বিষয় :

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বাংলায় রাজনৈতিক চেতনার উম্মেস হয়। রাজা রামমোহন রায় বাংলা তথা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আন্দোলন (১৮২৩), বিচারের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ (১৮২৭), ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও দাবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের যে ধারার সূচনা করেন সেই ধারা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এমনকি ১৮৪৯ সালের ‘কালা কানুন’ (black acts) বিরোধী যে আন্দোলন বাংলায় শুরু হয়েছিল তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। উনিশ শতকে ভারতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, ইংরেজ শাসনের প্রতি মোহভঙ্গ এবং ১৮৮৫-তে কংগ্রেসের জন্মের পিছনে যে কারণগুলি কাজ করেছিল তার অন্যতম প্রধান ছিল শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবিদ্বেষ ও দম্ভ এবং তার বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতীয়দের তীব্র ক্ষোভ ও আন্দোলন। ইলবার্ট বিল আন্দোলনের (১৮৮৩) বহু পূর্বে রামমোহন রায় বৈষম্যমূলক জুরি অ্যাক্টের বিরুদ্ধে যে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা ওই সময় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। বাংলায় শুরু হলেও বর্ণবিদ্বেষ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) ঘটনাটি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যতখানি গুরুত্ব পেয়েছে, তার তুলনায় ১৮৭৬ সালে কলকাতায় ভারত সভা-র প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৮৩-তে কলকাতার আহূত প্রথম সর্ব-ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন কম গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ১৮৭৭ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত যে কয়টি গুরুতবপূর্ণ প্রশ্ন এবং দাবীকে কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় আন্দোলন হয়েছিল তার সব কয়টির উদ্যোগ ও নেতৃত্ব ছিল ভারত সভার। এমনকি প্রথম সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের উদ্যোগও নিয়েছিল ভারত সভা। ওই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। প্রকৃত অর্থেই এটি ছিল সর্বভারতীয় সম্মেলন।

ভারতসভা ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর নেতারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় জনমত গঠন এবং ইংরেজ সরকার ও পার্লামেন্টের গোচরে তা আনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন যখন কলকাতার আহূত হয় তখন তারা তাদের দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন কলকাতার পৃথক ভাবে করার পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল মোট দশবার—১৮৮৬, ১৮৯০, ১৮৯৬, ১৯০১, ১৯০৬, ১৯১১, ৯১১৭, এবং ১৯২০, ১৯২৮ ও ১৯৩৩ সালে। অর্থাৎ ১৮৮৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন বসেছিল মোট ছয় বার। একই সময়ের মধ্যে বাংলা থেকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল আট বার। অর্থাৎ ১৮৮৫ থেকে ১৯১১, মোট ২৭ বছরের মধে কংগ্রেস সভাপতি পদে বা কংগ্রেস অধিবেশন স্থল রূপে নির্বাচিত হয়ে বাংলা এবং বাঙালি বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা পেয়েছিল ১৪ বার। কিন্তু বাংলার সেই গুরুত্ব এরপর থেকে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল। এর একাধিক কারণ ছিল। জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমেই সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল। স্বভাবতই আন্দোলন ও সংগঠনের স্বার্থে অন্যান্য স্থানে কংগ্রেস আধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া ন্যায় এবং যুক্তিসঙ্গত ছিল। এমনকি একটি বিশেষ অঞ্চল বা প্রদেশ থেকে সভাপতি নির্বাচিত না হয়ে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সভাপতি নির্বাচন কাম্য ছিল।[১] কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের প্রভাব ও আধিপত্যের অবসানের মূল কারণ ছিল তিনটি। এগুলি হল : (১) ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর। (২) বাংলা ও বাঙ্গালির প্রতি রাজরোষ এবং বাংলার গুরুত্ব হ্রাসের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। (৩) গান্ধীযুগে প্রথমে চিত্তাঞ্জন দাশ ও পরে সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া গান্ধীজির নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনও বড়োমাপের সর্ব-ভারতীয় নেতার আবির্ভাব না হওয়া।[২]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনরূপে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলেও ক্রমে সারা দেশে স্বদেশী জাগরণের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। বাংলার সীমানা অতিক্রম করে স্বদেশী চিন্তাধারা দেশের অগণিত মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। ওই আন্দোলনের তীব্রতা ও বৃহত্তর রাজনৈতিক মতাদর্শ ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। কিন্তু এইসব কিছু সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যাবেনা যে, বঙ্গভঙ্গ সার্বিকভাবে রদ করা সম্ভব হয়নি। বাংলার ভৌগলিক এবং প্রশাসনিক সীমা সঙ্কুচিত হয়েছিল ১৯১১ সালে। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তে কলকাতা শহর তথা সমগ্র বাংলার যে মর্যাদাহানি হয়েছিল, গুরুত্ব কমে গিয়েছিল তা অনস্বীকার্য।[৩] এই বিষয়টি কিন্তু তৎকালীন বাঙালি ও অন্যান্য প্রদেশের নেতাদের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাংলা এবং বাঙালি নেতৃত্তের গুরুত্ব হ্রাসের সূচনা ১৯১১ সালে হয়েছিল একথা মনে করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে।

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ ও চরমপন্থীদের কংগ্রেস ত্যাগ করা পর্যন্ত কংগ্রেসে বাংলার নেতাদের যে বড়ো রকমের ভূমিকা ও প্রভাব ছিল তা সুস্পষ্ট। সুরাট অধিবেশনের পর কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজন দেখা দেওয়ার ফলে কংগ্রেস সংগঠন ও আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি সুরাট কংগ্রেসের পর থেকেই কংগ্রেস সংগঠনে বাঙালি নেতৃত্বের প্রভাবও কমতে থাকে। অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর মতে, "চরমপন্থী মতাদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি এবং চরমপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি হলেও ১৯১৬ সালে লখনৌ কংগ্রেসের পূর্বে চরমপন্থীদের কংগ্রেস সংগঠনে এবং রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনের নীতি ও তা কার্যকর করার ব্যাপারে কোনও সক্রিয় ভূমিকা ছিল না"।[৪] ১৯১৬ সালে চরমপন্থীদের প্রত্যাবর্তন ঘটলেও ১৯১৯ সালের মধ্যেই কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ও নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা গান্ধীজীর হাতে ন্যস্ত হয়। পূর্বতন মডারেট দল প্রথমে 'লিবারেল' নাম গ্রহণ করে, ক্রমেই অবলুপ্ত হয়ে যায়। 'নরমপন্থী' মতাদর্শও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের পরবরতী সময় থেকে গান্ধী যুগের সূচনা পর্যন্ত তিনজন কংগ্রেস সভাপতি বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন— ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৯১৪), সাত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (১৯১৫) ও অম্বিকাচরণ মাজুমদার (১৯১৬)। ১৯১১ সালে কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছিল কলকাতায়। ১৯১৭ সালে কলকাতায় আবার কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেসন বসে অ্যানি বেসান্তের সভাপতিত্বে। এর মধ্যে একমাত্র ১৯১৬ সালের লখনৌ অধিবেশন ছাড়া কোনও অধিবেশনই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তেমন পরিচিতি পায়নি, যদিও সভাপতির ভাষণগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল।[৫]

১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে আন্দোলনের পদ্ধতি ও প্রকরণ নিয়ে নরমপন্থী-চরমপন্থী বিভাজনের মধ্য দিয়ে দলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। অবশেষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংসাই কংগ্রেসের মৌল নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে যে ভিন্নপন্থীরা এই নিয়মতান্ত্রিক অহিংস আন্দোলনের পথকেই একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি, তাদের মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্তের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।[৬] তারা ক্রমশ কংগ্রেসের বাইরেকার সংগ্রামী আন্দোলণের ধারার সঙ্গে যুক্ত হন বা বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র ধারার সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। এবং এই প্রক্রিয়াই কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি গড়ে ওঠে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের একটি বিল্পবী ধারা- ব্রিটিশ শাসক যার নাম দিয়েছিল 'সন্ত্রাসবাদ'। এই আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের চরমপন্থীদের একাংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ গড়ে অথে। শ্রেণিগত ভাবে সংগ্রামীরাও ছিলেন মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির। মহারাষ্ট্রে গোপন সংগঠন ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা হলেও বাংলাই হয়ে ওঠে এই আন্দোলনের পীঠস্থান। প্রধানত মধবিত্ত শ্রেণির উদ্যোগে ও অংশগ্রহণেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'অনুশীলন সমিতি'। অন্যদিকে বারীন ঘোষ, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রকাশ করেন বিপ্লববাদী সাপ্তাহিক

'যুগান্ত'। বড়লাটকে হত্যার ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে প্রফুল্ল চাকী আত্মঘাতী হন আর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সেই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাবার জন্য ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের এক পরিকল্পনা জনৈক সহযোগীর বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে যায়। সেপ্টেম্বর-এ বালেশ্বরের জঙ্গলে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যতীন্দ্রনাথ মুখপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বীরের মৃত্যু বরণ করেন। প্রবাসেও যে বিপ্লবীরা নানা সংগঠন গড়ে তোলেন তাদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভুপেন্দ্রনাথ দত্তের মতো বাঙালিরা ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ধারা, গঠন ও মতাদর্শগত ভিত্তি ছিল অনেক বেশি পরিণত। রুশ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের সাফল্যের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। ১৯২৪ সালে রামপ্রসাদ বিসমিলের সঙ্গে যোগেশ চ্যাটার্জী, শচীন্দ্রনাথ সান্যালের মতো প্রবীণ বাঙালি বিপ্লবীদের নেত্রিত্ত গঠিত হয় 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টি'। পরে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত শিব ভার্মা, ভগত সিং ও শুকদেবের মতো তরুণ বিপ্লবীরা সংগঠনটির নাম দেন 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি'। ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভার কক্ষে ভগত সিং ও বাটুকেশ্বর দত্ত বোমা নিক্ষেপ করেন। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় সূর্য সেনের ফাঁসি হয়। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ হানা দিয়ে শহীদ হন বিনয়, বাদল, দীনেশ। সশস্ত্র বিপ্লবীদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করলেও তা গণ আন্দোলনে পরিণত হতে পারেনি। ফলে দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তা শেষ পর্য্যন্ত সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তাছাড়া এই বিপ্লবী আন্দোলনগুলি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও মূল সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের বাইরেকার আন্দোলন ছিল বলে বিপ্লবী নেতাদের জাতীয় রাজনীতিতে কোনও প্রভাব ছিল না।

গান্ধীজী কংগ্রেস সংগঠন এবং কংগ্রেস পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক হওয়ার পর দুজন মাত্র বাঙ্গালি এবং প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের নেতা কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রথমজন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি ১৯২১ এবং ১৯২২ সালে কংগ্রেস সভাপতি হন। অন্যজন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি ১৯৩৮ সালে হরিপুরা এবং পরের বছর ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। বাংলার সাথে ভারতীয় রাজনীতির বিভেদ আরম্ভ হয় চিত্তরঞ্জন দাশের সময় থেকেই। গোপীনাথ সাহা নামে এক বিপ্লবী যুবক পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট মনে করে মিস্টার ডে নামে এক সাধারণ ইংরেজ চাকুরেকে চৌরঙ্গীর ওপর গুলি করে হত্যা করে ১৯২৪ সালের ২২ জানুয়ারি। ফলে তার ফাঁসি হয়।[৭] সে বছর পয়লা জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন বসে এবং সেই অধিবেশনে কংগ্রেস যে প্রস্তাব নেয় তাতে এই ধরনের ঘটনার ও হিংসার নিন্দা করা হয় এবং গান্ধীজী প্রদ্রর্শিত অহিংসা আন্দোলন সমর্থন করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোপীনাথ সাহার আত্মদানের সাহসের প্রসংসা করা হয় যদিও তাকে বিপথচালিত বলা হয়। এই রেজলিউশান নিয়ে

গোলমাল বাঁধে ২৯ জুনের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে এবং সেখানে সমস্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয় ও মিস্টার ডে-র পরিবারকে শোকবার্তা পাঠানো হয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের শত চেষ্টাতেও গোপীনাথ সাহার ফাঁসির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়নি। বাংলার সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস থেকে সরে আসার এই শুরু আর তা সম্পূর্ণ হয় সুভাষ বসুর পদত্যাগের পরে। বাঙ্গালি নেতৃত্ব কিন্তু নিজে দূরে সরেনি, তার ভারতীয় জাতীয়তাবোধে কোনও খাদ ছিলনা, আজও নেই— তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গান্ধীবাদীদের ঠেকাতে চিত্তরঞ্জন মতিলাল নেহরুকে সঙ্গে নিয়ে স্বরাজ্যবাদী গ্রুপ করলেন— গান্ধীজি প্রমাদ গুনলেন। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যু তাঁকে সুযোগ এনে দিল- কলকাতায় এসে নেতৃত্বহীন স্বরাজ্যবাদীদের তিনি ভেঙ্গে দিলেন। সুভাষ বসু রইলেন জেলে এবং তারপর ইউরোপ-এ নির্বাসনে।

১৯৩৫ সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট পাস হল এবং দেশকে সাম্প্রদায়িক ভাবে ভাঙ্গা হল— আংশিক স্বায়ত্বশাসন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দিয়ে, আর সবটাই হল গান্ধীজী ও কংগ্রেসের সম্মতিতে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হল বাংলার এবং এই আইনের ফলে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। বাংলার তৎকালীন আদমসুমারিতে যদিও শতকরা ৪৮ ভাগ হিন্দু ও ৫২ ভাগ মুসলমান ছিল তবুও নানা রকম প্যাঁচ কষে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হল— কেউ প্রতিবাদ করল না— না কংগ্রেস, না বাঙ্গালি হিন্দু নেতারা। এর পরের নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি সব থেকে বেশি আসন পেল কিন্তু একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল না। ফাজলুল হক চাইলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে কোয়ালিশন সরকার গড়তে— কিন্তু এবারও বাধ সাধলেন গান্ধী এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। তারা বললেন কংগ্রেস কোয়ালিশনে যাবে না— অথচ আসামে এবং সিন্ধু প্রদেশে যথাক্রমে কোয়ালিশন এবং বাইরে থেকে মুসলিম লিগকে সমর্থন করলেন।[৮] হতাশ ফাজলুল হক মুসলিম লিগের সঙ্গে কোয়ালিশনে গেলেন- জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা মৌলবাদীদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে হাত মেলালেন এবং বাংলার হিন্দুদের বাদ দিয়ে মুসলিম সরকার ক্ষমতায় এল। মাত্র তিন মাস পরে গান্ধী মত পালটালেন এবং বললেন কোয়ালিশন হোক - কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে এবং বাংলাকে দুভাগ করার প্ল্যান এগিয়ে গেছে। যদি চিত্তরঞ্জন বেঁচে থাকতেন, যদি স্বারাজ্যবাদীরা থাকতেন, যদি সুভাষ বসু দেশে থাকতেন, যদি বাংলার কংগ্রেসে বলার মতন কোনও নেতা থাকতেন, যদি বিদ্রোহ করেও কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে হাত মেলাতেন, তাহলে ঘটনা প্রবাহ কোন খাতে প্রবাহিত হতে পারত ? ইতিহাসে অবশ্য যদি এবং কিন্তু (Ifs and Buts)-এর কোনও স্থান নেই। ১৯৩৭ সালে দেশে ফিরে সুভাষচন্দ্র বসু তার পরেও চেষ্টা করেছিলেন— নলিনীরঞ্জন সরকারকে লিগ মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করিয়ে মুসলিম লিগকে চাপে ফেলে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনে যেতে

বাধ্য করতে। গান্ধীজী প্রথমে এতে সম্মতি জানিয়ে পরে বাধা দিলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ গান্ধীজী ও কংগ্রেসের ইতিহাস এক কলঙ্কজনক অধ্যায় যাতে বলিপ্রদত্ত হয়েছে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালি এবং যার ট্র্যাজিক হিরো— সুভাষচন্দ্র বসু।

সুভাষচন্দ্র বসু কোন পরিস্থিতিতে ও কীভাবে হরিপুরা ও ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, কেন তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন সে ঘটনার ইতিহাস কারোর অজানা নয়। "গান্ধী-সুভাষ মতান্তর ও বিরোধ বাঙালির মানসিকতার এমন একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং ছাপ ফেলেছিল যা আজও সম্পূর্ণ দূর হয়নি বা মুছে যায়নি।"[৯] ভাবপ্রবণ বাঙালি মন গান্ধীজীর প্রতি সকল শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁর সুভাষ বিরোধিতাকে ভুলতে পারেনি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের গান্ধী যুগে বাঙালি নেতৃত্বের ভূমিকা প্রসঙ্গ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর নামই সর্ব প্রথমে মনে আসে। এই দু'জনকে বাদ দিলে ১৯২১ সালের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভূমিকা জাতীয় স্তরে কংগ্রেস অপেক্ষা বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অবশ্য অসহযোগ অন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বাংলার দেশপ্রেমী মানুষ অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছিল। আত্মত্যাগ ও জীবনদান করেছিল। কিন্তু সেই আত্মোতসর্গের ইতিহাস মূলত আঞ্চলিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

জাতীয় রাজনীতি থেকে বাঙালি নেতৃত্বের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার অন্য একটি কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জয়া চ্যাটার্জী। তার মতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দেড় দশকে সর্ব-ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলা তার প্রাধান্য হারিয়ে জাতীয়তাবাদী মূল স্রোতধারার রাজনীতি থেকে ছিটকে পড়ে। ঐ সময় 'ভদ্রলোক রাজনীতি' ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে এবং ক্রমাগতভাবে প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে থাকে। বাংলার সমাজে অন্যান্য প্রতিপক্ষ গ্রুপের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে নিজেদের সবার্থ রক্ষায় আগে থেকেই সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন ভদ্রলোকেরা রাজনীতিকে ক্রমাগতভাবে অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক আদর্শিক কাঠামো বিনির্মাণ করল সেটা জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে গেল না, সেই সঙ্গে তারা সেটাকে বিপরীত দিকে নিয়ে গেল।[১০]

উপসংহার :

জাতীয় রাজনীতিতে একঘরে হওয়ার ফল বাংলার পক্ষে ভাল হয়নি। এই নিজ গৃহে পরবাসী হওয়ার ফলে বাঙালিকে প্রচুর রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্য দিতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এই দূরত্ব কিছুটা ঘোচে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়। কিন্তু ততদিনে যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দেশভাগে এবং প্রচণ্ড উদ্বাস্তুর স্রোতে বাংলার নাভিশ্বাস উঠেছে। যদি বাঙালি নেতৃত্ব জাতীয় রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে না পড়ত; যদি জাতীয় কংগ্রেসে বাঙালি নেতৃত্বের আধিপত্য ও প্রভাব খর্ব না হত; যদি বাঙালি নেতৃত্ব প্রাদেশিক বিষয়ে অতিমাত্রায়

মনোনিবেশ না করত; যদি বাঙালি হিন্দু নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ত তাহলে হয়তো দেশভাগের মত বেদনাদায়ক ও করুণ পরিণতি নাও হতে পারত।

তথ্যসূত্র :

১। স্বপন বসু, হর্ষ দত্ত (সম্পা.), বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা, পুস্তক বিপনি, ২০১৫, পৃ. ৫৪-৫৫।

২। পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৫।

৩। পূর্বোল্লিখিত।

৪। পূর্বোল্লিখিত।

৫। পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৬।

৬। খোকন কুমার বাগ, রঙ্গঙ্কান্তি জানা, সম্পা, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালিঃ অন্তরমহল, কলকাতা, রক্তকরবী, ২০১৭, পৃ. ১০৩।

৭। দেশ, ২১ অক্টোবর, ১৯৯৫, বর্ষ ৬২, সংখ্যা ২৫, সম্পা, সাগরময় ঘোষ, পৃ. ৫১।

৮। পূর্বোল্লিখিত।

৯। স্বপন বসু, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৬।

১০। জয়া চ্যাটার্জী, বাঙলা ভাগ হলঃ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ, ১৯৩২-১৯৪৭, অনু, আবু জাফর, কলকাতা, এল এলমা পাবলিকেশনস, পৃ. ভূমিকা ২-৩।

নিঃসঙ্গ নায়কের সন্ধানে বুদ্ধদেব গুহ-র 'সমুদ্রমেখলা'

অনিমেষ কুমার মাহাত

সারসংক্ষেপ :

এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই নিঃসঙ্গ। নির্জন প্রকৃতির মতো মানুষ ব্যক্তিত্বের গভীরে নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। এই নিঃসঙ্গতা ঋণাত্মক নয়, ধনাত্মক, জীবনকে গভীরভাবে পাবার, উপভোগ করার আধার। বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ এই নিঃসঙ্গতার আত্মিক উপলব্ধিতে সৃষ্টি করেছেন 'সমুদ্রমেখলা'র আহুক চরিত্র। বাংলা সাহিত্যে যে চরিত্রটি অবিস্মরণীয় একলা পথিক। তারই পরিচয় 'সমুদ্রমেখলা', তারই স্বর ও সুর এই উপন্যাসের শব্দ বাক্য, জীবনপ্রবাহ।

সূচক শব্দ :

অপত্যবোধ, আস্তানা, নিঃসঙ্গতা, প্রলেপ, জিন্দা দিল, মন-মৌজি, এলোমেলোমি, বাচাল, রিকিঝিকি, মেগাপড।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

মানব সত্তার দুটো দিক আছে সঙ্গতা ও নিঃসঙ্গতা। নিঃসঙ্গতা জীবনের একটা অঙ্গ। বিশেষত মানুষ একই সঙ্গে নিঃসঙ্গ ও সঙ্গতার বেড়ায় আবদ্ধ। মানুষ একদিকে সামাজিক অন্যদিকে প্রবল পরিমাণে ব্যক্তিক। আমরা যখন পূর্ণরূপে সামাজিক হয়ে উঠি তখন সঙ্গতা লাভ করি। আবার যখন আমাদের একটা চিরায়ত নিঃসঙ্গ সত্তা, ব্যক্তিগত আবেশ উপলব্ধি করি তখন নিঃসঙ্গতা থাকে। একদিক থেকে দেখা যায় প্রতিটি মানুষই নিঃসঙ্গ কারণ প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে সেখানে তার আর কেউ সঙ্গী নেই। ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ সমুদ্রমেখলা উপন্যাসে এই নিঃসঙ্গ সত্তাকে তুলে ধরেছেন।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে সমুদ্রবেষ্টিত সুনীল জলরাশির মধ্যে ছোট্ট একটি দ্বীপ হল 'দ্য হর্ণেটস নেস্ট'। জীবনের সায়াহ্ন বেলায় এই দ্বীপে এসে বসবাস করছে উপন্যাসের নায়ক আহুক। আহুক যে বাংলোতে থাকে তা কাঠের ছয়টি মোটা থামের উপর প্রায় এক মানুষ উঁচু চালা। তার উপর একটি মাত্র ঘর, তিনদিকে ঘোরানো বারান্দা কাঠের রেলিং দেওয়া। ঘরের মাথায় কাঠের ফ্রেম ও করোগেটেডের শিট দেওয়া। ভিতরে বাঁশের চাটাই এর ফলস সিলিং দেওয়া। বড় বড় জানালা, একদিকের দেওয়ালে শুধু কাঁচ। আহুক এখানেই একা থাকে। এই দ্বীপেই থাকে ভীরাপ্পান তাঁর

সহযোগী হিসেবে।

আহুকের চিন্তাভাবনার মধ্যেই ভীষণ একাকীত্ব লক্ষ করা যায়। জীবনের সায়াহ্নবেলায় পৌঁছে ভাবেন যে তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতার ছিটেফোঁটা তুলে দিয়ে যাবেন তাও হবার নয়। আসলে মানুষের চরিত্র এমনি যে অন্যের শিক্ষাতে শিক্ষিত হতে কেউ চায় না। যা তাঁরা শেখেন তা নিজস্ব সঠিক-নির্ভুল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। আহুকের যেমন অন্যের কাছে কিছুই শেখা হয়নি তেমনি নিজের জীবনভর অভিজ্ঞতার কথা শেখানোও হয়নি কাউকে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় কেউ শিখতেও চায়নি। অগোছালো, এলোমেলোই একদিন আহুকের জীবনের নিশান ছিল। আন্দামানের এই নির্জন দ্বীপে এসে তিনি এই এলোমেলো, অগোছালো জীবনকে ভয় পান। তাঁর স্ত্রী টিটিঙ্গি খুবই গোছানো প্রকৃতির ছিল। জীবনের সব জায়গায় পা ফেলার আগে তিনি বার বার ভাবেন, সাহস হয় না, শরীরের বল কমে গেছে, রিপুরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। এই পৃথিবীকে ছেড়ে যাবার আগে আহুক নিজেকে, নিজের পরিবেশ প্রতিবেশকে একটু গোছগাছ করে যেতে চান। নিঃসঙ্গ নির্জন সমুদ্রের ধারে এসে মনে হয়েছে—

"এই সংসারের কার যে কোনটা গুণ আর কোনটা দোষ তা যখন বোঝা উচিত তখন আদৌ বোঝা যায় না। বোঝা যায় অনেকদিন পরে। যখন সে মরে যায়, কী ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তখন ভুল শোধরাবার আর উপায় থাকে না কোনও।... অন্যকে বুঝতে বুঝতেই জীবন শেষ হয়ে যায়। প্রত্যেকেরই জীবন। সময়ে যদি বোঝা যেত তবে কী সুন্দরই না হতো সকলেরই জীবন।"[১]

আহুক বোস ভাবেন সমদ্রের সঙ্গে তাঁর যেন কোথাও মিল আছে। তাই তাঁর মনে হয়েছে—

"সমুদ্র এবং তাঁর নিজের একলা বুকেও এপর্যন্ত অনেকই এঁটেছে। জীবনে অনেকই পেয়েছেন সমুদ্র এবং আহুকও। কিন্তু কোনও প্রাপ্তিকেই তাঁদের ক্ষুদ্র মালিকানার ঘেরাটোপে শুধুমাত্র নিজেদেরই কুক্ষিগত করে রাখবার মতন নীচ মনোবৃত্তি ছিল না তাঁদের দুজনের কারোই। যা কিছুই সমুদ্র নেয়, তা আবার ফিরিয়েও দেয় অবলীলায়, সম্পূর্ণ নির্মোহভাবে। সে ফুলই হোক, কী শব।"[২]

ঔপন্যাসিক সমদ্রের নির্জনতার সঙ্গে আহুকের জীবনের নির্জনতাকেও তুলে ধরেছেন সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিতে।

আহুক যে পাখির খোঁজ করতে এই দ্বীপে এসেছিলেন তার দেখা পায়নি এবং মনে মনে ভাবেন যে, আর হয়তো দেখাও পাবেন না। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন তিনি। প্রত্যেক মানুষই সারা জীবন ধরে কোনো না কোনো পাখি খোঁজে। সেই পাখি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। কেউ তার পাখিকে পায়, কেউ পায় না, কিন্তু পাখি সকলেই খোঁজে। প্রথম যৌবনের অভ্যাসবশে সে নগ্ন না হয়ে শুতে পারে না। বাতিঘরের চাবুকমারা আলোকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। কারণ এই আলো শুধু তাঁর শরীরই নয় মনের নিভৃত ঘরেও উঁকি মারে, গোপনীয়তাকেও ছিঁড়ে খুঁড়ে

দেয়। পাশ বালিশ ব্যবহার করতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে যায় প্রেমিকা ফিরদৌসীর কথা। আহুক এই মুসলমান জাতির বড় ভক্ত ছিলেন। কারণ বড় জিন্দা দিল, মন-মৌজি জাত এই মুসলমানেরা। চারিদিকে সমুদ্রঘেরা এই নির্জন দ্বীপে থাকেন বলে সুখেই আছেন আহুক। নানারকমের সুখে। তাঁর মনের বনের মধ্যেই যেসব চেনা-অচেনা অন্য প্রাণীদের বাস তারা ছাড়া বাইরের কেউই পারে না তাঁর শান্তি নষ্ট করতে। নানারকম অসংলগ্ন ভাবনার এলোমেলোমির অলি-গলিতে হারিয়ে যায়। কাল সকাল ওর জন্য সুন্দর কিছু বয়ে নিয়ে আসবে নতুন কিছু। প্রতি রাতেই মাঝরাতে উঠে যখন দ্বিতীয়বার ঘুমোতে যান তখন এইসব ভাবনা আসে। তাঁর মনে পড়ে যায় হাজারীবাগের নীপুদিদির কথা। তেইশ বছর বয়সে এই নীপুদিদি মারা গেছে। এই নীপুদিদি আহুককে খুব ভালোবাসত—

"জীবনে অনেক নারীর ভালোবাসাই পেয়েছেন আহুক আজ অবধি কিন্তু সে এক অন্যরকম ভালবাসা, ভোরের শুকতারার মতন।"[৩]

সমুদ্রে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে সন্ধ্যার সময় নীল সবুজ জলরাশি যখন বিষণ্ণ কালো হয়, সন্ধ্যাতারা ওঠে দিগন্তে তখন নীপুদিদি জলের নীচ থেকে কথা বলে আহুকের সঙ্গে। আর এই সমুদ্রের মধ্যেই সে টুনা মাছের প্রেমে পড়েছে।

আন্দামান দ্বীপের নির্মম নির্জনতার রহস্য মানুষকে ভয় পাওয়ায় আবার অনাবিল আনন্দ জাগায় আহুক সেই আনন্দ পেয়েছে এই নির্জনতার মধ্যে। তাই তো সে রংকিনীকে বলেছে দেখার চোখ থাকলে সব কিছুই দেখা যায়। এই নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা ছাপিয়ে দেখা গেছে মনের গহন গভীরে যৌবনের সেই প্রেমিকার কথা, স্ত্রী টিটিঙ্গির কথা, চিচিঙ্গির কথা, নীপুদিদির কথা। সেই নির্জনতা উপভোগ করতে ছুটে এসেছে চুমকি সেই দ্বীপে। চুমকির কাছে আহুক বোস একজন পূর্ণ মানুষ, ফাইন জেন্টেলম্যান। রংকিনীর মনে হয়েছে আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা ছাড়া কেমন করে একজন মানুষ এইভাবে একাকী থাকতে পারে।

মানুষ পরিচয় আহুকের জীবন থেকে কবেই হারিয়ে গেছে। সে যেন একজন দ্বীপবাসী কোনো প্রাণী, কোনও বনমানুষ। শহুরে মানুষের জীবন থেকে পূর্ব এবং পূর্বাপর জ্ঞান অবলুপ্ত হয়েছে। শহুরে মানুষের জীবন থেকে, একদিন যেসব সাধারণ এবং প্রাকৃতিক সব আনন্দে মানুষ-মানুষী অভ্যস্ত ছিল তার সবকিছুই এখানে অন্তর্হিত হয়েছে। এখানের নির্জনতা যেন ডাক দেয় সকলকে। তাই তো রংকিনী নানা অসুবিধা সত্ত্বেও জঙ্গলভরা দ্বীপে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন আহুক বোস। তাই জীবনের সেই অভিজ্ঞতার কথা বলেছে রংকিনীকে—

"তোমাদের মতো প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া বিশেষ হয়নি, যা শিখেছি তা নানা দেশ ঘুরেই। ট্রাভেলিং ইজ দ্যা বেস্ট এডুকেশান। যদি অবশ্য চোখ-কান-নাক খুলে ট্র্যাভল করো।"[৪]

রংকিনীকে এই দ্বীপে পেয়ে মনে হয়েছে সেশ্যেলসে হানিমুনে যাওয়ার কথা।

আহুকের নিঃসঙ্গ জীবনে হঠাৎ যেন যৌবনের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে রংকিনী। যৌবনের আবেশ দেখা দিলেও নিজের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে তিনি সচেতন থেকেছেন। তাই সচেতনতার সঙ্গেই বলেছে—

"আমি যে তোমার বাবার বয়সী। কোনও বাবার বয়সী মানুষ কি পারে মেয়ের বয়সী কারো সঙ্গে জীবনে দৌড়তে? তাকে সুখী করতে?"[৫]

সমুদ্রঘেরা এই নির্জন দ্বীপের রবিনসন ক্রুসো আহুক বোস চৌত্রিশ বছর বয়সী রংকিনীর শরীরের মধ্যে এক অননুভূত রিকিঝিকি অনুভব করেছে। আহুকের মনে রংকিনীর শারীরিক সৌন্দর্য অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের মর্যাদা লাভ করেছে, যা কোনো পারি-শহরের বিউটিশিয়ানের পার্লারেও কোনো অর্থমূল্যে পাওয়া যাবে না। এই প্রসাধন শুধু যার চোখ আছে দেখার শুধু সেই এই প্রসাধন চিনতে পারে, অন্য কেউ পারে না। তাই তো আহুকের মনে হয়েছে টিটিঙ্গি যদি বিয়ের পর কোনো সন্তান জন্ম দিত তাহলে তা রংকিনীর সমবয়সী হতো। তাঁর মধ্যে কোথাও যেন এক পিতা হওয়ার কামনা লুকিয়ে ছিল। রংকিনীকে দেখে সেই বাসনা জেগে উঠেছে। নিজের সন্তান নেই তাই অপত্যবোধ কাকে বলে তা জানার সুযোগ হয়নি এজীবনে। এক গভীর বোধ থেকে তিনি এজীবনে বঞ্চিত রয়ে গেলেন। তাই তিনি সব বয়সী নারীকেই নারীর পূর্ণ মহিমায় প্রেমিক হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত।

আহুকের জন্মবৃত্তান্তও নিঃসঙ্গতার রহস্যে আবদ্ধ। জ্যৈষ্ঠ মাসের কোনো এক পূর্ণিমার রাতে ইছামতি নদীতে হাঁড়ির ভেতর থেকে যে শিশুর কান্না শোনা যাচ্ছিল সেই শিশুই হল আহুক বোস। তাঁর পালিতা মা সেখানে স্নান করতে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে পালন করেছে। সেই পালিতা মায়ের নিজস্ব কোনো সন্তান ছিল না। এই যে অজ্ঞাত জন্মপরিচয় বার বার আহুকের মনকে নাড়া দিয়েছে। দ্য হর্ণেটস নেস্ট দ্বীপে এসে সে শহুরে জীবন থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছে। এখানে কোনো খবরের কাগজ আসেনা, ইলেকট্রিসিটি নেই, টিভি, রেডিও নেই, পৃথিবীর দৈনন্দিন ঘটনার সংবাদ তাঁর মানসপটে জাগে না। কারণ এই নির্জন দ্বীপে সেই সংবাদ পৌঁছে না। তাঁর মতে ঘড়ি হল যত সব নষ্টের গোড়া, যা সব আনন্দ নষ্ট করে দেয়। তাই এই দ্বীপে এসে সে ঘড়ি ও ক্যালেণ্ডার বর্জন করেছে। জন্মদিন কবে তা জানতে পারে না, তবে মৃত্যুদিন জানবে শুধু ভীরাপ্পান আর সামুদ্রিক পাখিরা যারা তার শবের উপর বসবে। এই যে নির্জন সমদ্রে একাকী বসবাস করার ফলে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর গভীর জীবনদর্শন প্রকাশ পেয়েছে।

চুমকির মতে আহুক বোস অন্য ধরনের মানুষ। আহুক প্রতিদিন সকালবেলা নিজের আস্তানা ছেড়ে পূর্বদিকে সকালবেলার সূর্যকে স্বাগত জানান। তিনি কারো কাছে কোনোদিন মাথা নত করেননি। তবে তাঁর হৃদয়েশ্বর, ভুবনেশ্বর, সদানুভূত ঈশ্বরের কাছে সবসময় নতমস্তক থাকেন। তাঁর মধ্যে বিরহ বিধুর ভাবনা ভেসে উঠেছে বিভিন্ন সময়ে—

"সেলুলার জেল শুধু আন্দামানেই নেই, বন্দীরা শুধু সেখানেই অত্যাচারিত হননি নির্মম ভাবে, সেই জেল আছে প্রত্যেক মানুষেরই বুকের মধ্যেও। সেই জেলে সে নিজেই বন্দি, নিজেই জেলার, নিজেই ফাঁসির আসামী। এবং ঘাতক।

বিরহী মন, বিরহী দ্বীপ, বিরহী সমুদ্র বুকের মধ্যে কেন জানেন না, ভোরের পুবালি বাতাসের মতো মুঠো মুঠো দুঃখ বয়ে আনে। অথচ এ দুঃখ কোনও মানুষকেই ক্লিষ্ট করে না বরং স্নিগ্ধ করে। এ দুঃখের শেষ একদিন নিশ্চয়ই হয় সব মানুষের জীবনে। শেষ হওয়ারই কথা। কারণ, এ অশেষ নয় বলে।"[৬]

প্যাডক গাছের বন, চিড়িয়া টাপ্পু, ওয়াণ্ডুরুর থেকে শুরু হওয়া সুন্দরী ম্যানগ্রোভ বনভূমি, পাহাড়ময় দ্বীপের গাছ, জলিবয় দ্বীপের নীলমেখলা, প্রবালমালা, সবই থাকবে। স্কিন্ক দ্বীপপুঞ্জের পাঁচ বোনেরা প্রতিদিন খেলবে যখন ভাঁটা পড়বে। সমুদ্র পেরিয়ে পায়ে হেঁটে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে নববিবাহিত দম্পতিরা হাতে হাত রেখে হেঁটে যাবে। সমুদ্রের গন্ধ, সাদা-পেটের ঈগল-দম্পতির চকিত তীক্ষ্ণ ডাক, মেগাপড পাখিদের স্বপ্ন সবই থাকবে কিন্তু থাকবে না শুধু আহুক নিজে। এই সুন্দরকে ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে বড় বিষণ্ণ বোধ করেন। তাই তাঁর মনে হয়েছে—

"নিজেকে কোনওদিন তেমন ভালবাসেননি তিনি। আজও বাসেন না। হয়ত বাসতেন, যদি তাঁকে কেউ তেমন করে ভালবাসত। একমাত্র ভালবাসাই অন্য ভালবাসার জন্ম দিতে পারে। আনন্দই, অন্য আনন্দর।"[৭]

এই প্রকৃতিকে আহুক বোস ভালোবাসেন। একমাত্র প্রকৃতিই এই আদিম এবং চিরকালীন সুন্দরী, তাঁর ভালবাসাকে দশ গুণ করে ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই ভালবাসার জন্যই একা এই সমুদ্রমেখলা দ্বীপে তিনি ছটি বছর অতিবাহিত করেছেন। তাঁর মনের বিভিন্ন ভাবনাগুলো ভেঙে যাওয়া ঢেউয়ের মতো মনের বিবাগী বেলাভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে, সেই ভাবনাগুলিকে কুড়িয়ে নিতে বড়ই অনীহা আসে। তাঁর মনে হয় যে গেছে তা একেবারে চলে গেছে, সেগুলি আর ফিরে আসবে না, তাঁর অনেক ঠগী প্রেমিকাদের মতোই যারা তাঁর সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা খেলেছে। কেউ তাঁকে বোঝেনি। নির্জনতা ও একাকিত্ব তাঁকে অনেক কিছু ফিরিয়ে দিয়েছে, যা কিছু তিনি হারিয়েছিলেন। ওয়াল্ট হুইটম্যান, হেনরি ডেভিড থোরো, ন্যুট হামস্যুন, শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সকলের কাছ থেকেই তিনি নির্জনতা আর প্রকৃত আনন্দর পাঠ নিয়েছেন। সুখের আর আলসেমির পাঠ নিয়েছেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল এর কাছ থেকে। জীবনে আহুক অনেকদিন অনেক কাজ করেছে, কাজকে ভয় পাননি। সমুদ্রের সঙ্গে কথা বলে, হাওয়ার সঙ্গে কথা বলে, গাছের সঙ্গে কথা বলে, মাছের সঙ্গে কথা বলে এবং বাচাল মানুষদের সঙ্গে কথা না বলে দিন কাটিয়ে দেয়। তাঁর জীবনের দুঃখ শুধু একটাই। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে একদিন তার আর বেশি দিন নেই। শুধু তিনিই থাকবেন না। কত আপনজনকে বিদায় দিয়েছেন। তবে নিজেকে এই আশ্বাসবাণী দিয়েছে যে পরজন্ম বা যদি স্বর্গ

থাকে তবে আবার দেখা হবে। দ্বীপের নির্জনতা তাঁর একাকীত্বের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে—

"এখানের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য নির্জনতা। নির্জনতা তোমাকে কখনও খালি হাতে ফেরায় না। কী বনে, কী জীবনে।"[৮]

আহুকের পরিচিতি নিঃসঙ্গ রহস্যময়তায় ঘেরা। তাই সে কখনো রোমান্টিক মানুষ, অন্য ধরনের মানুষ, খেলুড়ে পুরুষ, ভারী চমৎকার অসাধারণ একজন মানুষ, ভারসেটাইল জিনিয়াস আবার কখনো ENDEMIC। আহুকের মনে হয় সে জংলা দ্বীপের মতো জংলি। আবার কখনো নিজেকে দুর্বুদ্ধিজীবীদের তালিকাভুক্ত করেন। রংকিনীর মনে হয়েছে—

"এখানে বছরের পর বছর একা থেকেও এত ভাললাগা-ভালবাসা বেঁচে আছে প্রকৃতির প্রতি, পরিবেশের প্রতি মানুষটার। আশ্চর্য! পরমুহূর্তেই ভাবল, এই গভীর ভালবাসা না থাকলে কি এমন আনন্দে এই নিভৃত ভয়াবহ নির্জনতাতে তিনি এতো দীর্ঘদিন আদৌ থাকতে পারতেন? তারপর ভাবল, কে জানে! মানুষটা হয়তো কোনও খুন-টুন করেছেন। স্মাগলার-টাগলার, নয় ফেরারী আসামী। সেলুলার জেল থেকেই পালানো নয়তো? জেলখানা থেকে না হলেও হয়ত পালাতে চাইছেন কোনও মানুষের কাছ থেকে, কোনও বিশেষ কোলাহলের জীবন থেকে। অথবা কে জানে! হয়ত নিজেরই কাছ থেকে। নইলে কী করে সম্ভব হয় এমন করে থাকা?"[৯]

আহুক গান শুনতে ভালবাসে। গীতবিতানের প্রতিটি গানের বাণীই তাঁর মুখস্ত। তবে সব থেকে কষ্টের বিষয় হচ্ছে বিধাতা তাঁর গলায় সুর দেননি। তাই আহুক যারা গান জানে তাদের ঈর্ষা করে। রংকিনীর সঙ্গে কোনো আনচার্টেড দ্বীপে গিয়ে থাকার কথা মনে হয়েছে। যেখানে কেউ থাকবে না শুধু রংকিনী আর আহুক। রংকিনীর সঙ্গে সন্তান-সন্ততির কথা বলতে গিয়ে আহুক চেয়েছে রংকিনীর মতো সুইটি পাই মেয়ের কথা। একদিকে সে নিঃসঙ্গতা উপভোগ করতে চাইছে অপরদিক থেকে কামনা জেগে উঠেছে। আর এই নিঃসঙ্গতার জন্যই পিতৃসত্তাকে জাগ্রত করেছে।

দৈহিক নিঃসঙ্গতায় বড় কথা নয় আত্মিক নিঃসঙ্গতায় বড় কথা। একদিকে প্রকৃতির সঙ্গতা থাকলেও মানব সমাজের দিক থেকে সে নিঃসঙ্গ। আন্দামান দ্বীপের নির্জনতার সঙ্গে নিঃসঙ্গ নায়কের হৃদয় একাত্ম হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব গুহ সবসময় তাঁর কাহিনির মধ্যে একটা অন্য কোনো অচেনা জগতের আলো বিকিরণের প্রচেষ্টা করেন। তাঁর গল্প, উপন্যাসগুলি পড়লেই মনে হয় সেখানে আলাদা ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয় সে 'কোয়েলের কাছে', 'ঝাঁকিদর্শন' আর 'সমুদ্রমেখলা'-ই হোক। আমাদের পরিচিত ধরা-বাঁধা নিয়মের বাইরে একটা অন্য পরিবেশ রচনা করতে চান। আর সেই জন্যই তিনি এই ধরনের নায়ক চরিত্রগুলিকে বেছে নেন তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে।

তথ্যসংকেত :

১) গুহ বুদ্ধদেব – সমুদ্রমেখলা, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ১৯৬৪, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা – ৩২-৩৩।
২) গুহ বুদ্ধদেব – সমুদ্রমেখলা, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৪, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা – ৩৩।
৩) গুহ বুদ্ধদেব – সমুদ্রমেখলা, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৪, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা – ৩৫।
৪) গুহ বুদ্ধদেব – সমুদ্রমেখলা, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৪, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা – ৬০-৬১।
৫) গুহ বুদ্ধদেব – সমুদ্রমেখলা, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৪, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা – ৬১।
৬) গুহ বুদ্ধদেব – সমুদ্রমেখলা, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৪, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা – ৭৩।
৭) গুহ বুদ্ধদেব – সমুদ্রমেখলা, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৪, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা – ৭৪।
৮) গুহ বুদ্ধদেব – সমুদ্রমেখলা, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৪, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা – ৮২।
৯) গুহ বুদ্ধদেব – সমুদ্রমেখলা, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৪, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা – ১০০।

হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মহামিলন পার্বণ : ‘গোবর্ধন’ বা ‘অন্নকূট’ উৎসব

অঞ্জন কর

ভূমিকা :

শ্রীমদ্ভগবত গীতা রচিত শ্রেষ্ঠ গোপন উপদেশ বাণী ‘সর্ব ধর্মান পরিত্যাজ মা মে কং স্মরণং ভজ’।

শ্রীমদ্ভগবত গীতার দশম স্কন্ধের নবম ও দশম অধ্যায়ে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বশ্যতা স্বীকার স্বরূপ দাস বন্ধন লীলা বর্ণিত হয়েছে। যা আসল পুরাণ শ্রীমদ্ভগবতে বিধৃত লীলাদির প্রভূত রস আস্বাদন করেছেন বৈষ্ণব আচার্যগণরা। লীলাপুরুষোত্তম ভগবান “শ্রীকৃষ্ণ” ভৌম লীলায় অনেক চমকপ্রদ লীলা প্রদর্শন করেন।

ভাগবত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ পাহাড়ের প্রতিনিধিত্ব ও একটি ধর্মীয় স্মরণ হিসেবে, হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা সারা ভারতবর্ষ সহ বিদেশে ‘গোবর্ধন’ বা ‘অন্নকূট’ পুজো উদযাপন করা হয়ে থাকে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় গৌড়ীয় ‘শ্রীচৈতন্যদেব’ এবং ‘স্বামীনারায়ণ’ সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব।



চিত্র ১ :- গিরিরাজ গোবর্ধন (wikimedia)

পৌরাণিক কাহিনি :

"গোবর্ধন" পুজো বা "অন্নকূট" পুজো হিন্দুদের বৃহত্তর একটি উৎসব। অন্নকুট কথাটির অর্থ ("খাদ্যের পাহাড়")। এই পুজো সাধারণত দীপাবলি উৎসবের চতুর্থ দিনে পড়ে। গোবর্ধন পুজোর দ্বারা ভক্তরা পাহাড় ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পূজার্চনা করে থাকেন।

ধর্মীয় কাহিনি অনুসারে, হিন্দু পুরাণে কৃষ্ণকে বিশ্বাস করে বৃন্দাবনবাসীরা ইন্দ্রদেবের উপাসনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গরীব বৃন্দাবনবাসীকে ইন্দ্রের পুজোতে যে বহু ব্যয় বিলাশিতা তা বন্ধ করে গরীব মানুষদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে বলেন। আর তখন ইন্দ্রদেব চটে গিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ে বৃন্দাবনকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে চান। সেই সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের কোপ থেকে রক্ষা করার জন্য ভগবান কিশোর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের উপর অনায়াসেই গোবর্ধন পর্বতটিকে ধারণ করেছিলেন।

ব্রজের মানুষেরা সাতদিন ধরে, এই পাহাড়ের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলো। এবং সেখানেই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা গোবর্ধন পুজো শুরু করেন। জগতে সবার অন্তরাত্মায় বাস শ্রীকৃষ্ণের। প্রচলিত আছে, গিরি গোবর্ধন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ।

গোবর্ধন পূজা উদযাপন :

মথুরা-বৃন্দাবন সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে দীপাবলির অঙ্গ হিসেবে পালিত হয় "গোবর্ধন" পূজা। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে এই গোবর্ধন পুজোর বিধান রয়েছে। ভক্তের বিপদে ভগবান কিভাবে এগিয়ে আসেন, তারি উদাহরণ এই পূজার দ্বারা লক্ষণীয়।

উল্লেখ্য, ভগবান গিরি গোবর্ধনের পুজোর আয়োজন সকালে করা হয়ে থাকে। এবং এই পুজো শুভ মুহূর্ত ধরেই হয়ে থাকে।

গোবর্ধন পূজার অনেক রূপ রয়েছে। আচারের একটি রূপের মধ্যে একটি দেবতা ("ভগবান শ্রীকৃষ্ণ") অনুভূমিক অবস্থানে গোবর থেকে তৈরি করা হয়। মাটির প্রদীপ, মোমবাতি, অন্ন, মিষ্টান্ন, ইত্যাদি এবং ভোগ সহকারে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। মহিলারা উপবাস করেন। ভগবান গোবর্ধনের কাছে ভক্তরা আশ্রয় প্রার্থনা করেন।[১]

অন্নকূট উৎসব :

"অন্নকূট" গোবর্ধন পুজোর সময় সম্পাদিত একটি প্রধান অনুষ্ঠান। যদিও কিছু গ্রন্থে গোবর্ধন পূজা ও অন্নকূটকে সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে গোবর্ধন পূজা হলো দিনব্যাপী অন্নকূট উৎসবের একটি অংশ।[২]

প্রসঙ্গক্রমে বলি যে, "গোবর্ধন" পূজা ও "অন্নকূট" উৎসবের সঙ্গে জড়িত আছে কালীপূজার অন্নভোগের বিষয়টিও।



চিত্র ২ :- Diwali & Annakut Celebration, Edison, (NJ)

অন্নকূটের আচারপ্রথা :

দীপাবলির চতুর্থ দিনে "অন্নকুট" পালন করা হয়। দীপাবলির সাথে অন্নকূটের আচার-অনুষ্ঠানগুলি নিবিড়ভাবে জড়িত। যদিও দীপাবলির প্রথম তিন দিন হল ধন-সম্পদ পবিত্র করার জন্য প্রার্থনার দিন এবং ভক্তের জীবনে বৃহত্তর সম্পদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে অন্নকূটের দিনটি হলো কৃষ্ণের কল্যাণের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন।

ছাপান্ন ভোগ :

"অন্নকূট" উৎসবের শুভদিনে ভক্তরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে "ভোগ" হিসেবে নিবেদনের জন্য ৫৬ বা ১০৮ প্রকারের বিশেষ ধরনের সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়াকেই অন্নকূট বলা হয়ে থাকে।

এই ভোগগুলির মধ্যে ভক্ত (ভাত), স্যুপ (ডাল), প্রলেহ (চাটনি), সাদিকা (তরকারি), দধি-শাকের তরকারি, শিখারিণী, শরবত, মোরব্বা, বলকা (বাটি), চিনির মিষ্টান্ন, বড়া, মধুযুক্ত মিষ্টান্ন, পুরী, মালপোয়া, জিলিপি, পায়েস, মোহনভোগ, ফল, তাম্বুলের মতো ৫৬ প্রকারের ভোগ নিবেদন করা হয়।

নিরামিষ খাবারের বিস্মৃত বিন্যাস ঐতিহ্যগতভাবে দেবতাদের সামনে স্তরে বা ধাপে ধাপে সাজানো হয়ে থাকে। মথুরা-বৃন্দাবন এবং নাথদ্বারায় দেবতাদের দুধ স্নান করানো হয়। নতুন চকচকে পোশাক পরানো হয়। হীরা, মুক্তা, মাণিক এবং অন্যান্য মূল্যবান পাথর এবং ধাতুর অলঙ্কার দিয়ে সজ্জিত করা হয়। তারপর পুজো করা হয়।

সুস্বাদু মিষ্টি, ফল, ভোগ ইত্যাদি নৈবিদ্য যা আনুষ্ঠানিকভাবে মূর্তির সামনে পাহাড়ের আকারে উত্থিত হয়। সেইসাথে ভজন ও প্রার্থনা করা হয়।

পাদওয়া :

দীপাবলি উদযাপনের 'অমাবস্যার' পরের দিন হল কার্তিক শুদ্ধ "পাদওয়া" যেদিন রাজা বালি 'পটল লোক' থেকে বেরিয়ে এসে 'ভু লোক' শাসন করবেন। 'বতু ওয়ামন' ভগবান বিষ্ণু তাকে প্রদত্ত বর অনুসারে বিশ্ব। তাই এই দিনটিকে 'বালি পদ্যমি' নামেও পরিচিত। 'পাদওয়া' বা 'বর্ষপ্রতিপদ' রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাভিষেককেও চিহ্নিত করে কারণ এই পাদওয়ার দিন থেকেই 'বিক্রম-সংবত' শুরু হয়েছিল।

গুড়ি পাদওয়া :

হিন্দু পরিবারগুলোর কাছে "গুড়ি পাদওয়ার" দিনটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। একটি প্রথা আছে যে এই পবিত্র দিনে স্ত্রী তার স্বামীর কপালে 'তিলক' লাগান, তাকে মালা পরান, তার 'আরতি' করেন এবং তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন। তারপর স্বামী তার স্ত্রী তার প্রতি যে স্নেহপূর্ণ যত্ন বর্ষণ করে তার প্রশংসা করে তাকে একটি উপহার দেয়। এইভাবে গুড়ি পাদওয়া হল স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে প্রেম ও ভক্তির উদযাপন এবং শ্রদ্ধার উৎসব। লোকেরা তাদের নববিবাহিত কন্যাদের তাদের স্বামীদের সাথে গুড়ি পাদওয়ার এই দিনে বিশেষ খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং তাদের উপহার দেয়।

থাল :

সাধু, ভক্তরা সবাই "থাল" পরিবেশন করে থাকে। কীর্তন বা ভক্তিমূলক স্তোত্র যা স্বামীনারায়ণের কবি "পরমহংস" দ্বারা রচিত। এই কীর্তনগুলি খাদ্যসামগ্রীর বর্ণনা দেয়। এই প্রার্থনা প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়, পরে আরতি হয়। কিছু মন্দিরে দিনে কয়েকবার আরতি হয়ে থাকে। সন্ধ্যায় ভক্তরা অন্নকূটের অংশ গ্রহণ করে প্রসাদ হিসাবে। এই পবিত্র খাবার যা ভগবানকে দেওয়া হয়েছে তা ভক্তরা করুণা হিসেবে গ্রহণ করে।

বিশ্বকর্মা পূজা :

কিছু কারিগর অন্নকূট দিবসে তাদের সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।[৩]

গোহাল বা গরইয়া উৎসব :

গোবর্ধন বা অন্নকূট উৎসবের দিনে এই "গোহাল" বা "গরইয়া" পূজা ও হয়ে থাকে। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি কৃষিভিত্তিক উৎসব, যা রাঢ় অঞ্চল সহ পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ইত্যাদি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় গ্রামাঞ্চলের বাড়িতে বাড়িতে এই পূজা করা হয়ে থাকে।



চিত্র ৩ :- গোহাল পূজা (ভগবানপুর)

পালন-রীতি :

কার্তিক মাসের প্রতিপদ তিথিতে "গরইয়া" বা "গোহাল" উৎসব পালিত হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে কালীপুজোর ঠিক পরের দিন অর্থাৎ দ্বিতীয়ার দিন এই পূজা হতে দেখা যায়। গৃহপালিত পশুদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এই দিনটিতে এই পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে।



চিত্র ৪ :- গ্রামীণ প্রাচীন সংস্কৃতি (Worship..)

গৃহকর্তা সকাল থেকে উপোস করে দুপুরবেলায় স্নান করে ভেজা কাপড়ে গোয়ালে বসে পূজা করেন। কিছু নীলাভ শালুক ফুল চিটে মাটির দ্বারা সদ্যনির্মিত গোলাকার পিঁড়িতে গুঁজে ও খুঁটিতে পুঁতে রাখা হয়। পূজার উপকরণ হিসেবে ধূপ, সিঁদুর, হলুদ, দূর্বা, আতপ চাল, গাওয়া ঘি এবং পিঠে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। গরুর গোয়ালে লাল মোরগ এবং মোষের গোয়ালে কালো মুরগি বলি দেওয়া হতে দেখা

যায়। তবে এই বলি দেওয়ার প্রথাটি পুজোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অনেক জায়গায় মোরগের বদলে ‘ঝিঙে’ বলি দিতে দেখা যায়।



চিত্র ৫ :- বলিপ্রথা (মোরগ বলি)

প্রথমে গরুর পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। এরপর প্রতিটি গরু ও মোষের শিঙে ও কপালে তেল, হলুদ ও সিঁদুর মাখিয়ে মাথায় ধান শিষের তৈরী মোড় পরানো হয়। এরপর গৃহকর্ত্রী নববস্ত্র পরে উলুধ্বনি দিয়ে গাভি পূজা করেন, যাকে গরু ‘চুমা’ বলা হয়ে থাকে। সন্ধ্যার সময় চালের গুঁড়ো পানিয়া নামক লতার রসের সাথে মিশিয়ে উঠোনে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। উৎসবের এই অংশকে চোখ ‘পুরা’ বলা হয়ে থাকে।[৪]

শুধু পুজো নয়, গৃহপালিত পশুদের জন্য তৈরী করা হয় গুড়ের পিঠাও। পুজোর শেষে গৃহপালিত পশুদেরকে খাওয়ানো হয় ফলমূল ও পিঠে। এভাবেই সম্পূর্ণ হয় গোহাল বা গর?ইয়া পুজো। এই পুজো বহুকাল ধরে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরম্পরা হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

ইঁজেইপিঁজেই :

এই একই সময় পুরুলিয়া জেলার গ্রামবাসীরা “ইঁজেইপিঁজেই” নামে আর একপ্রকার উৎসব পালন করে থাকেন, যা পুরোপুরি গোহাল পূজার অনুরূপ। পুরুলিয়া জেলার এটি কৃষিভিত্তিক উৎসব।

পালনরীতি :

কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রে “ইঁজেইপিঁজেই” উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এই উৎসবে গৃহপালিত পশু (গাভীকে) দেবীর মর্যাদা দিয়ে পূজা করা হয়ে থাকে। এই রাত্রে গোয়াল ঘিয়ে ডোবানো সলতার সাহায্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে গাভীর শিঙে তেল ও সিঁদুর মাখাতে হয়। গ্রামের প্রত্যেক দরজায় ও তুলসী তলায় শালপাতার ওপর কিছুটা চালের গুঁড়োতে তুলো দিয়ে সলতে ধরিয়ে রেখে পরে সেই পোড়া চালের

পিঠা তৈরী করে খাওয়া হয়।

সন্ধ্যার সময় 'লায়া' গ্রামের কুলহি মুড়ায় গাভীর আরাধনা ও 'মুঠ' পূজা করেন এবং গরুর মালিকের নিকট অর্থ ও কাপড় আদায় করে থাকেন।[৫]

উপসংহার :

ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে "লোক-উৎসব" একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। ভারতীয় সমাজ এই প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরম্পরায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সতুরাং সব মিলিয়ে ভারতীয় জনজীবনে এই পারস্পরিক মেলবন্ধন লক্ষণীয়। তবে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে এমন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা এখন বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

সৌজন্য : ড. রীতা সাহা (সহকারী অধ্যাপিকা) কন্ঠসঙ্গীত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

তথ্যসূত্র :

(১) Tracy Pintchman, Guests at God's Wedding : Celebrating Kartik among the Women of Benares, Published by State University of New York Press, Albany, 2005, Page- 212.

(২) তদেব, পৃ. ৬৬, ২১২।

(৩) Shobhna Gupta, Festival of India, Har-Anand Publications, New Delhi, 2002, Page- 84.

(৪) নব কিশোর সরকার, লোকায়ত মানভূম, পুরুলিয়ার কৃষিভিত্তিক লোক-উৎসব, প্রকাশক-বঙ্কিম চক্রবর্তী, পৃ. ২৩-২৪।

(৫) তদেব।

(৬) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Govardhan_Puja (n.d).

যুগপুরুষ রামমোহন রায়
এক আধারে বহুল সমাবেশ
অনুপম দাস

সূচনা :

অভাবনীয় জাতীয় সংকট কখনো কখনো এমন এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব অনিবার্য করে তোলে, যখন সেই ব্যক্তি হয়ে ওঠেন জাতির পরিত্রাতা। উনিশ শতকের সূচনায় বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির এরকমই এক বিশেষ সংকটময় মুহূর্তে আবির্ভাব ঘটেছিল যুগপুরুষ রামমোহন রায়ের। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মহান ব্যক্তিত্বকে কোনো একটি বিশেষ অভিধায় সীমায়িত করা সম্ভব নয়। তিনি একদিকে ছিলেন পণ্ডিত, মনীষী, চিন্তানায়ক, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক; অন্যদিকে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য এবং সাময়িকপত্রের জগতে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সঙ্গতভাবেই একথা বলা যায় যে, তিনি ছিলেন এক আধারে বহুর সমাবেশ।

রামমোহনের ব্যক্তিজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

'আধুনিক ভারতের জনক' রামমোহন রায় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে, মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামকান্ত রায় এবং মাতা তারিণী দেবী। তাঁর পিতা ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব আর মাতা ছিলেন একজন তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবান নারী। রামমোহনদের কৌণিক উপাধি ছিল 'বন্দ্যোপাধ্যায়' তাঁর পূর্বপুরুষ রাজসরকারে কর্মসূত্রে 'রায়রায়ান' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

রামমোহনের বাল্যশিক্ষা গ্রামের পাঠশালাতেই শুরু হয়েছিল। একইসঙ্গে তিনি অল্প বয়সেই আরবী-ফার্সী ভাষাতেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং আরবী ভাষায় অ্যারিস্টটল ও ইউক্লিডের গ্রন্থে পাঠ করে তাঁর স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি আরও তীব্রতর ও মার্জিত রূপ লাভ করে। এই সময় কোরাণ এবং ফার্সি ভাষায় বিভিন্ন সুফী গ্রন্থ পাঠের ফলে সম্ভবত প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূল তাঁর মনে শিথিল হতে শুরু করেছিল এবং তিনিই 'একেশ্বরবাদ' ও 'নিরাকার ব্রহ্ম'-এ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন।

চোদ্দ বছর বয়সে রামমোহনের সঙ্গে নন্দকুমার বিদ্যালংকার নামে এক সংস্কৃত-অধ্যাপকের সাক্ষাত হয়, যিনি পরবর্তীতে তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে হরিহরানন্দ অবধূত নামে খ্যাত হন। রামমোহন এঁর কাছেই সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীতে কাশিতে অবস্থানকালে বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র অধ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে

তিনি ইংরেজি ভাষা চর্চা শুরু করেন। তবে ডিগবী সাহেবের দেওয়ানীকালেই তাঁর ইংরেজি শিক্ষা যথার্থ অর্থে সম্পূর্ণতা পায়। হিন্দুশাস্ত্রের গভীর অধ্যয়ন এবং বাইবেল পাঠে রামমোহনের মনে একেশ্বরবাদী চিন্তা আরো দৃঢ় হয়। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর বন্ধনহীন রামমোহন মুর্শিদাবাদ চলে যান এবং সেখানেই থাকাকালীন তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় 'তুহফাতুল-মুয়াহীদিন' রচনা করেন। যার অর্থ— 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার।'

(২)

রামমোহন প্রথম জীবনে নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতায় কোম্পানির কাগজের ব্যবসা, সিবিলিয়ানদের টাকা ঋণ দেওয়া ইত্যাদি ব্যবসাও করেছিলেন। রামমোহন নয় বছর চাকরি করেছিলেন। এর মধ্যে অল্প কয়েকদিন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে এবং বেশির ভাগটাই ডিগবী সাহেবের অধীনে (যথাক্রমে রামগড়, ভাগলপুর ও রংপুরের কালেক্টার) দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই ডিগবী সাহেব প্রবল আত্মমর্যাদা সচেতন রামমোহনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৮১৪ খ্রিঃ ডিগবী সাহেব বিলেতে ফিরে গেলে রামমোহনও দেওয়ানী কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঐ বছরই কলকাতায় চলে আসেন। এরপরই রামমোহনের জীবনে এক বিচিত্র ও কর্মব্যস্ত অধ্যায়ের সূচনা হয়।

রামমোহনের দীর্ঘদিন ইচ্ছা ছিল ইংল্যান্ড-গমন। অবশেষে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে দিল্লির তৎকালীন বাদশাহের পক্ষে বিলেতের পার্লামেন্টে তদ্বির করার জন্য বাদশাহ রামমোহন রায়কে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে বিলেত প্রেরণ করেন এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ২৭ সেপ্টেম্বর লন্ডনের ব্রিষ্টলে রামমোহনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায় :

ভারতবর্ষের বুকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর কয়েকজন সহৃদয় ইংরেজ ব্যক্তির (জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ) ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা ও বিস্তার বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে এক সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। কারণ, এই সময় একদিকে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় নব্য যুবকের দল কেবলমাত্র সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের প্রতি অন্ধ-আনুগত্য স্বীকার করে ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শ থেকে শত যোজন দূরে অবস্থিত আত্মবলহীন বৃহত্তর বাঙালি সমাজ, যারা কালের নিরিখে আধুনিক যুগের হলেও, সত্য অতীত মধ্যযুগীয় বর্বরতা এবং ধর্মান্ধতা তখনও তাদের মনে সমানভাবে জাগরুক। এরকমই এক সংকটময় মুহূর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত তথা আধুনিক যুক্তিবাদ, বাস্তবচেতনা ও একেশ্বরবাদী ভাবনায় বিশ্বাসী বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণের আদিপুরুষ; ধীর-শান্ত অথচ দীপ্ত ও বলিষ্ঠ চরিত্র রামমোহন রায়ের আবির্ভাব।

বাংলায় 'রেনেসাঁস' বা 'নবজাগরণ'-এর সূচনালগ্নে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব

ও বলিষ্ঠ কর্মোদ্যম ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়— "ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্য নূতন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছা জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়— বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবতঃ উৎসুক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরোল, চারিদিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে, তাতে তাঁর বিতৃষ্ণা হল। সে চাইল মোহমুক্ত বুদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয়— যেখানে সকল মানুষের মিলন-তীর্থ।"

আধুনিক যুগের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, মানুষ হিসেবে মানুষের প্রকৃত সত্তার অনুসন্ধান। উদারহৃদয়-দীপ্তবুদ্ধি রামমোহন রায় মানুষের সেই প্রকৃত সত্তাটিকে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই সমস্ত সংকীর্ণতার গণ্ডিকে তুচ্ছ করে মানব-মুক্তির প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মানব-মুক্তির প্রেক্ষিতে ভারত-পথিক রামমোহনের আবির্ভাবের তাৎপর্য অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়ে লিখেছেন— "আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভকালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারেনি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এযুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দু-মুসলমান খ্রিস্টান কারও স্থান সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষ যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সন্ধান আছে, স্বীকৃতি আছে।"

মানবমন্ত্রে দীক্ষিত উদার-হৃদয় রামমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকৃত উক্ত ব্যাখ্যার মধ্যে যে কোনো অতিরঞ্জন ছিল না, তা ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে ঐ সভার 'ন্যাসপত্র' (Trust deed)-এ স্বয়ং রামমোহনের লেখা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি লিখেছেন—

"For a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious and devout manner ... ."

"For the worship and adoration of all Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe, but not under or by any other name, designation or title used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever."

রামমোহন রায়ের সুযোগ্য পৌরহিত্যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষ সর্বপ্রথম নবজাগরণে আলোকে অভিষিক্ত হয়েছিল, একথা আজ সর্বজনবিদিত ও সর্বজনস্বীকৃত। সেজন্যই ইউরোপের সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা-পুরুষ জণ উইক্লিফের সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের 'Morning Star' রূপে অভিহিত করা হয়।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, রামমোহনের এই সংস্কার আন্দোলনের দ্যুতি শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষকে নয়, সমগ্র প্রাচ্যকে উদ্বোধিত এবং উদ্ভাসিত করেছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের মানুষজনও তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ধর্মসংস্কারক রামমোহন ও তাঁর ধর্মমত :

(১)

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন রামমোহন রায় খুব অল্প বয়সে আরবি ফারসি ও সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দু মুসলিম খৃষ্টান বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এই সকল ধর্মগ্রন্থ পাঠের ফলে তিনি 'একেশ্বরবাদী নিরাকার ব্রহ্মবাদ'-এর সমর্থক হয়ে ওঠেন। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বহুদেববাদের বিরুদ্ধে এবং একেশ্বরবাদের সমর্থনে ফার্সী ভাষায় "তুহফাতুল-মুয়াহীদিন" নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। তবে কলকাতায় আসার পরই রামমোহনের ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রকৃত রূপ পায়।

এখানে উল্লেখ্য, কলকাতা আসার পূর্বে ডিগবী সাহেবের দেওয়ান হিসেবে রংপুরে কর্মরত থাকাকালীনই রামমোহনের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সেখানে তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিজ বাসভবনে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ধর্ম আলোচনায় অংশ নিতেন এবং তাদের সকলের বাদবিতণ্ডা মনোযোগ সহকারে শোনার পর তার যথাসাধ্য মীমাংসা করার চেষ্টা করতেন। এখানেও তাঁর মূল অবলম্বন ছিল 'একেশ্বরবাদ'। শোনা যায় যে, তিনি এইসময় একেশ্বরবাদের স্বপক্ষে ফারসি ভাষায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেছিলেন এবং বেদান্ত দর্শনের অনুবাদ করেছিলেন। এর ফলস্বরূপ রংপুর আদালতে জজ সাহেবের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত গণ্যমান্য গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চরমে পৌঁছেছিল এবং গৌরীকান্তবাবু রামমোহনের প্রচারিত মত খণ্ডনের জন্য 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বলাবাহুল্য রামমোহনের এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের উত্তাপ তাঁর আগমনের পূর্বেই কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল। তাই ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ডিগবী সাহেব বিলেত ফিরে যাবার পর রামমোহনও যখন দেওয়ান পদ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন, তখন কলকাতা ও তৎসন্নিহিত আঞ্চলের কিছু উদার, চিন্তাশীল ও সংস্কারপ্রয়াসী মানুষকে তাঁর আন্দোলনের সঙ্গি হিসেবে পেয়ে গেলেন। আবার কিছু বিষয়ী লোকও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পদস্থ ও ক্ষমতাশালী রামমোহনের ধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের সকলকে নিয়েই ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার মানিকতলার নিজস্ব ভবনে 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এটি বড়বাজারে বিহারীলাল চৌবের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। এখানে সপ্তাহে একদিন বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার চলত।

স্বভাবতই এক্ষেত্রেও রামমোহনের পথ একেবারে নিষ্কণ্টক ছিল না। প্রতিপদে তাঁকে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজপতি এবং তাঁদের অন্ধ-অনুগামীদের দ্বারা প্রতিবন্ধকতা এবং কুরুচিকর আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু কোনকিছুই যেমন রামমোহনকে তাঁর লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করতে পারেনি, তেমনি তিনি কখনই তাঁর সংযম ও রুচিশীলতা থেকেও

বিচ্যুত হননি। তিনি কখনও পুস্তক রচনা মাধ্যমে বিরোধীদের উপযুক্ত জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন, আবার কখনও তাদের সঙ্গে সরাসরি তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিহারীলাল চৌবের বাড়িতে 'আত্মীয়সভা' স্থানান্তরের কিছুদিনের মধ্যেই ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায় মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় আগত বিখ্যাত হিন্দুপণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য স্বামীর সঙ্গে এরকমই এক তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

সুব্রহ্মণ্য স্বামী কলকাতায় আসার পর রামমোহনের প্রচারিত মতকে ভ্রান্ত বলে দাবী করেন এবং একইসঙ্গে তিনি গর্বের সঙ্গে দাবি করেন, বেদোক্ত প্রমাণ দ্বারা 'প্রতিমা পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা'— এই সত্য প্রতিষ্ঠা করবেন। স্বাভাবিকভাবেই এই তর্কযুদ্ধে সংবাদে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজ উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। এমনকি হিন্দুসমাজপতি রাধাকান্তদেব স্বয়ং অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। যদিও তুমুল শাস্ত্রীয় বাক্ যুদ্ধের পর সুব্রহ্মণ্য স্বামী রামমোহনের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং রামমোহন কথিত নিরাকার ব্রহ্মোপসনাকেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তবে সুব্রহ্মণ্য স্বামীর এই পরাভব স্বীকারে শিকারে হিন্দু সমাজপতিদের মনোভাবে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি, বরং রামমোহনের প্রতি তাঁদের আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। কিন্তু রামমোহন তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে পূর্ণ উদ্যমে তাঁর প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এইসময় রামমোহনের সঙ্গে প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যে, ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর শহরের গণ্যমান্য হিন্দুগণ রামমোহনের সঙ্গে কলেজ কমিটিতে কাজ করতে অস্বীকার করেছিলেন। মহতী হৃদয় রামমোহন বৃহত্তর স্বার্থে কলেজ কমিটি থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

পরবর্তী আরও একটি ঘটনাও রামমোহনের প্রতি প্রাচীন পন্থীদের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে 'কমিটি অব্ পাবলিক ইনস্ট্রকশন' নামে একটি কমিটি স্থাপিত হয় এবং এই কমিটি তৎকালীন প্রাচ্যশিক্ষা-পন্থীদের পরামর্শে কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু রামমোহন সরাসরি এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেন এবং তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে পত্র-মারফত বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া ভারতীয়দের জাতীয় জীবনের উন্নতি সম্ভব নয়। স্বভাবতই এরপর প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থী দুটি দলের উদ্ভব হয় এবং উভয়ের বিরোধ চরম আকার নেয়। তবে একইসঙ্গে এই ঘটনা রামমোহনের শিক্ষাসংক্রান্ত দূরদর্শিতারও পরিচায়ক।

শুধু প্রাচীনপন্থী হিন্দুদেরই নয়, এই সময় রামমোহন খ্রিস্টান মিশনারীদেরও চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন। এর নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণ ছিল।

প্রথমত, ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আগত খ্রিস্টান মিশনারীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ও ভারতীয়দের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা। কলকাতার

নিকটবর্তী শ্রীরামপুর মিশন ও প্রেস প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরা যখন মহোৎসাহে তাঁদের লক্ষ্যপূরণের উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত, ঠিক সে সময় তাঁদের সামনে প্রবল প্রতিবন্ধকরূপে হাজির হয়েছিলেন বলিষ্ঠ চিত্র রামমোহন রায়। মূলত রামমোহনের প্রবল প্রতিরোধের কারণেই হিন্দুধর্ম সেদিন তাঁর অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর এই অসাধারণ অবদানের সাক্ষ্য মেলে রবীন্দ্রনাথের লেখায়—

"কি সংকটের সময় তিনি (রামমোহন) জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে হিন্দু-সমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচন্ড বন্যা বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইতেছিল রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খ্রিস্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময় তাঁহার মহৎ লোক না জন্মাইলে একদিন বঙ্গদেশে হিন্দু-সমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।"

দ্বিতীয়তঃ উদারপ্রাণ রামমোহন রায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে 'Precepts of Jesus – Guide to Peace and Happiness' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। রামমোহনের এই কাজে প্রবল খ্রিস্টানবিদ্বেষী হিন্দুরা যেমন তাঁর প্রতি চরম রুষ্ট হয়েছিলেন, একইসঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারীরাও তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই ক্রোধের কারণ ছিল, রামমোহন যিশুখ্রিস্টের উপদেশ সম্বলিত উক্ত গ্রন্থে খ্রিস্টের অলৌকিক বৃত্তান্তগুলি বাদ দিয়েছিলেন। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের দুই অন্যতম প্রতিনিধি উইলিয়াম কেরি ও মার্শম্যান তাঁদের ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'Friend of India'-য় এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন 'A Friend to Truth' ছদ্মনামে 'An Appeal to the Christian Public' (১৮২০) নামক আরও একটি পুস্তক রচনা করে উপযুক্ত যুক্তিসহ মার্শম্যানের ক্রোধ উপশমের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। এরপর রামমোহন 'Second Appeal' প্রকাশ করলেন। এতেও মার্শম্যান সন্তুষ্ট হলেন না। ইতিমধ্যে স্থিরচিত্র রামমোহন গ্রিক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা শুরু করেন এবং মূল হিব্রু বাইবেল থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে মার্শম্যানের ভ্রান্তি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে 'Final Appeal' রচনা করেন। এবার মার্শম্যান সাহেব পিছু হটতে বাধ্য হলেন। এই রচনার দৌলতে রামমোহনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

তৃতীয়ত, আরো একটি ঘটনা মিশনারীদের রামমোহন-বিদ্বেষে ঘৃতাহূতি দিয়েছিল। এই সময় উইলিয়াম অ্যাডাম নামে এক খ্রিস্টান মিশনারি যুবক শ্রীরামপুর ব্যাপিটিস্ট মিশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় আসেন। কিন্তু রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তাঁর মনোবৃত্তি পরিবর্তিত হয়। এরপর রামমোহন অ্যাডাম এবং ইয়েটস্ নামক আর সাহেবের সহযোগিতায় যিশুখ্রিস্টের সুসমাচার বিষয়ক পুস্তকগুলির বাংলা ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ করেন। এই সময় খ্রীষ্টধর্মমত সম্পর্কে 'ত্রিত্ববাদী' অ্যাডাম ও

ইয়েটস্ সাহেবের সঙ্গে একেশ্বরবাদী রামমোহনের তর্ক-বিতর্ক চলত। একসময় ইয়েটস্ সাহেব বিরক্ত হয়ে রামমোহনের সঙ্গ ত্যাগ করলেন। অ্যাডাম কিন্তু তা করলেন না, বরং তিনি রামমোহনের একেশ্বরবাদী ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রিষ্টীয় ত্রিত্ববাদী গোঁড়া ভাবনাকে ত্যাগ করে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে 'একত্ববাদী' হয়ে উঠলেন। ইংরেজি সাপ্তাহিক 'Friend of India' এবং বাংলা 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় শ্রীরামপুর মিশনারিরা অ্যাডাম ও রামমোহন উভয়কেই তীব্র আক্রমণ করলেন। তাঁরা অ্যাডাম সাহেবকে ব্যঙ্গ করে 'Fallen Adam' নাম দিলেন। এই ঘটনায় শুধু মিশনারিরা নয়, কলকাতায় ইংরেজদের মধ্যেও ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। কলকাতার টাইটলর নামে এক সাহেব রামমোহনের বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করেন। বলাবাহুল্য, রামমোহন উভয়পক্ষকেই যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন।

যাইহোক, অ্যাডাম সাহেব ধর্মমত পরিবর্তনের পর কলকাতাতেই 'হরকরা' পত্রিকা অফিসের দোতালায় 'ইউনেটেরিয়ান সোসাইটি' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এর অনেক আগেই ১৮১৯ খ্রিঃ রামমোহন কিছু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কারণে 'আত্মীয় সভা' বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই অ্যাডাম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত এই সভায় রামমোহন ও তাঁর সঙ্গীরাও আলোচনায় অংশ নিতেন। কিন্তু ১৮২৪ খ্রিঃ গোড়াতেই এই সভা বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রমূখের উৎসাহ ও সহযোগিতায় রামমোহন রায় চিৎপুর রোডের কমললোচন বসুর বাড়ি ভাড়া নিয়ে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ৬ই ভাদ্র 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন করেন। ১৮৩০ খ্রিঃ ২৩ জানুয়ারি (১১ মাস) চিৎপুর রোডের পাশেই নির্মিত স্থায়ী সভাগৃহে 'ব্রহ্মসভা'-র কার্যের সূচনা হয়। এই সভায় পরবর্তীতে 'ব্রহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়।

(৪)

এখন আসা যাক, রামমোহনের প্রকৃত ধর্মমত কী ছিল তার আলোচনায়। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের যুক্তিবাদ দ্বারা রামমোহন প্রভাবিত হয়েছিলেন, একথা সত্য এবং তার আভাস পাওয়া যায় তাঁর 'তুহফাতুল মুয়াহীদিন' গ্রন্থে। কিন্তু এর পরবর্তীতে রামমোহন যখনই কোনো গ্রন্থ রচনা বা বিচার করেছেন, তখন তিনি শাস্ত্রকেই একমাত্র প্রামাণ্য হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন কোনো ধর্মশাস্ত্রই আপুরুষেয় অর্থাৎ অভ্রান্ত না হলে প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেই পূর্বযুগ সঞ্চিত কিছু সত্য নিহত রয়েছে। তাই তিনি যখন যে ধর্মের মানুষের সঙ্গে শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হতেন, তখন সেই ধর্মের শাস্ত্র থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করতেন।

রামমোহন রায় মন-প্রাণ ও জীবনচর্যায় ষোলো আনা খাঁটি হিন্দু ছিলেন এবং তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁর নিজের কথাতেই স্পষ্ট— "আমার সমস্ত তর্ক-বিতর্কে আমি কখনো হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।" এমনকি তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ইংলন্ডীয় বন্ধুদের জানিয়েছিলেন, তাঁর অন্তেষ্টিক্রিয়া যেন খ্রিষ্টমতে না করা হয় এবং তাঁর এই অনুরোধ সশ্রদ্ধভাবে পালিত হয়েছিল। তাছাড়া রামমোহন যে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন, তা ছিল অসাম্প্রদায়িকভাবে এক ব্রহ্মের উপাসনাস্থল। হিন্দুধর্মে এ ধরনের উপসনালয় এর পূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। আসলে বৈচিত্র্যের দেশ ভারতবর্ষে রামমোহন এক সমন্বয়ের বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। যা একই সঙ্গে তাঁর গভীর রাষ্ট্রচিন্তারও ইঙ্গিতবাহী।

তাই একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, রামমোহন সনাতন হিন্দুধর্মকে উপড়ে ফেলে নতুন কোন ধর্ম (ব্রাহ্মধর্ম) প্রতিষ্ঠার কথা কোনোদিন ভাবেননি, বরং হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি অর্থাৎ বহুকাল ধরে সঞ্চিত অন্ধ-সংস্কাররূপে আবর্জনাগুলিকে দূর করে তার সংস্কার করতে চেয়েছিলেন; হিন্দুধর্মকে মানবতার পরিপোষক করে তুলতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ মানবধর্মই ছিল তাঁর মূল আরাধ্য।

সমাজ সংস্কারক রামমোহন :

বাংলা সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ ছিলেন রামমোহন রায়। তাঁর সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল, তৎকালীন সমাজে অস্তিত্বহীন নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা। রামমোহন আদ্যন্ত নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই নারী সমাজের উন্নতিকল্পে কৃত তাঁর অন্যতম কীর্তি ছিল 'সহমরণ' বা 'সতীদাহ প্রথা'-র রদ। ছোটোবেলায় স্বচক্ষে দেখা সহমরণের নৃশংসতা তাঁর হৃদয়ে যে গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল, পরবর্তীতে সেই আমাতেই এই নির্মম প্রথা রদে উদারপ্রাণ রামমোহনকে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল।

মৃত স্বামীর চিতায় নারীর সহমৃতা হওয়ার প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই নাকি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। ধর্ম ও পুণ্যের নামে নির্মম নিষ্ঠুরতার এক বিরলতম পরিদর্শন ছিল এই সতীদাহ প্রথা। রামমোহনের সময় এই নৃশংসতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। নিত্যদিনই ভাগীরথীর দুই তীরে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সতী হওয়ার নামে স্ত্রীকে হাত-পা বেঁধে নিক্ষেপের মাধ্যমে এরকম একাধিক নারকীয় হত্যালীলা সাধিত হত। সেই নারীদের আর্ত-চিৎকার সেখানে উপস্থিত কারো মনে বিন্দুমাত্র বেদনার সঞ্চার করত না; বরং তারা ঢাক-ঢোল-কাঁসরের উদ্দাম আওয়াজ সহযোগে মহোল্লাসে সতী হওয়ার দৃশ্য দর্শনে নিজেদের ধন্য করতেন। শুধু তাই নয়, কোন কারণে সতীদাহে বিঘ্ন ঘটলে, অর্থাৎ সতী-নারীটি চিতা থেকে পালানোর চেষ্টা করলে কিংবা চিতা ভেঙে গঙ্গার জলে পড়ে গেলে এদের পৈশাচিকতা চরমে পৌঁছত। সকলে মিলে সেই নারীর পিছু ধাওয়া করত এবং তার আকুল-আর্তি উপেক্ষা করে পৈশাচিক উল্লাসে তাকে পুনরায় জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করা হত। গঙ্গায় পতিত নারীর ক্ষেত্রে নৌকো সহযোগে পিছু ধাওয়া করা হতো এবং অনেক সময় বৈঠার আঘাতে অর্ধমৃত বা মৃত অবস্থায় নারীটিকে চিতায় নিক্ষেপ করা হত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিখ্যাত 'সহমরণ' কবিতায় এক মুসলমান যুবক মাঝির সহায়তায় গঙ্গাবক্ষে পতিত এরকমই এক সতীনারীর জীবনরক্ষার অনবদ্য কাহিনীকে রূপ দিয়েছিলেন। যাইহোক, আজকের দিনে এরকম এক পৈশাচিক প্রথার কথা ভেবেই আমাদের গা শিউরে ওঠে। রামমোহনের বলিষ্ঠ উদ্যমের কারণে এই নৃশংসতার

অবসান সম্ভব হয়েছিল।

তবে একথা ঠিক রামমোহনের পূর্বেই ব্রিটিশ প্রশাসনের দৃষ্টি এই নির্মম প্রথার ওপর পড়েছিল এবং তাঁরা সতীদাহ নিয়ন্ত্রণে কিছু উদ্যোগও নিয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা খুব একটা সক্রিয় ছিল না। কারণ, ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা কায়েম করার পর প্রথমদিকে ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারতীয়দের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপের সমর্থক ছিলেন না। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই প্রথা সম্পর্কে বিবেচনার জন্য গর্ভনর-জেনারেলের তরফ থেকে তৎকালীন নিজামত আদালতে পত্র-মারফত আবেদন জানানো হয়। এরপর মাঝে মাঝে আলোচনা হলেও তার কিছু ফল হয়নি। অবশেষে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে গভার্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া-র তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এবার থেকে সহমৃতা বিধবাকে আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পদস্থ কোনো রাজকর্মচারীর থেকে অনুমতিপত্র নিতে হবে। কিন্তু এই নির্দেশিকা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন হিন্দুসমাজের প্রবল বিরোধিতা শুরু করে। এইরকম এক সংঘাতময় পরিবেশে সতীদাহপ্রথা নিবারণের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রামমোহন রায় আবির্ভূত হলেন।

এর বেশ কয়েকবছর পর ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা নিকটবর্তী একস্থানে সতীদাহের নামে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ইংরেজরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট সতীদাহপ্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার সাহস দেখালেন না; তবে কিছু কঠোর নিয়ম প্রণয়ন করলেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মহানুভব উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পরই সঠিক অর্থে সতীদাহপ্রথা নিবারণে সরকারি উদ্যোগ শুরু হয়। এর প্রায় এক দশক পূর্বেই রামমোহন রায় সতীদাহপ্রথা নিবারণ কল্পে জোরালো আন্দোলন শুরু করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব চরমরূপ ধারণ করেছিলো। রামমোহন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কোনো কিছুর পরোয়া না করে কখনো সহমরণ-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে, আবার কখনো তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার সুদৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, রামমোহন তাঁর অনুগামীদের নিয়ে একটি দল তৈরি করেছিলেন। কোনো সতীদাহের ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই রামমোহন স্বয়ং সেই দলের সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যেতেন এবং তা রোধ করার চেষ্টা করতেন।

এহেন পরিস্থিতিতে গভর্ণর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সঙ্গে রামমোহনের সাক্ষাত হয় এবং উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। এরপর রামমোহনের সঙ্গে আলোচনায় সতীদাহ সম্পর্কে হিন্দুশাস্ত্রের সমর্থন বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার পর এবং প্রশাসনিক সকল দিক নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করে দৃঢ়চেতা বেন্টিঙ্ক সাহেব সতীদাহ নামক নির্মম প্রথা রদে তৎপর হন। অবশেষে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর 'সতীদাহ নিবারণ আইন' কার্যকরী হয়।

(৩)

তবে এখানেই সবকিছু মিটে গেল, এমন ভাবনার কোনো কারণ নেই। প্রাচীন হিন্দু সমাজ পুনরায় এই আইনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল এবং তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে গভর্ণর-জেনারেলের কাছে উক্ত আইন প্রত্যাহারের দাবি জানাল। অন্যদিকে রামমোহন ও তাঁর সহযোগিরা এই আইন যাতে কোনোভাবে প্রত্যাহৃত না হয়, তার আর্জি জানায়। প্রাচীন হিন্দু সমাজপতিরা এখানে বিশেষ সুবিধা হবে না বুঝতে পেরে চটজলদি 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করে এবং বিলেতের পার্লামেন্টে আপিল করেন। জানা যায়, রামমোহনের বিলেত যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, 'সতীদাহ নিবারণ আইন' যাতে পাশ হয় তা সুনিশ্চিত করা। অবশেষে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ১১ জুলাই হিন্দু ধর্মসভার আবেদনকে অগ্রাহ্য করে বিলেতের পার্লামেন্টে 'সতীদাহ নিবারণ আইন' পাশ হয়। রামমোহনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলার বুকে দীর্ঘকাল ধরে পাষাণের মতো চেপে বসে থাকা এক নির্মম প্রথার চির-অবসান সুনিশ্চিত হল।

রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণ ছাড়াও বহুবিবাহ ও বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি সে সময় প্রচলিত কন্যাপণ-এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ, অতিরিক্ত পণের লোভে বেশিরভাগ কন্যার পিতারা বহু বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে, বৃদ্ধের সঙ্গে, এমন কি রুগ্ন-বিকলাঙ্গ পুরুষের সঙ্গে তাদের কন্যার বিবাহ দিতেন।

এছাড়া সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, সর্বোপরি নারীরা যাতে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারেন তার জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এভাবেই রামমোহন নারীসমাজের দুঃখ-দূরীকরণ এবং নারীসমাজের কল্যাণ সাধনে আজীবন ব্রতি ছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, রামমোহন নারী সমাজের কল্যাণ সাধনে এত কিছু করেছিলেন, নারীশিক্ষার প্রসারে তাঁর আগ্রহের অভাব নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। এক্ষেত্রে বলতে হয়, তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেখানে নারীর কোনো অস্তিত্বই ছিল না, নারীরা প্রতিপদে অবহেলিত, নিপীড়িত; রামমোহন সবার আগে নারীদের সেই অবহেলা-নিপীড়ন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অসহায় নারীর দুঃখ-যন্ত্রণা সম্পর্কে হৃদয়হীন সমাজে দরদ বা অনুভূতির সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। এককথায়, নারীর অস্তিত্ব সম্পর্কে পুরুষ এবং নারী উভয়কে অবহিত করতে চেয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে রামমোহন :

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের একেবারে সূচনালগ্নেই বলা যায়, ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। সেসময় বাংলা সাহিত্য দীর্ঘ পদ্যনির্ভরতা কাটিয়ে উঠে গদ্য ভাষাকে তার অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দিয়েছে মাত্র। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের (১৮০০ খ্রিঃ) মিশনারীদের দ্বারা এবং ফোর্টউইলিয়াম কলেজের (১৮০০ খ্রিঃ) পন্ডিত গোষ্ঠীর দ্বারা খানকয়েক গদ্য পুস্তক রচিত ও মুদ্রিত হয়েছে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের এই শৈশবলগ্নেই

রামমোহনের আবির্ভাব এবং তাঁর যা কিছু রচনা সবই গদ্যভাষায় রচিত।

তবে রামমোহন মূলতঃ তাঁর আধুনিক মননশীলতা চিন্তা-ভাবনা ও ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তা প্রকাশের মাধ্যমে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যেই বাংলা গদ্যকে আশ্রয় করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কখনো প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ করেছেন, আবার কখনো রক্ষণশীল প্রাচীন হিন্দুদের আক্রমণের প্রত্যুত্তরে বিতর্ক মূলক গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে নিজের তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ১৮১৫-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে রামমোহন প্রায় ত্রিশটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর এই রচনাগুলিকে মূলত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

(১) অনুবাদমূলক রচনা — 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্তসার' (১৮১৫), এবং বিভিন্ন উপনিষদের ('কেনোপনিষদ', 'ঈশোপনিষদ', 'কঠোপনিষদ', 'মাণ্ডুকোপনিষদ', 'মুণ্ডকোপনিষদ' ইত্যাদি) অনুবাদ (১৮১৫-১৮১৯)।

(২) বিতর্কমূলক রনা — 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬), 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৭), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ' (১৮১৮), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'ব্রাহ্মণসেবধি' (১৮২১), 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩), 'পাদ্রী ও শিষ্য সম্বাদ' (১৮২৩), 'সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮২৯) ইত্যাদি।

এছাড়া রামমোহন রায় 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে একটি বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

আসলে সেইসময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত গোষ্ঠীর দ্বারা খানকয়েক ছাত্রপাঠ্য-কথোপকথনমূলক গদ্য পুস্তক রচিত হলেও বাংলা গদ্য ভাষার কোনো আদর্শ কাঠামো গড়ে ওঠেনি। বাংলা গদ্যভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য আবিষ্কার তো দূর, কেউ বাংলা ভাষায় মননশীলতা প্রকাশের উদ্যোগী হননি। রামমোহনই প্রথম বাংলা গদ্য ভাষার একটা কাঠামো গঠন করে তার ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বলিষ্ঠ স্বকীয়তা দানে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলা ভাষার যথার্থ উন্নতির জন্য তার যথোপযুক্ত ব্যাকরণ প্রয়োজন। এইজন্য তিনি নিজেই প্রথম ইংরেজি ভাষায় একটি বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন এবং পরবর্তীতে বাঙালিদের গ্রহণযোগ্য করে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) নামে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এটিই বাঙালির দ্বারা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থ।

(২)

এখন আসা যাক বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনালগ্নে আবির্ভূত রামমোহন রায়ের বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা বা অবদান কতটা ছিল, তার আলোচনায়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয়, রামমোহন রায় ছিলেন মূলতঃ চিন্তানায়ক, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক এবং সে কারণেই তাঁকে লেখালেখির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সচেতনভাবে সাহিত্যসৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। কিন্তু নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে এবং

বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে তিনি বাংলা ভাষার দুর্বলতার সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই সচেতনভাবে বাংলা ভাষার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রামমোহনই প্রথম বাংলা গদ্যকে যুক্তি-তর্ক-বিচার সমন্বিত আধুনিক মননশীলতা প্রকাশের যোগ্যতা দান করেছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বিষয়-গৌরবী প্রবন্ধ তাঁর হাতেই সৃষ্টি হয়েছিল।

তবে রামমোহনের গদ্যভাষা সম্পর্কে সমালোচকদের কিছু অভিযোগ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম দুটি হল— প্রথমত, ছেদ চিহ্নের ব্যবহার বিষয়ে রামমোহনের উদাসীনতা এবং দ্বিতীয়ত, রামমোহনে গদ্যে সরসতা, মাধুর্য ও শিল্পগুণের অভাব। সমালোচক প্রমথ চৌধুরী তাঁর (রামমোহন) রচনার আরো কিছু ত্রুটি নির্দেশ করে লিখেছেন— "তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই তাহার প্রধান কারণ, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।" এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, আসলে বিষয়বস্তুর কাঠিন্যই ছিল রামমোহনের গদ্যের নীরস ও মাধুর্যহীনতার প্রধান কারণ। তিনি যে সহজ-সরল গদ্য রচনায়ও সক্ষম ছিলেন, তা তাঁর ভক্তস্থানীয় কবি ঈশ্বরগুপ্তের কথায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত— "দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকের অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পরিপাট্য ও তাদৃশ্য মিষ্ঠতা ছিল না।" অন্যদিকে প্রমথবাবুর সমালোচনার জবাবে পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়, বাংলা গদ্যভাষা বা সাহিত্যের বিকাশ-সাধন রামমোহনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল না; তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ধর্ম ও সমাজ সংস্কার। সেই সূত্রেই নিজের বক্তব্যকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে তিনি বাংলা গদ্যের একটা চলনসই কাঠামো নির্মাণ করে নিয়েছিলেন।

(৩)

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য, অনেকেই রামমোহন রায়কে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের এই অভিমতের যথার্থতা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কারণ, রামমোহনের পূর্বেই শ্রীরামপুর মিশনারি এবং ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা বাংলা গদ্য চর্চার সূচনা ঘটে গিয়েছিল। তাই রামমোহনকে 'বাংলা গদ্যের জনক' না বলে, 'বাংলা গদ্যের প্রথম সংস্কারক' বলাটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

আলোচনার শেষে একথা বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যিক গদ্য গড়ে তোলার প্রয়াস রামমোহনের রচনার মধ্যে না থাকলেও, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক রামমোহন নিজের সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের তীব্রতা দিয়ে বাংলা গদ্যের শরীরী একটি স্বতন্ত্র 'স্টাইল' সঞ্চারে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন— "রামমোহন বঙ্গসাহিত্যিকে গ্রানিটস্তরের

উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।”

এছাড়া রামমোহন রায়ের রচিত ‘ব্রহ্মসংগীত’গুলি তাঁর সৃষ্টিশীলতার আর এক অনন্য নিদর্শন। এই সংগীতগুলিতে ‘একেশ্বরবাদ’ এবং ‘নিরাকার ব্রহ্মের’ প্রতি তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাস ও ভক্তির প্রকাশ ঘটেছে।

বাংলা সাময়িকপত্রের জগতে রামমোহন :

বাংলা গদ্যসাহিত্যের মতোই বাংলা সাময়িকপত্রের একেবারে সূচনালগ্নে ঠিক একইভাবে সাময়িকপত্র-জগতে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত ‘ব্রাহ্মণসেবধি’ (সেপ্টেম্বর, ১৮২৯) ও ‘সম্বাদ কৌমুদী’ (ডিসেম্বর, ১৮২১) ছিল সেই সময়ের দুটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।

(১)

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ও প্রেসের উদ্যোগে এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮১৮ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িকপত্র ‘দিগদর্শন’ আত্মপ্রকাশ করে। এটি ছিল একটি মাসিক পত্রিকা। এর মাসখানেকের মধ্যে ১৮১৮ খ্রিঃ ২৩শে মার্শম্যানের সম্পাদনাতেই শ্রীরামপুর মিশন থেকে সাপ্তাহিক বাংলা সাময়িকপত্র ‘সমাচার দর্পণ’ প্রকাশিত হয়।

এই ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকাতে ১৮২১ খ্রীঃ ১৪ জুলাই “কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশ হইতে কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত” একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রামমোহন রায় বুঝতে পারেন, উক্ত চিঠির প্রশ্নগুলির মাধ্যমে শ্রীরামপুর মিশনারিরা আসলে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করতে চেয়েছেন এবং তিনি এই অন্যায় আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দেওয়া উচিত বলে মনে করলেন। তবে রামমোহন সরাসরি নিজের নামে নয়, তাঁর পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্মার ছদ্মনামে চিঠিতে উক্ত হিন্দু ধর্ম-সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির উত্তর ‘সমাচার দর্পণ’-এর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করলেন। কিন্তু রামমোহন-প্রদত্ত সেই উত্তর ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকার ছাপা হলো না।

কিন্তু দৃঢ়চিত্ত রামমোহনও ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনি নিজস্ব উদ্যোগে ১৮২১ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে শিবপ্রসাদ শর্মার নামে ‘ব্রাহ্মণ সেবধি’ ও ‘Brahmanical Magazine’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হত। এর এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং অপর পৃষ্ঠে ইংরেজি অনুবাদ থাকত। এই পত্রিকার প্রকৃত প্রকাশক যে রামমোহন রায় ছিলেন, তা ‘সমাচার চন্দ্রিকা’-র সম্পাদক ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কথাতেই স্পষ্ট —

“...সহমরণ রহিত বিষয়ে তাঁহাকে (রামমোহন রায়কে) ইংরেজি সমাচারপত্র-প্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি... তিনি ব্রাহ্মণীকেল মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণসেবধি প্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিসনারি প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানের দিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন...।”

তবে ‘ব্রাহ্মণ সেবধি’-র খুব বেশিদিন নয় পত্রিকাটির মাত্র প্রথম তিন সংখ্যার

সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অনুমান করা হয়, এরপর আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। এরমধ্যে প্রথম দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিতে কৃত প্রশ্ন এবং রামমোহন-প্রদত্ত তার উত্তরসমূহ।

(২)

খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের প্রতি অন্যায় আক্রমণ এবং হিন্দু সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ১৮২১ খিস্টাব্দে ৪ ডিসেম্বর 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। যদিও এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন কলকাতার কলুটোলা নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত ও ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ, কিন্তু একথা কারোই অজ্ঞাত নয় যে, 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে রামমোহন রায়ের সক্রিয় ভূমিকা ছিল এবং তিনিই ছিলেন এর প্রধান লেখক।

পত্রিকাটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮টি এবং প্রত্যেক সংখ্যায় পত্রিকার শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটি মুদ্রিত হত —

"দর্পণে বদনং ভীতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিণা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ।।"

পত্রিকাটি প্রথমে প্রতি মঙ্গলবারে এবং ১৬তম সংখ্যা থেকে মঙ্গলবারের পরিবর্তে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হত। ১৮৩০ খ্রিঃ থেকে 'সম্বাদ কৌমুদী' দ্বিসাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয়। অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে দুদিন প্রকাশিত হত।

পত্রিকাটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এর মূল উদ্দেশ্য হলেও, একইসঙ্গে এতে রাজনীতি, লোকশিক্ষা, নীতিশিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গল্প, এমনকি দেশবিদেশের নানান সংবাদ প্রকাশিত হত। আসলে ধর্ম-সংক্রান্ত আক্রমণের জবাব দেওয়া পত্রিকাটির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ঠিকই, কিন্তু এর বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছিল লোকহিত সাধন।

সম্বাদ 'কৌমুদী'-তে যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ প্রকাশিত দ্বারা রামমোহন একদিকে যেমন মিশনারীদের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অপপ্রচার বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজপতি ও পণ্ডিতদের বিভিন্ন অন্ধ সংস্কারের প্রতি, বিশেষ করে সহমরণের মতো নির্মম প্রথার প্রতি সমর্থনের তীব্র সমালোচনা শুরু করেছিলেন। রক্ষণশীল ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুসমাজ ও সংস্কারের প্রতি রামমোহনের আক্রমণকে মেনে নিতে পারলেন না। উভয়ের মতবিরোধ চরমে উঠল এবং 'সম্বাদ কৌমুদী'-র ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রকাশের পর ভবাণীচরণবাবু পত্রিকার সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ১৮২২ খ্রিঃ ৫ মার্চ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপাত্র রূপে নিজস্ব সম্পাদনায় 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। স্বাভাবিকভাবেই পত্রিকা মারফৎ একদা সহযোগী ভবাণীচরনের সঙ্গে রামমোহনের মতাদর্শগত বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করেছিল।

যাইহোক, রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলীর সম্পাদক রাজনারায়ণ বসু 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার প্রশংসা করে লিখেছিলেন—

"এই সংবাদ-কৌমুদীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমন্বিত যে সকল লোকোপকারী বিষয় লিখিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রতীতি হইবে যে, রামমোহন রায় যে কেবল ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে লিখিতে পারিতেন তাহা নহে; জ্ঞানগর্ভ অমিশ্র সাহিত্য রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। রামমোহন রায় গদ্য রচনার বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রথম নির্ধারণ করাতে এবং কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লেখাতে তাঁহাকে বর্তমান গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা বলিতে হইবে।"

শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণবাবুর উদ্ধৃতি মন্তব্যটি একইসঙ্গে বাংলা গদ্য সাহিত্যে রামমোহনের অবদান ও অবস্থান নির্দেশকও বটে।

এছাড়া রামমোহন রায় ১৮২২ খ্রিঃ ফার্সী ভাষায় 'মিরাৎ-উল-আখবার' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। শিক্ষিত ও বিশিষ্ট সমাজের জন্য প্রকাশিত এই পত্রিকাটিতে রামমোহন নির্দ্বিধায় ইউরোপের রাজনীতি, ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করতেন। আয়ারল্যান্ডের দুরবস্থার কথা, গ্রীসের জাগরণের মতো বিষয়গুলিও এতে সমানভাবে আলোচিত হত। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সমগ্র ভারতবর্ষে ফার্সী সংবাদপত্রের সর্বপ্রথম সম্পাদক ছিলেন রামমোহন রায় এবং ভারতবর্ষের বাইরে পারস্যেও 'মিরাৎ-উল-আখবার' সমান জনপ্রিয় ছিল। তবে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে পত্রিকাটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

ইতিকথন :

রাজা রামমোহন রায়ের বহুমুখী প্রতিভা ও বিচিত্র কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে একথা স্পষ্ট যে, বাংলায় নবজাগরণের উষারুণ প্রত্যুষে তাঁর মতো একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরচিত্ত ও বলিষ্ঠ চরিত্র মহামানবের আবির্ভাব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুতঃ রামমোহনের আধুনিক যুক্তিবাদ ও মননশীলতার সঞ্জীবনী স্পর্শেই সর্বপ্রথম দীর্ঘকাল যাবৎ অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারে অভ্যস্ত আত্মজ্ঞান এবং আত্মবলহীন বাঙালির মুক্তি সূচিত হয়েছিল। তবে তাঁর এই মনের মুক্তির আন্তরিক প্রয়াস শুধুমাত্র বাংলা বা বাঙালি সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; জাতীয় ক্ষেত্রেও তিনিই সর্বপ্রথম জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করে তুলেছিলেন। একই সঙ্গে ন্যায় ও সত্যের উপাসক রামমোহন সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিতেও দ্বিধা করেননি। এমনকি ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট কর্তৃক জারিকৃত প্রেস অর্ডিন্যান্সেরও তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এজন্যই যথার্থ অর্থে রামমোহন রায় ছিলেন "ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ"।

তথ্যসূত্র :

১. পাল, বিপিনচন্দ্র; নবযুগের বাংলা, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪১৯।

২. মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন, ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, অক্টোবর ২০০০।
৩. রায়, অলোক; উনিশ শতক, প্রমা, কলকাতা, ২০১৫।
৪. গুহ, রণজিৎ; দয়াঃ রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা, তালপাতা, কলকাতা, ২০০৭।
৫. ভট্টাচার্য, প্রদ্যুম্ন, রামমোহন ও বাংলা গদ্য, বারোমাস, এপ্রিল, কলকাতা ১৯৯০।
৬. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার; রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৭৯।
৭. দাস, যোগানন্দ, রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন বা বাংলার জাতীয় ইতিহাসের মূল ভূমিকা, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলকাতা, ২০০৩।
৮. ঘোষ, অনিল চন্দ্র; বাংলার ঋষি, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কোলকাতা, ২০০৮।
৯. শাস্ত্রী, শিবনাথ; রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কোলকাতা, ২০০৩।
১০. চৌধুরী, সুবোধ; সাহিত্যিকা, কোলকাতা, ২০০৯।
১১. ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র; সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, জয় দুর্গা লাইব্রেরী, কোলকাতা, ২০০৮।
১২. Majumdar, Ramesh Chandra, On Rammohan Roy, Calcutta, Asiatic Society, 1972.
১৩. Joshi, V.C, (Ed.) Rammohan Roy and the process of Modernization in India, New Delhi, 1975.
১৪. Sarkar, Sumit, Rammohan Roy and the Break with the Path.
১৫. Majumdar, J.K; Raja Rammohan Roy and Progressive Movements in India, a selection from records, 1775-1188, Calcutta, Art Press, 1941.
১৬. Majumdar, B.B. History of Political Thought from Rammohan to Dayananda, Calcutta, Bookland, 1967.
১৭. Kumar, Ravinder, Essays in the Social History of Modern India, Oxford University Press, 1983.
১৮. Guha, Ramachandra; Makers of Modern India, Penguin Viking, New Delhi, 2010.

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পে নারীজগৎ

বিজয় কুমার স্বর্ণকার

সাম্প্রতিক কালের একজন জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। সত্তর দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত হয়ে মাত্র কয়েকটি গল্প প্রকাশ করেই রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ছিলেন তিনি। গতানুগতিক ধাঁচের লেখনির পরিবর্তে তিনি স্বতন্ত্র এক পথ বেছে নিলেন। স্বপ্নময় কোন স্বপ্ন-কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে ভাসলেন না। চেনা বাস্তব জগতের খুঁটিনাটি ঘটনাকেই তাঁর কথাবয়নে টেনে আনলেন। শহরের সব থেকে সরু ও অন্ধকার গলির দরিদ্রতম ও সাধারণ মানুষের কথা, একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের প্রান্তিক নিম্নবর্গের কথা, উপেক্ষিত অবহেলিত ও বঞ্চিত নারীদের কথা, মাটি-ঘেঁষা বিভিন্ন জাতি-উপজাতির জীবনকে স্বপ্নময় তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু করলেন। মোটকথা লেখনির বিষয়াঙ্গিক বৈচিত্র্যে, বাস্তবিকতায়, চমৎকার বর্ণনাকৌশলে এবং সর্বোপরি অভিনব আধুনিকতায় বর্তমান পাঠকমহলে স্বপ্নময় চক্রবর্তী এক জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখা প্রথম ছোটগল্পটি হল 'যোজন বিস্তৃত'। ১৯৭৪ সালে 'মধ্যাহ্ন' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। আর তাঁর প্রথম গল্পসংকলন হল 'ভূমিসূত্র' (১৯৮২)। এছাড়া অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলি হল—'অষ্টচরণ ষোল হাঁটু' (১৯৮৮), 'ভিডিও ভগবান নকুলদানা' (১৯৯৩), 'জার্সি গরুর উল্টো বাচ্চা' (১৯৯৪), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (২০০৩), 'পঞ্চাশটি গল্প' (২০০৬), 'সেরা ৫০টি গল্প' (২০১১), 'সব গল্প মেয়েদের' (২০১৭), 'রাক্ষসায়ন' (২০১৮), 'গরু গম্ভীর গরুতর' (২০১৮) ইত্যাদি।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পবৈচিত্র্যের মধ্যে কেবল শ্রেণিবিভাজিত সমাজের মানুষের জীবনচিত্রই উঠে আসেনি, আছে দেশভাগ ও স্বদেশপ্রেমের প্রসঙ্গ, নোংরা রাজনীতি, আধুনিক সভ্যতায় যান্ত্রিকতার প্রভাব ও সন্ত্রাস, আছে প্রেম-ভালোবাসার কথা, তেমনি অন্যদিকে বর্তমান সময়কালের প্রেক্ষাপটে নারীজগতের অন্দরমহলের বাস্তব কঠোর পরিচয়কে তিনি তাঁর কলমের মরমী স্পর্শে রূপদান করেছেন। স্বপ্নময় চক্রবর্তী রচিত নারীকেন্দ্রিক শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'স্নানযাত্রা' এবং 'মেয়েমানুষ অথবা কলাগাছ'।

'স্নানযাত্রা' গল্পটি একটি শ্রেষ্ঠ নারী মনস্তাত্ত্বিক গল্প। গল্পের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র বৃদ্ধা মনোরমা। পুত্রপ্রেমে অন্ধ, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, প্রতিহিংসা পরায়নী এবং শেষ পর্যন্ত অনুশোচনায় দগ্ধ, রক্তমাংসে গড়া এক জীবন্ত মা চরিত্রের নির্মাণ করলেন গল্পকার।

অপারস্নেহ ও বাৎসল্যগুণে মমতাময়ী জননী তার আপন মহিমায় সন্তানদের লালন-পালন করে থাকেন। মাতৃস্নেহের দ্বারা-ই একজন মা তার সন্তানদের আজীবন বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রাখবেন এটাই স্বাভাবিক। সন্তানও সময়কালে বৃদ্ধ বাবা-মার প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করবেন এটাই সত্য। কিন্তু এই স্নেহ যখন স্বার্থ-র সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তখন তার কোন মর্যাদা থাকে না। 'পুত্রপ্রেমে অন্ধ মা'-কে আমরা আমাদের পরিচিত সমাজে আকছার দেখতে পাই। কিন্তু স্বপ্নময় তাঁর 'স্নানযাত্রা' গল্পে কঠোর সেই বাস্তবকে দৃশ্যনীয় করে তুললেন। এই গল্পে 'মা'-কে সত্য সত্যই অন্ধ করে স্নেহান্ধ মায়ের রূপচিত্র অঙ্কন করলেন। অভিনব বর্ণনা কৌশলে যা হয়ে উঠেছে জীবন্ত ও বাস্তব।

কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পের শুরুতেই এক অভিনব চমক থাকে এবং টান টান উত্তেজনায় গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে। পাঠ শেষ না করে পাঠক গল্পটি ছেড়ে উঠতে পারে না। এক অদ্ভুত আকর্ষণে পাঠককে ধরে রাখে। সাধারণত ছোটগল্পের শেষে একটা সমাপ্তি ঘটে, কিন্তু স্বপ্নময় তাঁর বেশিরভাগ গল্প সমাপ্তি দিয়েই শুরু করেন। এতে করে গল্প পাঠে একটা সাসপেন্স থাকে। গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, ছেলে অরুণ ও নাতনি মিতুলের কাঁধে ভর দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে মনোরমা বাড়িতে ঢোকে। চার বছর আগে দৃষ্টি গিয়েছিল তার, কর্নিয়াতে আলসার, পরে লিউকোমা। অনেক ডাক্তার দেখানো, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর করে শেষপর্যন্ত চোখের কর্নিয়া ট্রান্সপ্লান্টেশন করে চার বছর পর আবার দৃষ্টি পায় মনোরমা। কিন্তু এবার তার চোখের মণি অরুণকে নয়, 'নতুন' চোখে এবার সে প্রথমেই পুত্রবধু গোপাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে ছেলের কাছে। ভুক্তভোগী অরুণ মাকে বলে, 'এটা তোমার চোখের পার্শিয়ালিটি মা'।[১] কিন্তু না, আর পার্শিয়ালিটি নয়, যা পূর্বে সে করেছিল ছেলের প্রতি। স্বপ্নময়ের মনোরমা চরিত্রটি আমাদের "চোখের বালি"র মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষ্মীকে মনে করিয়ে দেয়।

মনোরমার ছাব্বিশ বছর বয়সে তার স্বামী বৃন্দাবন মিত্র, এই বাড়ি ও কিছু ব্যাঙ্ক ব্যালান্স রেখে মারা যান। বিপত্নীক এই নারীর একমাত্র পুত্র অরুণই সর্বস্ব হয়ে ওঠে। "কতদিন ঘুমন্ত অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে আলো না নিবিয়ে। অরুণের মুখে দেখেছে ওঁর স্বামীকে। ঠিক ওঁরই মতো শীতকাতুরে, ওঁরই মতোই জড়িয়ে ধরে শোওয়া, ওঁরই মতো বায়না করা, দই-মিষ্টি খাওয়া। ওঁরই মতো অভিমানে মুখ ভার, ওঁরই মতোই মিটিমিটি চাওয়া, —ওঁরই মতো সব কিছু।

মনোরমা অরুণকে চোখের আড়াল করত না। স্কুলে গিয়েও বসে থাকত, টিফিনবেলায় খাবার খাইয়ে দিত, খাবার সময় অরুণের মাছের কাঁটা বেছে দিত, সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিত নিজের হাতে। স্নান করাতে গিয়ে মনোরমা একদিন দেখেছিল অরুণের চামড়া ফুঁড়ে উঁচিয়ে ওঠা কৈশোরকেশ। তখন মনোরমার শরীরে ঢং ঢং ঘন্টা বেজেছিল আশঙ্কার।"[২]

ফ্রয়েড মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানুষের আকর্ষণ একটু বেশি থাকা-ই স্বাভাবিক। পুত্রসন্তানের প্রতি মনোরমার আকৃষ্ট হওয়ার ঘটনাও স্বাভাবিক, তবে তার

একটা সীমা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মনোরমার মনস্তত্ত্ব এমন ভাবে তুলে ধরলেন গল্পকার, যা পাঠক সাধারণের কাছে একটা জোর ধাক্কা লাগে, অথচ এমন বাস্তব নারী চরিত্র-মানসিকতা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে। পুত্রের শরীরে যৌবনের আভাস দেখা মাত্রই পুত্র হারানোর আশঙ্কায় তটস্থ হয়ে যায় মনোরমা। যখন ছেলে তার সঙ্গে ঠিকঠাক কথা বলে না, শরীরে মায়ের হাত বোলানো সহ্য করে না, মা-কে জড়িয়ে ধরে আর শোয় না, বড় অসহায় লাগে মনোরমার। এক চরম আত্মসংকটে ভুগতে থাকা নারী শেষপর্যন্ত প্রতিহিংসাময়ী হয়ে ওঠে। বড় হয়ে চাকরি পেয়ে মায়ের স্নেহাঞ্চল থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া এবং স্বর্গীয় পিতার প্রতি ভক্তি কমে যাওয়াতে পলে পলে মনোরমাকে যন্ত্রণা দিতে থাকে। ছেলে বিয়ের যোগ্য হলে পাত্রী দেখা শুরু করে মনোরমা, নানান খুঁত ধরে অনেক বাদ দিতে থাকে। শেষে গোপা নামে গজদাঁতে মেয়ের মিষ্টি হাসিতে মোহিত হয়ে যায় অরুণ, কিন্তু মনোরমার পছন্দ নয়, কারণ—

'উঁচ কপালি খড়মপেয়ে কিংবা গজদন্ত
গৃহলক্ষ্মী নাহি হয়, নহে পয়মন্ত।'[৩]

শেষপর্যন্ত ছেলের জেদের কাছে হেরে গিয়ে গরদের শাড়ি পরে, কারুকাজ করা কুলোয় প্রদীপ জ্বালিয়ে গোপাকে বরণ করেছিল মনোরমা।

আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের বশে আনার জন্য একটি সুন্দর লাইন খুব করে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, সেটি হল—'সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে'। কিন্তু আবার যেখানে নারীই নারীর শত্রু, সেখানে কোনমতেই সুখী সংসারের আশা করা যায় না। নারীর আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা এবং অপর নারীর প্রতি প্রতিহিংসা কতটা বীভৎস ও কুরুচিকর হতে পারে, সেদিকটিও স্বপ্নময় চক্রবর্তী দেখালেন তাঁর স্নানযাত্রা' গল্পের মনোরমা চরিত্রে। গোপাকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনলেও কিছুতেই আর সহ্য করতে পারে না। পুত্র হরানোর যন্ত্রণায়,হাহাকার,হতাশাও শূন্যতায় অন্তর্জ্বালায় ছটপট করতে থাকে সে।

"ওদের ফুলশয্যার দিন মনোরমার নিজের খাটটাকে মনে হয়েছিল একটা পোড়া মাঠ। পাশের বালিশ দুটো সমাধিফলক। অরুণ আর শোবে না এই খাটে, আর শোবে না মায়ের পাশে। অরুণের গায়ের সিগারেটের গন্ধ আর পাবে না মনোরমা। আর শুনবে না অরুণের মৃদু নাক ডাকার শব্দ, ছেলেটা পর হয়ে গেল। অন্য এক অচেনা মেয়ের সম্পত্তি হয়ে গেল।"[৪]

আসলে মৃত স্বামী বৃন্দাবনের প্রতিচ্ছায়া তার ছেলের মধ্যে দেখতে পেতেন মনোরমা। ছেলের রূপ-গন্ধ-ভালবাসায় বিভোর থাকত এই নারী। স্বামী হারানোর যন্ত্রণা যেন অনেকটাই ভুলে থাকতেন। কিন্তু এখন পর-নারীর হাতে পড়ে তার ছেলে যেন পর হয়ে হয়ে। চরম আত্মসংকটে পড়ে যায় মনোরমা। অসহ্য এই মানসিক রোগ শারীরিক ব্যাধিতে পরিণত হয়। দুসপ্তাহের পর এক রাতে বুকের যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে। এরপর থেকে অরুণ মায়ের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে। প্রেগনেন্ট গোপা বাপের বাড়ি গেলে মনোরমা যেন সোনাছেলে ফিরে পেল, বিছানা আলো করে আবার তার পাশে

ছেলেকে পেল, আবার তার স্বামীর এক অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করতে লাগল। গোপার নামে নানান অনুযোগ অভিযোগ শোনাতে থাকে ছেলেকে, বহুদিন পর আবার যেন পোড়া মাঠে বৃষ্টি পড়তে লাগল। মনোরমা অরুণকে বলে—

'আমি তোকে যত ভালবাসি, তোর বউ তোকে ততটা বাসে?'[৫]

বলে বসে,'আর কটা তো দিন। বউমা চলে এলেই তো আবার ওঘরে চলে যাবি তাই না?'[৬]

সত্যি নারী চরিত্র বোঝা খুবই মুশকিল। স্বার্থপর এই মায়ের বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারে না অরুণ। হিংসায় জ্বলে ওঠে গোপাও। শ্বশুরবাড়িতে দেখা করতে গেলে গোপা অরুণকে বলে—

'তোমার মা এখননিশ্চয় ভালোআছেন।বলে,তোমার মায়েরসঙ্গে শুচ্ছ তো এখন?'[৭]

আসলে কোনো নারীই তার অধিকারে কাউকে ভাগ বসাতে দিতে চায় না। প্রত্যেক অধিকারের একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। সেই সীমাকে লঙ্ঘন করে মনোরমা।

'ছেলে বিয়োলাম বউকে দিলাম'[৮]

একটা অসহ্য প্রতিহিংসায় ঝাঁজরা হতে থাকে মনোরমা। অভিমানী গোপা আট মাসের মিতুলকে কোলে নিয়ে ফিরে এলে, আবার ছেলে অরুণকে কেড়ে নেয়, নিজেকে তার মনে হতে থাকে বঞ্চিত, অবহেলিত। স্বামীহীনা এই নারী ক্রমশ নিরাপত্তার অভাবে যেন মানসিক রোগী হয়ে যায়। তার ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত জ্ঞান থাকে না। এক রাতে কান পাতে ছেলে-বৌমার ঘরে, যা অত্যন্ত কুরুচিকর,

"কান খাড়া করে রেখেছে মনোরমা—পাশের ঘরের শব্দ শুনবে। আজ ওদের খুব মজা। মিতুল নেই। নির্ঝাঞ্ঝাট। মনোরমার শরীরে শয়তান ভর করে যেন, যেন নিশি পায়। মনোরমা বিছানা ছাড়ে। উনুনের ধোঁয়ার মতো ধীরে ঘর ছাড়িয়ে পাশের ঘরের বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে অন্ধকার জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মশার ডাকে ছি ছি বাজে। জানালায় পর্দা ফেলা কিন্তু জানালা খোলা। ভিতরে নীল আলো। মনোরমা নিজে অন্ধকার হয়ে গিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিশে পর্দার কৃপণ ফাঁকা দিয়ে আলো-আঁধারি মাখা কয়েকটা ভগ্নদৃশ্য দেখেছিল।"[৯]

নারী চরিত্র সত্যই বড় রহস্যময়। এই নারী মনস্তত্ত্বের একেবারে তলানিতে যে গোপন কথাগুলি ঘোরাফেরা করে, সেসব কথাকে গল্পে টেনে আনলেন নারী চরিত্রের রূপকার স্বপ্নময়। যে কথা ভাবতে-শুনতে খারাপ লাগলেও অত্যন্ত বাস্তব। পুত্রস্নেহে অন্ধ এমন বেআক্কেলে মা কদাচিত থাকে যারা চোখের মণি ছেলেকে আজীবন আঁচলবন্দি করে রাখতে চায়। এরপরই মনোরমা সত্য সত্যই অন্ধ হয়ে যায়। যা এ-গল্পের মূল ব্যঞ্জনাবাহী। মনোরমা জানে 'সেই পাপে'ই চোখ গেছে তার। সেই গভীর রাতের পর থেকেই চোখে জ্বালা, চুলকানি পরে জল পড়া এবং শেষে অন্ধত্ব।

বিপরীতে গোপাও প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না। শাশুড়ির অন্ধত্বে সে যেন খুশিই হয়। গোপা ঠিক জানে, চোখ গেলেও কান ঠিক আছে শাশুড়ির। মনোরমার সামনেই

চলে তাদের দম্পত্যের খুনসুঁটি। দৃশ্যটির জীবন্ত বর্ণনা করেছেন স্বপ্নময়,—

"গোপা তখন অরুণের হাতটা ধরল। গোপা হাসছে। গজদান্ত হাসি। ভীষণ নিষ্ঠুর লেগেছিল হাসির ওই মিষ্টিপনা। গোপা পট করে একটা চুমু খেয়ে নিল অরুণের গালে। অরুণ অবাক তাকালে, গোপা অনুনাসিক যৌনস্বরে বলেছিল, উনি দেখতে পাননি তো ...।"[১০]

এরপর অরুণ থাপ্পড় মারলে, মা-ছেলের সম্পর্ক জড়িয়ে বিচ্ছিরি ও অশ্লীল সব গালাগাল দিয়ে স্বামীর ঘর ছেড়েছিল গোপা।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম মানুষ বোঝে না— এই কথাটি চিরসত্য। বিপত্নীক বৃদ্ধা মনোরমা একমাত্র সম্বল পুত্র অরুণ। তার এই চোখের মণিটিকে কোন মতেই আড়াল করতে চায়নি। ছেলেকে বিয়ে দেওয়ার পরও নিজের স্নেহ আঁচলেই আবদ্ধ করে রাখতে চাইলেন। কিন্তু এতে বাধা পেয়ে তিনি হয়ে উঠলেন হিংসা পরায়নী। পুত্রের প্রতি স্নেহদৃষ্টি আর পুত্রবধূর প্রতি বিষ-দৃষ্টি হানতে থাকলেন। এরকম চলতে চলতে তিনি একসময় সত্য সত্যই অন্ধ হয়ে গেলেন। চোখ থাকতে যিনি কোনদিন পুত্রবধূ গোপাকে সুনজরে দেখতে চায়তেন না, তাচ্ছিল্য করে গেছেন, পুত্রের প্রতি ভালবাসাতে ভাগ বসিয়েছে বলে বরাবর কুদৃষ্টিই হেনেছেন। একে একে সব মনে পড়ে যায় মনোরমার। পুত্রবধূ গোপার প্রতি কী অন্যায়টাই না করেছিল। কঠোর এই শাশুড়ি বৌমার জন্য বিন্দুমাত্র ভালবাসা বর্ষণ করে নি। সব সময় পুত্র হারানোর ভয় ও নিরাপত্তার অভাবে হয়ে উঠেছিল প্রতিহিংসাময়ী নারী। সব কথা স্মরণ করে আজ মনোরমার বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে, অশ্রুজলে চোখ মন শরীর সব ভিজে যায়। এখন অন্ধ হয়ে আবার দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার বাসনা হয় মনোরমার, পুত্রবধু গোপাকে আবার দেখবেন বলে, মাতৃস্নেহের দ্বারা তাকে এবার আপন করে নিতে চায়।

এত সবের জন্য নিজে-ই যে দায়ী সে কথা জানে মনোরমা, অনুশোচনা হয় তার। কিন্তু কিছু করার থাকে না। আজ চার বছর পর অন্ধত্ব কাটিয়ে বিধাতা যেন তাকে 'নতুন চোখ' দিয়েছে। এই নতুন চোখে প্রথম সে গোপাকেই দেখতে চেয়েছে। এই নতুন চোখে সে এবার নতুন জীবন শুরু করতে চায়। যে জীবনে থাকবে ছেলে, ছেলের বৌ গোপা ও তাদের মেয়ে মিতুল। আজ গোপাকে না দেখতে পেয়ে অশ্রুভারে চোখ ঝাপসা হয়ে যায় মনোরমার। খুব অত্যাচার করেছে সে গোপার প্রতি। মেয়ে মিতুলের অনেক অনুনয় বিনয়ে গোপাও চারবছর পর এই বৃন্দাবন ধামে আসে। চার বছর পর দুই নারী দুই দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশ দেখতে থাকে। মনোরমা অতীতস্মৃতি নিয়ে, ছেলে-বউ-নাতি নিয়ে এবার সুখের সংসার করতে চায়। আর গোপা এই সংসার চিরতরে ছাড়ার আগে আর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। শাশুড়ি বউমায় চোখাচোখি হলেও কোন কথা হয় না। বড় অভিমানী এই নারী। শাশুড়িকে বলে— "আপনার কথা মনে হত। আসতেও ইচ্ছা করত। ডাকেননি তো কখনও। এবার চলি। সাবধানে থাকবেন।"[১১]

গল্পের শেষে এসে দেখা যায় শাশুড়ি-বউয়ের আর একে অপরের প্রতি আর কোন

দ্বেষ-হিংসা থাকে না। সময়ই যেন এই উভয় নারী চরিত্রকে বদলে দিয়েছে। গল্প যত ক্লাইমেক্সের দিকে এগোতে থাকে, পাঠকেরও শ্বাস-প্রশ্বাস যেন থেমে যায়। একরকম প্রশান্তি বিরাজ করে পাঠকমনে। মনোরমা চরিত্রকে রক্তমাংসে গড়া আরও জীবন্ত করে আঁকলেন স্বপ্নময়। মনোরমা চায় গোপা যেন না যায়। অরুণকে, মিতুলকে ও তাকে ছেড়ে যেন না যায়। সে গোপার হাতটা রথের রশির মতো ধরে অরুণের ঘরে দিয়ে আসে। মনেপ্রাণে চায় তারা যেন আবার এক হয়ে যায়। ছেলে-বউয়ের সুখি দাম্পত্যের প্রার্থনা করে সে ঈশ্বরের কাছে। তার ইচ্ছে করে বৌদি হয়ে তাদের ঘরের বাইরের শিকল তুলে দেয়। এক নিষিদ্ধ দৃশ্য সে কল্পনা করে। না, এই দৃশ্যে আর কোন হিংসা নেই, আছে এক নির্মল-সুন্দর আনন্দ। মনোরমার মনে পূর্বের এমন একটা নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখেই তার চোখ গিয়েছিল। আবারও ওরকম একটা দৃশ্যের সে পুনরাবৃত্তি চায়। বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া একটি পরিবারের আবার পুনর্মিলন চায়। দেখতে চায়। এখনই। এতে তার চোখ যায় যাক। চোখের কর্নিয়া-রেটিনায় লেগে থাক এই দৃশ্য। শেষ দৃশ্য। চোখের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা চরিত্রের এই যে দৃষ্টভঙ্গির পরিবর্তন—এখানেই গল্পটি আমাদের স্বর্গীয় আনন্দ দান করে। গোপা শেষবারের মত বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আজকে তার জন্যই চিরদিনের মত গোপা স্বামীকে, শাশুড়িকে, মেয়েকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। চেষ্টা করেও সেই ক্ষত, সেই ফাটল জোড়া লাগাতে পারল না। মনোরমার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। তবুও শেষ আশা ছাড়ে না। চলে যাবার সময় গোপাকে বলে—

"আবার এসো। গোপার মাথায় হাত রাখল। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে মাখিয়ে দিল ন্যাপথলিনের গন্ধমাখা প্রাচীন বাক্সের পুরোনো আদর।

তখন গোপা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। ক্রমশ ঝাপসা। কারণ মনোরমার চোখের আনাচে-কানাচে বেয়ে তখন জল। যে চোখটা এতদিন অন্য শরীরে ছিল, স্নান করে নিল আজ। স্নানযাত্রা।"[১২]

স্বপ্নময় চক্রবর্তী সাধারণত সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত এবং বঞ্চিত নারীদেরকেই তাঁর গল্পের নায়িকা হিসেবে নির্বাচন করেছেন। বহুদিন ধরেই এই নারীরা নির্যাতিত, অপমানিত। ২০২১ সালের সামাজিক সমানাধিকারের যুগে এসেও নারীরা তার যোগ্য সম্মান পেল না। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সাধারণ নারী হিসেবে জন্ম নেওয়াটা যে কতটা কষ্টের, কতটা দুর্ভোগের, তার প্রামান্য দলিল স্বরূপ একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'মেয়েমানুষ অথবা কলাগাছ'। নামকরণটি বিশেষ ইঙ্গিতবহ। গল্পপাঠের পূর্বেই আমাদের জানা হয়ে যায় কী বলতে চলেছেন গল্পকার। অর্থাৎ মেয়ে মানুষকে তিনি কলাগাছের সঙ্গে তুলনা করলেন। শুনতে খারাপ লাগলেও কঠোরভাবে বাস্তব। কলা খেয়ে যেমন কলাগাছ কেটে ফেলা হয়, আর জলে ফেলামাত্র তা ভেসে যায়, তেমনি নারীর প্রয়োজন মিটে যাওয়া মাত্র তাকে ছুঁড়ে ফেলে কিছু স্বার্থপর পুরুষ। 'মেয়েমানুষ অথবা কলাগাছ' তেমনি লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং ভেসে যাওয়া নারীর জীবন ইতিহাস।

গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র বিদিশা। মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূর রোজকার রুটিং অনুসারে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করা, টাইমে টাইমে বাতিক শ্বশুরের সেবাযত্ন করা, তারপর সারাদিনের খাটুনির শেষে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্ধরাতে ফেরৎ মদ্যপ কামুক স্বামীর শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া—সবকিছুই বিদিশাকে সহ্য করতে হয়। কী করবে, সে তো অসহায় নারী, স্বামীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা মত সে চলতে বাধ্য। স্বপ্নময় আর একটি ঘৃণ্য বাস্তবকে বেপর্দা করলেন এগল্পে। অনেক সময় প্রমোশনের জন্য অফিসের বস-কেও খুশি করার জন্য নিজ নারীকেও এগিয়ে দেয় এই পুরুষ সমাজ। হিতেশ তরফদার নীলাঞ্জনের অনুপস্থিতিতে বিদিশাকে ফোন করলে এবং এতে বিদিশা বিরক্ত প্রকাশ করলেও নীলাঞ্জনের কোন আপত্তি থাকে না, কারণ হিতেশ হল নীলাঞ্জনের অফিসের বস। ঘটনাচক্রে দুশ্চিত্র হিতেশের গায়ে হাত দিয়ে 'লক্ষ্মীমেয়ে' বলা বিদিশার অপছন্দ লাগলে নীলাঞ্জন তাকে 'আনসোস্যাল' বলে ভর্ৎসনা করে। নিজের এই নারীজীবন নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে বিদিশা। কলেজে পড়া কালে একজনকে ভাল লেগেছিল তার। একসঙ্গে এস এফ আই-এর অলোক। কিন্তু গরিব বলে, না বুঝে ইঞ্জিনিয়ার নীলাঞ্জনের হাতে দিয়ে সুখে মরেছিল বিদিশার বাবা। কিন্তু ধীরে ধীরে তার জীবন হয়ে ওঠে বিবর্ণ। স্বাধীনতা বলে কিছু পায়নি সে। ভয় করে তার। নারী-নিগ্রহের প্রতিকার চেয়েছিল এবং দুষ্কৃতিদের শাস্তির দাবীতে সে চিৎকার করেছিল। কিন্তু এই নারীর প্রতিবাদী কন্ঠ থামিয়ে দেয় নীলাঞ্জনেরা। এক অদৃশ্য মানসিক খাঁচায় বন্দী বিদিশা ছটপট করতে থাকে। তার ভয় করে। 'খাঁচার ভিতরে বসে মুরগি অন্য মুরগিটার মাংস হয়ে পলিথিন প্যাক হয়ে যাওয়া নিশ্চুপ দেখে'।[১৩] অন্যান্যদের থেকে অনেক ভাল থাকলেও তার জীবনতরি ভেসে গেছে। তাই দেখা যায় বিদিশা নীলাঞ্জনকে ছেড়ে নিরুদ্দেশে ভেসে যায়।

মানবদরদী শিল্পী স্বপ্নময় সচেতন ভাবেই এগল্পে দেখালেন যে, যেখানে একটি মধ্যবিত্ত বাড়িতে নারীর মান-সম্মানের কোন বালাই থাকে না, সেখানে অসহায়, দরিদ্র, নিম্নশ্রেণির এবং বস্তিবাসী নারীদের জীবনচিত্র কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা নির্মোহ ভাবেই তুলে ধরলেন। এগল্পে এমন দুটি নারী চরিত্র হল—চিনু ও বাসন্তী। 'মেয়েমানুষ অথবা কলাগাছ' নামকরণটি গল্পের এই নারী চরিত্র দুটির জীবনচক্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

চিন্ময়ী ওরফে চিনুকে প্রথমত শিবশম্ভুধাম নামের এক ব্রাহ্মণ বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে দেখা যায়। পরণের বস্ত্র ও ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সে বাড়ির সমস্ত কাজ করে। তারপর পুরী দেখার টোপ গিলে ফেলে এই সহজ সরল বালিকা। বাইরে থেকে দেখে এই পরিচারিকাদের জীবনকে স্বাভাবিক মনে হলেও তাদের পেছনের জীবন খুব একটা মধুর থাকে না, বেশিরভাগটাই থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনুসন্ধানী গল্পকার স্বপ্নময় যেন টর্চলাইটের মাধ্যমে এই উপেক্ষিতা নারীদের অন্ধকার জীবনের প্রতি আলোকপাত করে সেই অচেনা জগৎকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

এই চিনুকে ভাসিয়ে দিয়ে যায় তার মা। একুশে ফেব্রুয়ারির রক্ত আর খান

সেনাদের ভয়ে মায়ের সঙ্গে এপার বাংলার হৃদয়পুরে মামার বাড়িতে চলে আসে চিনু। কিন্তু হৃদয়হীন মামা তাদের একটু থাকার জায়গা ও পেটের জন্য ঘরের ঝি-এর কাজ করিয়ে নেয়। মা মারা গেলেও মামা দয়া দেখায়নি। তারপর কলেজপড়ুয়া মামাতো ভাই চিনুর শরীরের দিকে কুদৃষ্টি হানে। চিনুকে নিয়ে এলাকার ছেলে-ছোকরারা কুৎসিত ছড়া কাটে—'কও তো দেখি আমের ছাল? আমের ছাল। তোর পিসতুতো বোন আমাদের গেরামের মাল।'[১৪] কেউ প্রতিবাদ করে না। অত্যন্ত সংকুচিত হতে দেখা যায় অসহায়া এই নাবালিকাকে। বাড়ির নিন্দা হবে বলে এই মামা চিনুকে বলে—

"চিনুরে, এই বাড়িতে আর থাকিস না। তোর দিকে চ্যাংড়াগো কুনজর। তোরে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি দি। খাবিদাবি, থাকবি ভালো। বিয়ার সম্বন্ধ দেখি, কিছু হইলে খবর দিমু।"[১৫]

প্রথমত মা ফাঁকি দিয়ে গেছে, তারপর মামা তার দায় ঝেড়ে ফেলেছে। এমন প্রতিশ্রুতি তো মন ভোলানোর জন্য। সত্যি এই সহজ সরল অবলাদের অতি সহজেই বশে আনা যায়, তারপর প্রয়োজন মিটে গেলে আবার ছুঁড়েও ফেলা যায়। হতাশ চিনু দেখে কত মেয়ের বিয়ের বাজনা বাজে, কিন্তু মামার আর দেখা নেই। যেখানে নিকট আত্মীয়রা এই অনাথ চিনুকে ফাঁকি দেয় সেখানে অপরজন নীলাঞ্জনরাই বা সম্মান করবে কেন, তার প্রতি সহানুভূতি বা তার ভবিষ্যৎ নিয়েই বা মাথা ঘামাবে কেন। আর তাইতো চিনুর প্রেমিক গ্রিলের রং মিস্ত্রি রনচার নাম একটি গ্যাং-রেপ কেসে জড়িয়ে যাবার পর পুলিশ চিনুকে থানায় নিয়ে যেতে চাইলে উদাসীন থেকেছে শিবশম্ভুধামের মালিক। বরং বাড়িতে গেস্ট আসায় কাজে ক্ষতি হবে বলে আগামী কাল থানায় গিয়ে চিনুকে পৌঁছে দিয়ে আসবে বলে নীলাঞ্জন পুলিশকে অনুরোধ করে। অর্থাৎ যে সমাজ-মাথাদের এই মেয়েদের রক্ষা করার কথা, প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর তারা কিন্তু পাশে দাঁড়ায় না। কাজের মেয়েরা কেবল যেন এক যন্ত্র, ছোটলোক। কিন্তু তারাও যে মানুষ, তাদের যে মান-সম্মান আছে, সুষ্ঠভাবে বাঁচার অধিকার আছে—এমনটা মনে করে না মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষেরা। কলকাতা শহরে বসবাসকারী মেকি ভদ্রলোকদের কুৎসিত, ভন্ড মুখোশকে তীব্রভাবে কটাক্ষের দ্বারা বেপর্দা করেছেন গল্পকার।

গল্পে বাসন্তী নামের আর এক ভেসে যাওয়া দুঃখিনী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। নীলাঞ্জন-বিদিশাদের বাড়িতে সে রান্নার কাজ করে। বাসন্তীর পেছনের জীবন মধুর নয়। স্বপ্নময় দেখালেন কীভাবে নারীলোভী দুশ্চরিত্র পুরুষরা এক নারী ভোগ করার পর পর-নারীতে ধাবিত হয় এবং তার ফলে এই অভাগিনী নারীদের জীবন কতটা দুঃসহ হয়ে ওঠে। আট মাসের গর্ভবতী বাসন্তীকে ছেড়ে কাঁচা বয়সের এক মেয়েকে বিয়ে করে চলে যায় বাসন্তীর স্বামী। কচি খোকাকে নিয়ে পৃথিবীকে অন্ধকার দেখেছিল বাসন্তী। কোথায় পাবে সে 'উড়কি ধানের মুড়কি', খোকার জন্য কোথায় পাবে 'আম কাঁঠালের ছায়া', 'ইষ্টিকুটুম পাখি', 'খাট নাই পালং নাই' নীল প্লাস্টিকে ঘুমোয় বাসন্তীর খোকা। এখানেও গল্পকার তুলে ধরলেন সেই সামাজিক কন্ট্রাস্ট। অসামান্য ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে ধনী,

আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর মানুষকে দিলেন তীব্র খোঁচা। শেষপর্যন্ত জমির প্রমোটারি দালাল কেষ্টর দয়াতে খালধারের বস্তীতে তার থাকার ব্যবস্থা হয়, কেষ্ট তার সন্তানকে খেতে দেয়। তবে কেষ্টকে মাঝে মাঝে শরীর দিতে হয়। না, আপত্তি করতে পারে না বিপদগ্রস্ত বাসন্তী। দুর্ভাগ্যবশত একটি গ্যাং-রেপের শিকার হয় বাসন্তীরা। ভদ্র বলে পরিচিত শহুরে মানুষদের রুচি কতটা নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের হয় এগল্পে তার ছবি ফুটিয়ে তুললেন গল্পকার। নিগৃহীত এই নারীদের প্রতি মালিকপক্ষেরা কোনরকম সহমর্মিতা দেখায়নি, বরং বস্তীর কোন কোন মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে—তা জানার কৌতূহল প্রকাশ করে রায়গিন্নি। অর্থাৎ নারী-ই যেখানে নারীর শত্রু। নীলাঞ্জন, রায়গিন্নিরা আর এই রেপিস্ট মেয়েদের কাজে রাখতে চায় না, কারণ তারা ভদ্রলোক, সমাজে তাদের একটা মান প্রেস্টিজ আছে। অর্থাৎ যত দোষ এই নির্যাতিতা নারীদের।

গল্পটি শেষ হয় একটি সুন্দর ভাষা ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে। শেষে দেখা যায়, ভেসে আসা তিন নারী চরিত্রই আবার কোথায় হারিয়ে যায়। স্ত্রী বিদিশাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে নীলাঞ্জন হঠাৎ পুকুরের মাঝখানে কী একটা ভাসতে দেখে সংশয় জাগে তার মনে। দত্তদের বাড়ির কলাগাছ বলে মনে হয়, কারণ কলাগাছ এমনই, "কলা খাওয়া হয়ে গেলে মানুষ গাছ কেটে ফেলে দেয়।"[১৬]

তথ্যসূত্র :

১। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, 'সব গল্প মেয়েদের', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, মাঘ ১৪২৪, পৃষ্ঠা-২৪।

২। তদেব, পৃষ্ঠা-২৭।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-২৮।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা-২৯।

৫। তদেব।

৬। তদেব।

৭। তদেব।

৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৩০।

৯। তদেব।

১০। তদেব, পৃষ্ঠা-৩১।

১১। তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩।

১২। তদেব, পৃষ্ঠা-৩৪।

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১১৫।

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-১১১।

১৫। তদেব।

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১১৬।

সুফিবাদ, ইসলাম ও তার রূপান্তর
ইমাম হোসেন

ইসলামের আদি যুগে, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমানাধিকার ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পরে নেতৃত্ব ও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে ইসলামি সমাজ। একজন খলিফার যুগ শেষ হতেই, দেখা দেয় বহু কেন্দ্রিকতা, অনৈক্য প্রাধান্য বিস্তার করে ইসলামি দুনিয়ায়। অচিরকাল মধ্যে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের সূত্রে আরবে ও অন্যত্র প্রাদুর্ভাব হয় ভোগবিলাস এবং শ্রেণিবৈষম্য। এ সময়ে আরবের বাইরে ইসলাম প্রচারিত হয় দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে নানা ধর্ম সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর জন্ম দিতে থাকে। আরবের পণ্ডিতরা তখন বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহে ও বীক্ষণে রত হয়েছিল। এ সময়ে ইসলামে গুপ্তগোষ্ঠী হিসেবে সুফিদের আত্মপ্রকাশ হয়। ধর্মের একমাত্রিক ব্যাখ্যা শিল্প-সাহিত্যের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জাতীয় রুচি নিয়ে নানা গোষ্ঠী সুফি নামে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলাম ধর্মে অতীন্দ্রিয়বাদ যে বিশেষ্য রূপ ধারণ করেছিল তাকেই সুফিবাদ বলা হয়। সুফিবাদ হলো ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তা ও অনুভব করার একটি বিশেষ পদ্ধতি। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে আল্লাহ ও ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে গভীর অনুভূতি এবং ঐ গুলির ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভের মানবিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই এর ভিত্তি নিহিত।

খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের মত শুরুতেই কঠোর তপশ্চর্যা তথা ধ্যানাভিমুখি জীবনের চর্চা করলেও দ্বিতীয় মুসলিম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে খ্রিস্ট ধর্ম, নিও প্লেটোনিক চিন্তা, খ্রিষ্টানদের অতীন্দ্রিয়বাদ ও বৌদ্ধ ধর্মের অনেক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে সুফিবাদ এক পৃথক বিশ্বাসী আন্দোলনে পরিণত হয় এবং অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক ও সর্বেশ্বরবাদী চিন্তার স্তর অতিক্রম করে। খ্রিস্টান ধর্মে যাজক ও শিক্ষানবিশের যে সম্পর্ক ১৩শ শতাব্দীতে যে সুফি তারিকা গড়ে উঠেছিল তারমধ্যে তেমনি শিক্ষক (শাইখ) ও শিক্ষানবিশের (মুরিদ) সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়।

সুফি শব্দের এবং মতবাদের উদ্ভব বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে 'সুফ' অর্থাৎ ছাগল বা ভেড়ার লোম থেকে সুফি নামটি এসেছে। প্রথমদিকে সুফিরা লোমের কম্বল ও পোশাক ব্যবহার করতেন। কেউ কেউ বলেন 'সাফী' অর্থাৎ ময়লা পরিষ্কারক ন্যাতাকানি থেকেই সুফি কথাটি এসেছে। কারণ, অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার লক্ষ্যেই সুফিরা নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। আরেক দল বলেন যে, মদীনার মসজিদের বারান্দায় যাঁরা পবিত্র মহম্মদের সময় থাকতেন সেই আসহাব-

ই-সুফফা অর্থাৎ বারান্দার অধিবাসীদের আদর্শ-ই সুফিরা গ্রহণ করেছিলেন এবং এই 'সুফফা' শব্দ থেকেই সুফি শব্দ নেওয়া হয়েছে। এখানে থাকতেন সংসার ত্যাগী বেশকিছু কয়েকজন মুসলমান ও পবিত্র মহম্মদের সাহাবী-যাদের অন্যতম ছিলেন পবিত্র আবু-হুরাইরাহ। আরেক দল মনে করেন গ্রিক শব্দ 'sofos' যার অর্থ জ্ঞানী তার থেকে সুফি শব্দ নেওয়া হয়েছে। সুফিরা নিজেদের কে সত্যকার জ্ঞানী বলে মনে করতেন। অন্যমতে, ইসলামি লৌকিক ঐতিহ্য এবং মর্ম মুখী চিন্তার ক্রমবিকাশে সুফিমতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। সুফিরা মূলত তাসাওয়াফ বা ফকরা নামে অধিকতর পরিচিত ছিল। সুফি, ফকির, দরবেশ, কলন্দর প্রভৃতি শব্দ গুলি কালক্রমে সমার্থক শব্দ হিসেবে ইসলামীর পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত হতে থাকে। ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতায় সুফি ও সমর্থক শব্দের অর্থান্তর ঘটে এবং বহুমাত্রিক অর্থে সম্পৃক্ত হয়।

সুফিদের সর্বপ্রথম গুরু নিয়েও মতভেদ আছে। আরবের সুফিরা প্রধানতঃ পবিত্র মহম্মদকেই তাদের প্রথম গুরু বলে মানেন। পবিত্র মহম্মদকে সুফিদের গুরু ধরে নেওয়া সঙ্গত। কারণ, তিনি আহার, পোষাক ও পরিচ্ছদের দিক থেকে অত্যন্ত সাধা সিধা ভাবে জীবন যাপন করতেন। গভীর রাতে ও ভোরের দিকে আল্লার এবাদত করতেন। প্রত্যাদেশ পাওয়ার পূর্বে তিনি ধ্যান করতেন নির্জনে। শিয়া সুফিরা আবার পবিত্র আলীকেই তাঁদের গুরু বলে মান্য করেন।পবিত্র আলী ও জীবন যাপন করতেন সাধারণভাবে। কথিত আছে, একবার তিনি একটা জায়গায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছেন খবর শুনে পবিত্র ফাতিমা বলেছিলেন না, তিনি মারা যাননি। তিনি আল্লার ধ্যানে তন্ময় হয়ে আছেন। যে অন্তর্নিহিত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল-তার চর্চা নিয়ে পবিত্র আলী ব্যস্ত ছিলেন। তবে আরব সন্নিহিত এলাকায় বহু সুফি হাসান-আল-বসরী (৬৪১-৭২৮ খ্রি:) কেই সর্বপ্রথম সুফি বলে স্বীকার করেন। হাসান-আল-বসরী বসরা শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি কৃচ্ছতা সাধন এর ধারণা সুফিদের মধ্যে প্রচলন করে। যার ভিত্তি ছিল খ্রিস্টান যাজক ও বৌদ্ধ শ্রমনদের ধর্ম ধারণা। হাসান-আল-বসরী ও এবাদত নিয়ে মশগুল থাকতেন। ঠিক সময়ে নামাজ পড়ার সময় পেতেন না। এই বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন আমি সাধনায় ব্যস্ত। তিনি ও পার্থিব কামনাকে নির্মূল করার উপদেশ দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন ঐ কাজ নামাজ পড়ার চেয়েও উত্তম। তার হৃদয় ছিল উদার।

সুফিরা আল্লার সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগ সাধন, পার্থিব কৃচ্ছসাধন এবং মনকে কলুষমুক্ত করার প্রয়াস করতেন। এরা মনে করেন, আল্লাকে বুদ্ধি দিয়ে পাওয়া যায় না। তাঁকে পেতে হয় হৃদয়ের আকুতি ও প্রেম দিয়ে। উপাসনা এবং প্রেমের দ্বারাই চরম পাওয়া সম্ভব।

পবিত্র মহম্মদ, তৎ শিষ্য পবিত্র আলী ও তৎ শিষ্য হাসান আল বসরী আর তার সমসাময়িক পঞ্চম ইমাম বাকির ও তৎ পুত্র ইমাম জাফর আল সাদিক পর্যন্ত অর্থাৎ ৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামে ব্যক্তিগত সাধনার এই ধারা অব্যাহত থাকে। তবে তখনো সুফি কথাটি চালু হয়নি। ষষ্ঠ ইমাম জাফর আল সাদিকের শিষ্য ইবনে হাইয়ান (মৃত্যু

৭৭৬ খ্রিস্টাব্দ)। সর্বপ্রথম সুফি মতবাদের সংগঠিত রূপ দান করেন। তখন সুফি বলতে একজন কঠোর তপস্বীকেই বোঝাত। ইবনে হাইয়ান কে একদল কৃচ্ছ্সাধক সর্বপ্রথম সুফি বলে উল্লেখ করেছেন। পরে যখন এই মতবাদ বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে তখন পবিত্র মহম্মদকেই প্রথম সুফি বলে ধরে নিয়ে তাঁকে কিংবা পবিত্র আলীকেই প্রথম গণ্য করে সুফি গুরুদের তালিকা প্রকাশ করা হতে থাকে।

মারুফ কারফী (৮১৫ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু) একজন সুফি সাধক যিনি সর্বপ্রথম অস্বীকার করেন অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধন কে। ইনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অষ্টম ইমাম আলী রির্জার শিষ্য ছিলেন। আল্লার প্রেমে অর্থাৎ অন্তরের আলোকে নিজেকে নিমজ্জিত রাখার ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হন। আল্লাকে পাওয়ার পথ যে প্রেম এবং তাই যে সাধনার শেষ কথা, মানুষের কামনার ও যে তাতেই নিবৃত্তি- এই মতবাদ তিনি প্রচার করেন।

মারুফ কারফীর আল্লার প্রতি অবিচল প্রেম এই তত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আবু সুলাইমান দারানী (মৃত্যু ৮৪৯ খ্রি:) আত্মাকে সাধনার দ্বারা পবিত্র করার বিষয়ে যত্নবান হলেন এবং এই গুণাবলী অর্জন করার পর পরম আত্মার সাথে সম্মিলনের মত প্রচার করেন। এই প্রকার জ্ঞানকে আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান ও অন্তর্নিহিত জ্ঞান বলে অভিহিত করেন, যা পরে মারিফাৎ বলে স্বীকৃতি পায়। তবে এই বিষয়ে চরম পথে যিনি সর্বপ্রথম যান তাঁর নাম জইন্নুল আল মিশরী (মৃত্যু ৮৬০ খ্রিস্টাব্দ)।ইনি ভবানন্দে বিভোর হয়ে,সমাবিস্থ হয়ে যেতেন।যাকে বলা হয় “ওয়াজদ” বা সমাধি। এর দ্বারাই আল্লাহ্ কে জানা যায় বলে তিনি ঘোষণা করেন।

সুফিদের মরমিয়া দিকটি সর্বোচ্চ বিকাশ হয় পারস্যের বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে। এঁরা ছিলেন সত্যকার আর্য এবং ইসলামের পূর্ব সময়ে অগ্নির উপাসক কিংবা বৌদ্ধ। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে ঐ সব এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মের সর্বশেষ পরিণতিতে - সর্বেশ্বরবাদ প্রচারিত হয়। প্রথমে জীবের মধ্যে এবং পরে সবকিছুতেই সৃষ্টিকর্তার প্রকাশ ও অস্তিত্ব আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। সুফিরাও এখন থেকে পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে আল্লার প্রকাশ ও অস্তিত্ব অনুভব করতে থাকেন। অতঃপর মরমিয়াবাদ তাকেই কেন্দ্র করে বিকশিত হয় ধীরে ধীরে।

পারস্য নিবাসী বায়েজিদ আল বিস্তামী (মৃত্যু ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ) ফানা বা মহামিলন বা অনুদর্শনের মধ্যে বিলীন হওয়া, সুফিদের মধ্যে প্রচার করেন। এটা বৌদ্ধ নির্বানের অনুকরণে বলে মনে করা হয়। বায়েজিদ বিস্তামীই সর্বপ্রথম সুফিবাদকে আধুনিক অর্থে সংগঠিত করেছিলেন। শুধু অন্তরের আলোক, প্রেম ও নির্বানের তত্বকেই নয়, আল্লার সীমাহীন অস্তিত্বকেও ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে—

১) আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নন।

২) তবু সমস্ত কিছুই আল্লাহ নয়। কেননা, সমস্ত কিছুই আল্লার মধ্যে। বায়েজিদ স্পষ্ট করে বলেছিলেন— “আমার পোষাকের তলায় খোদা ভিন্ন কিছু নেই। আমার জয় হোক।” পারস্য নিবাসী মনসুর হাল্লাজ অন্তরের আলোকের শিক্ষার গভীরে গিয়ে উপলব্ধি

করেন যে, তিনিই সত্য— তিনি আল্লাহ। অর্থাৎ সর্বেশ্বরের মতে সবকিছুতেই যেহেতু আল্লাহ বর্তমান— তাঁর প্রকাশ সম্ভব এবং তিনি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কিছু নেই। ৯২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর সামাধি বাগদাদে বর্তমান।

তারপর সুফিবাদের সমর্থনে ইমাম গাজ্জালী (১০৫৮-১১১১ খ্রিস্টাব্দ) বলেন, আল্লাহ ও সত্যকে জানার জন্য একজন মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে আল্লার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ স্থাপন করে তাঁর উপর নির্ভর করতে পারে। ইমাম গাজ্জালীকে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠতম তাত্ত্বিক এবং অন্যতম মহান ও মৌলিক চিন্তাবিদ বলা হয়। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। আশ আরিয়া মতবাদের চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন ইমাম গাজ্জালী এবং এই অনুশাসনকেই তিনি ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন আদর্শে পরিণত করেন। মুসলিমরা মনে করেন যে, পবিত্র মহম্মদের পর আর যদি কোন দৈববর্তা ঘোষণাকারী ধর্মপ্রচারক থাকত, তাহলে ইমাম গাজ্জালীই সেই পদের উপযুক্ত হতেন। রক্ষণশীল মতাদর্শের অনুগামী হিসাবে জীবন শুরু করলেও ইমাম গাজ্জালী একজন সুফি তে তে পরিণত হন এবং আত্মা ও মনের শান্তি খুঁজে পান। সুফিরা এই সময় বলতে শুরু করেন, ইসলাম হল অন্তরের ধর্ম। অন্তরে চলছে আলোর খেলা। অন্তরের আলোর দ্বারাই সৃষ্টিকর্তাকে জানতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সুফিদের প্রথম স্তর হল-নিয়ত বা দৃঢ় বাসনা। দ্বিতীয়-স্তর হল তওবা বা পাপ থেকে নিবৃত্ত থাকার প্রতিশ্রুতি। তৃতীয় স্তর হল-মুজাহদা বা এবাদতের প্রস্তুতি। এই স্তরে সাধক ষড় রিপূর ষড়যন্ত্র হতে মুক্তি পায়। আধ্যাত্মিক স্তরে সাধকের জন্য এটাই হলো আত্মসমর্পণের পথ। সাধনার চতুর্থ স্তর হল-মুকাশাফা বা আবরণ উন্মোচন। এই সময় সুফি সাধক তার পরম প্রেমিকের গন্ধ পাবে। স্বর্গীয় প্রেমের যে স্পন্দন সে তা আস্বাদ করবে তার সর্বানুভূতি পথে। পঞ্চম স্তর হল— 'মুশাহাদা' সাধক এই স্তরে পৌঁছে পরম প্রেমিকের স্পর্শ অনুভব করবে ধীরে ধীরে। তার অন্তঃস্থল পরিপূর্ণ হবে তাঁর প্রেমে ও পরম প্রাপ্তিতে। তারপর প্রত্যক্ষ করবে তাঁর প্রকাশকে, তাঁর আলোকে, তাঁর সত্যকে। অন্তিম বা ষষ্ঠ স্তরে সাধক তাঁর পরম প্রেমিকের প্রেমের তীব্রতা সহ্য করতে পারবে না। তাই তার ঘটবে হাল বা দশা প্রাপ্তি অর্থাৎ ভাব সমাধি। এই সর্বশেষ স্তরের নাম "ওয়াজদ" বা পরম প্রাপ্তির প্রশান্তি।

সুফি সাধক ইমাম গাজ্জালী এই সাধন পন্থাকে সমর্থন করেননি। তিনি তরিকতের পথে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সমগ্র সৃষ্টি কে তিনি ভাগ করেছিলেন দু-ভাগে-দৃশ্য ও অদৃশ্য। দৃশ্য জগত হলো 'আলম উল মুলুক' অর্থাৎ বস্তুজগৎ। এখানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও প্রগতি বিদ্যমান। তিনি অদৃশ্য জগতকে ভাগ করেন দু-ভাগে। প্রথম ভাগে আছে "আলম উল্ জবারুৎ"। এখানে থাকেন মহান সত্যসন্ধানী ও গুণবান ব্যক্তিবর্গ। এই স্তরটি বস্তুজগৎ ও পরবর্তী শুদ্ধাত্মা জগতের মধ্যবর্তী স্থান। অদৃশ্য জগতের দ্বিতীয় স্তরটি কে বলা হয় "আলম উল্ মলাকুৎ" ইমাম গাজ্জালী বলেছেন, এটি হলো মানুষের আত্মার স্তর। বিশিষ্ট সুফি ফারহাৎ এই স্তরকে জ্ঞানের স্তর বলেছেন।

ইমাম গাজ্জালী মতের সমর্থক গণ— আল্লার কাছ থেকে এসেছি আর সেখানেই

ফিরে যাবো — এই রূপ মত প্রকাশ করতেন। মানুষের আত্মা শেষ পর্যন্ত আল্লার নিকটবর্তী হয়। এই পথের শেষ পর্যায়কে 'ফানাফিল্লাহ' বলা হলেও সুফিদের বিভিন্ন মতবাদীরা কেউ একে হুলুল বা সম্মিলন, কেউ বা ইত্তিহাদ বা মিলন বলেছেন।

অন্যদিকে, সুফিদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ প্রচার করেন স্পেনের আলদীন ইবন আল আরাবী (১১৬৫-১২৪০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর সমাধি আছে দামাস্কাসে। তিনি খুব জোর দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন বিশ্বের সমস্ত কিছুই আল্লার অংশ এবং বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে তিনি বিরাজমান। তার গ্রন্থের নাম ফুসুস আল হীকাম, এটি সুফি দর্শন সংক্রান্ত পুস্তক। "ওয়াহ্ দেতাল ওজুদ" বা সর্বেশ্বরবাদ প্রচার করার পর তিনি প্রেমের পথে আল্লাহ্ কে পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করেন। তিনি আল্লাহকে পরম রমণী রূপ কল্পনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে আল্লাহ তাঁর নিজের আকারে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রেম ও মরমীয়াবাদের প্রচারে সর্বপ্রথম কলম ধরেন মিশরবাসী ইবন আল ফরিদ (১১৮১-১২৩৫ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'দিওয়ান' সুফিপ্রেম সঙ্গীতকে সাধনা স্তরে পৌঁছে দেয়। সুফিকাব্য ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান পারস্যের কবি গোষ্ঠী। মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি:)। ৬ টি খন্ডে প্রণয়ন করেন তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'মসনবী'-প্রায় তিরিশ হাজার ফরাসি শ্লোকের মাধ্যমে। তিনি যে কথাটি খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন তা হলো— "যুক্তি শয়তানের আর প্রকৃত প্রেমেই হলো মানুষের একমাত্র মূলধন"। তাই তিনি আল্লার প্রেমে মশগুল হয়ে সামা বা ঈশীগীতে মনপ্রাণ নিমজ্জিত করে ভাবনৃত্যে অংশগ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভাবাবেশে সমাধিপ্রাপ্ত হওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ভাব সমাধি দশা বা হাল— এইসবের মাধ্যমেই যে পরম সত্যকে জানা যায়— বলে তিনি মনে করতেন। মৌলানা রুমি প্রচার করতেন যে, সত্য, কল্যান, সুন্দর এবং মানুষকে ভালোবাসাই হচ্ছে "ইশ্ কে ইলাহীর পথ" যাকে তিনি বলেছেন "সিরাজুম মুনিরা" -শ্রেষ্ঠ আলোক বর্তিকা। পারস্য কবি হাফিজ ও শেখ সাদী সুফিদের প্রেম তত্ত্বের উপর কাব্য রচনা করেন।

প্রথম পাঁচটি ইসলামিক শতাব্দীতে সুফিবাদ বলে পরিচিত ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উপলব্ধির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। শিষ্য ও অনুগামীদের ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি কোন প্রেরণা দায়ক শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব বা স্মৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। নিজেদের মতাদর্শ প্রচার করে চলেছিলেন— নিজেদের শিক্ষা ও গুরুদের নির্দেশ মতো। কিন্তু তাঁরাও অবশেষে সংবদ্ধতার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং দ্বাদশ খ্রিস্টীয় শতকের শেষদিকে সমমনোভাবাপন্ন সুফিদের সংগঠন দানা বাঁধতে শুরু করে। সর্বপ্রথম যিনি সুফিদের একটি সংগঠনের বিষয়ে উদ্যোগী হন তাঁর নাম আবাদ আল কাদির জিলানী বা আল জিলী (১০৭৭-১১৬৬ খ্রিস্টাব্দ)। ইনি সুফি গুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন বাগদাদে। তাঁর মতবাদীদের বলা হয় কাদেরিয়া। তিনি সুফিদের জন্য যে সংঘ তৈরি করেন তাকে 'তরিকাহ' বা পথ বলা হয়। সবচেয়ে উদার ও সহিষ্ণু সংগঠনগুলির অন্যতম ছিল এটি।

প্রাচীনত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় সংগঠনটি হল রিফাঈ। ইরাকের অধিবাসী আহমদ আল রিফাঈ (১১৮৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু) এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। তারপর সুফিদের সংগঠিত করেন-মৌলানা জালাল উদ্দিন রুমি (মৃত্যু ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর শিষ্যদের বলা হয় নাচিয়ে দরবেশ। তিনি সর্বপ্রথম সঙ্গীতকে সাধনার অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করেন। আরও একদল সুফি যারা সংঘটিত হলো গুরু বা দরবেশ উপসনার প্রয়োজনে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে এই মত প্রচারিত হয়েছিল। এই মত মরক্কোতে প্রচার করেন আলী আল সাধিলী (মৃত্যু ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে)।

তসবী জপ করার প্রণালী অর্থাৎ আল্লার নাম জপ করার প্রণালী সুফিরাই প্রবর্তন করেন। বিখ্যাত সুফি জুনায়েদ আল বাগদাদী (মৃত্যু ৯১০ খ্রিস্টাব্দ) তসবী ব্যবহার করতেন তারফলে হতো তার ভাবসমাধি। তসবী জপ করার প্রণালী সুফিরা গ্রহণ করে খ্রিষ্টানদের কাছ্ থেকে। জুনায়েদ আল বাগদাদী কে যখন বলা হয় এটা নতুন উদ্ভাবন যা মূল ইসলামে নেই। তখন তিনি বলেছিলেন যেহেতু এটা আমাকে আল্লার কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করে তাই, তাকে আমি পরিত্যাগ করব না।

সুফি-সাধকগান স্বর্গীয় বিশুদ্ধতাকে হৃদয়ে ধারণ করে পৃথিবীর সেবা করার দিকে নজর দিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের সাধনার দ্বারা অন্তরের ও চরিত্রের সর্বোত্তম বিকাশ সাধন। তাঁরা বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিলেন। মানুষের কল্যাণ, উন্নতি এবং সাহায্যের জন্য তার প্রাণপণ করেছিলেন। মানুষের স্বার্থকেই তাঁরা শিরোধার্য করেছিলেন নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে এবং তা করাকেই তারা ধর্ম আচরণ বলেও বুঝেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আরব জাতির ইতিহাস- ফিলিপ কে হিট্টি- মল্লিক ব্রাদার্সৎ

২. লালন ভাষা অনুসন্ধান- আবদেল মান্নান- রোদেলা প্রকাশনী।

৩. তাজকে রাতুল আউলিয়া- শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার- সোলে মানিয়া বুক হাউস।

৪. দি স্পিরিট অফ ইসলাম-সৈয়দ আমীর আলী- ঝিনুক প্রকাশনী।

৫. A history of sufism in India- Saiyid Ather Abbas Rizvi-Munsiram Manoharlal Publisher.

৬. বাস্তুবাদী বাউল-শক্তিনাথ ঝা-দে'জ পাবলিশিং।

৭. সুফিতত্ত্ব -ইমাম গাজ্জালী সোলে মানিয়া বুক হাউস।

৮. ইসলামী ইতিহাস - আবু মুসআব ওসমান -যাকতা বাতুল হাসান।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগরায়ণ (১৯৫১-২০০১)

প্রণব মিস্ত্রী

মানুষ ক্রমশ গ্রাম থেকে শহরমুখী হচ্ছে কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনমানের আশায়। ফলত ভারতের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে শহরগুলি সংখ্যায় ও আয়তনে বাড়ছে। মহানগরগুলিতে এই পরিবর্তন অনেক বেশি গতিশীল। স্বাধীনতার পূর্বে অর্থাৎ উপনিবেশিক সময়ে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বিচার করলে দেখা যাবে যে বেশির ভাগ মানুষই কৃষিজীবী এবং তারা গ্রামে বসবাস করত। সেই সময় শহরের সংখ্যা যেমন কম ছিল তেমনই শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাও কম ছিল। অর্থাৎ উপনিবেশিক সময়ে নগর সেই ভাবে বিকাশ লাভ করেনি।[১] বিংশ শতকের প্রথমে অর্থাৎ ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেখা গেছে মাত্র ২৫.৮ মিলিয়ন (১০.৮ শতাংশ) মানুষ শহরে বসবাস করত। যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৬.১ মিলিয়নে (২৭.৮শতাংশ) পরিণত হয়েছে।[২] ১৯২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ২৮ মিলিয়ন মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করত। ১৯৫১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬২ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।[৩] ১৯৫১ সালের পর থেকে শহরাঞ্চলে মানুষের বসবাস দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮১ সালে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১৬০ মিলিয়নে পরিণত হয়।[৪] ২০০১ সালে ২৮৫ মিলিয়নের বেশি মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করে যা বিশ্বের শহুরে জনগণের ১০ শতাংশ এবং এশিয়ার ২১ শতাংশ। বর্তমানে (২০১১) ৩৭৭ মিলিয়ন মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করে (প্রায় ৩১ শতাংশ), যা ইউনাইটেড স্টেটস-এর জনসংখ্যার থেকে বেশি।[৫] শহুরে মানুষের দ্রুত বৃদ্ধির কারণে দেখা গেছে ১৯০১ সাল থেকে ২০০১ সালের মধ্যে যেখানে ভারতের জনসংখ্যা মাত্র ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে শহুরে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ গুণের বেশি এবং শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২ গুণের একটু বেশি (১৮২৭ থেকে ৪৩৬৮টি)।[৬] অথচ প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯১১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত শহরের জনসংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষের কারণে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে অভিবাসিত হয়ে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু ১৯১১ সালে শহরাঞ্চলে প্লেগ রোগ জনিত মহামারির কারণে শহরাঞ্চলের মানুষ গ্রামাঞ্চলে অভিবাসিত হয়ে যায়।[৭] ফলত এই সময় শহরের সংখ্যা হ্রাস পায় (১৮২৭ থেকে ১৮১৫টি)।[৮] ১৯৩১ সালের পর ধীরে ধীরে শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নগরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪১-৫১ সময় কালে ভারত বিভাগ

জনিত কারণে নগরের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় (৪১.৪ শতাংশ)। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল চার দশকে (১৯০১-৪১) নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৮.৩ মিলিয়ন সেখানে মাত্র এক দশকে (১৯৪১-৫১) সম পরিমাণ (১৮.৩ মিলিয়ন) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৯] ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৬০০টি নগর গড়ে উঠেছিল।[১০] ভারতের নগরায়ণে বিশেষভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত হয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ২০ বছরের মধ্যে (১৯৫০-৬৮) জাতীয় আয় দ্বিগুণ এবং ২৫ বছরের মধ্যে (১৯৫০-৭৪) মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ করা।[১১] প্রথম পরিকল্পনার সময়কাল ছিল ১৯৫১ সালের এপ্রিল ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়কাল ছিল ১৯৫৬ সালের এপ্রিল ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল যথাক্রমে ১১-১২ শতাংশ এবং ২৫ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৩.৫৬ কোটি টাকা।[১২] দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪৩ কোটি টাকা। পরে বৃদ্ধি করে ৪৮ কোটি টাকা করা হয়েছিল।[১৩] প্রথম পরিকল্পনার থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ও খনির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। পাশাপাশি ৮ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।[১৪] অর্থনৈতিক বিশেষ করে নগরোন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তোলে। এই সময়কালে গড়ে ওঠে মিনিস্ট্রি অফ আরবান অ্যাফিয়ারস, দ্যা ন্যাশনাল বিল্ডিং অর্গানাইজেশন, দ্যা স্কুল অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার ইন নিউ দিল্লী, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলোজি খড়গপুর প্রভৃতি। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল আবাসন প্রযুক্তির উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষিত নগর পরিকল্পক তৈরি করা। তদুপরি নগর সমস্যা সম্পর্কিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলিকে পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৫৭ সালে টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন দিল্লী নগর পরিকল্পনার মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করেছিল, যা অন্যান্য নগর পরিকল্পনার আদর্শ পরিকল্পনা (মডেল প্ল্যান) হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল।[১৫] পরে দিল্লী নগর পরিকল্পনার ধাঁচে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে নগর পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৫৯ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জমি অধিগ্রহণ ও জমি উন্নয়নের জন্য (যেখানে পর্যাপ্ত নির্মাণ কার্য করা যাবে) ১০বছর ধরে লোন দেওয়ার প্রকল্প চালু করেছিল।[১৬] এই সময়কালে শহর ও গ্রাম পরিকল্পনার আইনগুলি রাজ্যস্তরেও প্রয়োগ করার পরামর্শও দেওয়া হয়।[১৭]

ভারতের নগরোন্নয়ন পরিকল্পনার ইতিহাসে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। এই পরিকল্পনায় অঞ্চলভিত্তিক নগরোন্নয়ন পরিকল্পনার সুপারিশের পাশাপাশি শহরের জমি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়। নগরের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি

শক্তিশালী করার জন্য নগরের স্থানীয় শাসনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় এবং বেশিরভাগ রাজ্যে নগরোন্নয়ন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন শুরু হয়। পৌরপ্রশাসনকে জোরদার করা এবং শিল্পাঞ্চলগুলিকে শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে অনেকদূরে গড়ে তোলার কথা বলা হয়। আদর্শ হিসাবে ধরে নেওয়া হয় ব্রিটেনের নগর পরিকল্পনার নকশা এবং তার প্রয়োগপন্থাগুলি।[১৮] অর্থাৎ 'New Town Act 1946'-এর প্রভাব ভারতের নগর পরিকল্পনায় পড়েছিল।[১৯] এই সময় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল বড় শহরগুলির জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরির দায়িত্ব রাজ্য ও স্থানীয় সরকারের উপর অর্পন। মাস্টার প্ল্যানগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের জন্য জমির ব্যবহার, কলোনিবিহীন নগর তৈরি, জোনগুলিতে জমিব্যবহারের বিভাজন, পর্যাপ্ত রাস্তা ও পরিবহণ ব্যবস্থা এবং আবাসিক এলাকাগুলিতে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা। মাস্টার প্ল্যান গুলি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নগর পরিকল্পনা উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হয় Delhi Development Authority, Mumbai Metropolitan Regional Development Authority, Madras Metropolitan Development Authority.[২০] এই সংস্থাগুলি নগর থেকে দূরে শিল্প স্থাপন এবং গ্রাম-নগর সংযোগকে জোরদার করার মাধ্যমে জনসংখ্যার বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

চতুর্থ পরিকল্পনায় দিল্লী, মুম্বাই ও কলকাতা মহানগর এলাকার উপর থেকে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করার জন্য ৭২টি ছোট ছোট নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ অর্থবরাদ্দের সাহায্যে চণ্ডীগড়, গান্ধীনগর, ভূপাল এবং ভুবনেশ্বরের মত বিভিন্ন রাজ্যের নতুন রাজধানীগুলির উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হয়। এই সময় অন্যতম প্রতিষ্ঠান হাডকো প্রতিষ্ঠিত হয় যার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

পঞ্চম পরিকল্পনায় মূল উদ্দেশ্য ছিল নগরগুলিতে জমির দাম নিয়ন্ত্রণ, ছোট ও মাঝারি নগরগুলির উন্নয়নের জন্য একটি কাঠামো সরবরাহ, নগরের প্রাথমিক পরিষেবা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে মহানগরগুলির সমস্যা সমাধান প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৫ সালে ছোট ও মাঝারি নগরগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা করার জন্য প্রফেসর বিজিত ঘোষের নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে ৫০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট নগরগুলির উন্নয়ন এবং ৩ লাখের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট নগরগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করেছিল। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য Integrated Urban Development Programme চালু করা হয়েছিল। পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষদের পরিষেবা প্রদানের জন্য Site and services প্রকল্প চলু হয়েছিল।[২১] পঞ্চম পরিকল্পনায় নগরগুলিতে জমির দাম নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালে Urban Land Ceiling and Regulation Act চালু করা হয়েছিল। এই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল নগরগুলির জমি যেন কিছু মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত না হয়ে পরে এবং নগরের বিকাশ সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির মধ্যে জমির সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থা করা। এই আইন পরবর্তী সময়ে নগর পরিকল্পনায় দরিদ্রদের আবাসন নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জমি উদ্বৃত্ত থাকে সেই লক্ষ্যে নগরের খালি জমি দখল ও অতিরিক্ত

জমি অধিগ্রহণের বিধান দিয়েছিল।

মাঝারি ও ছোট মাপের নগর অর্থাৎ ১ লাখের কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট নগরগুলির উন্নয়নের ব্যাপারে প্রথম জোর দেওয়া হয়েছিল ষষ্ঠ পরিকল্পনায়। এই উপলক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে Intregrated Development of Small and Medium Towns (ছোট ও মাঝারি নগর সুসংহত উন্নয়ন) প্রকল্প চালু হয়েছিল। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১ লক্ষের কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট নগরগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং মৌলিক পরিষেবা প্রদান। এই প্রকল্পটির আওতায় কেন্দ্রীয় সহায়তার উপাদানগুলির মধ্যে ছিল জমি অধিগ্রহণ, অল্প কিছু নতুন বাজার নির্মাণ, শিল্প স্থাপনের যোগ্য জমি উন্নয়ন, নগরগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও পরিষেবা প্রদান এবং স্বল্প ব্যয়যুক্ত স্যানিটেশন নির্মাণ। এল বি ১৩ রাজ্যের উন্নয়নের উপাদানগুলির মধ্যে ছিল কলোনি উন্নয়ন, ছোট ছোট কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, স্বল্প ব্যয়যুক্ত জল সরবরাহ প্রকল্প, নিকাশি নালা ও পয়ঃপ্রণালী, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পার্ক এবং খেলার মাঠ স্থাপন। রৌট্রি ৬১ এল বি ১৪ এই প্রকল্পটি শুরু করার সাথে সাথে ২৩১টি শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে আরও কিছু এই তালিকায় যুক্ত করা হয়েছল। এই প্রকল্পে ২০০টি শহরের উন্নয়নের জন্য ৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।[২২] এই টাকার পরিমান ছোট ও মাঝারি শহরগুলির পরিকাঠামো নির্মানের জন্য স্বল্প হলেও ভারতের নগরায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

সপ্তম পরিকল্পনায় নগর উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের সুযোগ উন্মুক্ত এবং আবাসন নির্মাণের মূল দায়িত্ব বেসরকারি খাতে অর্পণ করা হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল National Housing Policy. এর মূল উদ্দেশ্য ছিল গৃহহীন মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনা, আবাসনের উন্নয়ন এবং নূন্যতম মৌলিক পরিষেবা প্রদান। নগর উন্নয়নের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় IDSMT গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হিসাবে অব্যাহত ছিল। এই সময় আরও ১০২টি নগর এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছিল। জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে অন্যান্য নগরগুলিতে ছড়িয়ে দিয়ে দিল্লীর জনসংখ্যা হ্রাস করে সেখানে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল National Capital Region Planning Board. শহুরে দারিদ্রতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এই পরিকল্পনায় চালু করা হয়েছিল Urban Basic Services. উদ্দেশ্য ছিল নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত মহলা ও শিশুদের উন্নতিসাধন। Urban Basic Services ১৯৯০ সালে Environmetal Improvemet of Urban Slum এর সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন প্রকল্পের নাম হয় Urban Basic Services for Poor. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের উন্নয়নের জন্য ১৯৮৯ সালে Nehru Rozgar Yojana নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা চালু করা হয়। একই বছরে National Commission on Urbanization তার রিপোর্ট পেশ করে। এই প্রস্তাবে পরবর্তী বছরগুলিতে নগর নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। নগরায়ণ জাতীয় কমিশন ৩২৯টি নগরকে Generator of Economic Momentum হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। জাতীয়

কমিশনের প্রস্তাবে ত্রিস্তরীয় এক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনের কথা বলা হয়েছিল। যেখানে উপরের স্তরে থাকবে কেন্দ্র, নিচের স্তরে স্থানীয় নগর সংস্থাগুলি এবং মাঝে রাজ্য। ১৯৯২ সালে ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীতে পাশহয় এবং পরের বছর কার্যকারি হয়।[২৩]

অষ্টম পরিকল্পনার সূচনায় Town and Country Planning Organization জাতীয় নগর নীতি (National Urban Policy) সম্পর্কিত একটি খসড়া প্রকাশ করে। মূল উদ্দেশ্য ছিল নতুন নগরগুলিতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ছড়িয়ে দিয়ে মহানগরগুলির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা, বিভিন্ন শ্রেণির নগরগুলিতে জনসংখ্যার সুষম বন্টন প্রভৃতি। অষ্টম পরিকল্পনায় পূর্ববর্তী পরিকল্পনার পাশাপাশি নতুন কিছু পরিকল্পনা চালু করেছিল। শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য Educated Unemployed of Employment Generation in Urban Localities নামক প্রকল্প চালু হয়েছিল। প্রথম শ্রেণির নগরগুলিতে এই প্রকল্পটি চালু হয়। একই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির নগরগুলির জন্য ১৯৯৫ সালে Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme নামক আর একটি প্রকল্প চালু হয়। এই পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ছিল মেগাসিটি প্রকল্প। প্রাথমিক পর্যায়ে মুম্বাই, কোলকাতা, দিল্লী, বেঙ্গালুরু ও চেন্নাই এই ৫টি মহানগরে চালু হয়েছিল।[২৪]

নবম পরিকল্পনায় পূর্ববর্তী নগরোন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে একজোট করে সমগ্র দেশের জন্য নগরায়নের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল। পাশাপাশি কর্মসূচিগুলির বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় নগর সংস্থাগুলির আর্থিক স্বাবলম্বনের দিকে জোর দেওয়া হয়েছিল। Nehru Rozgar Yojana, Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme এবং Urban Basic Services for Poor প্রকল্পকে একত্র করে ১৯৯৭ সালে স্থাপন করা হয়েছিল Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojona. উন্নত বাসস্থান তৈরির জন্য Nehru Rozgar Yojana এবং Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme কে একত্র করে ঐ বছরেই তৈরি করা হয়েছিল National Slum Development Programme.

আলোচিত প্রথম ৯টি পরিকল্পনায় দেখা গেল নগরোন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। নগরোন্নয়নে প্রকল্পগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু প্রকল্পগুলি যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় ভারতের নগরগুলি সুষমভাবে বিকশিত হতে পারে নি। প্রথম পাঁচটি পরিকল্পনায় শিল্প ও নগরোন্নয়নের কথা বার বার বলা হলেও মূলত বড় শহরগুলির কপালেই জুটেছিল উন্নয়নের যাবতীয় আশীর্বাদ। IDSMT কর্মসূচির মাধ্যমে ছোট ও মাঝারি নগরগুলির উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু দেখা গেছে অষ্টম পরকল্পনার শেষ অবধি এই কর্মসূচি মাত্র ৯০৪টি শহরের ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ছিল মাত্র ২৮৩.৯৬ কোটি টাকা।[২৫] Urban Land Ceiling and Regulation Act প্রয়োগের সময় নগরাঞ্চলে ১৬৬১৬২ থেকে ২২০০০০ হেক্টর ফাঁকা জমি ছিল। ভাবতে অবাক লাগে ১৬৬১৬২ হেক্টর জমির মধ্যে মাত্র ৮ শতাংশ জমি অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত, ২ শতাংশ অধিগ্রহণ এবং .৩৭ শতাংশ জমি স্বল্প আয়ের

আবাসন নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।[২৬] ১৯৯৪ সালে অর্থমন্ত্রক একটি বিশেষজ্ঞ দল তৈরি করেছিল। ১৯৯৬ সালে বিশেষজ্ঞ দল India Infrastructure Report: Policy Imperative for Growth and Welfare নামক একটি রিপোর্ট পেশ করেছিল যা বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই রিপোর্টে পরবর্তী ১০ বছরে ২৮০৩.৫ বিলিয়ন টাকা অর্থাৎ প্রতি বছরে ২৮২.৯৭ বিলিয়ন টাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও ১৯৯৫ সালে সমস্ত সরকারি আয়ের উৎস একত্র করে মাত্র ৫০ বিলিয়ন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল।[২৭] ১৯৯৫ সালে Ministry of Urban Affairs and Employment নগরোন্নয়নে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল। সেখানে দেখা গেছে মাত্র ৮৭৯টি মাস্টার প্ল্যান রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে, ১৫৮টি খসড়া তৈরি হচ্ছে এবং ১৬১টি মাস্টার প্ল্যানের প্রস্তুতি চলছে।[২৮] অন্যদিকে বিশাল সংখ্যক নগরবাসীর চাপে উত্তরোত্তর বাড়ছে জমির চাহিদা। অথচ সেই পরিমাণ জমির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য নগরের মূল পরিকল্পনায় বহু পরিবর্তন আনতে হয়েছে। বেশির ভাগ পরিকল্পিত নগরগুলির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নগরের উপকণ্ঠে বিস্তীর্ণ কৃষি ক্ষেত্রকে অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে কৃষকদের পরিবর্ত জীবিকার যেমন সমস্যা হচ্ছে তেমনই সমস্যা হচ্ছে তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে নগরগুলির মাস্টার প্ল্যানে দরিদ্র মানুষদের জন্য তেমন কোন স্থান না থাকায় তাদের উন্নয়নমূলক কাজ যেমন ব্যহত হয়েছে তেমন তৈরি হয়েছে কলোনি সমস্যা। প্রথম দিকের পরিকল্পনাতে নগরগুলির সমস্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেও এই সময় গড়ে ওঠা নগরগুলি বিশেষ করে চণ্ডীগড়, ভুবনেশ্বর, দুর্গাপুর প্রভৃতি নগরগুলিতে নিম্ন আয়ের মানুষদের বসবাসের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল। যদিও নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য বৃহৎ আয়তনের আবাসন নির্মাণের মাধ্যমে বস্তিহীন নগর নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছিল ভিন্ন। আবাসন সংস্থা এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলি বিলাসবহুল আবাসন নির্মাণ করে উচ্চ আয় সম্পন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের কাছে বিক্রি করে নিজেদের লাভ বাড়িয়ে নিতে ব্যস্ত ছিল।[২৯] পাশাপাশি কৃত্রিম ভাবে সৃষ্টি জমির অভাবকে কাজে লাগিয়ে জমি মাফিয়া ও বিল্ডাররা শহরের ফাঁকা জমিকে দখল করে রাজত্ব করছে। উদাহরণ হিসাবে মুম্বাইয়ের কথা বলা যেতে পারে। ১৯৯৮ সালে ফাঁকা জমির ৫৫% মাত্র ৯১ জন ব্যক্তির অধীনে ছিল।[৩০] সুতরাং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগরায়ণে গতি এসেছে কিন্তু অত্যন্ত অপরিকল্পিত ও অসমভাবে চলছে এই নগরায়ণের কাজ। ফলত সামাজিক ও পরিকাঠামোগত বৈষম্য বাড়ছে। নগরের একদিকে গড়ে উঠছে উন্নত জীবনযাত্রার পরিকাঠামো, অন্যদিকে ন্যূনতম মৌলিক পরিষেবা পাচ্ছে না। নূন্যতম মৌলিক পরিষেবা পাওয়ার জন্য সৃষ্টি হচ্ছে অসম প্রতিযোগিতা। দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের সংঘর্ষ, অসন্তোষ, সামাজিক সমস্যা।

তথ্যসূত্র :

(১) R. Ramchandran, Urbanization and Urban System in India, Oxford

University Press, New Delhi, 1989, p- 69.

(২) Lalit Batra, A Review of Urbanization and Urban Policy in Post-Independent India,Working Paper Sesies,JNU,New Delhi, 2009, p- 3.

(৩) Census of India 1981, Census Monograph No.1, Urban Growth in India 1951-81, Ministry of Home Affairs, New Delhi, pp-iii-iv.

(৪) Ibid

(৫) Shaw, Annapurna. Indian Cities, (New Delhi, Oxford University Press, 2012), p- xviii.

(৬) Lalit Batra, A Review of Urbanization and Urban Policy in Post-Independent India,Working Paper Sesies,JNU, New Delhi, 2009, p-3.

(৭) Ashish Bose, Studies in India's Urbanaization 1901-1971, Tata McGraw-Hill, New Delhi, 1973, p- 52.

(৮) Ram. B. Bhagat and Soumya Mohanty, Trends and patterns of India's urbanization: A Demographic Assessmant, Paper presented in the annual meeting of population association of America, New Orleans, USA, 16-19th April 2018, p- 4.

(৯) Ashish Bose, Studies in India's Urbanaization 1901-1971, Tata McGraw-Hill, New Delhi, 1973, p- 60.

(১০) Amitabh Kundu, Urban Development and Urban Research in India, Khama Publishers, New Delhi, 1992, p.- 2.

(১১) N.A. Sharma, Economic Development in India: The First and Second Five Year Plans, Palgrave Journals on behalf of the International Monetary Fund, Vol. 6, No. 2 (April, 1958), p.- 204.

(১২) সেচ ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ৬.৬১ কোটি, পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ৫.৫৭ কোটি, কৃষি ও জনসমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৩.৫৭ কোটি, শিল্প ও খনিতে ১.৭৯ কোটি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে .৬৯ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল। West Bengal Economic Policy,First Five year Plan of West Bengal,1951-1956,p.-5.

(১৩) সেচ ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ৯.১৩ কোটি, পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ১৩.৮৫ কোটি, কৃষি ও জনসমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৫.৬৮ কোটি, শিল্প ও খনিতে ৮.৯০ কোটি, সামাজিক পরিসেবার ক্ষেত্রে ৯.৪৫ কোটি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে .৯৯ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল। N.A. Sharma, Economic Development in India: The First and Second FiveYear Plans,Palgrave Journals on behalf of the International Monetary Fund, Vol. 6, No. 2 (April, 1958), p.- 212.

(১৪) ২.১ মিলিয়ন নির্মাণ কার্যে, ০.৮ মিলিয়ন শিল্প ও খনিতে, ০.৫ মিলিয়ন কুটির

শিল্পে, ২.৭ মিলিয়ন ব্যবসা-বানিজ্যে। N.A. Sharma, Economic Development in India:The Firstand Second FiveYearPlans,PalgraveJournals on behalf of the International Monetary Fund, Vol.6,No.2 (April, 1958), p.-206.

(১৫) Shaw, Annapurna. Indian Cities, (New Delhi, Oxford University Press, 2012), p- 20.

(১৬) Lalit Batra, A Review of Urbanization and Urban Policy in Post-Independent India,Working PaperSesies,JNU, New Delhi,2009,pp-8-9.

(১৭) আর. বি. ভগৎ, ভারতের নগর নীতি অতীতাবলোকনে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ, যোজনা, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৩।

(১৮) আর. বি. ভগৎ, ভারতের নগর নীতি অতীতাবলোকনে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ, যোজনা, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৩।

(১৯) এই আইন বলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইংল্যান্ডে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে লন্ডন শহর থেকে দূরে অনেকগুলি নতুন শহরের পত্তন হয়েছিল, যেখানে বিকেন্দ্রীয় কর্মকেন্দ্র গড়ে উঠল সবুজেঘেরা স্বাস্থ্যকর বসতি ও বিনোদন ব্যবস্থা নিয়ে।তথ্যসূত্র- মাণিদীপ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পিত নগরায়ণ উৎস ও সন্ধান (কলকাতা, শিবম, ২০১৩,),৪৯।

(২০) Lalit Batra, A Review of Urbanization and Urban Policy in Post-Independent India, WorkingPaper Sesies,JNU, New Delhi, 2009, p- 8.

(২১) J.K. Rotray, Urban and Regional Planning in Practice in India, Habitat International, 1993, Vol. 31, No. 3, p- 60.

(২২) আর. বি. ভগৎ, ভারতের নগর নীতি অতীতাবলোকনে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ, যোজনা, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৪।

(২৩) আর. বি. ভগৎ, ভারতের নগর নীতি অতীতাবলোকনে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ, যোজনা, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৪।

(২৪) তদেব পৃ. ১৪।

(২৫) তদেব পৃ. ১৫।

(২৬) Lalit Batra, A Review of Urbanization and Urban Policy in Post-Independent India,Working Paper Sesies,JNU, New Delhi,2009, p- 15.

(২৭) Ibid, p- 20.

(২৮) Government of India, Master Plan Approach: Efficacy & Alternatives, Ministry of Urban Affairs and Employment, New Delhi, 1997, p.- 57.

(২৯) Lalit Batra, A Review of Urbanization and Urban Policy in Post-Independent India,WorkingPaper Sesies,JNU, New Delhi,2009, p- 9.

(৩০) Ibid, p- 15.

বিশ্বায়ন ও শিক্ষা

সরমা নায়েক

'এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম-যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমাস সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত ... এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয় বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছে করে সেটা ভাল করে প্রকাশ করতে – কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না, কী একটা কিম্ভুত রকমের মনে করবে'। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৬৪নং চিঠি, ছিন্ন পত্র, ২০ আগস্ট, ১৮৯২)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অন্তর্হিত মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত ধরে। যেখানে তিনি বিশ্বভাতৃত্বের আসন পাতলেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা পাবে পরিপূর্ণতা। তবে এ ভাবনার উৎস রয়েছে আমাদের সংস্কৃতির সূচনালগ্ন থেকেই। ভারতের অতি প্রাচীন সংস্কৃতির উপনিষদে বলা হয়েছে- 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যা পুত্রা'- এই স্ত্রোত্রটি থেকে স্বাভাবিক মানবাত্মার প্রসারের বাণী প্রচার করা হয়েছে।

প্রাচীনকালে স্থাপিত তক্ষশীলা এবং পাল যুগে স্থাপিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও ওদন্তপুরী, সোমপুরী বিক্রমশীলা মহাবিহারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রদের সমাবেশ ঘটেছে। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীরাই নন শিক্ষকরাও এসেছেন বিভিন্ন স্থান থেকে। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকদের হাত ধরে ঘটেছে বিভিন্ন সংস্কৃতির আদান প্রদান। স্থাপত্য-ভাস্কর্যে ঘটেছে নানান মিশেল। এরপর মধ্যেযুগে যখন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে বাণিজ্যের জন্য, ক্ষমতা বিস্তারের জন্য ভারতবর্ষে নানা সময়ে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তখনও হয়েছে নতুন কিছু সঞ্চয়ন। এরপর যখন ইউরোপীয় শক্তির আগমন ঘটেছে, তারা এদেশকে দিয়েছে এক নতুন অবয়ব। ইউরোপীয়দের প্রভাবেই আমাদের বহু যুগের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা।

'বিশ্বায়ন' এই ধারণাটির সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে। সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের ধারণাটি প্রশমিত করার জন্য সমগ্র বিশ্বের নাগরিক 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর অধিবাসি এই ধারণার প্রবর্তন করা হয়। 'বিশ্বায়ন' বা 'বিশ্বীকরণ' ইত্যাদি ধারণাগুলির ব্যবহার শুরু হয় ১৯৬০ সাল

নাগাদ। অধ্যাপক রোনাল্ড রবার্টসন আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শিক্ষা জগতে এই ধারণাটির প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন— বিশ্বায়ন এমন একটি ধারণা যা একদিকে যেমন বিশ্বের সংকুচীকরণকে বোঝায় অপরদিকে তেমনি বিশ্বের একত্রীকরণের ধারণারও সৃজন করে।

স্বামী বিবেকানান্দের মতানুসারে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল আমাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পরিস্ফুটন ও পরিমার্জন। আদিমকাল থেকেই আমাদের পূর্বজরা আমাদের দলবদ্ধভাবে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। সেই শিক্ষাকেই আমরা আবার নতুন ছাঁচে ফেলে তার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করলাম। শিক্ষা ও বিশ্বায়ন দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষার দ্বারা বিশ্বায়নের গতি ত্বরান্বিত হবে এবং বিশ্বায়নের ফলে শিক্ষার প্রসার হবে দ্রুতগামী।

১৯৯৯ সালে ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট বিশ্বায়নের শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেন। যার দ্বারা শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে অনগ্রসর দেশগুলিকে অগ্রসর করা যাবে—

১. Ethics (নীতি)- মানবাধিকার রক্ষার নীতি।

২. Equity (সাম্য)- জাতিগুলির অসাম্য দূর করা।

৩. Inclusion (অন্তর্ভুক্তিকরণ)- দেশের প্রান্তিক মানুষকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা।

৪. Human Security (মানুষের নিরাপত্তা)- সামাজিক অস্থিওরতা দূর করে মানুষের শান্তি ও সুরক্ষা সুদৃঢ় করা।

৫. Sustainablity (স্থিতিশীলতা)- পরিবেশকে ধ্বংশের হাত থেকে বাঁচানো।

৬. Development (বিকাশ/ উন্নয়ন)- দারিদ্র ও বঞ্চনা দূরীকরণ।

শিক্ষার বিশ্বীকরণের ফলে এর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঞ্চয়ন ঘটেছে। বিশ্বায়ন কেন্দ্রিক শিক্ষার থেকে ফলপ্রসূ হতে হলে কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞান থাকলে হবে না, ব্যক্তিকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যোগাযোগে দক্ষ হতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত প্রশাসনকে আন্তর্জাতিক দক্ষতার জন্য আঞ্চলিক স্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে হবে। এই জন্য জাতীয় স্তরে বিশেষ পরিকল্পনা ও উদ্যমের প্রয়োজন। বিশ্বায়নের থেকে আগত কুফলগুলিকে হ্রাস করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার মানবিক রূপটি রক্ষায় যত্নশীল হতে হবে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষা মডেল তৈরি হচ্ছে। যেখানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাত্রী ক্রমশই তার শিখনের ধরণ পরিবর্তন করছে। শিক্ষার্থীর ভূমিকা শুধু সক্রিয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তারা স্বাধীন ও আত্মব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন বিশ্বায়নের অন্যতম সুফল। এর ফলে কল্পিত শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষণ, গবেষণা ও শিক্ষাকে বিস্তারিত করণের প্রক্রিয়াকে একসূত্রে গতিত করা সম্ভব হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত

প্রতিষ্ঠানগুলি প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও একই ভাবে আত্মসমীক্ষা করতে পারে। উচ্চশিক্ষা পরিকাঠামো পরিবর্তন ও উন্নয়নেও তথ্য প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দূরাগত ও নমনীয় শিক্ষা প্রসারে তথ্য প্রযুক্তি অত্যন্ত আবশ্যক। এর ফলে এক বিশাল সংখ্যক শিক্ষা সুযোগের বঞ্চিত থাকা মানুষ শিক্ষা প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পাচ্ছে। এমনকি পাঠ্য বিষয় নির্বাচন ও মূল্যায়নে তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দকে প্রধান মর্যাদা দিতে পারছে। ভারতে প্রায় ১০টির বেশি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও ৬১টির বেশি দূরশিক্ষার পরিচালন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের ফলে শিক্ষার বৈষাম্য অনেকখানি দূরীভূত হয়েছে। স্থান, কাল, জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ শিক্ষার আঙিনায় আসতে পেরেছে।

শিক্ষা একটি বিকাশশীল প্রক্রিয়া হিসাবে বিশ্বায়নকে তরান্বিত করে যা ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের হাত ধরে দেশে বিদেশে যে শিক্ষার সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে পড়ছে তৃতীয় বিশ্বের মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীরা। এই ভাবে বিদেশে উন্নত ধরণের চাকুরি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এক সুবিধাপ্রাপ্ত প্রজন্মের সৃষ্টি হচ্ছে। এরা জীবন যাত্রার মান উন্নত করবার জন্য বিদেশে চাকুরিসূত্রে স্থায়ী বাসিন্দা হচ্ছে। বিশ্বায়নের আর একটি বিশেষ সমস্যা হল বৈদ্যুতিন বিভাজন। উন্নত দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এই বিভাজন বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এর ফলে সংস্কৃতিগত পার্থক্য, গ্রাম-শহরের পার্থক্য, উপার্জনের মাত্রা প্রভৃতির মধ্যে পার্থ্যক্য সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে সর্বস্তরে তরান্বিতকরণে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

১. দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিদেশে পরিষেবাযোগ্য করতে হবে।

২. বিদেশের মাটিতে এগুলির শাখা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. অনাবাসী ভারতীয় ছাত্রদের দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভরতি করতে হবে।

৪. ভারতে পরিচালিত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রম ও ডিগ্রিদান প্রক্রিয়ার উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫. ভারতীয় বিদেশনীতির পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে হবে। এছাড়া বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে শিক্ষা পরিচালন, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা, নতুন উদ্যোগের সূচনা, উন্নত পরিকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি।

বিশ্বায়নে বহুমুখী প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বহু সংস্কার সাধনের পরই এই প্রক্রিয়ার উপযুক্ত সুফল লাভ করতে পারব। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধির একটি বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ- 'আমি আমার গৃহকে চার দেওয়ালে বন্ধ জানালার দ্বারা আবদ্ধ করতে চাই না। আমার প্রাঙ্গণের ওপর দিয়ে সর্বসংস্কৃতির বাতাস মুক্ত ভাবে যেন বয়ে যায়। কিন্তু আমি আমার নিজের পায়ে দৃঢ় থাকতে চাই

তাকে কোনোভাবেই ঝড়ো বাতাসে ভেসে যেতে দেব না'।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১১।

২. সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব, প্রগতিশীল প্রকাশক, কোলকাতা, ১৯৯৯।

৩. রাধারমন চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রগতিশীল প্রকাশক, কোলকাতা, ২০০৯।

৪. সোনালী চক্রবর্তী, শিক্ষার সমাজ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, শোভা, কোলকাতা, ২০১৬।

৫. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, মৌলিক লাইব্রেরী, কোলকাতা, ১৯৯৪।

৬. গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসের আলোয় সমকালীন বিশ্ব ১৯৪৫-২০১৪, মিত্রম, কোলকাতা, ২০০৭।

৭. গৌতম বসু, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, বিশ্ববিকাশ কুণ্ডু, কোলকাতা, ১৯৯৪।

৮. দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, কোলকাতা, ২০০৭।

৯. Archana Banarjee, Fundamentals of Educational Sociology, B.B Kundu, Kolkata, 2006.

১০. Rascual Gisleert, Fundamentals of Sociology, Orient Black Swan, Kolkata, 2010.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্বাচিত ছোটোগল্প : অতিলৌকিকের স্বপ্ন-অস্তি সংলাপ

সোমনাথ চ্যাটার্জী

মানুষের জ্ঞান যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয় সেখানে ঘটে যায় অতিলৌকিকের বিশাল ব্যাপকতা। প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর অত্যধিক জ্ঞান আরোপ চাহিদা-পূরণের চেষ্টায় জন্ম নেয় উদ্দীপকের অন্তরালে থাকা ব্যক্তির অস্তিত্বের সংলাপ। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক আধারে রবীন্দ্রনাথ পাড়ি দিয়েছেন চেতনের গহন ভূমিকায়। তাঁর গল্পসাহিত্যের পাথেয় হতে পারত মানুষের স্বপ্ন ব্যর্থতার জয়-পরাজয়ের হাতছানির আগাছাটুকু। কিন্তু না, তিনি আখ্যান নির্ভরতার সমস্ত প্রশ্ন ছাপিয়ে লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেছেন খণ্ডিত পুনরাবিষ্কারের পথ। লেখক কথন-চরিত্র, পাঠক এসবের সমন্বয়ে প্রথম প্রহরের উৎকণ্ঠাকে ভাষারূপ দিতে গিয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। 'আত্মপরিচয়'-এর একটি প্রবন্ধে কবি জীবন ধর্মের সারসত্য উপলব্ধি করতে গিয়ে জানিয়েছেন :

"বাইরের জগতের মানুষের যে পরিচয় সেইটেতেই তার প্রতিষ্ঠা। বাইরের এই পরিচয়টি যদি তার ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোনো অংশে না মেলে তা হলে তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে। কেননা মানুষ যে কেবল নিজের মধ্যে আছে তা নয়, সকলে তাকে যা জানে সেই জানার মধ্যেও সে অনেকখানি আছে।"[১]

মানুষের অস্তিত্বের মেরুকরণের দ্বিধাময় উচ্চারণের নেপথ্যে থেকে যাবে জানা আর না জানার রহস্যোচিত খেলা। আধুনিক ছোটগল্পের মণিময় সত্যের অবভাস রচনা করে উঠতে পারে না নৈতিক-অনৈতিকের পাঠ গ্রহণ ক্ষমতা। আর এ জন্যেই 'ক্ষুধিত পাষাণ' অট্টালিকায় কোনো এক 'নিশীথে' সংযোগ সামঞ্জস্য খুঁজে বের করে 'কঙ্কাল'-এর শারীরিক জীবদ্দশার উপকথা 'জীবিত ও মৃত' গল্পের অমোঘ প্রতীকতার সংকটতম কৌতূহলী প্ররোচনা রচনা করে নেয় মণিমালিকার প্রথাবদ্ধ উচ্চারণ। অস্তি ধর্মের প্রেরণায় জীবনের যে আকুল বেদনা সিন্ধুতীরে পড়ে পড়ে মার খায়, তার থেকে বাইরে বেরিয়ে সারসংক্ষেপ বুঝতে আমাদের দ্বারস্থ হতে হয় রবীন্দ্র গল্পের আঙিনাতে। সময়ের অভিঘাতে বর্তমান থেকে সরে সরে এসে কবি ঘুরে বেড়িয়েছেন সম্পূর্ণ ঘোর অনাগত মহাকালের প্রবহমান নদীতরঙ্গে। অন্ধকার জগতের বৈকল্পিক আখ্যানের বাধ্যবাধ্যকতা নেই বলেই গল্পকারের উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে ছোঁয়া লেগেছে বিরাট শূন্যতার গম্যহীন স্বপ্নরাজ্যের সীমাহীন আবেষ্টনী। অন্ধকারের পরিব্যাপ্ত চরাচর উপাখ্যানের সত্যতা নির্ণয় করে। কথনশাস্ত্রের পদচারণার

সুযোগে একটি স্থিরবিন্দু ব্যবহার করার ফলে পাঠকের মন পেন্ডুলামের মতো ঘুরতে থাকে অবৈধ তবু নিষিদ্ধ পরিণাম নির্দেশকে। "অন্ধকার" শব্দটি রবীন্দ্র ছোটোগল্পের জীবরাজ্যের নির্বাসিত জগতের দুর্গম আসনে থাকতে থাকতে দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রচ্ছন্ন-পাঠের আসর জমিয়ে দিয়েছে। নির্মাণের পরিকল্পনার সামনে স্বল্প জীবনের পরমায়ু এভাবেই আপন স্বীকারোক্তির অসম্পর্কিত আলোচনার নিবিড় ছায়াতলে তৈরি করে ইন্দ্রিয় স্বজ্ঞার আবেগঘন নান্দনিক পরিস্থিতির—

ক) "মনে হইল, এই-যে রাত্রি দুই প্রহরে একটি দীপশিখা চিরান্ধকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন, আর মানুষের ছোট ছোট প্রাণশিখা কখনো দিনে কখনো রাত্রে হঠাৎ নিবিয়া বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাও তেমনই।"[২]

খ) "যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ংকর স্থান বলিয়া বোধ হইল।"[৩]

গ) "অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুর বর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিল অঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য আবেগের সঞ্চার করিল।"[৪]

ঘ) "অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকার সংকুচিত ম্লানভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে। কোনো লোককেই দেখিলাম না। তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল, কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে।"[৫]

ঙ) "বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে, তাহার মনে হইতেছিল, যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে।"[৬]

প্রকৃতির অন্ধকারে মুহূর্তের পর মুহূর্ত ঘটা মানুষের 'ছোট ছোট প্রাণশিখা' তৈরি করেছে গল্পের বাতাবহ। কেননা কথকের অন্তরাল জীবনে এমন সব না বলা স্বর জমে আছে যেগুলির নিস্তব্ধ আচরণ খুঁজে পেতে মরিয়া কোনো না কোনো কাল্পনিক সৃষ্টির সংযত বিন্যাসঃ "সে যেন কী খুঁজিতেছে, পাইতেছে না, এবং দ্রুততর বেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করিতেছে।"[৭] দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলেছে 'নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিস্কের কল্পনা'। আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখলে বুঝতে পারব, কথাকারের গল্প বলার প্রেক্ষিতে আছে সটান ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনের প্রয়াস। কঙ্কালের কুহকধর্মীতা মূলত এমন এক মানুষের, যার কাছে সময়ের বয়ে যাওয়া ব্রত ধর্মের আবহ রচনা করে উঠতে পারেনি। সামান্য এক নারীর ইতিহাসের ক্রন্দন তৈরি করেছে গল্পের বার্তা। নিজের ষোল বছরের জীবন্ত উত্তাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বেছে নিতে হয় অস্থিবিদ্যার চটকদার আবহকে। "কোথায় বাসর ঘর! আমার সেই বিবাহের দেশ কোথায়!"[৮] দাদার বন্ধু ডাক্তারের পরস্পর

কথাতে মেয়েটির জীবনে অনেকখানি জুড়ে আছে নিজের স্বগত দৃষ্টিভঙ্গি। নাড়ী দেখতে গিয়ে সন্ধ্যাকালের 'মানসসভায়' "পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষ হ্রাস পেয়ে মাত্র একটি" প্রাণীতে আসার মুহূর্তেই রচনা করে নিয়েছে নারীর অন্দরমহলের সংলাপ। এই মনোভাবনার পেছনে কাজ করেছে বেশ কিছু জিনিস- ক) স্বামীকে 'যমের মতো' ভয় করার বিশেষত্ব। খ) বিধবা প্রাপ্তি হেতু 'বিষকন্যা' অভিধা প্রাপ্তি। আজন্ম সংস্কারের ছায়াতলে বেড়ে ওঠা নারীর বয়ান পরিসর সামাজিকতার বিধৃত কালের গড়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষে বারবার পুড়তে হয়েছে ব্যক্তিকেই। তার কারণ স্বীয়বোধ। অপরের প্রেক্ষিতে কঙ্কালের নায়িকা নিজেকে তৈরি করতে গিয়ে বাঁধিয়ে ফেলেছে বড় বিপদ। প্রত্যেক মানুষ পৃথিবীতে আসে কিছু সম্ভাবনা নিয়ে, যা "বিষকন্যা"-র মধ্যেও কোনোভাবে ব্যতিক্রম ছিল না। পরিবারে একমাত্র দাদার সংস্পর্শে বেড়ে ওঠা মেয়েটির পুরোটা সময় কেটেছে সন্ধ্যার বাগানের একাকীত্বের পরিচর্যার ভেতরে। "পৃথিবীর সমস্ত" যুবাপুরুষের "তৃণপুঞ্জ রূপে দল" বেঁধে থাকার মধ্যেই নির্মিত হয়ে গিয়েছিল গল্পের পরিণাম— "আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম।"[৯] নিজের অন্তর্গত ব্যক্তি অনুভবের এই সঙ্গীহীন বিরহচেতনা "সন্ধ্যায়" নির্বাসনে যেতে হয়েছে— "পুরুষদের বিশ্বাস করিবার জো নাই। পৃথিবীতে আমি একটি মাত্র পুরুষ দেখিয়াছি এবং এক মুহূর্তে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি।"[১০] অস্তিত্বের চিরদিনরাত্রি অস্পষ্টতা ব্যক্ত করা যাবে কবিগুরুর আত্মজ্ঞানের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকা খণ্ড কালের বক্তব্য দ্বারা—

"ভাবের তীব্রতা অনুসারে মানসিক সময়ের পরিমাপ হয়— কোনো কোনো ক্ষণিক সুখ দুঃখ মনে হয় যেন অনেক ক্ষণ ধরে ভোগ করছি। যেখানে বাইরের লোকপ্রবাহ এবং বাইরের ঘটনা এবং দৈনিক কার্যপরম্পরা আমাদের সর্বদা সময়ের-গণনায় নিযুক্ত না রাখে সেখানে, স্বপ্নের মতো, ছোটো মুহূর্ত দীর্ঘকালে এবং দীর্ঘকাল ছোটো মুহূর্তে সর্বদাই পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই আমার মনে হয় খণ্ড কাল ও খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম।"[১১]

।। দুই ।।

আজকাল যেন সবকিছুর সংশয়কে ছাপিয়ে তার চিন্তাকে নিয়ে গল্পকারের নিজের ভাষা সক্রিয় হয় আরও। সেই ভাষা আবিষ্কারের জন্য অন্যের ভাষায় মনোযোগী হতে হতে সে বোঝে লৌকিক অলৌকিক শক্তির উপর চারপাশের সঙ্গে সম্পর্কের মনন সমীক্ষা। বিচিত্র প্রাণীর প্রেতচ্ছায়া সমকালের আবর্তে বাস্তবের দূরতিক্রম্য বাধা পেরিয়ে নিজস্ব পথ তৈরি করে নেয় বলেই 'নিশীথে'র সারসত্তা থেকে সবকিছুকেই ছাপিয়ে মানুষ হয়ে পড়ে জীবন নিঃসঙ্গতার স্বরূপ। গৃহিণীর সেবাচর্চায় কোনো খাদ না থাকলেও প্রতিবাদস্বরূপ মৃত্যু পরবর্তী অন্ধকার ঝাউদেশের শিখর প্রদেশে "মর্মভেদী হাসি", "অভ্রভেদী হাহাকারের" ক্রন্দন অঝোরে ঝরে পড়ে। অগ্রাহয়ণ মাসে নদী তীরে জ্বলন্ত হল— 'ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।'[১২]

তবে কেন নিশীথের রমণী ছেড়েছিল নিজের অধিকারবোধের প্রশ্নমালা! সদর্থক

কারণ না খুঁজে পাওয়াতে তার সমস্ত শরীর মন, জীবন যৌবন, পুলকিত হৃদয়ে থমকে দাঁড়ায় চন্দ্রালোকিত শূন্যতার ওপারে। ডাক্তার কন্যা মনোরমার হাতে স্বামীর জীবন ভার তুলে দেওয়ার পরেও শরতের সন্ধ্যার আকাশ কথকের গহন রাজ্যে সন্ধানরত। মানুষের মনের ভেতরকার অহং সর্বস্বতার পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা আশ্রয়গত সমস্যা। আদর্শ প্রেম আখ্যানের শোকে নিমজ্জমান জগতের করুণ স্পর্শের দ্বারাই রক্ষণশীল প্রকটতা অন্তর্বয়নের বৈচিত্র্যে উঠে আসে অবচেতনার প্রচ্ছন্ন অভিষেকে—

"কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।"[১৩]

যন্ত্রণা প্রাধান্য সমাজের কল্পিত অস্তিত্বই পাঠকের যুক্তি পরম্পরার স্তরকে খণ্ডন করার সাহস রাখে। বাইরের সত্য আর ভিতরের সত্যের চূড়ান্ত উপস্থাপনগত চেহারায় মানুষের ব্যর্থতা ও পরাজয়, পরিণামহীন সম্পর্ক, সমস্ত কিছুর সঙ্গেই আজ আত্মবিচ্ছেদের পরম্পরায়। এই যন্ত্রণা নিছক শারীরিক নয়, আত্মিকও—

ক) গৃহিণীর স্ব-ইচ্ছায় বিষপান। খ) কথকের আত্মসংশয়। গ) কথক পাঠের যন্ত্রণার উপশমে আপসরক্ষা। চূড়ান্ত ব্যাখ্যা সংঘটনের পেছনে 'শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোক' পরিবেশ রচনা করেছে। বলা ভালো রবীন্দ্র সাহিত্যে কল্পনার অতিদৈবিক অন্তঃশিলা সতত নিজেকে জীবনের প্রতিতি স্তরে ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতার পর্যবেক্ষণে সময়ের প্রতিনিধিত্ব সূচনা করে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে অন্ধকারের অট্টলিকার পরিবেশ বর্ণনে প্রথমেই গা ছমছমে বিশ্বাস্য অস্তিত্বের যুক্তিশৃঙ্খলার কার্যপরম্পরাকে ভেঙে 'পরপার' চিহ্নায়কের অভাবনীয় চোখ ধাঁধানো জাগরণের সমাপ্তিবিহীন সন্ধান—

১. "সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রায় রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিল পথ সংকুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতা গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।"[১৪]

২. "প্রাসাদের বড় বড় শূন্য ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।"[১৫]

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে গল্পের নির্মাণে গল্পকারের একপ্রকার রোমাঞ্চিত স্বভাবের তুলনা দেওয়া যায়। অসমাপ্ত শরীরী আকাঙ্ক্ষার প্রাণময় কান্না লুকিয়ে রাখতে পারে না পাষাণের জৈব সত্তাকে। যাকে আমরা বাস্তব বলে জানি তা সমস্ত দিক থেকে রুদ্ধ। অভিজ্ঞতার বাইরের জগতে বিদ্যমান অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অস্তিত্বের বৃহৎ সম্ভাব্য পরিস্থিতিকে বুঝতে না পারায় মানুষের মনে তৈরি হয়েছে কল্পনার জান্তব ব্যাভিচার। গল্পের কথক নিজেকে প্রায় উন্মুক্ত করে পৌঁছতে চান 'প্রাগৈতিহাসিক'এর নির্মমতায়—

"The attendant allusion must be genuinely imaginative, and evocative of atmosphere; and though it need not employ supernatural themes,-it must be consonant with them. The phenomena of death are convenient

sources for such allusion, especially where ghosts are in question; but the most widely available method is the use of mysterious sound, as we have so often had occasion to remark."[১৬]

ভাষাহীন জগত যেখানে থাকতে পারে না কোনো অপর সত্তার নীরব উপস্থিতি। মোহের সম্মিলিত সচেতন অভিপ্রায় ও অবচেতনের প্রাতিষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক অভ্যাস সমসাময়িক জীবনানন্দীয় পরাবাস্তবের দার্শনিক জটিলতার ঘূর্ণিস্রোত। 'সজীব পদার্থের মতো' আমাদের বাস্তব জগতের বাইরে এক প্রতীয়মান 'অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ'। পাষাণ প্রাসাদের বিজনতা গল্প কথকের 'বুকের উপর যেন একটা ভয়ংকর ভার'। নতুন পরিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং গল্পকারের সমান্তরাল দূরাগত প্রতিধ্বনিতে চারিদিক পরিষ্কার হয়ে উঠতে চায় 'মানুষের ইতিহাস বিবর্ণ হৃদয়'—

"অনুতাপে আমার হৃদয় উদবেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জনা চাহিব, খুঁজিয়া পাইলাম না।"[১৭]

না জানানোর আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নিয়েছে এমন এক পরিস্থিতির যা মানুষের ব্যক্তি স্তর অতিক্রম করে প্রবেশ করেছে চেতনার অন্তর্গহনে। এর থেকে বেরিয়ে আসার একটি মাত্র উপায়ের খোঁজে বেছে নিতে হয়েছে পরাবাস্তবের বহুদূর এক পাষাণের অতীত কান্নার আবছায়ায়। 'অনেক অতৃপ্ত বাসনা' ও 'উন্মত্ত সম্ভোগের' শিখায় আলোড়িত হয়েছে কথকের আবশ্যক হৃদয়ের অন্তঃশার শূন্যতা। মেহের আলির সেই বিদীর্ণ স্বর যা একইসঙ্গে কাজ করেছে গল্পের আগাগোড়া 'বানানো'-য়- "তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"[১৮] উদ্ধারের বাসনা থেকে জন্মজাত গল্পকারের শেষ মুহূর্তটি অত্যন্ত কঠিন, দীন অর্থহীন। স্বপ্ন বিশ্লেষণের স্তরে ফ্রয়েডের সাহায্য নিয়ে বলতে পারি—

"যখনই দুটি উপাদানকে দেখানো হয় খুবই কাছাকাছি, তখন স্বপ্ন যেন জোর দিয়ে বোঝাতে চায়, স্বপ্ন-চিন্তায় এদের অনুরূপ প্রতিভূগুলি (বা পুনরুস্থাপনাগুলি)-র মধ্যে একটি বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। ফলত, স্বপ্ন-জোটগুলি (dream combinations) এলপাথাড়িভাবে সম্পূর্ণ বেমানান বা দুর্বোধ্য স্বপ্ন-মালমশলার উপাদান দিয়ে তৈরি হয় না, বরং তারা তৈরি হয় সেইসব উপাদান দিয়ে যেগুলি স্বপ্ন-চিন্তায় বেশ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।"[১৯]

।। তিন ।।

'জীবিত ও মৃত' গল্পের আখ্যান কৌশলে 'আমি'-র দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করার ফলে কাদম্বিনীর স্বপ্নের বেড়াজাল তৈরি করেছে গল্প কথকের অতিকুহকের আলো-অন্ধকারের আবছায়া— "প্রথমেই মনে হইল, যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জন এবং চিরান্ধকার।"[২০] অন্ধকারের পটভূমে জীবনকে নিয়ে খেলাবার বার্তাবহ ইঙ্গিতের ইশারায় নৈতিক অন্তঃপুরের বাসনা স্থিত এক 'অপরাধী'কে উদ্যত করে নিজেরই অস্তিত্বের উপদ্রব ঘাড়ে বহন করার জন্যে। 'তোমরা মানুষ আর আমি ছায়া'-র মাঝখানের বিরাট ব্যবধানে সমাজ-সংসারের ভার অপ্রীতকর সব বিষয়ে প্রশ্ন করতে বাধ্য করেছে কাদম্বিনীর অন্য এক বৈশিষ্ট্যের

সমাজ সম্পর্ক, রাণীহাটের জমিদার শারদাশংকর বাবুর পরিবারের ছত্রছায়ায় যেটা বেড়ে উঠেছিল পিতৃকুল ও পতিকুলের কেউ না থাকার নিভৃত যন্ত্রণায়। কোনো 'সামাজিক দাবি' ও 'স্নেহের দাবি' ব্যতিরেকে শুধুমাত্র 'আপনার দাবি' নিয়ে অস্তিত্বের প্রামাণিকতার দলিল হাজির করা যায় না। কেননা মানুষ অপরের সঙ্গে কৃত ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই নিজের আত্মচিন্তার অনিশ্চয় জগৎ গড়ে তোলে—

"কাদম্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কী যেন ভাবে— মনে করে 'স্বামী ও ঘরকান্না লইয়া ও যেন বহু দূরে আর-এক জগতে আছে। স্নেহ-মমতা এবং সমস্ত কর্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে, আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।'"[২১]

নিজের মধ্যে তৈরি হওয়া বিশেষ যন্ত্রণার সাময়িক ঘটনা উস্কে দিয়েছে অনাধিকার ও গল্পের দেশীয় উৎপীড়নের মাত্রাকে। অন্ধকারের রহস্যঘন প্রেক্ষাপটে আবদ্ধ থেকে গল্পের চরিত্র ঢাকতে পারেনি কোনো অবাঞ্চিত অসম্ভবের সাধনার আতিথ্যকে। যোগমায়া ও কাদম্বিনীর মধ্যেকার এই দুস্তর ব্যবধান রচনায় সাহায্য করেছে কথক বক্তার ডিটেকটিভ দৃষ্টিদান। পঞ্চম পরিচ্ছেদে কাদম্বিনীর আগমনের কিছু আগেই ঘটে গেছে প্রাকৃতিক লীলার জিজ্ঞাস্য অনুবার্তা— 'বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল'[২২] এমন সময়ে তার অন্দরমহলে প্রবেশের ক্ষীণ দীপালোকে খোকার মূর্তি একটি মাত্র প্রাণকে আশ্রয় করে সপ্রমাণ ভ্রমের শিকার হল। বলাবাহুল্য "বৃষ্টি" গল্পে প্রধান চরিত্র হয়ে এসেছিল বলেই কাদম্বিনীর ভেতরকার অস্তিত্বের ক্রমাগত চেতন ঝঙ্কার বারবার শোনা গেছে— "আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই— ওগো, তবে আমি কোথায় যাইব।"[২৩] কাদম্বিনীর প্রকৃত সত্তা জুড়ে ছিল খোকা। নারী জন্মের আজীবন সংস্কারে বেড়ে ওঠা বিধবার চরিত্র শেষ পর্যন্ত খোকাকে নিজের কাছ থেকে দূরে রেখে নিজেরই মনোগৃহের অভ্যন্তরে প্রেতবাসভূমি গঠন করে নিয়েছে। 'মণিহারা' গল্পে এই অন্ধকারের ভীষণ কঙ্কাল চেহারার সঙ্গে আমরা মুখোমুখি হই শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে। শেষ মুহূর্ত আসার সঙ্গে সঙ্গেই মণিমালাকে আবাহন করা হল ফণিভূষণের নিজের স্বপ্নের আলোকে। শৈশবের অবদমনের শব্দ আকাঙ্ক্ষা আয়নার সামনে বহু বছর পরে নিজেকে জানান দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যদিবা আয়না কখনো মানুষের প্রতিকৃতির শৃঙ্খলায় আটক রাখতে পারে না নিজেকে। কেননা অনুকরণ যোগ্যতার বশবর্তীতার চেয়ে ইঙ্গিত হয়ে ওঠে নিদ্রার চক্ষু উন্মীলনের হ্রস্ব ই-কারের 'ভেক'—

"তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন, তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারিদিকের এইসকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড় সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো; এইসকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।"[২৪]

অতিকুহকের প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে নিহিত আছে মানুষের গহন রাজ্যের অতি বায়বীয় কল্পনা ও বাস্তবের আদর্শ স্তর পরম্পরায় চাবি। মণিমালিকার অতিরিক্ত

স্বর্ণ ইচ্ছা রচনা করতে থাকে জীবনের নিস্তেজ তরঙ্গের ঘূর্ণিমালা। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পাবার সাধনায় মণির মনে গড়ে উঠতে পারেনি কোনও না পাওয়ার বেদনার অভীপ্সাটুকু। দীর্ঘ দাম্পত্যেও আসেনি কোনো সন্তান জন্মের স্ত্রী স্বাধীনতা। আর তাই মধুসূদনের এক চেষ্টাতেই ঘরছাড়া হতে দেরি করেনি। উপসংহারের শেষে এসেও ইস্কুলমাস্টারের কাছে গল্প শোনার অভিব্যক্ত পাঠক শ্রোতার চিন্তনের ভাব রাজ্যে সক্রিয়ভাবে থেকেছে 'অভিশপ্ত বাড়ি'। দিন দশেক পরে ফণির বাড়ি ফেরার পথটি মোটেই ভালো ছিল না। বিধ্বস্ত চেহারায় ফণির সন্ধ্যাকালে পরিত্যক্ত ঘরে ফেরার পরেই ঘটে গেছে স্বপ্নের পরিবেশ রচনা— "প্রকৃত নিশিথরাত্রে আপন মৃত্যু নিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুতহস্তে আর একটি বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।"[২৫] এই পর্দা ফেলার নেপথ্যে ব্যাপারটা সমস্তটাই জাগরিত স্বপ্নের। কেননা শূন্যতার শেষে ঘটে যায় ফণির চৈতন্যের এমন এক দ্বন্দ্ব যা তাকে নিক্ষেপ করেছে 'জগত মিথ্যা'-র জনশূন্য বাড়ির চিরজীবনের সর্বস্বজড়ানো সংসারের ফাঁকা খাঁচাটায়। স্ত্রী মণিমালিকার সঙ্গে জীবনে যে সম্পর্ক ছিল স্বামীর তা অনেকটাই 'ঠাণ্ডা' অস্তিত্বের। তাই মধুসূদনের সঙ্গে ঘর ছাড়ার প্রাককালে স্ত্রীর মনে রচনা করে নিতে শেখেনি স্বামীর ব্যবসায়িক বুদ্ধি। মণির হৃদয়ের 'বরফপিন্ড' গলাবার সময়টুকু দিতে পারেনি 'পুরুষ' হওয়ার উন্নত হৃদয়বৃত্তি গর্ব। তাইতো নদীর ধারের সাঁতার কাটার অভ্যাস স্নায়বিক উদ্দীপনা কাজে আসেনি। মেলা ভাঙার পর-পরেই সকলের থেকে ছিন্ন ফণির মনোজগতের ভাষাতীত বেদনা অঝোরে ঝরতে থাকে অমানুষী শরীরী সত্তার সূত্র ধরে, যা 'অতলস্পর্শ সুপ্তির' মধ্যে নিমগ্ন অবস্থায় ছিল। নদীতীরের শব্দ প্রথমে ফণির নির্জ্জন মনে আসে বাচনিক অর্থপূর্ণ সাংকেতিক ব্যাঞ্জনার দ্বারা। 'ভেকের অশ্রান্ত কলরব', শ্রাবণের ধারার 'ঝরঝর' শব্দ, আলনায় 'শাড়ি কোঁচানো'র জায়গা প্রভৃতি সংকেতের সাহায্যে কল্পনায় অতৃপ্ত বাসনাকে (যা স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের বর্বরতার) ঘুমের মধ্যে ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করে। ফ্রয়েডের মতে, "it is an attempt at wish fulfillment" অর্থাৎ স্বপ্ন নিদ্রা রক্ষার চেষ্টা করতে গিয়েও ব্যর্থ হয় কোনও এক অনিশ্চয়তায়। এভাবে ছোট ছোট শাব্দিক বিন্যাসে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ধরতে চেয়েছেন কৈফিয়তের বিশ্লেষণকে।

তথ্যসূত্র :

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মপরিচয়', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৫০, পৃষ্ঠা ৪১।

২) রবীন্দ্র রচনাবলী ষোড়শ খন্ড, 'কঙ্কাল', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৩৫০, পৃষ্ঠা ৩২১।

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, 'জীবিত ও মৃত', অশোক বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৯২।

৪) রবীন্দ্র-রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড, 'নিশীথে', কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, প্রকাশ ২৫ বৈশাখ, ১৩৫২, পৃষ্ঠা ২৬৪।

৫) রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ৭ পৌষ, ১৩৫২, পৃষ্ঠা ২৩৬।
৬) রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড, ‘মণিহারা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৩৫৩, পৃষ্ঠা ২৬০।
৭) রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ খন্ড, ‘কঙ্কাল’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৩৫০, পৃষ্ঠা ৩২১।
৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৮।
৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৫।
১০) রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ খন্ড, ‘কঙ্কাল’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৩৫০, পৃষ্ঠা ৩২৭।
১১) রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খন্ড, ‘ছিন্নপত্রাবলী’, ১২১ সংখ্যক, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ১৩৫।
১২) রবীন্দ্র-রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড, ‘নিশীথে’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ২৫ বৈশাখ, ১৩৫২, পৃষ্ঠা ২৬৭।
১৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৫।
১৪) রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ৭ পৌষ, ১৩৫২, পৃষ্ঠা ২৩৮।
১৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪১।
১৬) Edward Charles Whitmore, 'The Supernatural in Tragedy', Cambridge Harvard University Press, 1915, P-352।
১৭) রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’,বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ৭ পৌষ, ১৩৫২, পৃষ্ঠা ২৪১।
১৮) রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ৭ পৌষ, ১৩৫২, পৃষ্ঠা ২৪২।
১৯) সিগমুন্ড ফ্রয়েড ‘স্বপ্ন-বিশ্লেষণ’, কলকাতা, প্রকাশ ১৪১০, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩।
২০) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, ‘জীবিত ও মৃত’, অশোক বুক এজেন্সী, ২০০৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯২।
২১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৪।
২২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭।
২৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭।
২৪) রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড, ‘মণিহারা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৩৫৩, পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০।
২৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রধারা : আত্ম-নির্মাণের প্রেক্ষিতে

সৌমিত্র কুণ্ডু

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্য সংরূপ বাংলা পত্রসাহিত্য। পত্র বা চিঠি সাধারণত তিন প্রকার হয়। সাধারণ চিঠি যা প্রয়োজনের কথা, কাজের কথা— তা তথ্যপূর্ণ হয়। সমসাময়িক সমাজ বা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পক্ষে প্রয়োজনীয়, এর ঐতিহাসিক মূল্য বেশি। সাহিত্যিক পত্র— এই চিঠি; পত্র লেখকের শুধু ব্যক্তিত্বের নয়, হৃদয়ের স্পর্শ বিজড়িত, এই পত্র নিছক প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়। তা সৃষ্টিধর্মী, আত্মপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। পত্র যখন সাহিত্য হয়ে ওঠে তখন তা হয় সকলের। আর এক ধরণের চিঠি হল সাময়িক পত্রিকার সম্পাদককে লেখা চিঠি, যাকে বলা হয় খোলা চিঠি।

১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ দেব (ভূপ) অহোম রাজ চুকামফা স্বর্গদেব বাহাদুরকে যে চিঠি লিখেছেন, সেই বৈষয়িক চিঠিই বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বা প্রথম চিঠি হিসাবে উল্লেখিত হয়। তবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে পত্র চর্চার বিশেষ প্রচলন ছিল তা বররুচির 'পত্রকৌমুদী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়। পত্রের বিষয়বস্তু ছাড়াও পত্রদাতার নানা বিষয়ে নির্দেশদান বা প্রশস্তি পত্রের প্রধান বিষয় ছিল। পত্রের বিনিময় ও ব্যবহারের আরও পরিচয় পাওয়া যায় কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'তে শকুন্তলার দুষ্মন্তকে লিখিত পত্রে। এছাড়াও 'ভাগবত পুরাণে' রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লেখার প্রসঙ্গ আছে। মধ্যযুগে মুসলমান আমলেও পত্র রচনার প্রাচীনযুগের ঐতিহ্য বজায় ছিল। তবে তা নিতান্তই কেজো কথা এবং সংবাদে পূর্ণ। প্রথম ভারতে পত্র পাঠানোর জন্য ডাক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় আলাউদ্দিন খিলজির (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি:) রাজত্বে। পরে পাঠানসম্রাট শেরশাহের রাজত্বকালে (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি:) ডাক ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। উনিশ শতকে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের দেশীয় মানুষের বৈষয়িক ব্যবস্থা শেখানোর জন্য রামরাম বসু 'লিপিমালা' রচনা করেন। এর প্রথম ধারায় ১৫ টি এবং দ্বিতীয় ধারায় ২৫ টি পত্র আছে।

উনিশ শতক বাংলা সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়। ইংরাজি সভ্যতা ও শিক্ষার সংস্পর্শে এসে উনিশ শতকে বাঙালির ভাবজীবন ও সমাজ জীবনে যে বিপ্লব দেখা যায় তার লক্ষণ সমগ্র যুগের সাধনায় ব্যপ্ত হয়ে আছে। এই মানসিক বিপ্লবের ফলে বাইরের জগতে প্রধান সংঘাত বাধে

বাঙালির সমাজজীবনে। যার প্রথম অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রাহ্মসমাজ'। বাংলা পত্র রচনার ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রামমোহন রায় এবং তার পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের পত্র সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে ওঠে। পত্রসাহিত্যে সাধারণ বিষয় লেখকের বর্ণনা ও আত্মজাগৃতি গুণে মহনীয় হয়ে ওঠে।পত্রসাহিত্য নিছক ব্যক্তিগত সংবাদ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে না থেকে পত্রলেখকের আন্তঃমানসের উন্মোচন ঘটায়। এই আত্মউন্মোচন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলীতে তাঁর আত্ম নির্মাণের পক্রিয়াকে কীভাবে কার্যকর করেছে তা আলোচনা করব।

বাংলা সাহিত্যের অবিসংবাদিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রসাহিত্যকার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি প্রথম চিঠি লিখেছেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি মাতার অনুরোধে পিতাকে চিঠি লেখার অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সেখানে শিশু রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে, রাশিয়ার ভারত আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হওয়াতে মার মনে উদ্বেগ উপস্থিত হয়েছিল। সেই উৎকণ্ঠা দূর করতে মার আদেশে পিতাকে চিঠি লেখেন। কেমন করে চিঠি লিখতে হয় তা জানতেন না। তাই দপ্তরখানায় মহানন্দ মুনশির শরণাপন্ন হন। চিঠি লেখার সেই শুরু, আর শেষ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই। মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছিলেন অন্যের হাত দিয়ে। ১৭ বছর বয়সে 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' তরুণ রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রসাহিত্য রচনা 'ছিন্নপত্রাবলী'। তারপর তাঁর পত্রধারায় ক্রমবিস্তারে পাওয়া যায় 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পথে ও পথের প্রান্তে' প্রভৃতি। এছাড়াও রয়েছে তাঁর প্রকাশিত আঠারো খন্ডে চিঠিপত্র গ্রন্থাবলী এবং পৃথকভবে হেমন্তবালা দেবী, প্রমথনাথ বিশি প্রমুখকে লেখা অজস্র পত্র। ডঃ গৌরচন্দ্র সাহার 'রবীন্দ্র পত্রাবলী : তথ্যপঞ্জী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ছাপা চিঠির সংখ্যা প্রায় চার হাজার। এই চার হাজার চিঠি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ৩২০ জনকে।[১] এখনও তাঁর অপ্রকাশিত নানা পত্রের সন্ধান চলছে এবং মুদ্রিত হয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছেন একাধিক নারী ও পুরুষকে। তিনি যেসব নারীর মধ্যে পত্র লেখবার ক্ষমতা দেখেছেন তাঁরা হলেন— ইন্দিরা দেবী, কাদম্বিনী দেবী, হেমন্তবালা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, রাণু অধিকারী প্রমুখ। পুরুষদের মধ্যে যাঁদের বেশি চিঠি লিখেছেন, তাঁরা হলেন— অজিতকুমার চক্রবর্তী, অমল হোম, অমিয় চক্রবর্তী, দিলীপকুমার রায়, প্রমথ চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশি প্রমুখ।

ইউরোপ প্রবাসীর পত্র :

তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১৭ বছর বয়সে লন্ডন ও প্যারিসে গিয়েছিলেন, কিছুকাল স্কটল্যান্ডেও থাকেন। অভিভাবকদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে I.C.S. করার। তারই প্রস্তুতির

ফাঁকে তিনি বিলিতি সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় অনেকগুলি চিঠি লেখেন। সেগুলি 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পত্রগুলির মধ্যে তারুণ্যের উচ্ছলতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসংযম ও নেতিবাচকতা আছে। রবীন্দ্রনাথ এগুলি পত্রাকারে প্রকাশে সম্মত ছিলেন না। বন্ধুদের অনুরোধে ইতিহাসের ধারা রক্ষার জন্য তাঁকে পত্রগুলি কুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করতে হয়। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

"আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখোমুখি এক প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহার চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।"[২]

নিজের কথা সহজ ভাবে বলেছেন পত্রগুলিতে। এর ভাষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, বাংলা চলিত ভাষার সহজ প্রকাশ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে। আলোচ্য পত্রধারায় ইংরেজ সমাজ সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত অনুভূতির নানা বিবরণ আছে।

ছিন্নপত্রাবলী :

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর 'ছিন্নপত্রাবলী'র মুখ্য পত্র প্রাপিকা স্নেহের ভাইজি ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন যে, তিনি যে সব চিঠি লিখেছেন তাতে তাঁর মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমন আর কোন লেখায় হয় নি। তিনি আরও লিখেছেন,

"যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে অন্তরের কথা তার চিঠিতে প্রকাশ পাচ্ছে তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখবার ক্ষমতা আছে।"[৩]

এভাবে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে উন্মোচন করেছেন। তাঁর অন্তরের কথা প্রকাশের, তাঁর সমস্ত লেখার আকর্ষণ হয়ে উঠেছে ইন্দিরা দেবী।

'ছিন্নপত্রাবলী'র চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্যচেতনার রঙে রঙিন। অনেকগুলি চিঠিতে 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি' প্রভৃতি কাব্যের নানা কবিতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। আবার একাধিক গল্পের চরিত্রগুলি তাদের আদিরূপে দেখা দিয়েছে আলোচ্য পত্রাবলীতে। কিন্তু এর সবচেয়ে অবারিত দিক হল রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সৌন্দর্যসম্ভোগ। শিলাইদহ থেকে ১২৯৯ সালের ২ আষাঢ় এক পত্রে লিখেছেন যে, প্রকৃতির সমস্ত রঙ, আলো এবং ছায়া, আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, দ্যুলোক-ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত শূন্য— পরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্য কম আয়োজন চলছে না। সেটা বড়ো একটা উৎসবের ক্ষেত্র।

প্রকৃতি কখনও হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র সত্তা। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে এক চিঠিতে লিখেছেন যে, ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত, তেমন তাঁর পদ্মা, তাঁর বাহন, খুব বেশি পোষমানা নয়, কিছুটা বুনো। তার পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। এভাবে

প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে সজীব সত্তা। রবীন্দ্রনাথের ছাত্র সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশি বলেছেন যে, ছিন্নপত্রের নায়িকা পদ্মা।

রবীন্দ্রনাথ নিজের দেহপীড়া নিয়ে কৌতুক স্নিগ্ধ পত্র লিখেছেন। দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফিরে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এক পত্রে লিখেছেন যে, কোমরটাকে যত সামান্য বলে মনে হত এখন আর তত সামান্য মনে হয় না। হৃদয় ভেঙে গেলে একেবারে কাত। তখন প্রেমের আহ্বান, স্বদেশের আহ্বান, সমস্ত পৃথিবীর আহ্বান এলেও কোমরে টার্পিন তেল মালিশ করবে। এভাবে কৌতুকের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজের দেহযন্ত্রণা খানিকটা ভোলবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আত্মকৌতুকের এই পত্রে তাঁর গানেরও লালিকা (parody) রচনা করেছেন— 'তবু কেন কোমর টনটন করে রে' (মূল গান— 'তবু কেন প্রাণ কাঁদে রে')

'ছিন্নপত্রাবলী'র অনেকগুলি চিঠিতে 'ছুটি', 'পোস্টমাস্টার', 'সমাপ্তি' প্রভৃতি ছোটগল্পের, 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'নরনারী' প্রবন্ধের এবং তাঁর 'প্রকৃতিপর্যায়'এর কিছু গান রচনার বীজ লক্ষ্য করা যায়। শিলাইদহ থেকে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে এক পত্রে লিখেছেন যে, কবিতা তাঁর বহুকালের প্রেয়সী। তিনি সাধনাতেই লেখেন আর জমিদারিই দেখেন, যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন, তখন নিজের মধ্যে প্রবেশ করেন। এও জানিয়েছেন যে, জীবনের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচারণ করলেও, কবিতায় কখনও মিথ্যা বলেন না। কবিতা তাঁর জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান। কবিতার মধ্যে যে তিনি নিজেকেই প্রকাশ করেন, নিজের নির্মাণ ঘটান সেকথা জানিয়েছেন। তিনি অন্য এক চিঠিতে লিখেছেন যে, অনেক মূর্খ মনে করেন কবিতার ছন্দোবন্ধ একটা বাহাদুরি, তাতে সাধারণ লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে সুখ দেয়, সেটা ভুল। কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়, বিশ্ব জগতের সমস্ত সৌন্দর্য সেই নিয়মে সৃষ্টি। এভাবে কবিতার সঙ্গে জাগতিক সৌন্দর্যের একটা মেলবন্ধন তৈরি করেছেন। ফলে তাঁর আত্মাও আর বন্দি থাকে না, প্রসারিত হয় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। কখনও উপমা তাঁর প্রকৃতি চেতনাকে নতুন রূপ দেয়। সাজাদপুর থেকে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন এক চিঠিতে মেঘের বর্ণনা দিয়েছেন। সেই বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে উপমার ব্যবহার—

"এই ঘন নীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে টকটকে রক্তবর্ণ আভা বেরোচ্ছে— একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক 'বাইসন' মোষ যেন খেপে উঠে রাঙা চোখ দুটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীল কেশরগুলো ফুলিয়ে বক্র ভাবে মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়েছে।"[৪]

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন এক পত্রে লিখেছেন যে, গল্প লেখার সুখ হল, যাদের কথা লিখবেন তারা দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেয়, তাঁর একলা মনের সঙ্গী হয়, বর্ষার সময় বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করে। সেই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নামে উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতরণ করা গেছে। সবে-মাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং

সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, ... হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বাড়ি-শিকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল।"[৫]

এভাবে চিঠিগুলি গল্প রচনার প্লট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গল্পে 'সমাপ্তি' গল্পের পূর্বসূত্র আছে।

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় ছিন্নপত্রাবলীর একাধিক পত্রে। সেখানে তাঁর ভালোলাগা, মন্দলাগা আত্মনির্মাণে প্রভাব ফেলেছে। সাজাদপুর থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই এক পত্রে লিখেছেন যে, বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতি চিরস্থায়ী। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে বেদনাটুকু বাস্তবিক সত্য, বিস্মৃতি সত্য নয়। এক একটা বিচ্ছেদ এবং এক একটা মৃত্যুর সময় মানুষ জানতে পারে সেই ব্যথা, সেই ভয়ংকর সত্য। তাঁর আত্ম এখানে দর্শনের স্তরে উন্নিত হয়েছে। যেখানে তাঁর ব্যক্তিমন ভিন্ন স্তরে বিকশিত। কখনও তাঁর ব্যক্তিত্ব মানবিকতায় পূর্ণ। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে এক চিঠিতে লিখেছেন যে, উপবাস করে, আকাশের দিকে তাকিয়ে অনিদ্রায় থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক করে, পৃথিবীকে এবং মানুষকে কথায় কথায় বঞ্চিত করে— এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চান না। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে করে, একে বিশ্বাস করে, ভালোবেসে, ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মত বেঁচে এবং মানুষের মত মরে যাওয়াকে যথেষ্ট বলে মনে করেন। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এভাবে তাঁর মানবিক সত্তা নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি লিখেছেন যে, তাঁর ইচ্ছা করে দিনরাত্রি বিচার বিবেক বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো পুরোনো জীর্ণতার মধ্যে শরীর মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না করে, একটা দ্বিধাহীন, চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে জীবনের আনন্দ লাভ করেন। এই আনন্দ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রাণের গতি, যা তাঁকে প্রতিটি অনুভবে ভরিয়ে রাখে। শিলাইদহ থেকে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২ জুলাই এক পত্রে লিখেছেন,

"যত বয়স হচ্ছে তত এইটে দেখছি পাওয়াটা নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অন্যে কতটা দিতে পারে তা নিয়ে নালিশ-ফরিয়াদি করা ভুল, আমি কতটা নিতে পারি এইটেই হচ্ছে আসল কথা। যা হাতের কাছে আসে তাকেই পুরোপুরি হস্তগত করে নেওয়া অনেক শিক্ষা সাধনা এবং সংযমের দ্বারা হয়।"[৬]

তিনি পাওয়ার আনন্দে নিজেকে সর্বদা নিমগ্ন রাখতে চান। তিনি মনে করেন যে, ছোটো দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ, কিন্তু বড়ো দুঃখ আমাদের বীর করে তোলে। এই বোধ রবীন্দ্রনাথের আত্মনির্মাণের সহায়ক হয়েছে এবং আত্মকে নানাভাবে বিকশিত করেছে।

জাভাযাত্রীর পত্র :

'জাভাযাত্রীর পত্রে'র কয়েকটি পাতায় পত্রসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। দ্বিতীয় পত্রে তিনি রানী মহলানবীশকে লিখেছেন যে, স্রোতের জলের যে ধ্বনি, সেটা তার চলারই ধ্বনি। চিঠি হল লেখার অক্ষরে বকে যাওয়া, এই

বকে যাওয়াটা মনের তথা জীবনের লীলা। 'জাভাযাত্রীর' অনেকগুলি পত্র দ্বীপময় ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনের বিশেষত; সেখানকার বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম, রামায়ণ, মহাভারতের পুথি; বরোবুদুরের ভাস্কর্য, মংকুনগরোর রাজগৃহের অলিন্দে রামায়ণের চিত্রাবলী, মহাভারত অবলম্বনে ছায়ানৃত্য ইত্যাদির বিবরণে পূর্ণ। এগুলি পত্রপ্রবন্ধ। কিন্তু দুএকটি ছোট চিঠিতে প্রকৃতির রসসম্ভোগ এবং মনের বকুনির স্বাদুসাহিত্যের স্বাদ পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। ছয় সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রানী মহলানবীশকে লিখেছেন যে, দুশো মাইল দূরে এক জায়গায় যেতে হবে, রেলগাড়ির উদ্দেশ্যে মটরগাড়িতে যাওয়া, দরজার কাছে মটরগাড়ি তারস্বরে মাঝে মাঝে শৃঙ্গধ্বনি করছে, দিনটি চমৎকার, নারকেল গাছের পাতা ঝিলমিল করছে। ঝরঝর করছে আর দুলছে আর সামনে সমুদ্র স্বগত উক্তিতে অবিশ্রাম কলধ্বনি করছে। প্রকৃতি চেতনার আলোকে এখানে কবি রবীন্দ্রনাথের আত্ম বিকশিত।

ভানুসিংহের পত্রাবলী :

এই পর্যায়ের পত্র লেখা হয়েছে রানু অধিকারী নামে রবীন্দ্র-অনুরাগিণী এক কিশোরীকে। তাঁর পিতা ফণীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রথমে ছিলেন বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে তিনি শান্তিনিকেতনে সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়ে আসেন। তাঁর কিশোরী কন্যা রানুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা রাণীর বেশ মিল ছিল। এজন্য রবীন্দ্রনাথ তাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। রানুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৫৯ টি চিঠির সংকলন 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'।

'ভানুসিংহের পত্রাবলী' পর্যায়ের গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের ছদ্মনাম দিয়েছিলেন 'ভানুসিংহ'। তারই সূত্রে চিঠিগুলির প্রাপিকা রানুর কাছে তিনি হচ্ছেন ভানুদা। চিঠিগুলির অধিকাংশ শান্তিনিকেতন থেকে লেখা। রবীন্দ্রনাথ বইটির ভূমিকায় লিখেছেন যে, চিঠিগুলির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি এবং তাতে জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস। আর তাতে মিশেছে লেখকের সকৌতুক স্নেহ।

এই পত্র সংকলনের কোন কোন চিঠি 'জাভাযাত্রীর পত্রাবলী'র মত ভ্রমণ বিবরণে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ ও সিংহল থেকে যে চিঠিগুলি লিখেছেন; তাতে রয়েছে সেখানকার জীবনযাত্রা। আলোচ্য পত্রধারার তৃতীয় পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, রানুর সঙ্গে চিঠি লিখে তিনি জিততে পারবেন না। তার মত বাসন্তী রঙের কাগজ তিনি খুঁজে পান নি। সামান্য সাদা কাগজই সবসময় খুঁজে পান না, এই তো চিঠির কাগজের কথা। তারপর ভেবেছিলেন ছবি এঁকে তার চিঠির উপযুক্ত জবাব দেবেন— চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলেন অহংকার বজায় থাকবে না। এ বয়সে নতুন করে হাঁস আঁকতে বসা তাঁর পক্ষে চলবে না। ক অক্ষরে পেটের নিচে ৎ জুড়েও সুবিধা করতে পারলেন না। সেবারকার মত রানুর হাঁসেরই জিত হল। আলোচ্য চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও বেশ কিছু ভ্রমণধর্মী চিঠির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩২৬ সালের

২৬ আশ্বিন শিলং থেকে এক পত্রে লিখেছেন যে, তিনি যেদিন পৌঁছেছেন সেদিন থেকে বৃষ্টি বাদলা কেটে গেছে। সকালে উজ্জ্বল রোদের আলোকে চারিদিক প্রসন্ন। মোটামোটা গোটাকতক মেঘ পাহাড়ের গা আঁকড়ে ধরে চুপচাপ রোদ পোহাচ্ছে। তাদের এমন বেজায় কুঁড়েরকমের চেহারা যে শীঘ্র তারা বৃষ্টি বর্ষণে লাগবে এমন মনে হয় না। এখানেও দেখা যায় প্রকৃতি চেতনার আলোকে তাঁর আত্ম আলোকিত।

রাশিয়ার চিঠি :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ৬৯ বছর বয়সে রাশিয়ায় ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে নতুন সমাজতান্ত্রিক দেশটির বিবরণ দিয়ে অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলির সংকলন 'রাশিয়ার চিঠি'। অধিকাংশ চিঠি রাশিয়ার রাজধানী মস্কো থেকে লেখা। চিঠিগুলির উপসংহারে রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। অন্যান্য চিঠিগুলিও প্রবন্ধধর্মী। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর মস্কো থেকে লেখা প্রথম চিঠিতে লিখেছেন যে, রাশিয়ায় যা দেখছেন আশ্চর্য ঠেকছে। অন্যকোনো দেশের মত নয়, একেবারে মূলে প্রভেদ। তারা আগাগোড়া সব মানুষকে সমান ভাবে জাগিয়ে তুলেছে। কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে মিল ছিল। অল্প কালের মধ্যে তারা দ্রুত বেগে বদলে গেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে কিছু গলদ দেখতেও ভুল করেন নি। তিনি লিখেছেন,

"সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে— কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব বেশি দিন টেকে না— সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।"[৭]

এযেন 'অচলায়তন' নাটক রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। সেই নাটকে দেখা যায় মহাপঞ্চকের দল অচলায়তনকে যান্ত্রিক করে তুলেছে। গুরু বা দাদাঠাকুর এসে সেই যান্ত্রিকতা ভাঙলেন। পঞ্চকের মত ছাত্রদল যান্ত্রিক বিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। এই প্রতিবাদী ভাবনা এবং কোনো বিষয়কে মূল থেকে পর্যবেক্ষণ রবীন্দ্রনাথের আত্মনির্মাণের সহায়ক।

তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার কিছু কমিউন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সেখানকার সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছেন। এ বিষয়ে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর মুক্তালাপ হয়েছে। ইউক্রেনিয়ার একটি যুবক এবং চাষি মেয়ের সঙ্গে কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন নতুন সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার মধ্য এশিয়ার একজন চাষি স্বতন্ত্র ক্ষেতে চাষ করা বাদ দিয়ে ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে যোগ দিয়ে কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারে ফলন বাড়ানোর কাজে আগ্রহী। সামাজিক পর্যবেক্ষণ এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত সমাজ-রূপান্তরের নির্যাস তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। এই সমৃদ্ধি তাঁর আত্ম বিকাশ ঘটিয়েছে।

পথে ও পথের প্রান্তে :

‘পথে ও পথের প্রান্তে’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ৬০ টি চিঠি সংকলিত। এই চিঠিগুলি লেখা হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। প্রথম চিঠিটি রচনার তারিখ ২০ নভেম্বর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ এবং শেষ চিঠিটি লেখা হয়েছে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে। চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর এককালীন সচিব পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ এবং নির্মলকুমারী বা রাণী মহলানবীশকে। তখন তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন। এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা শুনেছেন ও করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে, কিছুকাল ধরে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিরন্তর যে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা চলেছিল, তারই বাক্যালাপের বেগ চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

আলোচ্য পত্রধারায় রবীন্দ্রনাথের মননঋদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। ৬ সংখ্যক পত্রে লিখেছেন যে, নিজের জীবনের কথা যখন ভাবেন— তখন ভাবেন কত সুদীর্ঘ কাল বেঁচে আছেন— কত সুখ-দুঃখ—আশা–আকাঙ্ক্ষা—চেষ্টা ও সাধনা, কত বহু গ্রন্থ জটিল ইতিহাস বুনতে বুনতে জীবন গেল। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দাবিতে মানুষ যে কাজ করে থাকে তার কোনও উদ্বৃত্ত নেই। নিজের মধ্যেই তা শোষিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথের আত্মসমীক্ষার মধ্যে দার্শনিক মননশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। এই আত্মসমীক্ষা তাঁর আত্ম নির্মাণের সহযোগী। আবার কোন কোন চিঠিতে প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৫ সংখ্যক চিঠিতে লিখেছেন যে, সকালে বিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে চমৎকার সূর্যোদয় হয়েছে, ঈষৎ বাষ্পে ঢাকা সকরুণ আলো সেখানের গাছপালা বাড়িঘর সবকিছুকে স্পর্শ করেছে। সেটাই হল চির পরিপূর্ণতার সুর, যা বিশ্বকে চিরনবীন করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি দর্শন এখানে দার্শনিক মননে উন্নীত হয়েছে। প্রকৃতিপ্রেম তাঁর আত্মনির্মাণের সহায়ক হয়েছে।

চিঠির মধ্যে এভাবে বিভিন্ন বিষয় বৈচিত্রে রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। চিঠিগুলি হয়ে উঠেছে তাঁর আত্মচরিত।

তথ্যসূত্র :

১। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথের চিঠি : চিঠির রবীন্দ্রনাথ, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বিষয় – চিঠিপত্র, সম্পা- তাপস ভৌমিক, ১৪১১।

২। রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), পৌষ ১৩৯৬, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পৃ. ১০।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রকাশ ১৩১৯, পৃ. ২৪৫।

৪। তদেব, পৃ. ৫৯।

৫। তদেব, পৃ. ২১০।

৬। তদেব, পৃ. ১৬৮।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৯।

রবীন্দ্রনাথের 'পথের সঞ্চয়' : পাশ্চাত্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ফসল

সুদীপ কোলে

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ধারায় অন্যতম রচয়িতা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর রচিত ভ্রমণগ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এই ভ্রমণগ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন ভ্রমণ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিব্রাজক রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলেত ভ্রমণ ছাত্রজীবনে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮। তারপরের ভ্রমণ বিলেত যাত্রা অন্তরের টানে। এরপর প্রায়শই তাঁর দেশভ্রমণ হয়েছে বিভিন্ন মনীষীদের আমন্ত্রণে। সাধারণত ভ্রমণকারীরা যেসব কষ্ট-দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে দেশভ্রমণে বা পর্যটনে রত থাকেন সেই সব দুর্ভোগ তাঁকে পেতে হয়নি; একমাত্র শরীরের পীড়া ছাড়া। তাঁর সময়ে বিশ্বপর্যটনে জাহাজই ছিল ভ্রমণের একমাত্র মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮ খ্রিঃ থেকে জুন, ১৯৩২ খ্রিঃ পর্যন্ত বিশ্ব পর্যটন করেছেন। তার ফলশ্রুতি হিসেবে পাওয়া যায়— 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৭৮), 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' (১৮৯০), 'পথের সঞ্চয়' (১৯১২), 'জাপানযাত্রী' (১৯১৬), 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' (১৯২৪), 'জাভাযাত্রীর পত্র' (১৯২৭), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩০), 'পারস্য-যাত্রী' (১৯৩২), 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯৩৭) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি।

'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থটিতে ১৯১২ সালে বিদেশযাত্রার প্রারম্ভে ও পথে এবং ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় পরিভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যে সকল প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট এই প্রবন্ধগুলি সেই সময় 'তত্ত্ববোধিনী', 'প্রবাসী', ও 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৩৯ সালে সেগুলি পরিবর্তিত আকারে 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে সাহিত্য-রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি রবীন্দ্রনাথ মুম্বাই শহরে গিয়ে কলকাতা ও মুম্বাই শহরের মধ্যে নিসর্গের ভূমিকাটিকে উপলব্ধি করেছেন। কলকাতার সঙ্গে সমুদ্রের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম গঙ্গা; কিন্তু সমুদ্র মুম্বাইকে বেষ্টন করে রয়েছে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে জলপথে মুম্বাইয়ের যতখানি যোগাযোগ, কলকাতার সঙ্গে তা হয়ে ওঠেনি। এই অপূর্ণতার কারণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে—

"প্রকৃতির সঙ্গে কলকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল গঙ্গা। এই গঙ্গার ধারাই সুদূরের রহস্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার খোলা পথ ছিল। শহরের এই একটি জানালা ছিল, যেখানে মুখ বাড়ালে বোঝা যাইত, জগৎটা এই লোকালয়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়। কিন্তু গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমা আর রইল না, তাহাকে দুই তীরে এমনি আঁটো-সাঁটো পোশাক পরিয়েছে

এবং কোমরে বন্ধ এমনি কষিয়া বাঁধিয়াছে যে, গঙ্গাও লোকালয়েরই পেয়াদার মূর্তি ধরিয়াছে।"[১]

অর্থাৎ সুদূরের আহ্বান বোম্বাইয়ের প্রাণে এসে বাজে। কিন্তু কলকাতার কানে পৌঁছায় না। মুম্বাইয়ের শত শত নরনারী বিচিত্র সাজে সেজে অপরাহ্নের সময় সমুদ্রের ডাকে বেলাভূমিতে এসে জড় হয়। আর সমুদ্রের ডাক কলকাতা শুনতে পায় না। কলকাতা শহরে শুধুমাত্র বৈকালিক হাওয়া উপভোগ করবার জন্য এক ইডেন গার্ডেন রয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার ইতিহাসকে একেবারে নিজস্ব নৈপুণ্যে আবেগমথিত চিত্তে সরস ভঙ্গীমায় তুলে ধরেছেন। বুনো মানুষ একদা ঘোড়াকে বশ মানিয়েছে; সমুদ্রকে জয় করেছে। সেই বিজয় ইতিহাসকে তিনি অনবদ্য ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন—

"ডাঙায় চলিতে চলিতে মানুষ এক জায়গায় আসিয়া দেখিল, সম্মুখে তাহার সমুদ্র, আর তো এগোইবার জো নাই। নীল জল, তাহার তল কোথায়, তাহার কূল দেখা যায় না। আর লক্ষ লক্ষ ঢেউ তর্জনী তুলিয়া ডাঙার মানুষদের শাসাইতেছে; বলিতেছে, 'এক পা যদি এগোও তবে দেখাইয়া দিব, এখানে তোমার জারি-জুরি খাটিবে না।' মানুষ তীরে বসিয়া এই অকূল নিষেধের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু, নিষেধের ভিতর দিয়া একটা মস্ত আহ্বানও আসিতেছে। তরঙ্গগুলা অট্টহাস্যে নৃত্য করিতেছে— ডাঙার মাটির মতো কিছুতেই তাহারদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ লক্ষ ইস্কুলের ছেলে যেন ছুটি পাইয়াছে— চীৎকার করিয়া, মাতামাতি করিয়া, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটিতেছে না; পৃথিবীটাকে তাহারা যেন ফুটবলের গোলার মতো লাথি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া আকাশে উড়াইয়া দিতে চায়। ইহা দেখিয়া মানুষের মন তীরে বসিয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। সমুদ্রের এই মাতুনি মানুষের রক্তের মধ্যে করতাল বাজাইতে থাকে। বাধাহীন জলরাশির এই দিগন্তবিস্তৃত মুক্তিকে মানুষ আপন করিতে চায়।"[২]

কবি রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সমুদ্রের জলরাশি মরুভূমির মতোই মরীচিকা সদৃশ পিপাসার্ত পথিকের কাছে। সেখানে এত জল থাকা সত্ত্বেও এক ফোঁটা জল পান করা যায় না। আর নদীর জল হল মানুষের জীবনসাথী। সংসারে শান্তি আর আনন্দ নিয়ে বোনেরা আমাদের জীবন পূর্ণ করে, নদীগুলোর মধ্যে সেই মানবিক আবেদন মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের সেই সহৃদয়তা নেই, সে যেন মূর্তিমতী বাধা স্বরূপ। তবু মানুষ সমুদ্রের কাছে হার মানে নি। এইভাবে এই গ্রন্থটিতে নিসর্গ ও বস্তুবিশ্ব কেবলই নিজ রূপে উদ্ভাসিত হয়নি; রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনালোকে স্বতন্ত্র রূপে উপস্থাপন করেছেন।

এই গ্রন্থের 'যাত্রার পূর্বপত্র' অংশে তিনি য়ুরোপীয় সভ্যতাকে বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"বস্তুত, বনস্পতির প্রবল প্রাণশক্তিই প্রচুর পল্লব বর্ষণ করে; অবিশ্রাম পরিত্যক্ত মৃত পত্রে তাহার মৃত্যু প্রমাণ করে না।"[৩]

য়ুরোপ আপন শক্তির ঐশ্বর্য সম্পর্কে সচেতন। এই সচেতনতা তাকে পীড়নের

মতো পালনেও দক্ষ করে তুলেছে। সে পীড়া দেওয়ার সাথে সাথে সেবাও করেছে। যন্ত্রসভ্যতায় মানুষ যন্ত্রের দাস। ভোগ্যবস্তুর মধ্যেই তার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা। কৃচ্ছ্রসাধন তার ব্রত নয়। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া কোনো সভ্যতার উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি য়ুরোপীয় সভ্যতার উন্নতির মূলে কৃচ্ছ্রসাধনাকে উপলব্ধি করেছেন। সে কৃচ্ছ্রসাধনা পুণ্যলাভে নয়, তীর্থ যাত্রায় নয়; লোকহিতব্রতে জেগে ওঠে। তিনি য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে যে মহাপ্রাণতার উল্লেখ করেছেন; এই গ্রন্থে তা দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কর্ম্মমুখর ইংল্যাণ্ডের মানুষ ছুটি পেলেই গ্রামে ছুটে যায়। সেখানকার মুক্ত আকাশ, খোলামাঠ আর সবুজ ক্ষেতের টানে তাদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আগস্ট মাসের এমনই একটি ছুটির দিনে রবীন্দ্রনাথ ট্রেনে করে যাত্রীদের সঙ্গে লণ্ডন থেকে এন্ড্রুজ সাহেবের এক পাদ্রি বন্ধুর পল্লীতে এসে উপস্থিত হন। সেখানে পাদ্রি সাহেব গ্রামের বিভিন্ন কৃষকদের বাগান তৈরীর উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির মূল লক্ষ্য ছিল যাতে কৃষকেরা তাদের বাড়ির চারপাশের জমিতে বিভিন্ন বাগান তৈরী করতে পারে। এর জন্য তিনি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করেন। পাদ্রি সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে তিনি লক্ষ করেন প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ির চারপাশে ফুলের ও তরকারির বাগান সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছে। সারাদিন মাঠের কাজ সমাপ্ত করে সন্ধ্যাবেলাতে এরা বাগান পরিচর্যা করে। আনন্দের সঙ্গে কাজ করে বলেই এই অতিরিক্ত পরিশ্রম তাদের কষ্টদায়ক মনে হয় না। ইংল্যাণ্ডে পাদ্রিরা নানা জনকল্যানমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে রাখেন।

এদেশীয় ব্রাহ্মণদের মতো পাদ্রিরা ধর্ম্মমতের জাল বিস্তার করে সমস্ত দেশকে বেষ্টন করে রেখেছে। ফলে দেশের উন্নতি কখনো কখনো বাধাগ্রস্ত হলেও দেশের অভ্যন্তরের মূলসুরকে তারাই ধ্বনিত করে তুলেছে। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণদের মতো জন্মসূত্রে পাদ্রি হওয়া যায় না। পাদ্রি হতে হলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও চারিত্রিক শুদ্ধতা অর্জন করতে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সে দায় নেই। ফলে তারা সৎ ও আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতে হয় না। কিন্তু পাদ্রিদের সমাজের কাছে একটা জবাবদিহি করতে হয় বলেই নির্মল চরিত্রের ধর্মনৈতিক সাধনার সুরটিকে সাধ্যমতো দেশের মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। পাদ্রিদের চরিত্রবান হওয়ার ভালো দিকগুলি সেখানকার সমাজ ভোগ করছে। পাদ্রিরা সাধ্যমতো সমস্ত দেশের ভালোর জন্য মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু চরিত্রধর্মে না হলেও স্বভাবধর্মে তারা ব্রাহ্মণদের মতোই ধর্মতন্ত্রের ধ্বজাবাহী। তাই চার্চের চিরপ্রথাগত বাহ্য পূজাবিধিতে একটু নড়চড় হলেই তারা এদেশীয় ব্রাহ্মণদের মতো নানা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে য়ুরোপ ভ্রমণকালে সেখানকার ভাবুক সমাজের সঙ্গে পরিচয় করেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি সেখানকার এই সমাজের দুটি প্রবণতার কথা বলেছেন। সেই প্রবণতাগুলি হল চিন্তার তীক্ষ্ণতা এবং চিন্তার ক্ষিপ্রতা। চিন্তার তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও তিনি আন্তরিকভাবে মানুষের প্রতি দরদী ছিলেন। মানুষের সর্বজনীন উন্নতির প্রতি

য়ুরোপের ভাবুক সমাজ গভীর অনুরক্ত। চিন্তাশক্তির তীক্ষ্ণতায় ও হৃদয়বৃত্তির পেলবতায় তা সমাজ জীবনের সামঞ্জস্য বিধানে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে একথা স্বীকার করেছিলেন। য়ুরোপের ভাবুক সমাজ যেমন চিন্তার তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও মানুষের প্রতি দরদী ছিলেন; তেমনি চিন্তাশক্তির ক্ষিপ্রতাও লক্ষ করা যায়। তাঁরা চিন্তার মধ্যেই জেগে থাকেন। আবার বলা যায় জনগণের দাবী তাঁদেরকে জাগিয়ে তোলে। এঁদের নিজস্ব হৃদয়ের পেছনে সমস্ত দেশের চিন্তার বিষয় কাজ করে। তাই সর্বদাই তাদের জাগ্রত ও মুখরিত হতে হয়।

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থায় পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে নিবিড়তা ও শিথিলতাকে স্পষ্ট করেছেন। আর 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের 'সমাজভেদ' অংশে তাকে আরো সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আহারে-বিহারে, বসনে-ভূষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই ভেদ সম্পর্কে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থে তিনি বেশ কৌতূহলের সঙ্গে বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথ জীবতত্ত্বের অমিলের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি মূলত প্রাচ্যের সমাজ পারিবারিক কাঠামোয় বাঁধা এবং আত্মীয়মণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার কথা বলেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের সমাজ হল জনসমাজ। ব্যপ্তিই তার স্বভাবধর্ম। তাই য়ুরোপের মানুষ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। তিনি লিখেছেন—

"পাশ্চাত্যসমাজ পারিবারিক সমাজ নহে; তাহা জনসমাজ, তাহা আমাদের সমাজের চেয়ে ব্যাপ্ত। ঘরের মধ্যে ততটা পরিমাণে সে নাই যতটা পরিমাণে সে বাহিরে আছে। আমাদের দেশে পরিবার বলিতে যে জিনিস বোঝায় তাহা য়ুরোপে বাঁধে নাই বলিয়াই য়ুরোপের মানুষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।"[৪]

কবি রবীন্দ্রনাথ এই মূলগত প্রভেদের পাশাপাশি গদ্য ও পদ্যের অন্তরধর্মের মিল খুঁজে পেয়েছেন। পদ্য যেমন সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ; কিন্তু তার ভেতরটি আলগা ও সাবলীল। প্রাচ্য সমাজ তেমনি ছোটোগণ্ডীর মধ্যে বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদের সূত্রে নিজস্ব পরিবার এবং প্রতিবেশীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপরিচয়ের সীমাকে ছিন্ন করে তাকে সম্পর্ক গড়তে হয়নি। কিন্তু পাশ্চাত্যের সমাজ গদ্যের মতো। গদ্য একদিকে যেমন স্বাধীন, ছড়িয়ে পড়াই তার স্বভাব। আবার অন্তরধর্মে প্রতিটি পদক্ষেপ তার তথ্য ও যুক্তির দ্বারা বিকশিত হয়। পাশ্চাত্যের সমাজের বাইরের গণ্ডীটি গদ্যের মতো আলগা; কিন্তু অন্তরধর্মে তা গভীরভাবে আবদ্ধ।

ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় বর্ণাশ্রমের দ্বারা পারিবারিক সমাজকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করবার সাধনায় নিজেকে নিয়োগ করেছে। বাবার সামনে তামাক না খাওয়া, গুরুঠাকুরকে প্রণাম ও দক্ষিণা দান, ভাসুরকে দেখলে ঘোমটা টানা প্রভৃতি সামাজিক নিয়ম-কানুনের দ্বারাই ভারতের পরিবার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পরিবারের বাইরে বর্ণভেদভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এইভাবে ভারতবর্ষ বৃত্তিভেদের দ্বারা প্রতিযোগিতার লড়াইকে প্রতিহত করেছে। জাতিভেদের দ্বারা ধর্ম ও ক্ষমতার লড়াইকে ঠেকিয়ে রেখেছে। ব্রাহ্মণ যেমন একদিকে

সমস্ত সামাজিক বিধানকে আপন সুখ-সমৃদ্ধির জন্য গড়ে তুলেছে। আবার ধনীর ভোগ ঐশ্বর্য সাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণকে আশ্রয় করে তারা ক্ষমতাবাণ হয়ে উঠেছে। তাই ভারতবর্ষীয় সমাজে কোনোদিন কোনো সংঘাতের সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু য়ুরোপীয় সমাজ বৃহত্তর প্রয়োজনের বন্ধনকে স্বীকার করেছে; কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি তাদের একই বন্ধনে বেঁধে পরস্পরের সংঘাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে নি। পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতার জন্য য়ুরোপে অনেক মহৎ মানুষের আবির্ভাব হয়েছে তা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থে দেখা যায়। আর সীমাহীন স্বার্থপরতা যে তারই একটি ফল তাও ব্যক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই স্বার্থপরতার আসল রূপটিকে তুলে ধরেছেন।

ভারতবর্ষ তার সনাতন প্রথার গর্ব ভুলতে পারে নি বলেই পাশ্চাত্যের অভিঘাতে গভীরভাবে জর্জরিত হতে হয়েছে। সমাজ-ইতিহাসের পাঠ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন যে ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ নিজ গর্বে অন্ধ থাকার জন্যই বৌদ্ধধর্মের প্লাবনকে একদিন ঠেকাতে পারেনি। আধুনিক ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে না পারলে তাকে দুঃখ পেতে হবে। পাশ্চাত্যের অভিঘাতে আমাদের সমাজজীবন জর্জরিত। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙেছে এবং সমাজপতিদের পদচ্যুতি হয়েছে। বর্ণগত পেশা ছেড়ে মানুষ জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। টোলের শিক্ষা ব্যবস্থা জনসাধারণের কাছে আস্থা হারিয়েছে। দুর্ভিক্ষে সরকারি হস্তক্ষেপ পড়েছে এবং বিত্তবান মানুষেরা শহরমুখী হয়ে উঠেছে। সর্বত্রই মানবজীবনে একটা ভাঙন এসেছে। এর ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাতে সনাতন রীতি দিয়ে সমাধান অসম্ভব। তাই সনাতন রীতি ভুলে আমাদের য়ুরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে। আর এই শিক্ষার দ্বারা নতুন সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন।

এই গ্রন্থে তিনি আরো জানিয়েছেন যে, ভারতবর্ষীয় সমাজের মানুষ পরিচিত মহলের বাইরে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তাদের ভীষণ আপত্তি। কিন্তু য়ুরোপীয় সমাজে মানুষ দুটি সত্তায় বিরাজ করে। একটি হল তার ব্যক্তিগত সত্তা আর অপরটি হল তার সামাজিক সত্তা। ব্যক্তিসত্তায় সে সকলের থেকে স্বতন্ত্র। এখানে সে নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে ব্যক্তিগত জীবনকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কিন্তু সামাজিক সত্তায় সে সর্বজনীন। সেখানে সে সকলের সঙ্গে নিযুক্ত হয়ে কাজ করে। ব্যক্তিগত জীবনকে সে এখানে টেনে আনে না। ফলে ব্যক্তি জীবনের মতো সমাজ জীবনেও সহজ, সরল, সুশৃঙ্খল ও স্বাভাবিক। ভারতবর্ষীয় সমাজে এই দুটি বিভাগ না থাকায় ব্যক্তিজীবনের সামাজিক দায় আমাদের কষ্টকর করে তোলে; আবার সামাজিক জীবনে ব্যক্তি জীবনের অসঙ্গতি আমাদের বিড়ম্বনার মূল কারণ হয়ে ওঠে।

কবি রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হন যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটক তারই স্বাক্ষর বহন করে। এর দশ বছর পর রচিত 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থে তিনি বিলাতি ও ভারতীয় সঙ্গীতের পার্থক্যের দিকটিকে তুলে

ধরেন। আর 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীতের এই দুটি স্বতন্ত্র আবেদনের কারণ তিনি ব্যাকরণের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। এই গ্রন্থে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে হার্মনি বা স্বরসঙ্গীতকেই প্রধান বলে মনে করেছেন। আর ভারতীয় সঙ্গীতের মুখ্য বিষয় হল রাগ-রাগিণী। ফলে য়ুরোপীয় সঙ্গীত আমাদের কানের মধ্যে তার আবেদন প্রস্তুত করতে পারে; কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের কানাড়া, টোড়ি প্রভৃতি রাগিণীর মধ্যে যে গাম্ভীর্য আছে, তা আমাদের পার্থিব অভাব মোচন করে অসীমের সন্ধানে নিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন—

"আমাদের সংগীত মানুষের প্রমোদশালার সিংহদ্বারটা ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয় এবং জনতার মাঝখানে অসীমকে আহ্বান করিয়া আনে।"[৫]

য়ুরোপীয় সঙ্গীত আমাদের উচ্ছ্বসিত করে তোলে; কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীত আমাদের হৃদয়কে আন্দোলিত করে তোলে। এইভাবে এই গ্রন্থে শিল্প-সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভ্রমণ অভিজ্ঞতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতার অন্যতম ফসল।

পরিশেষে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থটির পাশাপাশি বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ধারায় স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পথের সঞ্চয়', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৬, পৃষ্ঠা ২৭।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পথের সঞ্চয়', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৬, পৃষ্ঠা ৫২।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পথের সঞ্চয়', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৬, পৃষ্ঠা ৬।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পথের সঞ্চয়', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৬, পৃষ্ঠা ১৫৫।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পথের সঞ্চয়', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৬, পৃষ্ঠা ১৪৬।

অস্তিত্বের সংকট ও উত্তরণ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের প্রেক্ষিতে

সুশান্ত বেরা

সংক্ষিপ্তসার :

মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারির কাছে মানুষের জীবন ছিল অসহায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়' ও 'দুঃশাসন' গল্পে সেই বিভীষিকার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পে দেখা যায় মানুষ মানুষকে আড়চোখে দেখছে। কিছু সম্প্রদায় নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত। একদিকে ক্ষুধাতুর মানুষের আর্ত কলরব, অন্যদিকে কিছু মানুষের বিলাসী জীবনযাত্রা। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণার ছবি গল্পে ফুটে উঠেছে। আবার এযুগের দুঃশাসনরা কতশত দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করে চলেছে সমাজ তার হিসেব রাখে না। দেবীদাসের মতো মজুতদার সম্প্রদায়রা এই সমাজের দুঃশাসনের প্রতিভূ। তবে লেখক আশাবাদী তিনিও প্রত্যাশা করেছেন দুর্যোগের কালোমেঘ কেটে আকাশের রঙ আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠবে। নতুন ভোরের আলোয় জীবনের রঙ রঙিন হয়ে উঠবে।

সূচক শব্দ :

ম্যাগ্নেলিয়া, হেঁসো, হাইড্রেন্ট, মন্বন্তর, মহাযুদ্ধ, অ্যাসফল্ট, ডাস্টবিন, তাহিতি, বুভুক্ষু, খিচুড়ির ড্যালা, দুঃশাসন।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন বলিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। কালের পাতায় তিনি তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি শুধু প্রতিভাবানই নন, সমসাময়িক যুগের একজন প্রতিনিধি স্থানীয় শিল্পী। শিল্পী মাত্রই তিনি সমাজের প্রতিনিধি। সমাজের বহুবিধ বিচিত্র দিক তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষ দিশেহারা। অপরদিকে কালোবাজারি, মুনাফাখোর ও মজুতদার সম্প্রদায়ের আস্ফালন মানুষের জীবনকে উদভ্রান্ত করে তুলেছিল। সেই সঙ্গে মন্বন্তরের করালগ্রাস মানুষকে দিশেহারা করেছিল। সেই পরিস্থিতিতে মানুষ মানুষকে আড়চোখে দেখছে। সকলে সকলকেই ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিছু সম্প্রদায় ব্যস্ত নিজেদের আখেরকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য, অপরদিকে নিরন্ন মানুষের হাহাকার। পশু-মানুষে একসঙ্গে খাওয়ার সংগ্রহে

ব্যস্ত। এ প্রসঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের দৃশ্যপট আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। আসলে সেদিন সর্বগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবে মানুষের জীবন খেলাঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বাংলা জুড়ে দেখা দিয়েছে নিরন্ন বিবস্ত্র নরনারীর গগনভেদী হাহাকার। এই রকম এক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি মানুষ ও সমাজের যে অস্তিত্বের সংকট ও সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল তারই প্রতিফলন তাঁর সৃষ্টি সম্ভারে লক্ষ করা যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিতে সমাজ সম্পৃক্ত মানুষের ছবি ধরা পড়েছে। সেই সঙ্গে তিনি সময়ের দাবিকেও মেনে নিয়েছেন তাই তাঁর ছোটগল্পগুলিতে যুদ্ধ ও মন্বন্তরের প্রেক্ষাপট উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'বীতংস', 'হাড়', 'নক্রচরিত', 'দুঃশাসন', 'টোপ', 'ভাঙা-চশমা', 'বনতুলসী', 'সৈনিক', 'ইতিহাস' প্রভৃতি একাধিক গল্প থাকলেও মূলত তাঁর দুটি গল্প যথা 'হাড়' ও 'দুঃশাসন' গল্পের মধ্যদিয়ে মানুষের সংকট ও নিরন্তর লড়াইয়ের ছবিকে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

'হাড়' গল্পের কাহিনিতে দেখা যায় একজন বেকার যুবক রায়বাহাদুর এইচ. এল. চ্যাটার্জির বিলাস বহুল বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোহার গেটের ওপাশে দুটো কুকুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। গল্পের কথক চাকুরির সুপারিশের জন্য রায়বাহাদুরের বাড়িতে এসেছে। কারণ রায়বাহাদুরের একটি কলমের আঁচড়ে তার চাকুরিটা হয়ে যেতে পারে। রায়বাহাদুর মশায় তার পিতৃবন্ধু। তাই বিশেষ আশাপ্রদ ছিল গল্পের কথক। সেই আশা নিয়েই সে শ্যামবাজার থেকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে উপস্থিত হয়েছে। গেটের সামনে পায়চারি করতে করতে সে শুনতে পেয়েছে মনোহরপুকুর পার্ক থেকে ভেসে আসা বুভুক্ষু মানুষের আর্ত কলরব। একমুঠো খাবারের জন্য কুকুরে মানুষের লড়াই সেখানে সহজেই চোখে পড়ে।

গল্পের কথক কিছুক্ষণ লোহার ফটকের সামনে পায়চারি করার পর রায়বাহাদুরের মেয়ে তাকে দেখতে পায়, তখন গল্পের কথক রায়বাহাদুরের বিলাসবহুল কক্ষে প্রবেশ করে। গল্পে তার সুন্দর বর্ণনা আছে—

"সবুজপর্দা সরিয়ে ভেতরের কার্পেটে পা দিলাম। নীল রঙের একটা স্নিগ্ধ আলোয় ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেটির ওপর পা তুলে আধশোয়া অবস্থায় এক ভদ্রলোক কি পড়ছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই উঠে বসলেন।"[১]

নমস্কার প্রতিনমস্কারের পালা শেষ হওয়ার পর গল্পের কথক একখানা চিঠি রায়বাহাদুরের হাতে তুলে দেয়। সেখানে গল্পের কথকের পরিচয় রয়েছে। গল্পের কথক রায়বাহাদুরের বন্ধু প্রমথের ছেলে। প্রিয় বন্ধুর নাম শুনে রায়বাহাদুরের মনে পড়েছে শৈশবের দিনগুলির কথা। তারা ফরিদপুরের ঈশান স্কুলে একসঙ্গে পড়াশুনো করতো। কথকের পিতা খুব মেধাবী ও সৎ ব্যক্তি ছিল।

কথক এম. এ. পাশ করে সাধারণ কেরানিগিরির চাকুরি করার জন্য উমেদারি করতে এসেছে এই কথা জানার পর রায়বাহাদুর তাকে ব্যঙ্গ করেছে। সে পৃথিবী ভ্রমণের

পরামর্শ দিয়েছে। সেই সঙ্গে অ্যকটিভ সার্ভিস ও নেভিতে চাকুরি করারও পরামর্শ দিয়েছে। রায়বাহাদুরের দেখানো স্বপ্নগুলো সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবনে অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিলাসবহুল অট্টালিকায় বসে রায়বাহাদুর গল্পের কথককে নানারকম কালেকশন দেখিয়েছে, যদিও সে সব দেখার কোন মানসিকতা গল্পের কথকের ছিল না। তবে চাকুরির সুপারিশ প্রয়োজন তাই বিনাবাক্য ব্যয়ে কথক তাতে সম্মতি প্রদান করে।

রায়বাহাদুর আলমারি খুলে সযত্নে গচ্ছিত কতগুলি হাড় কথকের সামনে তুলে ধরল। সেই সঙ্গে সেই হাড়গুলির গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে থাকল। এই হাড়গুলির একটি বিস্তৃত পরিচয় ছিল। তার মধ্যে একটি হাড় রোডেশিয়ান প্রজাতির আদি মানবের চোয়ালের হাড়। যেটি রায়বাহাদুর পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনে ছিল। তারপর রায়বাহাদুর আর একটি হাড় বার করল যার মধ্যে যাদুবিদ্যা রয়েছে। যাদুবিদ্যার ক্ষমতাধারী হাড়ের একটি গভীর ইতিহাস রয়েছে। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় পুজো করে কুমারী মেয়েকে বলি দেওয়া হত। তারপর তাকে পুড়িয়ে প্রাপ্ত হাড়গুলো মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। সাতবছর পর মহাসমারোহে সে হাড় তুলে আনা হয় এবং সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। সেই হাড় জলের তলা থেকে যে তুলে আনতে পারে সেই হয় যাদুবিদ্যার মালিক। আসলে প্রশান্তমহাসাগরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে রায়বাহাদুর এই হাড়গুলো সংগ্রহ করেছিল। গল্পের কথক যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তা পূরণ হয়নি। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে ফিরে যায়। ফিরে যাওয়ার সময় ডাস্টবিনে দেখতে পায় একটি ছেলে হাড় চুষছে। তাহিতির যাদুবিদ্যার হাড় আর কলকাতার ডাস্টবিনের হাড়ের মধ্যে কেমন যেন সাদৃশ্য খুঁজে পায় গল্পের কথক।

আমাদের আলোচ্য গল্পে মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে উদ্ভূত কালোবাজারি ও মুনাফাখোর সম্প্রদায়ের চিত্র ও চরিত্র দুই-ই সুনিপুণ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধাতুর মানুষের আর্তরব আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে তুলেছে। ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য নিরন্ন মানুষ ডাস্টবিন থেকে খাবার সংগ্রহ করছে। ক্ষুধাতুর কুকুরও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গল্পকার সুনিপুণভাবে তার ছবি তুলে ধরেছেন—

"একটু দূরে মনোহরপুকুর পার্ক। আপাতত মনোহর নয়— বুভুক্ষুর কলোনী বসেছে সেখানে। নগরীর নির্মল স্ফটিক জলে জোয়ারের টানে ভেসে আসা একরাশ দুর্গন্ধ আবর্জনা। চীৎকার করছে, পরস্পরের মাথা থেকে উকুন বাছছে, জানোয়ারের মতো ঝুঁকে পড়ে কালো জিভ দিয়ে খাচ্ছে হাইড্রেন্টের ময়লা জল।"[২]

জীবন যন্ত্রণার এই নির্মম চিত্রের পাশাপাশি আমরা বিলাসী জীবনযাপনের ছবি পাই। রায়বাহাদুর তার অন্যতম নিদর্শন। রায়বাহাদুরের বাড়ির অন্দরমহলের রাজকীয় পরিবেশ এই বুভুক্ষু মানুষের আর্তরবের কাছে বড়োই বেমানান। গল্পের কথকের বর্ণনাতে তা স্পষ্ট—

"লোহার ফটক খুলে গেল। অ্যাসফেল্টের রাস্তায় এবার বিস্তৃত আমন্ত্রণ। উজ্জ্বল মসৃণ পথ— আমার তালি দেওয়া বিস্তৃত জুতোটার চাইতে অনেক বেশি পরিষ্কার।

সবুজ পর্দা সরিয়ে ভেতরের কার্পেটে পা দিলাম। নীল রঙের একটা স্নিগ্ধ আলোয় ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেটির ওপর পা তুলে আধশোয়া অবস্থায় এক ভদ্রলোক কি পড়েছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই উঠে বসলেন।"[৩]

রায়বাহাদুরের এই বিলাসী জীবনচিত্র সেকালের সমাজব্যবস্থার নগ্ন রূপটিকে প্রকাশিত করে। সমগ্র দেশ যখন কালের অভিশাপে বিপর্যস্ত তখন কিছু মুনাফাখোর ও মজুতদার সম্প্রদায় নিজের আখের গোছানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। অসহায় মানুষের আর্তরব তাদের কাছে বিরক্তিকর। তাই মনোহরপুকুর পার্কে ক্ষুধার্ত জনতার চিৎকার শুনে রায়বাহাদুরের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। সে বলেছে— "খেতে না পেলে চীৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই।"[৪] আসলে ক্ষুধাতুর মানুষ ছাড়া কেউ-ই ক্ষুধার যন্ত্রণা বুঝতে পারে না। তাই রায়বাহাদুরের কাছে তাদের যন্ত্রণা অনুভব করা অসম্ভব। রায়বাহাদুর নিজের আত্মপ্রচারে মগ্ন। প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে বহুব্যয়ে সংগ্রহ করা হাড় দেখানোর জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে হাড়গুলোর গুরুত্বও বর্ণনা করেছে। আরাম কেদারায় বসে গল্পের কথক ও রায়বাহাদুর মশায় যখন চা খাওয়ায় নিমগ্ন তখনও আর্ত-মানুষের কলরব ভেসে আসছে। লেখক আর্ত-মানুষের কলরব ও বিলাসী মানুষের যাপনচিত্রকে সমান্তরালভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"দূরে আবার সেই বুভুক্ষুদের চীৎকার। ডাস্টবিন উল্টে ফেলে দিয়ে যেমন করে সচীৎকারে ঝগড়া করে কুকুরের দল। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি ওরা গোগ্রাসে গিলছে, খিচুড়ির ড্যালা গলায় আটকে চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে, অথচ আরো পাওয়ার জন্যে অবরুদ্ধ সুরে আর্তনাদ করছে। আর আমরা এখানে চা খাচ্ছি কত মার্জিত, কত সংযত আর ভদ্রভাবে। মুখটা সিকি ইঞ্চি ফাঁক করে দাঁতের কোণে কেক কাটছি— উদ্দেশ্যটা যেন খাওয়া নয়, ঘাসের শীষ চিবানোর মতো দাঁতের একটুখানি বিলাসিতা মাত্র।"[৫]

রায়বাহাদুরের মতো মানুষগুলি কালোবাজারি মুনাফাখোর ও মজুতদার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ক্ষুধাতুর মানুষের চিৎকার ও বিলাসী যাপনচিত্রের পাশাপাশি আমরা এই গল্পে মধ্যবিত্ত সমাজের যন্ত্রণার ছবিটিও খুঁজে পাই। গল্পের কথক স্বয়ং মধ্যবৃত্ত সমাজের প্রতিনিধি। এম. এ. পাশ করার পর কোন কাজ সে জোগাড় করতে পারেনি। তাই সামান্য কেরানিগিরির চাকুরির জন্য তার বাবার বন্ধুর কাছে সে উপস্থিত হয়েছে। বেকারত্বের যন্ত্রণার কাছে সামান্য কেরানিগিরির চাকুরিটি যে কত মূল্যবান তা সে রায়বাহাদুরকে বোঝাতে পারেনি। টিউশনি পড়িয়ে মাত্র পঁচিশ টাকা সে হাতে পায়, যা দিয়ে তার দিন যাপন অসম্ভব। বুভুক্ষু মানুষেরা ডাস্টবিনের খাবার সংগ্রহ করে পেট ভরিয়েছে। কিন্তু এই মধ্যবিত্তের যন্ত্রণা তার থেকেও বেশি। হয়ত তাদেরও ক্ষুধার যন্ত্রণা রয়েছে কিন্তু তা লোকচক্ষুর অন্তরালে। যে রায়বাহাদুরের সামান্য কলমের আঁচড়ে তার চাকুরিটি হয়ে যেতে পারতো সেই রায়বাহাদুর তাকে অ্যাডভেঞ্চারের অলীক স্বপ্ন দেখিয়েছে। যা মধ্যবিত্তের জীবনে অলীক কল্পনা। রায়বাহাদুরের মতো মানুষেরা অনায়াসে সিঙ্গাপুর, হাওয়াই,

ম্যানিলা, তাহিতি, ফিলিপাইন, জাপানে ঘুরে আসতে পারে; তাদের কাছে মনে হতেই পারে- 'পৃথিবীটাকে চোখ মেলে না দেখলে বাঁচবার অর্থই নেই কোনো।'[৬] ভারতবর্ষের করুণ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এই পৃথিবী ভ্রমণ শুধু বিলাসিতা নয় এক অমানবিক নির্মমতার লক্ষণ। আমাদের মনে হয় দেখার চোখ থাকলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে সৌন্দর্য আহরণের প্রয়োজন নেই। আমরা দু-পা ফেলে ঘাসের শিশিরের অপার সৌন্দর্যও উপভোগ করতে পারি। তাই সৌন্দর্য অন্তরের উপলব্ধি। রায়বাহাদুরের মতো মানুষের কাছে অর্থ ছাড়া সবই অন্তঃসারশূন্য। অপরদিকে ক্ষুধাতুর মানুষ ও বেকারত্বের যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন সমাজের কাছে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার সময় নেই। মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সহ জীবনের উপাদেয় সামগ্রীগুলি যখন অপূর্ণ থাকে তখন তারা সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের কাছে বাঁশীও সঙ্গীত হারা হয়ে যায়। তাই যে প্রেক্ষাপটে গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে সেখানে সৌন্দর্যের সন্ধান করা অবান্তর ও অকল্পনীয়।

আবার এই গল্পে পৃথিবীব্যাপী ঘটে চলা জঘন্য কুসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। মিথ্যা যাদুবিদ্যার বশবর্তী হয়ে কত শত কুমারী মেয়েকে বলি হতে হয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। এখানেও ঘটেছে সেই দুর্বলের উপর নির্মম অত্যাচার। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় যে সব মেয়েদের বলি দিয়ে যাদুবিদ্যার হাড় তৈরি করা হয় তা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের হতেই পারে না তারা সবাই নিম্নবিত্ত হত দরিদ্র বাড়িরই মেয়ে। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস ১ম পর্ব' বইতে লক্ষ করেছি আমাদের সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষেরা নিম্নবর্গীয় দরিদ্র মানুষের সন্তানদের তেলে ফুটিয়ে এক মহাযৌধ তৈরি করত। সেখানেও কত শত মায়ের কোল শূন্য হয়ে যেত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পেও মুনাফাখোর ও মুজতদার সম্প্রদায়ের পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কালোবাজারির উজ্জ্বল নিদর্শন এই গল্পে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করালগ্রাস থেকে যুগসমাজের নিস্তার নেই। গল্পের কাহিনিতে দেখা যায় দেবীদাস একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। শুধু ব্যবসায়ী বললে ভুল হবে সে একজন আড়তদার। লেখক তার সুন্দর বর্ণনা করেছেন—

"ছোট গাঁয়ের ছোট বন্দরে বড় ব্যবসায়ী দেবীদাস। কাপড়ের আড়তদার সে— খুচরো পাইকারী সবই চলে। আশপাশের আট-দশখানা হাট তারই কৃপার ওপর নির্ভর করে থাকে; কিন্তু এবার সে অনুগ্রহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করতে হয়েছে দেবীদাসকে।"[৭]

এই দেবীদাসের কাছে একজন দরিদ্র মানুষ একজোড়া কাপড় চাইতে গেছে কিন্তু দেবীদাস তাকে কাপড় না দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। আসলে এই ব্ল্যাকআউটের মার্কেটে সকলে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে তৎপর। আসলে দেবীদাস ভালোভাবেই জানে এই সব গরীব মানুষদেরকে কাপড় বিক্রি করলে বাড়তি পয়সা পাওয়া যাবে না। অপরদিকে একজনকে দিলে আরও অনেক মানুষ দলবেঁধে তাদের দোকানে উপস্থিত হবে তাই হিসেব কষে দেবীদাস সেই মানুষটিকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। দেবীদাসের ভাইপো গৌরদাস প্রসন্নচিত্তের। গল্পের কাহিনি এগিয়ে চলেছে। গৌরদাস খবরের কাগজের

বিজ্ঞাপন পড়তে ব্যস্ত। এমন সময় থানার এল. সি. কানাই দে ঘরে প্রবেশ করে। থানায় যাত্রাপালার আয়োজন করা হয়েছে তার জন্য দারোগা দেবীদাসকে ৫০ টাকা চাঁদা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ৫০ টাকা নিয়ে কানাই দে চলে গেল। আলোক সজ্জিত মঞ্চে যথারীতি যাত্রাপালা শুরু হয়ে গেল। অপরদিকে মুচি পাড়ার একটি মেয়ের কান্নার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে কারণ পরশু দিন গভীর রাতে তাদের ছেলেকে শেয়াল চুরি করে নিয়ে গিয়ে, বাড়ির তিরিশ হাত দূরে খেয়েছে। সামান্য আলোর অভাবে সে ছেলেটিকে বাঁচাতে পারেনি। একদিকে আলোর রোশনাই অন্যদিকে অন্ধকার জীবনের যেন দুই প্রান্ত।

আসলে এই যুদ্ধের পরিস্থিতিতে মজুতদার ও মুনাফাখোরদের সাথে পুলিশের যেন গোপন সমঝোতা রয়েছে। পুলিশ-প্রশাসন মিলেমিশে এই কালো বাজারির পরিস্থিতিকে আরও জোরালো করে তুলেছে। তাই এই পরিস্থিতিতেও দারোগা শচীকান্তের মতো মানুষেরা আদ্দির পাঞ্জাবি পরতে পেরেছে। গল্পে তার উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে—

"শচীকান্তের আদ্দির পাঞ্জাবিটা হাওয়ায় উড়ছে। যুদ্ধের বাজারে অমন চমৎকার আদ্দি কোথায় পাওয়া গেল— সে রহস্য দেবীদাস জানে। একটি প্রফিটিয়ারিংয়ের মামলায় জাল কেটে বেরুতে একখানি আদ্দি খরচ করতে হয়েছে।"[৮]

যাত্রাপালা যথারীতি চলছে। যাত্রাপালার নাম 'দুঃশাসনের রক্তপান।' মহাভারতের কাহিনিতে দেখা যায় পাশা খেলায় হেরে যাওয়ার পর দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিল। তখন দ্রৌপদী প্রকাশ্য রাজসভায় প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে দুঃশাসনের রক্তদ্বারা কেশগুচ্ছকে রঞ্জিত করবে। যতদিন পর্যন্ত সেই রক্তের দ্বারা তার কেশরঞ্জিত না হচ্ছে ততদিন সেই কেশ খোলাই থাকবে। আর তা যদি না হয় তবে সতীর অভিশাপে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ভস্মীভূত হয়ে যাবে। মহাভারতের দ্রৌপদী শেষ পর্যন্ত দুঃশাসনের রক্তদ্বারা তার কেশ কে রঞ্জিত করেছিল। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কতশত দ্রৌপদীর আর্তনাদ উঠে চলেছে। তবে তাদের অভিশাপের কি কোন প্রভাব সমাজে পড়বে সেই প্রশ্ন গল্পে রয়েছে। "গৌরদাসের মনে হতে লাগল— সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে। কিন্তু তার অভিশাপে কি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ভস্ম হয়ে যেতে পারে? কে বলবে।"[৯]

যাত্রানুষ্ঠানের কাহিনি শেষের দিকে। ভীমসেনের গদার আঘাতে দুঃশাসন ভূপতিত হয়েছে। ভীমসেন দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করেছে। সেই সঙ্গে তার রক্তাক্ত হাত দিয়ে দ্রৌপদীর কেশগুচ্ছকে বেঁধে দিয়েছে। যাত্রাপালা শেষ হওয়ার পর দেবীদাস মুচিপাড়াতে গিয়েছে। সেখানে তার চোখে পড়েছে উলঙ্গ ষোড়শী মেয়ের জল নিয়ে আসার দৃশ্য। তবে মানুষের গলা শুনে সে লুকিয়ে পড়েছে। সমাজের দুঃশাসনদের জন্য এই ষোড়শী মেয়েটি আজ বিপন্ন। গল্পের শুরুতেই আমরা লক্ষ করেছি দেবীদাস একজন মানুষকে কাপড় দিতে চায়নি, অপরদিকে দারোগাবাবুর গায়ে দামি কাপড়। আসলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এরাই দুঃশাসন স্বরূপ। তাই তো শচীকান্ত দারোগার পাঞ্জাবির পানের পিককে রক্ত বলে মনে হয়েছে। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিল

তখন তার প্রভাব ভারতবর্ষে পড়েছিল। জিনিসপত্রের কালোবাজারির জন্য সবকিছুরই দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সাইরেনের শব্দে মানুষের ঘুম ভাঙতো। এই পরিস্থিতিতে দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ। তাই বেঁচে থাকাটাই যেখানে একটি সংগ্রাম, সেই পরিস্থিতিতে লজ্জা নিবারণের কাপড় সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব। আসলে সমাজের দুঃশাসন রূপী মানুষেরা এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তাই সামান্য আলোর অভাবে একজন মা তার সন্তানকে বাঁচাতে পারেনি। অপরদিকে ষোড়শী মেয়েও নগ্ন। সমাজের দুঃশাসনরা কি শাস্তি পাবে না গল্পকার গৌরদাসের মধ্যদিয়ে এই প্রশ্ন রেখেছেন-

"যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত হবে একদিন ? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ?"[১০]

গল্পকারের এ দাবী যথার্থ। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের গণজাগরণ ঘটবে। সমাজের দুঃশাসনদের বধ করার জন্য একদল মানুষ হেঁসোতে শান দিচ্ছে। গৌরদাসের মনে হয়েছে— "অমন ঝকঝকে করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা ?"[১১] তাই বলতেই হয় পৃথিবীর দুঃশাসনদের শাস্তি অনিবার্য।

শেষে বলতেই হয় হতাশা-নিরাশার মধ্যেও আমরা আশাবাদী। একদিন এই দুর্যোগের কালোমেঘ কেটে, আকাশের রঙ আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠবে। 'ম্যাগ্নোলিয়ার' গন্ধ জড়িত মধুর বাতাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। যাদুবিদ্যার হাড় মানুষ পেয়েছে মন্ত্রশক্তিও নিশ্চয়ই পাবে। পৃথিবী তখন শান্ত হবে।

তথ্যসূত্র :

১। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ. ৩১।
২। তদেব, পৃ. ৩০। ৩। তদেব, পৃ. ৩১। ৪। তদেব, পৃ. ৩৪।
৫। তদেব, পৃ. ৩৪। ৬। তদেব, পৃ. ৩২। ৭। তদেব, পৃ. ৫২।
৮। তদেব, পৃ. ৫৫। ৯। তদেব, পৃ. ৫৭। ১০। তদেব, পৃ. ৫৮।
১১। তদেব, পৃ. ৫৮।

ক. আকর গ্রন্থ:

১। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩, সপ্তদশ মুদ্রণ: শ্রাবণ ১৪২০।

২। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার – কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ২০১১।

বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম সাহিত্যিক : উপস্থিতি ও অবদান

মোজাফ্‌ফর রহমান

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিমদের দ্বারা রচিত কোন সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য রচনায় মুসলমান লেখকদের আবির্ভাব হয়নি'।[১] এই সময় মুসলমান লেখক না পাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন

১. মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব না হওয়া

২. ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া[২]

ব্রিটিশ আমলে মুসলমানরা ইংরেজদের বিধর্মী মনে করতেন। তাই তাঁরা ইংরেজদের ভাষাকে 'কুফুরি জবান' বলে ত্যাগ করেছিলেন। তবে সেই সময় গুটিকয়েক ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাঁরা বাংলা ভাষার প্রতি চরম অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। ফলে কথাসাহিত্যের বিকাশ বিলম্বিত হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমানদের দ্বারা ভালো বাংলা সাহিত্য রচিত না হওয়ার আরও কিছু কারণ ছিল। উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হল—

১) বলিষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকার অভাব,

২) ইংরেজি ও বাংলা ভাষা চর্চার সংকট,

৩) আরবি উর্দু ফারসি ভাষা শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ,

৪) বিদ্যালয় ও পাঠ্যপুস্তকের অভাব,

৫) ধর্মচর্চার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ,

৬) ওয়াহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলনের কুপ্রভাবের ফলে পাশ্চাত্য ভাষা চর্চার প্রতি মানুষের বিরূপ মনোভাব,

৭) ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন ‘‘আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুদের হাতে গড়ে ওঠায় হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। মুসলমান সমাজপতিদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না’’।[৩]

১৮২৫ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান রচিত কোন উপন্যাস ও ছোটগল্পের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু মুসলমানদের গদ্য ভাষায় সাহিত্যচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে আরবি, ফারসি ও উর্দুর জন্য যেসব মৌলবি

নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে বাংলা ভাষার কোন সম্পর্ক ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যের বিকাশে সাময়িক পত্রিকার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মুসলমানদের দ্বারা প্রথম সাময়িক পত্রিকার বিকাশ ঘটে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মার্চে আলিমুল্লাহের 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এটি মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালেই মীর মশাররফ হোসেন মুসলমান সমাজে বিশেষ চেতনা সঞ্চার করেন। মূলত মশাররফের সময় থেকেই বাঙালি মুসলমান কর্তৃক আধুনিক বাংলা সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ঘটে।[৪] পূর্বে বলা হয়েছে মীর মশাররফের প্রথম গদ্য পুস্তক 'রত্নবতী' বাঙালি মুসলমান রচিত প্রথম উপন্যাস। এটি ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-র পূর্বে যাঁদের রচনায় উপন্যাসের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে কোন মুসলমানের নাম উল্লেখ করা হয় না, অথচ বঙ্কিমচন্দ্র ও মীর মশাররফের আগেও কয়েকজন মুসলিম সাহিত্যিক উপন্যাস রচনার প্রয়াস নিয়েছিলেন। আমরা এখানে তাঁদের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করলাম না। মীর মশাররফের সমকালীন মুসলিম কথাসাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১. তৎকালীন উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাস্তব চিত্রায়ণ,
২. হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক,
৩. বহু উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রাধান্য,
৪. ইতিহাস ও পুরাতন ঐতিহ্যের অনুসরণ,
৫. রক্ষনশীলতা ও প্রগতিশীলতার প্রখর দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সমকালে মুসলিম ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রধান হলেন মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, মোজাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী এমদাদুল হক, শেখ ফজলুল করিম, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, শাহাদাৎ হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আকরাম উদ্দিন, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, আখতার মহল সৈয়দা খাতুন, আবুল ফজল, সৈয়দ মুজতবা আলী, হুমায়ুন কবির প্রমুখ। মীর মশাররফ হোসেনের পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাটি এঁদের মাধ্যমেই বিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে।

রোকেয়া মাত্র একটি মৌলিক উপন্যাস 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) রচনা করে সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ব্যতিক্রমী সৃষ্টি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 'পদ্মরাগ' রোকেয়ার মানসচিত্রের দর্পণ। লেখিকা 'অবরোধবাসিনী'-তে যা বলতে পারেননি, তার শিল্প সার্থক চিত্রময় বণীরূপ হল 'পদ্মরাগ'। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে মুসলিম সমাজের নানা সমস্যা ও সমাধানের ছবি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

রোকেয়ার সমকালীন বঙ্কিম অনুসারী ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। এই সময়কার লেখক শেখ ফজলুল করিমের পরিচ্ছন্ন আবেগময়, গাম্ভীর্যপূর্ণ, সৌষ্ঠব কাব্যময় ভাষাশৈলী বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। নুরুল হক চৌধুরী ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির বীজ বপনের

চেষ্টা করেছিলেন। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত পন্ডিতপোল গ্রামের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী শাহাদাৎ হোসেনের রচনায় মুসলিম সমাজ, নারী সমস্যা, সমাজ বাস্তবতা, শিক্ষা সংস্কৃতির সংকট ও জীবন যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে।

এই সময় অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, নুরুন্নেসা খাতুন, আখতার মহল সৈয়দা খাতুন, সীতাদেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, শান্তা দেবী প্রমুখ কথাসাহিত্যিকা সাহিত্যাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এ বঙ্গের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবীদের নিয়ে আলোচনা হলেও নুরুন্নেসা, আখতার মহলদের নিয়ে আলোচনা চোখে পড়ে না। অথচ বাংলা সাহিত্যে এঁদের অবদান কম নয়। মুসলিম লেখিকাদের মধ্যে প্রথম ঔপন্যাসিক নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী। অথচ এবঙ্গের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর উল্লখমাত্র নেই। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘স্বপ্নদৃষ্টা’ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৬ ব.) হুগলির শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। নূরুন্নেসা খাতুনের সময়কালে মুসলমান সমাজে কঠোর অবরোধ-পর্দাপ্রথা চালু ছিল। মেয়েদের জন্য কোন স্কুল ছিল না। তিনি মুসলিম মেয়েদের কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ‘জানুকিবাঈ’ (১৯২৪), ‘ভাগ্যচক্র’ (১৯২৯), ‘বিধিলিপি’ (১৯২৮), ‘নিয়তি’ (১৯২৯) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ‘শুভা’ এবং কাজী ইমদাদুল হকের ‘আব্দুল্লাহ’ উপন্যাস দুটি একই বছর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। নরেশচন্দ্রের ‘শুভা’ উপন্যাসের নায়িকা সুভা ব্যক্তিত্বময়ী আধুনিক রমনী। অন্যদিকে ‘মুসলিম ভারত’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘আব্দুল্লাহ’ উপন্যাসটি মুসলিম সমাজের বাস্তবচিত্র সমন্বিত আধুনিক উপন্যাস। এ বিষয়ে আমিনুল ইসলাম বলেছেন ‘সম্প্রদায় নির্বিশেষে চরিত্রের প্রতি এমন সম্মান প্রদান বাংলা সাহিত্যে বিরল বলা যায়’’।[৫] ‘আব্দুল্লাহ’ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ‘আব্দুল্লাহ’ পড়ে কাজী আবদুল ওদুদকে লিখেছিলেন

‘‘আব্দুল্লাহ বই পড়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। বিশেষ কারণ এই বই থেকে মুসলমানদের ঘরের কথা জানা গেল’’।[৬]

শরৎচন্দ্রের সময়কার একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হলেন কাজী আব্দুল ওদুদ। আব্দুল ওদুদ ছিলেন একজন স্বনামধন্য শক্তিমান লেখক এবং মুসলিম সমাজে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি। আমিনুল ইসলাম আব্দুল ওদুদকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৭] ওদুদ সাহেবের সামাজিক উপন্যাস ‘নদীবক্ষ’-কে (১৯১৯) রবীন্দ্রনাথ বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন।[৮] রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সমকালেই ‘নদীবক্ষ’ উপন্যাসটি সাহিত্য গগনে তুমুল ঝড় তুলেছিল। ‘নদীবক্ষ’ গ্রামীণ সমাজের জীবন আলেখ্য। ওদুদ সাহেবের ‘আজাদ’ (১৯২৮) উপন্যাসটি মুসলিম সমাজের দর্পণ বিশেষ।

এই সময় কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র তিনটি উপন্যাস, যথাক্রমে ‘বাঁধনহারা’ (১৯২৭), ‘মৃত্যুক্ষুধা’ (১৯৩০), ‘কুহেলিকা’ (১৯৩১) রচনা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়

দিয়েছেন। তিনি উপন্যাসে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে ধর্ম অপেক্ষা জীবনকে বড় করে দেখিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তথা মুসলিম সমাজের অন্যতম আধুনিক কবি ও লেখক হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতা ও গানের ক্ষেত্রেও তিনি জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে নূতনের বিজয় কেতন উড়িয়ে ছিলেন। ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়।

নজরুলের সমসাময়িক কালে কয়েকজন মুসলিম কথাসাহিত্যিক ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবরাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), মাহবুব উল আলম (১৮৯৮-১৯৭৮), মতিন উদদীন আহমদ (১৯০০-১৯৮০) প্রমুখ। এঁদের রচনা দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এঁরা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের লেখক হিসাবে সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করলেও এঁদের প্রাথমিক পরিচিতি অবিভক্ত বঙ্গেই গড়ে উঠেছিল।

চল্লিশের দশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দেশভাগ ও দেশত্যাগ। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ আগস্ট ভারত অত্যাচারি ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা পেল বটে, কিন্তু দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিল। এই সময় বহু মানুষ ভারত ছেড়ে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলিম বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিকের একটা বড় অংশ তখন পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। তাঁরা আর দেশ বদল করেননি। পূর্ববঙ্গ তখন স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ‘পূর্ববঙ্গ’ পাকিস্তানের পূর্ব অংশ বলে এই অঞ্চল পূর্বপাকিস্তান নামেও পরিচিত। যেসব সাহিত্যিক পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই সাহিত্যের ভীত অবিভক্ত বঙ্গেই উঠেছিল। তাঁদের কিছু কাব্য, উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, প্রবন্ধ, শিশুতোষ এ বঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে যাওয়ার পরেও তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি অব্যহত ছিল। আমরা এখানে তাঁদের উভয়বঙ্গের কথাসাহিত্যিক বলতে পারি। এই রকম কয়েকজন কথাসাহিত্যিক হলেন মতিন উদ্দিন আহমদ, আবুল ফজল, সৈয়দ মুজতবা আলী, জসীম উদদীন, গোলাম কাসেম, নাজিরুল ইসলাম, মোঃ সুফিয়ানা, মোহম্মদ কাসেম, মহি উদ্দীন চৌধুরী, বন্দে আলী, শওকত ওসমান প্রমুখ।

স্বাধীনতা-উত্তর সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে গোলাম কুদ্দুসের দারুন খ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও সংগঠক। স্বাধীনতা পরবর্তী একজন শক্তিমান লেখিকা হলেন মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)। তিনি নিজেই একটি যুগ। মহাশ্বেতা দেবীর সময়কালে লিখেছেন অসীম রায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, আব্দুল আজিজ আল আমান, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, আব্দুল জব্বার, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অমলেন্দু চক্রবর্তী, শচীন দাশ, আবু আতাহার, সোহরাব হোসেন, আফসার আমেদ, আব্দুর রাকিব প্রমুখ।

স্বাধীনতা পরবর্তী মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অধুনা আমডাঙা থানার (বর্তমান অশোকনগর থানার) অন্তর্গত সোলেমানপুর গ্রামের কথাকার, কবি, প্রাবন্ধিক, পত্রিকা সম্পাদক, পুস্তক প্রকাশক আবদুল আযীয আল

আমান। তিনি বহু সংগ্রাম করে পেশায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কলকাতায় হরফ প্রকাশনীর (১৯৬৫) প্রতিষ্ঠাতা ও এক সময়কার 'জাগরণ' পত্রিকার সম্পাদক আবদুল আযীয আল আমান সম্পর্কে আমিনুল ইসলাম লিখেছেন

"দেশভাগের প্রাথমিক আঘাতের ঘোর কাটিয়ে যুগপৎ সাহিত্য চর্চা এবং প্রকাশনার জগতে প্রথম যে মুসলিম স্বপ্নচারী ফিনিক্স পাখিটি সংস্কৃতির আকাশে অন্য শাব্দিক শিহরণে রুচিশীল ডানা মেললেন-তিনি আবদুল আযীয আল আমান"।[৯]

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বজবজ থানার সাতগাছিয়া থেকে উঠে আসা মাটির কাছাকাছির সাহিত্যিক, বাঙালি জীবনের কথাকার আব্দুল জব্বার (১৯৩৪-২০০৯) প্রায় পঞ্চাশের অধিক গ্রন্থের লেখক। কবি আবু আতাহার (১৯৪৫-২০০০) ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনাতে বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার স্বনামধন্য লেখক আব্দুর রব খান (১৯৪৯- -) সাহিত্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি কবিতা দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য ও সম্পাদনা কর্মেও সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদের আর এক লেখক আবুল বাশার (১৯৫১- -) বিশেষ সমাজ সচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে গ্রাম বাংলার প্রান্তিক মানুষের জীবন, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ধর্মীয় আচার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি বহু চর্চিত বিষয়গুলি বারবার উঠে এসেছে।

'সোমেনচন্দ পুরস্কার' প্রাপ্ত হাওড়ার বাগনানের আফসার আহমেদ (১৯৫০-২০১৮) বিশের অধিক উপন্যাস লিখেছেন। 'সানু আলির নিজের জমি' (১৯৮৯) উপন্যাসের ভাষারীতি সকলকে আকৃষ্ট করে। 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা' (১৯৯৬), 'মেটিয়াবুরুজের কিসসা' (২০০৩) বিশ্বের যেকোন মুসলিম সমাজের কাহিনি হতে পারে। তিনি মুসলিম সমাজের সমস্যাগুলি শিল্পীর তুলিতে ছবির মত অঙ্কন করেছেন। তাঁর উপন্যাসে বহুবিবাহ, তালাকপ্রথা, পুরুষতন্ত্র, নারী সমস্যা, ধর্মীয় ভাবাবেগ নতুন মাত্রায় উঠে এসেছে।

মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে শাহযাদ ফিরদাউস এক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'ব্যাস' (১৯৯৫) ও 'মৃত্যুর জন্ম এবং মৃত্যু' (১৯৯৯) উপন্যাসে হিন্দু পুরাণের অনুসৃতি ঘটেছে। প্রথম উপন্যাসের 'ব্যাস'-এর নায়ক ব্যাসের মাধ্যমে তিনি বলেছেন 'মানুষকে সবাই পরিত্যাগ করতে পারে কিন্তু মানুষ কাউকে পরিত্যাগ করতে পারে না"।

মুর্শিদাবাদ জেলার বসন্তপুর গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান প্রাক্তন আইপিএস নজরুল ইসলাম (১৯৫০- -) একাধারে প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত 'বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক' ব্যাপক সাড়া ফেলা একটি গ্রন্থ। তিনি পনেরোর অধিক উপন্যাস লিখেছেন এবং এখনও সৃষ্টিশীল আছেন। আব্দুস শুকুর খান(১৯৫৪- -) পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর গ্রামের বিখ্যাত লেখক। তাঁর 'শিকড়ের ঘ্রাণ' (২০০০) বাঙালি মুসলমান পরিবারের জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার সাহবাড়িয়া গ্রামের মাটির মানুষ,

কবি, প্রাবন্ধিক কথাসাহিত্যিক সোহরাব হোসেন বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট নাম। এখন চারিদিকে কেবল সুবিধাবাদ, ভোগবাদ, বিলাসিতা, পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি, আস্তিক-নাস্তিক ভাগ, প্রেমের ছলাকলা, নর-নারীর স্বপ্নের বিফলতা প্রভৃতি মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। লেখক সোহরাব হোসেন 'ছায়ামানুষ' উপন্যাসে তারই বাস্তব রূপ দিয়েছেন। এছাড়াও 'মহরণ' (২০০৩), 'সরম আলীর ভুবন' (২০০৪), 'মাঠ জাদু জানে' (২০০৪), 'সওকাত আলির প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি' (২০০৯) তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার অসাধারণ নিদর্শন।

বর্তমান সৃজনশীল কয়েকজন অলোকসামান্য প্রতিভাধর মুসলমান কথাসাহিত্যিক হলেন—কামাল হোসেন : 'পরম বিশ্বাসের গন্ধ' (১৯৯০), 'শিকড়ের প্রবাহ' (২০০৪), 'স্বতন্ত্র বারান্দা' (২০০৫), 'স্বভূমি', 'দায়ভার' ইত্যাদি।

মোসারফ হোসেন : 'জন্মভূমিশ্চ' (২০১২), 'কাঁচপোকার টিপ' (২০১২), 'পরিবর্তন' (২০১২), 'মুখোমুখি' (২০১৩) ইত্যাদি।

মুসা আলী : 'সোনালী মন', 'মুখোশের আড়ালে', 'ধনঞ্জয়ের ফাঁসি', 'অচেনা আকাশ' (২০১২), 'মানসকন্যা' (২০১৩) ইত্যাদি।

গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম : 'আশ্রমকন্যা', 'মাটির মানুষ', 'নিষিদ্ধ পল্লী', 'রাঙ্গামাটির পথ', 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' ইত্যাদি।

মুহম্মদ জালাল উদ্দিন বিশ্বাস : 'মোল্লা নাসিরুদ্দিন' (২০০৩), 'যমুনার ধারা বহে' (২০০৪), 'শেখ চিল্লি' (২০১২) ইত্যাদি।

নুরুল আমিন বিশ্বাস : 'অসময়ের যাপননামা', 'দিনবদলের গান' ইত্যাদি।

শামিম আহমেদ : 'সাত-আসমান' (২০১২), বিষাদ বিন্দু' (২০১৩) ইত্যাদি।

আব্দুর রাকিব : 'কবিতার ফেরিওয়ালা', 'বাঁশলোইয়ের বান' ইত্যাদি।

আব্দুল্লাহ রসুল : 'আবাদ' (১৩৭৬ ব.), 'শহর থেকে গ্রামে' ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র :

১. দ্রষ্টব্য, বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সি, প্রা. লি., কলকাতা, পুনর্মূদ্রণ ২০০২-২০০৩, পৃষ্ঠা ৩১৪।
২. দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৪।
৩. দ্রষ্টব্য, আহমদ, পৃষ্ঠা ২১০।
৪. দ্রষ্টব্য, আহমদ, পৃষ্ঠা ২০৮।
৫. দ্রষ্টব্য, ইসলাম-ক, আমিনুল, 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঔপন্যাসিক ১৮৬৯-২০১৩', পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৯১।
৬. দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃষ্ঠা ৯১।
৭. দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃষ্ঠা ১০৭।
৮. দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃষ্ঠা ১১১।
৯. দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃষ্ঠা ৯৭।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিরিখে চন্দ্রাবতী : কিছু প্রশ্ন কিছু বিস্ময়

বিদিশা চক্রবর্তী

ভূমিকা :

'নদী ও পাহাড় এসে মিশেছে শরীরে/ কিন্তু বান কোন পথে নামে সে জানে না/ কোন পথে ধ্বস!'[১] মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবির স্বীয় প্রজ্ঞার সঙ্গে মিশেল ছিল প্রেমিকা সত্ত্বা। চন্দ্রাবতী চরিত্রে কবি সত্ত্বার পাশাপাশি নারী চন্দ্রাবতীকে তরঙ্গায়িত করেছিল রূপ-যৌবনের তীব্র স্রোত। বান ডেকে সৃষ্টি করেছিল নিখুঁত এক প্রেমিকা চরিত্র। প্রথম মহিলা কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগে আত্মপ্রকাশ করেছিল ব্যক্তি চন্দ্রাবতী তার সার্থক প্রেমের আধারে। কিন্তু প্রেমের তীব্রতর বন্যার সঙ্গে ধ্বসকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি চন্দ্রাবতী। সার্থক প্রেমিকার ব্যর্থ প্রেম তাই মধ্যযুগের নিদর্শন হয়ে উঠল। ব্যর্থ প্রেমের অভিঘাত থেকে সৃষ্টি হল কাব্য। কবি চন্দ্রাবতী হয়ে উঠলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন ব্যতিক্রমী নারী। তিনি দ্বিজ বংশীদাস ভট্টাচার্যের কন্যা। পিতার আনুকূল্যে দুলালী কন্যা সংস্কৃত সহ বহু শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠে। এমনকি এই পিতা ও কন্যার মিলিত প্রয়াসেই পদ্মাপুরাণ রচিত হয়। কিন্তু এই পরিচয় ছাড়াও লেখিকার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায় তাঁর রচিত পালাগুলি এবং তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত পালা থেকে। যে সময়কালে চন্দ্রাবতী কবি হয়ে উঠে ছিল সেই সময় মধ্যযুগে একদিকে ধর্মনির্ভর বাংলা সাহিত্য বিস্তার লাভ করছে অন্যদিকে সৃষ্টি হচ্ছে মানব-মানবীর রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান 'মৈমনসিংহ গীতিকা'। নির্মিত হচ্ছে প্রেমের তাজমহল। মধ্যযুগের দৈবনির্ভর বাংলা সাহিত্যে শুধু চরিত্রের আধিক্যই বেশি ছিল না, পুরুষ চরিত্রের ভিড়ে নারী চরিত্রগুলি ছিল ক্লিশে। কাব্যের প্রয়োজনে, পুরুষের মনোরঞ্জনে প্রেম অথবা যৌনতার প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে নারী চরিত্রগুলি। পুরুষের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেছে তাদের। তুলনায় রাধা চরিত্র ব্যতিক্রম। সে সাহসী হয়েছে, পরকীয়া করেছে, প্রেমের টানে স্বামী-সংসার-সমাজকে ভাসিয়েছে, তবুও কাব্যের শেষে সে পরিত্যক্তা হয়েছে, প্রতিবাদী হয়নি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটিও 'রাধাকীর্তন' হয়ে ওঠেনি বড়ু চণ্ডীদাসের কলমে। পুরুষের কলম সেদিন নারীবাদে বিশ্বাসী ছিল না। মধ্যযুগের সামাজিক কাঠামোও এর স্বীকৃতি দেয়নি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পড়লে দেখা যায় 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' এ বলা হয়েছে, যে নারী পুত্রের

জন্ম দেয় সেই শ্রেষ্ঠা। কন্যার জন্ম যে নারী দেয় তাকে বারো বছর পর ত্যাগ করা যায়। মহাভারতেও স্পষ্টতই বলা আছে পূর্ব জন্মের পাপের ফলে নারী হয়ে জন্মাতে হয়। এমনকি এক নারীর আত্মত্যাগে সন্তুষ্ট হয়ে গৌতম বুদ্ধ আশীর্বাদ করেছিলেন এই বলে যে, তাকে যেন পরজন্মে নারী হয়ে জন্মাতে না হয়। এখানেও লক্ষণীয় সেই মহান পুরুষ কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ আশীর্বাদ। আজকের একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যখন নারী নির্যাতন, কন্যা হত্যা বা তালাক থেকে শুরু করে নারীর সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে আসে তখন মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র কবিরা নারীকে মুখ্য করে কাব্য রচনা করছেন, নারীকে পুরুষের আগে প্রাধান্য দিচ্ছেন নারীকে মর্যাদা দিচ্ছেন। আত্মমর্যাদা বোধে উজ্বল প্রতিবাদী নারী চরিত্র সৃষ্টি করছেন। চন্দ্রাবতী চরিত্র কিন্তু কবি কল্পনার বুনন নয়, রক্ত-মাংসে গড়া একজন মানুষ যার নিজের জীবনই কাব্য তথা জীবনের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছে।

সমগ্র 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় কবি চন্দ্রাবতীর আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়, তার সৃষ্ট 'মলুয়া' বা 'দস্যু কেনারাম পালার' পাশাপাশি 'দেওয়ান ভাবনা' বা স্ব-নামাঙ্কিত 'চন্দ্রাবতী' পালাটির কারনে। প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত মোট নয়টি পালার মধ্যে চন্দ্রাবতী একাই তিনটি পালার নিয়ন্ত্রক। ১৯১৩ সালে মৈমনসিংহ জেলা থেকে কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রাচীন মহিলা কবি চন্দ্রাবতী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, লেখক ছিলেন চন্দ্রকুমার দে। প্রবন্ধটি পড়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এতটাই চমৎকৃত হয়েছিলেন যে, তিনি লিখলেন— 'গ্রন্থাকার চন্দ্রাবতীর কাহিনীর মর্মাংশটি মাত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু যেটুকু দিয়াছিলেন, তাহা একেবারে চৈত-বৈশাখী বাগানের ফুলের গন্ধে ভরপুর; সেদিন কেনারামের উপাখ্যানের সারাংশের ওপর আমার অনেক চোখের জল পড়িয়াছিল।'[২] একই সঙ্গে চন্দ্রাবতীর জীবনালেখ্য ও কবি চন্দ্রাবতী সৃষ্ট কাব্য রোমান্টিক আখ্যান রচনা করল। স্রষ্টা তার সৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষিত হবার দাবীদার হয়ে উঠল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক ধারার মধ্যমণি চরিত্র হয়ে উঠল। তাই 'মলুয়া', 'দস্যু কেনারামের পালা', 'চন্দ্রাবতী', 'দেওয়ান ভাবনা' (কবি চন্দ্রাবতী রচিত কিনা বিতর্ক আছে), এবং চন্দ্রাবতী কৃত রামায়ণের নিরিখে চন্দ্রাবতী চরিত্র বিশ্লেষণ করা যাক।

সৃষ্টির অন্দরমহল : (মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা, দেওয়ান ভাবনা, চন্দ্রাবতী রামায়ণ)

একপ্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা যায় পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রথমভাগে প্রকাশিত মলুয়া পালাটি কবি চন্দ্রাবতীর রচনা। পালাভ্যন্তরে বর্ণিত ভনিতায় কবি নিজের পরচয় দিয়েছেন। মৈমনংসিহ অঞ্চলের লোকবিশ্বাসেও কবি চন্দ্রাবতীর স্বীকৃতি মেলে। এই পালার অপর নাম "কাজীর বিচার"। মলুয়া চরিত্রটির প্রাধান্যের কারণে পরিবর্তিত নাম হয় 'মলুয়া'। বিবাহিতা নারীর অপূর্ব প্রেমের নিদর্শন আছে পালাটিতে। চন্দ্রাবতী

যখন মলুয়া চরিত্র সৃষ্টি করছে, তখন সমাজের কিছু প্রচলিত ধারণা চালিত করছে তাকে - নারী সেবাদাসী, পুরুষের ভোগ্যা, পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ কখনই জানতে চায় না নারী মনের কথা। এমনকি বিবাহের সময়েও নারীর সম্মতির কোনও প্রয়োজন হয় না পরিবারের। মেয়েটি সেখানে নিছকই বস্তু। অভিভাবক বদল মেয়েটির কাছে গুরুত্বহীন অনুষঙ্গ। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্মোহ আস্ফালনে নারী সর্বৈব ব্রাত্য। মল্লিকা সেনগুপ্তের প্রাসঙ্গিক উক্তি, 'না, না, ভুল বলেছি, আমি মানুষী, আপাদমস্তক একটি মেয়ে। মানুষ এবং মানুষী আলাদা। সমাজ এই পার্থক্যটা বরাবর চালু রেখেছে রাজনীতিটা চিনিয়ে দেবার জন্যে। নারী ও পুরুষ আলাদা তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু আলাদা বলেই একটি পুরুষ এসে আমার সিঁথিতে রক্তচিহ্ন এঁকে দিয়ে ঘোষণা করবে - এই মেয়েটি আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি! হাতে, পায়ে, গলায়, নাকে সর্বত্র শেকল পরিয়ে দেবে আর সেই শৃঙ্খলকে ভালোবেসে আমরা বলব অলংকার? অক্ষয় সিঁদুর আর সোনার গয়নার উপকথায় চিরদিন চাপা পড়ে থাকবে আমার নিজস্ব কণ্ঠ, আমার বেদনা ও প্রতিবাদ, আমার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই![৩] ঠিক এই সামাজিক কাঠামোতে সৃষ্টি হচ্ছে মলুয়া চরিত্রটি। কুড়া শিকার করতে গিয়ে চাঁদ বিনোদের সঙ্গে মলুয়ার প্রেম-বিবাহ, মুসলমান কাজীর মলুয়ার প্রতি আকর্ষণ, কাজী কর্তৃক সম্পত্তি দখল, বিনোদের বিদেশযাত্রা- এভাবে পালাটি অগ্রসর হয়ে চলে। মলুয়া চরিত্রের পাতিব্রত্য, কর্তব্যবোধ, স্বার্থত্যাগ, দুঃখ বরণের তুলনায় বিনোদ চরিত্র অনেকটাই নিষ্প্রভ। হয়ত মলুয়া চরিত্রটিতে মধ্যযুগের আর্কেটাইপ সতী নারীর ছাপ রয়ে গেছে, সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে বাঁচাচ্ছে, কখনও আবার সে স্বামী কর্তৃক পরিতক্তা হচ্ছে, নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে নৌকাতে পাড়ি জমিয়েছে। লক্ষণীয় কবি চন্দ্রাবতীর হাতে একজন নারী কাব্যের মুখ্য এবং নিয়ন্ত্রক চরিত্রই শুধু হয়ে উঠছে না, চরিত্রটি আধুনিক চিন্তা চেতনার অধিকারী হচ্ছে। শাশুড়ি-বৌমা সম্পর্কের চিরাচরিত তিক্ততা অতিক্রম করছে। কবি লিখছেন, 'বাড়ির শোভা বাগবাগিচা ঘরের শোভা বেড়া/ কূলের শোভা বউ-শাশুড়ির বুক জুড়া।।/ বউ পাইয়া বিনোদের মা পরম সুখী হইল।/ ঘরগিরিস্থি যত সব যতনে পাতিল।।'[৪] আবার মলুয়া আত্মঘাতিনী হতে চাইলে শাশুড়ির ক্ষেদোক্তি, 'শুন শুন বধু ওগো কইয়া বুঝাই তরে।/ভাঙ্গা নাও ছাইড়া তুমি আইস মোর ঘরে।।'[৫] সমাজের কাছে অসতী মলুয়ার আত্মহনন আত্মহত্যা নয় আত্মত্যাগ। মলুয়া অভিমানী হয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রতিবাদী হয়েছে, বেঁচে থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সাহস পায়নি, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পরোক্ষে পরাজিত করেছে স্বামী ও সমাজকে। এক্ষেত্রে মল্লিকা সেন গুপ্তের কবিতার লাইনগুলি ভীষণ প্রাসঙ্গিক, '... মাজা ভেঙে দিয়ে গেছ, রাস্তায় ফেলেছ, / হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটি, মাজা ভাঙা কেঁচো।/ একদিন এই কেঁচো দেখো সাপ হয়ে / তোমাকে ছোবল দিয়ে নিজে যাবে ক্ষয়ে।'[৬] মলুয়ার এই আত্মহনন ছোবল হয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এবং স্বামীর বিরুদ্ধে জাগ্রত দ্রোহ ঘোষণা করেছে।

'দস্যু কেনারামের পালা' সম্পূর্ণ নায়িকা বর্জিত। চন্দ্রাবতী সৃষ্ট এই পালায় প্রধান দুই চরিত্রই পুরুষ। প্রকৃতিগতভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই মেরুতে দুটি চরিত্রের সৃষ্টি করছে চন্দ্রাবতী। ডাকাত হিসেবে কেনারাম চরিত্র চিত্রণ সার্থক। কবি বর্ণনা দিয়েছে, 'হাত পার গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া।/ আসমানে জমীনে ঠেকে যখন হয় খাড়া।।/ কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্বত প্রমাণ।/ রাবনের মত হইল অতি বলবান।।'[৭] অপরদিকে দ্বিজ বংশীদাস ধর্ম ও সত্যের প্রতিমূর্তি। যার ছোঁয়ায় পাষাণ গলে, নিষ্ঠুর কেনারাম ও ধার্মিক হয়। কবি চন্দ্রাবতী ব্যক্তিগত ভাবে পিতা কর্তৃক প্রভাবিত ছিল। দস্যু কেনারামের সঙ্গে তার পিতার সাক্ষাতের কথাও সম্ভবত শুনে থাকবে। তাই চরিত্র সৃষ্টিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে চন্দ্রাবতীর কলমে। দস্যু কেনারামের পাশাপাশি পিতা বংশী দাসও তার নামাবলী, উত্তরীয়, আবক্ষালম্বিত রুদ্রাক্ষ মালা, সুঠাম ও সুদীর্ঘ দেহ নিয়ে বাস্তব চরিত্র হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করছে কাব্যে। লক্ষণীয় 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় রোমান্টিক প্রণয় আখ্যানের ভিড়ে সম্পূর্ণ নারী বর্জিত একটি পুরুষ আখ্যান রচিত হচ্ছে তাও সেই তথাকথিত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের হাতে। এখানেই চন্দ্রাবতী আর পাঁচটা নারী চরিত্র থেকে আলাদা।

'দেওয়ান ভাবনা' র রচনাকার অজ্ঞাত এবং তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কও আছে। তবু আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন পালার শুরুতে জানিয়েছেন, 'দেওয়ান ভাবনা' ও 'দস্যু কেনারামের পালা' চন্দ্রাবতী প্রণীত। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতকে স্বীকার করে নিলে দেওয়ান ভাবনাও একবার আলোচনার অবকাশ রাখে। পালাটি তুলনামূলক ছোট। গল্পের যুগপৎ সাবলীলতা এবং শৈল্পিক দক্ষতা লক্ষ করা যায়। শাসক সমাজের আধিপত্য এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিতর্কিত ছায়া এতটাই সুস্পষ্ট যে, পালাটির নামকরণেও তার ছাপ রয়েছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র ক্ষীণ পুরুষ চরিত্রের ভিড়ে দেওয়ান ভাবনার মাধব চরিত্র স্বতন্ত্র। বিধর্মী পরপুরুষের স্পর্শ সত্ত্বেও সে তার বিবাহিতা স্ত্রী সুনাইকে পরিত্যাগ করেনি। শত্রুর হাত থেকে বীরের মত সে তার স্ত্রীকে উদ্ধার করেছে এবং যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যার দৃষ্টান্ত বিরল। মাধব চরিত্র সম্পর্কে সমালোচক তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র এই একটি মাত্র পুরুষ চরিত্রে পৌরুষের পরিচয় পাইয়াছে।... মোহকে জয় করিয়া পৌরুষ এখনে যথার্থ প্রেমের পথ বাঁধিয়া দিয়াছিল।'[৮] লক্ষণীয় ব্যক্তি জীবনে চন্দ্রাবতী জয়ানন্দ কর্তৃক পরিত্যক্তা ও প্রেম বিযুক্তা হয়েও 'দেওয়ান ভাবনা' পালাতে প্রেমের পূর্ণতা আনছে পালায় নায়কের হাত ধরে। নিজ জীবনের জয়ানন্দের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করছে মাধব চরিত্রের মাধ্যমে।

চন্দ্রাবতী রামায়ণ কবির স্মরণীয় সৃষ্টি। ছোট থেকে শিক্ষিত পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠা চন্দ্রাবতী 'রামায়ণের' প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। যার প্রভাব আমরা 'মলুয়া' পালাতে বা 'দস্যু কেনারামের পালা'তেও লক্ষ করি। চন্দ্রাবতী রামায়ণ মৈমনসিংহ অঞ্চলের মহিলাদের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। আশ্চর্য ভাবে চন্দ্রাবতী রামায়নে বাল্মীকি বা

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব লক্ষ করা যায় না। বরং তিব্বত, মালয়, জাভা, বা সুমাত্রায় যে রামায়ণ কথা প্রচলিত ছিল তারই সমূহ ছাপ রয়েছে 'চন্দ্রাবতী রামায়ণে'। এখানেও চন্দ্রাবতী কবি হিসেবে অন্যভাবে রামায়ণ রচনা করেছে, যেখানে সীতা চরিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রচ্ছন্ন ভাবে কবির নারীবাদী সত্ত্বার আত্মপ্রকাশ ঘটছে। চন্দ্রাবতী রামায়ণ শুরু হচ্ছে লঙ্কার বর্ণনা দিয়ে। সীতা সেখানে মন্দোদরী কন্যা-'এক মাস দুই মাস গো তিনমাস গেল।/ দশমাস দশদিনে গো পূর্ণিত হইল।।/ বিষেতে অবশ অঙ্গ গো বদন হইল কালা।/ দিন যায় রাত্রি আসে গো শনির বারবেলা/ এমন কালে রানী এক গো ডিম্ব প্রসবিলা।"[৯] সীতা ভূমিষ্ঠ হবার পরেই গণক রাবণকে জানায় এই কন্যার হাতেই পিতার নিধন ও বংশের নিধন হবে। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে বারবার পুরুষ চরিত্রগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সীতা। সেখানে রাবণ অপহরণ করেছে তাকে, স্বামী রাম অগ্নীপরীক্ষা নিয়েছে, এমনকি সন্তানসম্ভবা সীতাকে রাজ্য ও সংসার ত্যাগ করতে হয়েছে স্বামীর আদেশে, সীতার সেখানে কোনও কণ্ঠস্বর নেই। কিন্তু চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণে সীতার প্রয়োজনে চরিত্রগুলি আবর্তিত হচ্ছে। সীতার হাতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রাবণের নিয়তি। সীতার প্রয়োজনে জনক রাজা তাকে কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেছে। স্বপ্নে সীতা সতাকে দেখা দিয়েছে, 'একদিন রাতে গো সতা দেখিল স্বপন।/সে বড় আশ্চর্য কথা গো শুন সখীগণ।।/[১০] অথবা সীতা স্বপ্নে সতার গলা ধরে বলছে, 'আমারে লইয়া যাও গো জনক রাজার ঘরে।।/ বাপ মোর জনক রাজা গো রানী মোর মাও।/কালি প্রাতে মোরে লইয়া গো রানীর কাছে যাও।'[১১] লক্ষণীয় চন্দ্রাবতী রামায়ণে আগে সীতার জন্মবৃত্তান্ত আসছে, পরে আসছে রামের। এই ঘটনাগুলি কবি এবং তার সৃষ্টিকে আধুনিক করেছে। কবি চন্দ্রাবতী তাঁর এই রামায়ণকে খুব সচেতনভাবেই মহাকাব্যিক বিশালতা এবং গাম্ভীর্য দিতে চায়নি, বরং সরলকৃত করে পল্লি বাংলার গাথাকাব্য হিসেবেই রচনা করেছে। কাব্যের প্রতি ছত্রে 'গো' শব্দের ব্যবহার অথবা গ্রামবাংলার চিরাচরিত ননদ-ভাজ সম্পর্কের কুটিলতা তার প্রমাণ বহন করে। কুকুয়া ননদিনী চক্রান্ত করে পরিকল্পিত ভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বিনষ্ট করছে, 'বিশ্বাস না কর দাদা গো দেখহ আসিয়া।/ তোমার সীতা নিদ্রা যায় গো রাবণ বুকে লইয়া।।[১২] কাব্যটি এখানেই অসমাপ্ত। পাঠক লক্ষ করবেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের সঙ্গে চন্দ্রাবতী রামায়ণের মিল পাওয়া যায় বহুলাংশে। এটা ভাবা অসংগত নয় যে, মাইকেল স্বয়ং চন্দ্রাবতী রামায়ণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এখনেই একজন কবি এবং নারী হিসেবে চন্দ্রাবতীর সার্থকতা।

চন্দ্রাবতী চরিত্রের অন্দরমহল ও চন্দ্রাবতী পালা :

কবি চন্দ্রাবতীর সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যক্তি চন্দ্রাবতী কেমন ছিলেন তা জানার জন্যে নয়ান চাঁদ ঘোষ লিখিত 'চন্দ্রাবতী' পালাটির ওপরে আলোকপাত করা যেতে পারে। চন্দ্রাবতী সুপ্রসিদ্ধ মনসার ভাসান গায়ক দ্বিজ বংশীদাস ভট্টাচার্যের কন্যা। দুলালী কন্যাকে তিনি স্বহস্তে শিখিয়েছিলেন সংস্কৃত, ব্যকরণ, সাহিত্য, পুরাণ। মলুয়া,

'দস্যু কেনারামের পালা' বা শুধু রামায়ণ রচনাই নয়, চন্দ্রাবতী পিতাকে পদ্মপুরাণ লিখতেও সাহায্য করেছিল। সে একদিকে যেমন ছিল স্নেহময়ী কন্যা বা আগ্রহী ছাত্রী, অন্যদিকে তেমনই ছিল দয়িত-প্রাণ প্রেমিকা। প্রেমের আগুনে সারাজীবন দগ্ধ হয়েছে কিন্তু আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দেয়নি। নয়ানচাঁদ ঘোষ বর্ণিত 'চন্দ্রাবতী' পালাটি আদ্যোপান্ত প্রেমমূলক হলেও শেষ পরিণতি বিয়োগান্তক। চন্দ্রাবতীর জীবনে প্রেম পূর্ণতা পায়নি, প্রেমিক জয়ানন্দ কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েছে। এক মুসলমান নারীতে আসক্ত হয়ে জয়ানন্দ পরিত্যাগ করেছে চন্দ্রাবতীকে। প্রেমময়ী চন্দ্রাবতী পাষাণী হয়েছে, "... শুনিয়া হইল চন্দ্রা পাথর যেমন।।/না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী।/ আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী।।[১৩] চন্দ্রাবতী সিদ্ধান্ত নেয় সে সারাজীবন অবিবাহিত থাকবে। লক্ষণীয় মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে একজন নারী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সারাজীবন অবিবাহিত থাকার তাও পিতার আনুমতি ক্রমে। দুঃখিনী কন্যার পিতা কন্যাকে বলছেন, 'শিবপূজা কর আর লেখ রামায়াণে'।[১৪] এক্ষেত্রে পিতা এবং কন্যা দুজনেরই আধুনিক মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রাবতী চরিত্র অন্য মাত্রা পায় যখন সমাজের বেঁধে দেওয়া বৈবাহিক সূত্রকে সে স্বীকার করেনা মনের টান ছাড়া। পালার শেষ দৃশ্যে দেখা যায় একই সঙ্গে জয়ানন্দের প্রতি কোমল হৃদয়ের আকর্ষণ, অন্যদিকে ত্যাগশুদ্ধ চিত্তের গভীরে ধর্মনিষ্ঠা একই বৃন্তে বিধৃত হয়েছে। একদিকে লিবিডোর আহ্বান আর অন্যদিকে সুপার ইগো চালনা করেছে চন্দ্রাবতীকে। প্রানাধিক প্রেমিকের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছে, 'পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী'।[১৫] ঐতিহাসিক সত্যতার স্বাক্ষী স্বরূপ সেই জীর্ণ মন্দির ও ফুলেশ্বরী নদী আজও বিদ্যমান। প্রেম তাকে একমুখী করেছে, যোগিনী করেছে। চন্দ্রাবতীকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র সমস্ত নারী চরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যায়, কারণ চন্দ্রাবতী কবি মনের কল্পনায় সৃষ্ট কোনও নায়িকা নয়, সম্পূর্ণ রক্তমাংসে গড়া বাস্তব চরিত্র। যে শিক্ষা, রুচি, প্রেম, আত্মমর্যাদা নিয়ে নারী হিসেবে সম্পূর্ণা। জীবননাট্যের নায়িকা হিসেবেও অন্যতমা। যার সমগ্র জীবনটাই বিস্ময় এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ। চন্দ্রাবতীকে বাংলা সাহিত্যে ও পাঠক মনে রাখবে তার সৃষ্টির নিরিখে ও বাংলা লোকসাহিত্যের আকাশে এক উজ্বল নক্ষত্ররূপ স্রষ্টা হিসেবে।

তথ্যসূত্র :

১। মল্লিকা সেনগুপ্ত, অর্ধেক পৃথিবী, মেয়েটি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ২৯।

২। দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা), মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম এস ওয়েস সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০০, দীনেশচন্দ্র সেনের ভুমিকা অংশ। 'এই গাথাসমূহের সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে' শিরোনামাঙ্কিত অংশ, পৃষ্ঠা ৩৯৯।

৩। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'আমার কথা' (অধ্যায়নাম), পুরুষ নয়, পুরুষতন্ত্র (গ্রন্থনাম),

'গদ্যসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৫৭৭।
৪। দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা), মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম এস ওয়েস সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০০, 'মলুয়া' পালা, 'ঘরে ফেরা' নামাঙ্কিত অংশ, পৃষ্ঠা ১১৭।
৫। দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা), মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম এস ওয়েস সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০০, 'মলুয়া' পালা, 'শেষ দৃশ্য', পৃষ্ঠা ১৪৪।
৬। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, 'বিচ্ছেদ', আমাকে সরিয়ে দাও ভালোবাসা, পৃষ্ঠা ৪২৬।
৭। দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা), মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম এস. ওয়েস. সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০০, 'দস্যু কেনারামের পালা', 'দস্যুদলের প্রবেশ', পৃষ্ঠা ২৩১।
৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙলা লোকসাহিত্য, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩০৩।
৯। দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা), পূর্ববঙ্গ গীতিকা ২, 'চন্দ্রাবতী রামায়ন ও প্রাসঙ্গিক পাঠ ২', প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯ (প্রথম প্রকাশ : ১৯৩২), পৃষ্ঠা ২৪২।
১০। তদেব, 'ডিম্ব লইয়া সতার জনক মহিষীর নিকট গমন', পৃষ্ঠা ২৪৬।
১১। তদেব, 'ডিম্ব লইয়া সতার জনক মহিষীর নিকট গমন', পৃষ্ঠা ২৪৭।
১২। তদেব, 'সীতার বনবাসের পূর্ব সূচনা', পৃষ্ঠা ২৬৮।
১৩। দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা), মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম এস. ওয়েস. সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০০, নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত 'চন্দ্রাবতী', 'চন্দ্রার অবস্থা', পৃষ্ঠা ১৫৭।
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৮।
১৫। তদেব, 'শেষ' দৃশ্য, পৃষ্ঠা ১৬২।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত), মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম এস. ওয়েস. সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০০।
২। সন্দিপকুমার মন্ডল (সম্পা), মৈমনসিংহ গীতিকা, বাঙালির গান বঙ্গের আখ্যান, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ ১০ই মে, ২০১৯।
৩। রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা), প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, উর্বী প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০০৮।
৪। কেয়া চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), মৈমনসিংহ গীতিকা নব আলেখ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০২১।
৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৭।
৬। মল্লিকা সেনগুপ্ত, আমার কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৬।

পরিবেশ দূষণ ও মানব-প্রকৃতির দূষণ : রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার আলোকে

মাণিক কিস্কু

সারসংক্ষেপ :

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় মানুষ যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক সমস্যার সঙ্গে লড়াই করে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। বর্তমানে পরিবেশ দূষণ সারা বিশ্বে একটি চরম উদ্বেগের বিষয়। পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা পৃথিবীতে মানব অস্তিত্বের জন্য সঙ্কটস্বরূপ। পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি মানব প্রকৃতি (The Nature of Man), মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি নানা দিক দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ (Environmental Pollution) ও মানব প্রকৃতির দূষণের (Polluted Nature of Man) মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক রয়েছে। এটি একে অপরকে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতি ও মানব মনের সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে ভাবিত ছিলেন। তিনি মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের দিকটিতে আলোকপাত করেছেন। একই সঙ্গে তিনি মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির অসামঞ্জস্যের বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে এই উদ্বেগের পরিচয় পাওয়া যায়। জল, মাটি, বাতাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষের কর্মকাণ্ডে মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। পরিবর্তে দূষিত পরিবেশও মানব প্রকৃতির 'ঐশ্বরিক সত্তা' (Divine Nature) কে দূষিত করছে। পরিবেশগত অবক্ষয় এবং মানব-প্রকৃতির দূষণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং যে উপায়ে মানুষ তার 'ঐশ্বরিক প্রকৃতি' ফিরে পেতে পারে তা রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার আলোকে এই নিবন্ধে আলোচিত হবে।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

ভূমিকা :

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পরিবেশ দূষণের বিষয়টি সমগ্র পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে পরিবেশ দূষণ সারা বিশ্বে একটি চরম উদ্বেগের বিষয়। যখন প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমাজ ইত্যাদি মানুষের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সেই অবস্থাকে পরিবেশগত অবক্ষয় বলা হয়। পরিবেশ দূষণের কারণে পৃথিবীতে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুলি ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আকার ধারণ করেছে। পরিবেশ দূষণ আজ এতটাই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে যে তা মানব জাতির অস্তিত্বকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে। জাতিসঙ্ঘ পরিবেশ দূষণকে

পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সমস্যা রূপে চিহ্নিত করেছে। মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ পরিবেশ দূষণের জন্য মূলত দায়ী। অরণ্যভূমি ধ্বংস, নগরায়ন, সন্ত্রাসবাদ, গৃহযুদ্ধ, দূষণ, জনবিস্ফোরণ, দারিদ্রতা, বন্যপশু শিকার ইত্যাদি পরিবেশের ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করছে এবং এগুলি পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচিত। পরিবেশ দূষণের মূলে রয়েছে মানব প্রকৃতির দূষণ। মানুষের স্বরূপ হল 'ঐশ্বরিক'। কিন্তু সব মানুষ তার এই অন্তর্নিহিত 'ঐশ্বরিক সত্তা' (Divinity) উপলব্ধি করতে পারে না। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত ব'লেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি"।[১] ধৈর্য, দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি, নৈতিকতা, অহিংসা ইত্যাদি গুণ মানুষের ঐশ্বরিক প্রকৃতির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এই গুণ গুলি মানুষকে আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত করে। 'আধ্যাত্মিকতা' হল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বা আত্মোপলব্ধির ক্ষমতা। কিন্তু, বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ এই 'আধ্যাত্মিকতা' সম্পর্কে সচেতন নয়, এমনকি এটি উপলব্ধি করতেও আগ্রহী নয়। তারা তাদের কামনা বাসনা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পাশবিক প্রবৃত্তি দ্বারা এতটাই আচ্ছন্ন থাকে যে সে হিংস্র পশুর ন্যায় নিকৃষ্ট আচরণ করে। মানুষের এই অবস্থাকে মানব প্রকৃতির দূষণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

মানব প্রকৃতির স্বরূপ - রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি :

'মানব প্রকৃতি' (The Nature of Man) সংক্রান্ত প্রশ্নটি বৈদিক যুগ থেকেই মানুষের কৌতূহল ও চর্চার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানুষ শত শত শতাব্দী ধরে মানব প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করে চলেছে। তিনি বলেছেন, "সে বুঝেছে সে সহজ নয়, তার মধ্যে একটা রহস্য আছে, এই রহস্যের আবরণ উদ্ঘাটিত হতে হতে তবে সে আপনাকে চিনবে। শত শত শতাব্দী ধরে চলছে তার প্রয়াস"।[২] 'মানব প্রকৃতি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ ও বাউলের ধারণা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে 'মানব প্রকৃতি'র দুটি দিকের কথা বলেছেন। একটি মানুষের 'সসীম সত্তা' আর অন্যটি তার 'অসীম সত্তা'। "মানুষ আছে তার দুই ভাব কে নিয়ে, একটা তার জীবভাব আর একটা বিশ্বভাব"। মানুষের 'সসীম সত্তার' দিকটি তার দৈহিক সীমাবদ্ধতার দিক। মানুষের সসীম দিক বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে জীবনধারণের জন্য মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এই দিকটি নিতান্তই তার জৈবিক প্রয়োজন সাধনের। মানুষ তার রাগ-দ্বেষ, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা, অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদি দ্বারা চালিত হয়। জীবভাবে মানুষ তার আপন বিচারবুদ্ধি ও বিষয়বুদ্ধি নিয়ে জ্ঞান ও কর্মের পথে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে। তিনি বলেছেন, "মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেখানে আপন ব্যক্তিগত জীব যাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, কর্ম, তার রচনা শক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীব রূপে বাঁচতে চায়"।[৩] জীব হিসাবে মানুষের মধ্যে পশুদের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মানুষের পূর্বপুরুষ একসময় পশুদের মতো চারপায়ে চলাফেরা করত। কিন্তু, কালক্রমে মানুষ সোজা

হয়ে দাঁড়াতে শিখেছে, চারপায়ের বদলে দুপায়ে হাঁটতে শিখেছে। এরফলে তার দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হয়েছে, সে জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করলো। সে আত্ম-সন্তুষ্টি ও আত্ম-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কর্মে প্রবৃত্ত হল। জীবনের আশু প্রয়োজনের বাইরে তার কর্মের প্রকাশ ঘটল 'সৌন্দর্যবোধ' ও 'সৃষ্টি'র আনন্দে। "এই আনন্দের মধ্য দিয়েই সে জানতে পারে যে সে শুধু এক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়, সে এক মহা মানবের, এক পূর্ণের সঙ্গে একাত্ম"।[৪] মানুষই একমাত্র প্রানী যে সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে নিজেকে অতিক্রম করে। নিজেকে অতিক্রম করার এই ক্ষমতাকেই রবীন্দ্রনাথ মানুষের 'উদ্বৃত্ত' বলেছেন। যখন মানুষ নিজের জৈবিকতাকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবের সঙ্গে তার একাত্মতা অনুভব করে তখনই তার উদ্বৃত্তের প্রকাশ। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের অতিবর্তী আধ্যাত্মিক সত্তাকেই তিনি মানুষের উদ্বৃত্ত বলেছেন। মানুষের সৃজনশীলতা এই উদ্বৃত্তের ফল যার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন গুহাবাসী মানুষের গুহাচিত্রের মধ্যে, প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি মানুষের স্বরূপের এই দিকটি ব্যক্ত করেছেন – "কিন্তু, মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবন যাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্যে বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশী। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে বড় যে জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়"।[৫]

রবীন্দ্রনাথ মানুষের অসীম সত্তাকে 'সর্বজনীন' বা 'ঐশ্বরিক প্রকৃতি' বলেছেন। এই 'ঐশ্বরিক প্রকৃতি' মানুষকে আত্মত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি বলেছেন, "যা আমাদের ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম"।[৬] মানব প্রকৃতির এই আত্মত্যাগের দিকটি তাঁর 'Personality' প্রবন্ধেও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "We have seen men conquering pain by undaunted prowess, plunging into fiery ordeals only to march forward with triumph. What striving is this? This power that lies behind is neither physical nor mental, it belongs to the inward self where man is united with his God."[৭] বিশ্বমানবের ধারণা তাঁর বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন ভাবে উঠে এসেছে। তাঁর এই বিশ্বমানবের ধারণায় বাউল সাধকের 'মনের মানুষ' এবং উপনিষদের ব্রহ্মের ধারণার প্রভাব দেখা যায়। জীবনদেবতা মানুষের 'মনের মানুষ'। অন্তঃস্থিত সেই 'জীবন দেবতা'[৮] কে মানুষ বাইরের জগতে খুঁজে বেড়ায়। আর এতেই মানুষের যত দুর্গতি। মানুষের সেই মনের মানুষের অন্বেষণ প্রতিধ্বনিত হয়েছে আপন হারা বাউলের গানে – 'আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে'। মনের মানুষের ঠিকানাও সেই বাউলের গানেই প্রকাশিত 'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ'। তারই গানে মানুষের সঙ্গে মনের মানুষের মিলনের আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে – 'মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষেরই সনে'। বিশ্বমানব সত্তাই একমাত্র সত্য এবং ব্যক্তি

মানব ও বিশ্বমানবের মিলন বা একাত্মীভুত হবার প্রক্রিয়াই তার কাছে ধর্ম। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যে জীব ও বক্ষের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে।[৯] ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থকে অতিক্রম করাই যে মানুষের মূল লক্ষ্য এবং সেটিই মানব ধর্ম তা-ই 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয়।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক - রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি :

রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা - প্রবন্ধ, গান, কবিতা, কাব্যনাট্য ইত্যাদিতে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের দিকটি আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Sadhana – The Realisation of Life' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'The Relation of the Individual to the Universe' – প্রবন্ধে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের দিকটিতে আলোকপাত করেছেন। মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের দিকটি তুলে ধরেছেন। প্রাচীন কাল থেকেই পাশ্চাত্য সমাজ সংস্কৃতি ছিল নগর কেন্দ্রিক। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা হল মানুষের জীবন ও কর্মের দিকটি প্রভাসিত করা এবং মানুষ ও বিশ্বজনীন প্রকৃতির মধ্যে এক কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টির করা। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। এখানে মানুষের সঙ্গে জগতের সম্পর্ককে এক মহান সত্যের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। ভারতীয় সভ্যতার শুরু হয়েছে প্রকৃতির নিবিড় বনানীর কোলে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, অস্তিত্ব রক্ষা – সবকিছুর জন্যই মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল।[১০] পাশ্চাত্যের প্রচলিত ভাবনা হল নিছক জড় বস্তু ও পশুদের নিয়েই প্রকৃতি। মানব প্রকৃতির উদ্ভব তার আকস্মিক তুচ্ছ ব্যতিক্রম মাত্র। এই মতানুসারে, সত্তার মানদণ্ডে যা কিছু নিম্ন স্তরের তাই শুধু প্রকৃতি এবং আর যা কিছু পূর্ণতায় আভাসিত, বৌদ্ধিক বা নৈতিক তাই মানব প্রকৃতি। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা স্বীকারে কোন দিনই কুণ্ঠাবোধ করে নি।[১১]

বিবর্তনের ধারায় মানুষ তার বৌদ্ধিক শক্তি দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করেছে। সে তার প্রযুক্তিগত ও মানসিক বুদ্ধিমত্তার দ্বারা প্রাকৃতিক প্রয়োজনের বাধ্যবাধকতা থাকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে। মানুষ তার বৌদ্ধিক শক্তি দ্বারা জীব ও জড় জগতের সমন্বয়কে অস্বীকার করে এবং প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব কায়েম করার চেষ্টা করে। ফলে মানুষ নিজেকে প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। মানুষ ও প্রকৃতির এই বিচ্ছিন্নতা মানব জাতির অস্তিত্বকে সংকটময় করে তুলেছে। পাশ্চাত্য সমাজ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্য (intrinsic value) স্বীকার করে নি। পিটার সিঙ্গার তাঁর Practical Ethics[১২] গ্রন্থে পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, প্রকৃতির প্রতি মানুষের এই কর্তৃত্বমূলক মনোভাব পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা স্বীকারে কোনদিন কুণ্ঠাবোধ করে নি। রবীন্দ্রনাথও এই সম্পর্কের মূল্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্য স্বীকার করেন। তিনি মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন

ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে পরিবেশের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম এবং মানুষ ও তার পরিবেশের সম্পর্কের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতি তাঁর এই প্রেম, মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের হৃদয়াবেগ 'বলাই' গল্পে খুব সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেমেই মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ হয়। শিক্ষার প্রসার ও নিবিড় প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানব মনের বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে 'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পরিবেশ ও মানব প্রকৃতির অবক্ষয় :

জল, মাটি, বাতাস ইত্যাদি পরিবেশের উপাদান গুলির দূষণ পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করছে এবং জীব-বৈচিত্রের উপর তার প্রভাব পড়ছে। মানুষের দৈহিক ও মানসিক –উভয় স্বাস্থ্যের উপরই পরিবেশ দূষণের মারাত্মক প্রভাব পড়ছে এবং তা মানব জাতির অস্তিত্বের আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। পরিবেশ দূষণ কিভাবে মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'Association between Air Pollution and Suicide in South Korea: A Nationwide Study'- এ দেখা গেছে বায়ু দূষণের কারণে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ুদূষক গুলির মধ্যে আত্মহত্যার হারের সঙ্গে ওজোন গ্যাসের একটা জোরালো সম্পর্ক আছে। আত্মহত্যার বার্ষিক হার প্রায় ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৩] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের অন্য একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে দেখা গেছে পরিবেশ দূষণের সঙ্গে মানসিক রোগের সম্পর্ক আছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে বায়ু দূষণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে মানসিক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে।[১৪] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে দেখা গেছে পরিবেশ দূষণের কারণে মানুষের আক্রমণাত্মক আচরণ ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৫] এছাড়াও অন্য একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে দেখা গেছে বায়ু দূষণের কারণে মানুষের উদ্বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই উদ্বেগের কারণে অনৈতিক আচরণ ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে, বায়ু দূষণ কেবল মানুষের স্বাস্থ্যকেই বিঘ্নিত করে না, মানুষের নৈতিকতাকেও প্রভাবিত করে।[১৬]

এই সমস্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলির আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে পরিবেশ দূষণ ও মানব প্রকৃতির দূষণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আসলে মানুষ ও প্রকৃতি একই মুদ্রার দুই পিঠ। এরা একে অপরকে প্রভাবিত করে। মানুষই পরিবেশকে দূষিত করছে। পরিবর্তে, দূষিত পরিবেশও মানব প্রকৃতিকে সরাসরি প্রভাবিত করছে। এটি মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকেও প্রভাবিত করছে। নৈতিকতা বর্জিত লোভী মানুষের আচরণ অন্য মানুষের মানসিকতাকেও দূষিত করে। মানব প্রকৃতির এই দূষণ সামগ্রিকভাবে সমাজের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, নৈতিক দিক কে দূষিত করছে। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। এই প্রবণতাই প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণ ঘটাচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের মূল কারণ হল মানব প্রকৃতির দূষণ। অহংকার, লোভ ও

ক্ষমতার দম্ভ – ইত্যাদি হল মানব প্রকৃতির ঐশ্বরিক সত্তার দূষণের মূল কারণ। মানব প্রকৃতির দূষণের কারণে মানুষ নানা অনৈতিক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করছে। এই অনৈতিক কার্যকলাপ মানুষের স্বাস্থ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করছে।

মানব প্রকৃতির এই দূষণ এবং প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবনা-চিন্তা করতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ব্যক্তিগত ধনসম্পদ সঞ্চয়ের প্রবণতা মানুষের মধ্যে অসীম লোভ ও গভীর ঈর্ষার সৃষ্টির করেছে। এর ফলে তৈরি হচ্ছে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের অশুভ প্রতিযোগিতা এবং এর মধ্যেই নিহিত আছে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি। আত্যধিক মুনাফা অর্জনের মোহ মানুষের সমাজ বন্ধনকে শিথিল ও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।[১৭] মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি মানব কেন্দ্রিক, প্রকৃতি কেন্দ্রিক নয়। এই মানব কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মানুষ এই মহাবিশ্বের সঙ্গে একত্ব অনুভব করতে পারে না। ক্ষমতার দম্ভে মানুষ এতটাই অন্ধ হয়ে থাকে যে সে প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে না। ধর্মের উদ্দেশ্যে হল মানুষ ও তার ঐশ্বরিক সত্তার উপলব্ধি। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে প্রকৃত ধর্মের পার্থক্য করেছেন। অন্তর্নিহিত ঐশ্বরিক সত্তার উপলব্ধিই হল প্রকৃত ধর্ম। আধুনিক মানুষ ধর্মের এই প্রকৃত মূল্যকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই সে জীবনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারিয়েছে। তিনি তাঁর Creative Unity নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "upon the loss of this sense of Universal Personality, which is religion, the reign of machine and of method has been firmly established and man, humanly speaking, has been made a homeless tramp."[১৮] কামনার পর্দা দিয়ে মানুষ জগতকে দেখে বলেই তাকে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ করে ফেলে এবং পূর্ণ সত্য উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতির সঙ্গে নিজের মৌলিক বিচ্ছিন্নতা কল্পনা করে মানুষ নির্বোধের মতো নিজের মহত্ত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে। নিজের অন্ধ উন্মত্ততায় মানুষ এই জড় জগতটাকে ভয়ানক শত্রু বলেও মনে করে।

উপসংহার :

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনাবলীর মধ্য দিয়ে 'মানব ধর্ম' পালনের উপদেশ দিয়েছেন। উনিশ শতকের অন্যান্য মনিষীদের মতো তিনিও 'মানবতাবাদ' –এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই মানবতাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই 'আপন হতে বাহির হয়ে' পূর্ণতা প্রাপ্তির পরামর্শ দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ ছিল পূর্ণতার আদর্শ। মানুষের সব কর্ম প্রচেষ্টা ছিল এই পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে। এই পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তিনি জগতকে অস্বীকার করেন নি। মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতাকে তিনি কখনই অবহেলা করেন নি। তাঁর সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বের মূলে আছে মানুষের অনুভূতি। তিনি আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নয়নের বিরোধী ছিলেন না। বরং তিনি জগতের উন্নয়ন ও প্রগতির জন্য আধুনিক প্রযুক্তিকে সাদরে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে সেই আধুনিক

প্রযুক্তির দ্বারা অত্যধিক মুনাফা লাভের মোহ ও তজ্জনিত সাম্রাজ্যবাদী ভাবনা যেন মানুষকে গ্রাস না করে- পাশ্চাত্যের ভয়ঙ্কর পরিণতির উদাহরণ দিয়ে সেই বিষয়ে তিনি মানুষকে সচেতন করেছেন। তিনি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের কথা বলেছেন। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও তার প্রতি যত্নের মাধ্যেমেই এই ঐক্য স্থাপন সম্ভব। তিনি বলেন, মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে পৃথিবীর সঙ্গে তার আত্মীয়তা।

তিনি বলেছেন মানুষ সকল ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, কামনা বাসনা মুক্ত হতে পারলে পরমাত্মাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারে। একমাত্র প্রকৃত আত্মত্যাগের মাধ্যমেই আত্ম-উপলব্ধি সম্ভব। আমাদের অনুভূতিকে সর্বব্যাপী অসীম অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে বিশ্ব-চেতনা লাভ করা যাবে। উপনিষদে বলা হয়েছে ত্যাগের দ্বারাই সেই চেতনা লাভ করা যাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সবকিছুর সত্তা বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হতে হলে মানুষের উচিত নিজেকে ব্যক্তিগত কামনা বাসনা থেকে মুক্ত রাখা। এই শিক্ষা মেনেই সামাজিক কর্তব্য পালনের জন্য, অপরের দুঃখ লাঘবের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। মানুষের বৃহত্তর জীবন লাভের প্রচেষ্টার জন্য নির্লোভ স্বভাব এবং আত্মত্যাগের প্রয়োজন। আর এভাবে সবকিছুর সঙ্গে একাত্মভাবে ধীরে ধীরে প্রসার লাভই প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনা"।[১৯]

পরিবেশ দূষণ আজকের পৃথিবীতে একটি জ্বলন্ত সমস্যা। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। এছাড়াও বিশ্বের প্রতিটি দেশেই পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধক বিভিন্ন আইন আছে। এতদ্ সত্ত্বেও পরিবেশ দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রকৃতিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন না হলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি নেই। মানুষ তার অন্তর্নিহিত 'ঐশ্বরিক' সত্তার উপলব্ধি করতে সমর্থ হলে তার দৃষ্টিভঙ্গি গত পরিবর্তন আসে, মানুষ বিশ্ব জগতের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঋষিদের মতো সাধক ছিলেন না। তবে মানুষ হিসাবে সমগ্র মানব জাতি ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর অনুভূতি, হৃদয়াবেগ, উপলব্ধি ও মানবতার সাধনা তাকে সাধকের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ অনুসন্ধান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা পরম সত্য ও প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলে। এই সামঞ্জস্যের মাধ্যমেই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা যাবে। মানুষ তার দুই 'ভাব' এর সামঞ্জস্য উপলব্ধি করতে পারলে একদিকে যেমন 'মানব প্রকৃতি'র ঐশ্বরিক উপলব্ধি ঘটে অন্যদিকে তেমনি তার এই ঐশ্বরিক সত্তা দ্বারা সমস্ত প্রকারের দূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৬০), মানুষের ধর্ম, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কোলকাতা, পৃষ্ঠা: ভূমিকা অংশ।

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৬০), মানুষের ধর্ম, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কোলকাতা, পৃষ্ঠা-১০।

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৬০), মানুষের ধর্ম, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কোলকাতা, পৃষ্ঠা: ভূমিকা অংশ।

৪। ভট্টাচার্য, সেবন্তি (সম্পা.),আধুনিক ভারতীয় দর্শন,এবং মুশায়েরা,কলকাতা,পৃষ্ঠা ২১।

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৬০), মানুষের ধর্ম, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কোলকাতা, পৃষ্ঠা: ভূমিকা অংশ।

৬। ঐ, পৃষ্ঠা: ভূমিকা অংশ।

৭। Tagore, R. (1948), Personality, London: The Macmillan and Co. Ltd., (Indian Edition) p. 38

৮। ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ,(১৮৯৫),চিত্রা-জীবন দেবতা,আদিব্রহ্মসমাজ প্রেস,কল.পৃ ১৩১-১৩৪।

৯। ভট্টাচার্য,সেবন্তি (সম্পাদিত),আধুনিকভারতীয় দর্শন,এবং মুশায়েরা,কলকাতা,পৃষ্ঠা ২১।

১০। Tagore, R. (1913). Sadhana: The Realization of Life, New York: The Macmillan Company. PP. 5

১১। ঐ, পৃষ্ঠা ৬-৭

১২। Singer, P. (2011). Practical Ethics (3rd ed.), New York: Cambridge University Press, P. 241

১৩। Kim, Y. & Myung, W. et al, (2015). Association between Air Pollution and Suicide in South Korea: A Nationwide Study, Plos One, 10(2), Retrieved from https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117929

১৪। Khan A, Plana-Ripoll O, Antonsen S, Brandt J, Geels C, Landecker H, et al. (2019). Environmental pollution is associated with increased risk of psychiatric disorders in the US and Denmark. PLoS Biol, 17(8): e3000353. Retrieved from https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000353

১৫। Burkhardt, J. Bayham, J. et al, (2019). The relationship between monthly air pollution and violent crime across the United States. Journal of Environmental Economics and Policy, 9(2), P-188-205.

১৬। Lu, J. G. & Lee, J. J. et al, (2018). Polluted Morality: Air Pollution Predicts Criminal Activity and Unethical Behaviour, Association for Psychological Science, 29(3), P- 340–355. Retrieved from https://doi.org/10.1177%2F0956797617735807

১৭। ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ,রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯৫।

১৮। Tagore, R. (1922). Creative Unity, London: The Macmillan and Co. Ltd., (Indian Edition) P 125.

১৯। রায়, সুনীল,(২০২১) সাধনা(বাংলা অনুবাদ),প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা,পৃষ্ঠা ১৮।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা উপন্যাস : মুসলিম সমাজে নারী

রেজমান মল্লিক

সারসংক্ষেপ :

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা উপন্যাসে মুসলমান সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয়নি। যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা মূলত উচ্চবংশীয় শাসক গোষ্ঠীর সমাজ। শাসক সমাজে নারী অবহেলিত ও অত্যাচারিত ছিল না বরং তারা সংস্কৃতি চর্চা সহ অনেক অধিকার ভোগ করত। আধুনিক যুগের অভিজাত 'আশরফ' বা 'শরীফ' সমাজে নারী চুড়ান্ত অবহেলিত ছিল। পর্দাপ্রথা, শিক্ষার অধিকারহীনতা, সতীন সমস্যা ও তালাকের অপব্যবহার উচ্চবংশীয় মুসলমান নারী সমাজকে সংকুচিত করে রেখেছিল। উপন্যাসে কম আলোচিত অথচ 'আতরফ' বা এইদেশীয় নিম্ন-বংশীয় মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষায় অনগ্রসর থাকলেও তুলনামূলক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত। তালাকের ব্যবহার প্রবল হলেও, এই সমাজে পর্দার কড়াকড়ি ছিল না আবার সতীন সমস্যাও কম ছিল। কাজেই নিম্নশ্রেণির মুসলমান সমাজ স্বাধীনতার আগে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিবন্ধকতার মাঝে অন্তত শ্বাস নেওয়ার অধিকার ভোগ করত।

সূচক শব্দ :

আশরফ, শরীফ-সমাজ, আতরফ, পর্দা, তালাক

প্রতিপাদ্য বিষয় :

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী'কে বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক উপন্যাস মেনে নিলে বলা যায় বাংলা উপন্যাসের কাহিনির সূত্রপাত মুসলমান চরিত্র ও সমাজকে নিয়েই। মোগল-পাঠান রাজনৈতিক সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসে আয়েষা-ওসমান-কতলু খাঁ'র মত মুসলমান চরিত্র যেমন কাহিনিতে গুরুত্ব পেয়েছে তেমনি মুসলমান সমাজও উপেক্ষিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসগুলিতেও মুসলমান চরিত্র ও সমাজ উভয়ই বর্তমান। কিন্তু এই চরিত্র ও সমাজ সার্বিক মুসলমান ব্যক্তি বা সমাজের প্রতিবিম্ব নয়। এই সমাজ হল ভারতের শাসক পরিবার কেন্দ্রিক মুসলমান সমাজ। যারা আদতে ভারতীয় মুসলমান সমাজের অতিক্ষুদ্র অংশ। কাহিনির প্রয়োজনে এই সমস্ত পরিবারগুলির ছবি উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে, কেননা এই রাজপরিবারগুলি তথা এই নবাব-আমীর-ওমরাহ্‌দের সমাজ বাদ দিলে মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কাহিনি রচনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই

এই সকল উপন্যাসে ক্ষুদ্রতর অভিজাত মুসলমান সমাজ থাকলেও, সাধারণ বৃহত্তর মুসলমান সমাজ উপেক্ষিত রয়ে গেছে। মুসলমান সমাজের কথা বললেই নারীর প্রসঙ্গ আসে। মুসলমান সমাজে পুরুতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা নারী অনেক বেশি অবহেলিত, অত্যাচারিত বলেই সাধারণ এই ধারণা প্রচলিত হয়ে আসছে। মুসলমান নারীর এই অবসহা বাংলা উপন্যাসেও কম-বেশি বর্ণিত বা চিত্রিত হয়েছে। মুসলমান সমাজকে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে দুটি ভাগ করতে পারি প্রথমতভাগ, উচ্চবিত্ত-উচ্চবংশীয় মুসলমান সমাজ। দ্বিতীয়ভাগ, দরিদ্র-নিম্নবিত্ত নিম্নবংশীয় মুসলমান সমাজ। স্বাধীনতার আগে বাংলা উপন্যাসে যতটুকু মুসলমান সমাজ এসেছে তা প্রথমস্তরের সমাজ। ইসলাম ধর্মে বর্ণবিভাজন না থাকলেও ভারতীয় মুসলমান সমাজে বংশ-মর্যাদাভেদ ছিল। বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত্য মুসলমান সমাজে 'আশরফ' ও 'আতরফ' বিভাজন স্পষ্ট ছিল। 'আশরফ' হল উচ্চবংশীয় মুসলমান যারা ভারতের বাইরে থেকে এদেশে এসেছিল এবং তারাই ছিল শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ বাদশাহ-নবাব-আমীর-ওমরাহ ও তাদের পরিবার। তারা সংখ্যায় নগন্য হলেও ভারতীয় মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করত। দ্বিতীয় অংশটি ছিল আতরফ মুসলমান যারা এদেশীয়, ধর্মান্তরিত মুসলমান। তারা সংখ্যায় অধিকাংশ হলেও ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেত না। এই দুই সমাজ ধর্মীয়ভাবে অভিন্ন হলেও উভয়ের স্পষ্টত পৃথক সমাজ ছিল। প্রথমভাগটি যেমন বিদেশি এবং শাসক বলে নিজেদের উচ্চবংশীয় বা 'খানদানী' বলে মনে করত তেমনি তারা ছিল অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল। দ্বিতীয়ভাগটি এদেশীয় এবং শাসিত সমাজের তাই বংশ কৌলিন্য যেমন ছিল না, তেমনি তারা ছিল অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। উচ্চবংশীয় মুসলমান সমাজ ও নিম্নবংশীয় মুসলমান সমাজের মধ্যে যেমন অর্থনৈতিক দূরত্ব ছিল তেমনি সাংস্কৃতিক ভিন্নতাও বর্তমান ছিল। তাই উভয় সমাজের নারীর অবসহাও ভিন্ন ছিল।

নবাব-আমীর-ওমরাহ পরিবারে নারীদের অবসহা তথৈবচ ছিল না। নারীরা যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। পর্দার প্রচলন থাকলেও তা অতিকঠোর 'অবরোধ প্রথা' হয়ে বজায় ছিল না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণেই তারা পুরুষ ও নারীর পৃথক ব্যবসহা বজায় রাখতে পারত। সে ক্ষেত্রে নারীরা নিজেদের অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দে রাখতে পারত। আমীর-ওমরাহ পরিবারের মহিলারা নিজেদের অন্তঃপুর ব্যবস্থার মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ পেত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে এই বিষয়টি বেশ স্পষ্টত প্রকাশ করেছেন। মীরকাশিমের স্ত্রী দলনী বেগমকে আমরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান গাইতে এবং ফার্সী পুস্তক পাঠ করতে দেখি। "তখন, সুন্দরী (দলনীবেগম) এক ক্ষুদ্র বীণা লইয়া তাহাতে ঝংকার দিল, এবং ধীরে ধীরে, অতি মৃদুস্বরে, গীত আরাম্ভ করিল"[১] দলনী বেগমের এই সঙ্গীতচর্চা নিছক কাকতালীয় নয়। মধ্যযুগের নবাব-আমীর পরিবারে সংস্কৃতি-চর্চার একটা পরম্পরা চলমান ছিল। যার সাক্ষ্য বঙ্কিম পরবর্তী উপন্যাসেও আমরা লক্ষ করি। নবাব পরিবারের মত বাংলার সামন্ত মুসলিম

রাজাদের পরিবারেও এই সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে অভিজাত মুসলমান পরিবারে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। নবাব পরিবারের মত বাংলার ছোট ছোট সামন্ত শাসকের কন্যারা সঙ্গীতচর্চায় পারদর্শী ছিল, তাদের পরিবার থেকে সঙ্গীতে উৎসাহ দেওয়া হত। শাসক-পরিবারের মেয়েদের যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হত। বারভুইয়াঁর অন্যতম শাসক ঈসা খাঁর কথায় “সম্ভ্রান্ত বংশের সকল স্ত্রীলোককেই যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হয়। আগে এ প্রথা আরও বেশি ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এসে মুসলমানরাও কেমন বিলাসী, অলস ও দুর্বল হয়ে পড়েছে।”[২] ঈসা খাঁর বোন ফাতেমা সেতারসহ প্রত্যহ সঙ্গীতচর্চা করত এবং পরিবারের সকলে ওই সঙ্গীত আসরে সামিল হত। তারা পরিবারের নারীদের সঙ্গীতচর্চা ও ফার্সী কাব্যচর্চাকে নবাবী সংস্কৃতির অঙ্গ বলেই মনে করত। নবাবী আমলের পড়ন্ত বেলায় ইংরেজ আমলে এই সকল নবাবের বংশধরদের মধ্যে রক্ষণশীলতা বাড়তে থাকে। ছোট-বড়-মাঝারী মুসলিম জমিদারেরা তারা ধর্মকে অনেক রক্ষণশীল করে তোলে। এই সময় থেকেই উচ্চবংশীয় মুসলমান পরিবারগুলি নিজেদের ‘আশরফ’ বা প্রচলিত ভাষায় ‘শরীফ’ পরিবার বলে নিজেদের জাহির করতে শুরু করে। সাধারণ মুসলমানদের থেকে এই মধ্য-অর্থনীতি সমৃদ্ধ পরিবারগুলির সামাজিক দূরত্ব তৈরী হয়েছিল। রক্ষনশীল ‘শরীফ’ সমাজ যেমন সাধারণ মুসলমানদের সংসর্গ এড়িয়ে চলত তেমনি নিজেদের পরিবারের নারীদেরও রক্ষণশীলতার বাঁধনে আটকা রেখেছিল। এই সমাজের পুরুষরা যেমন নারীর জীবনচর্চার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ছিল তেমনি এই পরিবারের নারীরাও জাতি বা বংশমর্যাদার প্রশ্নে রক্ষণশীল ছিল। নারীরা নিজেদের বংশ-কৌলিন্য জাহির করতে গিয়ে অনেক সময় অমানবিক আচরণ করত। শরীফ ঘরের বিবি-কন্যারা নিচু আতরফ বা অ-শরীফ ঘরের মেয়ে-বউদের শুধু নিচু চোখেই দেখত না নিতান্তই অযোগ্য ও বাঁদী-দাসীর সমতুল মনে করত। তাই তাদের সঙ্গে একপাতে বসে খেত না। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম জমিদার পরিবারগুলির মহিলারা নিজেদের পুরুষদের মতই জাতিগর্বে বলিয়ান ছিল। সৈয়দ সাহেব তেমনি এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার তিনি নিজের গৌরব প্রচারে তালুক বিক্রি করে এক প্রকান্ড মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে তাঁর নিকট-সুদূর সকল আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করেন। এই আমন্ত্রণ বাড়িতে মুসলিম নারীদের রক্ষণশীল জাতিভেদ মানসিকতা প্রকট হয়ে ওঠে-“রাবিয়ার পিতামহ দ্বিতীয়বার যে বিবাহ করিয়াছিলেন, সে বিবি একটু নীচু ঘরের মেয়ে- রাবিয়ার পিতা তাঁহারই তাঁহারই গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া শরীফাবাদের এক বিবি কহিলেন, “হুঁ, সে আমি চা’ল চলন দেখে আগেই ঠাউরেছিলাম!” এবং সৈয়দ সাহেবের বড় বিবিকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বেয়ান সাহেব, রাবিয়ারা কি আমাদের সঙ্গে এক দস্তরখানে ব’সবে?” বড় বিবি কহিলেন, - “না, না, ওরা কেন ব’সবে? ওরা খাদিমী ক’রবে ‘খন।”[৩] নারীদের এই রক্ষণশীলতা নিজ নিজ পরিবারের পুরুষদের থেকেই নিঃসৃত। এর কারণ এই ‘শরীফ’

পরিবারগুলি নিজেদের প্রবল আত্মঅহংকারে মত্ত হয়ে নিজেরা এবং পরিবারে নারীদের শিক্ষা থেকে দূরে রেখেছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতি বর্জিত পর্দার ঘেরাটোপে নারীরাও ক্রমশ নিজেদের নিজস্ব রক্ষণশীল মানসিকতায় আবদ্ধ করে ফেলেছিল। বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষা একেবারেই ছিল না বললেই চলে। সাধারণ মুসলমান পরিবারে পুরুষদেরও পড়াশোনার প্রচলন না থাকলেও অভিজাত-'আশরফ' পরিবারের পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল বটে কিন্তু এই পরিবারের নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। তখনও শিক্ষা বলতে 'শরীফ' মুসলিম সমাজে সীমাবদ্ধ কিছু ধর্মীয় শিক্ষা প্রচলিত ছিল। আর নারীদের মধ্যে সেই সীমাবদ্ধ শিক্ষাও আরও সঙ্কুচিত ছিল। নারীদের ধর্মীয় উপাসনার জন্য আবশ্যিক কিছু বিষয় ও পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থপাঠের জন্য আরবী বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হত। মহিলাদের শুধু পড়ার অধিকারের বাইরে অন্য শিক্ষার কথা ভাবাই যেত না। বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও মুসলিম অভিজাত সমাজ মনে করত "জানানাদের পক্ষে লেখা-টেখা হারাম।"[৪] শিক্ষা পদ্ধতির দুটি অঙ্গ লেখা ও পড়া। একটি অংশকে বাদ দিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু মুসলিম মহিলাদের লেখার অধিকার কেড়ে নেওয়ার ফলে তারা 'ঠুঁটো' হয়ে পড়েছিল, আরবী-ফার্সী শুধুমাত্র পড়ার অধিকারে তাদের ক্ষীণদৃষ্টি শক্তি ছিল বটে কিন্তু পড়ার ক্ষেত্রটিও সরল ও সহজ ছিল না। সাধারণ মুসলিম নারীদের ধর্মীয় শিক্ষার অধিকার থাকলেও সুযোগ ছিল না। আশরফ বা 'শরীফ' বাড়ির মেয়েরা 'দ্বীন-তালিমের' অধিকার পেত বটে তবে তাতেও নানা শর্ত ও বিধি নিষেধ জুড়ে থাকত। আট বছরের নিচের মেয়েরাই সার্বিকভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারত। তার থেকে বেশি বয়সের মেয়েদের পুরুষ-মৌলবীর কাছে পাঠানো নিষিদ্ধ ছিল। তবে বৃদ্ধ ও অতিপরিচিত মৌলভীদের সেই সুযোগ দেওয়া হত। "মৌলবী সাহেব একে বৃদ্ধ, তাহাতে বহুকাল যাবৎ এ বাটিতে বাস করিয়া এক্ষণে একরূপ বাটীর লোকের মধ্যেই গন্য হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া আট বৎসরের অধিক বয়স্কা বালিকাদিগকে 'সবক' দিবার অধিকারটুকু প্রাপ্ত হয়েছেন।"[৫] অভিজাত মুসলিম সমাজে নারীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্দাকে ব্যবহার করা হত। পর্দা প্রথার নামে 'আশরফ' বা অভিজাত মুসলিম পরিবারগুলিতে নারীদের উপর পুরুষের নির্মমতাও বজায় ছিল। ধর্মকে ব্যবহার করে পুরুষ, নিজ নিজ পরিবারের নারীদের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা শুধু করেনি বরং নারীকে নিজের দাসীতে পরিণত করেছিল। মৃত্যু শয্যায় পিতাকে দেখতে যেতে শ্বশুরবাড়ির পরিবার অনুমতিও সহজে দিত না। অজুহাত স্বরূপ তারা ধর্মকেই ব্যবহার করত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মীয়ভাবে 'বৈধ' পুরুষের অভাব দেখিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়া নাকচ করা হত। হালিমা যেমন 'আশরফ'-পীর পরিবারের মেয়ে তেমনি 'আশরফ' ও জমিদার পরিবারে পুত্রবধূ। তবে বংশ মর্যাদার সমান হলেও পিতার পরিবার দরিদ্র কিন্তু শ্বশুরবাড়ি জমিদার। তাই অর্থনৈতিক ভিন্নতা বর্তমান। পিতার শেষ অবসহায় হালিমার দাদা আবদুল্লাহ

চিঠি পাঠালেও হালিমাকে পাঠানো হয় নি কারণ হালিমার স্বামী বাড়ি ছিল না। পর-পুরুষের সাথে ঘরের বউকে কোথাও পাঠানো শরিয়ত বিরোধী। অন্যদিকে হালিমার ননদ সালেহা আবদুল্লাহ-র স্ত্রী। সে বাপের বাড়িতেই থাকে, শ্বশুরকে শেষ অবস্থায় দেখতে তাকেও অনুমতি দেওয়া হয় নি। অজুহাত অভিন্ন। আব্দুল্লাহ তার বড় শ্যালক আব্দুল মালেককে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে ধর্মীয় কারণকে হাজির করে। "আবদুল মালেক একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়া কহিল, "বাঃ, কেমন করে পাঠাই? আবদুল কাদের তখন বাড়ী ছিল না, আব্বাও ছিলেন না, কার হুকুমে ধরগে তোমায় পাঠাই!"

আবদুল্লাহ্ একটু শ্লেষের সহিত কহিল, "হ্যাঁ বাপ মরে, এমন সময় তো হুকুম ছাড়া পাঠান যেতেই পারে না। তা হালিমা আপনারদের বউ, তাকে না হয় আটকে রাখলেন কিন্তু আমার স্ত্রীকে পাঠালেন না? তার বেলায় তো কারুর হুকুমের দরকার ছিল না।"

"কার সঙ্গে পাঠাব? বাড়ীতে আর কেউ ছিল না, আমি তো আর ধরগে তোমার বাড়ী ফেলে যেতে পারি নে!"

"কেন, আবদুল খালেকের সঙ্গে পাঠালেই তো হ'ত।"

আবদুল মালেক যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়িল। বলিল, "সে কি! তার সঙ্গে? সে হ'ল ধরগে তোমার 'গায়ের মহরুম'..."[৬]

'গায়ের মহরুম' বলতে বোঝায় যার সাথে বিবাহ করা বৈধ। আর যার সাথে বিবাহ বৈধ তার সামনে পর্দা ছাড়া নারীর অবসহান অবৈধ। ধর্মীয় এই নির্দেশ 'শরীফ' মুসলমান সমাজের কাছে মান্য করা ভক্তির জন্য নয় বরং নারীকে নিয়ন্ত্রণের একটি পন্থা বলেই ব্যবহৃত হত। যারা 'গায়ের মহরুম' রীতির জন্য নারীকে পিতৃগৃহে যেতে দিত না তারাই নিজ গৃহের পরিচারিকাদের 'বেপর্দা' করে রাখত। ধনী আশরফ পরিবারে বাঁদি বা চাকরানীর ব্যবস্থা ছিল যারা পুরুষ মনিবদের সামনে আসত, সেবা করত এমনি কি পুরুষ অতিথিদেরও সেবা করত। "আবদুল্লাহ দস্তরখানে গিয়া বসিল। একটা বাঁদী সেলামচী লইয়া হাত ধোয়াইতে আসিল। তাহার পরিধানে একখানি মোটা ছেঁড়া কাপড়, তাহাতে এত ময়লা জমিয়া আছে যে বোধহয় কাপড়খানি ক্রয় করা অবধি কখনো ক্ষারের মুখ দেখে নাই!"[৭] ধর্মে সকল প্রকার নারীদের পর্দার কথা বলা হলেও অভিজাত মুসলিম পরিবার চাকরানি বা বাঁদীদের জন্য পর্দার ব্যবসহা করে নি। কারণ বাঁদীরা নারী হলেও তাদের ভোগ্য বলেই বিবেচিত হত। এই বাঁদিরা শুধু গৃহসহলীর কাজ করে, প্রভুদের সেবা দেয় তা শুধু নয়, প্রভুদের মনোরঞ্জনকারী বাঁদী বা সুন্দরী বাঁদীদের তারা বিবাহ করা অভিজাত পুরুষদের স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। যেমন করে আবদুল কুদ্দুস তার এক বাঁদীকে বিবাহ করে ছিলেন তেমনি কুদ্দুসের ছেলে আবদুল মালেকও গোলাপী নামে এক বাঁদীকে বিবাহ করেছে। এই পরম্পরা চলতেই থাকে। বিবাহের পরেও বাঁদী পূর্ণ স্ত্রী মর্যাদা পায় না, তেমনি বাঁদী-

পুত্র-কন্যা সাধারণ সন্তানের মত সম্মান সুযোগ সুবিধা পায় না। "আবদুল কুদ্দুস প্রথম বয়সে একটি বাঁদীকে নেকাহ করিয়াছিলেন, তাহারই গর্ভে খোদা নেওয়াজের জন্ম হয়। খোদা নেওয়াজই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কিন্তু সে বাঁদী গর্ভজাত বলিয়া বিবি-গর্ভজাত কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে 'বড় মিঞা সাহেব', 'মেজ মিঞা সাহেব' ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতে হয়।"[৮] কাজেই নারী ছিল অভিজাত মুসলিম সমাজের কাছে নিছক ভোগ্য ও নিয়ন্ত্রণাধীন এক মানবগোষ্ঠী। পর্দা ছিল নারীদের নিয়ন্ত্রণের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। পর্দা প্রথার সাথে গোঁড়ামি মিশে গিয়ে মুসলমান সমাজকে যে দুরাবস্হার মধ্যে ফেলেছিল তাতে নারীদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধংস্ব হয়ে গিয়েছিল। নারীর চিকিৎসা করালে পর্দার নিয়ম লঙঘন হয় এই কারণেই পুরুষ চিকিৎসকের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলত। যদিও বিপাকে পড়ে কবিরাজকে চিকিৎসার জন্য আনা হত তাতেও যে বিচিত্র পরিসিহতির সৃষ্টি হত তা চিকিৎসার জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়ত, হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হত। জমিদার পুত্র-বধূ হালিমা অসুস্হ। তার চিকিৎসার জন্য গ্রামের এক বৃদ্ধ কবিরাজকে ডেকে আনা হল। "রোগিনী মশারীর ভিতর রহিল, তাহার পার্শ্বে একটা দোহারা মোটা রঙ্গিন কাপড়ের পর্দা লটকান হইল। পর্দার ভিতরে হালিমার মাতা, শাশুড়ি এবং আরও দুই একজন স্ত্রী-পরিজন রহিলেন। কবিরাজ আসিয়া পর্দার বাহিরে বসিলেন এবং রোগিনীর অবস্থা সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আবদুল কাদের এক একটি প্রশ্ন শুনিয়া পর্দার ভিতর যায় এবং একটু পরে আবার বাহিরে আসিয়া উত্তরটি কবিরাজ মহাশয়কে শুনায়। এই রূপে মোটামুটি অবস্থা জানিয়া তিনি একবার রোগিনীর হাত দেখিতে চাহিলেন। আবদুল কাদের ভিতরে গিয়া পর্দার একপ্রান্ত সামান্য একটু উঁচু করিয়া ধরিল এবং কবিরাজ মহাশয়কে হাত বাড়াইয়া দিতে কহিল। কবিরাজ মহাশয় পর্দার ভিতর হাত বাড়াইয়া দিলেন; আবদুল কাদের তাঁহার হাতের তিনটি আঙুল ধরিয়া হালিমার বাম হস্তের কবজির উপর ধরিয়া রহিল;"[৯] পশ্চিমা চিকিৎসা ব্যবস্থা তখন মুসলিম নারীদের জন্য সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। কেননা এই ব্যবসহায় ডাক্তার, পর-পুরুষ হয়ে শরীফ বাড়ির বধূর চিকিৎসা করবে, যেখানে নাড়ি পরিক্ষা করতে রোগিণীর হাত ধরতে ধরবে, বুক পরিক্ষা করতে বুকে কল (স্টেথিস্কোপ) বসাবে এবং প্রয়োজনে রোগিণীর অনাবৃত শরীরে ইনজেকশন দেবে। তাই এই চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হারাম। অথচ কোন মুসলিম নারীকে ডাক্তার করাও নিষিদ্ধ ছিল কেননা সেক্ষেত্রেও নারীর আব্রু-ইজ্জত নষ্ট হয়। ফলে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ থাকলেও আধুনিক চিকিৎসার অভাবে 'শরীফ' পরিবারের অনেক নারীই মারা যেত। তবে চিকিৎসার এই রক্ষণশীলতা ক্রমশ ক্ষীণ হতে শুরু করে। অনেক অভিজাত মুসলিম পুরুষ ইংরেজের সান্নিধ্য লাভ করার ফলে তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা-চিকিৎসাসহ নানা ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকে। অনেক অভিজাত 'শরীফ'কর্তা ক্রমশ অনুধাবন করলেন যে, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবসহার সাথে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। এই ধারণার প্রসারে অভিজাত

মুসলমান পরিবারে চিকিৎসার প্রয়োজনে নারীর পর্দা ক্রমশ শিথিল হতে লাগল। পুরুষ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা মহিলাদেরও শুরু হল। হাফেজ সাহেব রক্ষণশীল পরিবারের উচ্চবংশীয় কর্তা। তবে তিনি ধার্মিক হলেও অন্ধ-রক্ষণশীল নন। আধুনিক ব্যবসহার তাগিদ অনুভব করতেন। তাই নিজের যুবতি কন্যা অসুসহ হলে ইংরেজ-সাহেব ডাক্তার ডাকলেন এবং মেয়েকে টেথেস্কোপ দিয়ে 'বুক পরিক্ষার' অনুমতি দিলেন। "বৃদ্ধ ঝি কম্পিত হস্তে কোনমতে স্টেথেসকোপ যন্ত্রমূল তাঁহার বক্ষস্থলে বসাইতে পারিতেছে না দেখিয়া, মোমেনা নিজে ঝির হস্ত হইতে যন্ত্রটি লইয়া বক্ষের তিন চারি স্থানে স্থাপন করিতে লাগিল। শেযে তাহার পিতা মোমেনার হস্ত হইতে লইয়া, তাহার পৃষ্ঠের ২/৩ যায়গায় লাগাইতেই ডাক্তার সাহেব বলিলেন ...।"[১০] পূর্বের মত চিকিৎসার জন্য নারীর পর্দার ঘেরাটোপ উঠে গেল, বুক পরিক্ষার অনুমতি জুটল, তবে ডাক্তারের পরিবর্তে পরিবারের কোন নারী বা পুরুষ রোগিণীর বুকে যন্ত্র বসানোর অনুমতি পেত। এইভাবে চিকিৎসা সংক্রান্ত রক্ষণশীলতা মুসলমান সমাজ থেকে ক্রমশ দূর হল।

নারী চিরকাল পুরুষ অনুগামী ও ভীতু। তারা বিবাহিত জীবনকে যেমন ভালোবাসে তেমন বিবাহ বিচ্ছেদকে ভয় করে। নারীর এই ভয় তার প্রধান দুর্বলতা। পুরুষ নারীর দুর্বলতাকেই ব্যবহার করে, মুসলিম পুরুষ সমাজও তার অন্যথা নয়। মুসলিম নারীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পুরুষ 'তালাক'কে ব্যবহার করত। ইসলামে বিবাহ-বিচ্ছেদের সহজ ও সরল নিয়মাবলী পুরুষ নিজেদের স্বার্থে তথা নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে, অসৎ উপায়ে ব্যবহার করত। বেগম রোকেয়া তৎকালীন মুসলিম সমাজের এই ব্যবস্থা ও তালাকের অপব্যবহার তাঁর উপন্যাসেও প্রকাশ করেছেন। সিদ্দিকা অভিজাত পরিবারের এক প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টারের স্ত্রী, স্বামীর প্রতি তাঁর প্রেমের কোনো ঘাটতি ছিল না। বিলাতে উচ্চশিক্ষা পাঠরত স্বামী একদিন স্ত্রী রাফিকাকে 'ইনসিয়োর করা' পত্র ডাকযোগে পাঠালেন। সিদ্দিকা স্বামীর পত্র বিধিমত স্বাক্ষর করে গ্রহণ করলে "তিনি পত্রের মোড়ক খুলিয়া দেখিলেন, তাহা সুবিস্তৃত ত্যাগপত্র (তালাকনামা)। তিনি ত্যাগপত্র দিয়াছেন, ইনি স্বাক্ষর দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন-সুতরাং তাঁহাদের বিবাহসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল!! এইরূপে ১৩ বৎসরের বিবাহবন্ধন কলমের এক আঁচড়ে শেষ হইল! তিনি ইংলন্ড হইতে মেম লইয়া আসিলেন, রাফিকা পাগল হইয়া গেলেন?"[১১] তালাকের ভয় নারীদের স্বামী অনুগামী করে রাখত সন্দেহ নেই। সেই ভয়েই স্বামীর সকল কর্ম-অপকর্ম মুখ বুজে সহ্য করতে হত। স্বামীর অনুগত থাকলে সমাজে তার খ্যাতির শেষ নেই। স্বামীর সকল দোষকেই মেনে নিয়ে থাকার নাম পতিব্রতা নারী। মীর সাহেব বৃদ্ধ বয়সে যুবতি দৌলতননেসাকে বিবাহ করে শ্বশুরের সম্পত্তির মালিক হয়ে যান। তারপর নতর্কীসহ আমোদ প্রমোদে দিন কাটাতে থাকেন। রূপসী নামক এক নর্তকীর প্রতি মীর সাহেব অনুরক্ত। দৌলতননেসা স্বামীর এই কাজে বাধা হন না। প্রতিবেশির কথায় কান দেন না। স্বামীর প্রতি তার ভক্তিতে

কোনো কমতি নেই তাই তিনি সমাজের চোখে এক অসাধারণ মহিলা। বসীরদ্দীনের কথায়, "এমন মেয়ে হয় নাই। একালে কেউ এমন দেখে নাই। বাপরে বাপ! তারই সকল, তারই বাড়ি, তারই বৈঠকখানা, ভাব দেখি সে কেমন মেয়ে?"[১২] স্বামীর অনুবর্তী হয়ে, স্বামীর সকল কর্ম নিরবে অনুমোদন করার নাম 'সতীত্ব' তথা 'আওরাতে হাসিনা'। পরিবার ও সমাজে সর্বত্র এই সকল নারীর জয়গান গাওয়া হত। অর্থাৎ নারীকে যে কোন পরিস্থিতিতেই পুরুষের আনুগত্য করতে হত। নারীর নিজ সিধান্ত নেওয়ার অধিকার সমাজ অনুমোদিত ছিল না। অভিজাত 'শরীফ' পরিবারের মহিলারা পর্দার অবরোধে, সতীনের সহচরী হয়ে, তালাকের আতঙ্কে, শিক্ষাবর্জিত জীবন অতিবাহিত করত।

'আতরফ' বা এদেশীয় দরিদ্র মুসলমানের সমাজ, 'শরীফ' মুসলমানদের সমাজ থেকে ভিন্ন ছিল। যদিও স্বাধীনতার আগের বাংলা উপন্যাসে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ 'আতরফ' মুসলমানের সমাজ উপেক্ষিত রয়ে গেছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কয়েকটিমাত্র উপন্যাসে সাধারণ মুসলমান নারীর জীবন- ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ মুসলমান পরিবারে নারীর মূল সমস্যা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের। হতদরিদ্র গ্রাম্য অথবা বস্তিবাসী মুসলমানের মধ্যে পর্দা ছিল না। তারা পর্দা প্রথাকে বিশ্বাস করত কিন্তু পর্দা পালনের সাধ্য তাদের ছিল না। দারিদ্রের সাথে সাধারণ মুসলমানকে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হত, অন্নের সংস্হানে পুরুষের সাথে নারীকেও হাত মেলাতে হত, তাই পর্দা, আব্রু ইত্যাদি শব্দ বা ধারণা তাদের জীবনে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। জেলে বস্তির সাধারণ মুসলমান তবুও চেষ্টা করে নারীদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে কিন্তু "মেয়েদের বাহিরে না আসিলে চলে না। নদীতে জল আনিতে যাইতে হয়, পুরুষেরা কেহ বাড়িতে না থাকিলে দোকানে সওদা আনিতে যাইতে হয়। বাড়ির আনাচেকানাচে লাউ কুমড়া ফলিলে, মুরগিতে ডিম পাড়িলে, গ্রামে গিয়া বেচিয়া আসিতে হয়।"[১৩] কাজেই দরিদ্র মুসলমান সমাজ তার নিজস্ব রীতিতেই চলে, প্রয়োজনের তাগিদে তারা পর্দা করে আবার পর্দা বর্জন করে জীবনকে সহজ করে নেয়। ধর্মীয় বিধি নিষেধের থেকে তারা জীবনের প্রয়োজনকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। অন্নের অনিশ্চয়তার সাথে জুড়ে ছিল স্বাসহ্য-চিকিৎসার অনিশ্চয়তা। তাই সুযোগ মিললে 'শরীফ' নারীদের মত বেগানা-পুরুষ ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসা নিতে তাদের বাধা ছিল না। কাজেই নারীদের অবাধে যেমন হাতুড়ে পুরুষ ডাক্তার চিকিৎসা করত তেমনি মুসলিম পরিবারের নারীদের ডাক্তারসহ অন্য পুরুষদের সঙ্গে কথা বলা, রঙ্গ-রসিকতায় বাধা থাকত না। কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের চাঁদবাজারের বস্তিবাসী মুসলমান। বংশকৌলিন্যে যেমন নিম্নশ্রেণির তেমনি অর্থনৈতিক অবস্থায় নিম্নতম শ্রেণির। 'নুন-আন্তে পান্তা ফুরায়' অবসহার এই মুসলমানদের কোনো কোনো দিন পান্তাও জোটে না। দরিদ্র পরিবারের বিধবা 'সেজ বৌ' মরণাপন্ন। তার চিকিৎসা করতে নকড়ি ডাক্তার আসে। "নকড়ি ডাক্তার বোধহয় ততক্ষণে মোজো-বৌয়ের ইশারার মানে

বুঝে নিয়েছিল। ... মেজ বৌ ডাক্তার শুনতে পায় এমনি জোরেই বলে উঠল 'আখার বাসি ছাইগুলোর কিনারা হল দেখে! বলেই একটু হেসে আবার বলে উঠল, 'যেমন উনুন মুখো দেবতা, তেমনি ছাই পাঁস নৈবেদ্যি!"[১৪] এই সমাজে পুরুষের মত নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকলেও অর্থনৈতিক দুরাবস্থা তাদের অনেকটাই স্বাধীনতা দিয়েছে। স্বামীর মতই তারা পরিবারের অন্ন সংসহানের জন্য পরিশ্রম করে তাই হয়ত স্বামীর উপর তাদেরও কথা চলে। স্বামীর পূর্ণ অনুগামী বা দাসী হয়ে জীবন কাটাতে হয় না। তারা স্বামীর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে, ঝগড়া করতে পারে, আবার স্বামীর দ্বারা শারীরিক নির্যাতনও সহ্য করতে করে থাকে। সাধারণ দরিদ্র মুসলমান সমাজে নারী, পুরুষের কঠিন ঘেরাটোপ থেকে অনেকটা মুক্ত। তবে এই সমাজও রক্ষণশীলতামুক্ত নয়। এই রক্ষণশীলতা অভিজাত মুসলমান সমাজের কৌলিন্যের কারণে নয় বরং লৌকিক বিশ্বাস ও প্রতিবেশির কারণে। প্রতিবেশির বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনে নারী নিজেদের সংস্কারে আবদ্ধ করে রাখে। পর্দার শৈথিল্যের মাঝেও 'শরীফ' মুসলমান সমাজ থেকে তুলনামূলক কম হলেও এই সমাজেও সতীন সমস্যা, তালাক সমস্যা নারীকে অতিষ্ঠ করে। তবে বিধবা মুসলিম নারী এই সমাজে অপাঙক্তেয় হয়ে যায় না। তাদের পারিবারিক গুরুত্ব বজায় থাকে। বিধবার পর যতদিন পুনঃবিবাহ না হচ্ছে সে স্বামীর পরিবারেই স্বাচ্ছন্দে থাকে। বিধবার বিয়ে নিয়েও সাধারণ গরীব মুসলমান সমাজে রক্ষণশীলতা নেই। বরং গৃহবধূকে পরের বাড়ির বউ না হয় সেই চেষ্টাই করা হয়। বিধবার বিয়ে সাধারণত শ্বশুরবাড়ির পরিবারেই হয়ে যায়। দেওরের সাথে বিধবা বৌদির বিয়ে সাধারণ মুসলমান সমাজে সহজ ব্যাপার। বিধবা মুসলমান নারীর বৈধব্য দশা কাটাতে তাই বিশেষ সমস্যায় পড়তে হয় না। চাঁদ সড়কের মুসলিম বস্তির পাঁকালের মেজদাদা সোভান যুবক বয়সেই মারা যায়। বিধবা মেজবউ দুটি সন্তান নিয়ে শাশুড়ির সংসারে থেকে যায়। এমন অবস্থায় বাড়ির বড়-বউ, পাঁকালে, তার মা আর বোন পাঁচিতে মিলে একটা গোপন পরামর্শসভা বসেছিল। মেজ বউকে পাঁকালের বউ করার বিষয়ে। পাঁকালে তার বউদিকে বিয়ে করতে রাজ্জি হচ্ছিল না। তার মা অনুনয়ের স্বরে বলল, 'রাগ করিস কেন বাবা ? এমন তো সব গরীব ঘরেই হচ্ছে আমাদের। তাছাড়া ওর চাঁদপনা মুখ কিছুতেই ভুলতে পারি নে। এমন বউ পর হয়ে যাবে! আমার কপালই যদি না পুড়বে তাহলে সোভানই বা মরবে কেন, আর তোকেই বা এই উপরোধ করতে যাব কেন ?

পাঁচি মায়ের কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল, 'তা ভাই তোমার এক আশ্চয্যি লজ্জা। অমন তো কতই হচ্ছে! একদিন ভাবী বলেছ বলে বুঝি আর ইয়ে করতে নেই! দুদিন বাঁধবে তারপর আপনি সড়গড় হয়ে যাবে, দেখে নিও।'[১৫] সাধারণ মুসলমান সমাজে দারিদ্রের মাঝে, শত সমস্যা, ঠোকাঠুকি-হাতাহাতির মাঝেও নারী পরিবারে আপন হয়ে থাকে। ধর্মীয় বিধি, সামাজিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নারী নিজের জগৎ তৈরী করে নিতে পারে। তাই এই দরিদ্র নিম্নবংশীয়-মুসলিম সমাজে নারীর

জীবনে কৃত্রিমতা নেই। প্রতিবন্ধকতার মাঝেও নারী বুকভরা শ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. চন্দ্রশেখর,বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রী উপচরণ বন্দোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ-১৮৮৩, কলকাতা, পৃ. ৮।

২. রায়নন্দিনী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী উপন্যাস সমগ্র, ২০০০, ক্যাবকো, ঢাকা, পৃ. ১৭।

৩. আবদুল্লাহ,কাজী ইমদাদুল হক (কামরুল আহসান সম্পাদিত),আফসার ব্রাদার্স, ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ৮৭।

৪. ঐ, পৃ. ২৪।

৫. ঐ, পৃ. ৪৩।

৬. ঐ, পৃ. ১৯-২০।

৭. ঐ, পৃ. ২৩।

৮. ঐ, পৃ. ২৯।

৯. ঐ, পৃ. ২৩।

১০. স্বপ্নদৃষ্টা, নূরন্নেছা খাতুন, নুর কটেজ, ১৩৩০, শ্রীরামপুর, পৃ. ১১৫।

১১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নির্বাচিত রচনা (সম্পাদনা:সেরিনা জাহান), পদ্মরাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ১৫৩।

১২. মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী ৩য় খন্ড (আবদুস সাত্তার সম্পাদিত), নভেম্বর ১৯৬০, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১৩০।

১৩. মানিক বন্দোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, বেঙ্গল পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৩৫৫, কলকাতা, পৃ. ২৯।

১৪. মৃত্যুক্ষুধা, কাজী নজরুল ইসলাম (নজরুল রচনাবলী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ২য় খন্ড) মে, ২০২১ বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩২০।

১৫. ঐ, পৃ. ৩২৯।

বাংলা উপন্যাসে স্বামী বিবেকানন্দ ও অলৌকিকতা

সিদ্ধার্থ দত্ত

সাহিত্যে পাতার পর পাতায় স্বামী বিবেকানন্দ অনন্য। কখনো ব্যক্তিজীবন পরিণত হয়েছে রূপ থেকে অরূপে মানবিক আলো-ছায়ার দ্বন্দ্বে। তিনি শুধু ধর্মীয় মহামানব নন, তিনি মানুষের কল্পনার রাজ্যে ধ্রুবতারা, তিনি আবার মানবতায় চিরভাস্বর। সাহিত্যিকদের কলমে স্বামীজি আমাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আপন মহিমায় সদাজাগরুক। স্বামীজির জীবন, কর্ম, ভাব, ভাবনা হয়ে উঠেছে উপন্যাস সাহিত্যের বিষয় আশয়। স্বামীজি আমাদের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছেন মানবতার কান্ডারীরূপে। মানুষকে যেমন ভালোবেসেছেন, ঠিক তেমনি মানুষকেই কাছে পেতে চেয়েছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে যা বাস্তবের ভূমীতে কোন ব্যখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। লৌকিকতা ছাড়িয়ে অলৌকিক সীমায় তা পৌঁছে গেছে। মহামানব স্বামীজি সেই অলৌকিকতাকে সাদরে বরণ করে নিয়েছেন।

অনেক উপন্যাসিক স্বামীজির ধর্মীয় ভাব ও ভাবনাকে যেমন তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁদের উপন্যাসে, ঠিক তেমনি তাঁদের মতে স্বামীজি হয়ে উঠেছেন কল্পলোকের বাসিন্দা। কিন্তু স্বামীজিও ছিলেন রক্ত মাংসের মানুষ। তিনি বাস্তববাদীও ছিলেন। বাস্তবের মাটিতে ছিল তাঁর বিচরণ ভূমী। আমরা জানি তিনি কোন কিছুকেই সহজে মেনে নিতে পারতেন না। স্বয়ং ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকেও তিনি মেনেছেন অনেক পরীক্ষা করার পরে। কিন্তু তার পরেও রয়ে যায় বাকি কিছু কথা। সেই বাকি কথাই হল স্বামীজিও মাঝে মাঝে অলৌকিক ঘটনাকে যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনি তিনি নিজেও তাঁর জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। যা হয়তো বিচার বা প্রমাণের বাইরে।

স্বামীজি অলৌকিক ক্ষঅমতার অধিকারী হয়েছিলেন আপন গুণে, আপন মহিমায়। জগতে অনেক মহাপুরুষ এসেছেন, শিক্ষায়-দীক্ষায়, কর্মে, ত্যাগে, বীরত্বে, সামাজিকতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতো এমন বহুমুখী প্রতিভা শুধু ভারতবর্ষে কেন, বিশ্বে দ্বিতীয় কোন মহামানবের মধ্যে দেখা যায় না। একজন মানুষের মধ্যে যে কতগুণ থাকতে পারে, তা স্বামীজিকে সামনে রাখলে বোঝা যায়। জগতে আর যে সকল মহামানব ও মহাপুরুষ এসেছেন তাঁরা সকলেই বরণীয়, কিন্তু তাঁদের ধারা

একমুখী। বহুধা বিভক্ত নয়। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, স্বামীজির যদি শুধু অলৌকিক ক্ষমতাগুলিকেই বা তাঁকে কেন্দ্র করে যে অলৌকিক কর্ম ঘটেছে, সেগুলিকেই যদি মনে রাখা যায় তবুও তিনি চিরশ্রেষ্ঠ হয়ে আছেন, থাকবেন। তাই আজও স্বামীজির জীবন ও কর্ম আমাদের কাছে নিত্য আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, এবং চিরকাল এই আকর্ষণ থাকবে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে অন্নপূর্ণা দেবীর 'স্বামী বিবেকানন্দ' (পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থটির কথা। গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য স্বামীজির জীবনের কথা। যে জীবন মানুষের কাছে আজও সমান আকর্ষণীয়। তথ্য ও কাহিনি যথাযথ, তবে কাহিনির মধ্যে রয়ে গেছে অলৌকিক নানা ঘটনা। যে ঘটনার দ্বারা আমরা স্বামীজিকে আরও নতুন করে চিনতে বুঝতে পারি।

স্বামীজি বাল্যকাল থেকেই ঘুমানোর সময় এক অদ্ভুত কান্ড লক্ষ করতেন। বিছানায় শোয়ার সাথে সাথেই তাঁর ঘুম আসত না। যখনই;

'উপুড় হয়ে শুয়ে চোখ বুজলে মনে হত দুই ভুরুর মধ্যে একটি জ্যোতির্বিন্দু জ্বলে উঠত। ঐ বিন্দু বর্ণের সুষমায় ক্রমে বিশ্বর আকারে ফেটে গিয়ে আলোর বন্যা উদ্ভাসিত। তখন সেই মায়া আলোকে ডুবে ডুবে ঘুম আসত। সারাজীবন তিনি এই জ্যোতি দেখেছেন। যা শুনে ঠাকুর বলেছেন, 'এ হচ্ছে ধ্যানসিদ্ধের লক্ষণ'।[১]

এই অলৌকিক ঘটনা আমাদেরকে বিস্ময় করে না। বরং যদি খুব ভাল করে উপলব্ধি করি, তাহলে দেখব এই আলোর বন্যা আগামী দিনকে সূচিত করেছে। নরেনও সমগ্র বিশ্বে মানবিকতার, চেতনার আলোর বন্যা বইয়ে দেবেন আপামার মানুষের মধ্যে। এই ইঙ্গিতই হয়তো এই আলোর বন্যা।

আর একটি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহ রেখেছেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরেও কাশীপুরে ভক্তরা কিছুদিন ছিলেন। তখন সেখানে এক ঘটনা ঘটে;

'একদিন বাগানে অন্য একজন গুরু ভাইর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে নরেন্দ্রনাথ গুরুদেবের দর্শন পান। চোখের ভুল ভেবে তিনি কিছু বললেন না। কিন্তু গুরুভাই বললেন, 'নরেন দেখ দেখ'।[২]

অর্থাৎ স্বামীজির যে চোখের ভুল ছিল না, তা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু গুরুর দেহত্যাগের পর তাঁর দর্শন পাওয়া নরেনের কাছে কিছুমাত্র আশ্চর্যের ছিল না। কারণ তিনি জানতেন, ঠাকুর তাঁর সঙ্গেই আছেন প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ক্ষণে। তাই আমাদের যা কাছে যা হয়তো অলৌকিক, নরেন্দ্রনাথের কাছে হয়তো লৌকিক।

উক্ত গ্রন্থে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ আছে। সেটি হল, একদিন প্রাণায়াম সম্পর্কে কিছু জানতে আগ্রহী দুজন ব্যক্তি স্বামীজির কাছে জানতে চায়। তারা কিছু বলার আগেই স্বামীজি তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিলেন, এবং দীর্ঘক্ষণ এ নিয়ে আলোচনাও করেন। তারা হতবাক হয়ে যায়;

'মনের কথা এমনভাবে অজ্ঞাতে জেনে উত্তর দেওয়ায় তারা অবাক। এই বিষ্ময় প্রকাশের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি এ-রকমে জেনে নিয়ে বলতে পারি'-এমন কি জাতিস্মরের মতো তিনি পূর্বজন্মাদির কথাও জানেন, বললেন'।[৩]

এই গ্রন্থে লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন, কলকাতাতে থাকার সময় স্বামীজির হঠাৎ স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায়, তিনি দার্জিলিং গেলেন। সেখানে মিস্টার এম. এম. ব্যানার্জির বাড়িতে উঠলেন। সেখানে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে;

'মতিলাল মুখোপাধ্যায় নামে একজন সে বাড়িতে বাস করছিল। একদিন তার ভীষণ জ্বর। বিকারে ভুল বকছে।

স্বামীজি তার ঘরে ঢুকে মাথায় হাত দিতে মন্ত্রের মতো জ্বর উবে গেল। একটুই বাদেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে বসল'।[৪]

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' গ্রন্থটির কথা। উক্ত গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্য মানবতার প্রতিমূর্তি। নরেন থেকে বিবেকানন্দের চলমান কাহিনিকে তিনি বর্ণনা করেছেন ভাবের সাথে আবেগকে সামনে রেখে। আর তার মধ্যেই রয়ে গেছে অলৌকিক কিছু ঘটনার বিবরণ। যেমন ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছে, সে যায় ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর যেমন তাঁকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন। নরেনও ঠিক সেইরকম ঠাকুরকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। একদিন সিমলায় রাম দত্তের বাড়িতে ঠাকুর এসেছেন। সেখানে নরেন নেই। রামবাবু বলেন, নরেনের অসুখ করেছে। ঠাকুর তাঁকে আনার জন্য বললে কালিপ্রসাদ আর নিরঞ্জন নরেনের বাড়ি যায়। গিয়ে দেখে নরেন মাথা যন্ত্রণায় অস্থির, তাকাতে পারছে না। সে যাবে কি করে? কিন্তু দুই বন্ধু জোর করে নরেনকে নিয়ে যেতে চায়। তখন নরেন চোখে বাঁধন দিয়ে দুই বন্ধুর হাত ধরে ঠাকুরের কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। লেখক লিখছেন;

'অন্ধের মত চোখ বন্ধ করে হাঁটি বা মোহান্ধের মত খোলা চোখের অহঙ্কারে, জানি প্রভু, তোমারই ডাকে চলেছি, চলেছি তোমারই দুয়ারে। পথ জানি আর না-জানি, পথই আমাকে পথ দেখাবে। পথে যখন একবার নেমে পড়েছি তখন জানি তুমিই পথ ভেঙে আসবে এগিয়ে, পথের দৈর্ঘ্য কমাবে, ক্লান্তি কমাবে। তুমি ত শুধু পথের শেষ নও, তুমি যে পদে-পদে।

নরেনকে দু-বন্ধু হাজির করল ঠাকুরের কাছে। সামনাসামনি বসিয়ে দিল।

'কি রে, কি হয়েছে তোর মাথায়? পদ্মহাতখানি সস্নেহে তার মাথায় বুলিয়ে দিলেন।

ভোজবাজি হয়ে গেল। সকল যন্ত্রণা উড়ে গেল কর্পূরের মত।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল নরেন, 'এ কি, কি আশ্চর্য, আমার মাথায় আর বেদ?না নেই'। টান দিয়ে খুলে ফেলল গামছা। 'সত্যি, আলোর দিকে তাকাতে পারছি। সব দেখতে পারছি সহজে। এতটুকু কষ্ট নেই। ভয় নেই। হালকা হয়ে গেলাম মুহূর্তে।

ঠাকুর হাসতে লাগলেন'।[৫]

স্বামীজির জীবনে এই সামান্য ঘটনা, কিন্তু এই ঘটনার কোন বাস্তব ব্যখ্যা তিনি যেমন খুঁজে পাননি, ঠিক সেইরকম আমরাও খুঁজে পাইনা। আর হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবেও না।

স্বামীজি নিজেও অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন, যার কোন আদিও নেই অন্তও নেই। যেমন ঠাকুরের অসুখ, নরেন সহ অন্য অনেক ভক্তরা আছে ঠাকুরের সেবার জন্য। এইরমক সময়ে শিবরাত্রির দিনে সকলে উপোস করে আছে। নরেন ধ্যানে বসার আগে বন্ধু কালীকে বলে রাখে কিছু সময় পরে সে যেন নরেনকে স্পর্শ করে। নরেন ধ্যানস্থ হয়;

'এই সময় কে আরেকজন ভক্ত ঢুকল দরজা ঠেলে। আর তখুনি কালী স্পর্শ করল নরেনকে।

স্পর্শ করা মাত্র এ কী হয়ে গেল কালীর হাত! বেঁকে গেল।

কাঁপতে লাগল। কতক্ষণ লাগল হাতটাকে সোজা করতে।

খানিক পরে নরেন জিগগেস করল কালীকে; 'কেমন মনে হল বল দিকি'।

যেন প্রচন্ড একটা ইলেকট্রিক শক পেলাম'। কালী অভিভূতের মতন বললে'।[৬]

যদিও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ঘটনাকে বলেছেন সিদ্ধাই। এবং নরেনকে এইরকম আর করতে তিনি নিষেধ করেন। বলেন, শক্তি সঞ্চয়ের আগেই বিলিয়ে দিতে নেই।

ঠাকুরের অসুখ ক্রমেই বাড়তে লাগল চিকিৎসায় কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। নরেন ঠাকুর দিকে তাকিয়ে ভাবে, ঠাকুরের লীলা- সংবরণের দিন বুঝি ঘনিয়ে এল। মনে মনে ভাবে এই কি অবতার? বিশ্বাস করতে তাঁর মন চায় না।

'যদি এই সময়ে, শেষ সময়, মুখ ফুটে বলে যেতে পারেন যে তিনি ভগবান তা হলে বিশ্বাস করতে পারি।

কিন্তু তাঁর কন্ঠে এখন ভাষা কই, চোখে জ্যোতি কই, লোক চেনবার ক্ষমতাও হয়তো এখন চলে গিয়েছে।

হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, চোখ চাইলেন ঠাকুর। তাকালেন নরেনের দিকে।

কিছু চান? কিছু বলতে চান? ব্যস্ত হয়ে কাছে এগুল নরেন।

স্পষ্ট স্বচ্ছ কন্ঠে ঠাকুর বললেন, 'শোন তোকে বলে যাই। যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই ইদানিং এ শরীরে রামকৃষ্ণ। বুঝলি' ?[৭]

নরেন ভাবে অন্তযামী মনের কথা টের পেয়েছেন। কিন্তু কেমন করে পেলেন? এ ঘটনা আর যাই হোক লৌকিক ঘটনা কখনোই নয়, একথা জোর দিয়র বলা যায়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের লেখক কিছু অলৌকিক ঘটনাকে তুলে ধরেছেন। স্বামীজি তখন আমেরিকাতে। ফরাসী গায়িকা এমা কালভে তখন শিকাগোতে। তাঁর জীবন তখন পুরোপুরি বিপর্যস্ত। একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে সে ব্যকুল। আত্মহত্যাও করতে গেছে কয়েকবার। সেই যন্ত্রণাময় দিনে সে শুনল স্বামীজির

কথা। সে যেতে চাইল স্বামীজির কাছে। স্বামীজির সঙ্গে দেখা করার জন্য সে গেল যে ঘরে স্বামীজি থাকতেন। শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এমা কালভে দেখল এক প্রশান্তময় পুরুষকে। কিছুক্ষণ পরে স্বাম্মমীজি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন;

'বৎসে দুরন্ত ঝড়ের মধ্যে তুমি আছ। কিন্তু ঝড়ের মধ্যে থেকেই তোমাকে তোমার শান্তি কুড়িয়ে নিতে শান্ত হও। শান্ত হওয়াই জীবনের সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ প্রত্যুত্তর। বসো।

সামনে টেবিল রেখে বসেছিলেন স্বামীজি, টেবিলের ওপারে বসল কালভে।

স্নেহভরা স্বরে স্বামীজি বলতে লাগলেন কালভের অতীত জীবনের কথা। এমন সব খুঁটিনাটি ব্যাপার যা তার নিভৃততম বন্ধুরও জানবার কথা নয়। কী ভীষণ, এ যে প্রায় অলৌকিক কান্ড'।[৮]

এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী যেমন স্বামীজি ছিলেন, তেমনি এই ক্ষমতাকে সামনে রেখে তিনি মানুষের যে সুস্থ, সুন্দর জীবনপথের সন্ধান দিতেন তার প্রমাণ এমা কালভে।

স্বামীজির কাছে এসেছেন আমেরিকার অন্যতম বিত্তশালী মানুষ রকফেলার। স্বামীজি তাঁকে দেখে বললেন, বসতে। তারপর তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর অতিত দিনের কথা অনায়াসেই বলতে লাগলেন। অবাক হয়ে গেল রকফেলার। সে বলে;

'এ কি, এ তুমি কী করে জানলে? রকফেলার লাফিয়ে উঠল।

'শোনো আমি আরো জানি। জানি তমার ভবিষ্যৎ'।

'ভবিষ্যৎ' ?

'হ্যাঁ, অদূর-সুদূর সমস্ত, সমস্ত দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে'।

'কী দেখছ' ?

'দেখছি, তোমার অনেক-অনেক টাকা। কিন্তু দেখছি এ টাকা তোমার নয়'।

'আমার নয়' ?

'না, দেখছি এ ঈশ্বরের টাকা। তোমার কাছে গচ্ছিত আছে। তুমি এ টাকা ঈশ্বরের সন্তস্নদের জন্যে, দুঃস্থ ও দুর্বল সন্তানদের জন্যে বিতরণ করছ অকাতরে'।[৯]

আশ্চর্য হয়ে ওঠে সে। সে বিশ্বাস করে না। উঠে চলে যায়। কয়েকদিন পর রকফেলার ছুটে আসে স্বামীজির কাছে। সে জানায় তাঁর টাকা সে দান করেছে দুঃস্থ, দুর্বলদের। আশ্চর্য স্বামীজির কথা, আশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতা যে কথা ও অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা একজন অর্থবান ব্যক্তি অকাতরে তাঁর টাকা সে বিলিয়ে দিতে পারে।

আমেরিকাতে থাকার সময় স্বামীজি একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই লেকচার ব্যুরো স্বামীজিকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য, যে টাকা উঠত তার কিছুটা স্বামীজিকে তারা দিত। তাই স্বামীজিকে সপ্তাহে বারো বা চোদ্দটার মত বক্তৃতা দিতে হতো। তিনি ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়তেন। প্রতিদিন বলার মত বিষয় খুঁজে না সবসময়। তখন স্বামীজির সঙ্গে এক অলৌকিক কান্ড ঘটে। স্বামীজি ঘুমের মধ্যে শুনতে পেতেন কে যেন তাঁকে ডাকছে;

‘...কী বলছি শোনো কান পেতে, শোনো মন দিয়ে। এ কি, বক্তৃতা দিচ্ছ ? হ্যাঁ, অবহিত হয়ে শোনো, পরে তুমি কী বলবে, কী তোমার বক্তব্য, জেনো রাখো।

... কখনো কখনো দুজন আসছে। কী বক্তৃতা দেওয়া যায় তাই নিয়ে তারা তর্ক করছে, আলোচনা করছে। বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলছে।

কখনো এমন সব কথা উঠছে যা স্বামীজি কখনো শোনেননি। এমনি সব ভাব যা কখনো আসেনি চিন্তায়। এ কী অভিনব।

হ্যাঁ, মনের মধ্যে গেঁথে নাও। কালকের বক্তৃতার জন্যে প্রস্তুত করো নিজেকে’।[১০]

তাঁদের কন্ঠস্বর পাশের ঘর থেকেও শোনা যেত। ঘরের বাসিন্দারা জিজ্ঞাসা করত, কাল রাতে স্বামীজি কার সঙ্গে কথা বলত ? কথাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য স্বামীজি বলতেন, তিনি ঘুমের ঘোরে হয়ত কথা বলতেন। কিন্তু ঘরের বাসিন্দারা বলত, আপনার সঙ্গে আরো কেউ ছিল, তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছিলেন। এই কথা শোনার পর স্বামীজি আর কথা এগিয়ে নিয়ে যেতেন না, পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন।

আমেরিকাতে থাকার সময় স্বামীজি আরও অলৌকিক ঘটনা ঘটান। যেমন এক ধনী ব্যক্তি স্বামীজিকে বলেছিল, সেই ব্যক্তির মনে এখন কী হচ্ছে তা স্বামীজি বলতে পারবেন ? প্রথমে স্বামীজি গ্রাহ্য করেননি, পরে ভাবলেন এই ব্যক্তিটিকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার আছে। তাই তিনি;

‘লোকটার দু চোখের মধ্যে স্বামীজি তাঁর দু চোখ নিবদ্ধ করলেন। লোকটা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। মনে হল তপ্ত দুই অগ্নিশলাকা তার শরীরের অস্থি মাংস ভেদ করে অন্তস্থলে গিয়ে ঢুকছে। কোন অবরোধ কোন আবরণ দিয়ে তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। দেখে নিচ্ছে জেনে নিচ্ছে তার সমস্ত প্রচ্ছন্নকে।

ভয় পেয়ে করুণকন্ঠে লোকটা চিৎকার করতে লাগল; ‘আর না, আর না। স্বামীজি, আপনার ঐ অগ্নিশ্বর ফিরিয়ে নিন। আমার সমস্ত গোপন কথা বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজেকে আর কিছুতেই ঢাকতে পারছি না। লুকোতে পারছি না’।[১১]

স্বামীজি তখন অসুস্থ। মঠেই আছেন। মঠে কেনা হয়েছে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। এত বই দেখে স্বামীজির শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী বলে ওঠে, এক জীবনে এত বই পড়া অসম্ভব। এই কথা শুনে স্বামীজি বলেন, তিনি দশ খন্ড পড়ে এবের একাদশ খন্ড ধরেছেন। শিষ্য অবাক হয়ে যায়। তাঁর কাছে অবিশ্বাস ঠেকে। স্বামীজি তখন বলেন, তাকে সে পরীক্ষা করুক। শরৎ বিভিন্ন খন্ড থেকে বেছে বেছে কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। স্বামীজি সব ঠিক উত্তর দিয়ে দেন। শিষ্য জিজ্ঞাসা করে;

‘এ কী করে সম্ভব হতে পারে ? শিষ্য অভিভূত হয়ে পড়ল;

‘এ মানুষের সাধ্য নয়’।

স্বামীজি বললেন, দ্যাখ একেই বলে ব্রহ্মচর্যের শক্তি। কোথায় কী ম্যাজিক লাগে এর কাছে ? একমাত্র ঠিক-ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারলেই সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত করা হয়। স্মৃতিধর, শ্রুতিধর হয়ে যাওয়া যায়। ...

'শুধু ব্রহ্মচর্য রক্ষার ফলেই এই অমানুষিক শক্তি ? দেশে তো আরও কত আছে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী। পারবে, পারবে তারা এই কীর্তিতে অধিষ্ঠিত হতে ? যাই বলুন মশায়, ব্রহ্মচর্য ছাড়াও আরো কিছু আছে। আরো কিছু আছে।

স্বামীজি চুপ করে রইলেন'।[১২]

একথা সত্য যে শরৎ বলেছেন, 'আরো কিছু আছে'। এই আরও কিছুর মধ্যেই রয়ে গেছে স্বামীজির অলৌকিক ক্ষমতা। যে ক্ষমতার কথা তাঁরাই জানতেন, যাঁরা তাঁকে খুব কাছের থেকে দেখেছিল বা তাঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিল।

লেখক আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আমেরিকার ডেট্রয়টে রাতের খাবার খাচ্ছেন স্বামীজি। খাবার খাওয়া হলে কফি হাতে নিয়েছেন আর গল্প করে যাচ্ছেন। কফির কাপ যখন মুখে তুলতে যাবেন;

'চুমুক দেবেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন কফিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া। চমকে তাকালেন ব্যাকুল চোখে, এ কি, ঠাকুর একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখমুখে দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ।

'ও রে, ও কফি খাসনে-বললেন ঠাকুর।

'কেন ? স্বামীজির পেয়েলা ধরা হাত কেঁপে-কেঁপে উঠল।

'ঐ পেয়ালাতে বিষ-কফিতে ওরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে'।[১৩]

স্বামীজি জীবনে এই অলৌকিক ঘটনা চিরস্মরণীয়। ঠাকুর যে তাঁর সঙ্গে প্রতিটি ক্ষণে আছেন, তাঁকে সকল দিক থেকে রক্ষা করছেন, এই ঘটনা তার প্রমাণ।

উক্ত গ্রন্থেই আর একটি ঘটনা আছে, যা স্বামীজির অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। স্বামীজি তখন আমেরিকায় মিস ব্যাগলির বাড়িতে আছেন। সেখানে তাঁকে বাড়ির এককোণে পড়ার ঘরে আটক করে রাখা হয়েছে। দরজা তালা দিয়ে বন্ধ করা। বাড়ির অন্য প্রান্তে অনেক লোকজন, হঠাৎ সেখানে স্বামীজিকে দেখা গেল তাদের সঙ্গে বসে। সকলেই অবাক হয়ে গেল। তিনি কি করে বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তালার চাবি তো অন্য একজনের কাছে। সেই দরজার কাছে সকলেই গিয়ে দেখে বাইরে দিক থেকে দরজা যেমন তালা বন্ধ করে রাখা ছিল, ঠিক সেইরকম বন্ধ করা আছে।

'তবে কি স্বামীজি জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন ? তাই বা সম্ভব হয় কী করে ? জানলায় শিক ছিল না ? জানলা দিয়ে বেরিয়েই বা বাড়ির এ প্রান্তে আসেন কী করে সহসা ?

অত গবেষণা দরকার কী ? তালা খুলে দেখলেই তো হয়।

তালা খুলে দেখা গেল যেমন বসে ছিলেন তেমনি বসে আছেন স্বামীজি। বই পড়ছেন তন্ময় হয়ে'।[১৪]

'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'-র তৃতীয় খন্ডে লেখক একটি অলৌকিক কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যে কতখানি অলৌকিক ক্ষমতাকে আয়ত্ত করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। লন্ডনে এসেছেন সারদানন্দ ও স্বামীজির ভাই মহেন্দ্রনাথ। তাঁদের

দুজনের জ্বর। ঔষধ খেয়েও তা কমছে না। বেশ কয়েকদিন তাঁদের জ্বর। এদিকে সারদানন্দ বক্তৃতা দেবেন স্বামীজির হুকুম। জ্বরের ঘরেই সে নিজেকে বক্তৃতার জন্য তৈরী করে, মহেন্দ্রনাথ তাঁকে সঙ্গ দেয়। তাঁদের এই অবস্থা দেখে স্বামীজি হেসে ধমক দেন। পরদিনও জ্বর কমলো না, কিন্তু দুপুরের থেকে জ্বর কমে গেল একেবারে। স্বামীজি এসে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, জ্বর কমেছে কি না? তাঁরা বলেন হ্যাঁ কমে গেছে। স্বামীজি তখন সারদানন্দকে বলেন;

'যা তোরও জ্বর আর আসবে না। আমি নিচে ডাইনিং রুমের চেয়ারে বসে উইলফোর্স দিচ্ছিলুম, জ্বরকে জোর করে টেনে বের করে দিলুম'। স্বামীজি ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে শুরু করলেনঃ 'জ্বর যাবে না! হুকুম মানবে না!'[১৫]

প্রদ্যোৎ গুপ্তের লেখা 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে স্বামীজির জীবনের নানা অলৌকিক ঘটনা। যে সকল ঘটনার কোন বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবুও সেসকল ঘটনা ঘটেছিল। স্বামীজি আমেরিকায় আছেন। মিসেস ওলি বুলের বাড়িতে তিনি আছেন। অনেক মানুষ আসেন, তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন স্বামীজি। সেখানেই একজন মহিলার খুব জ্বর বেশ কয়েকদিন ধরে। স্বামীজি তাঁকে বলে;

'তোমার জ্বর সারিয়ে দেব?

মহিলাটি উৎসুক হয়ে উঠলেন, বললেন, -তাহলে খুব ভাল হয়।

স্বামীজি মহিলার হাত দুটো নিজের হাতে টেনে নিয়ে চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে চুপ করে উঠে চলে গেলেন।

তারপর থেকে মহিলার আর জ্বর হয়নি'।[১৬]

স্বামীজি যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তা এই ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

উক্ত গ্রন্থে আর একটি অলৌকিক স্বপ্নের উল্লেখ আছে স্বামীজিকে নিয়ে। পাশ্চাত্যদেশ থেকে স্বামীজি স্বদেশে ফিরে আসছেন। নেপলস থেকে জাহাজে চড়ে আসছেন। ভূমধ্যসাগর দিয়ে যখন যাচ্ছেন, তখন স্বামীজি স্বপ্ন দেখলেন;

'একজন ঋষি এসে তাঁকে বলছেন, তুমি এখন ক্রীট দ্বীপের কাছ দিয়ে চলেছ। এখানে প্রথম খৃষ্ট ধর্মের উৎপত্তি হয়। আমি খোরাপুটি সম্প্রদায়ের একজন...

পরের কথাগুলি স্বামীজি স্মরণ করতে পারেননি-বলেছেন। বোধহয় সেই ঋষি এসেনি এমলি একটা কিছু বলছিলেন।

যীশুখৃষ্ট এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন'। ঘুম ভাঙ্গতেই ডেকে ছুটে এলেন স্বামীজি। একজন কর্মচারীর কাছে সময় জানতে চাইলেন।

কর্মচারী বলল-বারোটা।

-আমরা কোথায় এসেছি?

ক্রীট দ্বীপের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে'।[১৭]

এই কথা শুনে স্বামীজি অবাক হয়ে গেলেন, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের এমন মিল

দেখে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের স্বামীজি সম্পর্কে অন্যতম মুল্যবান গ্রন্থ হল 'স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী'। গ্রন্থটি স্বামীজির জীবনী উপন্যাসরূপে মহাভারতসম। পাঁচটি খন্ডে উপন্যাসটি বিভক্ত। এই গ্রন্থের প্রথম খন্ডে স্বামীজির জীবনের এক অলৌকিক ঘটনার বিবরণ আছে। ঘটনা স্বামীজি সমগ্র জীবনে ধরে শুধু স্মরণে রাখেন নি, এই ঘটনা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ঘটনাটি হল স্বামীজি ধ্যান শেষ করে বসে আছেন। তখনও;

'ধ্যানের প্রশান্তি, আনন্দ তখনো মনে লেগে আছে। 'অকস্মাৎ দেখিলেন দিব্যজ্যোতিতে ঘর পূর্ণ হইয়া গেল'। ঘরের ডানদিকের দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে এলেন অপূর্ব এক সন্ন্যাসী। পরিধানে গৈরিক বসন। হাতে কমন্ডলু, প্রশান্ত মুখ। দাঁড়িয়ে আছেন নরেন্দ্রনাথের আসনের সামনে। গেরুয়ার বসনপ্রান্ত পায়ের ওপর লুটোচ্ছে। ঝকঝকে কমন্ডলু। প্রশান্ত মুখে স্মিত হাসি। দীর্ঘ দেহ। ক্রমশই আরো কাছে আসছেন। কিছু বলতে চাইছেন। ঠোঁটে কথা লেগে আছে। নরেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। কাছে, আরো কাছে। ভয়ে, দরজা খুলে ঘরের বাইরে এক ছুটে পালালেন। বাইরে এসে মনে হল, এ কি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। শুন্য ঘর। মেঝেতে আসন। নেই, কেই নেই। এমন অপূর্ব সন্ন্যাসী তিনি আর কখনো দেখেননি। সৌম্য সুন্দর। কে এই দিব্য মানব। বুদ্ধদেব...'।[১৮]

পরবর্তীকালে স্বামীজি বলেছিলেন সেই সন্ন্যাসী ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। যিনি স্বামীজিকে কিছু বলার জন্যই এসেছিলেন। স্বামীজি ও বুদ্ধদেব এক মানবাত্মার আত্মীয় ছিলেন তা আমরা সকলেই জানি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অপর একটি উপন্যাস 'দুই কাকু' যেখানেও স্বামীজি প্রসঙ্গ যেমন আছে, ঠিক সেইরকম স্বামীজির অলৌকিক কাহিনির কথাও আছে। উপন্যাসের কাহিনি গতি পেয়েছে স্বামীজিকে সামনে রাখে। প্রধান চরিত্রগুলি স্বামীজির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। উপন্যাসে বোধয়ন নামে এক কিশোর চরিত্র যার আদর্শ স্বামীজি। সে তার মামার সাথে যখন স্বামীজিকে নিয়ে আলোচনা করে, তখন স্বামীজির এক অলৌকিক ঘটনাকে তুলে ধরে। স্বামীজি তখন পরিব্রাজক। একদিন তিনি শুনলেন একজনকে ভূতে ধরেছে, ঢাক, ঢোল বাজছে। ওঝা ভুত ছাড়াতে এসেছে। স্বামীজি সেখানে গেলেন। গিয়ে দেখলেন একটা লোহার কুঠার আগুনে বেশ ভালভাবে গরম করা হয়েছে। সেই কুঠারটি ভুতে ধরা ব্যক্তিটির শরীরে ছ্যাঁকা দেওয়া হচ্ছে, কিন্ত কোথায় ফোসকা পড়েনি, বা সে যন্ত্রণায় চিৎকারও করেনি। ওঝা জানালো তার দ্বারা হল না। এবার সকলেই স্বামীজির কাছে এলো, তারা বললো;

'মহারাজ! কুছ তো কিজিয়ে। স্বামীজি ভীষণ বিপদে পড়লেন। ভূত ছাড়াবেন কী করে। ভূতের শত্রু ওঝাই যেখানে হার মেনে গেল। তাঁরা কিছুতেই ছাড়বেন না, মহারাজ! আপনি পারবেন। স্বামীজি আর কী করবেন। এগিয়ে গেলেন। প্রথমে তাঁর দেখতে ইচ্ছে

করল, কুঠারের লোহার ফলাটা কতটা তেতেছে। হাত দেওয়া মাত্রই আঙুলটা ভীষণভাবে পুড়ে গেল। অসম্ভব যন্ত্রণা। কী উপায়? কুঠারটা ফেলে দিলেন। লোকটির মাথায় হাত রেখে কয়েকবার ইষ্টমন্ত্র জপ করে দিলেন। কী আশ্চর্য। আক্রান্ত মানুষটি ভাল হয়ে গেলেন। আর স্বামীজি সারারাত পোড়ার যন্ত্রণায় ছটপট করলেন...'।[১৯]

স্বামীজি অসম্ভবকে সম্ভব করতেন তাঁর আশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা। সেই অলৌকিক ক্ষমতা মানুষের মঙ্গলের জন্য, হিতের জন্যও প্রয়োগ তিনি করতেন।

ড.মণি ভৌমিকের লেখা 'আমি নরেন, বিদেশে বিবেকানন্দ' (অষ্টম সংস্করণ, ২০১৯)। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলা যেতে পারে এই উপন্যাসটিকে। গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ উপন্যাসের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে স্বামীজির কন্ঠে। স্বামীজি সকল কাজে-কর্মে উপলব্ধি করেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সঙ্গে সবসময় আছেন। তাঁকে সকল বিপদ থেকে তিনি রক্ষা করে চলেছেন। শিকাগো ধর্মসভা শেষ হয়েছে পাশ্চাত্যদেশের মানুষ সাদরে বরণ করে নিয়েছে স্বামীজিকে। সত্য হয়েছে ঠাকুরের ভবিষ্যতবাণী। স্বামীজি অনুভব করেছেন এক অলৌকিক শক্তিকে। যে শক্তি তাঁর সঙ্গেই আছে। স্বামীজি বলেছেন;

'আমি অনুভব করছি, এক অলৌকিক- যে-শক্তি আমার ব্যাখ্যা ও বর্ণনার অতীত-সেই শক্তি সত্যিই নির্ধারণ করতে চলেছে আমার বাকি জীবনের সমস্ত কাজ, সব পথচলা। আমার মনপ্রাণ গহন প্রণামে নতজানু, ছুঁয়ে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ। তাঁর কাছে আমার একটিই প্রার্থনা- আমার সকল অহংকার তুমি লুপ্ত করো। আমার 'আমি'-কে তুমি মুছে দাও। তুমি আমাকে নিয়ে চলো আমার হাত ধরে, পথ দেখাও আমাকে...'।[২০]

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ চিরভাস্বর। উপন্যাসিকদের কলমে তিনি নানারূপে, নানাভাবে চিরন্তন হয়ে আছেন। দিন বদলের সাথে সাথে মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটলেও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আকর্ষণের মাত্রা কমেনি, তাঁকে জানার ও চেনার কৌতূহল কমেনি, বরং বেড়ে চলেছে। স্বামীজি যে শুধু ধর্মের প্রচারক নন, তাঁর জীবন আমাদের জীবন পথকে আলোকিত করে, চেতনার দ্বারকে উন্মুক্ত করে। ঠিক তেমনি তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা আমাদেরকে বিষ্মিত করে। সেই বিষ্ময় আমাদের পথ চলার পাথেয়, আমাদের অনন্ত মনের খোরাক।

তথ্যসূত্র :

১) অন্নপূর্ণা দেবী, 'স্বামী বিবেকানন্দ', নব গ্রন্থ কুঠির, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ. ১৯।

২) অন্নপূর্ণা দেবী, 'স্বামী বিবেকানন্দ', নব গ্রন্থ কুঠির, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ. ৩৪।

৩) অন্নপূর্ণা দেবী, 'স্বামী বিবেকানন্দ', নব গ্রন্থ কুঠির, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ. ৯০।

৪) অন্নপূর্ণা দেবী, ‘স্বামী বিবেকানন্দ’, নব গ্রন্থ কুঠির, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ. ৯০।
৫) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘বীরেশ্বর বীবেকানন্দ’ (প্রথম খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃ. ৭৬।
৬) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘বীরেশ্বর বীবেকানন্দ’ (প্রথম খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃ. ১১০।
৭) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘বীরেশ্বর বীবেকানন্দ’ (প্রথম খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃ. ১৪১।
৮) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘বীরেশ্বর বীবেকানন্দ’ (দ্বিতীয় খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণঃ শ্রাবণ ১৩৫৫, পৃ. ৬৫।
৯) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘বীরেশ্বর বীবেকানন্দ’ (দ্বিতীয় খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণঃ শ্রাবণ ১৩৫৫, পৃ. ৭৭।
১০) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘বীরেশ্বর বীবেকানন্দ’ (দ্বিতীয় খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণঃ শ্রাবণ ১৩৫৫, পৃ. ৯৫।
১১) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘বীরেশ্বর বীবেকানন্দ’ (দ্বিতীয় খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণঃ শ্রাবণ ১৩৫৫, পৃ ৯৮।
১২) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘বীরেশ্বর বীবেকানন্দ’ (দ্বিতীয় খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণঃ শ্রাবণ ১৩৫৫, পৃ. ১০২।
১৩) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘বীরেশ্বর বীবেকানন্দ’ (দ্বিতীয় খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণঃ শ্রাবণ ১৩৫৫, পৃ. ১১৪।
১৪) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘বীরেশ্বর বীবেকানন্দ’ (দ্বিতীয় খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণঃ শ্রাবণ ১৩৫৫, পৃ. ১১৯।
১৫) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘বীরেশ্বর বীবেকানন্দ’ (তৃতীয় খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণঃ ১৩৭৬, পৃ. ১০৯।
১৬) প্রদ্যোৎ গুপ্ত, ‘স্বামী বিবেকানন্দ’, চক্রবর্তী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৫৯, পৃ. ৬৩।
১৭) প্রদ্যোৎ গুপ্ত, ‘স্বামী বিবেকানন্দ’, চক্রবর্তী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৫৯, পৃ. ৬৭।
১৮) সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ‘স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী’ (প্রথম খন্ড), দে’জ পাবলশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪২৫, পৃ. ২৯৮।
১৯) সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ‘দশটি কিশোর উপন্যাস’ আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১৩, পৃ. ৮৮৭।
২০) ড. মণি ভৌমিক, ‘আমি নরেন বিদেশে বিবেকানন্দ’, পত্রভারতী, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৮০।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা অভিধানবিদ্যা চর্চা : সমীক্ষা ও মূল্যায়ন

সোমেন পাল

সারসংক্ষেপ :

অভিধান এক ধরনের গ্রন্থ, যাতে একটা নির্দিষ্ট ভাষার শব্দসমূহ বর্ণানুক্রমে তালিকাভুক্ত থাকে এবং শব্দসমূহের অর্থ, উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তি, ব্যবহার ইত্যাদি বর্ণিত ও ব্যাখ্যায়িত থাকে। এটা স্বীকৃত যে, হাজার হাজার বছর আগে জ্ঞান-গরিমাসহ অনেক সভ্যতার উন্মেষ হলেও অভিধানের ব্যবহার অনেক প্রাচীন। সবচেয়ে পুরানো অভিধান পাওয়া গেছে আকাদিয়ান সাম্রাজ্যের সময়কার দ্বিভাষিক সুমেরীয়-আকাদিয়ান শব্দমালার উপর। আনুমানিক ২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত এই অভিধানের সন্ধান পাওয়া যায় এবলা (বর্তমান সিরিয়া) এলাকাতে। পরবর্তী সময়ে জানা মতে, বিশ্বের প্রথম ইংরেজি অভিধানের সংকলক ছিলেন জন গারল্যান্ড (John Garland)। অভিধানটা লেখা হয় ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে। তাও আবার ল্যাটিন ভাষায়। বাংলা অভিধানের সূচনা উনিশ শতকে। এই সময় থেকে বাংলা অভিধানের যাত্রা শুরু হলেও এ অঞ্চলের মানুষ অভিধানের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা অভিধান চর্চার সেই ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্যই আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা।

সূচক শব্দ :

প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ, অভিধান।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা অভিধান সমীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ায় আগে অভিধান বলতে ঠিক কী বোঝায় সেই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেওয়া দরকার। 'Dictionary'-র বাংলা প্রতিশব্দ 'অভিধান'। 'Dictionary' শব্দটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Dictonarium' থেকে, যার অর্থ 'শব্দের ভাণ্ডার'। অভিধানে কোনও ভাষার শব্দসমষ্টি বর্ণমালা অনুযায়ী সাজিয়ে মুদ্রিত থাকে যাতে প্রয়োজনীয় শব্দের আদ্য অক্ষর ধরে খুঁজলে সহজে পাওয়া যায়। অভিধানে শব্দের বানান, অর্থ, উচ্চারণ, প্রতিশব্দ, পরিভাষা, প্রতিবর্ণ ও ব্যাকরণ বিষয়ক নির্দেশ থাকে। একটা শব্দ বাক্যের মধ্যে কত অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, অভিধান থেকে তা জানা যায়। সেখানে শব্দের উৎস ও ব্যুৎপত্তিনির্দেশ পাওয়া যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুষঙ্গে জড়িত শব্দের সংজ্ঞা অভিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। কোনও একটা শব্দ কবে থেকে প্রথম ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কবে থেকে কোন অর্থ

ধারণ করেছে, এসবের ইতিহাস অভিধান ধারণ করে। আর এ প্রেক্ষাপটে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, একটা অভিধান হল 'সার্বক্ষণিক একান্ত কাছের শিক্ষক'।

বাংলা ভাষার ইতিহাসগত যুগ বিভাগের দিক দিয়ে দেখলে প্রাচীন যুগ আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ এবং মধ্যযুগ আনুমানিক ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলা অভিধান সংকলনেরও একটা অনুরূপ স্তরবিভাগ সম্ভবপর।

প্রাচীনযুগের অভিধান সংকলন :

(১) অমরকোষ-টীকাসর্বস্ব (১১৫৯, মতান্তরে ১১৬০)[১]— সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২) দেশীনামমালা/রত্নাবলী (১২শ শতক)— হেমচন্দ্র সূরি।

মধ্যযুগের অভিধান সংকলন :

(১) পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ (১৭শ শতক)— মার্কস আঁতোনিউ সাঁতুচি ও তাঁর সহযোগীগণ।

(২) পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ/এভোরা পুথি (১৭শ শতক)— উইলিয়াম মার্সদেন।

(৩) Vocabulario em idioma Bengalla E Partuguez (1743)— Manoel-da-Assumpsao.

(৪) ফারসি-বাংলা শব্দকোষ (১৭৭৪-১৭৭৫)— অজ্ঞাতনামা পূর্ববঙ্গীয় মুনশি।

(৫) সাত খণ্ডে ফরাসি-বাংলা শব্দকোষের পুঁথি (১৭৭৪-১৭৮৫)— ওগুস্তাঁ ওসাঁ।

(৬) Indian Glossary (1788)— Unknown Anthologist.

(৭) The Indian Vocabulary (1788)— Unknown Anthologist.

(৮) An Extensive Vocabulary: Bengalese and English (1793)— Aaron Upjohn.

(৯) A Vocabulary in Two Parts: English and Bongalee and Vice-Versa (1st- 1799, 2nd- 1802)— Henry Pitts Forster.

বাংলা অভিধানের ঐতিহ্য দীর্ঘকালের নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে মধ্যযুগের যেসব পুথি সংরক্ষিত আছে, তার মধ্যে অমরকোষ বা নামলিঙ্গানুশাসন নামের একটা সংস্কৃত অভিধানের পুথি পাওয়া যায়। অভিধানটা আনুমানিক ছয় শতকে অমর সিংহ কর্তৃক রচিত। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, এ অভিধানের শব্দভান্ডার এবং বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারের সিংহভাগ শব্দ অভিন্ন। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের অভিধান চর্চার ইতিহাস অমরকোষ দিয়ে শুরু করা যায়।

খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকে ফান ইয়ু ৎসিয়েন ৎসেউ ওয়েনের সংস্কৃত-চিনা অভিধানে কিছু প্রাচীন বাংলা শব্দ পাওয়া যায়। এরপর খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকে ফান ইয়ু ৎসা মিঙের সংস্কৃত-চিনা অভিধানেও কিছু প্রাচীন বাংলা শব্দ প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন যুগের শব্দ সংগ্রহের প্রথম নমুনা বাঙালি সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

টীকাসর্বস্ব গ্রন্থ। অমরকোষের টীকা এই গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের অনেক বাংলা প্রতিশব্দ আছে। প্রাপ্ত বাংলা শব্দের সংখ্যা সমালোচকদের মতে প্রায় দুইশত থেকে চার শতাধিক।[২] এই গ্রন্থের বাংলা শব্দসূচি নিয়ে শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় 'দ্বাদশ শতকের বাংলা শব্দ' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। নিম্নে উক্ত প্রবন্ধ থেকে বাংলা শব্দের কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা হল—

টীকাসর্বস্বে প্রাপ্ত রূপ	**আধুনিক রূপ**
চাতিপন্ন	ছাতিম
জেঠি	টিকিটিকি
কুল্ল	কুলা
শমিল	শোল (মাছ)
শর্বরী	সাবল
শিহড়	শিকড়
বাহুক	বাঁক
ভাণ্ডী	হাঁড়ি
রসাউণ	রসুন
করবেল	করলা

প্রাচীনকালেই (১২শ শতক) হেমচন্দ্র সূরি তাঁর রত্নাবলী বা দেশীনামমালা সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থে গুজরাত ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানের দেশি শব্দ সংকলিত হলেও এতে এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলো বঙ্গদেশেও প্রচলিত।

মধ্যযুগের প্রথম অভিধান হিসেবে আমরা সপ্তদশ শতকে সংকলিত পর্তুগিজ পাদ্রি মার্কস আঁতোনিউ সাঁতুচি ও তাঁর সহযোগীগণের (মতান্তরে দোম আন্তোনিও) পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষের কথা উল্লেখ করতে পারি। প্রায় একই সময়ে সংকলিত হয়েছিল উইলিয়াম মার্সদেনের এভোরা পুথি।

মধ্যযুগের প্রধান বাংলা ভাষার অভিধান বলতে বোঝায় ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রি Manoel-da-Assumpsao সংকলিত Vocabulario em idioma Bongalla E Partuguez গ্রন্থ। মনোএল পোর্তুগিজ ধর্মপ্রচারকদের এদেশিয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনেই গ্রন্থটা সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থের যথাযথ পুনর্মুদ্রণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক ভূমিকাসহ সম্পাদিত ও অনূদিত হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ অবলম্বনে গ্রন্থটা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

গ্রন্থটা পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান অক্ষরে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এর মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০ + ৫৯২ = ৬০২। তার মধ্যে ভূমিকা প্রভৃতি ১০ পৃষ্ঠা। ব্যাকরণ অংশ ১-৪০ পৃষ্ঠা, ৪১-৩০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাংলা-পর্তুগিজ শব্দসংগ্রহ,

৩০৭-৫৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পর্তুগিজ-বাংলা শব্দসংগ্রহ (এখানে নতুন কোনও শব্দ নেই, পূর্বের বাংলা-পর্তুগিজ শব্দাবলিকেই বিপরীতক্রমে সাজানো হয়েছে), ৫৭১-৫৯২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নানারকম শব্দ শ্রেণি হিসাবে (যেমন- তিথির নাম, সংখ্যাবাচক নাম, সপ্তগ্রহের নাম, হিন্দু ধর্মগ্রন্থের নাম, ঈশ্বরের গুণাবলি, সমোচ্চার্য শব্দ ইত্যাদি) সংগৃহীত হয়েছে। কয়েকটা নমুনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হল—

বাংলা শব্দ	রোমান বানান	পোর্তুগিজ শব্দ
আখরোট ফল	Acrot phol	Nox de Europa
আঠা	Atta	Visco
বাতাস	Batax	Vento
পোষাক	Poxac	Vestido
খেলা	Quela	Frinco
ছাই	Sai	Cinza
তীর্থ	Tirth	Romarla
উট	Untt	Camelo
উঠান	Utthan	Pateo
ঝগড়া	Zogora	Contenda

আঠারো শতকে সংকলিত পান্ডুলিপি আকারে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অভিধানের কথা জানা যায়। এর মধ্যে একটা হল বাংলা-ফারসি শব্দকোষ। নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেডের একজন পূর্ববঙ্গীয় মুনশি এর সংকলক ছিলেন। একশো পৃষ্ঠার এই অভিধানে প্রায় দুই হাজার শব্দ সংকলিত আছে। অভিধানের সংকলনকাল ১৭৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দ। প্রায় সমকালে ওগুস্তাঁ ওসাঁ (Augustian Aussant) নামে একজন ফরাসি দোভাষী ১৭৭৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মোট সাতটা ফরাসি-বাংলা শব্দকোষ সংকলন করেন। অধিকাংশ শব্দ রোমান হরফে লিখিত হলেও আত্মীয়তাবাচক শব্দের অভিধানসহ আরও একটা অভিধানে বাংলা লিপি ব্যবহার করা হয়েছে। এসব অভিধানের মধ্যে ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে সংকলিত একটা অভিধান ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। সেখানে প্রতিটা ফরাসি শব্দের অন্তত একটা করে ইংরেজি, পর্তুগিজ, ফারসি, হিন্দি এবং বাংলা প্রতিশব্দ সংকলিত হয়। অসাধারণ এই অভিধানে প্রায় ৩৮০০ ভুক্তি ছিল এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৯৬।

১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে রোমান হরফে লেখা বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষের একটার নাম The Indian Vocabulary এবং অন্যটার নাম Indian Glossary। অভিধান দুটোতে রোমান হরফে ইংরেজি প্রতিশব্দ ও অর্থসহ বাংলা শব্দ ভুক্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অজ্ঞাতনামা সংকলকদ্বয়ের এই অভিধান দুটো প্রথম বাংলা-ইংরেজি অভিধান।

বাংলা হরফে মুদ্রিত ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা অভিধানের নাম

ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলোরি (১৭৯৩)। এর ইংরাজি শিরোনাম An Extensive Vocabulary: Bengalese and English। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৫। অনুমান করা হয় এই গ্রন্থের সংকলক ছিলেন আরন আপজন (Aaron Upjohn)। বাংলা ভাষায় প্রথম সুবৃহৎ অভিধান রচনার কৃতিত্ব Henry Pitts Forster–এর। তাঁর অভিধানের নাম A Vocabulary in Two Parts: English and Bengalee and Vice-Versa (1799, 1802)। এর দুটো খণ্ডে প্রায় ২০,০০০ বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ সংকলিত হয়।

এই যুগের বাংলা অভিধান প্রসঙ্গে অন্য একটা চিন্তাসূত্র এখানে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে— আদর্শ সূত্র থাকা সত্ত্বেও এই যুগে উপযুক্ত দ্বিভাষিক অভিধান রচিত হয়নি কেন ? সেযুগের গদ্যভাষার অভাবকে এর কারণ হিসেবে গণ্য করা যায় না। কারণ, সেসময় সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর অভিধান সংকলিত হয়েছিল। প্রাকৃত বা পালি ভাষাতেও অভিধান ছিল। সেসব অভিধানের ঐতিহ্য প্রাচীনযুগের বাংলা ভাষায় অভিধান সংকলনে প্রেরণা সৃষ্টি করেনি।

এখন দেখা যেতে পারে ওই যুগে বাংলাভাষায় অভিধান রচনার ক্ষেত্রে কী ধরণের সম্ভাবনা কতটুকু ছিল বা অভিধান রচনা আদৌ সম্ভব ছিল কিনা। যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেন বা যাঁরা সাহিত্যের পাঠক সকলেরই অভিধান প্রয়োজন। প্রাচীনযুগে বাংলাভাষার সাহিত্যসম্ভার যথেষ্ট ছিল, বলা চলে। চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, অনুবাদকাব্য, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলি ইত্যাদি নিয়ে প্রাচীন বাংলাভাষার যে সাহিত্য-সংসার তাতে একদিকে যেমন আছেন সাহিত্যিকেরা; তেমনি রয়েছেন বহু পাঠক, শ্রোতা। অভিধানের প্রয়োজন এঁদের হতো না, একথা ভাবা যায় না।

মুসলমান আক্রমণের পরবর্তীকালে আরবি-ফার্সি শব্দ মধ্যবাংলায় ক্রমানুপাতিক হারে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে এই প্রবণতার চরম প্রকাশ দেখা গেল। রাজনৈতিক হস্তান্তরের দরুণ বাংলাদেশে তুর্কি-পাঠান-মোগলরা রাজা হয়ে এসেছে। এইসব জাতির লোকেরা বাংলাদেশে বসবাস করেছে। এদের মারফৎ বিদেশি আরবি-ফার্সি শব্দ বাংলাভাষায় প্রবেশ করেছে। আবার এইসব বিদেশিরাও বাংলাভাষা শিখতে উদ্যোগী হয়েছে। সুতরাং, এই সময় অন্তত ফার্সি শব্দের বাংলা অভিধান রচিত হতে পারত।

চৈতন্যদেবের আভির্ভাবে বাংলা সাহিত্য কৌলীন্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত হল, যে সাহিত্য ছিল গ্রাম্যরুচির স্থূলতায় বিকৃত, তা পল্লি-আসর ছেড়ে এসে দাঁড়াল যেন রাজদরবারে। বিষয়বৈচিত্র্য, রুচিশীলতা, দার্শনিকতা, ব্রজবুলির সুদূরপ্রসারী প্রভাব— সব মিলে সেযুগের ভাষার ক্ষেত্রে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। উন্নতভাবের বাহনরূপে সংস্কৃত শব্দাবলি ও বাক্যরীতি বাংলায় নতুন করে আদৃত হল। এই সর্বাত্মক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আবহাওয়ায় বাংলা-সংস্কৃত বা সংস্কৃত-ব্রজবুলি-বাংলা ইত্যাদি অভিধান প্রণয়ন যথেষ্ট প্রত্যাশিত ছিল।

কাজেই গদ্যভাষার অভাবের জন্য নয়, মানসিকতার অভাবেই প্রাচীনযুগের

বাংলা ভাষার অভিধান রচিত হয়নি। বাংলা ভাষার উদ্ভব আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ। আর সেই ভাষার যথাযথ অভিধান রচিত হলো ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে। সেও এক বিদেশির প্রয়াসে। খানিকটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার বইকি। এই বিষয়ে সুনীতিবাবু একটা মন্তব্য করেছেন, "বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে হাজার বছর হইল, এই হাজার বছরের মধ্যে বাঙ্গালী নিজভাষার অভিধান প্রণয়ন করিবার আবশ্যকতা আপনা হইতেই উপলব্ধি করে নাই। এবিষয়ে বিদেশী আসিয়া তাহাকে পথ দেখাইল।"[৩]

তথ্যসূত্র :

১) সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৩৯, ১৪৬ (উল্লেখ্য, ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দ)। পরেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাভাষা পরিক্রমা, খণ্ড ১, দে'জ, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৩০ (উল্লেখ্য, ১১৬০ খ্রিস্টাব্দ)।

২) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "অভিধান", প্রবাসী, বর্ষ ৩০, খণ্ড ১, ১৩৩৭, পৃ. ৮৬২ (উল্লেখ্য "প্রায় দুইশত")। বসন্তরঞ্জন রায়, "দ্বাদশ শতকের বাংলা শব্দ", বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৬, পৃ. ৯৩ (উল্লেখ্য "কিঞ্চিদধিক তিনশত")। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ২৪ মে ১৯৬৪, পৃ. ৩০ (উল্লেখ্য "চার শতেরও অধিক হইতে পারে")।

৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ২৪ মে ১৯৬৪, পৃ. ৮১।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে বংশানুক্রমিক জাতি-ভেদ প্রথা

স্বপন সরকার

ভারতীয় হিন্দু সমাজে বংশানুক্রমিক জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি উৎপাদনের যৌথ মালিকানা যা কুল ও বংশ থেকেই। যার প্রচলন থেকে বেরিয়ে আসা সমসাময়িক সময়েও সম্ভব হয়নি বললেই চলে। হিন্দু সমাজ জীবনের চরিত্রটা বেশ জটিল আকার ধারণ করল যখন থেকে পেশার ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ বংশের পরিচয় পাকাপাকি ভাবে কার্যকর হল। এমনকি চার জাতের মানুষদের পরিবারের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে, সেই সন্তানের নামকরণের মধ্য দিয়েও তার জন্মগত প্রতিফলন ঘটে থাকে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা মনুর দুইটি বিধানের উল্লেখ নিম্নে করব।

31. “Let (the first part of) a Brahmana's name (denote something) auspicious, a kshatriya's be connected with power, and a vaishya's with wealth, but a sudra's (express something) contemptible.”

32. (The second part of) a Brahmana's (name) shall be (a word) imphying happiness, of a kshatriya's (a word) imphying protection, of a vaisya's (term) expressive of thriving, and of a sudra's (an expression) denoting service.”[১]

উপরিউক্ত মনুর দুইটি বিধান থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, শুধু জন্মগত কারণেই হিন্দু সমাজে শূদ্র জাতির পেশা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির সেবা করার জন্যেই নির্দেশিত হয়েছে। শূদ্র জাতির সঙ্গে উচ্চ তিনটি জাতের মেলামেশার ক্ষেত্রেও মনু কঠোর বিধান দিয়েছেন, যার ফলে হিন্দু সমাজে কঠোর বংশগত জাতিপ্রথা তথা স্পর্শ-অস্পর্শ জাতির পরিবাহকতার তৈরি হয়। উক্ত বিষয়টিকে আরো পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য মনুর তিনটি বিধান নিম্নে তুলে ধরা যেতে পারে।

15. Twice- born men who, in their folly, wed wives of the low (sudra) caste, soon degrade their families and their children to the state of sudra's.

16. According to Atri and to (Goutama) the son of Utathya he

who weds a Sudra woman becomes an outcaste according to saunaka on the birth of a son and according to Bhrigu he who has (male) off spring from a (sudra female, alone).

17. A Brahmana who takes a sudra wife to his bed, will (after death) sink into hell; if he begets a child by her, he will lose the rank of a Brahmana.[২]

উপরিউক্ত বিধানগুলির উদ্দেশ্যেই ছিল বিবাহাদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে যাতে কোনো রূপ রক্তের সংমিশ্রণ যাতে করে না ঘটে। মনুর বর্ণিত উচ্চ জাতের মানুষদের জাতিগত পবিত্রতা যাতে রক্ষিত হয়, তার জন্যেই হয়তো উক্ত বিধানগুলি প্রবর্তিত করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে ভারতীয় হিন্দু সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা ভাঙতে হলে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটানো অত্যন্ত প্রয়োজন বলে ডঃ বি.আর. আম্বেদকর মনে করতেন। এর প্রমাণ আমরা পায়- তাঁর লেখা Annihilation of Caste বইতে। মনু যে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথাকে বেশ কিছু কঠোর নিয়মের মধ্যে বন্দী করে রাখার বিধান দিয়েছিলেন যা আজকের দিনেও ভারতের হিন্দু সমাজে কম বেশী এই বিবাহ বন্ধের ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথার প্রতিফলন দেখা যায়।

উক্ত বিধানগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মনু হিন্দু সমাজে অপরাধমূলক কাজ কর্মের জন্য যে ধরনের শাস্তির বিধান করা হয়, সেক্ষেত্রেও একই অপরাধের জন্য জাতিভেদের বিভাগ অনুযায়ী অপরাধের শাস্তির পরিমাণ নির্ধারিণ করা হয়। অতএব উচু জাতের মানুষের জন্য একই অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, নীচু জাতের মানুষের জন্য সেই অপরাধের শাস্তির পরিমাণ অনেক কঠোর করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে আমরা নিম্নে মনুর আরও দুটি বিধানের উল্লেখ করে পার্থক্যটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করব।

268. A Brahmana shall be fined fifty (panas) to defaming a Kshatriya; in (the case of) a Vaisya the fine shall be twenty five (panas); in (the case of) a Sudra the fine shall be twelve (panas).

267. A Kshatriya, having defamed a Brahmana, shall be fined one hundred; a Vaisya hundred and fifty or two hundred; a Sudra shall be suffer corporal punishment.[৩]

এই প্রসঙ্গে শূদ্রের ক্ষেত্রে উঁচু জাতের মানুষের বিরুদ্ধে কুবাক্য প্রয়োগ করলে কী ভয়ংকর শাস্তির বিধান করা হয়েছিল, সেগুলিও আমরা নিম্নে মনুর বিধান অনুসারেই উল্লেখ করব।

270. A once – born man (a Sudra), who insults a twice born man with gross invective shall have his tongue cut out; for he is of

low orgin.

271. If he mentions the names and castes (gati) of the (twice – born) with contumely an iron nail, ten fingers long, shall be thrust red – hot into his mouth.

272. If he arrogantly teaches Brahmanas their duty, the king shall cause hot oil to be poured into his mouth and into his cars.[8]

ভারতীয় হিন্দু সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলেই এই জাতি বিভাগ বা জাতিভেদ তৎকালীন সমাজের উচু জাতি ও নিচু জাতেরই ভেদাভেদ প্রকট করেছিল, বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। বস্তুতপক্ষে শোষক ও শোষিতের মধ্যে যে সম্পর্ক তা হিন্দু সমাজের জাতিভেদের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়াটা বেশ আমাদের কাছে কঠিন বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই সময় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই ছিলেন শাসক জাতি এবং বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল উৎপাদক জাতি, তবে শূদ্রদের কোনো মালিকানা থাকার দরুন সমাজের সর্বনিম্ন স্থানে তাদের অবস্থান ছিল। তবে শ্রমবিভাজন অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা শ্রমসাধ্য ও কঠোরতর কর্মগুলি শূদ্রদের সম্পন্ন করতেই হতো বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে।[৫]

ভারতীয় সভ্যতা কৃষি নির্ভরশীল সভ্যতা তা সর্বজন বিধিত। আর এই কৃষিকাজকে কেন্দ্র করেই যে সমাজের শোষক জাতি উৎপাদনের মালিকানার অধিকারেই উৎপাদক জাতিকে শোষণ করেই চলেছে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা উল্লেখ করব বৈদিক যুগের শেষ পর্বে এবং বৈদিক যুগের ঠিক পরবর্তীকালে কৃষিকার্যের উৎপাদনে সম্প্রসারনের সঙ্গে তথাকথিত বাজারী অর্থনীতির সূত্রপাতের ফলেই যে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয়রা প্রবলভাবে সামাজিক প্রাধান্য পেয়ে থাকেন, এবং অন্যদিকে সরাসরি কৃষিকাজের সঙ্গে নিযুক্ত শূদ্র জাতি হীনতর সামাজিক অবস্থানে পরিগণিত হয়ে পড়েন। এই সময় সমাজের প্রধান উৎপাদক জাতি ছিলেন বৈশ্য ও শূদ্র জাতি। আবার তথাকথিত দাসদের এই শূদ্রদের মধ্যেও ধরা যেতে পারে উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে। বৈশ্যজাতি কৃষিজীবী এবং শূদ্রদের ভূমিকা ছিল কৃষিশ্রমিকের এরই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সায়িক শ্রমের নিয়োজিত করা হতো।[৬] যা সমাজের দৃষ্টিতে হীনতর হিসাবেই পরিগণিত হতো বর্তমানেও কম বেশি দেখা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা একটা অনুমান করতেই পারি যে, ভারতীয় হিন্দু- সমাজের রীতি-নীতি নির্ধারণ করা উক্ত বিধানগুলি তৎকালীন শাসক জাতির আদরশগত ব্যবহারের প্রতিপালন সম্পাদিত করতেন। ফলত শাসক জাতি বিশেষ করে শূদ্রদের উপর শাসন শোষণ নির্যাতনের আদর্শগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাহ্মণবাদী শাস্ত্রকারগণ। মনু তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী বিধানের ফলেই কায়িক শ্রমজীবী শূদ্র জাতিকেই দমন-পীড়ন এবং অধঃপতিত করে রাখবার ব্যবস্থার কথাই বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে শাসক জাতি তথা ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয় নিরঙ্কুশ

শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিপত্য বজায় রাখবার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল মনুবাদী শাস্ত্রীয় বিধান। আবার মনুও বশিষ্টদের বিধানের মাধ্যমে শাসক জাতির স্বার্থ ও ভাবাদর্শেরই প্রতিফলন ঘটানো।[৭] কাজেই আমরা বুঝতে পারি যে বৈদিকোত্তর যুগেও ঋষি এবং শাস্ত্রকারীরাও তদানীন্তর হিন্দু সমাজের শাসক জাতির স্বার্থরক্ষাকারী হিসাবেই তাদের বিধান কঠোরভাবে সমাজ প্রচলন করেন।

আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে আমাদের আরও উল্লেখ করতে হয় যে, হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা মূলত উৎপাদন শক্তির অগ্রগতির ফলে সৃষ্টি জাতি বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থারই অপর একটি পরিচয় বলেও ধরে নেওয়া যেতেই পারে। আমরা ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্র থেকে জানতে পারি যে বৈদিক সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। এই সমাজে পুরুষই ছিল উৎপাদক তথা শিকারী ও যোদ্ধা এবং সম্পত্তির মালিক, এটা অবশ্য শারীরিক শক্তির কারণেও অনেকটা বাস্তবায়িত হয়েছিল। আবার এই ভাবেও বলা যেতে পারে যে, হয়তো বা দৈহিক সামর্থ্য বা জৈবিক কারণে নারীরা ছিল গৃহকর্তী, ঘর সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ভারপ্রাপ্ত হয়ে পড়েন। অগ্রগতির ফলে নারী-পুরুষের ভেদাভেদকেও বেশ পার্থক্য গড়ে ওঠে। এর কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, পূর্বের গোষ্ঠীগত সাধারণ জমির খন্ডে খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ার কারণেই জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ঘটার কারণেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়েছিল।[৮] এক্ষেত্রে শূদ্ররা একদিকে ভূমিদাস হিসাবে জমিতে কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়ে পড়েন, অন্যদিকে জমির মালিকানার অধিকারী পুরুষই হওয়ার ফলে নারীর উপর পুরুষেরও অধিপত্যও বেশ বৃদ্ধি পায়। নারী পুরুষের পার্থক্যের প্রেক্ষাপটে আমরা অধ্যাপিকা কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি তুলে ধরব। তাঁর মতে, “ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই নারীর অবনমন শুরু হয়। নারীর গর্বজাত সন্তানের পরিচয় হয় পিতার পরিচয়ে। অর্থাৎ নারীর গর্ভধারণের ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হয় পিতৃতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। নারী বাঁধা পড়ে যায় পিতৃতন্ত্রের নিগড়ে। ধীরে ধীরে পরিবারে ও সমাজে পুরুষের একাধিপত্য এবং নারীর আনুগত্যই হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ নিয়মে। পুরুষের হাতে চলে আসে পরিবারের সার্বভৌম ক্ষমতা, আর নারী হয়ে পড়ে পুরুষের অধীন। পুরুষের স্থান হয় ঘরে-বাইরে সর্বত্র, আর পুরুষের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে পিতৃতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রাখার কারণে নারীর স্থান হয় গৃহের অভ্যন্তরে অবৈতনিক দাসীর সমপর্যায়ে। পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি সর্বত্র পুরুষ হয় ক্ষমতাবান, আর নারীকে আত্মদান করতে হয় পুরুষের সেবায়। এই হলো নারী-পুরুষ বৈষম্যের মূল সূত্র।”[৯]

ভারতীয় হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ভাবে জানার জন্য আমরা নিম্নে অধ্যাপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি মন্তব্য তুলে ধরব। তাঁর মতে, “ভারতীয় ধর্ম শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী সব নারীর আর্থসামাজিক অবস্থানই হল তথাকথিত শূদ্র, পাপী এবং পশুর সাথে একাসনে। তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ

নেই যে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণভাবে পাহাড়ে, বনাঞ্চলে, সমুদ্রপকূলে এবং গ্রামের এক প্রান্তে বসবাসকারী (অন্তবাসী) তথাকথিত শূদ্র, অস্পৃশ্য অন্ত্যজ, ব্রাত্য বা দলিত নারীরা উচ্চবর্ণের নারীদের থেকে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অনেক বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। স্বাধীন্তোর ভারতেও সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলি জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (শূদ্র) নিম্নবর্ণের নারীদের অপেক্ষা উচ্চবর্ণের নারীরা অনেক বেশি সুবিধাভোগী।"[১০] উক্ত বক্তব্য থেকে আমরা একটা ধারণা করতে পারলাম যে, হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থান ছিল ভয়ঙ্কর অবহেলিত। আবার এই নারীদের মধ্যে শূদ্র নারীদের অবস্থান ছিল ভয়ঙ্কর। ফলে চতুর্বর্ণের মানদণ্ড নারীর ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। এথেকেই আমরা বলতে পারি যে, শূদ্র নারী-পুরুষ সমভাবেই উঁচু জাতির দ্বারা শোষিত ও অবহেলিত হত।

ভারতীয় সমাজে উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে কৃষির প্রসার ঘটলেও এবং খাদ্য উৎপাদন সমাজের সুখ বৃদ্ধি করলেও, ভূমি কর্ষণ সন্মানজনক কর্ম হিসাবে স্বীকৃত হয় না। আবার এই কৃষিকাজ জনিত ভূমিকর্ষণকে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী উচ্চ বর্ণের জন্য এই কাজ নিষিদ্ধ ছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা মনুর একটা বিধান উল্লেখ করব। তাঁর বিধানটি হল এইরূপ,

84. "(Some) declare that agriculture is something excellent (but) that means of subsistence is blamed by the virtous (but) that wooden (implement) with iron point injures the earth and (the beings) living in the earth."[১১]

উৎপাদনশীল শ্রম সম্পর্কে সম্ভবত এটাই ছিল তদানীন্তন শাসক জাতির মনোভাব। জাতি-ভিত্তিক সমাজে কায়িক শ্রম এবং উৎপাদনশীল শ্রম কোনো যুগেই মর্যাদা পায়নি। বৈদিক যুগের শেষ পর্ব থেকে সমাজে উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী জাতি - এই পরস্পর স্বার্থবিরোধী জাতির সৃষ্ট হওয়ার পর থেকেই উৎপাদনশীল শ্রম ও কায়িক শ্রম এবং শ্রমের উপর নির্ভরশীল শ্রমজীবী জাতির প্রতি শাসক জাতির অবজ্ঞা ও ঘৃণা শুরু হয় বলেও আমরা ধরে নিতে পারি। এই প্রসঙ্গে আমরা কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি মন্তব্য তুলে ধরব। তাঁর মতে, "ধর্ম শাস্ত্রের যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কায়েমী স্বার্থে কৃষিক্ষেত্রেও ক্রমশ গড়ে ওঠা নগরে, বন্দরে ও বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিকের জোগানকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে চতুর্বর্ণ প্রথাকে বিভিন্ন পুরুষানুক্রমে বর্ণগত পেশার সাথে জড়িয়ে ফেলে শূদ্রের দাসত্ব ও দারিদ্রকে চিরস্থায়ী করার পাকা বন্দোবস্ত হয়।"[১২] এই মন্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে, উপরিউক্ত বন্দোবস্ত সমসাময়িক সময়েও কম বেশি দেখা যায়।

বহু বহিরাগত জাতি শক্তি ভারতে আক্রমণ ও শাসন করেছে। তা সত্ত্বেও মনুপ্রকল্পিত ভারতীয় হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার পুরোপুরিভাবে অবলুপ্ত ঘটেনি

বলে মনে করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১) F. Max Muller, (Translated by G.Buhler) The Sacred Book of the East, Oxford at the Clarendon Press, London, 1886, P. 35.
২) F. Max Muller Ibid, P. 78.
৩) F. Max Muller Ibid, P. 301.
৪) F. Max Muller, Ibid, P. 301-302.
৫) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, (অনুবাদ কাবেরী বসু) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা (তৃতীয় মুদ্রণ) ২০০২, পৃ. ১৬৩।
৬) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।
৭) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।
৮) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।
৯) কল্যানী বন্দ্যোপাধ্যায়, নারীরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে : অন্ধকারে আলোর দিশা, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৫।
১০) কল্যানী বন্দ্যোপাধ্যায়, নারী শ্রেণী ও বর্ণ : নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান। প্রথম মিত্রম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩।
১১) F. Max Muller, Ibid, P. 420-21.
১২) কল্যানী বন্দ্যোপাধ্যায়, নারী শ্রেণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

কাজী নজরুলের গানে রাগ ও তাঁর সৃষ্ট রাগের গান

অজন্তা জানা

নজরুল্ল সংগীতের মধ্যে বহুধারার গানের সম্ভারের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল – গানে নানা ভঙ্গীমায় রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ। কোন গানে রাগ পূর্ণরূপে বিরাজ করছে আবার কোথাও মিশ্রভাবে, আবার কোথাও বা রাগের হালকা সুরের ছোঁয়া অনুভব করা যায়। সমুদ্রসমান শাস্ত্রীয় রাগসংগীতকে গানের কথায় খুব সুন্দরভাবে প্রয়োগ করে একটা স্বতন্ত্র শিল্পসত্ত্বার সৃষ্টি করেন সুরের যাদুকর কাজী নজরুল্ল। তিনি বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীতের জ্ঞানীগুণী মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, যাঁদের থেকে ভারতীয় উচ্চাঙ্গসংগীতের রাগশিক্ষা লাভ করেছেন। এঁনারা হলেন – ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ, ওস্তাদ দবীর খাঁ, মঞ্জুসাহেব প্রমুখ। রাগের আধারে সৃষ্ট নজরুল্লগীতির বিবিধ ভাগ লক্ষ করা যায় –

১। কাব্যগীতি।

২। রাগভিত্তিক।

৩। গজল।

৪। ইসলামী।

৫। ভক্তিগীতি।

৬। লোকগীতি।

৭। দেশাত্মবোধক।

৮। হাসির গান।

বিভিন্ন শুদ্ধ ও মিশ্ররাগের ব্যবহার করে কাজী নজরুল্ল তাঁর বিভিন্ন অঙ্গের গান, যেমন – ভজন, গজল, কাজরী, খেয়ালঅঙ্গ, ঠুংরী, ভক্তিগীতি ইত্যাদি তৈরি করেছেন। ধ্রুপদাঙ্গের তুলনায় খেয়াল ও ঠুংরী অঙ্গ বেশী লক্ষ করা যায় কবির গানে। নজরুল্লের গানের সুরবৈচিত্র্য এক মৌলিকত্ব নিয়ে বাংলার সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে। এর প্রধান কারণ হল রাগের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার যা কবির মনের ভাবনার কাব্যভাষার সহজপ্রকাশের সঙ্গে সুরের সম্পৃক্ততা। এছাড়াও এই গান পরিবেশনের ক্ষেত্রেও গানের গায়কীর মৌলিকত্বকে বুঝে গাইতে হয়। সুরের আলঙ্কারিক দিকটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত তান, খটকা প্রভৃতি অলংকরণের মাধ্যমে নজরুল্লগীতি গাইতে হয় অবশ্যই গানের ভাব, ভাবনা, ব্যঞ্জনা বজায় রেখে। নিম্নে কিছু গানের তালিকা দেওয়া হল, যেখানে বিভিন্ন রাগের ব্যবহার করেছেন নজরুল্ল—

ক্রমিক নং	রাগ	গান
০১	তিলং	অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে।
০২	আহীর-ভৈরব	অরুণকান্তি কে গো যোগী।
০৩	হাম্বীর	আজো কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া।
০৪	মিশ্র আশাবরী	আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়।
০৫	বেহাগ	আমি সুন্দর নাহি, জানি হে বন্ধু।
০৬	খাম্বাজ মিশ্র	উচাটন মন ধরে রয় না।
০৭	জৌনপুরী	একেলা গোরী জল ?কে চলে গঙ্গাতীর।
০৮	পরজ-বসন্ত	এল ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত।
০৯	দেশী-টোড়ী	এস প্রিয় আরো কাছে।
১০	ভৈরবী	ও গো পূজার থালার আছে আমার।
১১	বাগেশ্রী-বাহার	ও মা দনুজ-দলনী মহাশক্তি নমঃ
১২	খাম্বাজ	কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া।
১৩	হিন্দোল	কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের বকুল বাঁশি।
১৪	জৌনপুরী	কে পরালো মুণ্ডমালা।
১৫	দরবারী কানাড়া	ওর নিশীথ সমাধি ভাঙিও না।
১৬	দরবারী কানাড়া	কেন মেঘের ছায়া আজি।
১৭	ভৈরবী	খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু।
১৮	খাম্বাজ	গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা।
১৯	ভৈরবী	গানগুলি মোর আহত পাখির সম।
২০	মধুমাধবী সারং	চৈতালী চাঁদিনী রাতে।
২১	ভৈরোঁ	জয় বিগলিত করুণা রূপিণী গঙ্গে।
২২	ভৈরবী	জাগো জাগো রে মুসাফির।
২৩	ভৈরবী	তিমির বিদারী অলখ বিহারী।
২৪	বাগেশ্রী	তুই লুকাবি কোথায় মা কালি।
২৫	ভৈরবী	তুমি আমার সকালবেলার সুর।
২৬	বৃন্দাবনী সারং	তৃষিত আকাশ কাঁপে রে।
২৭	ভৈরবী	তোমার হাতের সোনার রাখি।
২৮	শুদ্ধসারং	ধূলি পিঙ্গল জুটাজুট মেলে।
২৯	দরবারি কানাড়া	কেন মেঘের ছায়া আজি।
৩০	টোড়ী	নয়ন মুদিল কুমুদিনী হায়।
৩১	দেশী টোড়ী	মোর না মিটিতে আশা।
৩২	বেহাগ	নিশি নিঝুম ঘুম।

৩৩	জৌনপুরী-মিশ্র	পথ-হারা পাখি কেঁদে ফেরে।
৩৪	ভীমপলশ্রী	পাষাণের ভাঙলে ঘুম।
৩৫	ললিত	পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে।
৩৬	পটদ্বীপ	প্রথম প্রদীপ জ্বালো।
৩৭	মিশ্র দেশ	ফিরিয়া এস এস হে ফিরে।
৩৮	বসন্ত মুখারী	বসন্ত মুখর আজি দক্ষিণ সমীরণে।
৩৯	আনন্দী	বলেছিলে ভুলিবে না মোরে।
৪০	মিশ্র শিবরঞ্জনী	বল মা শ্যামা বল তোর বিগ্রহ।
৪১	ভীমপলশ্রী	বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ।
৪২	পাহাড়ী	বিরহের গুলবাগে মোর ভুল।
৪৩	খাম্বাজ	মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে।
৪৪	শঙ্করা	মধুর নূপুর রুমু ঝুমু বাজে।
৪৫	জৌনপুরী	মম মধুর মিনতি শুন।
৪৬	বাগেশ্রী	মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়।
৪৭	ভৈরবী	মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী।
৪৮	ভৈরবী	মোর না মিটিতে আশা ভাঙ্গিল খেলা।
৪৯	ছায়ানট	শূন্য এ বুকে।
৫০	পিলু	সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে।
৫১	মিঞাঁকিমল্লার	স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা।
৫২	বাগেশ্রী	হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে।
৫৩	শিবরঞ্জনী	হে পার্থসারথী।
৫৪	পটদ্বীপ	হে প্রিয় আমারে দিবনা।
৫৫	জয়জয়ন্তী	মেঘ মেদুর বরষা।
৫৬	বাগেশ্রী	জনম জনম গেলো।
৫৭	শংকরা	পলাশ ফুলের গেলাস ভরি।
৫৮	ইমন	মনে পরে আজ সে কোন জনমে।

রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে সৃষ্ট নজরুলগীতিতে কাজী নজরুল প্রচলিত রাগ, অপ্রচলিত রাগ এবং নিজস্ব সৃষ্ট রাগ ব্যবহার করেছেন। নজরুলের সমস্ত ধরনের আর্টফর্ম-এর মধ্যে সংগীতের সৃষ্টি হল শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের ব্যবহার ছাড়াও তিনি প্রায় কুড়িটি রাগের সৃষ্টি করেছেন। এই রাগগুলি 'নবরাগ' নামক গীতিগুচ্ছের স্বরলিপির বইতে লক্ষ করা যায়। এটি নজরুলের সৃষ্টি সম্ভারের একটি অন্যতম সৃষ্টি। নজরুল সংগীতের বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনা বাংলা গানের জগতে এক অতুলনীয় স্থান অধিকার করে আছে। নজরুলগীতির সুরক্ষাকর্তা শ্রী জগৎ ঘটক মহাশয় নজরুলের 'নবরাগ' নামক গীতিগুচ্ছের স্বরলিপি গ্রন্থের মন্তব্য করেছেন—

“যখন তিনি রাগ সঙ্গীত অবলম্বন করে বাংলা গান রচনায় আত্মনিয়োগ করেন সেইসময় তাঁর ভাব-সমাহিত মনের অবচেতনায় কয়েকটি নতুন রাগ সৃষ্টির প্রেরণা পান। সেইসময় তিনি দুর্লভ সঙ্গীতগ্রন্থ সংগ্রহ করে বহু অপ্রচলিত রাগের গান রচনায় তন্ময় হয়ে যান এবং সেই সকল গানে সুরারোপের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দিয়ে স্বরলিপি করাতে থাকেন। . . . আবার নতুন রাগ সম্পর্কে নজরুল বলেছেন, ‘এগুলো আমার স্বপ্নে পাওয়া রাগ’।”

মার্গসংগীতের রাগের রূপে মোহিত কবি নানা স্বর-সুরে আত্মমগ্ন হয়ে থাকতেন, যার প্রতিফলন কবির ঘুমের সময় স্বপ্নে প্রতিফলিত হতো। এভাবে তাঁর অবচেতন মনেই নানা নতুন স্বরসমূহের ছবি কবির মনের চোখ দিয়ে দেখতেন। স্বর-সুরের রূপ আস্বাদ করতেন। এর ফলস্বরূপ তিনি নতুন নতুন রাগ সৃষ্টি করে ফেলেন। মার্গসংগীতের সুরে বিভোর হয়ে যাওয়া কবি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বর-সুরের স্বপ্ন দেখতেন। কবির অবচেতন মনে নতুন সুর এসে কবি নতুন নতুন রাগের আভাস পেতেন। এর ফলস্বরূপ প্রায় কুড়িটি নতুন রাগ সৃষ্টি করে ফেলেন নজরুল এবং এই রাগের উপর সুন্দর সুন্দর গানও বাঁধেন তিনি। রাগগুলি হল— দোলনচাঁপা, দেবযানী, মিনাক্ষী, অরুণ-রঞ্জনী, রূপমঞ্জরী, নির্ঝরিনী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা, শঙ্করী, অরুণ-ভৈরব, শিবানী ভৈরবী, রুদ্র ভৈরব, যোগিনী, আশা-ভৈরবী, উদাসী ভৈরব, রক্তহংসসারং, বেণুকা, শিব-সরস্বতী, বিষ্ণু-ভৈরব, ময়ূর সিংহাসন। রাগগুলির পরিচয় ও রাগে নিবদ্ধ গানগুলি নীচে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হল—

১। **দোলনচাঁপা**

আরোহী- স গ ক্ষ্ম প, গ ম ন ধ, প ন ধ র্স।

অবরোহী - র্স ন ধ ণ ধ প ক্ষ্ম প, গ ম র স।

বাদী - প

সম্বাদী - স

গান - দোলন চাঁপা বনে দোলে।

২। **দেবযানী**

আরোহী- স র প, ণ ধ, র, ণ ধ ন র্স।

অবরোহী - র্স ণ ধ প র স।

বর্জিত স্বর - গ ও ম।

বাদী - প

সম্বাদী - র

রূপ - ‘গারা’ ও ‘খাম্বাজ’ যেমন - ণ ধ ন র্স প্রবল।

পরিবেশন সময় ‘মিয়া-মল্লার’ এর প্রভাব মুক্ত হওয়া প্রয়োজন, রেখাবের প্রয়োগে মল্লারকে এড়ানো সহজ।

গান - দেবযানীর মনে

প্রথম প্রীতির কলি জাগে।

৩। **মীনাক্ষী**

আরোহী- ণ্ ধ্ স ণ্ র, গ ম প, গ ম প ধ র্স।

অবরোহী - র্স ণ ধ ম প, দ প ম জ্ঞ র, গ স।

বাদী - র

সম্বাদী - প

গান - চপল আঁখির ভাসায়, হে মীনাক্ষী করে যাও।

৪। **অরুণ রঞ্জনী**

আরোহী- স জ্ঞ, প, হ্ম প দ, র্স।

অবরোহী - র্স, ণ্, দ, প, জ্ঞ, ঋ, স।

গান - হাসে আকাশে শুকতারা হাসে।

৫। **নির্ঝরিনী**

আরোহী- স প গ ম প র্স।

অবরোহী - র্স দ প ম গ ম ঋ স।

বাদী - প,

সম্বাদী - স

অবরোহে শুদ্ধ নি গুপ্তভাবে প্রযুক্ত।

গান - রুম্ ঝুম, রুম্ ঝুম কে বাজায় জল ঝুম্ ঝুমি।

৬। **রূপমঞ্জরী**

আরোহী- স র ম প ন র্স।

অবরোহী - র্স ন ধ প, গ ম র গ, স র ন্? স।

বাদী - প,

সম্বাদী - স

গান - পায়েলা বোলে রিনি ঝিনি

নাচে রূপ-মঞ্জরী শ্রীরাধার সঙ্গিনী।

৭। **সন্ধ্যামালতী**

আরোহী- ন স, জ্ঞ র স, গ ম প, ণ ধ ম, প ন র্স।

অবরোহী - র্স ন দ প হ্ম জ্ঞ র স।

বাদী - প

সম্বাদী - স

গান - শোন্ ও সন্ধ্যা মালতী, বালিকা তপতী।

৮। **বনকুন্তলা**

আরোহী- প্ ধ্ স র, গ প ধ প, ধ র্স।

অবরোহী - র্স, ন ধ প গ র, গ স।

বাদী - প

সম্বাদী - র

সময় - সন্ধ্যা

গান - বনকুন্তলা এলায়ে বন শবরী ঝুরে সকরুণ সুরে।

৯। **শঙ্করী**

আরোহী- স গ প ন ধ র্স।

অবরোহী - র্স ন প, গ প ণ ধ প, গ স।

আরোহী-তে গান্ধার মাধ্যমের সঙ্গে আন্দোলিত এবং রেখাব গুপ্ত ভাবে প্রযুক্ত হয়।

বাদী - গ

সম্বাদী - ন।

গান - শঙ্কর অঙ্গলীনা যোগমায়া শঙ্করী শিবানী।

১০। **অরুণ ভৈরব**

আরোহী- ধ্ ণ্ স ঋ স গ ম, দ প, ণ ধ র্স।

অবরোহী - র্স ণ ধ ণ প ম দ প ম গ ম ঋ স।

বাদী - ম,

সম্বাদী - সা।

গান - জাগো অরুণ ভৈরব জাগো হে শিব-ধ্যানী।

১১। **শিবানী ভৈরব**

আরোহী- স র জ্ঞ প, দ র্স।

অবরোহী - র্স র্র জ্ঞ্র র্র ণ দ প, ম জ্ঞ স।

বাদী - স

সম্বাদী - প

গান - ভগবান শিব জাগো জাগো
ছাড়িয়া গেছেন দেবী শিবানী সতী।

১২। **রুদ্র ভৈরব**

আরোহী- স ঋ ম দ ণ র্স।

অবরোহী - র্স ণ দ ম ঋ স।

বাদী - দ,

সম্বাদী - ঋ

গান - এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি হে প্রলয়ঙ্কর।

১৩। **যোগিনী**

আরোহী- স ঋ জ্ঞ হ্ম দ প, ম প ণ দ প র্স।

অবরোহী - র্স ন দ প, প হ্ম জ্ঞ, ম, ম গ ঋ স।

বাদী - প
সম্বাদী - স
গান - শান্ত হও শিব-বিরহ বিহ্বল।

১৪। **আশা ভৈরবী**
আরোহী- স ঋ জ্ঞ স ঋ ম, প দ ণ প দ র্স।
অবরোহী - র্স দ প ম ঋ স।
বাদী - প
সম্বাদী - স
অবরোহে - 'ন' ও 'গ' গুপ্ত।
গান - মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ আছে শুধু প্রাণ।

১৫। **উদাসী ভৈরব**
আরোহী- সা, ঋ, গ, ম, হ্ম ণ র্স, র্ঋ র্স।
অবরোহী - র্ঋ র্স ণ হ্ম ম, গ ম ঋ স।
বাদী - ম
সম্বাদী - স

কোমল ধৈবত কড়ি মধ্যমের সহিত আন্দোলিত ভাবে অল্প প্রযুক্ত হয়। যেমন—ললিত রাগের সামান্য আভাস পাওয়া যায়।

গান - সতীহারা উদাসী ভৈরব কাঁদে।

১৬। **রক্তহংস সারং**
আরোহী - স র ম প ধ র্স।
অবরোহী - র্স ন প ম র স।
বাদী - প
সম্বাদী - র
গান - বল রাঙা হংস দূতী তার বারতা।

১৭। **বেণুকা**
আরোহী - স র ম, প ণ ধ, প ধ ম, প ধ র্স।
অবরোহী - র্স ন প ধ ম, গ র গ স।
বাদী - ম,
সম্বাদী - স

আরোহীতে নিখাদ ও গান্ধার প্রবল ভাবে প্রযুক্ত।

গান - বেণুকা বাজায় মহুয়া বনে।

১৮। **শিব সরস্বতী**
আরোহী- দ্ ণ স গ ম, দ প, জ্ঞ ম দ ণ র্স।

অবরোহী – র্স ণ দ ম, দ প, ম জ্ঞ ম স।
বাদী – ম
সম্বাদী – স
গান – জয়ী ব্রহ্ম-বিদ্যা শিব সরস্বতী।

১৯। বিষ্ণু-ভৈরব

আরোহী– স ঋ ম প দ, ণ দ, দ ঋ র্স।
অবরোহী – র্সা ণ দ প ম গ ম ঋ স।
গান – বিষ্ণু সহ ভৈরব অপরূপ মিলন শম্ভু মাধব।

২০। ময়ূর সিংহাসন

আরোহী– স র গ, ম প, ধ, ণ র্স
অবরোহী – র্স ন র্স, ণ ধ, প ধ ম প, ম গ, র, জ্ঞ র স।
গান – মম তনুর ময়ূর সিংহাসন।

নজরুলের গান রাগের ব্যবহার কীভাবে তিনি করেছেন তা রাগগুলির সম্পর্কে আলোচনা করে তবে গানের স্বরের মধ্যে রাগরূপকে খোঁজার চেষ্টা করা হবে নিম্নলিখিত কয়েকটি গানের মাধ্যমে—

রাগ - বাগেশ্রী

আরোহণ – সা গ ম ধ নি র্সা অথবা
সা নি ধনি সাম, গ ম ধ নি র্সা
অবরোহণ – র্সা নি ধ, ম পধ গ ম গ রে সা
পকড় – সা, নি ধ, সা ম ধ নি ধ, ম, গ রে, সা

এই রাগের কয়েকটি স্বরবিস্তার

১। সা নি ধ নি সা ম – , ম গ ম ধ নি ধ, ম নি ধ, ম ধ নি র্সা – ,
র্সা নি ধ, ম প ধ মগ, মগ রে সা, ধ নি সা ম – ।

২। সানি সা, মগম, নি ধ নি, র্সা–, র্রে নি র্সা নিধ, ম ধ নি ধ, গ, গ ম, মধ,
ধনি, ধ, র্সা, ধ নি র্সা ধনি, ধর্সানিধ, মধনি, র্সানিধ, মপধ,
ম গ সারে – সা।

‘মাগো চিন্ময়ী রূপ ধ’রে আয়’ – গানটি বাগেশ্রী রাগে রচিত।

বাগেশ্রী/ত্রিতাল
মাগো চিন্ময়ী রূপ ধ’রে আয়।
মৃন্ময়ীরূপ তোর পূজি শ্রীদুর্গা,

তাই দূর্গতি কাটিল না হায়।।

০ ১ + ৩ ।।

। ধণা পধা ।। র্সা [নর্]র্সা ণা ধা । [প]মা -। জ্ঞা জ্ঞা । [গ]রাঃ -জ্ঞঃ সা -। । -। -।} -। -। ।
মo। গোo চিন্ oo ম য়ী রূ প্ ধ' রে আ o o o o য় o o

। সা -রা সা সা । ণ্া [-র]সা [প]ধ্া -ণা । সা সমা মা মা । -। মা [প]মা -জ্ঞা ।
মৃ ণ্ ম য়ী রূ প্ তো র্ পূ জিo শ্রী দু র্ গা তা ই

। মা -ধা ধা ধা । ধা ধা ধা ধণা । পধা -ণপা -ধনাঃ -ধঃ । [-প]মা -জ্ঞা[ম] -রা[জ্ঞ] -সা ।।
দু র্ গ তি কা টি ল নাo হাo oo oo o o o o য়্

রাগ - কাফী

আরোহণ – সা রে গ ম প ধ নি র্সা

অবরোহণ – র্সা নি ধ প ম গ রে সা

পকড় – সা সা, রে রে, গ গ, ম ম, প

এই রাগের কয়েকটি স্বরবিস্তার

১। সা রে রেগ মম –প, ম প ম গ, রে গ, রে সা নি সা, রে গ ম প,
ম গ রে– ম গ রে সা নি ধ সা, রেরে গগ মম প।

২। ম প নি র্সা নি ধ প, প ধ প ম গ রে সা রে গ ম, রে গ ম প, ধ নি র্সা,
রেঁ গঁ র্সা, নি ধ প, র্সা নি ধ প, ম গ রে গ ম প, ম গ রে সা

৩। ম প ধ নি ধ প, ধ নি র্সা, রেঁ গঁ রেঁ র্সা, নি ধ প, র্সা নি ধ প, ম প,
রে গ ম প, গরে মগ পম গরে রে গ ম প, ম গ রে সা

এই রাগে গ ও নি কোমল, বাকি সব স্বর শুদ্ধ। কখনও কখনও শুদ্ধ গ, শুদ্ধ নি ব্যবহার হয়ে থাকে।

'বনে যায় (গোঠে যায়) আনন্দ–দুলাল' এই গানটি কাফী রাগে রচিত।

'বনে যায় (গোঠে যায়) আনন্দ দুলাল' –গানটির স্বরের অল্প কিছু অংশ দেওয়া হল রাগরূপকে বোঝানোর জন্য।

। [র]পা -। -। -। । -। -। সা রা । [র]পা -। -। -। । -। -। পা পমা ।
যা o o o o য়্ গো ঠে যা o o o o য়্ ব্র জo

। পা পর্রা র্রা -। । র্রা র্রা র্জ্ঞর্রা -র্সর্রা । র্রা র্রর্মা র্জ্ঞা র্রা । র্সা -। -। -। ।
গো পিo কা র্ প্রা ণ তাo oর্ চ রo ণে নূ পূ o o র্

। র্সা র্সর্রা র্সা ণা । ণধা পধা [প]মা [প]-মা । পা ধা ণর্জ্ঞা র্রা । র্সা -। মা গা ।
শ্রী মo তী রা ধিo কাo তা র্ বাঁ শ রীo র সু র্ সে যে

রাগ - হাম্বীর/হামীর

আরোহণ – সা রে সা, গ ম ধ, নি ধ র্সা

অবরোহণ – র্সা নি ধ প, ম॑ প ধ প, গ ম রে সা

এই রাগের কয়েকটি স্বরবিস্তার

১। সা রে সা, গ ম $^{নি}$ধ, ম॑ প ধ প, গ ম রে সা।

২। সারেসা, গ ম $^{নি}$ধ, নি ধ র্সা, র্সা নি ধ প, ম॑ প গ ম $^{নি}$ধ,
ম॑ প ধ, গ ম রে সা।

৩। সা, সারেসা গ ম $^{নি}$ধ, ধ প, নি ধ প, গ, ম রে গ ম
$^{নি}$ধ, প, র্সানিধপ, ম॑প ধ প, গ, মরে সা।

৪। সা রেসা গ ম $^{নি}$ধ, নিধ, র্সা –, নিধ, র্সার্রের্সা, র্গ,
র্মর্রে র্সা, নি ধ, প, ম॑পধপ মরে, গ ম $^{নি}$ধ প,
ম॑ প, ধ নি ধ প, গ, মরেসারেসা।

‘আজো কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া’ – গানটি হাম্বীর রাগে রচিত।

হাম্বীর – ত্রিতাল

আজো কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া।

চম্পা কুঞ্জে আজি গুঞ্জে ভ্রমরা – কুহরিছে পাপিয়া।

	০					১					+					৩				
	[পা]													[-া		-া	-া	-া	-া	
।।{	-া	ক্ষা	পা	ধা	।	পা	পা	গা	মা	।	^{ম}র্সা	ধা	-া	(ধা	।	ধনা	নর্রাসা	নধা	-পা)}	।
	০	আ	জো	কাঁ		দে	কা	০	ন		নে	০	০	কো		য়ে০	লি০০০	য়া০	০	
।	{পা	-ক্ষা	পা	মা	।	-গা	মা	মধা	পা	।	গা	মা	রা	সা	।	-না	রা	সা	-া}	।
	চ	ম্	পা	কু		ন	জে	আ০	জি		গু	ণ্	জে	ভ্র		০	ম	রা	০	

আহীর ভৈরব

এই রাগটি ভৈরব রাগের একটি প্রকার। পূর্বাঙ্গে ভৈরব এবং উত্তরাঙ্গে কাফী রাগের মিশ্রণে এই রাগ সৃষ্টি হয়েছে। এই রাগের উত্তরাঙ্গে শুদ্ধ ‘ধ’ ও কোমল ‘নি’– এর প্রয়োগ হয়। ভৈরব অঙ্গ প্রধান হওয়ার কারণে এই রাগকে ভৈরব ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরোহে কখনো কখনো তীব্র ঋষভ ব্যবহার করা হয় যদিও তা কদাচিৎ।

এই রাগে মধ্যমের উপর ন্যাস করলে রাগ সুন্দর হয়ে ওঠে।

চলন– গ, ম, রে, সা, রেগ, ম, প, ধনিধ, প, মপ, মগ, মরে, সা।

মমরেম, পপমপ, পমপধ, নিধপধ, মপগম, রেরেগম, পগরেসা।

এই রাগের কয়েকটি স্বরবিস্তার

১। [ম]গপ, [সা]রেসা, সাসারেসা, সারেসা, নি়সাগ[গ]রে,

গগম, [ম]গম(গ)রেপ, [ম]গমরেসা।

২। রেরেসাসা, গ(গ)রেগম, মম(প)পগ, ম(গ)রেরে, সা,

সা(মগ)রেসাম, গরেসাপ, গ(ম)ম(প)পগ, ম(গমগ)গরেসা।

৩। ম(গ)ম(ম)রেম, পপ(প)মপ, প(প)মপধ, নিধপধ,

[ম]ম প [গ]গ ম, রেরেগ(ম)ম, প [ম]গরেসা।

'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী' – গানটি আহীর ভৈরব রাগে রচিত। গানটির স্বরসমূহের কিছু অংশ দেওয়া হল –

আহীর ভৈরব/ত্রিতাল

অরুণ-কান্তি কেগো যোগী ভিখারী।

নীরবে হেসে দাঁড়াইলে এসে

প্রখর তেজ তব নেহারিতে নারি।।

রাসবিলাসিনী আমি আহিরিণী

শ্যামল-কিশোর-রূপ শুধু চিনি

অম্বরে হেরি আজ একি জ্যোতি-পুঞ্জ ?

হে গিরিজাপতি! কোথা গিরিধারী।।

	০					১					+					৩				
				[ধণর্সা		-ধণা]														
॥	{সা	সধা	ধা	(ধা	।	র্সণা)	পা	মা	মা	।	গা	-ঋা	গা	মগা	।	ঋা	গঋা	সা	-া}	।
	অ	রু০	ণ	কা		ন	তি	কে	গো		যো	০	গী	ভি০		খা	০	রী	০	
।	-া	সঋসাঃ	-ণ্ধ্ঃ	ণা	।	ণ্	গঋা	সা	-া	।	-া	সঋাঃ	গঃ	গা	।	মা	-া	মগা	-মপা	।
	০	নী০০	র০	বে		হে	০	সে	০		০	দাঁড়া	ই	লে		এ	০	সে০	০০	
।	-া	মগা	-াসঋ	ধ্ণা্	।	ণ্	গঋা	সা	-া	।	-া	সঋাঃ	গঃ	ঋা	।	মা	-া	মা	-া	।
	০	নী০	র০	বে০		হে	০	সে	০		০	দাঁড়া	ই	লে		এ	০	সে	০	
।	মা	মপা	পা	পধণা	।	-পা	ধা	র্না	র্সা	।	-া	ধর্নাঃ	র্সঃ	ণর্সা	।	র্ঋা	র্গর্ঋা	র্সা	-া	।
	প্র	খ০	র	তে০০		০	জ	ত	ব		০	নেহা	রি	তে০		না	০	রি	০	
।	মা	মপা	পা	পধণা	।	-পা	ধা	ণা	র্সা	।	ধনাঃ		পা	মঃ	।	ঋা	গঋা	সা	-া	॥
	প্র	খ০	র	তে০০		০	জ	ত	ব		০ নেহা		রি	তে		না	০	রি	০	

নজরুলগীতি পরিবেশনের জন্য রাগশিক্ষার প্রয়োজন। প্রত্যেক রাগের স্বরবিস্তার, স্বরের চলন শিখে সেই রাগের নজরুলের গানের স্বরলিপি লক্ষ্য করলে রাগকে ধরা যাবে। নজরুলের এতো বিপুল সংখ্যক রাগের জ্ঞান অর্থাৎ হিন্দুস্থানী রাগ এবং দক্ষিণী রাগেরও ব্যবহার করেছেন তিনি তাঁর গানে। তাঁর সৃষ্টির সম্ভার পুরো উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগকে কেন্দ্র করে এবং কিছু দক্ষিণী রাগেরও ব্যবহার করেছেন নজরুল। তিনি প্রখ্যাত সতীশ চন্দ্র কাঞ্জিলাল মহাশয়ের কাছে সংগীতের শাস্ত্রানুযায়ী সঙ্গীত শিক্ষালাভ করেছেন। সতীশবাবু একজন গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি সাহিত্য চর্চাও করতেন, যার কিছুটা প্রভাব নজরুলের উপর পড়েছিলো। শার্ঙ্গদেবের সময় থেকে ভারতীয় সংগীত দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে – উত্তর ভারতীয় সংগীত ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত। বাংলায় দক্ষিণ ভারতীয় রাগের কিছু প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের সুরে নজরুল যেসব গান তৈরি করেছেন, নিম্নে তার একটি তালিকা দেওয়া হল—

ক্রমিক নং	**রাগ**	**গান**
১	নীলাম্বরী	নীলাম্বরী শাড়ী পরি।
২	দেবগান্ধার	খেলে নন্দের আঙিনায়।
৩	শ্যামকল্যাণ	রস ঘন শ্যাম কল্যাণ সুন্দর।
৪	বড় হংস সারং	হংস মিথুন ওগো যাও কয়ে যাও।
৫	নাগসরাবলী	এস চির জনমের সাথী।
৬	বসন্ত মুখারী	বসন্ত মুখর আজি।
৭	মধুমাধবী সারং	চৈতালী চাঁদিনী রাতে।
৮	চাঁদনী কেদারা	চাঁদিনী রাতে মল্লিকালতা।
৯	শাওন কল্যাণ	সন্ধ্যা গোধূলি লগনে কে।
১০	আনন্দী	বলে ছলে ভুলিবে না মোরে।
১১	নট বেহাগ	ঝুম ঝুম ঝুম নূপুর বাজে।

১২	পট মঞ্জরী	আমি পথ মঞ্জরী।
১৩	লঙ্কাদহন সারং	অগ্নিগিরি ঘুমন্ত উঠিল জাগিয়া।
১৪	নারায়ণী	নারায়ণী উমা দেখে যা।
১৫	কর্ণাটী সামন্ত	কাবেরী নদী জলে কে গো।

সুরবৈচিত্র্য, গানে রাগ-রাগিণীর রূপদান এবং গানে এক বিশেষ প্রকার ভাষার ব্যবহার নজরুলগীতিকে অন্যান্য বাংলাগানের থেকে আলাদা করেছে অর্থাৎ এই গানে এক মৌলিকসত্ত্বা তৈরি করেছে। গানে রাগের প্রয়োগে এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরের প্রতি গভীর ভালোবাসা, প্রেম, অনুরাগ থেকে নিজস্ব সৃষ্ট কুড়িটি রাগ-এ সমস্ত সুরের সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে কাজী নজরুল বাংলাগানের জগৎকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। এভাবে বিশ্বসংগীতের অস্তিত্বের সঙ্গে বাংলাগানের অস্তিত্বকে সমৃদ্ধ করে যাবে নজরুলসংগীত।

তথ্যসূত্র :

১। দত্ত দেবব্রত, সংগীত-তত্ত্ব (প্রথম খণ্ড) (শাস্ত্রীয় তথা ভাব সংগীত প্রসঙ্গ), ব্রতী প্রকাশনী, "গানের ঘর", "বিদ্যাসাগর টাওয়ার" (ত্রিতল) ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, অষ্টম সংস্করণ : ২৫ শে ডিসেম্বর, ২০১৫।

২। লাহিড়ী চিন্ময়, মগনগীত ও তান মঞ্জরী (প্রথম খণ্ড), মন্দিরা লাহিড়ী, ৪/১৩ চণ্ডীতলা লেন, কলকাতা ৭০০০৪০, প্রথম প্রকাশ : শ্রীপঞ্চমী ৫ই ফাল্গুন, ১৩৮৯।

৩। দত্ত দেবব্রত, সংগীত-তত্ত্ব (নজরুল প্রসঙ্গ), ব্রতী প্রকাশনী, ৪৯/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ : ইং ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯১, বাং ৯ই পৌষ ১৩৯৮।

৪। গঙ্গোপাধ্যায় সুবোধ, সঙ্গীত প্রবর, রঞ্জনা প্রকাশনী, হাওড়া, প্রথম প্রকাশ : ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৯২।

৫। গঙ্গোপাধ্যায় সুবোধ, রবীন্দ্র-নজরুল বিভাকর (প্রথম ভাগ), মীরা নাথ, ৭২/৩ এফ/ ১ আর. কে. চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা ৭০০০৪২, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৮০।

৬। ইসলাম কাজী নজরুল, স্বরলিপি-নিতাই ঘটক, সম্পাদনা, আবদুল আযীয আল আমান, শ্রেষ্ঠ নজরুল স্বরলিপি অখণ্ড, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬, ১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ : কবির ৮৪তম জন্মদিন ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯, ২৬শে মে ১৯৮২।

৭। গঙ্গোপাধ্যায় সুবোধ, রবীন্দ্র-নজরুল বিভাকর (দ্বিতীয় ভাগ), মীরা নাথ, ৭২/৩ এফ/ ১ আর. কে. চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা ৭০০০৪২,১মপ্রকাশ :২৬শে জানুয়ারী ১৯৮১।

৮। ভাতখণ্ডে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ,বঙ্গানুবাদ-সঙ্গীতা মিশ্র,হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি,৯ম খণ্ড, দীপায়ন, সলীল সাহা,২০কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা, ১ম প্রকাশ : পৌষ ১৩৯৮।

৯। ভাতখণ্ডে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ, বঙ্গানুবাদ-সন্দীপন ভট্টাচার্য, অসীম চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৯।

কলকাতা মাদ্রাসার প্রতি বঞ্চনা ও বাঙালি মুসলিম সমাজে তার প্রভাব

মহ সেখ মারুফ আজম

মাদ্রাসা হল আরবি শব্দ। যেটি আরবি দারসুন থেকে উদ্ভূত যার অর্থ পাঠ। মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রথম প্রতিষ্ঠান ছিল সাফা পর্বতের পাদদেশে যায়েদ-বিন-আরকামের বাড়ীতে।[১] পরবর্তীকালে মসজিদে নববীর মধ্যে মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়, যেটি জ্ঞান বিজ্ঞান ও ঐশ্রী প্রেমের প্রতীক।[২] ভারতবর্ষে আধুনিক মাদ্রাসার গোড়াপত্তন ঘটে ইংরেজ কোম্পানির দ্বারা। মূলত দেশ শাসনের প্রয়োজনে ইসলামি আইন জানা ব্যক্তি দরকার ছিল। কোম্পানি এর নাম দিয়েছিল ইংরাজিতে 'Calcutta Madrasah', উর্দুতে 'মাদ্রাসা আলিয়া কলকাতা', আরবিতে 'আল মাদ্রাসাতুল আলিয়াতুল কালকাত্তিয়াহ'। এই মাদ্রাসা জড়িয়ে আছে ভারতের শিক্ষা আন্দোলনের ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস। সেই মাদ্রাসা ইতিহাস গড়ল, জন্মের ২২৯ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল।[৩] তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় এটির অবস্থান হওয়ায় বাঙালি মুসলিম সমাজে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়। এই মাদ্রাসায় পড়া ব্যক্তিদের দেওয়ানি ও নিজামত আদালতের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য কাজী, সুতকি, ও মৌলবিদের নিয়োগ করা হয়েছিল।[৪]

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : সমাজ, রাজনীতি –

১৭৮০ সালে কলকাতায় কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ারেন হেস্টিং এবং রাষ্ট্রীয় তহবিলের একটা অংশ ব্যয় করা হয়।[৫] ফলে কোম্পানির প্রশাসনের সহায়ক শ্রেণি সৃষ্টির পাশাপাশি কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান শিক্ষা বিস্তারে নবযুগের সূচনা হয়। উর্দুভাষী মুসলিমদের প্রাধান্য থাকলেও প্রচুর বাঙালি মুসলিম এই মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করতে থাকে।

প্রথমদিকে এই মাদ্রাসার মান উন্নয়নের চেষ্টা হলেও পরবর্তীতে কোম্পানি, ইংরেজ শাসক ও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার একে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রয়াস নেয়নি। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৬০ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় (২০০৮)।

কলকাতা মাদ্রাসা কলেজ ২২৯ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয় হল। কিন্তু কি কারণে এত সময় ব্যয় হল? কোনো বঞ্চনার কবলে পড়েছিলো তা বিশ্লেষণ করলে এটি

বোঝা যেতে পারে। সেই সঙ্গে বাঙালি মুসলিম সমাজ এতে কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা আলোচনা করা যাক।

মাদ্রাসার ১৮৫৭ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারা :

রাজধানী কলকাতায়, মৌলানা মজিউদ্দিনকে হেড মাওলানা করা হয়েছিলো এবং আরবি, উর্দু, ফরাসি, হাদিস, তফসির ও ফেকাহ ইত্যাদি বিষয় পড়ানো শুরু হয়।[৬] ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ওয়েলেসলি স্কোয়ারের বর্তমান সুরম্য ভবনটি শিলান্যাস করেন ভারতের গর্ভনর জেনালের পিট আমহার্স্ট। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে এর পাঠক্রমে যুক্ত হয় ARABIC, RHETORIC, ARITHMETIC, GEIMETRY, ASTONOMY, LOGIC < NATURAL PHILOSOPOHY, ছাত্ররা এখানে পড়তে আসতো গুজরাট, কাশ্মীর ও কর্ণাটক প্রভৃতি প্রদেশ থেকে। তখন বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও আসামের সমস্ত মাদ্রাসা পরিচালিত হত এই মাদ্রাসার অধীনে। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম এখানে ইউনানি নামক দেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লাস শুরু হয়।[৭] এখানে একটা ইংরাজি ক্লাস ও খোলা হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শীঘ্রই বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে কলকাতা মাদ্রাসা পরিচালনার ভার তৎকালীন খানদানী মুসলমান (আসরাফ শ্রেণি) দ্বারা হত।[৮] এই সময় উইলিয়াম হান্টার বলেছিলেন, আরবী-ফারসির শিক্ষা সরকারি চাকরিতে রুজি রোজগারের পথ হিসাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ফারসি ও আরবীই হয়ে রইলো এর একমাত্র শিক্ষনীয় বিষয়।[৯]

ওয়ারেন হেস্টিং কলকাতা মাদ্রাসার জন্য যে, টাকা বরাদ্দ করে গেছে এবং হাজী মুহম্মদ মহসিন ওয়াকেফে যে টাকা রেখে গেছে তা মাদ্রাসার আধুনিকরনে ব্যয় করা যেতো। ১৮১৬ তে মহসিনের সম্পত্তি দাঁড়ায় ১৫,৮৫,৫০০ টাকা এবং খাজনা আদায় থেকে ১৮০০০০ টাকা। কিন্তু তখন সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি।[১০]

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু স্কুল ও ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন হয় যা কলকাতা মাদ্রাসা কলেজের অনেক পরে। বাংলার হিন্দু সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হলেও মুসলমান সমাজে সেরকম প্রভাব পড়েনি।[১১] ইংরেজ সরকারের উদ্যোগে ভারতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে যারা (মুসলিম) ৩৭ বছর আগে পথচলা শুরু করে, তারা হিন্দু সমাজ অপেক্ষা পিছিয়ে পড়ে নিজেদের দূরদর্শীতা ও শেষে সরকারি অবহেলার দরুন।[১২]

সিপাহী বিদ্রোহের পর কলকাতা মাদ্রাসা :

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মহাবিদ্রোহ দেখা দেয়। এই মাদ্রাসা কলেজের অনেক বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক যোগদান করায় বাংলার ছোটলাট এই মাদ্রাসাকে বিলুপ্ত ঘটাতে চেয়েছিল।[১৩] নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলি এই দুই মুসলিম মনীষি কলকাতা মাদ্রাসার উন্নয়নে খুবই উদ্দোগী হয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে এই মাদ্রাসায় স্নাতোকোত্তর বিভাগ খোলা হয়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মাওলা বখশ কমিটি এই মাদ্রাসা কলেজকে অ্যারাবিক ইউনিভার্সিটি করার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু তা কার্যকর

হয়নি। ১৯৪৬ সালে বাংলার শিক্ষামন্ত্রী মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেবের নেতৃত্বে কমিটি এই মাদ্রাসাকে A ISLAMIC UNIVERSITY করার সুপারিশ করলেও তা কার্যকর হয়নি। উপরন্তু SEPERATION COUNCIAL এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহামেডান কলেজ, বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড ও ইলিয়ট হোস্টেলের রেকর্ড, বই, খাতা, সার্টিফিকেট, পান্ডুলিপি, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ সমস্ত আসবাবপত্র ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয় ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্ট। যা কলকাতা মাদ্রাসার যাত্রাপথে সাময়িক ছেদ পড়ে।[১৪]

দেশ স্বাধীন ও কলকাতা মাদ্রাসা :

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে, ৪ঠা এপ্রিল মহামেডান কলেজ নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে কথা বলে।[১৫] এই মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য আন্দোলনকারি আবু সালেহ রেজাউল করিম সাহেব বলেন-১৯৭৩ জানুয়ারিতে ধর্মতলায় ১৭ দিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চলে যার সভাপতি ছিলেন ড. শহিদুল ইসলাম, আমাদের ৬টি দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল আলিয়া মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে ও মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করতে হবে।[১৬]

একসময় একজন B.A পাশ WBCS অফিসার, মাদ্রাসা বোর্ডের সেক্রেটারি হয়ে, মাদ্রাসা কলেজকে পরিচালনা করত এবং সমস্ত সার্টিফিকেটে সই করতেন। এটা মাদ্রাসা কলেজের জীবনকালের চরম দুর্দিনের সাক্ষ বহন করে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে আগের ১০ বছর প্রিন্সিপালের পদ শূন্য ছিল।[১৭] কিছুদিনের মধ্যে কলকাতা মাদ্রাসা কলেজকে HIGHER EDUCATION DEPERTMENT এর হাত থেকে সরিয়ে স্কুল এডুকেশনের অধীনে স্থানান্তরিত করা হয়। এটা আর এক অধঃপতন। মাসের পর মাস হেড ক্লার্ক, ক্যাশিয়ার, টাইপিস্ট, ছিল না। ১৯৯৭ সাল থেকে সাত বছর আবার অফিসার ইন-চার্জ দিয়ে কলেজ চলে।[১৮]

২০০২ সালে এ. আর কিদওয়াই কমিটির প্রতিবেদনে এই কলেজকে DEEMED UNIVERSITY করার সুপারিশ করেও কার্যকর হয়নি।[১৯] এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে মহ, কামরুজ্জামান বলেন, ২০০৩ সালে আমরা একটি বড় ধরনের আন্দোলন করেছিলাম, তৎকালিন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে রাইটার্স বিল্ডিংএ ডেপুটেশন দিয়েছিলাম তাতে প্রধান দাবি ছিল কলকাতা মাদ্রাসা কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে।[২০]

অবশেষে সরকার CALCUTTA MADRASAH COLLEGE কে আপগ্রেড করে পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়-এ উন্নীত করেন। Kolkata Gazettea-এ The Aliah University Act-2007-এ বলা হয়, Where it is Expedient to Upgrade Calcutta Madrasah College one of the Oldest Institutions of Higher Learning and Culture in India and that End, to Establish and Incorporate a Feaching University at Kolkata to Dissolve the Calcutta Madrasah

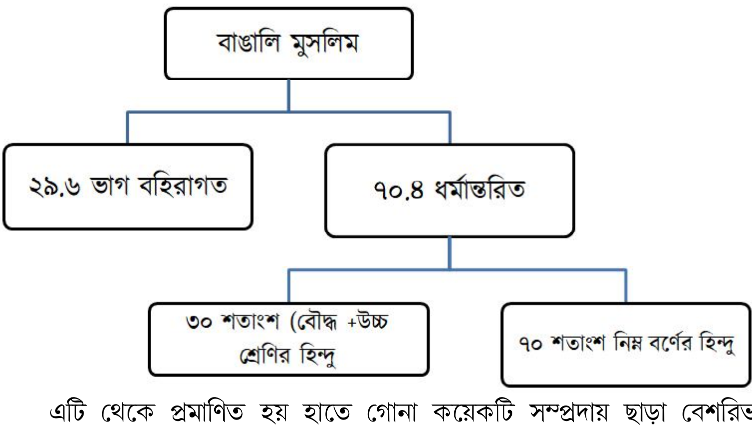
College, A Government Madrasah College and to Transfer to, and Best in the Said University all Properties and Rights of the Said College.[২১] বর্তমানে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছড়িয়ে আছে পার্কসার্কাসে, তালতলা, সল্টলেক, নিউটাউন প্রভৃতি স্থানে। এখানে পড়ানো হয় আর্টস, সাইন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং, বি.এড ইত্যাদি।[২২] ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মলগ্নে ভারতের এই প্রাচীনতম শিক্ষানিকেতনের নাম ছিল মাহামাডান কলেজ, ১৮৫০ সালে ক্যালকাটা মাদ্রাসা, ১৯৮৭ সাল থেকে ক্যালকাটা মাদ্রাসা কলেজ এবং ২০০৭ সালে নাম হয় আলীয়া বিশ্ববিদ্যালয়।[২৩]

কলকাতা মাদ্রাসা ও বাঙালি মুসলিম সমাজ :

মুঘল আমল থেকেই বাঙালি মুসলিম বা ধর্মান্তরিত মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা নিম্নমানের ছিল। এরা সাধারণত, চাষবাস, নৌকা চালানো, মাছ ধরা, সিপাহির নিম্ন পদ ইত্যাদি করে জীবিকা নির্বাহ করত। অন্যদিকে আসরাফ শ্রেণির অবস্থা ভালো ছিল সব দিক থেকেই। ইংরেজ শাসন কালেও বাঙালি মুসলিমদের সেরকম অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। তবে এক্ষেত্রে বাঙালি মুসলিমদের আলোর দিশা দেখিয়েছিলো আলিয়া মাদ্রাসা। যার সাহায্যে ক্ষুদ্র হলেও মুসলিম বুদ্ধিজীবীর জন্ম হয়েছিল। মুসলিমদের গোঁড়ামি, সরকারের অসহযোগিতার দরুন একটি সার্ভেতে দেখা যায় আলিয়া মাদ্রাসার ৯০ বছর পরেও (১৮৭১) বাংলা দেশে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থান ছিলো।

যথাক্রমে সর্বমোট চাকরির মধ্যে ইংরেজ ছিল ১৩৩৮, হিন্দু ৬৮১, মুসলমান ছিল ৯২, এ থেকে বোঝা যায় মুসলমানদের অবস্থা।[২৪]

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ড.এম.এ. করিম সাহেব “বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস” গ্রন্থে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের উৎসের একটি ছক প্রকাশ করেন। তার মতে বাঙালি মুসলিমদের উৎস হল—



এটি থেকে প্রমাণিত হয় হাতে গোনা কয়েকটি সম্প্রদায় ছাড়া বেশরিভাগ বাঙালি মুসলমান ধর্মান্তরিত এবং পিছিয়ে পড়া।[২৫]

সচার কমিটির রিপোর্টের পর এই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রকাশ পাই। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। সেই মেরুদন্ডই যেখানে পঙ্গু, সে জাতি সোজা হয়ে দাঁড়াবে কেমন ভাবে? বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ধর্মীয় ভাবাবেগকে অধিক গুরুত্ব ও সরকারের উদাসিনতার দরুন মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকরণের ব্যাঘাত ঘটে।[২৬] বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসার সংখ্যা হল ৬১৪, তারমধ্যে ১০২টি সিনিয়র মাদ্রাসা ও ৫১২টি হাই মাদ্রাসা। সেই সঙ্গে রয়েছে কয়েকশো আন-এডেড মাদ্রাসা।[২৭] আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক থিওলজি বিষয়কে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়ানোর জন্য ১১টি মাদ্রাসাকে অনুমোদন দিয়েছে।[২৮] উপরিক্ত মাদ্রাসা গুলির ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রধান ক্ষেত্র। সে কারণে মুসলিমদের উচ্চ শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটছে। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের উচিৎ যে সমস্ত জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা ২৫% এর উপরে সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার ধাঁচে পূর্ণাঙ্গ কলেজ নির্মাণ করা। যার ফলে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা আপন পরিবেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারবে।

সেই সঙ্গে কলেজ গুলি থাকবে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। বাঙালি মুসলিম সমাজ যেহেতু বেশিরভাগ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত সেই কারনে এখানে এগ্রিকালচার নামক বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গের ২৫ শতাংশের উপরে যে জেলাগুলিতে মুসলিম জনসংখ্যা সেগুলি হল কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও হাওড়া ইত্যাদি ১১টি জেলায় মাদ্রাসা ও আধুনিক শিক্ষার জন্য মডেল কলেজ নির্মাণ করে সেগুলি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে রাখলে বাঙালি মুসলমি সমাজের জাগরণে সাফল্য লাভ করত। যা বর্তমান কালে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অবহেলা ও দুর্দশা অনেকটাই দূর হত। যার দরুন সার্বিকভাবে লাভবান হত বাঙালি মুসলিম সমাজ। সাধারণত মুসলিম জনসংখ্যা বেশি সেই সমস্ত জেলাগুলির স্বাক্ষরতার হার কম। এখানে চাহিদা অনুযায়ী মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খুবই কম। যার বেশিরভাগই পরিকাঠামো, সার্বিক মান নিম্নমানের, তবে বেসরকারি উদ্যোগে মিশন ও কিছু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যা জেলার শিক্ষা নবজাগরনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে।[২৯]

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর বঙ্গের মুসলিম জনসংখ্যা অধিক এই সমস্ত জেলাগুলিতে মডেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে সেখানে প্রাথমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা চালু করে ভোকাশোনাল, নার্সিং, বি.এড, এগ্রিকালচার, ও প্রফেশনাল কোর্সগুলি চালু করে বাঙালি মুসলিম সমাজের উন্নয়নের পাথেয় হয়ে থাকতে পারতো।

তবে বর্তমান সময়ে মুসলিমরা অনেকটা এগোতে পারছে। ইসলাম অনুযায়ী শিক্ষার প্রচারও দিনের কাজ। তাই মুসলিম শিক্ষিত সমাজেরও দায়িত্ব আছে মুসলিমদের গণচেতনা ও গণজাগরনে।[৩০] এই আপদমস্তক পিছিয়ে পড়া বাঙালি জাতির

অগ্রগতির প্রধান সহায় হল শিক্ষা। আর এর মাধ্যমে মধ্যকালের মত বলিষ্ঠ বাঙালি নেতৃত্বের উদ্ভব হবে। যারা বাঙালি মুসলিম সমাজকে পথ দেখাবে। যেমন হলেন শের এ বাংলা ফজলুল হক।[৩১] ব্রিটিশদের দ্বারা প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা মাদ্রাসার দরুন মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ক্ষুদ্র হলেও এখান থেকে মাওলানা, কাজী, মুফতি, হেকিম, ম্যাজিসট্রেট, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, আইনবিদ, শিক্ষক শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। যা বাঙালি মুসলিমরা পশ্চাৎপদ জাতি থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়ায়। ১৭৮০-২০০৭ এই সময় পর্যন্ত কলকাতা মাদ্রাসার সময় কালে বাঙালি মুসলিম জাতি অনেক অগ্রগতি করতে পারতো কিন্তু সেভাবে তারা উন্নয়নের লাভবান হতে পারেনি। একটা জাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই সময়কাল অনেক। কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি।

১৮৭৫ সালে মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়ানটাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে যে আলিগড় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয় তা পরবর্তীকালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।[৩২] এর দ্বারা ভারতের মুসলিম নবজাগরণে সূচনা হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে দেশ-বিদেশের মুসলিম জাগরণে এর অবদান অনস্বীকার্য। অন্যদিকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ৯৫ বছর আগে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হলেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অগ্রগতি হয়নি। এখানে অবশ্যয় বঞ্চনা লক্ষ করা যায় যা বাঙালি মুসলিম জাতির উপরও প্রভাব পড়ে।

মুসলমান সমাজের নিজস্ব পরিবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে কত প্রয়োজন তা অনুধাবন করে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত একটি নিবন্ধ লেখেন মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সালে তার কিছু অংশ এখানে প্রকাশ করা হল : একবার ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখুন-এমন একদিন এসেছিল, যখন বাঙালি হিন্দুর আঁধার ঘরে জ্ঞানের আলোক এসে উঁকি মারল, তখন তারা চোখ খুললেন; পরে পাখীর কলরব শুনে বুঝতে পারলেন, "আর রাত্রি নাই ভোর হইয়াছে" তখন তারা অলস-শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু হিন্দু উঠে যাবেন কোথায় ? এটা করলে জাতি যায়, সেটা খেলে জাতি যায়, সুতরাং তখন তাঁরা দলে দলে খ্রিস্টান হতে আরম্ভ করলেন, ক্রমে বন্দোপাধ্যায় নাম বদলে 'ব্যানার্জী' হলেন, আর সরকার হলেন 'সিরকার'! সেই ঘোর সঙ্কটের সময়ে রাজা রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি সমাজ হিতৈষী লোকেরা ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তন করে হিন্দুকে সবংশে খ্রিস্টান হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। তখন তাদের নিজ স্কুল, কলেজ হল, তাঁদের ছেলেমেয়েরা আর খ্রিস্টানের স্কুলে পড়তে যায় না। তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রক্ষা পেলেন।

অপরদিকে মোসলেম সমাজও ছুটলেন হিন্দু আর খ্রিস্টানের স্কুলে। তাঁরা CONVENT এ পড়তে গিয়ে লায়লার নাম বদলে হল 'লিলী' আর জয়নব হল 'জেনী'। হিন্দু স্কুলে গিয়ে আয়শার নাম হল 'আশা', আর কুলসুম হলে 'কুসুম'। তারা গান শিখে বাড়িতে এসে গায় :

"JESUS SAVES ME THIS I KNOW
FOR THE BIBLE TELLS ME SO"

কিম্বা—

"মুসলমান বে-ইমান,
মারো জুতা, পাক্‌ড়ো কান!"

অথবা :

"নেড়ে মুসলমান, -
তার না আছে ধন, না আছে মান"।

এই সমস্ত শিক্ষিত মুসলমান সমাজ বায়না ধরেছেন যে, আই.এ.পাশ পাত্রি চাই। কেউ চাই অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ, তা না হলে তারা খ্রিস্টান বা ব্রাহ্ম হয়ে যাবেন। এ সব বিকৃত রুচির প্রধান কারণ, —বর্তমান ধর্মহীন শিক্ষা। ফল কথা, উপরোক্ত দুরবস্থার একাত্র ঔষধ একটি আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়, যেখানে আমাদের মেয়েরা আধুনিক জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং প্রদেশের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মত উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। যাদের সন্তান-সন্ততি হবে হজরত ওমর ফারুক, হজরত ফতেমা জোহরার মত। এর জন্য কোরান শরীফ শিক্ষার বহুল বিস্তার দরকার। কোরান শরীফ অর্থাৎ তার উর্দু এবং বাংলা অনুবাদের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক।

এর বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।[৩৩] (বানান অপরিবর্তিত)

উপরিক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় তৎকালিন সময়ে মুসলিমদের করুণ ইতিহাস। এর জন্য বেগম রোকেয়া মহিলা শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। এই সময় কলকাতা মাদ্রাসাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে।।

তবে বর্তমানে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক উন্নয়ন লক্ষ করা যাচ্ছে। পার্ক সার্কাসে ও নিউ টাউনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক ক্যাম্পাস। এর জন্য খরচ হয়েছে ৫৫১ কোটি টাকা। ১১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য ২টি আলাদা হোস্টেল হয়েছে। সেখানে ১২৫০ জন ছাত্র ছাত্রী আবাসিক হিসাবে থাকছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের থাকার জন্য ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে আবাসন তৈরি হচ্ছে। এখানে আর্টস, সায়েন্স, ম্যানেজমেন্ট, ল, নার্সিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, বি.এড ইত্যাদি কোর্স চালু আছে। এই কোর্স গুলি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছে। আধুনিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্ভাসিত এইসব বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশ ও জাতির সেবা করার যোগ্যতা তৈরি হচ্ছে।[৩৪]

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমস্ত অগ্রগতি বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে সচেষ্ট হবে। তবে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু প্রতিবন্ধকতা বর্তমান। কলকাতা মাদ্রাসায় ১৮২৬ সালেই প্রথম ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের সূচনা হয়েছিলো।[৩৫] বর্তমানে

মেডিক্যালে স্নাতক চালু হয়নি এছাড়া এম এড-এ কোর্স শুরু না হওয়া, এম টেক কোর্স এ আই সি টি ই-এর স্বীকৃতি না পাওয়া, স্বল্প মেয়াদী ভাষা ও অন্যন্য দক্ষতার কোর্স চালু না হওয়া যা লক্ষ লক্ষ মুসলিম যুবক যারা কর্মসংস্থানের জন্য দেশ-বিদেশে যায় তাঁদের সার্বিক ভাবে সহায়তা করতো। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আলো যে ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তা সুদূর ভবিষ্যতে মুসলিম সমাজের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে। যার ফলে মুসলিম সমাজের সার্বিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

উপসংহার :

উপনিবেশীক শাসন বাংলায় শুরু হলে হঠাৎ একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে মুসলিম সমাজের মধ্যে। এর মধ্যেই ওয়ারেন হেস্টিং কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে মুসলিমদের সহায়ক শ্রেণিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন। আর এটির প্রভাবে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মুসলিম সমাজে নবজাগরনের শুরু হয়েছিল। কিন্তু এর চরম সাফল্য লাভ সম্ভব হয়নি।

কলকাতা মাদ্রাসা ২২৭ বছরের ইতিহাস নানা ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল। অনেকবার তা তুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল, বিশেষ করে মহাবিদ্রোহের সময় ও ভারত স্বাধীন হওয়ার সময়। অনেক কমিশন, ডেপুটেশন ও আন্দোলনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ২০০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। উপনিবেশীক সময়কাল থেকে যে ঐতিহ্য মর্যদার মাধ্যমে এটির আবির্ভাব হয়েছিল। তা বর্তমান সময়েও থাকলে আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে কলকাতা মাদ্রাসা বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রানকেন্দ্র হতে পারত। আর সেটি ব্যর্থ হওয়ার জন্য অবশ্যই বঞ্চনা ছিল। যা বাঙালি মুসলিম জাতির অগ্রগতির সঙ্গে ওতপ্রত ভাবে জড়িত। বর্তমানে দেরি হলেও আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কর্ম কাণ্ড শুরু হয়েছে তা বাংলা তথা পূর্ব ভারতের মুসলিম সমাজের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র :

১) https://bn.m.wikipedia.org/wiki/মাদ্রাসা

২) মুবারাকপুরী, শায়খ সফিউর রহমান; আর্- রাহীকুল মাখতুম, অনু আঃখালেক রহমানী ও মুয়ীনুদ্দীন আহম্মদ, পুনর্মুদ্রণ-২০১৪, কলকাতা, এস.বি.পাবলিকেশন, পৃ. ৩২৬।

৩) ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কলকাতার মহামেডান কলেজ, কলম ঈদ সংখ্যা ২০১২ কলকাতা, পৃ. ৩১।

৪) হান্টার, ডাবলিউ ডাবলিউ; দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান, অনু. মহ. আনিসু- জ্জামান, ১৯৭৫, ঢাকা, খোশারোজ কিতাব মহল, পৃ. ১৭৩।

৫) Hossain, Anowar; Calcutta Madrasah and Modern Education, 2015,

Kolkata, Mitram, P. 48

৬) ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কলকাতার মহামেডান কলেজ, কলম ঈদ সংখ্যা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩১।

৭) কলকাতা মাদ্রাসা কলেজের ২২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০০৬, উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ১৩-২৬।

৮) রহমান, সামসুর; বাঙালি মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত, ২০১৫, কলকাতা, মল্লিক ব্রাদাস, পৃ. ১০২।

৯) হান্টার, ডাবলিউ ডাবলিউ; দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান, অনু. মহ. আনিসুজ্জামান, ১৯৭৫, ঢাকা, খোশারোজ কিতাব মহল, পৃ. ১৭৩।

১০) রহমান, সামসুর; বাঙালি মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত, ২০১৫, কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, পৃ. ১০৯।

১১) ঐ, পৃ. ১০২।

১২) ঐ, পৃ. ১০৩।

১৩) আলি, ড. সেখ রজব; ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোলকাতা মাদ্রাসা ১৭৮০-১৮৮২, ২০১৩, কলকাতা, নক্ষত্র প্রকাশন, পৃ. ১৬৪।

১৪) ড. মোহাম্মদ শাহীদুল্লাহ, কলকাতা মহামেডান কলেজ, কলম ঈদ সংখ্যা, ২০১২ কলকাতা, পৃ. ৩২-৩৩।

১৫) Hossain, Anowar; Calcutta Madrasah and Modern Education, 2015, Kolkata, Mitram, P. 215

১৬) সাক্ষাৎকারঃ আবু-শালেহ রেজাউল করিম, প্রাক্তন ছাত্র, আলিয়া মাদ্রাসা ও বিশিষ্ঠ সমাজসেবী, ১৩/০৪/২০১৬, কলকাতা।

১৭) ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কলকাতা মহামেডান কলেজ, কলম ঈদ সংখ্যা ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩৩।

১৮) ঐ, পৃ. ৩৫।

১৯) Hossain, Anowar; Calcutta Madrasah and Modern Education, 2015, Kolkata, Mitram, P.223-224.

২০) সাক্ষাৎকারঃ মহ. কামরুজ্জামান, প্রাক্তন ছাত্র, আলিয়া মাদ্রাসা ও সমাজসেবী, ১৫/০৪/২০১৬, বারাসাত।

২১) THE KOLKATA GAZETTE, FEBRUARY 20, 2008, PUBLISHED UNDER REFERENCE TO WEST BENGAL ACT XXVII OF 2007 (THE ALIAH UNICERSITY C ACT-2007)

২২) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aliah_University

২৩) ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কলকাতা মহামেডান কলেজ, কলম ঈদ সংখ্যা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩৫।

২৪) রহমান, সামসুর; বাঙালি মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত, ২০১৫, কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, পৃ. ১১২-১১৯।

২৫) ঐ, পৃ. ৪৫।

২৬) ঐ।

২৭) https://wbbme.org

২৮) https://aliah. ac.in

২৯) https:// em.m.wikipedia.org/wiki/islam_in_west_bengal

৩০) দৈনিক কলম; ১৪ ডিসেম্বর, ২০২০, কলকাতা, পৃ. ৪।

৩১) ঐ, ২৩ মে ২০২০।

৩২) https://www.amu.ac.in

৩৩) বেগম রোকেয়া; প্রবন্ধ, মাসিক মোহাম্মদী, জৈষ্ঠ্য ১৩৩৮, কলকাতা।

৩৪) কলম, ১৩ মে, ২০২১, কলকাতা।

৩৫) আলি, ড. সেখ রজব; ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোলকাতা মাদ্রাসা ১৭৮০-১৮৮২, ২০১৩, কলকাতা, নক্ষত্র প্রকাশন, পৃ. ১১৬।

গ্রন্থপঞ্জি :

১) মুবারাকপুরী, শায়খ সফিউর রহমান; আর-রাহীকুল মাখতুম, অনু.আঃ খালেক রহমানী ও মুয়ীনুদ্দীন আহমদ, এস.বি. পাবলিকেশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - ২০১৪।

২) রহমান, সামসুর; বাঙালি মুসলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৫।

৩) আলি, ড. সেখ রজব; ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোলকাতা মাদ্রাসা ১৭৮০ - ১৮৮২, নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩।

৪) Hossain, Anowar; Calcutta Madrasah and Modern Education, Mitram, Kolkata, 2015.

৫) হান্টার, ডাবলিউ ডাবলিউ; দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান, অনু. মহ. আনিসুজ্জামান, খোশারোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭৫।

আচার্য্য মম্মটের ‘কাব্যপ্রকাশ’ ও তাঁর টীকাভাষ্য

তারক মজুমদার

সংক্ষিপ্তসার :

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন আচার্য্য মম্মট। তাঁর ‘কাব্যপ্রকাশ’ গ্রন্থটি প্রাচ্য অলংকার চর্চার ক্ষেত্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। পূর্ববর্তী সমকালীন আলংকারিকদের নানা মত, কাব্যতত্ত্বের নানা বিষয় তাঁর ‘কাব্যপ্রকাশ’ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্য বহু আলংকারিক এর টীকা রচনা করেন। মম্মট-আলোচনার এই ধারার একজন শক্তিশালী ও বিখ্যাত টীকাকার হলেন রাজানক আনন্দ।

মূল কথা : আচার্য মম্মটের ‘কাব্যপ্রকাশ’ ও তাঁর টীকাভাষ্য-এর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ভূমিকা :

প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ঐতিহ্য ও পরম্পরায় (ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে পরম্পরা বা বিভিন্ন ধারা বা প্রকার বোঝাতে প্রস্থান শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়)। আচার্য মম্মট এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর ‘কাব্যপ্রকাশ’ গ্রন্থটি প্রাচ্য অলংকার চর্চার ক্ষেত্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাঁর ‘কাব্যপ্রকাশ’ গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এক হার্দ্য হৃদয়াবেগের সংযোগ ঘটেছে। মম্মট বিরচিত কাব্যপ্রকাশ একটি উচ্চাঙ্গের মৌলিক গ্রন্থ, তাই বিদ্বদ্ মণ্ডলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার জন্য এর প্রায় ৭৫টির বেশী টীকা গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিস্তারিত আলোচনা :

আচার্য মম্মটের আবির্ভাব বহুপূর্বেই ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের অবয়ব নির্মাণের কাজ সাফল্যের সাথে সূচিত হয়েছিল। অলংকারশাস্ত্রের আলোচনায় সাহিত্য প্রকরণের (বিশেষত কাব্যের) স্বরূপ ও প্রবণতার সংজ্ঞা ও লক্ষণসমূহের গতি-প্রকৃতি নিয়ে নানান মতামতের জন্ম হয়েছে। ‘History of Sanskrit Poetics’[১] পণ্ডিত এস. কে. দে ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের পর্বান্তর বা পরম্পরা বা প্রস্থানের চারটি স্তর লক্ষ্য করেছেন। এর প্রথম স্তরের বিস্তার আচার্য ভরতমুনি থেকে ভামহ পর্যন্ত অলংকার শাস্ত্রের আলোচনার মূল কাঠামো বা ভিত্তি নির্মিত হয়েছে এই প্রাথমিক স্তরে। একে ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের গঠনমূলক স্তর বলা যেতে পারে। ভারতীয় অলংকারের দ্বিতীয় স্তর বিস্তৃত ভামহ থেকে আনন্দবর্ধন পর্যন্ত। অলংকার শাস্ত্রের এই স্তরকে সৃজনশীল স্তর বলা যেতে পারে। এই স্তরে অলংকার শাস্ত্রের নান্দনিক সমৃদ্ধি তথা কাব্য সৌন্দর্য সম্পর্কে নতুন চিন্তা ভাবনার জন্ম হয়েছে। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের তৃতীয় স্তরকে অলংকার শাস্ত্রের নির্ণায়ক স্তর বলা যেতে পারে। এই স্তরে কাব্যের আত্মা সংক্রান্ত আলোচনা পরিপুষ্ট হয়েছে। অলংকার শাস্ত্রের এই তৃতীয় স্তর আনন্দবর্ধন

থেকে মম্মট পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের চতুর্থ স্তরে অলংকার শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে। এই স্তর বৈদগ্ধের স্তর নামে পরিচিত। এই চতুর্থ স্তর বিস্তৃত মম্মট ভট্ট থেকে জগন্নাথ পর্যন্ত।

অলংকার শাস্ত্রের স্তর বিভাজনের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে অলংকার শাস্ত্রের সূচনা বিষয়ে কৌতুহল জাগে। এ বিষয় পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আলংকারিক রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রকে সপ্তম বেদাঙ্গরূপে অভিহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের সাহিত্য বিদ্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচনার মিথটি অনেকে স্মরণ করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার সম্মুখে মহাদেব যে সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা করেছিলেন তাই কালক্রমে ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছে। এই মিথ অনুযায়ী রাজশেখরের অভিমত এই যে ব্রহ্মা অলংকার শাস্ত্রকে আঠারোটি প্রকরণে ভাগ করেছেন। রাজশেখরের এই মত পরবর্তীকালে অধিকাংশ আলংকারিকেরা গ্রহণ করেন নি। ভারতীয় অলংকার আলোচনার প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেছে ঋগ্বেদে (১/১১/৫৫) এবং শতপথব্রাহ্মণে (১২/৫/১/৫)। যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থেও (৩/১৩/১৮) উপমা অলংকারের উল্লেখ আছে। বিধিবদ্ধভাবে অলংকার নিয়ে প্রথম আলোচনা করেছেন ভরতমুনি। তাঁর নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে তিনি দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য সম্পর্কে ধারণা দিলেন। এরপর ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের আলোচনার আলোকবর্তীকা সংবহনে অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন আচার্য দণ্ডী এবং ভামহ। আচার্য দণ্ডী কাব্যের সৌন্দর্য বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন 'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলংকারান্ প্রচক্ষতে'। যে ধর্ম কাব্যকে সুন্দর করে তোলে বা কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে তাকে অলংকার বলা যেতে পারে। কাব্য এবং কাব্যের লক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত আলংকারিকদের মধ্যে বারবার জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছে। একটি শব্দ বা একাধিক শব্দের সমাহার তখনই কাব্য হয়ে ওঠে যখন তা ধর্ম, ব্যাপার এবং ব্যঙ্গ এই তিনটি বিশেষ গুণ দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। রুয্যকের অলংকার সর্বস্ব গ্রন্থের টীকাকার সমুদ্রবন্ধ তাঁর 'বিবৃতি' টীকায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"ইহ বিশিষ্টৌ শব্দার্থো কাব্যম্। তয়োশ্চ বৈশিষ্টং ধর্মমুখেন, ব্যাপারমুখেন ব্যঙ্গ্যমুখেন বেতি ত্রয়ঃপক্ষা:। অদ্যোহপি ভণিতিবৈচিত্র্যেণ ভোগকৃত্ত্বেন বেক্রোক্তিজীবিতকারেণ, চতুর্থোভট্টনায়কেন, পঞ্চম আনন্দবর্ধনেন"[২]

সমুদ্রবন্ধের এই বক্তব্যের আলোকে অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রস্থান এবং সেই প্রস্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলংকারিকদের পরিচয় প্রকাশ্যে এসেছে। কাব্য আলোচনার ক্ষেত্রে ধর্ম (অলংকার এবং গুণ), 'ব্যাপার' (ভনিতি বৈচিত্র্য কবি ব্যাপার, ভোগীকৃত রসিক ব্যাপার) এবং ব্যঙ্গপক্ষ আলংকারিকদের প্রস্থান বা পরম্পরার দিগ্-দর্শন হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে উদ্ভটাদি আলংকারিকগণ আছেন অলংকার পক্ষে, গুণপক্ষে আছে বামন, প্রমুখ আলংকারিক। অপর পক্ষে কুন্তক আছেন ভণিতিকৃতে কবি ব্যাপারে, ভোগিকৃত রসিক ব্যাপারে আছেন ভট্টনায়ক, ব্যঙ্গপক্ষে আছেন আনন্দবর্ধন।

সাহিত্য আলোচনার প্রথম পর্বে আলংকারিকেরা কাব্যের শরীর বা গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ক্রমে কাব্যের আত্মার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন তারা। এক্ষেত্রে

কোন শব্দ, শব্দার্থ, রীতি বা ধ্বনি-রস আলোচনার কেন্দ্রে থেকেছে। কাব্যের অন্তরমহল ও অঙ্গসৌষ্ঠবের আলংকারিক আলোচনার পথিকৃৎ কিছু আপ্তবাক্য স্মরণ করা যেতে পারে —

ভামহাচার্য — 'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাননম্'। (অলংকার)
দণ্ডী — 'ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণাঃ দশগুণাঃ স্মৃতাঃ'। (গুণ)
বামন — 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। (কাব্যের আত্মা রীতি, রীতিবাদ)
আনন্দবর্ধন — 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ'। (কাব্যের আত্মা ধ্বনি, ধ্বনিবাদ)
অভিনবগুপ্ত — 'রস এব বস্তুতঃ আত্মা'। (কাব্যের আত্মা রস, রসবাদ)
কুন্তক — 'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্'। (বক্রোক্তিবাদ)
ক্ষেমেন্দ্র — 'ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্'।

আচার্য মম্মট অলংকারের বিভিন্ন প্রস্থানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক রামানন্দ আচার্য বলেছেন— ''মম্মট তাঁর কাব্যলক্ষণে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক বস্তুসম্ভারের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি মন্তব্য করেছেন প্রসন্ন মনে, উদারভঙ্গীতে। বলেছেন, 'কাব্যং লোকোত্তরবর্ণনানিপুণ— কবিকর্ম'। কূটতর্কের কুহেলী যাদের আচ্ছনন্ করে না, তাঁরা সহজেই বোঝেন, এই ত' কাব্যের আসল লক্ষণ। কারণ লোকোত্তর বর্ণনা নৈপুণ্যের প্রেক্ষিতেই তো শাস্ত্র পাঠককে করে তোলে ধ্বনি-ব্যঞ্জনা-রীতি-উন্মুখ। মম্মটের কারিকা এবং বৃত্তি কখনও কখনও ভিন্ন-বক্তব্য-ধর্মী। ... সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ধারণে কখনও মম্মট কখনও হিতবাদী ('শিবেতরক্ষতয়ে', 'কান্তাসংমিততযোপদেশযুজে'), কখনও কলা কৈবল্যবাদী (সদ্যঃ পরনির্বৃতযে), কখনও কখনও নিছকই বস্তুতন্ত্রী ('যশসে', 'অর্থকৃতে', 'ব্যবহারবিদে')। সমন্বয়ের রাজপথে তিনি সাহিত্যের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সন্ধানে সিদ্ধহস্ত এবং সফল।''[৩]

আচার্য মম্মট : ব্যক্তি পরিসর :

আচার্য মম্মটের ব্যক্তিগত পরিচয় ইতিহাস কালের কুয়াশায় আবৃত। Aufrecht-এর অভিমত অনুযায়ী আচার্য মম্মটের প্রকৃত নাম মহিমভট্ট। অনবধানতাবশতঃ মহিমভট্ট মম্মটে রূপান্তরিত হয়েছেন বলে Aufrecht অনুমান করেছেন। যদিও মম্মট ও মহিমভট্ট একই ব্যক্তি কিনা, সে বিষয়টি বিতর্ক সাপেক্ষ। আচার্য মম্মটের নিজস্ব আত্ম-বিবরণীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে মম্মট নিজের উপাধি রূপে 'রাজানক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই উপাধিটি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের প্রচলিত। সুতরাং আচার্য মম্মট কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। আচার্য মম্মটকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে নানান জনশ্রুতি। সে-সবের সত্যতা বিচারের জন্য তাঁর কোনও ঐতিহাসিক প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থের সন্ধান মেলে নি। ফলত আচার্য মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশ'-এর বিভিন্ন টীকাকারের প্রদত্ত মম্মট সম্বন্ধীয় উল্লেখ তাঁকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন তথ্যের একমাত্র অবলম্বন।

মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশ'-এর টীকাকার ভীমসেন তাঁর বিখ্যাত 'সুধাসাগর' টীকায় মম্মটের জনক রূপে উল্লেখ করেছেন জৈয়টকে এবং 'মহাভাষ্যপ্রদীপ'-এর রচয়িতা কৈয়টকে উল্লেখ করেছেন মম্মটের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপে। 'শুক্লযজুর্বেদ'-এর ভাষ্যকার উব্বটকে মম্মটের

ভ্রাতারূপে উল্লেখ করেছেন কতিপয় সমালোচকেরা। কিন্তু উব্বট মম্মটের পিতা জৈয়টকে নয়, তাঁর 'বাজসনেয়ী সংহিতা'-য় তাঁর পিতার নাম রূপে উল্লেখ করেছেন বজ্রটের নাম। সুতরাং উব্বট মম্মটের ভ্রাতা কিনা এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে। ঐতিহাসিক হাল ও ওয়েবাব আচার্য মম্মটকে 'নৈষধচরিত'-এর রচয়িতা শ্রীহর্ষ-এর মাতুল রূপে উল্লেখ করেছেন পণ্ডিত এস. কে. দে এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

"The story relied upon by Hall and Weber that Mummata was the maternal uncle of the author of Naisdha may be relegated to the region of fantastic fables which ofen gather round celebrated names"[৪]

জনশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, মম্মটের জন্ম কাশ্মীরে, বিদ্যা-অধ্যয়নের জন্য তিনি বারাণসীতে এসেছিলেন। টীকাকার ভীমসেন তাঁর টীকায় আচার্য্য মম্মটকে কাশ্মীরের সরস্বতী রূপে আখ্যাত করেছেন—

'শব্দব্রহ্ম সনাতনং ন বিদিতং শাস্ত্রৈঃ ক্বচিৎ কেনচিৎ।
তদ্দেবী হি সরস্বতী স্বয়ম্ভূৎ কাশ্মীরদেশে পুমান্।।"[৫]

আচার্য্য মম্মটের জীবনীকালের সময়পরিধি নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। মম্মট নিজের কিংবা তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রদান করেন নি। তাই তাঁর সময়কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক গ্রন্থ ও উপাদানের উপর নির্ভর করতে হবে। মম্মটের কাব্যে আলংকারিক অভিনব গুপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে অভিনব গুপ্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দের সময় কিংবা তার পরে মম্মট তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ' রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' গ্রন্থের রচয়িতা ভোজরাজের (১০১০-১০৫৫) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সম্ভাবনার কথাও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। 'কাব্যপ্রকাশ'-এর ১০ম উল্লাসে আচার্য মম্মট 'উদাত্ত' অলংকারের আলোচনায় ভোজরাজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ভোজরাজের এই নামোল্লেখ আচার্য মম্মটের সময়কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ভোজরাজের রাজত্বকালের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং ১০৫৫ সালের কাছাকাছি সময়ে আচার্য্য মম্মটের গ্রন্থ রচিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আলংকারিক রাজানক রুয্যক বা রুচক রচিত টীকাভাষ্য 'সংকেত'-এ আচার্য মম্মটের নামোল্লেখ না থাকলেও, রুয্যক রচিত 'অলংকারসর্বস্ব' গ্রন্থে আচার্য মম্মটের নামোল্লেখ না থাকলেও, রুয্যক রচিত 'অলংকারসর্বস্ব' গ্রন্থে আচার্য মম্মটের মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক পি. ভি. কানের মতে 'অলংকারসর্বস্ব' গ্রন্থের রচনাকাল ১১৩৫-১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং আচার্য মম্মট ১১৩৫-১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। এই মতামতের সাপেক্ষে পণ্ডিত এস. কে. দে আচার্য মম্মটের সময়কাল হিসেবে একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দ্বাদশ শতকের প্রথম দুই দশককে চিহ্নিত করে বলেছেন, —

"We may, therefore, place Mammata between Ruyyaka on the one hand and Bhoja on the other, if we may assume, on the authority of the commentators, the identity of this Bhoja with the *Paramara* Bhoja of *Dhara*,

the reputed author of the *Sarasvatikanthabharanam* in other words, Mammata probably belongs to the period betwen the middle of the 11th and the first quarter of the 12th century.''[৬]

পণ্ডিত এস. কে. দে-র অভিমত সমর্থন করে একথা বলা যায়, একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সপাদ দ্বাদশ শতক আচার্য মম্মটের সময়কাল রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

কাব্যপ্রকাশ :

আচার্য্য মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশ' প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনায় এক বিশিষ্ট মাইলফলক। উত্তরভারতের সাহিত্যচর্চার পরিমণ্ডলে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের অবদান সুদীর্ঘকাল থেকেই পাঠক সমাজের কাছে সুবিদিত। কাব্যতত্ত্ব আলোচনার প্রস্থানে অর্থাৎ পরম্পরায় কাশ্মীরের স্থানীয় আলংকারিক আবহ থেকেই আচার্য্য মম্মট পরিপুষ্ট হয়েছিলেন বলে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আচার্য্য মম্মট শাস্ত্রালোচনায় সুপণ্ডিত ছিলেন (মম্মট 'শব্দ-ব্যাপার-পরিচয়' নামে একটি শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ক স্বল্পপরিচিত গ্রন্থের প্রণেতা), পাশাপাশি তাঁর রচনাশৈলীর মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য কবিপ্রাণনা। ফলত তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এক হার্দ্য হৃদয়াবেগের সংযোগ ঘটেছে। তিনি গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে পূর্বের অলংকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণার পর্যালোচনা করে নিজস্ব উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন। 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে মম্মট-পূর্ববর্তী বিশিষ্ট আলংকারিকদের সবিশেষ উল্লেখ রয়েছে। নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরত, 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'-র রচয়িতা ভামহ, উদ্ভট, আলংকারিকগণের নাম ও প্রসঙ্গ মম্মটের গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্ববর্তী মত ধারার সোপান বেয়েই তিনি পৌঁছেছেন ধ্বনিবাদের সুউচ্চ শিখরে। কাব্যপ্রকাশের বিষয় বিন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। কাব্যপ্রকাশের দশটি উল্লাসে আছে কারিকা এবং উদাহরণ। এই দশটি উল্লাসের বিষয়ক্রম হল —

১ম: মঙ্গলাচরণ, কাব্যপ্রয়োজন, কাব্যহেতু, কাব্যস্বরূপ, কাব্যের ভেদ ইত্যাদি।

২য়: শব্দ ও অর্থের ভেদ, অভিধা, লক্ষণা ব্যঞ্জনা ইত্যাদি।

৩য়: আর্থী ব্যঞ্জনার প্রসঙ্গ।

৪র্থ: ধ্বনিকাব্য, রস, রসধ্বনি ইত্যাদি।

৫ম: গুণীভূতব্যঙ্গকাব্য এবং তার বিভিন্ন প্রকারভেদ।

৬ষ্ঠ: চিত্রকাব্যের স্বরূপ ও প্রকারভেদ।

৭ম: কাব্যদোষ।

৮ম: কাব্যগুণ।

৯ম: শব্দালংকার।

১০ম: অর্থালংকার।

কাব্যপ্রকাশের এই বিষয়সূচী এই গ্রন্থের বিশালত্ব ও গভীরতার প্রকাশক। অর্থাৎ চিরাচরিত অলংকার শাস্ত্রের প্রায় সমস্ত বিষয় মম্মট আলোচনা করেছেন। এবং অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। অবশ্য মম্মটের কাব্যপ্রকাশের ১৪৩ টি

কারিকার বা সূত্রগুলি ভরতমুনির রচনা বলে অনেকে মনে করেন। সেক্ষেত্রে তাদের মতে কাব্যপ্রকাশের বৃত্তি অংশের লেখক হলেন মম্মট। তবে মাণিক্যচন্দ্র সরস্বতীতীর্থ, হেমচন্দ্র প্রমুখ আলংকারিকেরা কাব্যপ্রকাশের কারিকা এবং বৃত্তি— উভয় অংশেরই লেখক হিসাবে মম্মটকে চিহ্নিত করেছেন।

আচার্য মম্মট বিরচিত কাব্যপ্রকাশ একটি উচ্চাঙ্গের মৌলিক গ্রন্থ, তাই বিদ্বদ্ মণ্ডলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার জন্য অনেক বিদ্বান এর টীকা রচনা করেন। প্রায় ৭৫ টির বেশী টীকা গ্রন্থের উল্লেখ পাই আমরা। যাদের সম্পূর্ণ বিস্তৃত বিবরণ এস. কে. দে মহাশয়ের History of Poetics গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাবার্থচিন্তামণি টীকা গ্রন্থে বলেছেন—

কাব্যপ্রকাশস্য কৃতা গৃহে গৃহে টীকা।
তথাপ্যেষা তথৈব দুর্গমঃ।।

নিম্নে কয়েকটি টীকা গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হল —

কাব্যপ্রকাশের বিভিন্ন টীকা ভাষ্যকার :

মাণিক্যচন্দ্র :

মাণিক্যচন্দ্র গুজরাট দেশীয় জৈন কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যপ্রকাশের টীকাটির নাম 'সংকেত'। এই টীকাটির সময়কাল ১২১৬ সংবৎ বা ১৫৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি শীলভদ্রেরধারা অনুসরণ করে টীকার শেষ ভাগে আধ্যাত্মিকতার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর গুরু হল নেমিচন্দ্র এবং তাঁর ছাত্র হল সাগরেন্দু। মাণিক্যচন্দ্রের পার্শ্বনাথ-চরিত এর সময়কাল ১২৭৬ সংবৎ বা ১১২০ শতক। এ থেকে বলা যায় মাণিক্যচন্দ্রের সময়কাল দ্বাদশ শতক।

নরহরি বা সরস্বতী-তীর্থ :

সরস্বতী-তীর্থের কাব্যপ্রকাশের উপর রচিত টীকা গ্রন্থের নাম 'বালচিত্তানুরঞ্জনী'। এছাড়াও স্মৃতিদর্পণ ও তর্করত্ন নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। Aufrecht এর মতে তিনি মেঘদূতের একটি টীকা রচনা করেছেন যার একটি পাণ্ডুলিপি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী তে আছে। Stein বলেছেন সরস্বতীতীর্থ কুমারসম্ভবের ও একটি টীকা রচনা করেছেন। ১২৯৮ সংবৎ (১২৪১-৪২ শতক) তিনি জন্মেছিলেন বলে তাঁর টীকাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বৎসগোত্রীয় ছিলেন। তিনি নরসিংহের পৌত্র এবং নারায়ণের ভ্রাতা ছিলেন। তাঁর পিতা মল্লিনাথ এবং মাতা নাগাম্মা।

পরমানন্দ চক্রবর্তী :

কাব্যপ্রকাশের উপর রচিত পরমানন্দ চক্রবর্তীর টীকা গ্রন্থটি হল 'কাব্যপ্রকাশ-বিস্তারিকা'। তিনি বিশ্বনাথের উল্লেখ করেছেন এবং বিদ্যানাথ তাঁর গ্রন্থে পরমানন্দ চক্রবর্তীর উল্লেখ করেছেন। কমলাকার, নরসিংহ ঠক্কুর, বৈদ্যনাথ, নাগোজি ভট্ট, আনন্দ এবং রত্নকণ্ঠ তাদের গ্রন্থে পরমানন্দ চক্রবর্তীর উল্লেখ করেছেন। প্রভাকর ভট্ট তাঁর 'রসপ্রদীপ' গ্রন্থে (১৫৮৩ সালে) উল্লেখ করেছেন। পরমানন্দের লেখা থেকে বোঝা যায় তিনি চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পরে এবং ষোড়শ শতকের আগে জন্মেছিলেন।

গোবিন্দ ঠক্কুর :

গোবিন্দ ঠক্কুর এর টীকা গ্রন্থের নাম 'কাব্যপ্রকাশ-প্রদীপ'। এছাড়া তিনি কাব্যপ্রকাশ-'উদাহরণ-দীপিকা' এবং 'কাব্যপ্রকাশ-শ্লোকদীপিকা' গ্রন্থ রচনা করেন। Stein এর মতে দুটি গ্রন্থ একই। গোবিন্দ ঠক্কুর মিথিলার রবিকর পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতার নাম কেশব এবং মাতার নাম সোনাদেবী এবং শ্রীহর্ষ হল তাঁর অগ্রজ। তিনি তাঁর সৎ ভাই রুচিকর এর কাছ থেকে কাব্য এবং সাহিত্য শিখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়কাল নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। গোবিন্দ বিশ্বনাথের উল্লেখ করেছেন আবার প্রভাকর 'রসপ্রদীপ' (১৫৮৩ শতক) গ্রন্থে গোবিন্দের উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় তাঁর সময়কাল পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে।

জয়রাম ন্যায় পঞ্চানন :

তাঁর টীকা গ্রন্থের নাম 'কাব্যপ্রকাশ-তিলক' বা 'জয়রামী'। 'ন্যায়-সিদ্ধান্তমালা', 'পদার্থ-মণিমালা' এবং 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলী' ও 'তত্ত্বচিন্তামণ-দীধিতি' এর উপর টীকা রচনা করেন। জয়রাম যেহেতু 'তত্ত্বচিন্তামণির' উপর টীকা রচনা করেন সেহেতু তিনি রঘুনাথ শিরোমণির পরবর্তীকালের। আবার তিনি অষ্টাদশ শতকের ভীমসেনের পূর্ববর্তী। মোটামুটিভাবে বলা যায় তিনি সপ্তদশ শতকে জন্মেছিলেন।

শ্রীবৎসলাঞ্চন :

শ্রীবৎসলাঞ্চন ভট্টাচার্যের পিতার নাম শ্রীবিষ্ণু ভট্টাচার্য চক্রবর্তী। তাঁর 'সারবোধিনী' টীকায় মিশ্র, বিদ্যানাথ, ভাস্কর, জয়রাম, বিশ্বনাথ এই পাঁচজন টীকাকারের নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রসগঙ্গাধর গ্রন্থে এবং কমলাকর (১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ) বৎসলাঞ্ছনের উল্লেখ করেছেন আবার শ্রীবৎস বিদ্যানাথের উল্লেখ করেছেন। এর থেকে অনুমান করা যায় তিনি সপ্তদশ শতকের আগে।

রবি এবং রত্নপাণি :

গৌরী ও মনোধরার পুত্র এবং অচ্যুতের পৌত্র হলেন রবি। অচ্যুত আবার মিথিলার রাজা শিব সিংহ বা শিবসিদ্ধ এর মন্ত্রী ছিলেন। রবি রচিত টীকা গ্রন্থটির নাম 'মধুমতি'। গ্রন্থের শেষে তিনি উল্লেখ করেন তাঁর কন্যার নাম মধুমতী অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ করেছেন। ভীমসেন রবি ও রত্নাপাণির নাম উল্লেখ করেছেন।

মহেশ্বর :

মহেশ্বরের টীকার নাম কাব্যাপ্রকাশাদর্শ বা 'কাব্যপ্রকাশ-ভাবার্থ-চিন্তামণি'। তিনি একজন বাঙালী টীকাকার। বৈদ্যনাথ তাঁর গ্রন্থে মহেশ্বরের উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বলা যায় তিনি সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

কমলাকর ভট্ট :

কমলাকর ভট্ট একজন বিশিষ্ট মীমাংসক। মারাঠা ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ও মাতা হলেন রামকৃষ্ণ ভট্ট এবং উমা। নারায়ণ ভট্টের পৌত্র এবং রামেশ্বর ভট্টের প্রপৌত্র। কমলাকর ভট্ট কাব্যপ্রকাশ টীকায় চণ্ডীদাস, মধুমতীকার রবি ভট্টাচার্য, সরস্বতী তীর্থ,

পদ্মনাভ, সোমেশ্বর, পরমানন্দ চক্রবর্তী, শ্রীবৎসলাঞ্ছন প্রভৃতি টীকাকারের উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বয়ং নিজের সময়কাল উল্লেখ করে বলেছেন ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

রাজানক আনন্দ :

তবে তাঁর রাজানক উপাধি একথা প্রমাণ করে যে তিনি কাশ্মীরের লোক। তাঁর পিতার নাম ছিল সল্লক্ষণ। তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন উল্লেখ এবং সমসাময়িক আলংকারিকদের উপর নির্ভর রাজানক আনন্দের সময়কাল নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চলেছে। সপ্তদশ শতকের বিশিষ্ট আলংকারিক রাজানক রত্নকণ্ঠের মিত্র ছিলেন। 'সারসমুচ্চয়' টীকার লেখক মম্মট গবেষক রাজানক রত্নকণ্ঠ কাব্য রচনার সময়কাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ। রাজানক আনন্দ রাজানক রত্নকণ্ঠের সমসাময়িক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে Stein বলেছেন— "Ananda, who composed his commentary in 1665 A.D. is still well remembered in the tradition of Kashmirian Panditsas the contemporary and friend of Rajanaka Rantnakantha, one of whose known dates is 1648 A.D. Ananda therefore, may be assigned to the second and third quarters of the 17th century."[৭]

মূল্যায়ন :

আচার্য্য মম্মটের টীকা ভাষ্যের এই বহুতর প্রয়াস আচার্য্য মম্মটের অলংকার আলোচনার পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। মম্মটের কাব্য আলোচনার উষ্ণীশে উজ্জ্বল পালকের সংযোজন ঘটিয়েছেন টীকাকার রাজানক আনন্দ।

তথ্যসূত্র :

১। De, S. K. *History of Sanskrit Poetics,*(Second edition) Firma KLM Private Limited, Calcutta. 1976.

২। সমুদ্রবন্ধ, *'বিবৃতি-টীকা'*, ভট্টাচার্য, অমিয় কুমার, *সাহিত্যের দোষ, গুণ ও অলংকার প্রসঙ্গে আচার্য মম্মট,* প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২৩৪।

৩। আচার্য্য, রামানন্দ, প্রাক কথন, সাহিত্যের দোষ, গুণ ও অলংকার প্রসঙ্গে আচার্য মম্মট, ভট্টাচার্য, অমিয় কুমার, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা নং প্রাক্-কথন খ।

৪। De, S. K., *History of Sanskrit Poetics,* (Second edition) Firma KLM Private Limited , Calcutta, 1976, p. 145

৫। ভট্টাচার্য, অমিয় কুমার, *সাহিত্যের দোষ, গুণ ও অলংকার প্রসঙ্গে আচার্য মম্মট,* প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৪৫।

৬। De, S. K., *History of Sanskrit Poetics,* (Second edition) Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1976, p. 147.

৭। De, S. K., *History of Sanskrit Poetics,* (Second edition) Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1976, p. 168-169.

পশ্চিমবঙ্গের ডিগ্রি কলেজ লাইব্রেরিতে ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেলের বাস্তবায়ন : একটি প্রস্তাবিত মডেল

অশোক কুমার জানা

বিমূর্ত :

নিবন্ধটির মূল লক্ষ্য হল পশ্চিমবঙ্গের ডিগ্রি কলেজ লাইব্রেরিতে ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল এবং এটির পরিষেবাগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে স্পষ্ট চিত্র দেওয়া। এই নিবন্ধটি একটি ডিগ্রী কলেজ লাইব্রেরির ভূমিকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যাতে এর ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার বিকাশ সম্পর্কে সঠিক এবং পর্যাপ্ত তথ্য পেতে সহায়তা করে। ইউজিসি এবং রাজ্য অধিদপ্তরগুলি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এটি ডিগ্রী কলেজ লাইব্রেরি ব্যবহারকারীদের প্রকার এবং তাদের তথ্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করে। সাধারণ ডিগ্রি কলেজ লাইব্রেরিতে, প্রধান ব্যবহারকারীরা স্নাতক ছাত্র যারা অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পেশাদার কর্মজীবন শুরু করতে চলেছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন তরুণদের তাদের পেশা বেছে নিতে হবে, সে জন্য পরিকল্পনা করতে হবে এবং চাকরিতে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। কিন্তু, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এ ব্যাপারে তাদের সামান্য সাহায্য করতে পারে। ডিগ্রী কলেজের গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন পেশা, বিদ্যমান পরিষেবা, যোগ্যতার মানদণ্ড, আবেদনের পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সময়সূচী, গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানা এবং যোগাযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই নিবন্ধটি বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োজনীয়তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। যে শিক্ষার্থীরা তাদের পেশাগত ক্যারিয়ার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে। এটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে ক্যারিয়ার নির্দেশিকা পরিষেবার অস্তিত্বের একটি চিত্রও দেয়। এটি টিমওয়ার্ক এবং লাইব্রেরিয়ানদের ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের ডিগ্রি কলেজ লাইব্রেরিতে ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেলের জন্য একটি প্রস্তাবিত মডেলও প্রস্তাবিত হয়েছে।

কীওয়ার্ড :

কলেজ লাইব্রেরি ব্যবহারকারী, ক্যারিয়ার উন্নয়ন, ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল, ক্যারিয়ার গাইডেন্স সার্ভিস, ক্যারিয়ার তথ্য

১। পরিচিতি :

এটা প্রায়শই লক্ষ করা যায় যে আমাদের দেশের তরুণরা তাদের ভবিষ্যৎ পেশা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যায় পড়ে এবং এই বিষয়ে সঠিক ও সময়োপযোগী নির্দেশনা পায় না। ফলস্বরূপ, তাদের মধ্যে অনেকেই সঠিক পথে যেতে সময় নষ্ট করে এবং অনেকে তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সঠিক পেশা বেছে নিতে ভুল করে। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পেশাভিত্তিক নয় এবং তরুণরা তাদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী সঠিক কেরিয়ারের বিকল্পগুলি বেছে নেওয়ার জন্য সঠিক কাউন্সেলিং পায় না। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণিবদ্ধ এবং সংগঠিত তথ্য সরবরাহ করতে পারে না। ক্যারিয়ার বিকাশের বিকল্প হিসাবে তাদের কাছে যে ধরণের পেশাগুলি উপলব্ধ হতে পারে সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করা হয় না। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার আধুনিক বিশ্বে, তরুণদের জন্য ক্যারিয়ারের বিকল্পগুলি বেছে নেওয়ার বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। এখানে আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীদের ক্যারিয়ার গাইডেন্স সার্ভিস দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এসেছে এবং বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

২। কলেজ লাইব্রেরি ব্যবহারকারী- প্রকার এবং প্রকৃতি :

আমাদের দেশে কলেজ লাইব্রেরির প্রধান ব্যবহারকারীরা স্নাতক ছাত্র। কলেজে ভর্তি হওয়া তরুণরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাদের ভবিষ্যত পেশাগত কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ ব্যাপারে তাদের সঠিক পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রয়োজন। তরুণ কলেজ শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে সাধারণ ডিগ্রি কোর্সের ছাত্ররা তাদের কাছে উপলব্ধ পেশার ধরন, সেগুলিতে সুযোগ পাওয়ার যোগ্যতার মানদণ্ড, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং এই বিষয়ে কলেজ লাইব্রেরির উপযোগিতা সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান নিয়ে আসে।

কর্মজীবনের বিকাশের জন্য সঠিক বিকল্পগুলি পেতে এবং এর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য তাদের সঠিক অভিযোজন প্রয়োজন।

৩। পেশা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নথি এবং তথ্যের প্রকৃতি :

কেরিয়ারের বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নথি/ তথ্য নিম্নরূপ শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে—

ক. সংবাদপত্র

খ. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত কর্মসংস্থান গেজেট

গ. কর্মসংস্থান তথ্য সমন্বিত পত্রিকা

ঘ. সাধারণ জ্ঞান এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মতো বিষয় নিয়ে গঠিত ম্যাগাজিন

ঙ. সাধারণ জ্ঞান, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ অধ্যয়নের অন্যান্য উপকরণের মতো বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত

বইগুলি

চ. "পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট" নিয়ে বই

ছ. পাঠদান এবং প্রশাসনিক চাকরির মতো বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বই।

জ. অনলাইন তথ্য এবং ইন্টারনেট

এই নথি এবং তথ্য সুসংগঠিত এবং আপ টু ডেট হওয়া উচিত। নথিগুলির ইউটিলিটি এবং আরও পরিবর্তনগুলির উপর নিয়মিত মূল্যায়ন করা উচিত।

৪। কলেজ গ্রন্থাগারের ভূমিকা :

কলেজ লাইব্রেরি হল এই ধরনের বিশেষায়িত তথ্য পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য উপযুক্ত সংস্থা যারা তরুণ ছাত্ররা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে যাচ্ছে। এটি শিক্ষার্থীদের চাহিদা মূল্যায়ন করতে পারে, প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে, চাহিদা অনুযায়ী তাদের সংগঠিত ও প্রচার করতে পারে এবং ভবিষ্যতের পরিবর্তন ও আপগ্রেডেশনের জন্য প্রতিক্রিয়া পেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে একটি পৃথক কর্মজীবন নির্দেশিকা সেল গঠন করা উচিত এবং এটি গ্রন্থাগার পরিষেবার একটি অংশ হবে। এই ধরনের একটি বিশেষায়িত পরিষেবা বাস্তবায়নের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে আলাদা আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে। লাইব্রেরি শিক্ষার্থীদের তাদের কর্মজীবনের বিকাশের জন্য সঠিক বিকল্প পেতে এবং সফলভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

৫। ভারতে ক্যারিয়ার নির্দেশিকা পরিষেবা :

তরুণদের পেশাগত দিকনির্দেশনা প্রাচীন ভারতে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাধীনতার পর ১৯৫০-এর দশকে ধারণাটি আবির্ভূত হয়। ১৯৫৬ সালে, শিক্ষিত বেকারদের উপর একটি স্টাডি গ্রুপ তাদের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের তথ্য সরবরাহ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কর্মসংস্থান ব্যুরো প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিল। ফলস্বরূপ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য ও নির্দেশিকা ব্যুরো চালু করেছে। ১৯৬৬ সালে, কোঠারি কমিশন ছাত্র উপদেষ্টা ব্যুরো এবং তথ্য ও নির্দেশিকা ব্যুরোকে একত্রিত করে তথ্য ও কর্মসংস্থান কেন্দ্র গঠন করার সুপারিশ করেছিল যা সরাসরি ছাত্র বিষয়ক ডিনের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। ব্যুরোর কার্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে—

ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি

খ. তথ্যের প্রচার

গ. বিদেশী ছাত্রদের নির্দেশিকা

ঘ. ওরিয়েন্টেশন কোর্স হোল্ডিং

ঙ. প্রকাশনা, ইত্যাদি

সুপারিশগুলি বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে ক্যারিয়ার গাইডেন্স পরিষেবার অবস্থা অন্বেষণ করা

দরকার।

জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৮৬) বিভিন্ন স্তরে নির্দেশিকা পরিষেবার উপর বর্ধিত গুরুত্বসহ শিক্ষার একটিনতুন ব্যবস্থানিয়ে আসে।অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার কলেজগুলিতে ক্যারিয়ার নির্দেশিকা পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব স্বীকার করেছে। ফলস্বরূপ, সরকার কলেজগুলিতে ক্যারিয়ার নির্দেশিকা শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশিকা (২০০০) জারি করেছে।

৬। পশ্চিমবঙ্গের কলেজ লাইব্রেরির জন্য প্রস্তাবিত একটি মডেল :

পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলিতে ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল গঠনের জন্য একটি মডেল নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয়েছে—

৬.১ উদ্দেশ্য :ক. কর্মজীবনের উন্নয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীদের তথ্যের চাহিদা চিহ্নিত করা;

খ. উপরে উল্লিখিত চাহিদা পূরণের জন্য তথ্য সম্পদের একটি সংগ্রহ বিকাশ করা;

গ. কাউন্সেলিং এবং স্ব-মূল্যায়নের জন্য অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তাদের কর্মজীবনের বিকল্পগুলি সঠিকভাবে বেছে নিতে সহায়তা করা;

ঘ. শিক্ষার্থীদের আপ-টু-ডেট কর্মসংস্থানের তথ্য প্রদান করা;

ঙ. ছাত্রদেরব্যক্তিত্ব,সমস্যাসমাধানের দক্ষতাএবংসিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদিবিকাশেসহায়তা করা।

৬.২ কোষের গঠন :ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল লাইব্রেরি সার্ভিসের একটি শাখা হবে কলেজের অধ্যক্ষকে চেয়ারম্যান, লাইব্রেরিয়ানকে সেক্রেটারি/আহ্বায়ক এবং সমস্ত একাডেমিক বিভাগের প্রধান এবং অন্যান্য সদস্য হিসাবে বারসার।

৬.৩ অর্থ :প্রয়োজনীয় তথ্য সংস্থান এবং অবকাঠামোগত সামগ্রী স্বাধীনভাবে কেনার জন্য সেলের যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা থাকা উচিত। লাইব্রেরির জন্য বরাদ্দ বজঘ/রাজ্য অনুদানের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ ক্যারিয়ার গাইডেন্স পরিষেবার জন্য ব্যয় করা উচিত। সেলকে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার জন্য একটি বার্ষিক বাজেট এবং ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে।

৬.৪ অবকাঠামোগত সুবিধা প্রয়োজন :

ক লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার টার্মিনাল থাকতে হবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা অনলাইনে চাকরির তথ্য পেতে পারে এবং চাকরির আবেদন, বায়োডাটা ইত্যাদি অনলাইনে পাঠানোর সুযোগ পায়।

খ. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, কোর্স, অধ্যয়ন-সামগ্রী ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য পেতে ইন্টারনেট অনুসন্ধানের সুবিধা।

গ. কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ কোর্স, টিউটোরিয়াল ইত্যাদি সম্পর্কে আপ-টু-ডেট তথ্য সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক ডিসপ্লে বোর্ড।

৭। পরামর্শ :ক. কলেজগুলিকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার নির্দেশিকা তথ্য সরবরাহ করা উচিত।

খ. কলেজের উচিত ক্যারিয়ার মেলা ও কর্মশালার আয়োজন করা।

গ.শিক্ষার্থীদের জন্যক্যারিয়ার তথ্যঅনুসন্ধানপ্রশিক্ষণ কর্মসূচিওকলেজেআয়োজন করা উচিত।
ঘ. ক্যারিয়ার গাইডেন্সের উপর বই প্রদর্শনীও নিয়মিত আয়োজন করা উচিত।
ঙ লাইব্রেরির নোটিশ বোর্ডে চাকরি সংক্রান্ত তথ্য দিন।
চ. ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড শিক্ষার্থীদের চাকরি সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে সচেতন করতেও সহায়ক হতে পারে।
ছ. কর্মজীবনের তথ্যের জন্য ই-লার্নিং প্যাকেজের উন্নয়ন।

৮। উপসংহার :

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কলেজ লাইব্রেরিগুলিকে শুধুমাত্র ছাত্রদের সুবিধার জন্য নয় বরং তাদের কাছে লাইব্রেরি পরিষেবাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ক্যারিয়ার গাইডেন্স পরিষেবা চালু করা উচিত। বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরিতে বই পড়ার বা ধার নেওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা যা মূলত প্রাইভেট টিউশন ভিত্তিক এবং লাইব্রেরি ব্যবহারের দিকে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে না। সুতরাং, এই পরিস্থিতিতে ক্যারিয়ার গাইডেন্স পরিষেবা কলেজগুলিতে গ্রন্থাগার পরিষেবাগুলির পুনরুজ্জীবনের একটি মাধ্যম হতে পারে। পাশাপাশি এটি লাইব্রেরীকে প্রকৃত অর্থে একটি তথ্য কেন্দ্রে পরিণত করবে।

তথ্যসূত্র :

১. নন্দদুলাল বসাক ও বি বি দাস (২০১২), তথ্য, ইন্টারনেট ও গ্রন্থাগারিকতা, কলকাতা, পোগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
২. Bhatia K K. (2001). Principles of guidance and counseling. Ludhiyana: Kalyani Publishers
৩. Kulkarni, Uday. (2010). Career guidance through college libraries. In Library: a temple of learning and knowledge house, Sita Publications, pp. 203-207.
৪. Kumar, Krishan. (2001). Library organization. New Delhi: Vikash Publishing House
৫. Moly, T. M. (2005). Career guidance initiatives in India: Role of college librarians. Journal of Library and Information Science.30; 1. Delhi: Department of Library and Information Science, University of Delhi. pp. 75-90
৬. Moly, T. M. (2007). Career guidance through libraries in higher educational institutions. Annals of Library and Information Studies. 54; 4. New Delhi: NISCAIR, pp. 185-189).

মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

হাসানুর আলম

সারসংক্ষেপ :

মানুষ হলো সামাজিক জীব। সমাজকে নিয়েই মানুষকে চলতে হয়। এই সমাজ আবার কতোগুলো পরিবার নিয়ে গঠিত হয়। নারী হলো এই পরিবারের মূল। এই নারী একাধারে যেমন— মা, মেয়ে, বোন হয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করে, তেমনই একটি পরিবারকে সুস্থ, সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনা করতে পারে। সমাজ জীবনই হোক বা পারিবারিক জীবনই হোক নারীর ভূমিকা অপরিসীম। এখন প্রশ্ন হলো সমাজে এই নারীদের অবস্থান কোথায় ? নারীরা কি তাদের প্রাপ্য অধিকার পাচ্ছে ? যদি পেয়েই থাকে তাহলে তাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে কেন ? আমরা যদি প্রাচীনকালের দিকে একটু তাকাই তাহলে দেখতে পাবো ওই সময় নারীকে এক ভোগ্যবস্তুরূপেই গ্রহণ করা হতো। যদি আমরা ব্যাবিলন সভ্যতার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো সেসময় যদি কোনো পুরুষ কাউকে হত্যা করে, তাহলে সেই লোকের বদলে তাঁর স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। আবার যদি রোমান সভ্যতায় দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে, সেসময় নারীরা ছিল ভোগের সামগ্রী, নগ্নতা আর অশ্লীলতা ছিল তাদের মূল বিষয়। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেখানে নারীরা হয়েছে অবহেলিত, নির্যাতিত ও অত্যাচারিত।

এখন দেখা যাক মুসলিম সমাজে নারীদের কতোটা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আদৌ কি নারীরা স্বাধীন মুসলিম সমাজে ? মুসলিম সমাজে নারীরা কি সত্যিই সুরক্ষিত ? এরকম অনেক প্রশ্ন আমাদের মনে অনবরত ঘোরাফেরা করে। আমাদের সমাজে মুসলিম নারী মানেই অনেকে বোঝে নারীকে হতে হবে পর্দাশীল, নারীকে স্বামীর কথা মতো চলতে লাগবে, মেয়েরা বাইরে কোনো কাজ করতে পারবে না, মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব ধারণাগুলো কতোটুকু ভিত্তি সম্পূর্ণ সেটা আলোচনা করাই আমার মূল উদ্দেশ্য।

আর একটা বিষয় সমাজে দেখা যায় সেটা হলো নারীদের অধিকার, যেটা নারীবাদীদের (feminist) মূল উদ্দেশ্য। নারীদের অধিকার বলতে মূলত যে বিষয়গুলো আমাদের সম্মুখে আসে তা হলো— নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সমান অধিকার। মুসলিম সমাজে কি এইসব দিক থেকে নারীরা বঞ্চিত ? মুসলিম সমাজে কি নারীদের সমান অধিকার দেওয়া হয়নি ? আমরা সাধারণত দেখতে পাই মুসলিম সমাজের অধিকতর মহিলারা তাদের সারাজীবন অতিবাহিত করে অন্যের সেবা শুশ্রূষা

করে। বিবাহের পূর্বে পিতা-মাতার আর বিবাহের পরে স্বামী ও সন্তানদের। তাদের কাছে অর্থ থাকলেও তারা সেটা যেমন খুশি খরচ করতে পারে না স্বামীর অনুমতি ছাড়া। যদি ইসলাম ধর্মের মূল (পবিত্র) গ্রন্থের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো, সেখানে বলা আছে একটি প্রাপ্ত বয়স্ক নারী হতে পারে কোনো সম্পত্তির মালিক, যা সে কারো অনুমতি ছাড়াই যেকোনো খাতে খরচ করতে পারবে বা বিক্রি করতে পারবে। আর এই বিষয়টি ১৮৭০ সালে পশ্চিমা দেশগুলোতে আইনে পরিণত হয় (special married women property act)।

মূল শব্দ : নারী, অধিকার, সমাজ, ইসলাম, কোরআন।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

মানুষ হলো সামাজিক জীব। সমাজকে নিয়েই মানুষকে চলতে হয়। এই সমাজ আবার কতোগুলো পরিবার নিয়ে গঠিত হয়। নারী হলো এই পরিবারের মূল। এই নারী একাধারে যেমন— মা, মেয়ে, বোন হয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করে, তেমনই একটি পরিবারকে সুস্থ, সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনা করতে পারে। সমাজ জীবনই হোক বা পারিবারিক জীবনই হোক দুই ক্ষেত্রেই নারীর ভূমিকা অপরিসীম। কবির ভাষায়—

"এমন বন্ধু বলো কে আছে তোমার মত মিস্টার,
কভু তুমি ডার্লিং, কবু তুমি জননী,
কবু তুমি স্নেহময়ী সিস্টার।" (দীপ জ্বেলে যাই)

এখন প্রশ্ন হলো সমাজে এই নারীদের অবস্থান কোথায় ? নারীরা কি তাদের প্রাপ্য অধিকার পাচ্ছে ? যদি পেয়েই থাকে তাহলে তাদেরকে আন্দোলন করতে হচ্ছে কেন সমান অধিকারের জন্য ? আমরা যদি প্রাচীনকালের দিকে একটু তাকাই তাইলে দেখতে পাবো ওই সময় নারীকে এক ভোগ্যবস্তু রূপেই গ্রহণ করা হতো। যদি আমরা ব্যাবিলন সভ্যতার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো সেসময় যদি কোনো পুরুষ কাউকে হত্যা করে তাহলে সেই লোকের বদলে তাঁর স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। আবার যদি রোমান সভ্যতায় যায় তাহলে দেখা যায়, সেসময় নারীরা ছিল ভোগের সামগ্রী, নগ্নতা আর অশ্লীলতা ছিল তাদের মূল বিষয়, রোমানরা চাইলেই তাদের স্ত্রীদের হত্যা করতে পারতো। যদি আমরা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই সেইসময় নারীরা ছিল তিন ভাগে বিভক্ত, স্ত্রী, বারাঙ্গনা ও বেশ্যা। যদিও তাদের মধ্যে কোন কাজে কতোজন নিয়োজিত ছিল সেটা বলা যায় না। আশ্চর্যের বিষয় হলো সেই সময় পতিতাদের আয় থেকে রাষ্ট্র কর নিতো। এর থেকে আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো পতিতারা মন্দিরেও কাজ করতো। পতিতাদের খদ্দের ও ভক্তের দেওয়া অর্থে মন্দিরে সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠতো। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে নারীরা হয়েছে অবহেলিত, নির্যাতিত ও অত্যাচারিত। কোরআন নাজিল হওয়ার আগে আরব সভ্যতায় মেয়ে সন্তান জন্মের পরেই তাকে মেরে ফেলা হতো। কিন্তু কোরআন নাজিল হওয়ার পর এই প্রবণতা বিনষ্ট হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হলো সমাজে নারীর অবস্থান বলতে আমরা কি বুঝি? সমাজে নারীর অবস্থান বলতে এটাই বোঝানো হয় যে, নারীদের প্রতি সমাজের সম্মানবোধ, নারীদের প্রতি আচার-আচরণ, নারীদের অধিকার ইত্যাদি। এসবের মধ্যে সবথেকে বেশি যেটা প্রাধান্য পায় তা হলো নারীদের অধিকার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নারীদের অধিকার নিয়ে পাশ্চাত্যে এক নারীবাদী আন্দোলনের (feminism) সূত্রপাত হয়, যা পরবর্তীকালে এক বিরাট আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। নারীবাদীদের মূল দাবি ছিল নারীদের সমান অধিকার প্রদান করা (পুরুষদের সমান)। নারীবাদীরা বলেন, নারী ও পুরুষ সমান এবং তারা সবক্ষেত্রেই পুরুষদের সমান অধিকার পাবে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সবদিক থেকেই তারা হবে পুরুষদের সমান অধিকারী। তবে সম্মানের দিক থেকে নারীবাদীদের দাবি খুব একটা দেখা যায় না; কেননা, প্রত্যেক সমাজেই নারীদের সম্মান করা হয়, কখনো মা রূপে, কখনো বোন রূপে, কখনো বা সহধর্মিণী রূপে। আবার তাদের সাথে ব্যবহারও ভালো করে থাকে। সুতরাং নারীদের অবস্থান আলোচনা করতে গেলে আমাদের মূলত নারীদের অধিকার নিয়েই আলোচনা করতে হবে।

এখন আমি আলোচনা করবো মুসলিম সমাজে বা ইসলাম ধর্মে নারীদের অবস্থান। এখানে একটা কথা বলতে হয় ইসলাম ধর্ম আর মুসলিম সমাজ সঠিক অর্থে এক নয়। কেননা মুসলিম সমাজের সকল মানুষ যে ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ জেনেছে এমনটা নয়। অনেক মানুষই আছেন যারা ধর্মকে না জেনেই মুসলিম। আর আমি মনে করি ধর্ম (ইসলাম) ভুল হয় না, ভুল হয় মানুষ। মানুষই ধর্মকে সঠিকভাবে না জেনেই ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন ভুল কাজ করে থাকে, তারই প্রতিফলন হিসাবে আমরা মুসলিম সমাজে নারীদের বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে দেখি। তবে আমি এখানে মুসলিম সমাজ ও ইসলাম ধর্মকে এক অর্থেই ধরে আলোচনা করবো। যদি ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরীফ ও সহি হাদিস-এর উপর। মুসলিম সমাজে আমরা দেখি যে মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেয়। মেয়েদের পর্দাশীল হতে হয়, পিতামাতা বা স্বামীর কথা মতো চলতে হয়। এসব বিষয় দেখার পর আমাদের সত্যিই মনে হয় যে, মুসলিম সমাজে নারীদের কোনো স্বাধীনতা নেই, তারা যেন তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এসব বিষয় কতোটা যুক্তিযুক্ত তা উদ্ধার করা আমার মূল লক্ষ।

ইসলাম-পূর্ব নারীরা ছিল অবহেলিত ও নিন্দিত। এমনকি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে শুনে অনেকের মুখ কালো হয়ে যেত। তাদের সেই অন্ধকার মুখ এটাই প্রকাশ করতো যে নারীরা মোটেই সম্মানের পাত্র না। কন্যাসন্তানকে এতোটাই ঘৃণা করা হতো যে, কোনো কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই তাকে জীবন্ত পুঁতে দেওয়া হতো। এসব ঘটনা আমরা এখনো অনেক পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই, যদিও এটা সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। তবে যদি আমরা পবিত্র কোরআন শরীফ-এর দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো সূরা আল নাহাল-এর ৫৮-৫৯ নং আয়াতে বর্ণিত আছে— "তাদের মধ্যে

কাউকে যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তার মুখ কালো হয়ে যায়, সে তখন মনে মনে খুব কষ্ট পায় আর চিন্তা করতে লাগে হীনতার সাথে তাকে কি বাঁচিয়ে রাখবে নাকি তাকে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা চিন্তা করে সেটা কতই না নিকৃষ্ট।" মহানবী (সা.) বলেছেন, 'মেয়েশিশু বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক।' হাদিস শরিফে আরো আছে, 'যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যাসন্তান থাকবে; আর সে ব্যক্তি যদি তার কন্যাসন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ করে, তার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়।' এর থেকে বোঝা যায় কোরআন এ নারীদের অমর্যাদা করা হয়নি।

জাহেলী যুগের নারীদের সস্তা পণ্যদ্রব্য মনে করা হতো, যেভাবে খুশি সেভাবে ব্যবহার করা হতো। কেউ চাইলেই কোনো মেয়কে বিয়ে বা সঙ্গিনী করে রাখতে পারতো। কিন্তু ইসলামে মেয়েদের দেওয়া হয়েছে সম্মান। যদি কেউ তাদের পেতে চায় তাহলে সেই ব্যক্তিকে তার সম্পদের কিছু অংশ ব্যয় করতে হবে অর্থাৎ মোহর দিয়ে বিয়ে করতে হবে। সূরা আল নিসা-এর আয়াত ৪ এ বর্ণিত আছে— "আ আতুন নিছাআ ছাদুক্বা, তিহিন্না নিহলাহ; ফাইন ত্বিবনা লাকুম আন শাইয়িম মিনহু নাফছান ফাকুলুহু হানীআম মারীআ।" অর্থাৎ 'আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মোহর দিয়ে দাও খুশি করে। তারা যদি খুশি করে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো।' এই আয়াতটিকে বিশ্লেষণ করলে এটাই দাঁড়ায় যে, কেউ চাইলেই টাকা দিয়ে কোনো নারীকে ভোক করতে পারবে। কিন্তু এই সূরার ২১ নং আয়াতে বর্ণিত আছে বিয়ে বা নিকা হলো পবিত্র চুক্তি, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চুক্তি। এই আয়াতটি এটাই স্পষ্ট করে যে, বিয়েতে পুরুষদের যা অধিকার নারীর সেই অধিকার আছে; কেননা, কোনো চুক্তিতে দু-পক্ষেরই সমান অধিকার থাকে। এছাড়া উক্ত সূরার ১৯ নং আয়াতে বর্ণিত আছে— "তোমরা নারীদের জবরদস্তি করে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করো না।"

আল কোরআন-এ বর্ণিত আছে— "ওয়া লাহুন্না মিছলুল্লাজী আলাইহিন্না বিলমারুফি ওয়া লিররিজ্বালি আলাইহিন্না দারজ্বাহ।" অর্থাৎ 'নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের, তবে নারীদের উপর পুরুষদের রয়েছে মর্যাদা।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২৪) এই আয়াত অনুযায়ী পুরুষ ও নারী সমান শুধুমাত্র মালিকানা বাদে। সমস্যাটি হলো মুসলিমদেরই অনেকে এই উক্তিটির শেষ অংশটুকু কোট করে বলেন যে, পুরুষরা superior, তারা উদ্ধৃতিটি দেয় এবং বলেন পুরুষরা নারীদের উপরের অবস্থান করে, আল্লাহ নারীর উপর পুরুষদের মর্যাদা দান করেছেন তাই পুরুষরা বড়ো বা superior। এই দাবিটি মোটেই মানা যায় না; কেননা, এখানে একটি আয়াতের কিছু অংশ বলা হয়েছে। এই আয়াতের সামনের অংশেই বলা আছে পুরুষদের উপর নারীদেরও সমান অধিকার আছে। তাছাড়া সূরা আল নিসার ৩৪ নং আয়াতে বর্ণিত আছে— "পুরুষরা হচ্ছে নারীদের কাওয়াম"। এই আরবি শব্দ 'কাওয়াম' আর অর্থ আরো কিছু বা বাড়তি কিছু দায়িত্ব পালন করা। পুরুষদের আছে মর্যাদা নারীদের উপর এই কথার অর্থ এটাই বুঝতে হবে যে, নারীদের থেকে পুরুষদের রয়েছে অধিক দায়িত্ব।

তাছাড়া ইসলামে নারীদের বলা হয় গৃহকর্ত্রী (Homemaker) কারণ তারা ঘরকে উন্নত করে তোলে। সূরা আল বাকরার ২৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে— “তারা তোমাদের পরিচ্ছদ তোমরা তাদের পরিচ্ছদ”। এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা এটাই বলতে পারি যে পুরুষরা যেমন নারীদের সবকিছুরই দায়-দায়িত্ব (পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভার ইত্যাদি) নিয়ে থাকে ঠিক তেমনই মহিলারা পুরুষদের তথা পরিবারের সুখ-দুঃখ-ভালোমন্দের সমান দায়িত্ব পালন করে।

বর্তমানে নারীদের অবহেলিত একটি অধিকার হলো পিতার সম্পত্তিতে অংশ না দেয়া বা ছলচাতুরী করে সেই অংশ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া। আমরা সাধারণত দেখে থাকি মেয়েরা পিতার সম্পত্তির অংশীদার হয় না, যদিও বা বর্তমান আইন ব্যবস্থা নারীদের সেই অধিকার প্রদান করেছে। তবে এখনো সমাজেই সেটা কার্যকর হয়নি। নারীদেরকে কোনো না কোনো ভাবে তাদের পিতৃ সম্পত্তির অংশী করে না। কিন্তু কোরআন শরীফ-এ বর্ণিত আছে— “পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের যেমন অংশ আছে তেমনি আছে নারীদেরও অংশ হোক সেটা অল্প বা বেশি। এই অংশ নির্ধারিত” (সূরা আল নিসা আয়াত ৭)।

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে। মহানবী (সা.) বলেন, ‘মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত’। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক লোক মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? নবীজি (সা.) বললেন, ‘তোমার মা’। ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন ‘তোমার মা’। ওই লোক আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? এবারো তিনি উত্তর দিলেন ‘তোমার মা’। (বাখারি)।

মহানবী (সা.)-এর জামানার বিখ্যাত এক ঘটনার কথা আমরা জানি। মায়ের সেবা করার কারণে হজরত ওয়াইস করনি (রা.) প্রিয় নবীর জামানায় থেকেও সাহাবি হতে পারেননি। একবার ওয়াইস করনি (রা.) নবীজির কাছে খবর পাঠালেন ‘ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ, এখন আমি কী করতে পারি?’ নবীজি (সা.) উত্তর পাঠালেন, ‘আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত করা বেশি জরুরি।’ নবীজি (সা.) তাঁর গায়ের একটি মোবারক জুব্বা ওয়াইস করনির জন্য রেখে যান। তিনি বলেন, মায়ের খেদমতের কারণে সে আমার কাছে আসতে পারেনি। আমার ইন্তেকালের পরে তাকে আমার এই জুব্বাটি উপহার দেবে। জুব্বাটি রেখে যান হজরত ওমর (রা.)-এর কাছে। এবং প্রিয় নবী (সা.) বলেন, হে ওমর! ওয়াইস করনির কাছ থেকে তুমি দোয়া নিয়ো। এসব ঘটে এটাই প্রমাণ করে যে নারী হলো আল্লাহ তাআলার এক অনন্য সৃষ্টি।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত একটা প্রথা হলো মেয়েদের কম বয়সেই বিয়ে দেওয়া। আর কারণ হিসাবে অনেকেই মনে করেন ইসলাম ধর্মের এমনটা বলা আছে। কেননা হুজুরেরা (পণ্ডিত) বলে থাকেন ঘুম থেকে উঠে যুবতী মেয়ের মুখ দেখা হারাম (পাপ)।

এই কথাটিকেই অনেকে গুরুত্ব দিয়ে মেয়েদের কম বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেয়। অনেক সময় তারা অবিবাহিত কন্যাসন্তানকে তাদের বোঝ মনে করে। ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় আমরা এটাও দেখতে পাই যে, মেয়েদের ইচ্ছার উপর গুরুত্ব না দিয়েই তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। যদিও অন্যান্য ধর্মেও এই প্রবণতা বিদ্যমান, তবে মুসলিম সমাজে বেশি দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে ইসলামে বলা আছে 'ইলম শিক্ষা' (জ্ঞানার্জন) করা প্রত্যেক নর ও নারীর ফরজ (বাধ্যতামূলক)। বাখারী শরীফে বলা আছে মেয়েদেরকে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া যাবে না। যদি কোনো মেয়ের অপছন্দের পাত্রের সাথে বিয়ে হয় তাহলে সে সেই বিয়ে চাইলে না মানতে পারে। এ সম্পর্কে হযরত খানসা বিনতে খিযাম আল আনসারিয়া থেকে বর্ণিত। "যখন তিনি বয়স্কা ছিলেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে বিয়ে দেন।এ বিয়ে তাঁরপছন্দ ছিল না।এরপর রাসূলুল্লাহ এর কাছে গেলে তিনি তা বাতিল করে দেন।" আসলে এই সবকিছুর মূলে রয়েছে অজ্ঞানতা,ধর্মকে সঠিকভাবে না জানা।

ইসলামে নারীরা বেশি সুরক্ষিত। সুরা নুর এর ৩০ নং আয়াতে বর্ণিত আছে 'হে রসুল! আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন' এই আয়াতটি একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। ইসলাম নারীদের পর্দার কথা বলা আছে। এখানে পর্দা মানে শুধুই যে কালো রঙের আলখাল্লা জাতীয় পোশাক হবে, তা নয়। বলা হয়েছে এখানে এটাই বলা হয়েছে তোমরা সেইসব পোশাক পরিধান করো যা তোমাদের গোপনাঙ্গকে ঢেকে রাখে। এমন পোশাক পরো না যেটাতে তোমাদের গোপনাঙ্গ বাইরে থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। অর্থাৎ এখানে পাতলা, ছোটো, চামড়ার সঙ্গে একেবারেই লেগে থাকে ইত্যাদি বস্ত্র পরিধানের বিধিনিষেধ আছে। আমরা সকলই জানি সুদীর্ঘকাল থেকে আজ অবধি নারীরা ধর্ষণ হয়ে চলছে। একটি অন্যতম কারণ হলো পোশাক। কেননা একটি পুরুষ বা একটি মহিলা একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা biologically স্বাভাবিক। তবে এই প্রবণতা সবার মধ্যে থাকলেও এটি প্রকট হয়ে দেখা দেয় যখন তারা একে অন্যের অঙ্গগুলি (উত্তেজনা বাড়ায়) দেখতে পায়। তাই ইসলাম মতে যদি কোনো নারী পর্দা করে (যেমন ইসলামে বলা আছে একটি নারী যখন বাইরে বের হতো তখন যে অধিকতর তার মুখটা খোলা রাখতে পারে তবে চোখ বাদে বাকি সব জায়গা ঢাকাটাই অধিকতর ভালো) তাহলে এই অপরাধগুলো অনেকটাই কমে যাবে। নারীরা যাতে হয়রানি না হয় তার জন্য প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— 'নারীরা পুরুষদের সহোদর।' এখানে সহোদর কথার অর্থ বোন। এছাড়াও সুরা নুর আয়াত ২৩ এ আছে 'যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ইমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকাল ও পরকালে ধিক্কৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।'

কোরআনই সম্ভবত মানব জাতির ইতিহাসে প্রথম লিখিত গ্রন্থ যেটি নারী-পুরুষকে মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদা দিয়ে নারীদের পক্ষেও অবস্থান নিয়েছে। পুরুষ মানেই

পুরুষের পক্ষে এবং নারীদের বিপক্ষে – হাজার বছরের এই মানসিকতাকে কোরআনই প্রথম ভেঙ্গে দিয়েছে। নিচের আয়াতগুলো পড়ে দেখুন, কোরআনে নারী-পুরুষের মধ্যে আদৌ কোনো পার্থক্য করা হয়েছে কিনা।

"হে মানব-জাতি! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক আত্মা থেকে এবং যিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার জোড়া, আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অনেক নর ও নারী।" (আন-নিসা ৪:১)

"যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, এবং সে ইমানদার হবে, এরূপ লোক জান্নাতে দাখিল হবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।" (আন-নিসা ৪:১২৪)

"আমি বিনষ্ট করি না তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর কর্ম, তা সে হোক পুরুষ কিংবা নারী। তোমরা একে অন্যের সমান।" (আল-ইমরান ৩:১৯৫)

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মোত্তাকি।" (আল-হুজরাত ৪৯:১৩)

—এগুলো ছাড়াও আরো কিছু আয়াত আছে যা থেকে প্রমাণিত হয় ইসলাম ধর্মে নারীরা অবহেলিত নয়। এই পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থে নারী-পুরুষকে এতো বেশিবার পাশাপাশি সম্বোধন করা হয়নি এবং নারীদেরকে এভাবে সরাসরি মর্যাদা ও অধিকারও দেওয়া হয়নি।

আমি মনে করি ইসলামে নারীর যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে কি করে? ইসলামে তো নারীদের বাইরে কাজ করতে বারণ করা হয়েছে, বারণ করা হয়েছে তাদের চাকরি করতে। ইসলামে নারীদের কাজের অনুমতি দেওয়া আছে তবে তাদের ইসলামিক শরিয়ত মেনে কাজ করতে হবে, যেমন পর্দা করা ও পরপুরুষের সাথে বেশি মেলামেশা না করা ও অন্যান্য বিধানসমূহ। কিন্তু ইসলামে ভালো করেই বলা আছে যে, সংসারের ভার থাকবে পুরুষদের উপর। নারীরা নিযুক্ত থাকবে সংসার গঠনের কাজে; কেননা, নারীরাই পারে পরিপূর্ণ একটা পরিবার গঠন করতে। এই দিক থেকে নারীরা থাকবে অনেকটাই সুরক্ষিত। তাই নারীদের বাইরে কাজ করার অনুমতি সহজেই দিতে চায় না বা দেয় না। তাছাড়া এই একবিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। কারণ এখন সবাই (পুরুষ ও নারী) সবার মতো করে বাঁচতে চায়। তারা চায় স্বাধীন জীবনযাপন। যার ফলে তাদের সাংসারিক জীবন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা একে অপরকে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। যার ফলস্বরূপ তাদের বিচ্ছেদ হয়। এই ক্ষেত্রে নারীবাদীরা হয়তো বলবেন যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষেরা নারীদের দমিয়ে রাখতে চায়। সে ক্ষেত্রে বলা যায়, পুরুষেরা পরিবারের

কর্তা হলেও বেশিরভাগ পরিবারেই নারীদের কথা তো পুরুষেরা কাজ করে থাকেন। লোকেরা বলেন এখন নাকি স্ত্রীরাই বাড়ির চেয়ারম্যান আর পুরুষের সদস্য। ইসলামে নারীদের মর্যাদা খর্ব করা হয়নি। যদিও এখনো পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশ সমাজ ব্যবস্থা এইসব বিষয়ে অবহিত নয়। আমরা এখনো দেখি প্রত্যেক সমাজেই কিছু অনৈতিক কাজ (বাল্যবিবাহ, অনধিকার) করতে দেখি। তবে যে শুধু মেদেয়েরকেই কম বয়সেই বিয়ে দেওয়া হয় এমনটা নয়, পুরুষরাও তুলনামূলক (হিন্দুদের) ভাবে কম বয়সে বিয়ে করে ফেলে। এর কারণ হিসেবে ধরা হয় জেনা বা পাপকাজ থেকে অব্যাহতী। কেননা একটি ছেলে বা মেয়ে বিয়ের আগে যে পাপ কর্মগুলো করে থাকে বিয়ের পরে তা আর করতে পারে না। কিন্তু ইসলাম এটা বলে না যে ষোল বা আঠারো বছরের কম ছেলে বা মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হোক। ইসলাম যেমন বিবাহযোগ্য ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার কথা বলে তেমনি এটাও বলে যে কমপক্ষে মেয়েরা ষোল বছরের ঊর্ধ্বে হলে বিবাহযোগ্য, যা বর্তমানে আইন সিদ্ধ। যদিও বর্তমান সমাজে বাল্যবিবাহের পরিমাণ অনেকটাই কম; কেননা বর্তমান সমাজে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার এইসব প্রবণতা অনেকটাই কমেছে। তবে এই সবের মূলে হলো অজ্ঞানতা, ধর্মকে সঠিকভাবে না জানা, নৈতিকতার অভাব। ধর্মকে পরিপূর্ণ জানলে এইসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ইসলামে বলা আছে শুধু ধর্মকে জানলেই হবে না তা জীবনে প্রয়োগ করতে লাগবে। বলাবাহুল্য যে বর্তমানে নারীরা প্রায় সবদিক থেকেই স্বাধীন, মুসলিম সমাজেও। এখনকার নারীরা শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি সবকিছুই করতে পারে। এমনকি রাজনৈতিক বিষয়ও তারা অংশগ্রহণ করছে। তবে এইসব দিক থেকে নারীরা (মুসলিম সমাজের) এগিয়ে গেলেও পুণ্যের দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। কেননা ইসলামের পর্দা প্রথাকে বেশিরভাগ মেয়েরাই মেনে চলে না, বরং তারা বিভিন্ন জেনা (পাপ) করে থাকে। তবে ধর্মীয় দিকটিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিলে বর্তমান সমাজে নারী ও পুরুষ প্রায় সমানভাবেই বিরাজ করছে।

তথ্যসূত্র :

১. থানকী, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী : কোরআন শরীফ, ৮ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলা বঙ্গানুবাদ-২০০৪, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানি লিমিটেড।

২. আকন্দ, মোঃ আলী রমজান : গুরু সক্রেটিস (২০১৬), ৪৬/১, ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, অবসর প্রকাশনা সংস্থা।

৩. হক, মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল; চৌধুরী, আলহাজ্ব মোঃ সোলায়মান : সহীহ বখারী শরীফ অনুবাদ (২০০৬), ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা-১১০০।

৪. শায়খুল, হাদীস হজরত মাওলানা মোহাম্মদ জাকারিয়া (রহঃ) : ফাজায়েলে আমাল, তানবীর বুক ডিপো ১১ কলুটোলা স্ট্রিট কলকাতা-৭৩।

৫. চট্টোপাধ্যায়, মলয় : ইসলাম ধর্মের রূপরেখা (২০১৫), চিরায়ত প্রকাশন প্রা: লি:, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

৬. https://bn.wikipedia.org/wiki/

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নির্বাচনী সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ (১৯০৪- ১৯৬৮খ্রি.)

হরেকৃষ্ণ সরকার

ভূমিকা :

বেশীরভাগ মনুবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী গবেষকরা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে নিয়ে গবেষণা করতে উপেক্ষা করেছেন। কিছু পক্ষপাতী লেখক যেমন- বাবলুকুমার পাল উদেশ্যমূলক ভাবে তাঁর চরিত্র ও কার্যাবলীকে সমালোচনা ও কলঙ্কিত করেছেন[১]। বর্তমানে মাসাউকী উসুদা, সঞ্জয় গজবীর, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বৈপায়ন সেনের[২] মত কিছু লেখক মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের উপর গবেষণা করলেও তাঁর নির্বাচনী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর যথাযথ আলোকপাত করেননি। তাই আমার এই গবেষণামূলক বিশেষ প্রবন্ধটি সকলের কাছেই চিত্তাকর্ষক হবে বলেই আশা করি। সমাজদরদী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল শৈশবকাল থেকেই বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন[৩]। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি আপনাদেরকে অবগত করবে কী ভাবে এবং কেন তিনি নির্বাচনী সংগ্রামে নিজেকে নিযুক্ত করে রাজনৈতিক কার্যাবলীতে বলিদান করেছিলেন। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে আরও দেখানো হয়েছে তাঁর সামাজিক কার্যাবলীর চেতনা, আদিভূমিসন্তান ও অন্য সকল মানুষের প্রতি তার সীমাহীন ভালোবাসা ও তাঁর দেশপ্রেম তাঁকে নির্বাচনী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক কার্যাবলীতে নিয়োজিত করেছিল, এটাও দেখান হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী ও অমানবিক মনুবাদের বিরুদ্ধে তাঁর জাতীয়তাবাদী, সাম্যবাদী ও দেশপ্রেমী মানসিকতা তাঁকে নির্বাচনী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করেছিলো[৪]। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে আরও দেখানো হয়েছে যে হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুরবাদী এবং আম্বেদকরবাদী মতাদর্শ তাঁর নির্যাতিতের স্বার্থে নির্বাচনী সংগ্রামে লড়ার এবং তার রাজনৈতিক কার্যাবলীর প্রধান মতাদর্শ রুপে কাজ করেছিল[৫]। এই বিশেষ বিষয়গুলি উপরোক্ত কোন ঐতিহাসিকই যথাযথভাবে আলোচনা করেনি, তাই আমার এই প্রবন্ধটি গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়।

নির্বাচনী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক কার্যাবলীতে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের জনসেবামূলক কার্যাবলী ও বক্তৃতার ভূমিকা :

শৈশব থেকেই মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন উদারমনা, যুক্তিবাদী, দয়ালু ও নিঃস্বার্থ প্রতিবাদী চরিত্রের[৬]। সে কারণেই তিনি তাঁর প্রতিভাদীপ্ত ও অতৃপ্ত শিক্ষাজীবন শেষ করার সাথে সাথেই নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন দরিদ্রের সেবায়, নিরক্ষরের শিক্ষাদানে ও মনুবাদী জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী লড়াইতে[৭]। আর সেই কারণেই তাঁকে রাজনীতিতে আসতে হয়েছিল, কারণ তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে রাজনীতি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সমাজসেবা। তাই আমরা দেখি যে এই উপমহাদেশে, বর্তমান ভারত বাংলাদেশ ও পাকিস্থানে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন নিঃস্বার্থ সমাজসেবায়। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি আপনাদেরকে বুঝতে সাহায্য করবে যে তাঁর জনদরদী ও প্রতিবাদী মানসিকতা তাঁকে জাতভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়তে এবং তাঁর আদিভূমিসন্তান ও অন্য সকল মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা তাঁকে নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল করেছিল, কিন্তু পরিতাপের বিষয় দ্বৈপায়ন সেন, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাসাউকী উসুদা, সুমিত সরকার, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মত ঐতিহাসিকেরা যথাযথ ভাবে তা তুলে ধরেননি। এই প্রবন্ধটি আপনাদেরকে আরও জানাবে যে, তাঁর জনসেবা ও দেশপ্রেমমূলক বক্তৃতা তাঁকে এই উপমহাদেশে জনপ্রিয় নেতৃত্বে পরিণত করেছিল। কিন্তু এই বিশেষ বিষয়টিও উপরোক্ত ঐতিহাসিকদের লেখনীতে ফুটে ওঠেনি। এখন দেখে নেওয়া যাক আমার এই গবেষণালব্ধ তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর আত্মত্যাগ, কিভাবে তাঁকে জনপ্রিয় নেতা ও মহাপ্রাণে পরিণত করেছিলো।

বিখ্যাত নেতৃত্ব অশ্বিণী কুমার দত্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "Little Brother of the Poor" সংগঠনের জনসেবামূলক কার্যের দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর সেই কারণেই দেশপ্রেমী যুবক যোগেন্দ্রনাথ উক্ত সংগঠনের সেবামূলক কাজে আত্মোৎস্বর্গ করেছিলেন[৮]।

ছাত্র জীবন থেকেই যোগেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় বক্তা ছিলেন। তাঁর মর্মস্পর্শী কণ্ঠ, তাঁর যুক্তিবাদী ও প্রতিবাদী বক্তব্য তাঁকে তাঁর বন্ধু ও শিক্ষকদের কাছে মুগ্ধ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তাঁর এই জনপ্রিয়তা তাঁকে বারবার ক্লাস ও স্কুল মনিটরে পরিণত করেছিল[৯]। আগৈলঝাড়া প্রজা – সম্মেলনের বক্তৃতায় তিনি সকলকে বুঝিয়ে ছিলেন বৃথা আবেদন নিবেদন ও ভিক্ষার নীতি দ্বারা কোন কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়[১০]। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯৩৬ সালে বরিশালের লোকাল ও ডিস্ট্রিক বোর্ডের নির্বাচনে জয়লাভ করার ফলে আরও বেশি করে জনপ্রিয় হতে শুরু করেছিলেন। আর সেই কারণেই ১৯৩৭ সালের উত্তর পূর্ব বাখরগঞ্জ সাধারণত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্যাতিত সমাজের ও তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের বিপুল ভোটে জয় লাভ করেছিলেন[১১]। তাঁর কলিকাতার ছোট আদালতের (Small Cause Court) ওকালতি পরিত্যাগ করে ১৯৩৬ সালে জনসেবামূলক কাজের প্রসারকল্পে বরিশালের সদর আদালতে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করে নিঃস্বার্থ জনসেবার জন্য বারের স্বার্থপর উকিলদের কাছে বিরক্তির কারণ

হলেও তাঁর সেই নিঃস্বার্থ সেবাই তাঁকে জননেতায় পরিণত করেছিল[১২]।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বাগ্মিতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে অতি প্রাচীনকাল থেকে। আমরা জানি যে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার সফিস্ট বক্তারা এই কারণে বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। আমাদের এই বাংলাতেও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়ও খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাদের সুমধুর বক্তৃতার জন্য। ইংল্যান্ডের- বার্ক, শেরিডন, আর্ল অফ চ্যাথাম, ফক্স ও পীট এবং পৃথিবীর আরও অনেক বাগ্মী, তাঁদের বাগ্মীতার জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন[১৩]।

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল আগৈলঝারা প্রজা-সম্মেলনে জনদরদী ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর এই খ্যাতি ও জনপ্রিয়তাই তাঁকে সুমহান নেতৃত্বে পরিণত করেছিল[১৪]। তাই পরবর্তীকালের, বিধানসভা বিতর্ক, ১৯৪৬ সালের অন্তর্বতী সরকারের আইন মন্ত্রীত্বের বিতর্ক, পাকিস্থানের মন্ত্রীসভার বিতর্ক ও অন্য সর্বত্র তাকে নির্যাতিত সংগ্রামের সর্বকালের খ্যাতি দান করেছে। তাঁর এই বাগ্মিতা মদনমোহন মালব্য, যিনি চার বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ও তিনবার হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁর প্রশংসা অর্জন করেছিল। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মহাশয়েরও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল[১৫]। কিন্তু তাঁর এই বিশেষ গুণাবলী ও সংগঠনিক নেতৃত্ব দানের দিকটি আধুনিক গবেষকদের কাছে বিশেষভাবে উপেক্ষিত ররেছে। তাই এই বিষয়টিতে আলোকপাত করতেই হল।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নির্বাচনী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক কার্যাবলীতে দেশপ্রেম :

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নির্বাচনী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক কার্যাবলীতে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল তাঁর চিরবঞ্চিত ও মনুবাদী সমাজে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণিত মানুষ ও অন্য সকলের প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা ও দেশপ্রেম। তার এই ভালোবাসা ও দেশপ্রেমের জন্যই তিনি সর্বকালের দেশপ্রেমী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও সর্বকালের বঞ্চিত জনতার মুক্তি যোদ্ধা, ভারতরত্ন বাবা সাহেব আম্বেদকরকে নেতৃত্বে ররণ করতে পেরেছিলেন[১৬]। আর সেই দেশাত্ববোধক কাজের শুভারম্ভ হয়েছিল দেশপ্রেমী কংগ্রেস নেতৃত্ব অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের হাত ধরে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর ১৯৩৮ সালে অন্যান্য নির্দলীয় বিধায়কদের নিয়ে তিনি “Independent Scheduled Caste Assembly Party” গঠন করেছিলেন[১৭]। গান্ধীজির অনুপ্রেরণায় নেতাজীর হাত ধরে কলকাতায় পৌর সভার নির্বাচনে জয়ী হয়ে নির্যাতিতের জনসেবা, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশ গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন[১৮]।

চিরনির্যাতিত, বঞ্চিত আর মনুবাদী শোষণে জর্জরিত শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির জন্য তিনি ১৯৩৮ সালে বিধান সভায় No-Confiidence Motion আহ্বান করেছিলেন। কারণ আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা-তপশিলী জাতি, তপশিলী

উপজাতি, শ্রমিক ও কৃষক স্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পুঁজিবাদকে সমৃদ্ধ করেছিল[১৯]। তাই বঞ্চিত মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বাধ্য হয়েই তাকে খাজা নাজিমুদ্দীন ও পরবর্তীকালের হুসেন সহীদ সুরাবর্দ্দী মন্ত্রী সভায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল, তাঁর এই সব কার্যাবলীর মধ্যেই চির বঞ্চিত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর দরদ ও দেশপ্রেমই ফুটে উঠেছে, No-Confidence Motion বক্তৃতার মধ্যে তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে[২০]। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা মে-এর খড়িবাড়ী জনসভায় দেশভাগের বিরোধিতাও তাঁর গভীর দেশপ্রেমেরই পরিচয় দেয়[২১]। ১৯৫০ সালের পাকিস্থানের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ তাঁর পাকিস্থানের সংখ্যালঘু মানুষের প্রতি সীমাহীন দরদ ও ভালোবাসাকেই ফুটিয়ে তুলেছে[২২]। কিছু স্বার্থান্বেষী আর সুবিধাবাদীরা নিজেদের স্বার্থে কুৎসায় রটিয়েছেন আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধে তা আমি দেখিয়েছি। অন্যান্য গবেষকরা এই দিকটি উপেক্ষা করলেও মহাপ্রাণের সুপুত্র গবেষক জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল ''মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ'' নামক গ্রন্থে ভালভাবেই তার তথ্য দিয়েছেন[২৩]।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নির্বাচনী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক কার্যাবলীর রাজনৈতিক মতাদর্শ:

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের উপরোক্ত দেশাত্মবোধক ও জাতীয়তবাদী মানসিকতা এবং তাঁর চিরবঞ্চিত আদিভূমি সন্তানদের জন্য সমাজসেবামূলক কার্যাবলী তাঁকে নির্বাচনী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক কার্যাবলীতে উদবুদ্ধ করেছিল। তবে তিনি তাঁর এই কাজের মূল অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, নিপীড়িত জনগণের মুক্তিদাতা হরি গুরুচাঁদ ঠাকুর, মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে ও বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে, হরি চাঁদ ঠাকুরের সুপুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের বাণী— যে ধর্মে রাজা আছে, সেই ধর্ম তাজা। ধর্ম রাজ্যে বাস করে ধর্মশীল প্রজা।। রাজা যদি হতে চাও ধর রাজ ভাব। ভাব অনুযায়ী আসে ভাবের স্বভাব।। (গুরুচাঁদ চরিত, মহানন্দ হালদার।)[২৪], এই বাণী দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাই তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন বৃথা আবেদন নিবেদন ও ভিক্ষার দ্বারা বঞ্চিত মানুষের মুক্তি আসে না, সেটা আসে রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। ভারতরত্ন বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের ঘোষণা রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা যার সাহায্যে প্রতিটি বন্ধ দরজার খোলা সম্ভব এই বাণী তাকে আম্বেদকরের অনুগামী ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সামিল করেছিল[২৫]।

তাই আমরা দেখতে পাই এই উপমহাদেশে, বর্তমানের ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে তাঁর নির্বাচনী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক কার্যাবলী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর ও বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের নীতি রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেল। কিন্তু তাঁর এই রাজনৈতিক মতাদর্শ অন্য কোন ঐতিহাসিক ও গবেষকের দ্বারা আলোচিত হয়নি।

তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে দেখা যায় তিনি বিশেষভাবেই, মনুবাদী অসাম্য, পুঁজিবাদী অসাম্য ও ধর্মীয় মৌলবাদী অসাম্য বিরোধী ছিলেন, মূলত তিনি

বাস্তববাদী, মার্কসবাদী, ও সাম্যবাদী নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। মনুবাদী অসাম্য ও বঞ্চনার হাত থকে ভারতীয় আদিভূমিসন্তানদের সঠিক মুক্তির জন্য তিনি আসাম, করিমগঞ্জ জন সভায় বলেছিলেন "যদি আজ কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে, আমার জীবনের বিনিময়ে ৮ কোটি তপশিলীর সার্বভৌম মুক্তি আসিবে, তবে আমি সেই মৃত্যুকে তিলে তিলে বরণ করিতে পরিব। যদি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে অথবা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আমাকে নিক্ষেপ করিলে সে মুক্তি মিলে, তবে আমি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়িব।" তাঁর এই সংগ্রামী ও দরদী কথা থেকেই বোঝা যায় তিনি তপশিলীদের মুক্তির জন্য আত্মোৎস্বর্গী ও সংকল্পবদ্ধ ছিলেন[২৬]। তিনি মনে প্রাণে কমিউনিস্ট ও সাম্যবাদী ছিলেন। তাই তিনি আত্ম প্রত্যয়ের সাথে বলতে পেরেছিলেন "আমি ভাবিয়া বিস্মিত হই যে একজন সোসালিস্ট বা কমিউনিস্ট নেতা কিরূপে আমাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া ধিক্কার দিতে পারে[২৭]।" তাঁর এই উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে তিনি প্রকৃত মার্কসবাদী, বাস্তববাদী ও সাম্যবাদী ছিলেন বলেই হিন্দুধর্ম শাস্ত্রের অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পাথরের দেবতার পূজা ও মন্দির প্রবেশ আন্দোলনের থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি[২৮]।

তাঁর এই রাজনৈতিক আন্দোলন সফল করতে ও চিরবঞ্চিত শ্রমিক কৃষককে মুক্তি দিতে তিনি রোমের ক্রীতদাস ও স্পার্টার হেলটগণের মুক্তি সংগ্রামের কথা বলে এই উপমহাদেশের নিপীড়িত আদিভূমিসন্তানদের মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন[২৯]। তিনি হরি-গুরুচাঁদ ও বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের রাজনৈতিক আদর্শ থেকে বেশ ভালভাবেই বুঝেছিলেন শিক্ষার প্রসার ও জনচেতনার বিশেষ প্রয়োজন। তাই তিনি গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শ— "খাও বা না খাও তাতে দুখ নাই। ছেলে পেলে শিক্ষা দাও এই আমি চাই" (গুরুচাঁদ চরিত, মহানন্দ হালদার) এই শিক্ষাদর্শে ভাবিত হয়ে মনুবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ঘৃণিত ও উপেক্ষিত মানুষের শিক্ষা ও চেতনার প্রসার ঘটানোর বিশেষ সংগ্রাম করেছিলেন[৩০]। তিনি তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের পূর্ণতা দেখতে পেয়েছিলেন বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের মুক্তির বাণী "শিক্ষিত হও, সংগঠিত হও, আন্দোলন কর", এই বাণীর মধ্যে। কারণ এই বাণীর মধ্যেই রয়েছে পৃথিবীর সর্বস্থানের সর্বকালের চিরবঞ্চিত মানুষের মুক্তির মূলমন্ত্র। আর এই কারণেই বাবা সাহেবকে সংবিধানের জনক বানাতে আর মুক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে জয়ী করে মনুবাদী হিন্দু-মহাসভা ও জাতীয় কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ করে পাঠিয়েছিলেন গণপরিষদে। নিজে গণপরিষদে যাওয়ার জন্য লালায়িত না হয়ে, করেছিলেন চরম আত্মত্যাগ, আর দিয়েছিলেন তাঁর অতিপ্রিয় মহান নেতৃত্ব বাবা সাহেবকে সর্বকালের যোগ্য সম্মান, আর চিরবঞ্চিত মানুষকে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি ও সাম্যর অধিকার, আর তাঁর এই আত্মত্যাগের জন্যই তিনি চিরবিঞ্চিত ও মুক্তিকামী মানুষের মনে হয়ে রয়েছেন সর্বকালের মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল[৩১]।

নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রীসভা শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ উপেক্ষা করলে, তপশিলী জাতি

ও উপজাতির শিক্ষা ব্যহত করলে ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায় অনিম করলে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তার কঠোর প্রতিবাদ করে সরকার ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়ে বঞ্চিত জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করেছিলেন[৩২]। সুরাবর্দী মন্ত্রীত্বকালে মুসলিম লীগের সমর্থনে ১৯৪৬ সালে অন্তরবর্তী সরকারে যোগদান করলেও মৌলবাদী মুসলিমদের কায়েমী স্বার্থের সাথে কোনও দিনই আপোষ করেনি বলেই দেশভাগের পূর্বে বাংলাভাগের বিরোধিতা করে রাজস্থান বা অচ্ছুৎস্থান নামে রাজ্য গঠনের জন্য জন আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। আর যাতে তপশিলী হিন্দুরা দেশভাগের বলি হয়ে ওপার বাংলার মুসলমানদের কাছে অত্যাচারিত হয়ে এপারে আসতে বাধ্য না হয়, তার জন্য লোক বিনিময় চেয়েছিলেন[৩৩]। তার সে আন্দোলন ব্যর্থ হলে বাধ্য হয়েই তিনি পাকিস্থানের মন্ত্রীসভায় যোগদান করেছিলেন আইন ও শ্রমমন্ত্রী রূপে[৩৪]। মহম্মদ আলী জিন্নার মৃত্যুর পর আপ্রাণ চেষ্ঠা করেও ব্যর্থ হলে তিনি এদেশে এসে দেশভাগের বলি শরণার্থী উদ্বাস্তু হিন্দুদের দন্ডকারণ্যর পরিবর্তে এই বাংলাতেই নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসনের আন্দোলন করে তিন বার জেলে গিয়েছিলেন[৩৫]।

দেশভাগের বলি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসিন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বঞ্চিত মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য তিনি ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে বলিয়াপুকুর-বলিয়াগঞ্জ (তপ:) নির্বাচন কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী রূপে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে কংগ্রেস প্রার্থী পুলিন বিহারী খটিক মহাশয়ের কাছে পরাজিত হন[৩৬]।

কিছু শুভকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের ইচ্ছা ও পরামর্শে, এবং উদ্বাস্তু মানুষের স্বার্থে ও দেশগঠনমূলক কাজে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে লড়তে ইচ্ছুক ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায় তাঁর প্রস্তাব গ্রহণের ইচ্ছুক থাকলেও নদীয়া জেলায় কংগ্রেস নেতৃত্ব জীবন রতন ধরের কঠোর বিরোধিতার জন্য তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি, ধর মহাশয়ের ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতার ফলে তিনি মনীন্দ্র ভূষণ বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন[৩৭]। তাই তিনি পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র জানা, আশুতোষ ঘোষ ও অন্যান্যদের সাথে নিয়ে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ কৃষক প্রজা পরিষদ গঠন করেন ও পরে সেই সংগঠনটিকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ১৯৬২ সালের হাঁসখালি (তপ:) ও বাগদা (তপ:) প্রতিযোগিতা করে পুনরায় পি. আর. ঠাকুর মনীন্দ্র ভূষণ বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে পরাজিত হন এবং এর পরের একটি উপনির্বাচনেও পরাজিত হয়েছিলেন[৩৮]।

১৯৬৭ সালের ১৫ থেকে ২১ শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভারতের সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়। ১৯৬৬ সালের ১৩ই আগস্টের যুগান্তর প্রত্রিকায় খবর ছেপেছিল যে P.S.P. পার্টি বাদ দিয়ে কংগ্রেস বিরোধী ১৩ টি পার্টি ও অন্য কিছু নির্দলীয় বিরোধী নেতৃত্ব জ্যোতি বসু ও অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বাম কম্যুনিস্ট ফ্রন্ট গঠন করেছিল[৩৯]। ১৯৬৬ সালে ১৩ই ডিসেম্বরের দৈনিক বসুমতী সংবাদপত্র থেকে জানা যায় যে সংযুক্ত ফ্রন্ট নামে আর

ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল[৪০]। এই রূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল জ্যোতিবসু ও প্রমোদ দাস গুপ্তের সাথে রাজনৈতিক মিত্রতা করেও বারাসত পার্লামেন্টারী কেন্দ্রে প্রতারিত হয়ে রনেন্দ্র নাথ সেনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। এর পরে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে লড়ায়ের জন্য বামপন্থী ও সংযুক্ত ফ্রন্টের সাথে মিত্রতার চেষ্টায় যখন ব্যস্ত আর নিজের R.P.I. পার্টি স্বার্থ ও বঞ্চিত মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিতে অসম্মত হয়ে বাগদা কেন্দ্রের হ্যালেঞ্চায় পার্টি অফিস উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন সেখানে ১৯৬৮ সালের ৫ই অক্টোবর বাড়ি ফেরার পথে অন্তিম সাথী মুকুন্দ মণ্ডলের সম্মুখে আকস্মিকভাবে মুখে গ্যাঁজলা উঠে মৃত্যু মুখে পতিত হন। মহাপ্রাণের সুপুত্র জগদীশ মণ্ডল ও সদানন্দ বিশ্বাস, মুকুন্দ মণ্ডল ও অপূর্ব লাল মজুমদারকে যিনি যার বাগদা কেন্দ্রের প্রতীদ্বন্দ্বী বাম ঘনিষ্ট ও তথাকথিত উচ্ছবর্ণীয় ঘনিষ্ট ছিলেন মৃত্যুর জন্য সন্দেহ করলেও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। তবে সংবাদপত্রের খবর দেখে অনুমান করা যায় তিনি মনুবাদী পার্টিরগুলির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন[৪১]।

উপসংহার :

সারাজীবন বঞ্চিত মানুষের জন্য আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, অসহায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য জীবন বিপন্ন করা, দেশভাগের বলি উদ্বাস্তুদের স্বার্থে কারাবরণ, দেশ গঠনের জন্য নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তি যোদ্ধা ভারতরত্ন বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের সহযোদ্ধা হয়েও মুখে গ্যাঁজলা উঠে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবুও তাঁর মৃত্যুর পরে আজও স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদীরা তাকে কলঙ্কিত করে নিজেদের মুখে বুদ্ধিজীবীর মুখোশ লাগিয়ে সন্মানিত হন। তাই মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের উক্তি মনে পরে যায় "আমি এত বিষ হজম করেছি যে নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত সমস্তই তাহাতে নীল হওয়া উচিত ছিল[৪২]।" তাঁর দূরদর্শিতা ও অনেক ভবিষ্যত বাণী আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর ভবিষ্যত বাণী আজ এপার বাংলা ওপর বাংলার সংখ্যা লঘুদের ক্ষেত্রেও যথার্থ বলে পরিগণিত হচ্ছে। দেশভাগের ফলাফল জলন্ত উদ্বাস্তু সমস্যা তাঁর ভবিষ্যত বাণীর মধ্যে আজও সমাধান খুঁজছে। তাঁর কথা মত পশ্চিমবঙ্গে আজও বঞ্চিত মানুষেরা তথাকথিত উচ্চবর্ণের শোষণ থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে। গবেষক ও ঐতিহাসিক দ্বৈপায়ন সেন তার গবেষণায় দেখিয়েছেন দেশ ভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলনকে সফল করতে পারছে না[৪৩]। অপর সুনামধন্য ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন বঞ্চিত মানুষের আন্দোলন স্বাধীনতর পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মতুয়া ধর্মের উদ্বাস্তু আন্দোলনে পরিণত হয়েছে[৪৪]। আমার মতে আগামী ২০ বছরের মধ্যে বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মানুষের রাজনৈতিক আন্দোলন সফলতা লাভ করে সর্বভারতীয় বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মানুষের মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হবে। হরেকৃষ্ণ সরকারের প্রতিষ্ঠিত আদিভূমিসন্তান (আম্বেদকরবাদী-অ্যাবরিজিনাল) A.P.I. পার্টি অফ ইন্ডিয়া বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে ৫০,০০০ এর মত ভোট পেয়ে রাজবংশী

নেতৃত্ব শ্রদ্ধেয় অতুল রায়ের প্রতিষ্ঠিত K.P.P. পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব তাঁর সুপুত্র অমিত রায় ও শ্রদ্ধেয় আদিবাসী নেতৃত্ব কিরণ কালিন্দীর P.P.P. এবং C.P.I. (M.L) Regional পার্টির নেতৃত্ব শ্রদ্ধেয় শ্রীধর মুখার্জির সাথে মিত্রতা করে সেই লক্ষ্যে দ্রুত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

তথ্যসূত্র :

১. পাল বাবলু কুমার, বরিশাল থেকে দন্ডকারণ্য, পূর্ব বঙ্গের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসিন ইতিহাস, পরিবেশক- মিত্রম ৩৭ এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা -৭৩, গ্রন্থমিত্রা, 1Bi, রাজা লেন, কলকাতা -৯, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১০, পৃষ্ঠা ১ –৪০।

২. Sen Dwaipayan, The Emergence and Decline of Dalit Politics in Bengal, Jogendra Nath Mandal, The Scheduled Castes Federation, and Partition, 1932-1968 University of Chicago, Department of History, P.1- 308.

৩. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ : মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ২–৩।

৪. Mandal Sd/J.N. An Appeal Object of The All- India Scheduled Castes Federation., President, Bengal Provincial S. C. Federation, মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ২৫–২৬, ১৩৮–১৩৯।

৫. বৈরাগী মণিমোহন হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম প্রকাশিকা: শ্রীমতি শোভা বৈরাগী, আন্দোমেলা, রাণাঘাট, নদীয়া, প্রথম প্রকাশ: ১৭ই জুন শুক্রবার, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১-১১২।

৬. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ১২ – ১৩।

৭. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৩–১৪।

৮. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ : মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ১০–১১।

৯. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২,

ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ৫।

১০. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ : মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ১১ – ১২, ১৪ – ১৫।

১১. The Amrita Bazar Patrika, January 28, 1937., Repot of the Reforms Office, Bengal 1932–1937, P. 340-341., মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ : মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ২০–২৯।

১২. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ : মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ২২– ২৪।

১৩. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ১১– ১২।

১৪. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ১২।

১৫. Mandal Jogendra Nath, Mr. Mandal's Speech, The Statesman, Monday, August 11, 1947., মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ চতুর্থ খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭৯, পরিবর্ধিত প্রকাশ : জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা ২৭ – ২৯।

১৬. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩৪।

১৭. বর্মন উপেন্দ্র নাথ, উত্তর বাংলার সেকাল ও আমার জীবন-স্মৃতি, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৫, মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩৪, ৪৯–৫১।

১৮. বর্মন উপেন্দ্র নাথ, উত্তর বাংলার সেকাল ও আমার জীবন-স্মৃতি, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৫, মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ : মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ৪৯ – ৫১।

১৯. Hindusthan Standard, Sunday, July 31, Monday, Aug. 8, 1938.,

Assembly Proceedngs Vol. LIII. No. 1, Page-88., মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ৫১-৫৩।

২০. The Amrita Bazar Patrika, Tuesday, April 20, 1943, Hindusthan Standard, Sunday, July 31, Monday, Aug. 8, 1938., Hindusthan Standard, Sunday, April 25, 1943., Assembly Proceedigs, Vol. LIII. No. 1, Page-88., মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ৫১-৫৩।

২১. Sind Observer, Saturday, May 10, 1947., The Statesman, Saturday, May 10, 1947., মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ তৃতীয় খন্ড, দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭৯, পরিবর্ধিত প্রকাশ: এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা ৯০- ৯৩।

২২. আনন্দবাজার প্রত্রিকা, সোমবার, অক্টোবর, ৯, ১৯৫০, লোকসেবক, সোমবার, অক্টোবর, ১৯৫০।, সত্যযুগ, অক্টোবর ১০, ১৯৫০, The Nation, Monday, Oct. 9. 1050., মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ চতুর্থ খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭৯, পরিবর্ধিত প্রকাশ : মে ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৯৩ - ২২০।

২৩. আজাদ, সোমবার, অক্টোবর ৯, ১৯৫০, মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ পঞ্চম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃষ্ঠা ১-২।

২৪. বৈরাগী মণিমোহন হরি-গুরু চাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম প্রকাশিকা : শ্রীমতি শোভা বৈরাগী, আন্দোমেলা, রাণাঘাট, নদীয়া, প্রথম প্রকাশ : ১৭ই জুন শুকরুবার ২০০৫, পৃষ্ঠা -৯০।

২৫. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ : মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ৪৯-৫১।

২৬. মণ্ডল যোগেন্দ্রনাথ, করিমগঞ্জে আসাম প্রাদেশিক তপশিলী ফেডারেশনের অধিবেশন সভপ্রতি মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের বক্তৃতা, মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খন্ড, দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৩১-১৪১।

২৭. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খন্ড, দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী

দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা কভার।

২৮. মণ্ডল যোগেন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক তফসিলজাতি ফেডারেশন প্রথম প্রাদেশিক মহাসম্মেলন স্থান - গোপালগঞ্জ (ফরিদ পুর) তারিখ-২৪ ও ২৫ এপ্রিল, ১৯৪৫ সভাপতির অভিভাষণ, মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৭৩- ১৮৪।

২৯. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খন্ড, দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৬০।

৩০. রায় জগদীশচন্দ্র, গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা - আন্দোলন হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ প্রকাশনী, সিন্দ্রানী, বাগদা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পিন: ৭৪৩২৯৭, পৃষ্ঠা - ১১।

৩১. Amrita Bazar Patrika. Saturday, July 6. 1946., মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩৭-৪৬।

৩২. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ: মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ১০৯-১১০।

৩৩. Morning News, Tuesday, May 13, 1947., মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ তৃতীয় খন্ড, দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭৯, পরিবর্ধিত প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা ৯০-৯৯।

৩৪. Amrita Bazar Patrika, Thursday, July 24, 1947, মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ চতুর্থ খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭৯, পরিবর্ধিত প্রকাশ: জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা ২০ – ২১।

৩৫. মণ্ডল যোগেন্দ্রনাথ পূর্বভারত বাস্তহার সংসদের উদ্দেশ্য ও দাবি, মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, "মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ" ষষ্ঠ খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৫৪- ৫৯।

৩৬. Mandal Jogendra Nath, An Appeal to the Voters Of The Beniapukur-Ballygunge Assembly Constituency, 64, Southern Avenue, Calcutta-29., মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ সপ্তম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১০২ – ১০৬।

৩৭. যুগান্তর, মে ৩, ১৯৫৫ মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ সপ্তম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮, ১২।

৩৮. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ সপ্তম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১১৬-১১৯।

৩৯. যুগান্তর, বুধবার, আগস্ট ৩১, ১৯৬৬, মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ সপ্তম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১২৬।

৪০. দৈনিক বসুমতি, মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১৩, ১৯৬৬, মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ সপ্তম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৩৩।

৪১. আনন্দ বাজার পত্রিকা, শনিবার, অক্টোবর ৫, ১৯৬৮, The Statesman, Sunday, October 6, 1968., অন্তিম সঙ্গীর বিবরণীতে যোগেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দিন (মুকুন্দ বিহারী মণ্ডলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের সাক্ষাত্কাগর) সদানন্দ বিশ্বাস ২৪/ ৫ /২০০৫, মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ সপ্তম খন্ড, চতুর্থ দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৬৪-১৮২, সিকদার রণজিতকুমার, এক নজরে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, ড: আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ৩০ জুন, ২০০৭, পৃষ্ঠ- ১-১৬, সম্পাদনা রায় জগদীশচন্দ্র, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ প্রকাশনী উত্তর চব্বিশ পরগণা, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা ১-৩২।

৪২. মণ্ডল জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খন্ড, দুনিয়া, স্টল-২২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৫, পরিবর্ধিত প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা কভার পেজ।

৪৩. Sen Dwaipayan, The Emergence and Decline of Dalit Politics in Bengal, Jogendra Nath Mandal, The Scheduled Castes Federation, and Partition, 1932- 1968", The University of Chicago, Department of History, P. xii–xiv.

৪৪. Bandyopadhyay sekhar, Caste, Protest and Identity in Colonial India, The Namasudras of Bengal, 1872–1947, Oxford University Press 2011, P. 238–274.

ভাদু : স্বরূপ সন্ধানে

মধুমিতা পাল

সারসংক্ষেপ :

বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাণ হল সঙ্গীত। কিংবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, সঙ্গীতের ভিত্তিভূমির ওপরই বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাসাদটি রচিত হয়েছে। বাঙালির প্রায় সব উৎসব-অনুষ্ঠানের আরম্ভ ও সমাপ্তি সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই হয়ে থাকে। অতএব সঙ্গীত যে বাঙালির মজ্জাগত, বাঙালির চেতনারাজ্যে সঙ্গীতের রাজকীয় আধিপত্য তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভাদুগান লোকসাহিত্যের অন্যতম একটি জনপ্রিয় ক্ষেত্র। 'ভাদু' পশ্চিম সীমান্তের বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একটি লোক উৎসব। ভৌগলিক পরিধি মোটামুটি পশ্চিম বর্ধমান; দক্ষিণ বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল। ভাদু গীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে ভাদু পূজা সম্পর্কে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। বারো মাসে তেরো পার্বনের মত ভাদু পূজা পুরুলিয়ার একটি আঞ্চলিক উৎসব। ভাদু পূজা মূলত মহিলা কেন্দ্রীক। ভাদ্র মাসে সংক্রান্তিতে ভাদু পূজা হয়। নারীরূপী মূর্তি ভাদু দেবী হিসাবে পূজিত হয়। ভাদুর উৎস সন্ধান করতে হলে অন্য লোক সংস্কৃতি বা লোক উৎসবের মতই অনুমান আশ্রয় করতে হয়। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটি প্রচলিত কাহিনির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের রাজার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, কেউ কেউ বলেছেন নাম 'ভদ্রাবতী', কেউ বলেছেন 'ভদ্রেশ্বরী'। এই লোক উৎসবটি আজ অস্তিত্বহীন অবস্থায় তবুও ক্ষেত্র সমীক্ষাকালীন আমরা এটা লক্ষ করেছি, সমাজের কিছু সম্প্রদায় ভাদু-উৎসবের মধ্যে দিয়ে ভাদুগানকে জীবিত করে রাখার প্রয়াস নিয়েছে। ভাদু গীতির মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে পুরো সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিমন্ডলের রূপ ফুঁটে উঠেছে।

শব্দবন্ধন :

সংস্কৃতির, সম্প্রদায়, কাশীপুরের, সমীক্ষাকালীন, অস্তিত্বহীন, পরিমন্ডলের, পার্শ্ববর্তী, পুরুলিয়া, সীমান্তবর্তী, সংক্রান্তিতে, মজ্জাগত, বাঙালির, চেতনারাজ্য, সঙ্গীতের, রাজকীয় আধিপত্য ইত্যাদি।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

'ভাদু' পশ্চিম সীমান্তের বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একটি লোক উৎসব। ভৌগোলিক পরিধি মোটামুটি পশ্চিম বর্ধমান; দক্ষিণ বীরভূম, বাঁকুড়া,

পুরুলিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল। এই সুবিশাল অঞ্চল ব্যাপ্ত ভাদু উৎসবটির প্রকৃত পরিধি ঠিক কতখানি ব্যাপ্ত সেটা বলা বর্তমানে সম্ভব নয়। এই ধরনের প্রাচীন লোক উৎসবগুলি আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। একসময়ে এই বিশাল অঞ্চলব্যাপী উদ্‌যাপিত হওয়া ভাদু মূলত এখন বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার কিছু অংশে একটু দাগ রাখার মতন টিকে রয়েছে। একসময় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী সাড়ম্বরে পালিত হওয়া ভাদু উৎসব আজ কোন এক অজানা স্রোতে দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে। কিছু মানুষের প্রচেষ্টায় এই উৎসবের আঁচ পাওয়া সম্ভব হয়। ক্রমশ কালের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া এই লোক উৎসবটিকে বাঁচিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় 'ভাদু' এই লোক উৎসব ও ভাদু গীতি সম্পর্কে পর্যালোচনার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নিয়ে আমার পথচলা।

বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাণ হল সঙ্গীত। কিংবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, সঙ্গীতের ভিত্তিভূমির ওপরই বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাসাদটি রচিত হয়েছে। বাঙালির প্রায় সব উৎসব অনুষ্ঠানের আরম্ভ ও সমাপ্তি সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই হয়ে থাকে। অতএব সঙ্গীত যে বাঙালির মজ্জাগত, বাঙালির চেতনারাজ্যে সঙ্গীতের রাজকীয় আধিপত্য তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সঙ্গীতেই বাঙালি মানসের সার্থক প্রতিফলন। সামাজিক, ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রের পরিচয়ই বিবৃত রয়েছে বাঙালির সঙ্গীতে। তাই সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে বাঙালির সার্থক পরিচয় লাভ সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। বাংলার ব্যক্তি প্রয়াসের দ্বারা সৃষ্ট সঙ্গীতের পাশাপাশি পরিপূরক রূপে স্থান লাভ করে আছে বাংলার লোকসঙ্গীত। লোকসাহিত্যের অপরাপর বিভাগগুলির মত লোকসঙ্গীতও সংহত সমাজের সৃষ্টি এবং ব্যপ্তির পরিবর্তে তা সমষ্টির সৃষ্টি রূপেই পরিচিত।

ভাদু গীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে ভাদু পূজা সম্পর্কে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। বারো মাসে তেরো পার্বনের মত ভাদু পূজা পুরুলিয়ার একটি আঞ্চলিক উৎসব। ভাদু পূজা মূলত মহিলা কেন্দ্রীক পূজা। ভাদ্র মাসে সংক্রান্তিতে ভাদু পূজা হয়। নারীরূপী মূর্তি ভাদু দেবী হিসাবে পূজিত হয়। ভাদুর উৎস সন্ধান করতে হলে অন্য লোক সংস্কৃতি বা লোক উৎসবের মতই অনুমান আশ্রয় করতে হয়। কেননা এই ধরনের লোক উৎসব গুলি ঠিক কবে কোথায় কি প্রসঙ্গে বা কারা শুরু করেছিলেন, তা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কালের অমোঘ নিয়মে এগুলি বয়ে চলেছে। ঠিক তেমনই কবে কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী ভাদু উৎসবের সূচনা করেছিলেন তার কোন সঠিক প্রমাণাদি নেই। আছে প্রচলিত কিছু কিংবদন্তি বা জনশ্রুতি, আর আছে একমাত্র তথ্য হিসাবে কিছু ভাদুগান। যার অধিকাংশই ছড়িয়ে আছে ভাদুপালনকারী নারীদের স্মৃতির পটে। যদিও সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে বহু গান আবার অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটি প্রচলিত কাহিনির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের রাজার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, কেউ কেউ বলেছেন নাম 'ভদ্রাবতী'। কেউ বলেছেন 'ভদ্রেশ্বরী'। সুপাত্রে রাজকন্যার বিবাহ নির্ধারণ হয়, বিবাহের রাতে পথে বর

ডাকাতের হাতে নিহত হয়, কন্যা লগ্নভ্রষ্টা হন। লগ্নভ্রষ্টা কন্যা পুকুরে আত্মবিসর্জন দেন। কারো কারো মতে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান। কারো কারো মতে অকালমৃত্যু হয়। কন্যা ভদ্রেশ্বরীর স্মৃতি রক্ষার্থেই রাজা পরবর্তীকালে ভাদু উৎসবের প্রচলন করেন। এই উৎসবের একমাত্র প্রমাণ হিসাবে প্রাপ্ত ভাদু গানগুলির উপর গুরুত্ব দিতেই হয়। —

"চল কাশীপুরে রাজ দরশন করবো গো নয়নভরে।
কাশীপুরে ভাদু পূজা, মানভূমেতে কে করে
পঞ্চকোট রাজার দৌলতে দেখ এখন সবার ঘরে।"[১]

হিন্দু রাজণ্য সম্প্রদায়ভুক্ত কন্যা যে কাশীপুরের রাজেরই কন্যা, সেই উল্লেখও আমরা ভাদু গানে পেয়ে থাকি —

"কাশীপুরের মহারাজা
সে করে ভাদু পূজা
হাতেতে মা জিলিপি খাজা।"[২]

আবার কেউ কেউ ভাদু উৎসবকে পুরুলিয়ার 'ভূমিজ' সম্প্রদায়ের 'করম' উৎসবের সংস্করণ বলেও মনে করেন। একটি ঝুড়িতে পঞ্চশষ্য আর বালি রেখে কিছু লৌকিক আচার এবং সঙ্গীতের সহযোগে এই উৎসব পালন করা হয়। এই গানগুলিকে বলা হয় 'জাউয়া' গান। কয়েকটি জাউয়া গানের উদাহরণের মধ্যে দিয়ে এর সঙ্গে ভাদু উৎসবের যে মিল আছে সেটা দেখা যেতে পারে।

"আজ রে করম ঠাকুর ঘরের দুয়ারে গো
কালরে করম ঠাকুর কাঁশ নদী বাঁকে।"[৩]

—অর্থাৎ করম উৎসবের সঙ্গে ভাদু উৎসবের মিল পাওয়া যায়। পূর্বে আলোচিত সকল কিংবদন্তির সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে, সুব্রত চক্রবর্তী তাঁর 'ভাদু' গ্রন্থে ভাদু উৎসবকে ফসল ফলানোর উৎসব বলে উল্লেখ করেছেন। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় মূলত এই উৎসবের শিকড় নিহিত আছে। কৃষিজনিত ভৌগোলিত বিরুদ্ধতা, খরা এই অঞ্চলের মানুষগুলির মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমেও দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না, বছরের বেশ কিছু সময় অনাহার তাদের নিত্য সঙ্গী। এছাড়াও আছে দারিদ্রতা ও অন্ধকারে ডুবে থাকা, সমাজ সংস্কারের, অন্ধ-কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ নারীদের করুণ কাহিনি। সমাজের এই নারী হৃদয় সুযোগ খোঁজে একটুকরো খুশীর সন্ধানে। ভাদু উৎসব যেন তাদের কাছে নির্মল মুক্ত বাতাস গ্রহণের এক পন্থা। ভাদোই ধান বা ভাদ্র মাসটিকে তাই গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। জৈষ্ঠো মাসে চাষ শুরু হয়, চাষ চলে শ্রাবণ পর্যন্ত। আর এই চাষের কাজে সাহায্য করে মহিলারা, ভাদ্র মাস হল বিশ্রামের মাস।

ভাদু পালনকারী নারীর কন্ঠে তাই শোনা যায়—

“ভাদু পূজার দিনে ...
সারারাত উড়াব ফুর্তি হে কাটার জাগরণে
বাকি আজ রাইখো না কিছু
যা ইচ্ছা আছে মনে।”[৪]

ভাদুর সম্পর্কে এত বেশী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে এবং যার প্রত্যেকটিতে মানবী রূপই জড়িয়ে আছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ‘ভাদু’ মূর্তিরূপ কল্পনার কোন অবকাশ নেই। সেই কারণেই ‘ভাদু’ আপন গৃহের কন্যা সমতুল, যেখানে নিজের কন্যাকে নিজের মতো করে সাজানোর অবাধ স্বাধীনতা থাকে, অর্থাৎ ভাদু উৎসব এক ব্যতিক্রমী স্বাতন্ত্র্য সমন্বিত উৎসব। নির্দিষ্ট কোন বাঁধনে কোন ভাবেই বাঁধা যায় না এ উৎসবের যাবতীয়কে। সেই সূত্রে মূর্তির রূপ দানে শিথিলতা বর্তমান। আপন মনের মাধুরী দিয়ে শিল্পী ভাদুকে তিলতিল করে তিলোত্তমা হিসাবে গড়ে তোলেন। ভাদুর অন্যান্য যে রূপ আমরা দেখি যেমন কৃষ্ণ কোলে ভাদু বা বাহন রূপে হাঁস বা ময়ূর, সকল ভাদু মূর্তিতে এগুলি লক্ষণীয় নয়। আভিজাত্য পূর্ণ মূর্তিগুলিতে এই সংযোজন লক্ষ করা যায়। যেহেতু ভাদু রূপের সঙ্গে মানবী মূর্তির মিল বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ফলস্বরূপ ভাদু দেবী নয়, আমাদের ঘরের মেয়ে।

ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ভাদু পূজার দিন পুরো রাতভোর ভাদু পালনকারী গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে যখন যোগদান করেছিলাম, তখন দেখলাম একই গ্রামের ও একই পরিবারের মহিলারা একত্রিত হয়ে ভাদু গান গাইছে, সেই সকল ভাদু গানের মধ্যে আগমনীতে বিজয়ার সুরও লক্ষ করা যায়। কন্যা আগমনে গৃহে যে উৎসবের আমেজ জাগে সেই সুর ধ্বনিত হয় ভাদুর আগমনে ভাদু পালনকারিণীদের মুখে—

“ভাদ্রের পয়লা দিনে
কেমন করে থাকবো গো ভাদু বিনে
বছর ধরে ভাদুর তরে বসে আছি দিন গুনে ...,
প্রাণের ও ভাদু ধন -
পায়ে আলতা সিঁথায় সিন্দুর লো নয়নে দিব অঞ্জন।”[৫]

—বিবাহযোগ্য কন্যার বিবাহ বাসর, সজ্জা ও কন্যা বিদায়ের মূহুর্তগুলি চিহ্নিত হয়েছে পরপর—

“নিশি হয়েছে ভোর -
ওলো সখি কাটাতে হবে মায়াডোর
থাকতে হবে একলা ঘরে ঘোড়ে ভাদু ধনে মোর ...
ভাদু যাই বোলো না -

যাই বলিলে প্রাণে মোর প্রাণ থাকে না ...”[৬]

—অর্থাৎ ভাদু গীতির মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে পুরো সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিমন্ডলের রূপ ফুঁটে উঠেছে। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভাদুগান ও ভাদু উৎসব আজ বিলীন হয়ে যাওয়ার পথে, শিক্ষিত সমাজ যার কোন খোঁজ রাখে না। এই লোক উৎসবটি আজ অস্তিত্বহীন অবস্থায় তবুও ক্ষেত্র সমীক্ষাকালীন আমরা এটা লক্ষ করেছি, সমাজের কিছু সম্প্রদায় ভাদু-উৎসবের মধ্যে দিয়ে ভাদুগানকে জীবিত করে রাখার প্রয়াস নিয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় লোক সঙ্গীত রত্নাকর, চতুর্থ খন্ড, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৯।

২) সুব্রত চক্রবর্তী, ভাদু, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পৃষ্ঠা ৯।

৩) রামশঙ্কর চৌধুরী, ‘ভাদু ও টুসু’, কথা শিল্প, জানুয়ারী ১৯৮১, পৃষ্ঠা ১১।

৪) সুব্রত চক্রবর্তী, ভাদু, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০০১, পৃষ্ঠা ২১।

৫) ঐ, পৃষ্ঠা ৩২।

৬) ঐ, পৃষ্ঠা ৩২।

ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায় : মৌলিক ধারণা এবং সচেতনতা

মৌসুমী সরকার

সারসংক্ষেপ :

লিঙ্গ চিহ্ন (Sex) এবং লিঙ্গ পরিচয় (Gender) এ দুটি বিষয় অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে এই দুটি বিষয়ে ধারণা এখনও অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট বা বলা যায় অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। আর সেই অস্পষ্ট ধারণা থেকেই নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উদ্রেক হয়, যেমন— স্ত্রী এবং পুরুষ - সমাজে কি কেবলমাত্র এই দুই লিঙ্গ পরিচয়ের ব্যক্তি বর্গই বর্তমান? পুরুষ এবং স্ত্রী - এই দুই প্রকার লিঙ্গ পরিচয়ের ক্ষেত্রে তাদের লিঙ্গ চিহ্ন বা সেক্স থাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ পুরুষ সেক্সের ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয় পুরুষ এবং স্ত্রী সেক্সের ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয় স্ত্রী। কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তির সুস্পষ্টরূপে পুরুষ বা স্ত্রী লিঙ্গ বর্তমান কিন্তু লিঙ্গ পরিচয়ের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাদের আচার-আচরণ, অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত প্রকৃতির তাদের লিঙ্গ পরিচয় কি প্রকৃতির হবে? অথবা যাদের একই শরীরে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়লিঙ্গ একই সঙ্গে লক্ষ করা যায় বা যাদের শরীরে স্ত্রী বা পুরুষ কোন লিঙ্গ চিহ্ন স্পষ্ট নয় তাদের লিঙ্গ পরিচয় কি প্রকৃতির হবে? বা যাদের শরীরে স্ত্রী বা পুরুষ লিঙ্গ সুস্পষ্টরূপে আছে এবং সেই অনযুায়ী তাদের লিঙ্গ পরিচয় তারা দিয়ে থাকেন কিন্তু পাশাপাশি তারা সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন তাদের সামাজিক পরিচয় কি হবে? যদিও সমলিঙ্গের প্রতি শুধুমাত্র যৌন আকর্ষণই নয় বস্তুত সমলিঙ্গের প্রতি আবেগপূর্ণ অনুভুতি ও বিদ্যমান থাকে যা তৃতীয় লিঙ্গের একজন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ ২০১০ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, "There is much more to such relationships. Same-sex relationships, too are extremely soulful, emotional and have the same pathos that any heterosexual relationship has."[১] অতএব এই পেপারটিতে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর ব্যাখ্যা সহকারে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলতো ট্রান্সজেন্ডার' বা 'রূপান্তরকামী' শব্দটি বার বার এসেছে কারণ এই 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটি অন্য অনেক শব্দকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে।

মুখ্য শব্দ :

লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিচয়, উভয়লিঙ্গ, সমলিঙ্গ, তৃতীয় লিঙ্গ, ট্রান্সজেন্ডার।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

"রূপান্তরকামী বা ট্রান্সজেন্ডার হল সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাদের মানসিক লিঙ্গবোধ জন্মগত লিঙ্গ চিহ্ন হতে ভিন্ন" (উইকিপিডিয়া)। ("Transgender people have a gender identity or gender expression that differs from the sex that they were assigned at birth." [Wikipedia]) অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার হল এমন এক ব্যক্তি যার জন্মের সময় যে যৌন চিহ্ন দেখা যায়, সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে সেই যৌন চিহ্নের ভিত্তি তে তার লিঙ্গ পরিচয় না হয়ে যখন সেই ব্যক্তি যার লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণ করা হচ্ছে, তিনি নিজের মধ্যে যে লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য অনুভব করছেন সেই বৈশিষ্ট্য অনযুায়ী তার লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারিত হয়। সহজ ভাষায় রূপান্তরকামী বা ট্রান্সজেন্ডার বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তি যারা তাদের জন্মের সময় প্রাপ্ত লিঙ্গ পরিচিতি থেকে নিজেদেরকে ভিন্ন মনে করেন অর্থাৎ যাদের লিঙ্গ পরিচয় জন্মের সময় যেমনটা মনে করা হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ভিন্নরূপে অনুভূত হয় এবং পরে তারা তাদের লিঙ্গ পরিচয়ের রূপান্তর ঘটান। তাদের নিজের জন্মগত ধারণা তাদের জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাদের মনে হয় তারা বহিরঙ্গে যে লিঙ্গ পরিচয় বহন করছেন তার অন্তরালে অন্য লিঙ্গ পরিচয় রয়েছে। এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই যে এই অনুভূতি তারা কেবলমাত্র নিজেরাই অনুভব করেন অন্য কাউকে দেখাতে পারেন না। ট্রান্সজেন্ডার এমন একটি শব্দ যে শব্দতলে একই সঙ্গে অনেক শব্দার্থ অবস্থান করে। এবং সেই শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য এতটাই সূক্ষ্ম যে সেগুলো ভালোভাবে আলোচিত না হলে ট্রান্সজেন্ডার সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে ট্রান্সজেন্ডার শব্দের অন্তর্গত বা ট্রান্সজেন্ডার শব্দের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শব্দের অর্থ আলাদা আলাদা করে আলোচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এখানে এই পেপারের মূল আলোচ্য বিষয় সেটাই।

Objectives :

(i) ট্রান্সজেন্ডার সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া।

(ii) ট্রান্সজেন্ডার শব্দটিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা।

(iii) ট্রান্সজেন্ডার সম্বন্ধে বিভিন্ন ভুল ধারণা গুলি কে দূর করা।

(iv) ট্রান্সজেন্ডার সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা।

Methodology :

মূলত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে পেপারের উদ্দেশ্য টিকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাধারণত এখানে গৌণ তথ্যগুলির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বই, ইন্টারনেট, বিভিন্ন সরকারি তথ্যের ওয়েবসাইট, ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের বিভিন্ন ইন্টারভিউ ভিডি ও এবং বিভিন্ন

সংবাদপত্র।

অনেক সময়ই ট্রান্সজেন্ডার শব্দটিকে সংক্ষেপে ট্রান্স' লিখে প্রকাশ করা হয়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি ভালোভাবে বোঝার জন্য সেক্স এবং জেন্ডার এই শব্দ দুটির সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু শব্দ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। কাজেই এখানে ট্রান্সজেন্ডার সংক্রান্ত মলূ বিষয়ে যাওয়ার আগে সেই শব্দগুলো আলোচিত হল। এরকম কিছু শব্দ হলো—

সেক্স বা যৌন চিহ্ন বা লিঙ্গ চিহ্ন :

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেক্স শব্দটিকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তা হল "সেক্স হল পুরুষ এবং মহিলাদের বিভিন্ন জৈবিক এবং শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য যেমন প্রজনন অঙ্গ, ক্রোমোজোম,হরমোন ইত্যাদি।" (Sex refers to "the different biological and physiological characteristics of males and females, such as reproductive organs, chromosomes, hormones, etc.") অর্থাৎ সেক্স হলো আমাদের জৈবিক সত্তা। একজন ব্যক্তির যৌন চিহ্ন সাধারণত তার ক্রোমোজোম, প্রজনন শারীর স্থান এবং যৌন হরমোন সহ বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখে নির্ধারিত হয়।[২]

জেন্ডার বা লিঙ্গ :

অপরদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জেন্ডার বলতে বুঝিয়েছে, "সামাজিকভাবে নির্মিত নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্য - যেমন নিয়ম, ভূমিকা এবং নারী ও পুরুষের গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক। এটির ধারণা এক সমাজ থেকে অপর সমাজে ভিন্ন হয় এবং পরিবর্তিত হতে পারে।" (Gender refers to "the socially constructed characteristics of women and men - such as norms, roles and relationships of and between groups of women and men. It varies from society to society and can be changed.") এবং জেন্ডার হলো আমাদের সামাজিক সত্তা। সাধারণত কোন ব্যক্তির যৌন চিহ্নের উপর ভিত্তি করে তার লিঙ্গ নির্ধারণ করা হলেও সবসময়ই সেই নিয়ম অনুসৃত হয় না। কোন কোন সময় ব্যক্তি দ্বারা অনুভুত লিঙ্গ পরিচিতি ব্যক্তির ক্রোমোজোম বা প্রজনন শারীরস্থান অনসুারী নাও হতে পারে।

অর্থাৎ কিনা সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি আমরা জন্মের সময় থেকেই পেয়ে থাকি এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি আমরা পরে সমাজ থেকে পেয়ে থাকি। যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি, তখন সাধারণত আমাদের জন্মের সময় যে সেক্স ক্যাটেগরি নিয়ে আমরা জন্মায় তার ওপর নির্ভর করে আমাদের জেন্ডার বা লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণ করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি জন্মের সময় পুরুষ সেক্স অর্গান নিয়ে জন্মায় তাহলে তার লিঙ্গ হিসেবে তাকে পুরুষ চিহ্নিত করা হয় অপরদিকে যে ব্যক্তির স্ত্রী সেক্স তাকে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে পরিচিত করা হয়। সাধারণত সমাজে স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুই ধরনের লিঙ্গকেই স্বীকার করা হয় এবং সমাজ আমাদের পুরুষ এবং স্ত্রী লিঙ্গ হিসেবে কিছু নির্দিষ্ট আচার-আচরণ বেধে দেয় যে আচরণের অভ্যাস নির্দিষ্ট লিঙ্গের মানুষের জন্য স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। একেই

বাইনারি কনসেপ্ট অফ সেক্স (Binary Concept of Sex) বলা হয়।

জেন্ডার আইডেন্টিটি বা লিঙ্গ পরিচয় :

জেন্ডার আইডেন্টিটি বা লিঙ্গ পরিচয় একজন ব্যক্তির নিজস্ব এবং আভ্যন্তরীণ অনভুতি বা জ্ঞান। একজন ব্যক্তি তার সেক্স বা লিঙ্গ চিহ্ন স্ত্রী-পুরুষ বা অন্যান্য বিশেষ যাই হোক, তিনি নিজের অভ্যন্তরে পুরুষ, স্ত্রী বা অন্য যে বিশেষ লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য অনুভব করবেন সেটাই তার লিঙ্গ পরিচয়। যেমন সমাজে একজন ব্যক্তি তার লিঙ্গ পরিচয় হিসাবে স্ত্রী, পুরুষ বা অন্যান্য বিশেষ লিঙ্গ বিশিষ্ট হয়ে থাকেন। অর্থাৎ লিঙ্গ পরিচয় হল আপনি কীভাবে নিজেকে চিনবেন, একজন পুরুষ, মহিলা বা অন্য কিছু হিসাবে।

জেন্ডার এক্সপ্রেশন বা লিঙ্গ প্রকাশ বা অভিব্যক্তি :

অপরদিকে জেন্ডার এক্সপ্রেশন বা লিঙ্গ অভিব্যক্তি হল একজন ব্যক্তি তার পুরুষত্ব বা নারীত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং উপস্থাপন করেন। এক কথায় লিঙ্গ অভিব্যক্তি বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তি সমাজে যে আচরণের মাধ্যমে তার লিঙ্গ পরিচয়ের প্রকাশ ঘটান। সেটা কোন ব্যক্তির আচার-আচরণ, বেশভূষা, কেশ বিন্যাস, গলার স্বর অথবা কোন শারীরিক ভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে হতে পারে।

জেন্ডারট্রানজিশন (GENDER TRANSITION) :

আবার যখন কোন ব্যক্তি জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গ পরিচয় ব্যতিরেকে নিজেদেরকে যে লিঙ্গ পরিচিতি সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে মনে করেন বা যে লিঙ্গ পরিচিতি সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে অনভুব করেন সেই অনসুারে যখন তারা আচরণ করেন তখন সেই পরিবর্তিত অবস্থাকে বলা হয় লিঙ্গ পরিবর্তন বা জেন্ডার ট্রানজিশন। এই জেন্ডার ট্রানজিশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কোন ব্যক্তি তাদের পোশাক, বাহ্যিক রূপ বা নাম ইত্যাদি পরিবর্তন করেন। কিছু মানুষ হরমোন থেরাপি বা অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তন করেন এবং তাদের দেহকে তাদের নিজেদের অভ্যন্তরে অনুভূত লিঙ্গ অনযুায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলেন। আবার কোন সময় নিজেদেরকে অপরিবর্তিত রেখেই তাদের লিঙ্গ পরিচয়ের প্রকাশ ঘটান।[৩] জেন্ডার ট্রানজিশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার সাহায্যও নেওয়া হয়, যেমন— হরমোন থেরাপি, সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি (SRS) ইত্যাদি। জেন্ডার ট্রানজিশনের পর তারা নারী থেকে পুরুষ (FTM) বা পুরুষ থেকে মহিলা (MTF) ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন। এবং মনে রাখতে হবে জেন্ডার ট্রানজিশনের জন্য অস্ত্রোপচার বা হরমোনাল থেরাপি সব সময় প্রয়োজন নাও হতে পারে। তা একান্তই সেই ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এই জেন্ডার ট্রানজিশন বা লিঙ্গ রূপান্তর অনেক ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে সুস্থ, পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে সাহায্য করে।

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন (SEXUAL ORIENTATION) :

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বা যৌন অভিযোজন বলতে বোঝায় একজন ব্যক্তি যে লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন অর্থাৎ তার যৌন আকর্ষণ এর অভিমুখ কে বোঝায়।

একজন ব্যক্তির যৌন অভিযোজন তার বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতিও হতে পারে বা তার সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতিও হতে পারে বা কখনো উভয় প্রকার লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ থাকতে পারে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয় এবং যৌন অভিযোজন দুটি এক বিষয় নয়। মনে রাখতে হবে নন ট্রান্সজেন্ডারদের মত ট্রান্সজেন্ডারদেরও যেকোনো যৌন অভিমখুীতা বা যৌন প্রবণতা থাকতে পারে। একজন ট্রানসম্যান বা ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ প্রাথমিকভাবে অন্যপুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন তখন তিনি সমকামী হিসেবে চিহ্নিত হবেন। আবার যখন তিনি নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হবেন তখন তিনি একজন সরল পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হবেন। আবার যখন তিনি স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবেন তখন তিনি বাইসেক্সুয়াল বা উভকামী হিসেবে বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ তার লিঙ্গ পরিচিতি যেটাই হয়ে থাকুক না কেন তার যৌন অভিযোজন যেকোনো ধরনের হতে পারে।

ইন্টারসেক্স (INTERSEX) :

ট্রান্সজেন্ডার সম্বন্ধে গভীরভাবে জ্ঞান আহরণ করতে হলে এই ইন্টারসেক্স শব্দটি জানা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। ট্রান্সজেন্ডার এবং ইন্টারসেক্স এই শব্দ দুটির অর্থ অনেকে গুলিয়ে ফেলেন। কেউ কেউ ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে ইন্টারসেক্স বলেও বিভ্রান্ত হন। যদিও এই দুটি শব্দ একেবারেই আলাদা। আমাদের আশে পাশে এমন কিছু শিশু থাকে যাদের সহজেই পুরুষ বা মহিলা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, কিছু মানষু XY ক্রোমোজোম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাদের মহিলাদের যৌনাঙ্গ এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অন্যদের XX ক্রোমোজোম থাকতে পারে কিন্তু জরায়ু নেই, অথবা বাহ্যিক শারীরস্থান থাকতে পারে যা স্পষ্টভাবে পুরুষ বা মহিলা প্রদর্শিত হয় না। এদেরই আমরা ইন্টারসেক্স হিসেবে গণ্য করি। ইন্টারসেক্স মানুষের প্রজননগত শারীরস্থান বা জিন আছে যা পুরুষ বা মহিলার সাধারণ সংজ্ঞাগুলির সাথে যায় না। অপরদিকে একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি সাধারণত একটি শরীর এবং জিন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যা একটি সাধারণ পুরুষ বা মহিলার সাথে মিলে যায়, কিন্তু তাদের লিঙ্গ পরিচয় বা জেন্ডার আইডেন্টিটি ভিন্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও বলতে পারি যে ইন্টারসেক্স ব্যক্তির যে সেক্সুয়াল ডিফর্মিটি থাকে তা প্রায়ই জন্মের সময় থেকেই বোঝা যায় কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির জেন্ডার নন-কনফর্মিটি জন্ম লগ্ন থেকেই বোঝা যায় না, তা ঐ ব্যক্তির বৃদ্ধি এবং বিকাশ এর সঙ্গে সঙ্গে তার আচার-আচরণ এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়।[৪]

সিশজেন্ডার (CISGENDER) :

একজন সিশজেন্ডার ব্যক্তি কেবলমাত্র তাকেই বলা হবে যার লিঙ্গ পরিচয় তার জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গের সাথে মেলে।

জেন্ডারকুয়ার (GENDERQUEER) :

'কুয়ার' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'বিচিত্র' বা 'অদ্ভুত'। এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে জেন্ডারকুয়ার শব্দটি সেই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে যখন কোন ব্যক্তির জেন্ডার আইডেন্টিটি বা লিঙ্গ পরিচয় বিচিত্র প্রকৃতির হবে অর্থাৎ যেটা স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা

সম্ভবপর হবে না। কিছু ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি আছেন যারা প্রকৃতিগতভাবে ঠিক পুরুষ বা মহিলা নন, বা অন্যদিকে তারা নিজেদের লিঙ্গ পরিচয় পুরুষ এবং মহিলার সংমিশ্রণ হিসাবে বিবেচনা করেন। এদেরকে বলা হয় জেন্ডারকুয়ার। এবং যেহেতু এরা পুরুষ বা মহিলা কোনোটিই নন তাই জেন্ডারকুয়ার ব্যক্তিরা লিঙ্গ পরিচিতির নন-বাইনারী অংশে বিবেচিত হন বা চিহ্নিত হন। জেন্ডারকুয়ার ব্যক্তিরা বিষমকামী বা সমকামী নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। এবং বিশেষভাবে উল্লেখ্য জেন্ডারকুয়ার ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচিতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে জেন্ডারকুয়ার এবং নন-বাইনারি শব্দদুটির ধারণা আপাতদৃষ্টিতে একই বলে মনে হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান আছে। সাধারণত নন বাইনারি আমরা তাদেরকেই বলি যারা বিশেষভাবে স্ত্রী বা পুরুষ কোন লিঙ্গ পরিচয়েই পরিচিত হন না। অপরদিকে জেন্ডারকুয়ার হল এমন একটি শাব্দিক ধারণা যার অর্থ ও পরিধি অনেক বেশি পরিবর্ধিত। সাধারণত লিঙ্গ পরিচয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয়গুলি স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় না বা যে বিষয়গুলি লিঙ্গ পরিচয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত হিসাবে গণ্য হয় সেগুলি জেন্ডারকুয়ারের অধীনে অর্থপূর্ণ আকার পায়। পাশাপাশি একজন ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে প্রতিদিন ভিন্নভাবে অনুভূত হওয়া পরিবর্তিত অনুভূতিগুলি যা তার লিঙ্গ পরিচয়ের অনুকূলে যেতেও পারে আবার নাও যেতে পারে কিন্তু জেন্ডারকুয়ার পরিচিতির অধীনে যথার্থতা পায়। এক কথায় যখন একজন ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচিতি ট্রান্সজেন্ডার, ইন্টারসেক্স, বাইনারি বা নন-বাইনারি কোন সংজ্ঞার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না তখন সেই ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচিতি জেন্ডারকোয়ারের অন্তর্গত হয়।[৫]

বাইনারী (BINARY) :

বাইনারি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো "দুটি অংশ থাকা"। যে লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণায় শুধুমাত্র দুটি লিঙ্গ, পুরুষ এবং মহিলাই স্বীকৃত হয়, সেই ধারণাকেই লিঙ্গ পরিচয়ের বাইনারি কনসেপ্ট বলা হয়। কিছু ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি ব্যতীত বেশিরভাগ ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিই লিঙ্গ পরিচয়ের বাইনারি কনসেপ্ট- এ বিশ্বাসী। তাদের লিঙ্গ পরিচিতি হয় পুরুষ নয় মহিলা হয়।[৬]

নন-বাইনারী (NON-BINARY) :

বেশিরভাগ ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয় হয় পুরুষ বা মহিলা। কিন্তু কিছু ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি আছেন যারা পুরুষ বা মহিলা কোন কোন লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ নন। উদাহরণস্বরূপ, কিছুলোকের এমন একটি লিঙ্গ পরিচয় রয়েছে যা পুরুষ বা মহিলার সংমিশ্রণ বলা যায় বা একটি লিঙ্গ পরিচয় যা পুরুষ বা মহিলার থেকে আলাদা। কিছু ব্যক্তি আছেন যারা কোনো লিঙ্গ পরিচয় দিয়ে চিহ্নিত হন না। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানুষের লিঙ্গ পরিচয়ের পরিবর্তন হয়। এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের পরিচয় এর জন্য নন-বাইনারী শব্দবন্ধ কে ব্যবহার করেন। ("People whose gender is not male or female use many different terms describe themselves

with non binary being on the most common.” NCTE)[৭] অর্থাৎ বোঝা গেল, যে লিঙ্গ পরিচয় পুরুষ ও মহিলা ব্যতিরেকে অন্য লিঙ্গ পরিচয়কে নির্দেশ করে তাকেই নন-বাইনারি লিঙ্গ পরিচয় বলা হয়। যেমন জেন্ডারকুয়ার, এজেন্ডার, বাইজেন্ডার ইত্যাদি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য নন-বাইনারী লোকেরা সাধারণত ইন্টারসেক্স হয় না, তারা সাধারণত এমন দেহ নিয়ে জন্মায় যা পুরুষ এবং মহিলার সাধারণ সংজ্ঞার সাথে মানানসই হতে পারে, তবে তাদের সহজাত লিঙ্গ পরিচয় পুরুষ বা মহিলা ছাড়া অন্য কিছু হয়। নন বাইনারি ব্যক্তিরা তাদের দেহকে তাদের লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন।

ট্রানসসেক্সুয়াল (TRANSEXUAL) :

ট্রানসসেক্সুয়াল শব্দটি বর্তমানে অব্যবহৃত শব্দ কারণ ট্রানসসেক্সুয়াল শব্দটির জায়গা এখন নিয়েছে ট্রান্সজেন্ডার। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার এবং ট্রানসসেক্সুয়াল এই শব্দদুটির অর্থ অনেকাংশে একই রকম হলেও এই দুটি শব্দ কখনও এক নয়। যখন কোন ব্যক্তি তার লিঙ্গ চিহ্ন সার্জারির মাধ্যমে (বিশেষত সেক্স রি-অ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি বা SRS) তার কাঙ্খিত লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে স্থায়ীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলেন তখন সেই ব্যক্তিকেট্রানসসেক্সুয়াল বলা যেতে পারে। “Transsexuals are people who experience a gender identity that is inconsistent with their assigned sex and desire to permanently transition to the sex or gender with which they identify, usually seeking medical assistance (including sex reassignment therapies, such as hormone replacement therapy and sex reassignment surgery) to help them align their body with their identified sex or gender.” (Wikipedia) তবে সব ট্রানসসেক্সুয়াল ব্যক্তি সাজারি বা অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন হরমোন থেরাপি ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে নিজেদের সেক্সুয়াল আইডেন্টিটির সঙ্গে জেন্ডার আইডেন্টিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবেন এমনটা নয়। অপরদিকে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি মাত্রই তিনি ট্রানসসেক্সুয়াল হবেন এমন নয় কিন্তু ট্রানসসেক্সুয়াল ব্যক্তি মাত্রই ট্রান্সজেন্ডার হতে পারেন। ট্রানসসেক্সুয়াল শব্দ দ্বারা সমগ্র ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়কে বোঝানো হয় না। ট্রান্সজেন্ডার শব্দের অর্থ অনেক বেশি ব্যাপকতর ট্রানসসেক্সুয়াল শব্দের অর্থ অপেক্ষা। ১৯৪৯ সালে ডেভিড অলিভার কোল্ডওয়েল ‘ট্রানসসেক্সুয়ালিজম’ (Transsexualism) শব্দটি চালু করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৫০ সালে তিনি ‘ট্রানসসেক্সুয়াল’ (Transsexual) শব্দটি ব্যবহার করেন যেখানে ১৯৬৫ সালে জন অলিভেন প্রথম ট্রান্সজেন্ডার শব্দটির উৎপত্তি ঘটান বা সৃষ্টি করেন। প্রাথমিকভাবে ট্রান্সজেন্ডার শব্দের অন্তর্গত সমস্ত শব্দগুলিকে প্রকাশ করার জন্য ট্রানসসেক্সুয়াল শব্দটি ব্যবহৃত হতো। কিন্তু পরবর্তী কালে ‘ট্রান্সজেন্ডার’ শব্দটির সৃষ্টি হওয়ার পর ‘ট্রান্সজেন্ডার’ শব্দটি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কারণ ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির জেন্ডার আইডেন্টিটির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু সেক্সুয়াল আইডেন্টিটির পরিবর্তন নাও হতে পারে অপরদিকে ট্রানসসেক্সুয়াল ব্যক্তির জেন্ডার আইডেন্টিটির সঙ্গে সেক্সুয়াল

আইডেন্টিটিরও স্থায়ীভাবে পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রবল থাকে। কাজেই ট্রানসসেক্সুয়াল অপেক্ষা ট্রান্সজেন্ডার শব্দটির অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। ফলে ট্রানসসেক্সুয়াল শব্দটির গুরুত্ব অনেকাংশে কমে যায়।

জেন্ডার ডিস্ফোরিয়া (GENDER DYSPHORIA) :

'ডিস্ফোরিয়া' কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'অসন্তুষ্টি' বা 'অস্বাভাবিক বিষন্নতা'। অতএব জেন্ডার ডিস্ফোরিয়া বলতে আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হবে জেন্ডার বা লিঙ্গ বিষয়ে অসন্তুষ্টি। অনেক সময় কোন ব্যক্তি জন্মের সময় যে লিঙ্গ পরিচয় প্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তীতে সেই ব্যক্তিনিজের অভ্যন্তরে ভিন্ন প্রকৃতির লিঙ্গ পরিচয় অনুভব করেন যা তিনি বাইরে কাউকে দেখাতে পারেন না, আবার জন্মের সময় প্রাপ্ত লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়েও নিতে পারেন না। ফলে সেই ব্যক্তির মধ্যে একটি তীব্র সংকট দেখা দেয়। যে সংকট সেই ব্যক্তিকে গুরুতর মানসিক যন্ত্রণার দিকে নিয়ে যেতে পারে যা তার স্বাস্থ্য এবং দৈনন্দিন জীবনকে অশান্ত করে তোলে।[৮] ব্যক্তির এই অবস্থাকেই জেন্ডার ডিস্ফোরিয়া বলা হয়। কিন্তু সব ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির লিঙ্গ বা জেন্ডার ডিসফোরিয়া হয় না। কারণ তারা নিজেদের লিঙ্গ বিষয়ে অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেন এবং নিজের আকাঙ্ক্ষিত লিঙ্গ পরিচয়ে নিজেকে রূপদান করতে সক্ষম হন। জেন্ডার ডিস্ফোরিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যেমন সেই ব্যক্তির অন্তরে অনুভূত লিঙ্গ পরিচয় অনযুায়ী তার ড্রেসিং এবং গ্রুমিং করা যেতে পারে। কখনও কখনও শরীরকে শারীরিকভাবে পরিবর্তনের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। এবং সর্বোপরি সমাজকেও যথেষ্ট উদার হতে হবে তাদের মানবাধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে মিথস্ক্রিয়ার পথ প্রশস্ত করার জন্য। মনে রাখতে হবে ট্রান্সজেন্ডার হওয়া কোন অসুস্থতা নয়। যেহেতু ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি এখনও বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠেনি এবং সমাজের ট্রান্সজেন্ডার সম্বন্ধে অনেক ভুল বা অস্বচ্ছ ধারণা আছে, তাই ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে সমাজে এখনও অনেক বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হতে হয়, যা কখনও কখনও সহিংসতার রূপ নেয়। ফলে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির মধ্যে একটি মানসিক চাপ তৈরি হয় যা মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়।

জেন্ডার নন-কনফর্মিটি (GENDER NON-CONFORMITY) :

আমরা সমাজে প্রায়শই মেয়েলি, পুরুষালী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকি। সমাজে স্ত্রী এবং পুরুষের জন্য কিছু কাজ বা কিছু আচরণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে যে কোনটি পুরুষ সম্পাদন করবেন আর কোন কাজটি স্ত্রী সম্পাদন করবেন। স্ত্রী এবং পুরুষের জন্য এই নির্দিষ্ট ভাবে বেধেঁ দেওয়া সামাজিক বাধ্যবাধকতাই সমাজে স্টিরিওটাইপ বা বাঁধাধরা ধারণার জন্ম দেয় যেখানে স্ত্রী সম্পাদিত কাজগুলোকে মেয়েলি কাজ এবং পুরুষ সম্পাদিত কাজগুলোকে পুরুষালী কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলত যখন কোন পুরুষ, স্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত কোন কাজ করেন বা স্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত কোন আচরণ করেন তখন সেই পুরুষকে বা পুরুষের আচরণকে মেয়েলি আচরণ হিসাবে গণ্য করা

হয়। ঠিক স্ত্রীদের ক্ষেত্রে বিপরীতভাব দেখা যায় অর্থাৎ পুরুষালী বলা হয়। অর্থাৎ লিঙ্গ পরিচয়ের তথাকথিত স্টিরিওটাইপগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান হলো না, যা জেন্ডার নন-কনফর্মিটি বা লিঙ্গ পরিচয় অসঙ্গতির নামান্তর। জেন্ডার নন-কনফর্মিটি বা লিঙ্গ পরিচয় অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়া মানে লিঙ্গ পরিচয়ের স্টেরিওটাইপগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া। উদাহরণস্বরূপ, কোন মহিলার জামাকাপড়, চুলের স্টাইল, অঙ্গভঙ্গি যখন তার বিপরীত লিঙ্গের সাথে স্টেরিওটাইপিকভাবে যুক্ত হয় তখন সেই মহিলাকে পুরুষালী বলা হয়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে জেন্ডার নন-কনফর্মিং ব্যক্তি মাত্রই ট্রান্সজেন্ডার হবেন এমন নয়। অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার হওয়া এবং লিঙ্গ অ-সঙ্গতি পূর্ণ হওয়া এক বিষয় নয়।

ট্রানসভেস্টাইট (TRANVESTITE) :

ট্রানসভেস্টাইট' ল্যাটিন শব্দ যা ট্রান্স' (ওভার) এবং 'ভেস্টিটাস' (ড্রেসডক্রস) - এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। ম্যাগনাস হিরশফেল্ড ক্রস-ড্রেসিংয়ে যৌন আগ্রহ বোঝাতে ১৯১০ সালে শব্দটি তৈরি করেছিলেন। তিনি এটি ব্যবহার করেছেন এমন ব্যক্তিদের বর্ণনা করতে যারা অভ্যাসগতভাবে এবং স্বেচ্ছায় বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরেন। যেহেতু তথাকথিত "ট্রান্সভেস্টিজম" একটি ব্যাধি হিসাবে পরিচিত ছিল তাই তা ট্রান্সজেন্ডারদের কাছে বিশেষ গ্রহণযোগ্য হয়নি। বরং তারা নিজেদের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য 'ক্রস-ড্রেসার' কথাটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। সাধারণত নন-বাইনারি বা জেন্ডারকুয়ার যাদের লিঙ্গ পরিচয় 'পুরুষ' বা 'মহিলা' এই দুই সংকীর্ণ শ্রেণীর সাথে মেলে না তারাই ক্রস-ড্রেসার, ট্রান্সভেস্টাইটস ইত্যাদি ব্যক্তিদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ লিঙ্গ (THIRD & FOURTH GENDER) :

উইকিসনারি ফ্রী ডিকশনারিতে (Wikitionary the Free Dictionary) থার্ড জেন্ডার বা তৃতীয় লিঙ্গ বলতে বোঝানো হয়েছে ট্রান্স-ম্যানদের এবং ট্রান্স-ওমেনদের বলা হয়েছে চতুর্থ লিঙ্গ। অপরপক্ষে অজয় মজমুদার তার "A Scientific Aspect of Transgender" নামক বইটিতে জেন্ডার কে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন যার মধ্যে প্রথম লিঙ্গ (First Gender) মেল অর্থাৎ পুরুষ, দ্বিতীয় লিঙ্গ (Second Gender) ফিমেল অর্থাৎ মহিলা, তৃতীয় লিঙ্গ (Third Gender) ট্রান্সজেন্ডার অর্থাৎ রূপান্তরকামী এবং চতুর্থ লিঙ্গ (Fourth Gender) হোমোসেক্সয়াল, বাইসেক্সচুয়াল অর্থাৎ সমকামী, উভকামী ইত্যাদি। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যদি কেউ ট্রান্সজেন্ডার হয়, তার মানে এই নয় যে তার লিঙ্গ পরিচিতি আবশ্যিকভাবে "তৃতীয় লিঙ্গ"-ই হবে। বেশিরভাগ ট্রান্সজেন্ডারদের একটি লিঙ্গ পরিচয় থাকে যা পুরুষ বা মহিলা হয়। "It's important to remember that if someone is transgender, it doesn't necessarily mean that they have a `Third Gender'. Most transgender people do have a gender identity that is either male or female, and they should be treated like any other man or woman." (NCTE)[৯] যেমন ডঃ মানবী বন্দোপাধ্যায় তার বায়োগ্রাফি "A Gift of

Goddess Lakshmi" তে বলেছেন, "I would neither menstruate nor would I bear children, but I would have a vagina and breasts to heighten my sexuality and that was of utmost importance to me because it would give me the identity that I had craved all my life... ... ... Finally I looked in the mirror and was happy with Dr. Khanna's creation. Somnath had left me forever and Manobi was born... ... ... Finally my soul had found its body, and I had a sense of completeness that had been denied to me at birth."[১০] অপরদিকে তৃতীয় লিঙ্গের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ এক সময় বলেছিলেন, "It is for me to decide whether I will stand in the queue for men or for women or neither of the two." তিনি নিজেকে পুরুষ বা মহিলা কোন ছাঁচেই ফেলেন নি।[১১]

ইতিহাসে ট্রান্সজেন্ডার :

এতদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লিঙ্গ চিহ্নিতকরণ হত যাকে ইংরেজিতে বলা হয় বাইনারি কনসেপ্ট অফ জেন্ডার। এই দুই ভাগ বিশিষ্ট লিঙ্গ হল পুরুষ এবং মহিলা। এর পাশাপাশি কিছু মানষ দেখা যায় যাদের লিঙ্গ চিহ্ন বা জেন্ডার আইডেন্টিফিকেশন অস্পষ্ট অবস্থায় থাকে। প্রথম অবস্থায় যাদেরকে সমাজে জায়গা দেওয়া হতো না এবং আমাদের লিঙ্গ চিহ্নের বাইনারি কনসেপ্টে -এ তাদের কোন জায়গা ছিল না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের মানবাধিকারও অস্বীকৃত হতো। তাদেরকে আমরা সাধারণত হিজরা, নপুংসক, কোঠি ইত্যাদি অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নামে পরিচয় দিয়ে থাকি। প্রাচীনকাল থেকেই যাদের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই। বিভিন্ন মহাকাব্য এবং পৌরাণিক কাহিনিতে যাদের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল-এও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু পুরাণ লোককথা মহাকাব্য ও সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে এদের দেখা যায়। প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতি তিনটি লিঙ্গের স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রাচীন হিন্দুআইন, ভাষাতত্ব ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তৃতীয় লিঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মনুস্মৃতি তৃতীয় লিঙ্গের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করে। ভারতবর্ষে মঘুল যুগ পর্যন্ত এদের অবস্থা ভালো ছিল। সুলতানি ও মঘুল আদালতে কর ও শুল্ক আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন শক্তি শালী হিজড়া ব্যক্তিত্ব। ডাচ মার্চেন্ট ফ্রান্সিস্কো পেলশার্ট (Francisco Pelsaert)-এর ভ্রমণকাহিনি থেকে আমরা জানতে পারি সপ্তদশ শতকে মঘুল দরবারে ট্রান্সজেন্ডার তথাকথিত হিজড়া সম্প্রদায়ের অবস্থা উৎকর্ষ মানের ছিল। "They can get whatever they desire- fine horses to ride, servants to attend them outside, and female slaves inside the house, clothes as fine and smart as those of their master himself." (Francisco Pelsaert).

কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় এদের অবস্থার ক্রমশই অবনতি দেখা যায়। ১৫৩৩ এর "Buggery Act" অ-প্রজনন যৌনতাকে (unnatural sex) অপরাধ

হিসেবে সাব্যস্ত করে এবং ১৮৬৪ সালে এই আইন ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার ট্রান্সজেন্ডার বা হিজড়াসহ ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়কে আরও ব্যাপকভাবে লক্ষ্যবস্তু করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮৭১ সালের "Criminal Tribes Act" টি যদিও প্রাথমিকভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্যই প্রযুক্ত হয়েছিল তবও্ু সেখানে ট্রান্সজেন্ডার বা হিজড়া সম্প্রদায়ের অধিকার হরণের একটি বিধান রাখা হয়েছিল যার মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার বা হিজড়াদে র অধিকার খর্ব করা হয়েছি ল। এই আইনে বলা হয়েছিল ট্রান্সজেন্ডার বা হিজড়া সম্প্রদায় কে যদি জনসমক্ষে তাদের নৃত্য পরিবেশন বা মহিলাদের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায় তবে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে বা জরিমানা দিতে বাধ্য করা হবে এবং প্রতিটি ট্রান্সজেন্ডার বা হিজড়াকে উপনিবেশিক শাসকের কাছে তাদের নাম নথি ভুক্ত করতে হবে। এবং এর পরেই তাদের কাছে থাকা অনাথ শিশুদের সরিয়ে নেওয়া হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা হল এমন একটি আইন যা সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করে যা ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে চালু করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে কেউ যদি স্বেচ্ছায় পুরুষ, মহিলা বা পশুর সঙ্গে শারীরিক সহবাস করে তবে সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। যাইহোক, একটি ঐতিহাসিক রায়ে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তে, আইপিসির ৩৭৭ ধারাকে নিষ্পত্তি করে এবং ব্যক্তিগতভাবে সম্মত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সমকামিতার অনমুতি দেয়। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে সম্মতিপূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক সমকামী যৌনতা অপরাধ নয়।

ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার কারণ :

'লিঙ্গ পরিচয়' একটি জটিল বিষয়, যে বিষয়ে এখনো কেউ কোনো স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি। একইভাবে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার নির্দিষ্ট কোন কারণ এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে কিছু কিছু কারণ কে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার জন্য মনে করা হয়। যেমন—

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আধ্যাপক সিমন ডি লেভয় ট্রান্সজেন্ডার এবং হোমোসেক্সুয়ালদের ওপর পরীক্ষা করার সময় মস্তিষ্কের তৃতীয় অংশটিকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ এই তৃতীয় অংশটি সেক্সুয়াল সাইকলজি ও সেক্সুয়াল বিহেভিয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই অংশে হাইপোথ্যালামাস ও একটি ক্ষুদ্র যৌগিক কোষ $INAH_3$ অবস্থিত যা লেভয় পরীক্ষা করে দেখান ট্রান্সজেন্ডার, ট্রানসসেক্সুয়াল ও হোমোসেক্সুয়ালদের ক্ষেত্রে একই রকম কিন্তু হেটেরোসেক্সুয়ালদের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে ভিন্ন, যদিও এই কারণ অকাট্য নয়।[১২]

জন্মগত অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়া (সিএএইচ) এর ক্ষেত্রে মহিলা ভ্রূণের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি অনেক উচ্চমাত্রায় পুরুষ হরমোন নিঃসরণ করে ফলে নারীর যৌনাঙ্গের আকারে পরিবর্তন আসে এবং তা দেখে শিশুদের সহজে বোঝা যায় না নারী না পুরুষ।

আবার অনেক সময় শিশুর দেহে উভয় যৌনাঙ্গের অবস্থান একই সঙ্গে দেখা যায় যখন সেই শিশুটিকে নির্দিষ্টভাবে স্ত্রী বা পুরুষ কোন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এদের সাধারণত ইন্টারসেক্স বলা হয় যদিও বেশিরভাগ ইন্টারসেক্স ব্যক্তি ট্রান্সজেন্ডার

নন এবং বেশিরভাগ ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিও ইন্টারসেক্স নন।

অনেক সময় ক্রোমোসোমাল অস্বাভাবিকতা ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এমন অনেক সময় দেখা গেছে কোন একজন ব্যক্তি শারীরিকভাবে মহিলা শরীরস্থান নিয়ে জন্মেছেন কিন্তু তার ক্রোমোজোম XY যা পুরুষের। ফলে সেই ব্যক্তি ছোট থেকে একজন মেয়ে হিসেবে বড় হতে শুরু করেন কিন্তু নিজের মধ্যে পুরুষ সত্তা অনুভব করেন। কিন্তু চাক্ষুষ ভাবে সে ব্যক্তির পরিবারের বাকি সদস্যবৃন্দ তা বঝুতে পারেন না। কিন্তু তখন সে ব্যক্তি নিজের আভ্যন্তরীণ অনভুতির সঙ্গে মিলিয়ে চলার জন্য নিজের লিঙ্গ পরিচিতি পরিবর্তন করতে পারেন এবং তখনই তাকে ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়। এক্ষেত্রে আমরা ক্রীড়াবিদ পিঙ্কি প্রামাণিকের কথা উল্লেখ করতে পারি যেখানে তার মেডিকেল টেস্টে মেডিকেল প্যানেলের জেনেটিক এক্সপার্ট কৌশিক মন্ডল বলে ছিলেন, "Despite an XY chromosome combination, a DSD (Disorder of Sexual Development) cannot be termed as male... ... ... Pinki is chromosomally a male, it doesn't conclude that Pinki is a man."[১৩] অপরদিকে বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর গৌতম খাস্তগীর এ প্রসঙ্গে বলেন, "Pinki probably has an underdeveloped phallus, an internal testis but doesn't have a vagina or uterus... ... ... Her aggression can be attributed to male hormones and her chromosomes, but her sexual identity remains ambiguous."[১৪] এইরকম আরও কিছুঅস্বাভাবিক ক্রোমোজোমাল অবস্থা হল এক্স এক্স ওয়াই মেল (যেখানে ক্রোমোজোমের সংখ্যা থাকে ৪৭ টি), এক্স এক্স মেল সিনড্রোম (যেখানে ক্রোমোজোমের সংখ্যা থাকে ৪৮ টি), টার্নার সিনড্রোম (যেখানে যৌনাঙ্গ মহিলার মত হয় কিন্তু তাতে ডিম্বাশয় বা ওভারি থাকে না ফলতো কোন ঋতুচক্র লক্ষ করা যায় না।), ইত্যাদি।

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও সুপ্রজননবিদ গৌতম খাস্তগীর এক সাক্ষাৎকারে জানান, "একটি ভ্রুণ থেকে গর্ভাবস্থায় শিশুর পূর্ণাঙ্গ রূপ নেওয়ার প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেকেই একই রকম। সবাই মেয়ে হয়ে শুরু হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক শিশুর এই প্রথম পর্যায়ের শারীরিক গঠন মেয়ের মতো। সামনে মূত্রনালী, শরীরের পিছন দিকে মল নির্গমনের পথ এবং একদম মাঝে জননাঙ্গ।" ভ্রুণ সৃষ্টির চার মাস পর থেকে ছেলে এবং মেয়েদের দেহের গঠনে পরিবর্তন আসে। ডক্টর অনন্যা মণ্ডল, এম.ডি., ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজিস্ট, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ৩১শে মে, ২০১৯ এ বলেন গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে সমস্ত শিশু মেয়ে থাকে কারণ তার মধ্যে কেবলমাত্র তার মায়ের X ক্রোমোজোম ই কার্যকরী থাকে। পরে শিশুর পিতার ক্রোমোজোম ই নির্ধারণ করে শিশুটির লিঙ্গ। এরূপ অবস্থায় শিশুর পিতার X এবং Y ক্রোমোজোম দুটি থেকে যদি X ক্রোমোজোম শিশুর মধ্যে আসে তাহলে শিশুটি অবধারিত ভাবে মেয়ে (XX) হিসেবে জন্ম নেবে অপরদিকে Y ক্রোমোজোম এলে শিশুটি ছেলে (XY) হিসেবে

জন্ম নেবে কারণ ওই শিশুর মধ্যে মায়ের থেকে প্রাপ্ত এক্স ক্রোমোজোম আগে থেকেই ছিল।[১৫] অপরদিকে সিগমুন্ড ফ্রয়েড বলেন, "Masculine and feminine currents coexist in everyone."[১৬] ফলতো পুরুষ এবং মহিলা প্রত্যেকের মধ্যেই বিপরীত লিঙ্গ পরিচয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। কিন্তু শিশু যখন বয়স প্রাপ্ত হয় তখন যদি তারমধ্যে বিপরীত লিঙ্গ পরিচয়ের প্রবণতা অনেক বেশি পরিমাণে দেখা যায় তখনই সমস্যা শুরু হয়। তবে সে সমস্যা দেখা দিলেই যে উক্ত ব্যক্তিকে ট্রান্সজেন্ডার বলা হবে তা নয় সমস্যা আরও ঘনীভূত হলে তবে তার ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হয়।

রিপ্রোডাক্টিভ এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ও জেনেটিসিস্ট ডঃ লরেন্স সি. লেম্যান (Dr. Lawrence C. Leyman) ট্রান্সজেন্ডার রোগীদের চিকিৎসা করার সময় তাঁর মনে হয়েছিল ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার অন্তরালেও জৈবিক ভিত্তি আছে। সাইন্টিফিক রিপোর্টস জার্নালের লেখক ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ উইমেন্স রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রিসার্চ স্কলার, মেডিকেল কলেজ অফ জর্জিয়া (ইউনিভার্সিটি), ডঃ জে. গ্রাহাম থেইসেন (Dr. J. Graham Theisen) বলেন, "We certainly think that for the majority of people who are experiencing gender dysphoria there is a biologic component, we want to understand what the genetic component of gender identity is... ... ... I think gender is as unique and as varied as every other trait that we have."[১৭]

অতএব ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি এবং তা এখনও গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে।

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের সমস্যা :

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের অধিকার আইনগত ভাবে স্বীকৃত। কিন্তু এই আইনি স্বীকৃতি পাওয়ার পরেও সামাজিক স্বীকৃতি এখনও সেভাবে দেখা যায় না। একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে এখনো পর্যন্ত সামাজিক, মনোসামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় স্কুল, কলেজ বা কর্মজগতে তাদেরকে এখনো ব্রাত্য করে রাখা হয়। মানুষ এখনও তাদের থেকে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখেন। এখনও পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কে তাদের লিঙ্গ পরিচিতি অনসুারে সম্বোধন করা হয় না। আর ঠিক এই ভীতি থেকে অনেক সময় ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি তার নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে চান না ফলে তিনি এক কঠিন মানসিক সমস্যায় ভুগতে থাকেন।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ট্রান্সজেন্ডার সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট সম্ভব সচেতনতার অভাব। তাদের সম্বন্ধে সমাজের বাকি মানযুদের মধ্যে যে ধারণা দেখা যায় তা হয় অস্পষ্ট বা ভুল। প্রথমেই যে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো সমাজে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং যতটা সম্ভব তাদেরকে মলূস্রোতে নিযুক্ত করা। অনেকেই জানেন না ট্রান্সজেন্ডার কোনো রোগ নয়, এটি একটি সহজ স্বাভাবিক অবস্থা যা আমাদের সমাজে তথাকথিত লিঙ্গ পরিচিতির বাইনারি কনসেপ্ট

বহির্ভূত।[১৮]

২০১১ সালের সেনসাস অনযুায়ী ট্রান্সজেন্ডার এর সংখ্যা ভারতবর্ষে ৪,৮৭,৮০৩। এর মধ্যে ভারতের সর্বমোট সাক্ষরতার হার যেখানে ৭৪%, ট্রান্সজেন্ডার সাক্ষরতার হার ৫৭.০৬% মাত্র। ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের একটা গুরুত্বপূর্ণ বাধা হলো তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা। ভারত সরকারের তাদের থার্ডজেন্ডার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের এম্প্লয়মেন্টের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তাদের "সোসিও-ইকনোমিক্যালি ডিজঅ্যাডভান্টেজড" গ্রুপ (Socio-Economically Disadvantaged) হিসেবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

এছাড়াও স্কুল কলেজগুলিতে ট্রান্স-ইনক্লুসিভ (Trans-Inclusive) পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে ভারতবর্ষে জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক পদক্ষেপ দেখা যায়। যেমন- ২০১৪-এর ২৯শে অক্টোবর ইউজিসি (UGC) একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে যেখানে সকল ইউনিভার্সিটি উপাচার্যদের অনুরোধ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের অনমুোদিত কলেজগুলি তে সমস্ত রকম আবেদনপত্র বা শংসাপত্রে ট্রান্সজেন্ডার বিকল্পটি রাখতে।[১৯] পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর ২০১৫ সালের জনু মাসে ভারতবর্ষের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার প্রিন্সিপাল হিসেবে ডঃ মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় কে নিয়োগ করে এক যুগান্তকারী নজির সৃষ্টি করে।[২০]

অখিল ভারতীয় কিন্নর শিক্ষা সেবা ট্রাস্ট (All-India Transgender Education Service Trust) ২০১৯-এর ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করে উত্তরপ্রদেশের কুশিনগর জেলার অন্তর্গত ফাজিলনগর ব্লকে ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য দেশের সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে যেখানে প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত পড়াশোনা করা যাবে এবং স্নাতকোত্তর এর পরে ও গবেষণামলূক কাজ বা Phd ও সম্পন্ন করা যাবে।[২১]

ভারত সরকার ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের স্বার্থে "The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019" বিলটি পাস করেন যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, "No establishment shall discriminate against transgender persons in matters relating to employment, recruitment, promotion and other related issue." সেই অনযুায়ী কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে নিয়োগ পরীক্ষার নিয়ম সংশোধন করা হয় এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধিন সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স (CAPF) - এ ট্রান্সজেন্ডার নিয়োগের জন্য 'CAPF Examination - 2020 (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট)' - তে থার্ড জেন্ডার হিসাবে ট্রান্সজেন্ডারদের অন্তর্ভুক্তি করার জন্য অনুরোধ করা হয়।[২২]

সম্প্রতি ওড়িশা পুলিশ সার্ভিসে কনস্টেবল, সাব ইন্সপেক্টর ইত্যাদি বিভিন্ন পদে যোগদানের জন্য ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি থেকে আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে।[২৩]

এছাড়া ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি ওয়ার্ল্ড প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর ট্রান্সজেন্ডার হেলথ- এর (WPATH) https://www.wpath.org/ ওয়েবসাইটে লগ ইন করে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত, শিক্ষাসংক্রান্ত ও সামাজিক ন্যায়ের ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।

এই আলোচনাটি ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ট্রান্সজেন্ডার পারসন্স - এর সদস্যা রেশমা প্রসাদ-এর কথা দিয়ে শেষ করা হল। তিনি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে ট্রান্সজেন্ডারদের প্রতি ভারত সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা ও তাদের অবস্থার উন্নতির কথা মেনে নিয়ে বলেন "যেদিন হিজরা রেশমা প্রসাদ শুধুমাত্র ডঃ রেশমা প্রসাদ হিসেবে পরিচিত হবেন সেদিনই ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি মূল স্রোতে র প্রধান দরজায় এসে দাঁড়াবেন।"[২৪]

তথ্যসূত্র :

১. Hazra, S. (2018) : "A Tribute to Rituparno Ghosh, the Filmmaker Who Humanised Same-Sex Relationships". Retrieved from https://thewire.in/film/a-tribute-to-rituparno-ghosh-the-filmmaker-who-humanised-same-sex-relationships

২. "Transgender People, Gender Identity and Gender Expression" (2014) : American Psychological Association. Retrieved from https://www.apa.org/topics/lgbtq/transgender

৩. Collin, S. (2021) : "When you Don't Feel at Home With Your Assigned Gender". Retrieved from https://www.webmd.com/sex/gender-dysphoria

৪. Intersex Research Study (2017) : USAID (UNDP) Retrieved from https://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/Intersex%20Research%20Study%20UNDP%202017.pdf

৫. Beemyn B. G., (2015) : "Genderqueer" Retrieved from http://www.glbtqarchive.com/ssh/genderqueer_S.pdf

৬. Understanding Non-Binary People : How to Be Respectful and Supportive (2018) : National Center for Transgender Equality Retrieved from https://transequality.org/issues/resources/understanding-non-binary-people-how-to-be-respectful-and-supportive

৭. Understanding Non-Binary People : How to Be Respectful and Supportive (2016) : National Center for Transgender Equality Retrieved from https://transequality.org/issues/resources/understanding-transgender-people-the-basics (7)

৮. Overview Gender Dysphoria (2020) : NHS Retrieved from https://www.nhs.uk/conditions/gender-dysphoria/

৯. Frequently Asked Questions About Transgender (2016) : National

Center for Transgender Equality Retrieved from https://transequality.org/issues/resources/frequently-asked-questions-about-transgender-people

১০. Bandyopadhyay, M., Mukherjee Pandey, J. (2017) : A Gift of Goddess Lakshmi (A Candid Biography of India's First Transgender Principal). Penguin Random House India Pvt. Ltd, ISBN 9780143425946, Pp 134 - 136.

১১. Roy, S. (2013) "An icon beyond labels: Man, woman or Rituparno?" Retrieved from https://www.firstpost.com/bollywood/an-icon-beyond-labels-man-woman-or-rituparno-830493.html

১২. Majumdar, A., Tarafdar, R. (2019) : A Scientific Aspect of Transgenders. Notion Press, ISBN 978-1-64587-564-2, Pp 196.

১৩. Das, N. (2012) : "Athelete Pinki Pramanik suffers from DSD, can't rape" Retrieved from https://www.oneindia.com/2012/11/14/twist-athlete-pinki-pramanik-suffers-from-dsd-cant-rape-1098476.html?story=3

১৪. Chakraborty, R. (2021) : "খাস বাত গর্ভাবস্থায় সমস্ত শিশুই মেয়ে : বিস্ফোরক ডা: খাস্তগীর" Retrieved from https://www.khaskhobor.com/opinion/all-children -during-pregnancy-are-girls/?fbclid=IwAR0re HjC0zh Ywtdu 8a EiHr AIawElUJgfHHTcL5KPrD8W-5A8K9WiwcAe4bA

১৫. Mandal, A. (2019) : "Causes of Gender Dysphoria" Retrieved from https://www.news-medical.net/health/Causes-of-Gender-Dysphoria.aspx

১৬. "Men & Masculinity - Freud - Complex, Mental, Unconscious and Oedipus - JRank Articles" (2021) : Retrieved from https://science. jrank. org/pages/10172/Men-Masculinity-Freud.html

১৭. "Gene variants provide insight into brain, body incongruence in transgender" (2020) : Medical College of Georgia at Augusta University. Retrieved from https://www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200205084203.htm

১৮. Rajdev, B. (2020) : "Status of Transgender Students in School Part of Our Current Education System" Retrieved from https://main stream weekly.net/article9736.html

১৯. "ENROLMENT OF TRANSGENDERS ENROLLED IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS", Union Human Resource Development, 2015 Retrieved from https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/ru1357.PDF

২০. “India gets its first transgender college principal” 2015 Retrived from https://www.thehindu.com/news/national/manabi-banerjee-all-set-to-become-indias-first-transgender-college-principal/article7251132.ece
২১. “India's first university for transgender community to come up in UP's Kushinagar” 2019 Retrieved from https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/india-s-first-university-for-transgender-community-to-come-up-in-up-s-kushinagar-1631851-2019-12-27
২২. “Transgender Officers In Armed Forces: The First Step Is To Remove Fear Of Stigmatisation” 2020 Rtrived from https://www.outlookindia.com/website/story/opinion-transgenders-officers-in-armed-forces-the-first-step-is-to-remove-fear-of-stigmatisation/356668
২৩. “Odisha Police invites applications from transgender community for posts of constables, sub-inspectors” 2021 Retrived from https://www.indiatoday.in/india/story/odisha-police-applications-transgender-community-constables-sub-inspectors-1814148-2021-06-13?fbclid=IwAR0ruSqO1BytOGMw31XGFAvPoc9mwsvsSVp7g1A8NxX35I4lGHkDemGOIFY
২৪. ‘ট্রান্সজেন্ডার স্বীকৃতি এবং ট্রান্সফোবিয়া : ট্রান্সওম্যান রেশমা প্রসাদের জীবনযাত্রা” ২০২১ : পূর্ণ জ্যোতি এডুকেশন রিহেবিলিটে শন সোসাইটি Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=DbdNi87lIxM

দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি : বাবু ব্রজলাল চক্রবর্তী ও হাজী মহম্মদ মহসীন প্রসঙ্গ

মুহাম্মদ জিন্নাতুল্লাহ শেখ

সারসংক্ষেপ :

বৃহত্তর খুলনায় প্রথম কলেজ স্থাপন হয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে। কলেজের নাম দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি। শতাব্দী প্রাচীন এই বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা বাবু ব্রজলাল চক্রবর্তী। শুধু প্রাচীনত্বের বিচারেই নয়, শিক্ষার মানে, পরীক্ষার ফলে, অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের স্বনামধন্য পরিচয়ে এই কলেজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একদা খুলনা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল। হাজী মহম্মদ মহসীনের এস্টেটের অর্থে দৌলতপুরে প্রথম প্রাইমারী স্কুল এবং খুলনায় প্রথম হাই ইংলিশ স্কুল (১৮৬৭) প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ব্রজলাল চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় দৌলতপুরে হিন্দু একাডেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি হয়। কলেজের ৪২ একর ভূসম্পত্তি মধ্যে ৪০ একরই হুগলীর সেই প্রখ্যাত দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীনের ওয়াকফকৃত বিশাল সম্পত্তি অধিভুক্ত খুলনা জেলার সৈয়দপুর এস্টেটের ভূসম্পত্তির উপরই কলেজটি অবস্থিত। তাছাড়া হাজী মহম্মদ মহসীনের শিক্ষা তহবিল থেকে ১৯১২-৪২ এর মধ্যে হিন্দু একাডেমি তহবিলে নগদ জমা পড়েছে মোট ১৮,৫০০ টাকা। খুলনার বরণীয় সন্তান শিক্ষানুরাগী শ্রী ব্রজলাল চক্রবর্তীর ১৯৪৪-এ তিরোধানের পর কলেজটি তাঁর নামে নামকরণ করা হয় ১৯৪৬-এ। কিন্তু যে মহান ব্যক্তির ভূ সম্প্রত্তির উপর বৃহত্তর খুলনায় প্রথম কলেজ স্থাপিত হয় সেই মহান দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীনের নাম কলেজের কোন অঙ্গের সঙ্গে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি কর্তৃপক্ষ বিজড়িত করেননি। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত দেশীয় ও জাতীয় ইতিহাসেরই উপাদান যোগায়। দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি স্থাপনে ব্রজলাল চক্রবর্তী ও দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীনের অবদান তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধটিতে।

মূলশব্দ :

দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি, সৈয়দপুর এস্টেট, ওয়াকফ, দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীন, পূর্ববঙ্গ, টোল, পাঠশালা, মহাপাঠশালা, আবাসিক কলেজ, বর্ণহিন্দু, মুসলিম ছাত্র, লিয়েন, শিক্ষা তহবিল, শিক্ষাবিদ, অবিভক্ত বাংলার বিধানসভা, ব্রজলাল কলেজ।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি খুলনা জেলার প্রাচীনতম কলেজ এবং এর ঐতিহ্য এ

অঞ্চলের যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় প্রাচুর্যময় এবং প্রথম শ্রেণিভুক্ত কলেজ সমূহের মধ্যে অন্যতম। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে খুলনার দৌলতপুরে কল্লোলিনী ভৈরবের কোল ঘেষে স্থাপিত হয় দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি। স্থাপন কালের প্রেক্ষিতে অবিভক্ত বঙ্গদেশে এই কলেজের স্থান ৩১তম।[১] হাজী মহম্মদ মহসীনের অর্থে প্রতিষ্টিত হুগলি কলেজের স্থান ছিল পঞ্চম।[২] বৃহত্তর খুলনার দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি প্রথম কলেজ।[৩] ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশভাগের সময় এই কলেজের বেশ কয়েকজন কলেজ শিক্ষক সহ শিক্ষিত ও প্রখ্যাত ব্যক্তিরা ভারতে এসেছিলেন এবং ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্টা করেছিলেন।[৪]

ব্রিটিশ আমলে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের ফলে কিছু মন্দ প্রভাব সমাজের উপর পড়ে। যৌথ পরিবার বন্ধনে শিথিলভাব দেখা দেয় এবং হিন্দু যুবকরা খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। কবি মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রিটেন থেকে সদ্য আমদানিকৃত কলকাতা হিন্দু কলেজের কর্মরত শিক্ষকদের প্রভাবে শিক্ষিত হিন্দু ছাত্ররা উত্তেজনাপূর্ণ ব্যবহার দেখাতে শুরু করে। এতে বনেদী ব্রাহ্মণদের বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় একখানা পত্র প্রকাশ পেল : "পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করিবার পর তাহার ব্যবহার ও পোশাকে বিপরীত আচরণ পরিলক্ষিত হয়। উপদেশ কথা বলিবার উপায় নাই। আমি ইংরেজী জানি না বলে ননসেন্স বলে। আমার নিকট বসিতে চাহে না। ব্রাহ্মণ পন্ডিতকে পরবশ্য, চোর-ডাকাত বলে সম্মোধন করিতে লাগিল। গঙ্গার পবিত্রতাকে স্বীকার করিতে চাহে না। কয়েকজন ঘোষণা করিয়াছেন হিন্দুধর্ম কুসংস্কারে ও অন্ধ বিশ্বাসে পূর্ণ।"[৫]

ব্রজলাল চক্রবর্তী (১৮৭১-১৯৪৪) ও বনেদী ব্রাহ্মণরা হিন্দু ধর্মের প্রাচীন সংস্কারের প্রতি অনুরাগী। তাঁদের মতে, ধর্মের অনুশাসন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে কোনো অসঙ্গতি বা বিরোধভাব নেই। এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য ব্রজলাল চক্রবর্তী একদল কর্মী গড়তে বদ্ধপরিকর হন। এ উদ্দেশ্য সাধনে তিনি একটি কলেজ স্থাপনের মনোনিবেশ করেন। স্থান হিসাবে বেছে নেন নিজ জেলা খুলনার নির্ধারিত স্থান দৌলতপুর।[৬]

১৯০২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের দিকে ব্রজলাল বাবু তাঁর কথা, তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা বেশ কিছু শিক্ষিত লোকের কাছে তুলে ধরেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তথা ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে ৯ টি কলেজ ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের ছিল ২২ টি কলেজ। তাই ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের দিকে কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্ব পায়। কেননা, সে সময় খুলনা অঞ্চলে কোন কলেজ ছিল না বললেই চলে। সব থেকে কাছের কলেজ ছিল 'নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ' যেটা ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাতায়াতের দিক থেকেও ছিল নানান সমস্যা। উচ্চশিক্ষার জন্য নড়াইলে যাওয়াটা ছিল বেশ কষ্টের। সে কারণে ব্রজলাল বাবু দৌলতপুরেই পূর্ববঙ্গের

দশম কলেজটি স্থাপনের জন্য জায়গা নির্বাচন করেন এবং দুই একর জমিও কেনেন।[৭]

কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ৮৬ বৎসর পর দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির জন্ম হয়। 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ' ও 'হিন্দু কলেজ' তথা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বাবু ব্রজলাল চক্রবর্তী (শাস্ত্রী)। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তাধারা ব্রজলাল চক্রবর্তীকে প্রভাবিত করে। সর্বোপরি পিতা-মাতার প্রভাব তাঁর মনের দৃঢ়তা ও কর্মশক্তি জাগাতে সক্ষম হয়।[৮]

হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে আর আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হয় ১৮১৭ এর ২০ জানুয়ারি। এ কলেজের অপর নাম ছিল 'এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কলেজ'। কেননা এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এদেশে ইংরেজি শিক্ষার গোড়া পত্তন ঘটে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত সন্তান-সন্ততিদের উচ্চশিক্ষা দান করে ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া।[৯] প্রকৃতপক্ষে এখানে শুধু বর্ণ হিন্দু এবং খ্রিস্টান ছাত্রদের ভর্তি করা হত। বিলিতি কায়দায় পড়ালেখা শেখাবার প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া হয়। খুলনার দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সার্বিকভাবে হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে খুলনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু যুবকদের উচ্চশিক্ষা প্রদান করা।[১০] কলকাতায় হিন্দু কলেজের দুটো শাখা বা অংশ ছিল- পাঠশালা (A School) এবং মহাপাঠশালা(Academy)। প্রথমটি তাৎক্ষণিকভাবে শুরু হয় এবং দ্বিতীয় টি কিছু পরে। The College shall include a school (patshalla) and an Academy (Mahapatshalla)।

হিন্দু একাডেমি নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা বা ব্রজলাল চক্রবর্তী তাঁর 'The Decennial Report of Daulatpur Hindu Academy'-তে কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন। রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতিষ্ঠানের দুটো শাখা বা অংশ ছিল - সারস্বত চতুষ্পাঠী এবং কলেজ বা একাডেমি। উভয় ক্ষেত্রেই ছাত্ররা হবেন আবাসিক। ব্রজলাল চক্রবর্তীর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আবাসিক হিসেবে গড়ে তোলা। আদর্শ শিক্ষকের মহৎ গুণাবলী ছাত্র জীবনে প্রতিফলিত হবে এটাই ছিল আকাঙ্ক্ষা। এজন্য প্রচুর জমির প্রয়োজন।

অনাবাসিক ছাত্ররা ভর্তির অযোগ্য এটাই ছিল মূল বিধান। কিন্তু চতুষ্পাঠী ছাত্রদের বাসস্থান, খাওয়া ও পড়ার খরচ কর্তৃপক্ষের বহন করবেন এবং কলেজ শাখার খরচ ছাত্ররা বহন করবেন— এটাই ছিল নিয়ম। উভয়েরই কাজ একই সঙ্গে আরম্ভ হয়। তবে প্রথমটির সরকারি অনুমোদন ১৯০৩-এ পরের টির ১৯০৭-এ পাওয়া যায়। ১৯০২ সালে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি প্রতিষ্ঠার প্রথম আট বছর কোন মুসলিম এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাত্রকে এ কলেজে ভর্তি করা হয়নি। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় শুধু উচ্চবর্ণ হিন্দু পুরুষ সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য।[১১] ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক এ. কানিংহাম দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি পরিদর্শনের সময় মন্তব্য করেন "ইহা নিশ্চিত রূপে একটি সাম্প্রদায়িক কলেজ।

শুধু বর্ণ হিন্দুদের সন্তানদের জন্য (For the Respectable Hindu) স্থাপিত হয়েছে। এরূপ কলেজকে অর্থ সাহায্য ও মজুরি প্রদানের বিষয়ে সরকারের অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।"[১২]

তাই ৩০.০৪.১৯০৭-এ হিন্দু একাডেমি দুটো ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়। প্রথমত, এফিলিয়েশন বা অনুমোদন, দ্বিতীয়ত, সৈয়দপুর এস্টেটের জমি না পাওয়ার ফলে সৃষ্ট সংকট। আর এর সঙ্গে জড়িত ছিল আর্থিক সংকট। নিরপেক্ষ ইনসপেক্টররা সব সম্প্রদায়ের ছাত্রভর্তি না করা পর্যন্ত সরকারের অনুমোদন পাওয়ার জন্য সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা এ কলেজকে পাবলিক কলেজ করার জন্য জোর পরামর্শ দেন। মুসলিম ছাত্র ভর্তি না করা হলে সৈয়দপুর এস্টেটের কোন জমি পাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠেনা। দুটো বাঁধার চরম বাঁধা। অথচ হিন্দু একাডেমি কর্তৃপক্ষকে উভয় বাঁধার বেগ টপকাতেই হবে যদি কলেজ কে বাঁচাতে হয়। ব্রজলাল চক্রবর্তী ও তাঁর সহযোগীরা চেয়েছিলেন (অ-হিন্দু-মুসলমান) ছাত্র ভর্তি না করেই এ দুটো কঠিন বাঁধা অতিক্রম করে তাঁদের ফলিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিভাগের সদর দপ্তর, কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট এবং খুলনা জেলা প্রশাসক ও জেলা জজ কোর্টের পক্ষ থেকে আগত পরিদর্শক বৃন্দ ও পদস্থ ভারতীয় বাঙালি বর্ণ হিন্দু ও বাবু ব্রজলাল চক্রবর্তীর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য গভীর ভাবে লক্ষণীয়।[১৩]

এমন সংকটাপন্ন অবস্থায় বাবু ব্রজলাল চক্রবর্তী খুলনার প্রথম মুসলিম ডি. এম. আহসান আহমদকে কলেজ পরিদর্শনের জন্য আহ্বান জানান। জেলা প্রশাশক সৈয়দপুর এস্টেটের রক্ষক। এ জমি নেয়ার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ৩০.০৪.১৯০৭ তারিখে খুলনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. আহসান আহমদ কলেজ পরিদর্শনের সময় ব্রজলাল চক্রবর্তী তাঁকে জানান যে, কলেজের সংলগ্ন হাজী মহম্মদ মহসীনের সৈয়দপুর ট্রাস্ট-এস্টেটের অনেক জমি আছে। তিনি ছাত্রদের সহযোগিতায় এখানে একটি সুন্দর কৃষি প্রদর্শনী খামার শুরু করতে আগ্রহী। কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এ মতের সাথে একমত না হয়ে বলেন যে, এ জমি মুসলিম ওয়াকফ সম্পত্তি। এ কলেজে শুধু হিন্দু ছাত্র পড়ে। ওই জমির ব্যবহার ধর্মীয় আইনের পরিপন্থী। এখানে 'হাজী মহম্মদ মহসীনের নামে' একটি প্রদর্শনী কৃষি ফার্ম স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, কলেজের সংগৃহীত ২ একর (৬ বিঘা)এর পাশে সৈয়দপুর এস্টেটের জমি ব্যতীত আর কোনো জমি নেই। এই ৬ বিঘার পর আবাসিক কলেজ স্থাপন করা সম্ভব নয়। অথচ খুলনায় একটি কলেজেরও প্রয়োজন আছে।[১৪]

বাবু ব্রজলাল চক্রবর্তী দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী রেজিস্টার্ড দলিলে উল্লেখ করেন "The Primary Object of Hindu Academy at Daulatpur is the Tuition of the Sons of Respectable Hindus. The Teachers and the Students must be respectable Hindus and must be Residential."[১৪(ক)] মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাত্রদের ভর্তির কোন শর্ত ছিল না। বর্ণ হিন্দুরা মুসলিম ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে

একই দৃষ্টিতে দেখতেন।[১৫] ব্রজলাল চক্রবর্তী কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ছিলেন। সারদাচরণ মিত্র এ হাইকোর্টের বিচারপতি। এ সুবাদে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পাওয়ার ফলে ছাত্ররা প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতেন। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য বিচারপতিকে আনা হয়। ১৩.০৯.১৯০৮ তারিখে কলেজে এসে কাগজপত্র ও বিধিমালা দেখে তিনি বিস্মিত হন। জমি ৬ বিঘা সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশেই অবস্থিত প্রখ্যাত দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীনের ওয়াকফের ভূসম্পত্তি রয়েছে। মুসলিম ছাত্র ভর্তি করা হবে না, অথচ মহসীনের সম্পত্তির উপর কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এসব স্ববিরোধী কথা বিচারপতি সারদাচরন মিত্র জ্ঞাত হন। তিনি পরিদর্শন রিপোর্টে উল্লেখ করেন, "হাজী মহম্মদ মহসীনের সৈয়দপুর ট্রাস্ট এস্টেট থেকে অনেক কিছুই নেওয়া যেত এবং আসা করা হয়েছিল। দৌলতপুর-ট্রাস্টের বহু ভূসম্পত্তি আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এটি একটি হিন্দু ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান। মহসীনের সম্পত্তি মুসলিম ওয়াকফ- এর অধীন।"[১৬]

বিচারপতি সদাচরণ মিত্র কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ব্রজলাল চক্রবর্তী কে জানালেন যে, "এ কলেজকে পাবলিক কলেজ (যেখানে সব সম্প্রদায়ের ছাত্র ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করবে) না করা পর্যন্ত সরকারী অনুমোদন হবে না। কারণ সরকার সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য এই নীতির উপর কাজ করবে।" এমতাবস্থায় কলেজ কর্তৃপক্ষ নিতান্ত বাধ্য হয়েই জরুরী মিটিং এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, "মুসলিম ছাত্র ও নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাত্র ভর্তি করাতে আপত্তি নেই।"[১৭]

এইভাবে হিন্দু একাডেমির অচলাবস্থা নিরসনের জন্যই নিতান্ত বাধ্য হয়েই পবিত্র ব্রাহ্মণদের জন্য তৈরি নিয়ম শিথিল করে মুসলিম ছাত্রদের ভর্তি করাতে হলো। নড়াইলের মির্জাপুর সৈয়দ নওজোর আলী এবং আটরা নিবাসী মোঃ একরামউদ্দিনই প্রথম মুসলিম ছাত্র যাঁরা কলেজে ভর্তি হন (১৯০৯ এ) এবং ১৯১১ সালে আই. এ. পাশ করেন। প্রথম জন মেধা বৃত্তি প্রাপ্ত হন মাসিক ১২ টাকা রেটে। এ বিষয়টিও হিন্দুদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। ১৯০৭-এ মুসলিম ছাত্র ভর্তির বিষয়টি বলা হয়েছে। কিন্তু ওই সময় ভর্তি করা কোনো ছাত্রের নাম পাওয়া যায়নি। তবে এটা ঠিক যে, মুসলিম ছাত্রদের ভর্তির বিষয় নীতিগতভাবে মেনে নেওয়ার রিপোর্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালে তবেই আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পাওয়া যায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। এখানে ব্রজলাল চক্রবর্তীর বক্তব্য উল্লেখ্য : "The formal recognition of the Hindu Academy by the University was received in October, 1908. The initial struggles came to an end."[১৮]

অনুমোদন পাওয়ার পর ১৯০৮ থেকে ১৯১৩ এর মধ্যে মজুরি বাবদ ১ লাখ ৫ হাজার টাকা এ কলেজ পায়। এ অর্থ ছাত্রাবাস, বিজ্ঞানাগার, বই, যন্ত্রপাতি, জমি বাবদ ব্যয় করা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ সৈয়দপুর এস্টেটের জমি পাওয়ার জন্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৪০ একর জমি লিয়েন (Lien) পায়। সরকারের মঞ্জুরি কৃত অর্থ পুনরায়

সরকারি তহবিলে জমা দিয়ে অধিগ্রহণ করা হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা লিয়েন প্রাপ্ত। এ সময়ের তৈরি কলেজের একটি সাইট প্লান পাওয়া গেছে। এ ম্যাপে উল্লিখিত এবং ৪২ একর (২ একর ক্রয়কৃত এবং ৪০ একর সৈয়দপুর এস্টেট থেকে লিয়েন প্রাপ্ত) জমির কথা ও পার্শ্বে ৪২ একরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[১৯] সরকারের পক্ষে খুলনা ডি. এম এবং কালেক্টর বাহাদুর এই বিশাল সম্পত্তি হিন্দু একাডেমিকে লিয়েন দেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ ভালভাবেই জানতেন যে, এই জমি ব্যবহারের জন্য একবার পেয়ে গেলে আর ফেরৎ দেয়ার প্রশ্নই উঠবে না। কারণ এটি একটি জনকল্যাণমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জমি হিন্দু একাডেমি পেয়ে গেল। কিন্তু এর মালিকানা সরকারের হাতে রয়ে গেল। অর্থাৎ সরকার টাকা দিয়ে ক্রয় করে হিন্দু একাডেমিকে ব্যবহারের জন্য লিয়েন দিলেন। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজলাল চক্রবর্তী তাঁর 'The Decennial Report of Daulatpur Hindu Academy'-তে উল্লেখ করেন, "১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমরা শিক্ষা তহবিল থেকে প্রতি মাসে ৫০ টাকা হারে পাচ্ছি এবং সুবিখ্যাত(Illustrious) মহম্মদ মহসীনের এস্টেটের উপরই কলেজটি স্থাপিত।"[২০]

আলোচনায় স্পষ্ট যে, দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির মন্দির এলাকার ৬ বিঘা জমি-যা ১৯০২ সালে ৩০০ (তিন শত) টাকায় ক্রয় করা হয়। এই ২ একর সম্পত্তির উপর অবস্থিত চতুষ্পাঠী বা টোল। এ জমি বর্তমান কলেজের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ভৈরব নদীর তীরবর্তী দধিবামনদেব মন্দির এলাকাধীন। কলেজটি ৪০ একর বা ১২০ বিঘার উপর অবস্থিত। এ জমি হুগলী নিবাসী ভারত বিখ্যাত দানশীল হাজী মহম্মদ মহসীনের (১৭৩০-১৮১২) দানকৃত সৈয়দপুর এস্টেটের ওয়াকফ এর ভূসম্পতি, যাঁকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ও শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪) আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ ভারতীয়দের অন্যতম হিসেবে গণ্য করেছেন।[২১] কলেজের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে ১৯৩০-এ হাজী মহম্মদ মহসীনের শিক্ষা তহবিলের মঞ্জুরি কৃত ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার দ্বারা খনন কার্য চালিয়ে ১ টি টিউবওয়েল বসানো হয়।[২২]

১৯০২ এর জুন থেকে ১৯৪৬ এর মার্চ মাস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি নামেই পরিচিত ছিল। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুলাই বাবু ব্রজলাল চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অবিভক্ত বাংলার বিধানসভার এম. এল. এ বীণা দাসের সভানেত্রীতে এ কলেজের নামের সঙ্গে ব্রজলাল চক্রবর্তীর নাম সংযোজন করার জন্য এক বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। সার্বজনীনভাবে কলেজের নামকরণ হয় 'ব্রজলাল হিন্দু একাডেমি'। ১৯৪৯ এ কলেজের নাম হয় 'দৌলতপুর ব্রজলাল একাডেমি'। পরে ১৯৫১ সালে কলেজের নাম থেকে একাডেমি শব্দটি উঠিয়ে দিয়ে কলেজের নাম রাখা হয় 'ব্রজলাল কলেজ, দৌলতপুর'। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ১ জুলাই কলেজের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। ১৯৭৩ এ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বলে ঘোষণা করা হয়।

দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি স্থাপনে বাবু ব্রজলাল চক্রবর্তী ও দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীন— দু'জনের অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রজলাল চক্রবর্তী উদ্যোগ না নিলে

সৈয়দপুর এস্টেটের বর্তমান স্থানে ওই সময় এই কলেজ স্থাপিত হতো না।[২৩] কিন্তু দুঃখের বিষয় কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জমি সংক্রান্ত এবং একই সঙ্গে মহসীন দান তহবিলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও হাজী মহম্মদ মহসীনের নাম স্বরনে আনা হয়নি। সরকারি ব্রজলাল কলেজ দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীনের দানকৃত সৈয়দপুর এস্টেটের উপরই অবস্থিত (মন্দির এলাকার ৬ বিঘা বাদে)। এছাড়া প্রতিমাসে ৫০ টাকা হারে কয়েক দশক যাবত মোট প্রায় ১৮৫০০ টাকা প্রাপ্ত হয়। তৎকালীন সময়ে এটা একটা বিরাট অবদান। কিন্তু এর প্রতিদানে মহসীনের নামে কোন কিছুই করা হয়নি।

১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কিছু হিন্দু জমিদার ও বিত্তবান ব্যক্তি এ কলেজের ভবন নির্মাণ ও উন্নয়ন কল্পে অর্থ দান করেন। এ অর্থ দ্বারা ভবন নির্মাণ করে দেওয়াল গাত্রে পাথরের খোদাইকৃত দাতার নাম আজও বিরাজমান। কলেজ প্রতিষ্ঠাতা ব্রজলাল চক্রবর্তী এদের নাম স্মরণীয় করে রাখার কোনো ত্রুটি করেননি। নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় তাঁর মাতা ব্রজসুন্দরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কলেজে মন্দির নির্মাণের জন্য ৫০০০ টাকা, কাশিমবাজারের মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী ৫০০০ টাকা, রংপুরের রাজা গোপাল লাল রায় ৩০০০ টাকা, পুটিয়ার রানী, বাগেরহাটের জমিদার যদুনাথ বিশ্বাস অর্থদান করেছেন। এ সমস্ত দাতার নাম পাথরে খোদাই করে ঘরের দেওয়ালে সযত্নে গেঁথে রাখার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে। দাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এরূপ বাণী ব্রজলাল চক্রবর্তী রেখে গেছেন। "We have to express our heartfelt gratitude to these donors. The College is immensely indebted to them."[২৪] এ সমস্ত দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন প্রশংসনীয় এবং একটি মহৎ গুণ। এজন্য ব্রজলাল চক্রবর্তী ও তাঁর পরামর্শদাতারা জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু যে জমির ওপর এ ভবনগুলো নির্মিত, ছাত্রদের জন্য খেলার মাঠ ও বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রস্তুতকৃত, ছাত্রাবাস নির্মিত, পুকুর খননকৃত, চলাচলের রাস্তা, শিক্ষকদের বাসভবন নির্মিত-এ সমস্তই হাজী মহম্মদ মহসীনের দানকৃত সৈয়দপুর এস্টেটের অন্তর্গত খুলনা জেলার দৌলতপুর থানার পাবনা, দৌলতপুর এবং গোয়ালপাড়া মৌজার জমির উপর। এ জমি না হলে এ কলেজ এখানে স্থাপিত হত না। কিন্তু ব্রজলাল চক্রবর্তী হিন্দু জমিদার ও তাদের প্রতি যে কৃতজ্ঞতার স্মারক বানিয়ে রেখে গেছেন, কিন্তু হাজী মহম্মদ মহসীনের এত বড় দানের প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একটি শব্দ ব্যবহার করতেও তাকে দেখা যায়নি।

তথ্যসূত্র ও টীকা :

১। প্রফেসর মোঃ বজলুল করিম, ব্রজলাল কলেজের ইতিহাস, অবকাশ প্রকাশনী, দৌলতপুর, খুলনা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২০, পৃ. ২।

২। হুগলি কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় মহসীন এডুকেশন এনডাওমেন্ট ফান্ড-এর অর্থানুকূল্যে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে।

৩। স্থাপনকালের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কলেজ সমূহের মধ্যে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির স্থান দশম।

৪। History of Govardhanga Hindu College, http://www.ghcollege.ac.in, Dated 09.09.2020.

৫। প্রফেসর মোঃ বজলুল করিম, ব্রজলাল কলেজের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭৬।

৬। প্রসিদ্ধ নদী বন্দর দৌলতপুর খুলনা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তরে ভৈরবের তীরে অবস্থিত। খুলনা মহকুমায় পরিণত হয় ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে। আর ১৮৮২ সালে খুলনা জেলায় পরিণত হয়।

৭। মকবুল মাহফুজ, হাজী মোহাম্মদ মহসিন, কথা প্রকাশন, বাংলা বাজার ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১২ পৃ. ৪৫।

৮। প্রফেসর মোঃ বজলুল করিম, ব্রজলাল কলেজের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭৫-১১৭৬।

৯। Presidency College Register, Publication, 1926, P. 1; প্রফেসর মোঃ বজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২।

১০। প্রফেসর মোঃ বজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১১। ওই, পৃ. ৪৩৮।

১২। প্রফেসর মোঃ বজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২, ৬৮।

১৩। প্রফেসর মোঃ বজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

১৪। ওই, পৃ. ৫৬।

১৪(ক)। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল রেজিস্ট্রিকৃত অর্পননামা, দলিল নং-১৪৬৩।

১৫। প্রফেসর মোঃ বজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

১৬। ওই, পৃ. ১৩৯, ৬৩।

১৭। ওই, পৃ. ১৪০।

১৮। ওই, পৃ. ৭১।

১৯। ওই, পৃ. ৭১।

২০। ওই, পৃ. ৬৫।

২১। Sir Asutosh Mukherjee, Haji Mahomed Mohsin Death Centenary Tribute on 18h March 1913, Reprinted and Published by Viswa-kos Parisad, Kolkata, pp.7-8; March 14, 1913, p. 3.

২২। প্রফেসর মোঃ বজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

২৩। ওই, পৃ. ৮০।

২৪। Decennial Report of the Daulatpur Hindu Academy, 1902-1912, Khulna, Bengal, Printed by Ramesh Chandra Chowdhury, Bijoy Press, 20 Potuatala Lane, Calcutta, 1912, P. 20.

কোচবিহারের রাসমেলার ইতিকথা

পার্থ সারথী দাস

সংক্ষিপ্তসার :

পুজো বা মেলায় ঘুরে বেড়াতে আমরা বিশেষত বাঙালিরা খুব ভালোবাসি। পুজোর মরশুমের ঠিক পরেই আসে মেলার পালা। আর এমনই একটি দুইশত বছরের বেশি পুরনো ঐতিহ্যবাহী মেলা হল কোচবিহারের রাসমেলা। এই মেলায় উত্তরবঙ্গ সহ গোটা রাজ্যের মানুষ তো বটেই, এমনকি আসাম ও পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান থেকেও প্রচুর লোকের সমাগম হয়। সকলের আগমনে মেলা হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক মিলন মেলা।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

রাস মেলার ইতিকথা :

এই রাস মেলা নিয়ে অনেক পুরনো গল্প গাথা আছে। কথিত আছে, ১৮১২ সালে কোচবিহারের তৎকালীন রাজা হরেন্দ্র নারায়ণের হাত ধরে ভেটাগুড়িতে প্রথম এই মেলার হাতে খড়ি ঘটে। ওই বছরই রাস পূর্ণিমা তিথিতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভেটাগুড়িতে নবনির্মিত রাজপ্রসাদে প্রবেশ করেন। পরবর্তীকালে ১৮৯০ সালে রাজা হরেন্দ্র নারায়ণের প্রপৌত্র নৃপেন্দ্র নারায়ণ বৈরাগী দিঘির পাড়ে মদনমোহন মন্দির স্থাপন করেন এবং ওই মন্দিরে স্থায়ীভাবে মদনমোহন ও অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করেন। সেই বছর থেকেই আজ পর্যন্ত মন্দির সংলগ্ন এলাকায় রাস মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে সংকীর্ণ জায়গার দরুন ১৯১৭ সালে মেলাটি সরিয়ে নিকটবর্তী প্যারেড গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া হয় যা এখন রাস মেলার মাঠ নামে পরিচিত।

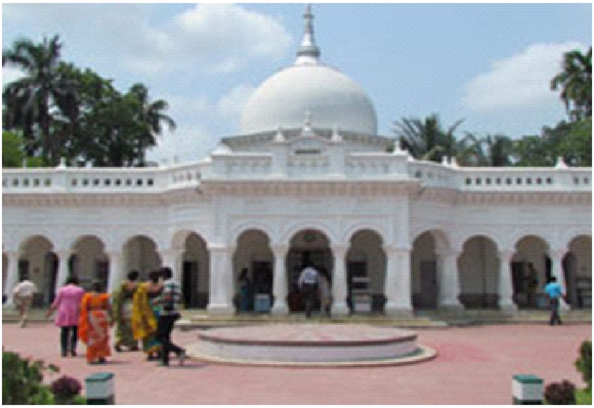
এই মদনমোহন মন্দিরে পাঁচটি কক্ষ রয়েছে। বিভিন্ন কক্ষে রয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর বিগ্রহ। যেমন পূর্ব প্রান্তে রয়েছে মা জয়তারা। পশ্চিম প্রান্তে মা কালীর বিগ্রহ। আরেক পাশে ভবানী বিগ্রহ। অন্যদিকে নাট মন্দির। নাট মন্দিরে দুর্গা পূজা বা জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। মন্দিরের পাশে রয়েছে পুষ্করিণী বৈরাগীদিঘি। আগে এই পুকুরে মন্দিরের সেবায়েত বা ভক্তরা স্নান করতেন। তাঁদের জন্য বিশেষ তাঁবুর ব্যবস্থা থাকত। এখন তাঁদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আনন্দময়ী ধর্মশালা।

মন্দিরে মূল বিগ্রহের কক্ষ হলো মদনমোহনের। বিগ্রহটি রুপা দিয়ে তৈরি। বিগ্রহ বলতে দুটি— একটি বড় মদনমোহনের আর একটি ছোট মদনমোহনের। ছোট মদনমোহন অন্তরালেই থাকেন। বছরে একবারই জেগে ওঠেন। আর সেটা হল রাস

উৎসবের সময়।

রাজ বংশের আদি দেবতা হলেন মদনমোহন। মদনমোহনের পুজো ও যজ্ঞের মধ্য দিয়ে মেলার শুভারম্ভ ঘটে। প্রথমদিকে রাজার বংশধরেরা রাস মেলার উদ্বোধন করলেও পরবর্তীকালে কোচবিহারের শেষ স্বাধীন রাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর ১৯৭০ সাল থেকে দেবত্বের ট্রাস্টের সভাপতি হিসেবে জেলাশাসকরা পুজো দিয়ে রাশিচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের সূচনা করেন। এখানকার মানুষের বিশ্বাস এই পুজো করা হয় জেলার সর্বস্তরের মানুষের মঙ্গল কামনার জন্য।

মদনমোহনের ভাবনা কোচবিহারে এলো কিভাবে। কথিত আছে, ১৭৮৩ সাল থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত কোচবিহারে রাজত্ব করতেন রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ। তারপর ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন রাজা শিবেন্দ্র নারায়ন এবং ১৮৬৩ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ ও নৃপেন্দ্র নারায়ন। এই রাজাদের রাজত্বকালে অসম থেকে বিতাড়িত হয়ে এসেছিলেন বৈষ্ণব গুরু শংকরদেব। গবেষক রঞ্জিত দেবের মতে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধারানী বলে কিছু নেই। একই অঙ্গে তার দুই রূপ। তিনিই পুরুষ, আবার তিনিই প্রকৃতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্বৈত রূপ প্রচার করায় শংকরদেব চরম বিরোধিতায় পড়েন। এমতাবস্তায় তিনি অসম থেকে কোচবিহারে এসে প্রচার কাজ শুরু করেন। আর ঠিক সেই সময় তাঁর ভাবনা থেকেই কোচবিহারের মদনমোহন বিগ্রহের মূল ভাবনা এসেছে।



রাস সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব হলেও রাস চক্রটি তৈরি করেন একজন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ (বংশানুক্রমিকভাবে বর্তমানে আলতাফ হোসেন)। যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। শুধু তাই নয় এই রাস চক্রের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়। লক্ষ্মী পুজোর দিন থেকে রাশ চক্র তৈরির শুরু হয়। সাধারণত বাঁশ দিয়ে রাস চক্রটি তৈরি করা হয়। এর উচ্চতা ২২ থেকে ২৫ ফুট এবং ব্যাস ৮-১০ ফুটের মতো হয়ে থাকে। এটি দেখতে অনেকটা চোঙ আকৃতির মতো। এর উপরিভাগ বিভিন্ন ধরনের রঙ-বেরঙের কাগজ দিয়ে মোড়ানো থাকে।

যার মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয় ঘটে।



রাস মেলা পরিচালিত হয় কোচবিহার পৌরসভার দ্বারা। মেলা চলে টানা ১৫ দিন ধরে। মেলার দিন যত গড়াতে থাকে লোকসমাগম ততই বাড়তে থাকে। এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ হলো বিশালাকার পুতনা রাক্ষসী মূর্তি। এই মূর্তি মদনমোহন মন্দির চত্বরে এক প্রান্তে বড় টলির উপর তৈরি করা হয়। যার মধ্যে মৃৎশিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে ওঠে পুরাণের বিভিন্ন খণ্ডচিত্র। এছাড়াও, মেলা উপলক্ষে মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণে ধর্মীয় কাহিনী মডেলের মাধ্যমে পুতুল ঘরে সাজিয়ে রাখাটাও এখানকার পুরনো ঐতিহ্য। রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনির টুকরো ছবি মূর্তির মডেলের মাধ্যমে মন্দিরের দেওয়া এলাকা জুড়ে তৈরি পুতুল ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়।

এছাড়াও মেলার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকে সার্কাস, মরণ কূপ, হরেক রকমের নাগরদোলা, ট্রয় ট্রেন সহ দেশ বিদেশ থেকে আগত দুই হাজারেরও বেশি

রকমারি দোকান। রাসমেলায় ছোটদের রকমারি হাজারো খেলনা আসে। তার মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ হলো টমটম গাড়ি। একসময় এক টাকায় ঐ টমটম গাড়ি বিক্রি হতো। এখন দাম প্রায় দশ গুণ বেড়েছে কিন্তু তাই বলে টমটম গাড়ির কদর কমেনি।

এছাড়াও, আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ হলো জিলিপি। জিলিপির রসের টানে জিলিপি প্রেমী মানুষেরা মেলায় আসেন। তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা নিয়ে জমে ওঠে বিক্রেতাদের লড়াই। ভেটাগুড়ির জিলিপি এবং বাবুরহাট, নীলকুঠি, পুন্ডিবাড়ি ও দেওয়ানহাটের জিলিপি মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। তাই রাস মেলা হয়ে ওঠে রসেরও মেলা।

মেলা উপলক্ষে প্রতিদিনই পৌরসভার সাংস্কৃতিক মঞ্চে জমকালো জলসার আয়োজন করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে মদনমোহন মন্দির চত্বরে প্রতিদিনই কীর্তন, ভাগবত-পাঠ, ধর্মীয় যাত্রানুষ্ঠান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

রাস মেলা উপলক্ষে গোটা কুচবিহার জুড়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। মেলা চত্বরেও পর্যাপ্ত পুলিশ ও সিসিটিভির ব্যবস্থা থাকে। তাই নির্ভয়ে আনন্দ উপভোগ করা যায়।

তথ্যসূত্র :

১) ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহারের ইতিহাস, অনিমা প্রকাশনী, ১৪১ কেশব চন্দ্র লেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯।

২) আনন্দ গোপাল ঘোষ ও নারায়ণ চন্দ্র সাহা, কোচবিহারের ইতিহাস।

৩) আবির ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, মেঘের ভেলা, রাসমেলা সংখ্যা, ২০১৭।

৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০শে কার্তিক, ১৪২০, শনিবার।

পশু-পক্ষী প্রীতির আলোকে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প

সনৎ পান

এক

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যপাধ্যায় (১৯২০-১৯৯৯) বাংলা সাহিত্যের ধারায় এক অনন্য নাম। সুদীর্ঘ ছয় দশক ধরে তিনি সাহিত্য সরস্বতীর সাধনা করেছেন। বাংলা ছোট গল্পের ধারায় স্বাদবদলের গল্পকার হিসেবে পরিচিত হলেও বহু বিচিত্র বিষয় তাঁর লেখনি স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছে। সমুদ্রকল্লোল, নাবিকজীবন, দ্বীপময় মানুষের জীবনালেখ্য তাঁর সাহিত্যকে নতুনত্ব দান করেছে। বাংলা সাহিত্যে পশু পক্ষী নিয়ে লেখা গল্পের সংখ্যা স্বল্প। সাহিত্যের আদি লগ্ন থেকে পশু পখির কথা বিভিন্ন রূপকথা, উপকথা, লোককথায় পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ধারায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ', বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'বুধনীর বাড়ী ফেরা', পরশুরামের 'লম্বকর্ণ', 'রাজমহিষী', 'লক্ষ্মীর বাহন', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ড়া 'লাল ঘোড়া', 'সৈনিক', বনফুলের 'বাঘা', সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের 'গোধ্ন, প্রভৃতি গল্পে পশু পক্ষী প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

শচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'মার্কো', 'মা লক্ষ্মীর বাহন', 'ভোঁদড়বাবাজী', 'সুন্দরী' গল্প শুধু পশু পক্ষী প্রীতির সঙ্গে মানবিকতা, মূল্যবোধ ও সমাজমানসের মেলবন্ধন ঘটেছে। শচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের গল্পে পশু-পক্ষী প্রীতির অন্বেষণ মূল আলোচ্য নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

দুই

ছোটদের জন্য লেখা 'মার্কো' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী 'শারদীয়া' (১৯৬২) সংখ্যায়। পরবর্তীতে 'সাগরিকা', 'কিশোর গল্পসমগ্র' ও 'শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলা কিশোর সাহিত্যে পশুকেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে 'মার্কো' অনন্য। মার্কো এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, সে কোনো মানুষ নয়, সে একটি বাঁদর। গল্পের পটভূমি বিশাখাপত্তনম বা ভাইজাগ। পাহাড়ঘেরা ছোট সুন্দর বন্দরটিতে দেশ বিদেশের অসংখ্য জাহাজ এসে ভিড়ত। লেখক জাহাজি কোম্পানিতে কাজ করতেন। জাহাজি জীবনের অভিজ্ঞতা বাস্তব বর্ণনাময় প্রকাশ 'মার্কো' গল্পে।

গ্রীস দেশের একটি জাহাজ বন্দরে আসে। জাহাজের দু এক জন ছাড়া কেউ

ইংরেজি বলতে পারত না, ইশারা ইঙ্গিত কথা বলার মাধ্যম। গ্রীক জাহাজের এক খালাসি কথককে ডাকে 'ইউ ইন্দু ?'। সে জানতে চায় লেখক কি হিন্দু ? সারা ভারতবর্ষের লোক ওদের কাছে হিন্দু। হিন্দু মাত্রই তার কাছে হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করার দৈবী ক্ষমতার অধিকারী। কথক দীর্ঘক্ষণ হাত দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তার একাকিত্বের কথা বলে। কেননা, তিনি জানেন জাহাজি নাবিক মাত্রই আত্মীয় পরিজন থেকে দূরে, একা একাকী। এই নিঃসঙ্গ নাবিক জানতে চায়— 'তেল মি, হি লাভ্স মি ?' ক্যাপ্টেন তাকে ভালোবাসে একথা শোনার পর গ্রীক নাবিক রাগান্বিত হয়। কাহিনিসূত্রে মার্কোর আবির্ভাব ও লেখকের সঙ্গে পরিচয়—

"পরক্ষণেই নজরে পড়ল ওর হাতে চেনে বাঁধা ছোট একটি বাঁদর। আমাদের দেশি বাঁদর নয়, লালচে লালচে গায়ের লোম, মুখখানি লাল, আর খুব ছোট্ট দেখতে। গোলগোল চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।"[১]

বাঁদরটির নাম মার্কো। নাবিক (জর্জি) জানতে চায় মার্কো তাকে ভালোবাসে কিনা ? কথক জানায় 'ভালোবাসে'। পরক্ষণেই চালাকির আশ্রয় নেন। নাবিকটির হাত ভালো করে দেখার ভান করে বলে মার্কো নয় অন্য কেউ ভালোবাসে। জর্জি উত্তেজনার বশে ঠোঁটে সিগারেট চেপে ধরে। মার্কো সন্তর্পনে কথক ও জর্জির সিগারেট ধরিয়ে দেয়। অপ্রত্যাশিতভাবেই নাবিক (জর্জি) কথককে মার্কোর দায়িত্বভার হস্তান্তর করে। জাহাজ থেকে তাঁর ঘরে মার্কোর আগমন হয়। তাঁর সব সময়ের সঙ্গী মার্কো। মার্কোর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা বর্ণনীয়। স্নেহের কাঙাল মার্কো তাঁর সঙ্গে খেলা করে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে মার্কো ভালোবাসে, আলুর খোসা, কলার খোসা সে নির্দিষ্ট প্লেটে রাখে। কথকের লেখার সময় মার্কো চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে, অপার বিস্ময়ে লেখা দেখতে থাকে। কালি ফুরিয়ে গেলে কালি, খাতাপত্র আলমারিতে গুছিয়ে রাখে মার্কো। লেখক টেবিলে অফিসের কাজকর্ম করার সময় মার্কো উশখুশ করতো, কিন্তু সাহিত্যিক কাজকর্মের সময় একেবারে চুপ। লেখকের ভাষায়—

"মার্কো একটি অদ্ভুত ধরনের জীব।"[২]

মাসখানেক পর কলকাতা থেকে লেখকের মা, দুই বোন— রেখা ও লীলা, আর সেজভাই আসে। মার্কোর জীবনধারা অন্যখাতে প্রবাহিত হতে থাকে। ওদের দেখে মার্কো বিরক্ত হয়। লেখকের জিনিসপত্র, আলমারি, বইয়ে অপরকে হাত দিতে দেয় না। এ প্রসঙ্গে সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্তের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

"এক আশ্চর্য Possessiveness! লেখক তার প্রভু, কারও সঙ্গেই সে তার প্রভুকে ভাগ করে নেবে না। ভালোবাসা— যা এই গল্পের ধ্রুবপদ। তার কী আশ্চর্য প্রকাশ!"[৩]

পরিবার ও মার্কো উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্বে কথক ক্ষতবিক্ষত হন। তিনি মার্কোকে কিছুদিনের জন্য পরিচিত ইসমাইলের কাছে পাঠিয়ে দেন। কর্মব্যস্ততার মাঝেও কথকের মনে পড়ে মার্কোর কথা। জর্জির মতো হয়তো তাকেও মার্কো ভুলে গিয়ে, ইসমাইলকে ভালোবাসতে শুরু করেছে— এসব কথা তাঁর ভাবনাকে গ্রাস করে। একদিন ইসমাইল

ছুটে এসে কথককে ডেকে নিয়ে যায়। কথক দেখে গিয়ে মার্কো বুকের কাছে হাত জড়ো করে অন্তিমকালে রামনাম স্মরণ করে মারা গিয়েছে। মার্কোর হাতে সুদীর্ঘ আয়ুরেখা দেখে কথকের মনে হয়েছিল এ ছেলে অনেকদিন বাঁচবে, কিন্তু বাঁচল না। কথকের প্রতি ভালোবাসার টানেই মার্কো ধীরে ধীরে আত্মাকে হত্যা করেছে। তাঁর লেখার সময় মার্কোর স্মৃতি ভেসে ওঠে, আর মনে হয়—

"কোথাকার কোন সুদূরের কোন্ জীব, সে আমাকে অমন করে ভালোবেসেছিল কী করে ? নাকি ভালোবাসার ধর্মই এই সে কোনো বাছবিচার করে না! আপনি আপনিই ঢেউয়ের মতো উদ্বেল হয়ে ওঠে। বোধ হয় তাই, নইলে লতাপাতায় শাখায় প্রশাখায়, জীবে জীবে, অনুতে পরমাণুতে এমন অহেতুক ভালোবাসার রাগিনী বেজে ওঠে কেমন করে ?"[৪]

মার্কোর ট্র্যাজিক পরিণতি পাঠককে বিরহকাতর করে তোলে। লেখক এই গল্পে জাহাজি জীবন, মার্কোর জীবনের পর্বান্তর ও পরিণতিকে কাহিনি নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন। কিশোর গল্পের ধারায় মার্কো পশুপ্রেমের গল্প হিসেবে চির সমুজ্জ্বল। মার্কোকে কেন্দ্র করেই গল্পের কাহিনি ক্রম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। মার্কোর মৃত্যু ও তার স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়েই কাহিনি সমাপ্তি লাভ করেছে— যা এক কথায় অনবদ্য।

'মা লক্ষ্মীর বাহন' গল্পটির শুরু হয় কিশোর কথকের পরিবারের দারিদ্র্যের বর্ণনা দিয়ে। শিশু বয়স অতিক্রম করে কথক কৈশোরে উপনীত। চরম দারিদ্র্যের এক দুপুরে অভুক্ত অবস্থায় উপস্থিত হয় বিশেশ্বর, গ্রাম্য সম্পর্কে কথকের জ্যাঠামশাই। ফেরার সময় বিশেশ্বর বলে—

"তোমাদের বাড়িতে শীগগিরই কেউ আসবে, আর সেদিন থেকে তোমাদের অবস্থা ফিরতে আরম্ভ করবে।"[৫]

ঘটনার কিছুদিন পর বাড়িতে আশ্রয় নেয় আহত লক্ষ্মীপ্যাঁচা। কারখানা বন্ধ, কথকের বাবার চাকরি নেই। সে স্বপ্ন দেখে সচ্ছল আগামী দিনের। প্রথম প্রথম প্যাঁচাটি পালিয়ে গেলেও কিশোর কথকের সঙ্গে এক অসম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। লক্ষ্মীকে স্মরণ করে প্যাঁচার সম্মুখে তাঁর মা প্রণাম করে পরিবারের দারিদ্র্য মুক্তি ও মঙ্গল প্রার্থনা করে। প্যাঁচাটি কলা, বাতাসা, চাল কোনকিছু না খেলেও আরশোলা ধরে খায়। কথক ভাঙা পায়ে ব্যান্ডেড বেঁধে, ডানায় চুন হলুদ মাখিয়ে শুশ্রূষা করে। প্যাঁচার চোখে সে দেখে বেদনার ছাপ—

"একেবারে বাচ্ছাদের মতো চোখ। টুনকি যখন ছোট ছিল, মার কোলে শুয়ে থাকত, তখন ওর চোখ ছিল ঠিক এইরকম। ... দুটি চোখ ভর্তি বেদনার ছাপ। কত ব্যথা যেন রয়েছে ওই পাখিটার বুকে, সেই ব্যথাই দুটি চোখে ফুটে উঠল।"[৬]

দিন বদলের পালা শুরু হয়। কথকের বাবা চাকরি ফিরে পায়, কারখানা খুলে যায়। পরিবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শ্রমিক নেতা সুভাষ মাইতিকে। কথকের বোন টুনকি ও মা প্যাঁচাটিকে একপ্রকার ভুলে যায়। গভীর রাত্রে দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ করে

প্যাঁচাটি। দরজা খুলে কথক বাইরে আসে। বন্ধুর কোলে শুয়ে জল খেয়ে চিরঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে প্যাঁচাটি। পক্ষী প্রীতি ও কিশোর মনস্তত্ত্বে লেখকের অমর তুলিতে ফুটে উঠেছে 'মা লক্ষ্মীর বাহন' গল্পে।

গল্পে লক্ষ্মীপ্যাঁচা ও কিশোরের অসম বন্ধুত্ব হৃদয়রসে জারিত। কিশোর চরিত্র হিসেবে কথক অনন্য। কৈশোরের সংস্পর্শে সে বুঝতে পারে পরিবারের দুরবস্থার কথা। সে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। গল্পের শুরুতে তার কথায় স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ি। দারিদ্র্যের চিত্র অঙ্কনে বর্ষার প্রসঙ্গ চিত্রময় হয়ে ওঠে। লেখক যেন শব্দের বুননে চিত্র অঙ্কন করেছেন—

"আমাদের বাড়িটা পাকা, একতলা, কিন্তু বৃষ্টির সময় ছাদ দিয়ে জল পড়ে। মা বালতি টেনে নিয়ে এসে নীচে পেতে দেয়। তাতে ছাদের জল পড়ে টুপটাপ শব্দ হয়। বর্ষা পড়লেই আমার গা গরম হয়ে জ্বর হয়। সেই জ্বরের সময় বিছানায় শুয়ে টুপটাপ শব্দ শুনতে আমার বেশ ভালো লাগে।"[৭]

বিশেশ্বরের কাছে নতুনের আগমনে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে শুনে কিশোর মনে আশার সঞ্চার হয়। শিশু চরিত্র টুনকি (কথকের বোন) প্যাঁচার প্রতি আগ্রহ, ভালোবাসা ও কৌতূহল গল্পে লক্ষ করা যায়। কথকের মা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে প্যাঁচাকে প্রণাম করে—

"মা গড় হয়ে প্রণাম করল মেঝেতে, মা লক্ষ্মী, এসেছে যখন, থাকে, আমার ছেলেমেয়েরা যেন একটু সুখের মুখ দেখে।"[৮]

সংস্কারের বশবর্তী হয়ে মা লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচাকে কেউ সিঁদুর পরিয়ে দেয়। প্যাঁচার নিয়ে সংস্কার ও বিশ্বাস গল্পে নতুনত্ব লাভ করেছে। কিশোর কথকের অসুস্থ আহত প্যাঁচার প্রতি সহানুভূতি ও তার দু চোখের মধ্যে বেদনার ছাপ গল্পে উপস্থাপিত। বাবার চাকরি ফিরে পাওয়ার পরও প্যাঁচার প্রতি টান অক্ষুন্ন ছিল। কিশোর মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের শুরু হয়, সে ভাবে—

"সেই যে জ্যাঠামশাই এসেছিল ? বলেছিল, কেউ একজন আসবে, তারপর আমাদের অবস্থা ফিরবে। সেই একজন সত্যি সত্যি তাহলে কে ? আমার বন্ধু, না সুভাষ মাইতি ?"[৯]

গল্পের সমাপ্তিতে প্যাঁচাটির মারা যাওয়া কথকের সঙ্গে পাঠককেও অশ্রুসিক্ত করে তোলে। 'মা লক্ষ্মীর বাহন' গল্পের নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মী। প্যাঁচাকে নিয়ে সংস্কার, কিশোর মনের ভালোবাসার সঙ্গে সমাজ বাস্তবতা তথা পরিবারের দরিদ্রের বর্ণনায় 'মা লক্ষ্মীর বাহন' গল্পটি স্রষ্টার অনবদ্য সৃষ্টি।

যশোহর জেলার নড়াইলে লেখকের জীবনের ১৯৩৪-৩৮ অতিবাহিত হয়, নড়াইলের চিত্রা নদী, প্রকৃতিকে অবলম্বন করেই 'নড়াল পর্ব'। নড়াইল জীবনের স্মৃতি লব্ধ 'ভোঁদড় বাবাজী' গল্প। 'আমার সাহিত্যের পটভূমি' তে লেখক স্বীকার করেন—

"'ভোঁদড় বাবাজী'র একটি সূত্র আছে। বৈশাখে নড়ালে একটি আড়ং বা মেলা

হত। সেই মেলায় সার্কাস আসত। ছোট ছোট সার্কাস। 'ঝরাফুল দলে কে অতিথি' নজরুলের এই গানসহ পুতুল নাচ দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম সার্কাস যে নৌকা দুটি (কি তিনটি ঠিক মনে নেই) করে এসেছিল, তাতে সার্কাস মালিকের স্ত্রীর এক ভোঁদড় ছিল।"[১০]

'ভোঁদড় বাবাজী' গল্পটি ১৯৯৪ সালে 'শুকতারা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে লেখকের 'কিশোর গল্পসমগ্র', 'চন্দ্রালোক থেকে আসছি' ও 'শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মেলা বা আড়ং উপলক্ষে চিত্রা নদী বেয়ে গ্রাম্য সার্কাসের দল রতনগঞ্জে আসত। চিত্রা নদীতে স্নান করতে গিয়ে কথক দেখে নৌকায় বসে একজন স্ত্রীলোক একটি ভোঁদড়কে জলে নামিয়ে দেওয়া। ভোঁদড়টির নাম 'মানুষ'। সে মুখে করে মাছ নিয়ে এসে মালিককে দেয়। স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথোপকথনে কথকের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। কথককে স্ত্রীলোকটি 'ও মনি' বলে ডাকে। কথককে সার্কাসের পাস বা টিফিন দেয়। সার্কাসের পুতুল নাচ, ট্রাপিজের খেলায় মুগ্ধ হয় কিশোর কথক। ভোঁদড় বাবাজী পুতুলনাচের মূল কান্ডারি, গল্পে মঞ্চে তার আবির্ভাবের চমৎকার বর্ণনা পাই—

"... অদ্ভুত সাজে বেরিয়ে এসেছে আমাদের ভোঁদড় বাবাজী। কোমরে খাটো ধুতি, এমন করে পরা যে পিছন থেকে লেজটা ঠিক বেরিয়ে এসেছে। গা খালি। তাতে একটা সাদা পৈতে ঝুলছে। মাথায় ছোট লাল গামছা। দিব্যি হেঁটে হেঁটে স্টেজে ঢুকল।"[১১]

পুরোহিত রূপী ভোঁদড় পুতুল বর কনের বিবাহ সম্পন্ন করে। ভোঁদড় ও পুতুলের নাচ দর্শক মনে আনন্দের হিল্লোল তোলে। কিছুদিন পর কথক স্নান করতে গিয়ে শোনে 'মানুষ' (ভোঁদড় নাম) নিখোঁজ। পরে ভোঁদড় ফিরে আসে, ফিরে আসে সার্কাস দলের আনন্দ ও সমৃদ্ধি। এক পাগল নদী থেকে ভোঁদড়কে তুলে নিজের কাছে বেঁধে রেখেছিল। সে বেড়া ভেঙে চলে আসে মালিকের কাছে। পাগল দাবি করে ভোঁদড়ের, কেননা—

"ভোঁদড় ছিল তার অন্ন-বস্ত্র, সুখ-সমৃদ্ধির প্রতীক।"[১২]

গল্পের মূল চরিত্র 'ভোঁদড়'। সে সার্কাস দলের অন্নবস্ত্রের চাবিকাঠি। ভোঁদড়ের চরিত্র বৈশিষ্ট্যও অপরিসীম, মাতৃভক্ত সন্তানের মতোই নিঃসন্তান স্ত্রীলোকের সমস্ত কথা সে মান্য করে। নদী থেকে মাছ ধরে নিয়ে এলেও কাঁচা মাছ খায় না, ভাজা মাছ খায়। সে 'মা' বলে ডাকে। মঞ্চে তাঁর পুরুতের অভিনয়ও অনবদ্য। দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য মহামায়া সার্কাসের পুরোধা ভোঁদড়টি। সে নিখোঁজ হলে সার্কাস যেন মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। এককথায় সমস্ত গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ভোঁদড়। তাকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত। কথকের মধ্যে কিশোর মনের কৌতূহল, সার্কাস দেখার আগ্রহ গল্পে লক্ষ করা যায়। যশোরের চিত্রা নদীকেন্দ্রিক নড়াইলের জনজীবন নদীকেন্দ্রিক পল্লীবাংলার প্রতিনিধি। নদীর সঙ্গে মানুষের নাড়ির সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে পাগলের চিন্তায়, ভোঁদড়টিকে পাওয়া নদীর দান বলে সে মনে করে। দেশভাগের যন্ত্রণাও স্মৃতিমেদুর নড়াইলের প্রকৃতি লেখকের ভাষায় ধরা পড়েছে—

"সেই চিত্রা নদী, বাঁধাঘাট আর আমাদের রতনগঞ্জ গ্রাম এখন বাংলাদেশ। সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। স্কুল-কলেজ, বিরাট জমিদারবাড়ি-স্টিমারঘাট আর মস্ত বড়ো হাট। স্বপ্নের মতো মনে পড়ে।"[১৩]

চরিত্র-চিত্রন, নামকরণ, প্রকৃতির রূপচিত্রণ, সার্কাসের বর্ণনায় 'ভোঁদড় বাবাজী' পশুকেন্দ্রিক গল্প ধারায় অনন্য। কিশোর মনের কৌতূহল সৃষ্টিকারি প্লট নির্মাণে স্রষ্টার মুন্সিয়ানার পরিচয় গল্পে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

তিন

শচীন্দ্রনাথের পশু-পক্ষী প্রীতির গল্পের অন্তরালে সমাজ জীবন রস ফল্গুধারায় বহমান। মার্কো ট্র্যাজিক পরিনতি পাঠকের মনকে অশ্রুসিক্ত করে তুলে। ভোঁদড়বাবাজীকে কেন্দ্র করে জীবন জীবিকা আবর্তিত, ভোঁদড়ের প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার চিত্রাঙ্কন করেছেন। প্যাঁচাকে কেন্দ্র করে বিশ্বাস সংস্কার ও বাস্তবতার ত্রিবেনী সঙ্গম ঘটেছে। গল্পগুলির মধ্যে মানুষের জীবনে পশু-পক্ষীর অবস্থানকে স্নেহ মায়া ভালোবাসার বন্ধনে কথারূপ দান করেছেন। স্রষ্টার বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা ও কল্পনার মেলবন্ধনে গল্পগুলি অমরত্বের দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ, 'শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প', সাহিত্যবিহার, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-জানুয়ারি, ২০১০, পৃ. ৩।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

৩. দাশগুপ্ত, সৌমিত্রশংকর, মার্কো, সুনীল দাশ (সম্পা.) 'শিলালিপি', ভাদ্র ১৪২৬ (জন্মশতবর্ষে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), পৃ. ১৯০।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ, 'শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প', সাহিত্যবিহার, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১২।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ, আমার সাহিত্যের পটভূমি, সুনীল দাশ (সম্পা.) 'শিলালিপি', ভাদ্র ১৪২৬ (জন্মশতবর্ষে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), পৃ. ৯১।

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ, 'শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প', সাহিত্যবিহার, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১১০।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩।

‘ক্ষত সারলেও দাগ থেকে যায়’-স্মৃতিযাত্রায় দেশ ও দেশভাগ

শীলা রাণী বসাক

সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রচারিত একটি সচিত্র সংবাদ সমাজের সংবেদনশীল মানুষকে নির্ঘুম রাতের মুখোমুখি করেছে এবং কিছু দর্শন ও শ্রুতিতে নির্ভর স্মৃতিকে উসকে দিয়েছে। আফগানিস্থানে তালিবানি শাসকের ক্ষমতা দখলের পর নাগরিক এবং অভিবাসীদের দেশত্যাগের ঢল। কেউ বা বিমানবন্দরের পাঁচিল টপকে উঠছেন, কেউ বা এরোপ্লেনের চাকার মধ্যে বসে পালিয়ে যেতে চাইছেন। পরিণামে মৃত্যুবরণ করছেন। এই ঘটনা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্য আগস্টের পরবর্তী সময়ের স্মৃতিকে মনে পড়িয়ে দেয়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ দীর্ঘ ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে আজ থেকে ৭৫ বছর বছর পূর্বে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু এ কেমন স্বাধীনতা ? এ তো দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা- যা জন্ম নেয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। একটি সঙ্গে দুটি দেশের অগণিত নরনারীকে করে তলে বাস্তুহীন। মধ্য আগস্টের সেই সন্ধিক্ষণে দুটি দেশের জনগণ আশায় ও আতঙ্কে দোলায়িত হয়েছে। কেননা এ তো কেবল স্বাধীনতা নয়, তা একই সঙ্গে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রদেশের জনতার কাছে পার্টিশন বা দেশভাগ। সদ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাভোগী পাঞ্জাব ও বাংলার সংখ্যালঘু জনগণের বেশ কিছু অংশ তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশত্যাগের। ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্থান রাষ্ট্রের পূর্ব অংশে জীবন, ধন, সম্ভ্রমের সুরক্ষার প্রশ্নটি হিন্দু জনগণকে তাড়িত করেছে দেশভাগের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনগণ কেউ স্বেচ্ছায় নতুন দেশে স্বপ্নের ভূমিতে রেওয়াজ বদল করে গেছেন, কেউ বা বাধ্য হয়ে গেছেন। যারা দেশান্তরিত হলেন তারা সকলেই যে নতুন দেশে সমাদৃত হলেন তা নয়। নতুন দেশে তাদের পরিচিতি হয়েছে ‘রিফুজী’ শব্দবন্ধে। নতুন ভূমিতে তাঁদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু জন্মভূমির টান উপেক্ষা করতে পারেননি তাঁরা। এপার বাংলা থেকে ‘উদ্বাস্তু’ হয়ে যাঁরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন তাঁদের স্বপ্ন, জীবন, সংগ্রাম, বঞ্চনা-প্রাপ্তি, আশা-হতাশা, ছেড়ে আসা দেশের কথা কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের স্মৃতিকথা, সেলিনা হোসেনের ‘যাপিত জীবন’, আবদুস সামাদের ‘সাড়ে তিন হাত ভূমি’ (উর্দু উপন্যাস ‘দো গজ জমিন’-এর বাংলা অনুবাদ) উপন্যাসে ধৃত হয়েছে। জীবনের প্রথম ষোলটি বছর

জন্মভূমি পশ্চিমবাংলার বর্ধমান জেলার যবগ্রামে কাটিয়ে ১৯৬০ সাল থেকে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণকারী কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের ধারাবাহিক স্মৃতিকহন- 'ফিরে যাই ফিরে আসি', 'উঁকি দিয়ে দিগন্ত', 'এই পুরাতন আখরগুলি' এবং 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি' (এই গ্রন্থটিকে লেখক নির্দিষ্ট কোনো সংরূপভুক্ত করেননি) গ্রন্থগুলিতে বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমি রাঢ়বঙ্গের মাটি, মানুষ, প্রকৃতির কোলে লেখক যেন ফিরে যেতে চেয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে লেখক জানান "দেশভাগ আমার কাছে ক্ষত স্বরূপ, ক্ষত সারলেও দাগ থেকে যায়"। তাঁর স্মৃতিকহনে চেতনার জন্মকাল থেকে শৈশবকাল পেরিয়ে কৈশোরকাল পর্যন্ত যেমন শারীরিক ও মনোজগতের বিকাশের কথা আছে, তেমনি আছে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবরণ। কৈশোরক ঘটনাবলি যা তাঁর মনে ছাপ ফেলেছে, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে সেই স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। যাঁরা এদেশ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গেলেন তাঁরা কীভাবে স্বাধীনতাকে গ্রহণ করলেন, দেশের নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্ণের জনগণের কাছে স্বাধীনতার স্বরূপ কী, স্বাধীনতার পূর্বের সমাজের গড়ন কেমন ছিলো, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিঘাত সমাজমানসে কীরূপ প্রভাব ফেলেছে, দেশভাগের ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ঘটেছে কিনা, আমজনতার কাছে ধর্মের চেয়ে যে ভাত বড়ো, লেখক ইতিহাসনিষ্ঠায় তা বর্ণনা করেছেন- যা বর্তমান প্রবন্ধের অলোচ্য বিষয়। লক্ষ লক্ষ 'উদ্বাস্তু', শরণার্থীর মতো তাঁকে শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি ঠিকই, কিন্তু ষোল বৎসর বয়সে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দেশান্তরিত হয়ে যে মানসিক কষ্ট তিনি পেয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গেই তিনি জানান "দেশান্তর ধর্মান্তরের চেয়েও বেশি"।[১] কেননা "দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর-বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে"।[২]

আগাছার মতো বেড়ে ওঠা বিস্ময়বিমুগ্ধ কিশোর আজিজুল সেই ছোট্টটি থেকে ছুটে চলেছেন। বর্ধমানের যবগ্রামের মাঠ-ঘাট-গাছপালা চষে ও চড়ে বেড়ানো, খেলাধুলায় পটু ছেলেটি দেখেছেন গ্রামে হিঁদু-মোসলমানের সহাবস্থান। লক্ষ করেছেন খাদ্য, পোষাক, নেশা এমনকি শব্দচয়নে সম্প্রদায়গত সামান্যভেদ থাকলেও তাদের মধ্যে সম্প্রীতিও কিছু কম ছিলো না। উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে 'সই পাতানো'র চল ছিল। লেখকের ঠাকুমার সঙ্গে কাশিমবাজারের মহারানি কাশীশ্বরীর সই পাতানো হয়েছিল। সেই সূত্রে মহারাজার ভাগ্নির ছেলে ভূতো, ননুর দাদা 'বন্‌দা' (বন্ধুদাদা) হয়ে ওঠেন লেখকের পিতা। হিন্দুদের নতুন চালের উৎসব 'নবান্ন'-এ সপরিবারে নিমন্ত্রিত হতেন লেখকের পরিবার। কথক দেখেছেন, গ্রামাঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায়ের পীরের ভক্ত ছিলেন পুত্রকামনাকাতর হিন্দু নারীরা। হিন্দুদের মা কালীর কাছে বৃদ্ধ মায়ের ভরণপোষণে অস্বীকৃত গোলামের মৃত্যুকামনাকারী মুসলিম গোলামের মাকেও দেখেছেন তিনি। লেখকও ভালোবাসেন চাল-কলা-দুধ-চিনি মিশ্রিত ঠাকুরের প্রসাদ খেতে। গ্রামের সকলেই ছিল সুখে দুঃখে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা। হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবহারের আলাদা আলাদা ঘাট থাকলেও, তারা একই পুকুরের জল ব্যবহার করতো।

দুর্গা পূজায় হিন্দুরা কখনই মসজিদের সামনে দিয়ে ঢাক-ঢোল-কাঁসি বাজাতে বাজাতে যেতো না।

ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ইত্যাদি নানা স্তরে সমাজজীবন বিভক্ত ছিল। বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকেও সমাজে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বাছবিচার কিরূপ প্রকট ছিল তার চিত্র লেখকের স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে। ননুকাকার মা কথকের পিতাকে পুত্রসম ভালোবাসেন, সেই সূত্রে ননুকাকার মা কথকের দিদিমা। সেই বাড়িতে গেলে কথকের হাতে দিদিমা দুটো নাড়ু অবশ্যই দেবেন কিন্তু স্পর্শ বাঁচিয়ে। মুসলমান বাড়ির সিধে গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত গ্রহণ করতে পারেন না। লেখক দেখেছেন, স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতমহাশয় তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রুতিলিখন সংশোধন করতে লেখকের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও মুসলমান ও নীচু জাত বলে তাঁর জিভে ঠেকানো পেন্সিল নিতে অস্বীকৃত হন। পরিণত বয়সে লেখকের উপলব্ধি "মানুষ কত কী যে সব উল্টো সিধে পুরে রাখতে পারে নিজের মধ্যে। কত কাজ করে অভ্যেসে অভ্যেসে ... সংস্কার আর ঘৃণা মোটেই এক জিনিস না"।[৩]

স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদাভেদ যে কেবল দুটি সম্প্রদায়ের ছিল তা নয়। হিন্দুদের মধ্যেও ছিল নানা স্তর বিভাজন। ব্রাহ্মণরা ছিল বর্ণশ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রের বিধানও তৈরি হতো বামুন ও কায়েতদের সুবিধানুযায়ী। গাজনের সময় যারা সন্ন্যাস নিত, উঁচু জাতের ব্রাহ্মণদের ও কায়স্থদের কেবল পুকুরে স্নান করে দণ্ডি কেটে শিবতলায় গেলেই হত। তাদের জিভ ফোঁড়া শাস্ত্রে নিষেধ। জিভ ফুঁড়বে তেলিরা। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও 'ভালো বামুন' ও 'দৈবজ্ঞ বামুন' ভেদ ছিল। 'ভালো বামুন' সমাজের সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র- তা তারা শিক্ষা, সম্মান, পরিচ্ছন্নতা ও বয়সে যতই হীন হোক না কেন! শুধুমাত্র বর্ণশ্রেষ্ঠ হওয়ার সুবাদে কথকের পাঠশালার সহপাঠী ক্ষুদিরাম ওরফে খুদে, যার "গায়ের চামড়া ফাটা ফাটা, খড়ি উঠছে, চকখড়ির মতো সাদা ধূলো সারা গায়ে, দুই হাতের দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে খোস আর পাঁচড়া, ক্ষারে কাচা জামাটায় ধূলোর এমন পরত পড়েছে যে পালংশাকের বীজ ছড়িয়ে দিলে চারা গজিয়ে যাবে"[৪] –সেও বামুনের পৈতের জোরে গায়ের 'ধেড়ে ধেড়ে' বুড়ো মানুষদের প্রণাম পেত পা ছুঁয়ে।

দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিম্নবর্গের হাড়ি, বাগদি, নাপিত পাড়ায় অ-বৈদিক দেবদেবীর পুজোর ভার পেত। নিম্নবর্ণের মানুষদের কোনো সামাজিক সম্মান তো ছিলই না, উপরন্তু এদের গ্রামে বাস করার অধিকারও ছিল না। যথার্থই এরা ছিল প্রান্তবাসী তা লেখকের নজর এড়ায়নি। গ্রামের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল 'ভদ্রলোক'এর কাছেই এরা জোড়হস্ত, নতমস্তক- "মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দির/ বেদনার করুণ কাহিনী"[৫]

লেখক গ্রামে মুসলমানদের মোল্লাদের সঙ্গে শেখেদের বিবাদ, দাঙ্গা। সেই মারামারি আদালত পর্যন্ত গড়াত। এইরকম ছিল বিংশ শতাব্দীর গ্রাম বাংলার সমাজের

স্থিতি। জমিদারী ব্যবস্থা ছিল। সেই ব্যবস্থা কায়েম রাখতে জমিদারদের লেঠেল বাহিনী থাকত। এই লেঠেলরা বাস করত ধারাসোনা নামক মুসলিমদের গ্রামে। হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে যেকোনো জমিদারের ডাকেই তারা প্রস্তুত থাকত।

সুখে-দুঃখে, ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে প্রায় ৭০০ বছর 'একই বৃন্তের দুটি কুসুম'-এর মতো বাস করেছে হিন্দু ও মুসলমান। সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা তাদের মধ্যে ছিল, কিন্তু বিদ্বেষ ছিল না। একটা সামাজিক বোঝাপড়া ছিল। হিন্দুবাড়িতে মুসলিম অতিথি এলে তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করা হতো প্রতিবেশী মুসলিম বাড়িতে। এর উল্টোটাও ঘটত। লেখক উল্লেখ করেছেন তাদের বাড়িতে হিন্দু আতিথির খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ননুকাকাদের বাড়িতে হতো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভাঙন শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক ভারতে। ইংরেজ শাসকের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি এই ভাঙনের সুচিছিদ্র পথকে করেছে ফাল প্রশস্ত পথ। নবাবের থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ায় বিজাতীয় ঘৃণা ও স্বজাতীয় অহংকারমত্ত হয়ে মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজ সংস্পর্শ ও তাদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অনেককাল নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। পরে মোহভঙ্গ ঘটলেও তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সাংগঠনিক চরিত্র অর্জন করেছে। ইংরেজ আমলে যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে জাতীয় পুজিঁর বিকাশ ঘটে। জাতীয় পুঁজির সম্প্রসারণের এই যুগে ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন চলার মাধ্যমে জাতি গঠনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। তৎকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধর্মকে হাতিয়ার করে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ প্রচার করতে থাকে। ফলত ধর্মীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদ অভিব্যক্ত হয়েছিল হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনবাদের মধ্যে। ব্রিটিশ শাসক হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদের স্বাধীনতার দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য "মরণোন্মুখ মুসলমান সামন্ততন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ল। মরন্ত সামন্ততন্ত্রকে বাঁচানো সম্ভব হল না কিন্তু তারই ধ্বংসাবশেষের উপরে নতুন মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর গোড়াপত্তন হল"।[৬] তারই প্রতিক্রিয়ায় ফল হিসেবে নবোদ্ভুত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম মানসে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতি ঝোঁক হলো প্রবলতর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে যে নতুন জমিদারশ্রেণির জন্ম হল, তাতে করে বাংলার কৃষিনির্ভর জনগণ অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক অবজ্ঞা সহ্য করছিল। মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার লাভের জন্য পৃথক দল 'মুসলিম লীগ' গঠন করে। আমাদের দেশের হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারা এই বিপদের কারণ বিশ্লেষণ না করেই স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে নিয়ে আসতে পারলেন না। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ এটা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করা ছাড়া গান্ধীজীর আর কিছুই করার রইল না। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের এই বিচ্যুতি লক্ষ করে বলেছিলেন— "হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে

বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু-স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই"।[৭] রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, কেবল মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে নয়, "লোকসাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা"।[৮] কেননা শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভারতবর্ষকে 'ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ' বলেই জেনে এসেছে।

পরিণতিতে দুই সম্প্রদায় রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছে। কথক কিশোর আজিজুল পাঠশালার বন্ধু সুবলের মুখে শুনেছেন, রায়েদের লক্ষীদা কলকাতায় মোসলমানের হাতে কাটা পড়েছে। কলকাতার এই দাঙ্গার রেশ গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে। লেখক এই দিনগুলিকে 'সূর্যি নেভার দিন' বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'সূর্যি নেভার দিনে' আট বৎসরের আজিজুল দেখেছেন— "কারও চোখে হিংসা, কারও কথায় হিংসা, কেউ বলছে নেড়েদের আর এদেশে জায়গা নেই, কেউ বলছে, একজন কাফেরকেও আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না"[৯]। আহত হয়েছেন যখন দেখেছেন দাশু পণ্ডিতের পাঠশালার সহপাঠী বলা আজিজুলকে মাথায় নিয়ে ঘুরছে দেখে অপর সহপাঠী 'বামুন'দের খুদে হিরণপুরের হাটের মোষের মতো লালচোখে বলে ওঠে— "হাঃ, নেড়ের বাচ্চাকে মাথায় তুলেছে"[১০]। পরিস্থিতি এমন যে বাতাসেও বিষ। আর সেই বিষে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষের ব্যক্তিপরিচয়, সম্পর্ক তলিয়ে যেতে দেখেছেন। জেগে উঠেছে একটাই পরিচয়— 'শুধু হিঁদু আর মুসলমান'। আর তাই ননুকাকা কথকের পিতাকে ভালোবাসা সত্ত্বেও খুনের পরিকল্পনা করতেও দ্বিধা করেন না।

এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা আসে। কিন্তু তা দ্বিখণ্ডিত। লেখক দেখেছেন এই স্বাধীনতা উৎসবে যবগ্রামের মুসলিমরা কেউ অংশগ্রহণ করেনি এক কথকের পিতা ছাড়া। আর গ্রামের হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোকদের' মনেই হয়নি হাড়ি, ডোম, মুচি, বাউরি, বাগদিদের সামিল করতে। কেননা তাদের যুক্তি— "হ্যাঃ, মুচিপাড়া, বাউরিপাড়ায় আবার দেশ স্বাধীনের গান"[১১]। একখন্ড যবগ্রাম সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিমূর্তি।

লেখক সেই কৈশোরেই দেখেছেন, এই স্বাধীনতা সম্পর্কে আমজনতার তেমন উল্লাস নেই। মুসলমান, হিন্দু নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কারোরই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। লেখক উল্লেখ করেছেন কালো ভট্টাচাযের কথা— 'চতুবগগ লাভ হয়েছে আর কি!' আসলে এই স্বাধীনতা আমজনতার সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক মুক্তি কতখানি দিতে পেরেছে তা কালো ভট্টাচার্যের উক্তিতে স্পষ্ট হয়েছে। এই স্বাধীনতা যা দুই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাধ্য করেছে জন্মভূমি পরিত্যাগ করতে। লেখক সেই লক্ষ লক্ষ জনতার একজন যাঁর হৃদয়ের দেশভাগজনিত ক্ষতের দাগ এখনও স্পষ্ট। তাই প্রৌঢ়ত্বে উপনীত লেখক হৃদয় নিংড়ে লেখেন সময়-সমাজ-মানুষের

আখ্যান ‘আগুনপাখি’।

তথ্যসূত্র :

১. হাসান আজিজুল হক, চালচিত্রের খুঁটিনাটি, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম পরিমার্জিত দে’জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, মাঘ ১৪১৫, পৃষ্ঠা ৪৮।

২. হাসান আজিজুল হক, শ্রেষ্ঠ গল্প, অনুষ্টুপ, কলকাতা ০৯, বইমেলা ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৫৬।

৩. হাসান আজিজুল হক, এই পুরাতন আখরগুলি, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪৪।

৪. হাসান আজিজুল হক, ফিরে যাই ফিরে আসি, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, মাঘ ১৪১৮, পৃষ্ঠা ৭৭।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০৬, পৃষ্ঠা ২১৯।

৬. রফিকুল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ , বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৫, পৃষ্ঠা ৮।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ পৌষ ১৩৫৫, পৃষ্ঠা ৩১।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৩২।

৯. হাসান আজিজুল হক, ফিরে যাই ফিরে আসি, তদেব, পৃষ্ঠা ১১৭।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৩।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা ২২৪।

মনোজ মিত্রের ‘চাক ভাঙা মধু’ : নারী চরিত্র

অরূপ সিং

‘চরিত্র’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো আচরণ বা ব্যবহার। কিন্তু চরিত্র বলতে আমরা কি বুঝি ? এ প্রসঙ্গে নাট্যকার পিরাণ দেল্লো বলেছেন— “যদি কোন ঘটনা বা তার অন্তর্গত ভাবকে আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হয়, তাহলে একটি স্বাধীন মানবীয় ব্যক্তিত্ব দরকার। ঐ ঘটনার চালক-শক্তিই হল চরিত্র।”[১] আবার মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে চরিত্র হলো মানুষের অন্তর্নিহিত কতগুলো ভাব ও বিশ্বাসের সমষ্টি-মাত্র, যার দ্বারা সে নিজের সঙ্গে ও বাইরের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলে। আবার অনেকের মতে চরিত্র হল নাটকের প্রাণ, তাই নাটকের মুখ লক্ষ্য। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিত্ব, ক্রমবিকাশ, নাটকের মূলস্রোতের সঙ্গে তার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ও নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা, চরিত্রের অন্তঃসংগতি, বাইরের নানা ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া— প্রভৃতি দিক সমালোচকের বিবেচ্য। চরিত্রের আন্তর ব্যক্তিত্ব ও নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতার সঙ্গে তার Action এবং সংলাপের সংগতির দিকটিও এই প্রসঙ্গে গুরুত্ব পায়। নাট্যকারের প্রতিভা ও তাঁর স্বকীয়তার প্রমাণও এর মধ্যে মেলে । তাই নাটকের মূল বক্তব্য ও ভাবগত দিকের সঙ্গে চরিত্রকে মিলিয়ে দিতে হয়।

অ্যারিস্টটল নটকীয় চরিত্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। প্রথমত, চরিত্র ভালো হবে। দ্বিতীয়ত, সে যথার্থ হবে। তৃতীয়ত, চরিত্র বাস্তব হবে। চতুর্থত, চরিত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। অ্যারিস্টটল তাঁর রসসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে চরিত্রের যে লক্ষণগুলির কথা বললেন সেগুলি চিরকালের নাটকীয় চরিত্র সম্বন্ধেই মোটামুটি প্রযোজ্য। নাটকের মধ্যে অনেক চরিত্র থাকতে পারে, কিন্তু নাটকের গতি প্রধানত একটি বা দুটি প্রধান চরিত্রকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয় এই প্রধান চরিত্রের উপর নাটক অনেকখানি নির্ভর করে বলেএই চরিত্ররূপারণেনাট্যকারের বিশেষ দক্ষতারপরিচয় দিতে হয়। এই চরিত্র যত বেশি পরিমাণে নাটকের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হবে ততই নাটক জমে উঠবে।

নাট্যকার মনোজ মিত্রের অন্যতম নাটক হল ‘চাক ভাঙা মধু’। নাটকটি ১৯৬৯ সালে রচিত হলেও পুনর্লিখিত হয়ে ১৯৭১ সালে ‘এক্ষণ’ পত্রিকার প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার দু’দশক পর অর্থাৎ যাটের দশকের একেবারে শেষের দিকে লেখা। মনেজ

মিত্র যে সময়ে এই নাটকটি রচনা করেন তখন নকশাল আন্দোলন হয়ে গেছে। রাজ্যজুড়ে তখন দেখা দিয়েছে খাদ্যের জন্য আন্দোলন। শহীদ হয়েছে প্রায় ৮১ জন কৃষক। ১৯৬২ সালে ভারত রক্ষা আইন চালু হওয়ায় উত্থান হয় এক নতুন শ্রেণির— যারা জোতদার-জদিরার-মজুতদার ও মহাজন। সারা দেশে এরাই শুরু করে কলোবাজারি। ফলে গোটা দেশ জুড়ে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম খাদ্যসংকট এবং খাদ্য আন্দোলন। যার ফলে গ্রাম ও শহরের মানুষ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই সংগ্রামের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায় বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ও 'দেবীগর্জন' নাটকে। 'দেবীগর্জনে'র (১৯৬৬) প্রায় তিন বছর পর রচিত হয় 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯)। এই নাটকে 'দেবীগর্জনে'র মতো কৃষক-জমিদার বা জোতদারদের প্রত্যক্ষ কোনো সংগ্রাম নেই, কিন্তু শোষকের প্রতি শোষিতের ক্রোধ-ঘৃণা এবং তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসহ শ্রেণিগত সমস্যার প্রতিফলন আছে। নাটকটি সুন্দরবন অঞ্চলের কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক ওঝা–পরিবারের কাহিনি নিয়ে লেখা। নাটকের দুটি অঙ্কে নাটকের বিষয়বস্তু— শোষক ও শোষিতের প্রতিবাদী ভাবনায় শোষণের অবসান।

এখন আমাদের আলোচ্য 'চাক ভাঙা মধু' নাটকের নারী চরিত্রগুলি। নাটকে মোট চরিত্রের সংখ্যা হল দশ। এর মধ্যে পুরুষ চরিত্র আটটি এবং নারী চরিত্র দুটি। দুই নারী চরিত্র হল যথাক্রমে বাদামী ও দাক্ষায়ণী।

বাদামী :

'চাক ভাঙা মধু' নাটকে যে দুটি নারী চরিত্র আছে তার মধ্যে বাদামী চরিত্রটি অন্যতম। নাট্যকার নাটকে তার আবির্ভাবের পরিচয়টি দিচ্ছেন এইভাবে— "দাওয়ায় শরীর এলিয়ে ঘুমুচ্ছে বাদামী। তার ক্লান্ত কালিপড়া চোখে মুখে কি অসম্ভব হলদে নিষ্প্রাণতা। বাদামী চোখ মেলে, হাই তোলে।"[২] গ্রামের ওঝা মাতলার একমাত্র কন্যা বাদামী। সে পাঁচ মাসের সন্তানসম্ভবা। স্বামী বিচ্ছিন্না হয়ে আজ অভাবী বাবার সংসারে আশ্রয় নিয়েছে। দিনের পর দিন ঠিক ভাবে খেতে পায় না সে। তাই তার শরীর অবসন্ন, ক্লান্ত। আর এই খাবারের জন্য সে তার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে। বাদামীর কথায়—

"বাদামী।। যাবার সময় বলে গেলে ভাতের জোগাড় না করে তুমি আর ফেরবা না! ... সারাটা বেলা কুথায় ছিলে গো ... আমি যে পথে পথে তোমারে কতো খুঁজে বেড়ালাম!'[৩]

বাদামীর একথা শুনে মাতলা তাকে বলে—

"মাতলা।। কেনে? পথে পথে ঘুরলি কেনে? তোরে না বলিচি অতো লড়া-চড়া না করতি! প্যাটেরডারে মারবি!"[৪]

বাদামীর মধ্যে প্রচণ্ড খিদের জ্বালা থাকলেও সে তার পেটের সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখে। তাই দুটো খাবারের জন্য বাবার খোঁজে সে পথে বেরিয়েছিল। আসলে তার বাবা নিজেও তিনদিন কিছু না খেয়ে খাবারের খোঁজে বেরিয়েও কোনো

খাবার পায়নি। ফলে জঙ্গল থেকে ফেরার পথে হাঁটার সময় সে এক গোখরো সাপ ধরে কলসিতে ভরে বাড়ি নিয়ে আসে। বাড়িতে এসে সে বাদামীকে বলে— গাছে উঠে চাক ভেঙ্গে মধু এনেছে। বাবা মধু এনেছে শুনে দু-রাত্রি কিছু না খাওয়া বাদামীর চোখে-মুখে লোভ উপচে পড়েছে। সে কোনো কিছু ভ্রুক্ষেপ না করে দ্রুত কলসির কাছে এগিয়ে যায়। তার পেছনে পেছনে যায় বৃদ্ধ জটা। বাদামী দড়ি খুলে কলসির ঢাকাটা সরাতেই তীব্র চিৎকার করে সে দূরে সরে আসে। জটা চিৎকার করে বলে— 'গোক্ষুর! গোক্ষুর!' অর্থাৎ মাতলা মধুর বদলে নিয়ে এসেছে গোখরো সাপের বাচ্চা। অবশ্য খাওয়ার জন্য নয়, পোষ মানানোর জন্য। বাবা মিথ্যে কথা বলেছে তাই খিদের জ্বালায় কাতর বাদামী রাগে মাতলার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দু-হাত দিয়ে তার চুল টেনে ধরে। আর মাতলা সহসা ঘুরেই বাদামীর গালে একটা চড় দিয়ে বলে—

"মাতলা।। আবাগের বিটি! জন্মের মত বাক্ বন্ধ হয়ে যাক তোর! ... দেখতে পাসনে আমার অবস্থা! বুকির পরে ভর দে ঘষটে ঘষটে চলিচি এট্টা সরিস্রেপোর মতো ... কেনে, ভাতার তোরে আমার ঘাড়ে তুলে দে গেছে কেনে?"[৫]

বাপ-মেয়ের এই ঝগড়ার সময় জটা খবর নিয়ে আসে গ্রামের অত্যাচারী মহাজন অঘোর ঘোষকে সাপে কেটেছে। এই খবর শুনে মাতলা-জটারা আনন্দ করলেও বাদামী চুপ থাকে। সে তার বাবাকে স্মরণ করিয়ে দেয় একজন ওঝার কী কর্তব্য। তাই অঘোর ঘোষ যতই তাদের শত্রু হোক, সে এও জানে অঘোর ঘোষের জন্যই আজ তাদের দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে হয়, তা সত্ত্বেও বাদামী নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। সে দাক্ষায়ণীর কাছে গিয়ে বলে বাবাকে বিষ ঝাড়ানোর জন্য সে রাজি করাবে। আসলে তার মনে হয় যখন কেউ বিপদে পড়ে তখন তার সঙ্গে শত্রুতা না করে বিপদের সময় তার পাশে দাঁড়াতে হয়। আর এখানেই বাদামীর মানবিকতা অনন্য। একজনের প্রাণ নেওয়া তার কছে পাপের তুল্য। তাই সে তার বাবাকে বিষ ঝাড়িয়ে অঘোর ঘোষকে বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু মতলা কিছুতেই রাজি হয় না। সে বলে, যে আমার সবকিছু গ্রাস করেছে আমি তার বাড়ি ঝাড়াতে যাবো না। মাতলার কথায় সায় দেয় বৃদ্ধ জটাও। তখন বাদামী বলে ওঠে—

"বাদামী।। তোমরা মানুষ না আর কিছু ...।"[৬]

এরপর দাক্ষায়ণী ও শঙ্কর আসে। তারা মাতলা ও জটার কাছে কাতর স্বরে অনুনয় বিনয় করে। কিন্তু তাতেও তারা যেতে রাজি নয়। তারা বলে, কত্তামশায়ের দেহ ভেলায় চাপিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিতে। নদীর পাড়ে অনেক বড়ো বড়ো গুণিনেরা বাস করে। তাদের নজরে পড়লে কত্তামশাই বেচে যাবে। বাবার মুখে এই কথা শুনে বাদামী বাইরে থেকে এসে চিৎকার করে বলে—

"বাদামী।। কী করে বলতি পারলে তুমি গাঙে ভাসানোর কথা? কী করে উচ্চারণ করতি পারলে মুখি? (বাদামী শঙ্করকে দেখে ঘোমটা দেয়) ভয় পেয়ো না

গো দাদাবাবু, আমার বাপ যতোক্ষণ আছে, আপনার বাপের কোনো ভয় নেই।"[৭]

মেয়ের কথাতেও যখন মাতলা রাজি হল না তখন দাক্ষায়ণী বাদামীকে কচ্ছপ আর শোলমাছ দিতে চায় এবং সঙ্গে টাকাও। শঙ্কর বাদামীকে কথা দেয় তার বাবাকে বাঁচিয়ে তুললে তাদের আর কোন অভাব থাকবে না। এমনকি বাদামীকে স্বামীর ঘর পাঠানোর সব ব্যবস্থা সে করে দেবে। বাদামীকে আরও বোঝায় খিদের জ্বালায় তার পেটের বাচ্চাটাও মারা যাবে। এমন সময় দাক্ষায়ণী কাপড়ের থলি থেকে চকচকে গোল টাকা বার করে। জটা ছুটে গিয়ে দাক্ষার হাত থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে বলে—

"জটা।। আহা ট্যাকা লিয়ে কোনো কথা নেই। সে তুমি ট্যাকা দিলেও কি, না দিলেও কি... কত্তারে তো আমাদের বাঁচাতিই হবে! নাকি, বল মাতলা... আর কটা ট্যাকা লাগবে কিন্তুক।"[৮]

টাকা নিবে অথচ অঘোর ঘোষকে বাঁচাবে না, এটা মাতলার বিবেকে খুব বাঁধে। তাই সে টাকা নিতেও রাজি নয়। কিন্তু বাধ সাধে বাদামী। সে ওঝা ধর্মের কর্তব্য সম্পর্কে মাতলাকে সচেতন করে। তার কথায়—

"বাদামী।। জানো না, ওঝার কানে খবর গেলি ছুটে যাতি হয় রুগীর ঠাঁয় ?"[৯]

পিতা ও কন্যার এমন কথোপকথনে গ্রামের চাষী ফুকনা প্রতিবাদ করে ওঠে। সে বলে—

"ফুকনা।। গাঁর এতো গুলান মান্‌ষেরে মেরে নিজেরা যদি বাঁচতি চাস, ভালো হবে না, এই কয়ে দিলাম।"[১০]

প্রত্যুত্তরে বাদামী বলে—

"বাদামী।। আমরা ওঝাগিরি জানি, তুমরা জানো না, এমন কালে তুমরা কত্তার কাজে লাগো না, দুটো পয়সা কামাতি পারো না। তাই বুঝি সব মোচড় মারো ?"[১১]

যাইহোক বাদামী আঘোর ঘোষকে বাঁচাতে অনড়। সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়— যদি তার বাপ না ঝাড়ায় তবে সে নিজেই ঝাড়াবে। তার কথায়—

"বাদামী।। পুণ্যি কাজে ক্ষেতি হয় না গো... উয়াতে ঘরে আলো আসে।"[১২]

তবে একটা সময় বাদামীরও মনে হয়েছিল তার বাবা, ঠাকুর্দারা ঠিক পদক্ষেপই নিয়েছে। তাদের ধারণা ছিল অঘোর ঘোষ বেচে গেলে সে আবার নিজের মূর্তি ধারণ করবে। কারণ সে জাত কেউটের বাচ্চা, ছোবল তো মারবেই।

যাইহোক নাটকের শেষে দেখা যাবে সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। কেননা বিষ ঝাড়ানোর জন্য বাদামী তার বাবাকে রাজি করাবে। মাতলা বিষ ঝাড়িয়ে অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে তোলে। পরক্ষণেই মাতলাদের সংশয় সত্যি হয়। জীবন ফিরে পেয়ে অঘোর আবার স্বমূর্তি ধারণ করে। মাতলাকে মারার জন্য বেহারাদের আদেশ দেয়। বাদামীকে দেখে তার হীন লালসা জেগে ওঠে। বাদামী তখন বুঝতে পারে হিংস্র জন্তুকে বাঁচিয়ে রাখা মানে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। তাই সে নারী সুলভ আচরণের আশ্রয় নেয়। অঘোর ঘোষকে মধু খাওয়ানোর বদলে গোখরো সাপ রাখা কলসি নিয়ে

এসে বলে—

"বাদামী।। কেনে দেবো না, আমার বাপ তুমারে পেরান দিতি পারলো, আর এট্টু মধু দিতি পারবে না। খাও, খেয়ে ঠান্ডা হও...।"[১২]

কিন্তু বাদামী যখন জানতে পারে তার বাবা সাপটাকে মেরে ফেলেছে। ঠিক তখনই সে উন্মত্ত পাগল হয়ে ওঠে। ছুটে গিয়ে অঘোরের হাত থেকে কলসিটা কেড়ে নিয়ে দড়াম করে উঠোনে ফেলে ভাঙে। হাতে তুলে নেয় কচ্ছপ ধরা সড়কি। গর্জন করে ছোটে অঘোরের দিকে। অঘোর পালাতে গেলে গ্রামবাসীরা তাকে ঘিরে ফেলে। অঘোর আলের ওপর পড়ে যায়। বাদামীও আলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সড়কি দিয়ে অঘোরকে বধ করে। তখন গ্রামবাসীরা চারপাশ দিয়ে চিৎকার করে, মার মার শালারে... মার মার।

নাটকের ভূমিকায় পবিত্র সরকার লিখেছেন— "বাদামীর এই কাজ শ্রেণীসংগ্রামকে সাহায্যই করে, তা শ্রেণীসংগ্রামের মূল লক্ষ্যকেই সমর্থন জোগায়।"[১৪]

দাক্ষায়ণী :

মনোর মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে অপর নারী চরিত্রটি হল দাক্ষায়ণী। নাটক থেকে আমরা জানতে পারি দাক্ষায়ণী হল অঘোর ঘোষের ধর্ম বোন। নাট্যকার নাটকে তার আবির্ভাবের বর্ণনাটি দিচ্ছেন এইভাবে—

"দূর থেকে মাতলাকে ডাকতে ডাকতে তীরের মতো ঝুটে এল দাক্ষায়ণী ঠাকরুন। বয়স সঠিক জানা যায় না, তবে যৌবনোত্তীর্ণ, তবু নানা দিকে সক্ষম, একটু বেটপকা লম্বা। ধবধবে সাদা থানের ওপর সরু কালো পাড়টা দাক্ষায়ণীর দেহে সাপের মতো কিলবিলিয়ে উঠেছে। মুখখানা দেখলে সারাক্ষণ একটা গোপন কেলেঙ্কারির কথা মনে পড়ে।"[১৫]

দাক্ষায়ণী শব্দের অর্থ হল সতী অর্থাৎ দেবী। কিন্তু যৌবনোত্তীর্ণ বলতে তিনকাল পেরিয়ে গিয়েছে। আর সরু কালো পাড়ের ওপর সাদা ধবধবে থানটি তার বিধবা হওয়ার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে। নাটকে নাট্যকার তার শৈশব, কৈশোর বা যৌবনকাল-এর বিষয় নিয়ে কোনো উল্লেখ করেননি। তবে তার যে একবার বিবাহ হয়েছিল এবং অঘোর ঘোষ যে তাকে বোনের চোখে দেখে তা দাক্ষায়ণীর কথাতেই বোঝা যায়। অঘোর ঘোষকে সাপে কাটলে দাক্ষায়ণী মাতলা-জটাদের কাছে এসে বলে—

"দাক্ষা।। ওরে দেখতে দেখতে কী সব্বোনাশ হয়ে গেলো রে! কেউ আমরা একটু বুঝতে পারিনি। ভালোমানুষ ঘুমুচ্ছে, ... ওমা, আমি রোদ পড়তে ছানাটুকু কেটে ডাকতে গিয়ে দেখি... ওরে কী সব্বোনাশ হলো রে, দাদা যদি আর আমার না বাঁচে...। বল্ ওরে তোরা বল্। গাঁয়ের কতোবড় একটা বল-ভরসা ছিলেন তুই বল্ জটু। অথচ দ্যাখ আজ তার এই বিপদ। আর সারা গাঁয়ে একটা লোক পাওয়া গেলো না। যাকে দিয়ে তোদের একটু খবর পাঠাবো...।"[১৬]

আবার

"দাক্ষা।। (মৃত্যু শোকাতুর উন্মাদিনীর মত ইনিয়ে বিনিয়ে) ও দাদা মাত্তর ক-টা ঘন্টা আগেও যে বুঝতে পারিনি আমার কপাল এমন করে পুড়ছে রে! দাদারে! তুমি যে কতো ছোটবেলায় তোমার দাক্ষারে বিষ্টুপুরের বাড়ি থেকে তুলে এনেছিলে রে... বাল্যবিধবার চোখের জলে সেদিন যে তোমার বুক ভেসে গিয়েছিলো রে... দাদারে... আজ পর্যন্ত কেউ যে কোনদিন বুঝতে পারেনি তুমি আমার নিজের ভাই নারে— সেই এতোটুকু বয়েস থেকে তুমি যে আমারে কোনোদিন স্বামীর ব্যাথা কারে বলে বুঝতে দাওনি রে... দাদারে...।"[১৭]

অঘোর ঘোষ দাক্ষায়ণীকে বোন বলে বাড়িতে ঠাঁই দিলেও আসলে দাক্ষায়ণী ছিল অঘোর ঘোষের রক্ষিতা যাকে অঘোর যৌনদাসী হিসেবে রেখেছে। যাইহোক দাক্ষায়ণী-ই অঘোরের সাপে কাটা প্রাণহীন দেহ মাতলা ওঝার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে। বিষ তোলার জন্য কতরকমভাবে অনুনয়-বিনয় করেছে। মাতলা রাজি না হওয়ায় তার মেয়ে বাদামীকে নানান প্রলোভন দেখিয়ে রাজি করায়। রক্ষিতা বলে অঘোর এর পুত্র শঙ্কর তাকে পিসির সম্মানটুকুও দেয়নি। নাটকের শেষে আমরা দেখব দাক্ষায়ণীর চেষ্টাতেই অঘোর ঘোষ বিষমুক্ত হয়। যে দাক্ষায়ণী অঘোর এর জন্য এত ভাবে অঘোর ঘোষ বিষমুক্ত হওয়ার পর তাকেই অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। আর অঘোর ঘোষ সম্পর্কে দাক্ষায়ণীর ভাবনা এইরকম—

"দাক্ষা।। হাজার দিন বলেছি সাবধান হও, ওগো সাবধান হও। তোমার কি শত্রুরের অভাব! যে দিকটা না দেখবো সে দিকেই একটা কান্ড বাঁধিয়ে বসবে। বলি, কি এমন হাতিঘোড়া কাজটা করতে হয় গো তোমায়, যে নিজের দিকটাও সামলাতে পারো না। ... সেই সেবারে, গোলাবাড়ির চালে উঠে আর নামতে পারো না, ... টিনের চালে সরাৎ সরাৎ পা হড়কাচ্ছে... কী কান্ড! কদ্দিন বলেছি দালানের মেঝেতে শুয়ো না, ওখানে পাঁচশোখানা বস্তা ডাঁইকরা, ভেতরে কোথায় কি ছুঁচো ইঁদুর ... না, আমি শোবো! পাহারা দেবো! কেন, পাহারা আমরা দিচ্ছিনে? না, আমি দেবো। যেটা বারণ করবো, সেটা করবে। (অভিমানে দাক্ষার চোখে জল, কণ্ঠ বিকৃত) নিজে তো দিব্যি চলে যাচ্ছিলে, কে কোথায় কিভাবে পড়ে থাকলো ফিরেও দ্যাখোনি। তোমার জন্যে কি ঝড়টা যে বয়ে গেছে এই মেয়ে মানুষটার ওপর দিয়ে...।"[১৮]

যার জন্য আজ অঘোর প্রাণ ফিরে পেল আজ তাকেই 'বুড়ি', 'রাঁড়ী'— ইত্যাদি বলে অঘোর গালাগাল দিচ্ছে। যাইহোক নাটক শেষে অঘোর ঘোষের প্রতিক্রিয়া ও দাক্ষায়ণীর পরিণতি আমাদেরকে হতাশাও করে না, অবাকও করে না। কারণ, অঘোর ঘোষের কাছে এই আচরণ অতি স্বাভাবিক। যুবতী বাদামীকে পেলে তার 'দাসী' ও 'যৌন দাসী' উভয় প্রয়োজনই মিটবে। তাই আজ আর তার কাছে দাক্ষায়ণীর কোনো প্রয়োজন নেই। দাক্ষায়ণীর বিধ্বস্ত বসন, তার প্রতি শানানো বিদ্রুপ পাঠক-দর্শকের কাছে করুণা বা সহানুভূতি উদ্রেক ব্যর্থ হয়।

শেষে বলা যায়, নাটকে দুটি নারী চরিত্র বাদামী ও দাক্ষায়ণী। দু'জনের মধ্যে সামাজিক শ্রেণিগত ব্যবধান অনেক। যেহেতু এটা শ্রেণিসংগ্রামের নাটক তাই এদেরকে পরস্পর পরস্পরের শ্রেণিশত্রু বলা যেতেই পারে। অবশ্য নারীর সামাজিক অবস্থান বিচারে এরা দুজনেই 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'। দাক্ষায়ণীর স্বামী মারা গেছে এবং বাল্যবিধবা দাক্ষায়ণী অঘোর ঘোষের পরিবারে আশ্রিতা। আবার অন্যদিকে বাদামীর স্বামী থেকেও নেই। টাকার অভাবে তার স্বামী পাঁচমাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে রেখে গেছে। তাই অভাবের সংসারে নতুন প্রাণের আগমন একেবারেই আনন্দজনক নয়। ফলে স্বামীহারা দাক্ষায়ণীর থাকা আর বাদামীর স্বামী-ছাড়া থাকার ভেতরে খুব একটা বিস্তর পার্থক্য নেই। সেদিক থেকে দেখলে দুটি চরিত্রের মধ্যেই সম্ভাব্য বিপ্লব দেখা গিয়েছিল। বাদামী যেভাবে আলের ওপর সড়কি চালিয়ে অঘোর ঘোষকে হত্যা করে, তাতে তার মধ্যে একটা বীরাঙ্গনার ঝাঁঝ লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে দাক্ষায়ণী একবার জ্বলে উঠলেও দাউ দাউ করে জ্বলতে পারেনি। কারণ তাকে দেখলে শঙ্কর ঘৃণা করে। অঘোর ঘোষ 'বুড়ি', 'রাড়ী' বলে ভৎর্সনা করে। কাজেই বাদামীর বিপ্লব সফল হলেও দাক্ষায়ণীর বিপ্লব সফল হলো না।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর, নাট্যতত্ত্ব বিচার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৮০।

২. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫।

৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৫। ৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৫। ৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৮।

৬. ঐ, পৃষ্ঠা ১২।

৭. ঐ, পৃষ্ঠা ১৪।

৮. ঐ, পৃষ্ঠা ১৮।

৯. ঐ, পৃষ্ঠা ১২।

১০. ঐ, পৃষ্ঠা ২৩।

১১. ঐ, পৃষ্ঠা ২২।

১২. ঐ, পৃষ্ঠা ৪০।

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৭।

১৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৭।

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা ১৩।

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা ১৩।

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা ২৫।

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩।

গান্ধীজী : স্বরাজ ও রামরাজ্যবাদ

ড. চন্দন মণ্ডল

সারসংক্ষেপ :

গান্ধীজী শুধু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোষহীন সংগ্রামী ছিলেন না। ভারতাত্মার স্বরূপ অনুধাবনেও তিনি ছিলেন অনন্য। স্বরাজ বলতে তিনি শুধু রাজনৈতিক মুক্তিকেই বুঝতেন না— চেতনার দাসত্ব মুক্তির বিষয়টিও তার কাছে অগ্রাধিকার পেত। স্বরাজ ও গণতন্ত্র ধারণাকে তিনি পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে করতেন না। গান্ধীজীর স্বরাজ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। হিন্দুর রাজত্ব হিন্দ স্বরাজ নয়। এ হল ন্যায়ের রাজত্ব, সকলের রাজ্য। রাম ঐতিহাসিক চরিত্র ছিলেন কিন্তু রামরাজ্য গান্ধীজীর কাছে শুধুই এক হিন্দু রাজ্যের কল্পনা নয়। রামরাজ্য হবে একটি প্রকৃত গণতন্ত্র যেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত অসাম্য দূর হয়ে যাবে রামরাজ্য বলতে তিনি বুঝেছিলেন জনগণ হবে সার্বভৌম ক্ষমতার আধার ও তাদের কাজকর্ম, আচরণ ইত্যাদির ভিত্তি হবে নৈতিকতা। তিনি রাষ্ট্রের অবলুপ্তির কথা ভাবেননি। সমাজে রাষ্ট্র থাকবে কিন্তু তা হবে সম্পূর্ণরূপে এক অহিংস সংগঠন। গান্ধীজীর স্বরাজ ও রামরাজ্য ধারণার মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তাকে বিশেষ মর্যাদাদানের পক্ষপাতী ছিলেন।

মূল শব্দগুচ্ছ :

স্বরাজ, রামরাজ্য, স্ব-অধিনতা, অহিংসা, গণতন্ত্র।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

গান্ধীজী শুধু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোষহীন সংগ্রামী ছিলেন না, ভারতাত্মার স্বরূপ অনুধাবনেও তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর ভাষায় "Swaraj for me means freedom for the meanest of our Countrymen. I am not interested in freeing India merely from the English Yoke... I have no desire of exchange kinglog for king stork."[১] স্বরাজ শব্দের অর্থ হল স্ব-অধীনতা। শুধু পর শাসন মুক্তিই স্বাধীনতা নয়, নিজের উপর নিয়ন্ত্রনের স্বাধিকার তাকে পূর্ণতা দান করে। বস্তুত দেশকে স্বাধীন করার জন্য দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের সমান্তরালে গান্ধী চেয়েছিলেন এদেশের সমাজকে যতদূর সম্ভব দূর্বলতা মুক্ত করতে। এজন্যই তিনি স্বরাজ বলতে শুধু রাজনৈতিক মুক্তিকেই বুঝতেন না— চেতনার দাসত্ব মুক্তির বিষয়টিও তার কাছে অগ্রাধিকার পেত। তাই তিনি নিজস্ব চিন্তা ও কল্পনায় ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সংস্কার ও ঐতিহ্যের অনুসারী হয়েই কিছু অভিমত প্রদান করেছিলেন এবং কর্ম সাধনায়

তাকে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন, সার্বিকভাবে মানব মুক্তির বৃহত্তর প্রেক্ষিতে যার মূল কথা— আত্মসংযম, আত্মত্যাগ, সেবা অহিংসা এবং ভালবাসার মধ্যে হৃদয় পরিবর্তন ঘটিয়ে সত্য ও ত্যাগের সমন্বয়ে বিরুদ্ধবাদী শক্তির কাছ থেকে নিজের অধিকার অর্জনের প্রয়াস। স্ব-রাজের অর্থ হল স্ব-অধীনতা। পাশ্চাত্য দেশে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্তন হয়ে থাকলেও লোকে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে না বলে গান্ধীজী মনে করতেন। তারাও নিজের দেশে নানাভাবে শোষিত হয় এবং এই শোষণের পিছনে আছে বিত্তবান ও বলবানের ক্ষমতা প্রয়োগ। জনতার বলপ্রয়োগের দ্বারা এই শোষণ হয়তো সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করা যায় কিন্তু শোষণের সুযোগ তখনও থেকে যায় এই কারণে যে মানুষের অন্তহীন চাহিদা পূরণের অভ্যাস তাকে কোনো না কোনো নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে নৈতিক শক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের পরনির্ভরতা দূর হতে পারে না। আবার এই উচ্চ নৈতিক ধারণা থেকে কিছুটা নেমে এসে রাজনৈতিক পর্যায়ে স্বরাজকে বাস্তব চেহারায় পাওয়া যায় যখন গান্ধী বলেন, "Real Swaraj will come not by the acquisition of authority by a few but by the acquisition of the capacity by all to resist authority when it is abused."[২] এজন্য সবার আগে প্রয়োজন সর্বসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা যার দ্বারা কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো যোগ্যতা ও মানসিক শক্তি তারা অর্জন করতে পারে। গণতন্ত্রের মূল তত্ত্ব অনুসারে ক্ষমতার উৎস যদি জনগণ হয়, তহলে তাদের সেই সক্ষমতাকে বাস্তবে প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। সেইটিই স্বরাজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

স্বরাজের সামাজিক চরিত্র সম্বন্ধেও গান্ধী সচেতন ছিলেন। স্বরাজ যেহেতু প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও উৎকর্ষের লক্ষ্যে স্থিত, সেহেতু মানুষে-মানুষে সামাজিক সম্পর্কটিও সুস্থ ভিত্তির ওপর স্থাপিত হওয়া দরকার। Young India পত্রিকাতেই কয়েকবছর পর অন্য একটি প্রবন্ধে গান্ধী লিখছেন করাচি কংগ্রেসের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে : "The Swaraj of my dream recognizes no race or religious distinctions. Nor is it to be the monopoly of educated persons nor yet of moneyed men. Swaraj is to be for all, including the farmer, but emphatically including... the starving toiling millions."[৩]

'হিন্দ স্বরাজ' বইতে তিনি বলেছেন যে স্বরাজ হল স্বশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ। গান্ধী ইংরেজ শাসকের নিকট যে স্বরাজের দাবি করেছিলেন তার অর্থ ছিল ইংরেজ শাসককে এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং ভারতবাসী নিজেদের শাসনভার গ্রহণ করবে। অর্থাৎ স্বরাজ মানে স্বায়ত্তশাসন। হিন্দ স্বরাজ-এর এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে কে শাসন করছে তা দেখা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ ইংরেজরা যদি এ দেশের শাসনতক্তে থাকতে চায় থাকুক। কিন্তু ওই শাসককে ভারতবাসীদের কথায় শাসন করতে হবে। ইংরেজদের কথায় ভারতীয়রা চলবে না, ভারতীয়দের কথায় ইংরেজদের চলতে হবে। এখানে গান্ধীর স্বরাজ সম্পর্কে ধারণার সত্যিকারের অর্থ নিহিত। আমরা প্রায়ই স্বাধীনতা

(freedom) শব্দটি ব্যবহার করি। কিন্তু গান্ধীর স্বরাজ ও ইংরেজি freedom যার বাংলা তর্জমা স্বাধীনতা এক নয়।

স্বরাজের বৈশিষ্ট্য :

আমরা এখানে স্বরাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করব। অবশ্য এগুলি তিনি কোথাও প্রণালীবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করে যাননি। হিন্দ স্বরাজ, হরিজন পত্রিকা প্রভৃতি স্থানে নানা প্রসঙ্গে তিনি এ সম্পর্কে যে বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন সেগুলি থেকে আমরা বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করতে পারি :

এক, স্বরাজ ব্যক্তিকে পশুশক্তি থেকে শুভশক্তিতে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে। অথবা বলা যেতে পারে যে পশুশক্তিকে পরাভূত করে শুভশক্তি জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু এই রূপান্তরের জন্য দরকার আত্মশক্তির পর্যাপ্ত বিকাশ। কারণ আত্মশক্তি না জেগে উঠলে মানুষ পশুশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে হিংসা ও দ্বেষের বশীভূত হয়ে পড়বে। সুতরাং গান্ধী স্বরাজ বলতে কেবল রাজনীতিক স্বাধীনতার কথা বোঝাতে চাননি।

দুই, তাঁর নিকট স্বরাজ গোষ্ঠী বিশেষ বা শ্রেণিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, একে সমাজের সকল স্তরের মধ্যে সম্প্রসারিত করার কথা বলতেন। যে স্বরাজ সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মুক্তি নিশ্চিত করে তাকে তিনি প্রকৃত স্বরাজ মনে করেননি। এই সর্বোদয়কে আমরা rise of all and development of all. সকলের উত্থান বা বিকাশ হল সর্বোদয়। কিন্তু বিকাশ হবে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক। কোনো সমাজ যদি মনে করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিকাশ হবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য তাহলে তিনি সেই সমাজ স্বরাজ অর্জন করেছে বলে মনে করেন না। সেই অর্থে তিনি স্বরাজকে সর্বোদয় বলে মনে করতেন।

তিন, স্বরাজ ও গণতন্ত্র এই দুটি ধারণাকে তিনি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করতেন না। কারণ সত্যিকারের গণতন্ত্রে স্বরাজ পাওয়া সম্ভব বলে মনে করা হয়। গণতন্ত্র মানে সকলের সামনে সমস্ত সুযোগ তুলে ধরা। ব্যক্তি যেমন বিকাশের সুযোগ পাবে তেমনি সমস্ত বিষয়ে নিজের মতামত সবার সামনে তুলে ধরতে পারবে। প্রকৃত গণতন্ত্রে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সমস্ত প্রকার কাজকর্মে অংশগ্রহণের অধিকার ও সুযোগ ভোগ করবে। এছাড়া অন্য যে-কোনো বিষয়ে নাগরিককে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। সেই কারণে তিনি গ্রাম স্বরাজ বা গ্রাম প্রজাতন্ত্র স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া এই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া কোনোভাবে সম্ভব নয়।

চার, স্বরাজ অর্জন ও রক্ষা করার দায়িত্ব ব্যক্তির। আমরা একটু আগে আত্মশক্তি জাগিয়ে তোলা বা আত্মোপলব্ধির কথা বলেছি। স্বরাজ ধারণার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠযোগ রয়েছে। তিনি মনে করতেন যে স্বরাজ একবার অর্জন করা যেমন কষ্টসাধ্য কাজ। ততোধিক কষ্টসাধ্য কাজ হল তাকে সুরক্ষিত করা। তার মতে এই কাজ ব্যক্তিকে করতেই হবে। তার সক্রিয় উদ্যোগ, সচেতনতা, কর্মতৎপরতা ব্যতিরেকে স্বরাজ সুরক্ষিত হতে পারে না। অবশ্য এই ধারণা প্রচার করে তিনি নতুন কিছু বলেননি। তার মতে Eternal vigilance in the price for liberty. অর্থাৎ স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে ব্যক্তিকে সদা

সতর্ক থাকতে হবে। আত্মোপলব্ধি ঘটেনি সচেতনতার বিকাশ হয়নি ও শুভশক্তি জাগেনি বলেই ভারত বারংবার বিদেশি শক্তির অধীনে এসেছে এবং ইংরেজরা এতকাল আমাদের দেশে আসন তৈরি করে রেখেছে। সুতরাং বিদেশি শক্তিকে পরাভূত করে স্বরাজ আনতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন চিরন্তন জাগরূক অবস্থা।

পাঁচ, গান্ধীর স্বরাজ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাঁর মতে সমাজে ব্যক্তি হল শেষ কথা। তার কল্যাণ, তার সিদ্ধান্ত এবং তার মত সর্বত্রই প্রাধান্য পাবে। রাজনৈলিক মুক্তির অর্থ জনসাধারণের চেতনা। এই চেতনা জনজীবনের সকল ব্যপারে আন্দোলিত না করে ঘটতে পারে না।[৪] ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে সমাজ গঠন ও নীতি নির্ধারণ কোনোটাই সম্ভব নয়। আর একটু ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় ব্যক্তি হল রাষ্ট্রশক্তির একমাত্র উৎস। তাঁর সার্বভৌমতা তত্ত্ব বিশ্লেষণকালে আমরা দেখেছি যে তিনি পাশ্চাত্যের সার্বভৌমতা ধারণাকে হিংসার জন্মদাতা বলে বর্জন করেছেন। কিন্তু যেভাবে তিনি ব্যক্তিকে পাদপ্রদীপের আলোয় এনেছেন তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে তিনি লোকায়ত সার্বভৌমতার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। যাই হোক, এই ধারণাটিকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেননি। সুতরায় স্বরাজ বিষয়ে তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে শানিত করছিলেন তখন তার সমগ্র মনোজগতে ব্যক্তি সমগ্র স্থান অধিকার করেছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরা বলতে পারি যে তিনি রুশোর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতেন। রুশোর রাষ্ট্রচিন্তার সবচেয়ে বড়ো বৈপরীত্য বা অসংগতি হল তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পুরসমাজ গঠনের কথা বললেন শেষ পর্যন্ত গণঅভীপ্সা তত্ত্বটি সাড়ম্বরে এবং সোৎসাহে প্রচার করে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পেছনের আসনে ঠেলে দিয়েছেন। গান্ধী আরও বলেছেন যে স্বরাজ একটি জনগোষ্ঠীর সার্বিক বিষয় হলেও কারোর কারোর স্বাধীনতা বা স্বরাজ থাকবে এবং কারোর থাকবে না, তা একেবারে হতে পারে না। প্রত্যেকের স্বরাজকে একত্রিত করলে তবে একটি সমগ্র জনগোষ্ঠীর স্বরাজ অর্জিত হয়েছে বলে মনে করা হবে। অর্থাৎ একটি জনগোষ্ঠীর স্বরাজ প্রত্যেকের স্বরাজকে নিয়ে গঠিত। যেমন রুশো বলেছিলেন যে সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে প্রত্যেকের ইচ্ছার মধ্যে প্রত্যেকের ইচ্ছা স্থান করে নেবে।

স্বরাজ মানে কেবল মতের প্রাধান্য নয়, জাতির ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি সবকিছুরই প্রাধান্য। এই উপসংহারে তিনি আরও লিখেছেন যে ইংরেজদের ভাষা অনেক উন্নত হতে পারে। কিন্তু তাদের সভ্যতা, কৃষ্টি, বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসন তেমন উন্নতমানের নয়। ভারতের স্বরাজ মানে ভারতবাসীরা একদিকে যেমন স্বশাসন গড়ে তুলবে একই সঙ্গে নিজেদের প্রশাসন এবং বিচারব্যবস্থা তৈরি করবে। তারা ব্রিটিশ প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা অনুকরণ করবে না। এক কথায় তাঁর নিকট স্বরাজ ছিল একটি ব্যঞ্জনাময় ধারণা এবং রাজনীতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন সবকিছুর ভারতীয়করণ। সেই কারণে তিনি স্বাধিনতা লাভের পর কংগ্রেসকে ভেঙে দেবার পক্ষপাতি ছিলেন এবং কংগ্রেসকে একটি গঠনমূলক সংগঠনে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।[৫]

স্বরাজ মানে গান্ধীজীর নিকট গণতন্ত্রের শুদ্ধ স্বরূপটির উপর অটুট আস্থা। শুধু

পরশাসনমুক্তি নয়, নিজের উপর নিয়ন্ত্রনের স্বাধিকার তাকে পূর্ণতা দান করে। মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ সম্পর্কিত সমগ্র ধারণা বিশেষ একটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়টি হল অহিংসা ও সত্যাগ্রহের পথে স্বাধীনতা অর্জন। স্বরাজের ধারণা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছেন সম্ভব হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ এবং প্রয়োজন হলে এর বাইরে স্বাধীনতা অর্জন। তিনি বিদেশী শাসনকে শয়তানিপূর্ণ বলে সুস্পষ্টভাবে সমালোচনা করেছেন। আবার ভারতের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা বা সহাবস্থানের ব্যাপারেও তাঁর সম্মতিসূচক অনুমোদন ছিল। বস্তুত ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালিত হওয়ার প্রাক্কালে 'স্বরাজ' শব্দটি ভালভাবে ব্যবহৃত হত। স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতারা প্রায়শই 'স্বরাজ' কথাটি প্রয়োগ করতেন। কিন্তু 'স্বরাজ' কথাটির সর্ববিধ ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সকলে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এই সময় গান্ধীজীও 'স্বরাজ'-এর সম্পূর্ণ অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন নি। এই শব্দটির দ্বারা ব্রিটিশ শাসনের সম্পূর্ণ অবসান বা ভারত ও ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা হয় নি। এই শব্দটির দ্বারা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থেকে বা এই সংগঠনের বাইরে গিয়ে স্বাধীনতার কথা বোঝান যেত। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, It (Swaraj) means a state such that we can maintain our separate existence without the presence of the English. If it is to be a partnership, it must be a partnership at will. 'হিন্দ স্বরাজ'-এর মধ্যে গান্ধীজীর স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণা নিহিত আছে। মহাত্মার মতানুসারে বস্তুগত সুখ লাভ বা ক্ষমতার হস্তান্তর 'হিন্দ স্বরাজ' নয়। 'সকলে না পাওয়া পর্যন্ত আমরাও নেব না'- এই চেতনা আমাদের মধ্যে এলে স্বরাজ আসবে। সকলের জন্য সকলের সমাজ হল স্বরাজ। এই সমাজে জাত-অজাত, সক্ষম-অক্ষম, ধনী-নির্ধন এরকম কোন ভেদাভেদ থাকবে না। গ্রাম স্বরাজের আদর্শ স্থাপনের স্বার্থে জরুরী হল আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সকলের কর্মসংস্থান প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্য উপনীত হওয়ার জন্য বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতি, দেশীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি আবশ্যক। তা হলে দেশের উন্নতি সাধনে দেশবাসীর সামর্থ্য, গুণগত যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার বিকাশ ঘটবে। হিন্দুর রাজত্ব হিন্দ স্বরাজ নয়। এ হল ন্যায়ের রাজত্ব, সকলের রাজ্য। এই স্বরাজের উদ্দেশ্য হল বৈদেশিক শাসনের অপসারণ, নৈতিকতার বিকাশ ও বিস্তার, পূর্ণ অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সামাজিকতা প্রভৃতি। তবে কিছু সংখ্যক মানুষ ক্ষমতার অধিকারী হলে তাকে স্বরাজ বলা যায় না। ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধে প্রতিটি মানুষের সামর্থ্য থাকা দরকার। তবেই স্বরাজের সৃষ্টি হতে পারে। স্বরাজ নিছক একটি রাজনীতিক বা আর্থনীতিক আদর্শ নয়। এ হল নৈতিক শক্তি-সামর্থ্যের অভিব্যক্তি। স্বরাজ হল এক সুশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থা। এর মধ্যে অহংবোধের বা ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণতা থাকবে না। কারণ অহংবোধের সংকীর্ণতাই সমাজে সংঘাত ও উত্তেজনাপূর্ণ বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করে। পরিপূর্ণ সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের রাজত্বই হল স্বরাজ।

গান্ধীজী আলোচনা কালে রামরাজ্য ধারণাটি না আসলে সে আলোচনা পরিপূর্ণতা পায়না গান্ধী তাঁর কল্পিত সমাজকে 'রামরাজ্য ' শব্দবন্ধটি রামায়ণের অন্তর্গত রামের জয় ও রাবণের পরাজয়ের প্রতিষ্ঠার কাহিনী থেকে নেওয়া হয়েছে। রাম এখানে সু-শক্তির প্রতীক। রাম ঐতিহাসিক চরিত্র ছিলেন কিন্তু। রামরাজ্য তার কাছে শুধুই এক হিন্দু রাজ্যের কল্পনা। রামরাজ্য হবে একটি প্রকৃত গণতন্ত্র, যেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সবরকম অসাম্য দূর হয়ে যাবে। এই প্রকৃত বলেছেন রামরাজ্য, মুসলমানদের কাছে এটি খুদাই-রাজটি হবে কিংডম অফ গড অন আর্থ। গান্ধীর ব্যবহৃত 'রামরাজ্য' শব্দটিতে রাজপাট বিষয়ের কোনো পুনর্নির্মাণের ইঙ্গিত ছিল না তিনি এভাবে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করতেন।

গান্ধী রামচন্দ্রকে দেবতা নয়, দেবোপম মানুষ হিসেবে দেখেছেন। ভাবনগরে অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক সমাবেশে গান্ধীর ভাষণে রামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠকে 'an object lesson in noble conduct' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর 'প্রজানুরঞ্জন' ভাবমূর্তি গান্ধীর দৃষ্টিতে স্বরাজের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। প্রজাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখবেদনা উপলব্ধি করার মতো সহজাত সংবেদনশীলতা থাকবে শাসকের। এজন্য জনমত যাচাই করতে ভেটের আশ্রয় নিতে হয় না। সর্বোপরি, গান্ধী বিশ্বাস করতেন এযুগেও মনুষ্যসমাজের রামরাজ্য হয়ে ওঠা অসম্ভব কোনো কল্পনা নয়। এমন রাষ্ট্রপ্রধান যে বাস্তবে আবার দেখা যাবে কিনা, সেটি ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা করতে গিয়ে পৌরাণিক প্রতীক ব্যবহার করার কারণ রাষ্ট্রব্যবস্থার সামনে একটি আদর্শ তুলে ধরা। এর থেকে যত নীচে নেমে আসবে একটি রাষ্ট্র, ততই তাকে ব্যর্থ বলে মনে করার কারণ ঘটবে। Young India-র একটি সংখ্যায় (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯) তাঁর আগাম সতর্কবাণী : "I warn my Mussalman friends against misunderstanding me in my use of the words ` Ramaraj' by Ramraj I do not mean Hindu Raj . I mean by Ramaraj. Raj, the Kingdom of God."[৬] তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন সেযুগে রামচন্দ্র নামের কেউ থাকুন বা না থাকুন প্রকৃত গণমুখী শাসনের চিত্রটি তখনই অঙ্কিত হয়েছিল। রামরাজ্যের তত্ত্বগত অর্থ হল মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত শাসনব্যবস্থা সু-শাসক হওয়াটাই বড়ো কথা যিনি শাসক তিনি ভোটের জোরে ক্ষমতায় এলেন কিনা, সেটা নিতান্তই গৌণ। গান্ধীর দৃষ্টিতে সেটিই হবে প্রকৃত গণতন্ত্র। তার মতে রামরাজ্য হবে ন্যায়পরায়নতা, নিরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার, সাম্য, অহিংসা, ভোগবিলাস ও স্বার্থপরতা বর্জিত একটি সমাজ। সুতরাং তার আদর্শ রাষ্ট্রকে রামরাজ্য বলতে আদৌ বাধা নেই। কার্যত আদর্শ রাষ্ট্র ও রামরাজ্য প্রায় সমার্থক।

গান্ধীজী রাষ্ট্র বিষয়ে যে ধারণা পোষণ করতেন তা ব্যাপক অর্থে রামরাজ্য। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে তিনি মনেপ্রাণে ভারতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম ও সভ্যতার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনি এমন সব শব্দ ও ধারণা প্রয়োগ করতে লাগলেন যেগুলির উৎস ভারতের ইতিহাস, সভ্যতা ও অতীত

ভারতের রাজনীতি। রামরাজ্য এই জাতীয় একটি ধারণা। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এর রাষ্ট্রব্যবস্থা, গণতন্ত্র ও সামাজিক কাঠামো কেমন হবে সে সবের ওপর আলোকপাতের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নানা প্রসঙ্গে রামরাজ্য কথাটি ব্যবহার করতে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি এর নানা ব্যাখ্যা দেন এবং সেগুলি যে সব সময় খুবই সংগতিপূর্ণ ছিল তা নয়। তবে তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন তা আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এখানে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপিত হবে তা রামায়ণের রাম যে ধরণের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন এবং যে জাতীয় রাজ্যশাসন স্থাপন করেছিলেন তার মতোই হবে। অপরিশোধিত অর্থে কথাটি তাই হলেও এর ব্যঞ্জনা বোঝা বা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। রামরাজ্য বলতে তিনি নিছক রামের শাসন অথবা রাম নামক কোনো ঐতিহাসিক পুরুষের আবির্ভাবের কথা বলতে চাননি। রামরাজ্যের তাৎপর্য ও তার কল্পনার ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা এই দুটি বিষয় নিয়ে আমরা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করবো।

রামরাজ্য বলতে তিনি sovereignty of people based on pure moral authority বোঝাতে চেয়েছিলেন। জনগণ হবে সার্বভৌম ক্ষমতার আধার এবং তাদের কাজকর্ম, আচরণ ইত্যাদির ভিত্তি হবে নৈতিকতা। নৈতিকতাবোধসম্পন্ন নাগরিকগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা চূড়ান্ত রূপে প্রয়োগ করবে। পাশ্চাত্যের অনেক রাষ্ট্রদর্শনিক যেমন কেবল জনগণের সার্বভৌমতার কথা বলেছেন গান্ধী সে বিষয়ে সহমত পোষণ করেননি। নীতিজ্ঞানের অধিকারী না হলে অন্যায়, অবিচার ও পীড়নের প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

রাম ছিলেন ন্যায়বিচার, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, নির্লোভতার প্রতীক। তিনি তার রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কোনো প্রজার প্রতি তিনি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেননি। ইংরেজ সরকার চলে যাওয়ার পরে ভারতেও এই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। সমাজের সকল স্তরেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সহিষ্ণুতা অনুশীলন করতে হবে। পরস্পরের প্রতি কোনো বিদ্বেষভাব মনে স্থান দেওয়া যাবেনা। প্লেটো তার আদর্শ রাষ্ট্রের অনুরূপ কল্পনা করেছিলেন প্রশাসনব্যবস্থার শীর্ষে তিনি একজন দার্শনিক রাজাকে বসাবার সুপারিশ করেছিলেন। তিনি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, হিংসা, লোভ ও স্বজন প্রীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত রাখবেন। গান্ধীর রাম ও ইতিহাসের রাম এবং প্লেটোর দার্শনিক রাজার মধ্যে বিশেষ করে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অধোগামিতা দেখে তিনি দার্শনিক রাজা ও আদর্শ রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিলেন।

গান্ধীর মতে রামরাজ্য ছিল ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার মূর্ত প্রতীক এবং স্বাধীন ভারতেও সেই আদর্শ ও সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হবে। তিনি ভারতের স্বরাজ অর্জন বা স্বশাসন স্থাপনকে যথেষ্ট বলে মনে করেননি। ব্রিটিশ ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনকে তিনি স্বরাজের প্রতীক বলে ভাবেননি। রামরাজ্যই কেবল প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রত্যক্ষ। সেখানে আর যাই থাকুক না কেন প্রকৃত গণতন্ত্র ও ন্যায়পরায়ণতা ছিল না। ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনে

নিরপেক্ষতা আনতে পারেনি। ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে চুক্তিমতবাদী রুশোও উন্নত মনোভাব পোষণ করেননি। আমাদের বক্তব্য হল স্বাধীন ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র স্থাপনের পক্ষে গান্ধী তাঁর বক্তব্য রাখেননি। রামরাজ্য স্থাপনই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

গান্ধীর সত্য উপলব্ধিতে ধর্মীয় হানাহানী এক জঘন্য অপরাধ। মানবিকতার চেয়ে বড় ধর্ম তো কিছুই হয় না।[৭] রামরাজ্যের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করার ফলে ভারতের এক শ্রেণির মুসলমান গান্ধীর মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। গান্ধী মনেপ্রাণে হিন্দু হলেও মৌলবাদী আদৌ ছিলেন না। তিনি রামকে কোনো ধর্মাবতার বলে পণ্য করেননি। রামকে তিনি ন্যায়পরায়ণতা, সুশাসন ও নিরপেক্ষতার প্রবর্তক বলে মনে করতেন এবং সেই বিচারে তিনি স্বাধীন ভারতে রামরাজ্যের অনুরূপ রাজ্য শাসন আনতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা তিনি ভাবেননি। তাঁর স্বপ্নের স্থাপিত হবে রামরাজ্য যা হবে Kingdom of God on earth ভগবানকে তিনি কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতীক বলে চিন্তায় আনেননি। সমস্ত ধর্মকে তিনি সমদৃষ্টিতে দেখতেন। সেইজন্য তাঁকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা হয়।

রামরাজ্য সম্বন্ধে তাঁর আরও বক্তব্য ছিল। যেমন তিনি বলেছেন যে রামরাজ্যে থাকবে সত্য ও অহিংসা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ হিংসায় আশ্রয় নিয়ে আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা করলেও নাগরিকগণ হিংসার সাহায্যে তার প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হবে না। অহিংস উপায়ে অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করবে এবং এইভাবে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি মনে করতেন কেবল রামরাজ্যে তা সম্ভব। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে যে ধরণের গণতন্ত্র তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাকে তিনি মনে করতেন কেবল রামরাজ্যে তা সম্ভব। কেবল তাই নয় এই ধরনের গণতন্ত্রে শাসত ও শাসিতের মধ্যে একটি বড়ো মাপের বিচ্ছিন্নতা গড়ে উঠেছিল। গান্ধীকল্পিত রামরাজ্যে এই ব্যবধান থাকবে না।

রামরাজ বা রামরাজ্যকে আমরা গান্ধীর কল্পিত আদর্শ রাজনীতিক ব্যবস্থা বা আদর্শ সমাজ নামে অভিহিত করতে পারি। তার নৈরাজ্যবাদের এটি আর একটি দিক। কারণ রামরাজ্যে কেবল হিংসা যে থাকবে না তা নয়। শোষণ, পীড়ন, বলপ্রয়োগ, কোনো কিছুই এক কলুষিত বা বৈশিষ্ট্য পূর্ণ করতে পারবে না। এখানে থাকবে পূর্ণ আকারের স্ব-শাসন এবং প্রশাসন বা পরিচালনের মধ্যে বিরাজ করবে নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা। এককথায় আমরা বলতে পারি যে গান্ধীর রামরাজ্য, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের আদর্শ রাষ্ট্র এবং রুশোর নৈতিক সমাজ সমস্তই সম শ্রেণিতে পড়ে। সবই কল্পিত ও ইউটোপীয়। আর গান্ধীর রামরাজ্য কেবল কাল্পনিক নয় একটি নি-রাজ সমাজ। মহাত্মা গান্ধীর মাতনুসারে রাষ্ট্র হল প্রচলিত বস্তুবাদী সভ্যতার প্রতীক। সরকার পার্লামেন্ট, আদালত প্রভৃতি হল রাষ্ট্রের এজেন্ট। এগুলিকে গান্ধীজী অগ্রগতির উপায় হিসাবে গণ্য করেননি। তিনি পার্লামেন্টের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। সংসদ সবসময় অস্থিরচিত্ততা ও অনিশ্চয়তা থেকে ভোগে। মহাত্মা গান্ধী একেবারে নতুন ধরণের এক সামাজিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ন্যায় ও সাম্য

প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আদর্শ সমাজব্যবস্থায় রাজপুত্র ও দেউলিয়ার মধ্যে, ব্যারিস্টার ও ঝাড়ুদারের মধ্যে কোন রকম বৈষম্য থাকবে না। এমনকি পথের কুকুরও ন্যায়বিচার পাবে। এই সমাজ হবে শ্রেণীহীন। এই সমাজে হিংসার প্রতীক রাষ্ট্রের কোন স্থান নেই। এক আদর্শ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে গিয়ে গান্ধীজী রাষ্ট্রবিহীন গণতন্ত্র এর কথা বলেছেন। অহিংস নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণহীন সমাজের সৃষ্টি হবে। কারণ সমাজে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা থাকবে, সাম্যনীতি বাস্তবে রূপায়িত হবে এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। মহাত্মা গান্ধী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সাম্যভিত্তিক শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেছেন।

গান্ধীজীর এই সাম্যভিত্তিক শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ অহিংস নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি শ্রেণী-সংগ্রামের পথ পরিহার করে শ্রেণী সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন। এই সমাজব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্র থাকবে না এবং কোন রাজনৈতিক ক্ষমতাও থাকবে না। রাষ্ট্রবিহীন এই অহিংস গণতন্ত্রই হল গান্ধীজীর ভাষায় রামরাজ্য। গান্ধীজীর মতানুসারে রামরাজ্য হবে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব। এই রাজত্বে জনগণের নৈতিক কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই রাজত্বে হিংসার কাঠামো হিসাবে রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে। গান্ধীজীর রামরাজ্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক ভর্মা তার 'Political philosophy of Mahatma Gandhi and sarvodaya' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "Ramrajya means the realisation of universal peace and humanitarian ethics ... The realisation of the Kingdom of God would depend however on a sincere faith in the supreme spirit by millions... this Ramrajya will be more cohesive than the formal bonds of legal organisation."[৮] এখানে সমাজ-জীবন স্ব-নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হবে। স্ব-আরোপিত বিধিবিধান, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সংযমই হবে এই সমাজব্যবস্থার চালিকা শক্তি। এখানে প্রত্যেকে তার নিজের প্রভু। এমনভাবে প্রত্যেকে নিজেকে পরিচালিত করবে যাতে অপরের ক্ষেত্রে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা দেখা না দেয়। কোন রকম ক্ষমতার দ্বন্দ্বের প্রশ্ন এই আদর্শ ব্যবস্থায় দেখা দেবে না। এখানে সকলের জন্য একই স্বাধীনতা থাকবে। এই সমাজব্যবস্থায় সকল ক্ষেত্রে সাম্য ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বজায় থাকবে।

মহাত্মা গান্ধী মার্কসীয় দর্শনের মত রাষ্ট্রের একেবারে অবলুপ্তির কথা বলেন নি। তাঁর অভিমত অনুযায়ী সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকবে। কিন্তু এই রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণরূপে এক অহিংস সংগঠন। এবং এই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, ভারী শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থা, বিশাল আকার আয়তনের যন্ত্রপাতি, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আমলাবাহিনী, বড় বড় হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমাজে থাকবে। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য জনসাধারণের কল্যাণ সাধন, ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন নয়। জনসাধারণের নৈতিক কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য কায়েম হবে। হিংসার কাঠামো

হিসাবে রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে।

এইভাবে স্বরাজ ও রামরাজ্য সংক্রান্ত ধারণার মধ্য দিয়ে গান্ধীজী তার স্বপ্নের স্বদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। হিন্দ স্বরাজ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে গান্ধীজী বলেছিলেন ব্যক্তিকে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট আত্মসমর্পন করতে হয় তহলে তাকে স্বরাজ বলা যাবে না। গান্ধীজীর স্বরাজ ও রামরাজ্য ধারণাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র্য সত্ত্বাকে বিশেষ মর্যাদা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। আজ যখন যারা বিশ্বে 'ভয়ংকরা দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী' হিংসা, রাষ্ট্রদ্রোহীতা, সন্ত্রাসবাদ, মানবাধিকার লঙঘনের মত ঘটনায় প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমাদের জীবনে বিষবাস্পে ভরিয়ে দিচ্ছে তখন গান্ধীজীর স্বরাজ ও রামরাজ্যবাদ ধারণাকে নতুন করে বিশ্লেষণ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে বলেই মনে হয়।

তথ্যসূত্র :

১. ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২ই জুন, ১৯২৪।

২. ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯২৫।

৩. ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১লা মে, ১৯৩০।

৪. দাশগুপ্ত, পান্নালাল, ১৯৮৬, গান্ধী গবেষণা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১০৬।

৫. মুখোপাধ্যায়, গৌতম (সংকলিত), ২০১২, মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা : ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ, (ড. ত্রিদিব সন্তপা কুণ্ডুর প্রবন্ধ), মিত্রম, কলকাতা, পৃ. ৩৫।

৬. ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।

৭. সেনগুপ্ত, শেখর, ২০১৮, সার্ধশতবর্ষে গান্ধী পরিক্রমা, প্রিটোনিয়া পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলারস, কলকাতা, পৃ. ৩১।

৮. Bandyopadhyay, Jayantanuja, 2014, Social and Political Thought of Gandhi, Kolkata, pp. 60.

মল্লরাজাদের ধর্মীয় সহনশীলতা

ড. চৈতালী মান্ডি

রাঢ় বাংলার অন্যতম জনপদ মল্লারাজধানী বিষ্ণুপুর মন্দিরনগরী হিসাবে খ্যাত, যদিও শিল্প, সংস্কৃতি, সংগীত তার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। ধর্ম, পূজা, দেবদেবী-উপাসনা–এসবের মধ্যে মানুষ একটা আলাদা জীবনকে খুঁজেছে, একটা আশ্রয় চেয়েছে। বৃহৎ এর কাছে নিজের ক্ষুদ্র আত্মাকে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করে সে শান্তি পেতে চেয়েছে।

একটা দেশের শাসক যদি হঠাৎ তাঁর রাজ ঐশ্বর্য, রাজকীয় ভোগবিলাসকে সরিয়ে রেখে একজন বৈষ্ণব হয়ে যান। রাজকার্যের মৌলিক ব্যাপারগুলি সামলে যদি তিনি রাধাকৃষ্ণ লীলাকীর্তন পদ রচনা করতে বসেন তাহলে সেই রাজ্যের ও রাজ্যবাসীর কী দশা হতে পারে ? এরকমই এক ধর্মসর্বস্ব রাজন্যকুল ও তাঁদের রাজক্ষেত্র মল্লভূমের সম্প্রীতিময় ধর্মীয় মিশ্র সংস্কৃতির সমন্বিত রূপটির কথাই আমরা আলোচনা করব। মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরের বুকেহাঁটতে হাঁটতে আজকের কোনো পর্যটক ভাবতে বসেন ভগ্ন রজপ্রাসাদ লুপ্তপ্রয়, কিন্তু এত মন্দির কেন ? এক একটি মন্দিরের যে নির্মাণব্যয় তা দিয়ে ভালো প্রাসাদা বানানো যেত। সম্পদের অভাব বিলাসবহুল প্রাসাদনির্মাণে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে নি। আসলে ব্যাপারটা ছিল দৃষ্টিভঙ্গীর, এক ভিন্ন আত্মদর্শণের ফল। হৃদয়বীণার সুর যখন বাঁধা হয়ে যায ত্যাগ ও তিতিক্ষার সুরে, তখন ব্যক্তিগত আকাঙ্কাগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। মন ছুটতে থাকে পরমের সন্ধানে, রভসানন্দের আস্বাদনের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে।

উৎসমূল থেকেই মল্লরাজাদের অন্তরে ধর্ম জড়িয়ে ছিল। রাঢ়ের জনজাতির চরিত্রগত আদিম যে ধারা সেদিকে তাকালেও দেখা যায় প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম ও পরে জৈন ধর্মের ব্যাপক প্রভাব এই অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল খুব প্রবল। অরণ্যচারী, শিকারি, কৃষিজীবী, মুন্ডারিজ জাতির পূর্বপুরুষ ও মৎস্য শিকারি কৈবর্ত জাতির পূর্বপুরুষরাই রাঢ়ের বাঙালি জাতির ভ্রূণ গঠন করেছে।এইসব জনগোষ্ঠীগুলির ধর্মচর্চায় ভগবান তথাগত প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম এবং তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ ও মহাবীর প্রচারিত জৈন ধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। বৌদ্ধতন্ত্রের দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি - রাঢ়ের ধর্মীয়, সামাজিক, এমনকি পারিবারিক ক্রিয়াকান্ডকেও প্রভাবিত করেছিল। রাঢ়বঙ্গের শিব এবং শক্তি, রাধা এবং কৃষ্ণের যুগল রূপের মধ্যেও অভিব্যক্ত হয়েছে বৌদ্ধ দেবতাদের নিজ নিজ শক্তির সহচরীর সঙ্গে বিভিন্ন নিবিড় মুদ্রায় অবস্থান। শিব ও শক্তি বা রাধাকৃষ্ণের এই একত্র অবস্থান বোঝাতে চায় যে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে প্রভেদ অবাস্তব, দুটিই পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে গেছে এক মহা একত্বে। যেমন লবণ জলে বিগলিত বস্তুবাদী হয়ে এককার হয়ে যায়।

আদিতে বিষ্ণুপুরের শাসকগণ ছিলে শাক্ত পথের পথিক। স্বাভাবিকভাবেই বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আমরা মৃন্ময়ীদেবীকে পাই। অত্যন্তনিষ্ঠার সঙ্গে রাজ পরিবার আজও মৃন্ময়ীদেবী

পূজিতা হচ্ছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুপুর ভ্রমণে এসে স্নানের সময় এই মৃন্ময়ী মাতাকে দর্শন করে রোমাঞ্চিত হন। লোকশ্রুতি ও ইতিহাস মিলেমিশে রয়েছে মৃন্ময়ী দেবীকে ঘিরে। এখনও রেণু রেণু হয়ে শক্তি রূপা যেন বিষ্ণুপুরের আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্তা।

মল্লারাজাদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস কিন্তু গোঁড়ামীতে পরিণত হয়নি। এখানে ইসলাম, জৈন, খ্রিস্টান ইত্যাদি এমনকি অন্তজ সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে মল্ল রাজবংশ ও তাঁদের উত্তরসূরীরা কোনো বাধা সৃষ্টি তো দূরের কথা তাঁদের সাবলীল ও স্বাভাবিক ধর্মানুষ্ঠানে যত্নবান ছিলেন। অনেক ভূ-সম্পত্তি নিষ্কর হিসেবে দান করা, মাজার বা ধর্মস্থান তৈরীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করে দেওয়া ইত্যাদি রাজারা সানন্দে করতেন।

রাঢ়বঙ্গের ধারাবাহিকতার পথ ধরে মল্লভূমে কখনো শাক্ত, কখনো শৈব, আবার কখনো বৈষ্ণব ভাবালুতা সাধারণ মানুষ তথা রাজন্যবর্গের মসানবসত্তাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছে। চারপাশের মুসলীম শাসনের পরিমণ্ডলের মধ্যে একটি ছোট স্বাধীন হিন্দুরাজ্য হিসেবে বিষ্ণুপুরে রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মাচরণের যে বিশেষ সুযোগ ছিল তারই ফলশ্রুতিতে বিষ্ণুপুর বা মল্লভূম জুড়ে মন্দির সংস্কৃতির এক অভিনব বিকাশ ঘটে থাকে। তারই বহিঃপ্রকাশ দেখি বিষ্ণুপুরের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য দেবালয়, সৌধ ও মিনারগুলিতে, দেখতে পাই সমান গুরুত্ব সহকারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদ, গির্জা, মাজার সহ তথাকথিত অন্তজ শ্রেণিদের অনেক উপাসনা স্থলকে।

কোনবান তলায় সাহেবের মাজার এবিষয়ে উল্লেখ্য। এই সিদ্ধ পীর হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে আদৃত ছিলেন। আজও সেই ট্রাডিশান সমানে চলছে - সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার এই মাজারে এলে সহজেই এই পীরের আকর্ষণ নজরে আসবে। মল্লরাজ শ্রীচৈতন্যসিংহ (১০৫৯ মল্লাব্দ) এই মাজারের অনুকূলে যে ছাড়পত্র (ভূমিদান সংক্রান্ত) দিয়েছিলেন তা এই সমাধ্যিহের 'খাদেম' বা সেবাইতের কাছে রক্ষিত আছে। এই দলিল থেকে জানা যায় মল্লরাজ কোরবান সাহেবের প্রতি কেমন শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন। এই দলিলে মোট ৩১ বিঘা জমি পীরোত্তর বলে ঘোষণা করা হয় বলে উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে জনশ্রুতি এই যে, মল্লরাজ বীর হাম্বির কোরবান সাহেবের আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক শক্তির পরিচ পেয়েছিলেন এবং বিষ্ণুপুরে স্থায়ীভাবে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর বাসস্থানেই এই মাজারটি গড়ে তোলা হয়। পবিত্র সমাধির উপর মল্লভূমরাজ শ্রীচৈতন্য সিংহ একটি স্মৃতিকক্ষ নির্মাণ করান এবং নিত্য সেবাকার্যের ব্যবস্থা করা হয়। বালিধাবড়া মহল্লায় নূতন পুকুরের কাছে আছে আর একটি মাজর – এটি ঘোড়া আলি সাহেবের। পোকাবাঁধের (বীর বাঁধ নামেও পরিচিত) পূব পাড়ে রয়েছে সত্যপীরের সমাধি। প্রতি বৃহস্পতিবার বিশেষ পূজা এবং মহরমের সময় বিশেষ অনুষ্ঠান এই দুটি মাজারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মল্লরাজবংশের এখানেও ভূমিদানের ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য।

পোকাবাঁধের পশ্চিপাড়ে রয়েছে বিষ্ণুপুর থানার বিপরীত মারোয়ারী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জিউয়ের মন্দির। এখানে এই মন্দিরের প্রাথমিক স্থাপনকার্য ও ব্যয়ভার, নিত্যপূজার ব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মল্লরাজাদের অবদান কিরকম তা জানা যায় রাঠীদের দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তির দলিল দস্তাবেজ থেকে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিষ্ণুপুরে স্থাপিত হয় ওয়েসলিয়ান মিশনের গির্জা। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করে বিস্তীর্ণ এলাকা নিজের জমিদারির শামিল করে নেন। তারপরেও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজপরিবার নিজেদের দখলে থাকা ভূ-সম্পত্তি বিশেষ অংশ ওয়েসলিয়ান মিশনের অধীনে গীর্জা প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করে দেন এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে এই গীর্জাটি আজও তারই সাক্ষর বহন করে চলেছে।

মাধবগঞ্জে রয়েছেন বড়াম (বড়ম) ঠাকুর। পৌষ সংক্রান্তিতে তাঁর পূজার বিশেষ আয়োজন হয়। তথাকথিত অন্ত্যজদের এই পূজোয় মল্লরাজাদের ভূমিকাটিও গভীর অর্থবহ। এর জন্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি দানে মল্লরাজ পরিবারের বদান্যতা ও উদারতা আজও স্পষ্ট।

বর্তমানে এটি একটি প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য যে, বিষ্ণুপুরের চারপাশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে একদা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধর্মের প্রভাব ছিলো এবং স্বভাবতই এই ধর্মগুলিকে কেন্দ্র করে স্থানে স্থানে দেবদউল গড়ে উঠেছিল। মল্লরাজ বংশের উত্থানের আগে এই অঞ্চলগুলিতে (রাঢ়বঙ্গের অন্যান্য স্থানের মতো) ধর্মীয় বিবর্তন ঘটেছিল। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই বিবর্তনের ধারাটি স্পষ্টতর হয়েছে।

কালের স্বাভাবিক নিয়মে অনেক যায়গাতেই প্রাচীন স্থাপত্যগুলি নষ্ঠ হয়ে গেছে। কোথাও প্রাচীন দেউলের ভিত্তিপ্রস্তর শুধু জোড়া আছ। আবার কোথাও বিগ্রহগুলিকে নতুন রূপে পূজা করার জন্য অনতিদূরে নূতন দেবালয় গড়ে তোলা হয়েছে। কোনো কোনো প্রাচীন মূর্তিতে সংযোজন করে অন্য ধর্ম বিশ্বাসীগণ আত্মীকরণ করেছেন কিন্তু মূর্তিগুলিকে ভেঙে ফেলা হয়নি। এসবই ধর্মীয় সহবস্থানের এবং সঙ্গীকরণের সাক্ষর। যেমন, বিষ্ণুপুরের পাশেই ধরাপাটে জৈন মূর্তিগুলি – লক্ষ্মী, সারস্বতী, মনসা, বিষ্ণু – এদের সঙ্গেই পূজো পান। দু-একটি মূর্তির সংযোজিত রূপ ধর্মীয় সঙ্গীকরণের অনবদ্য দৃষ্টান্ত। এই অঞ্চলের একটি মন্দিরে কৃষ্ণ বাসুদেবের পূজোর আয়োজনের রাজা বীর হাম্বীরের পৃষ্ঠপোষণা আজও সুবিদিত। একদা জৈন ধর্মকেন্দ্রের অন্যতম পীঠস্থান ধরাপাটে একটি জৈন, মূর্তির বাসুদেবে রূপান্তর একটি স্মরণীয় ঘটনা। মুণিনগরে মল্লরাজ বীরসিংহের প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের পূজা যেমন হয় তেমনি পূজিত হন বাসুলীদেবীও।

বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা শিব। জেলায় দুশোরও বেশী বিভিন্ন গ্রামে শিবের জাগ্রত ক্ষেত্র আছে। বিষ্ণুপুর শহরে সবচেয়ে প্রাচীন দেউল হিসেবে চিহ্নিত মল্লেশ্বর শিব মন্দির (১৬২২ খ্রি.)। মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় বীরহাম্বীরের রাজত্বকালে। প্রথম বীরসিংহ এটি সমাপ্ত করেন ও ফলকে নামোল্লেখ করেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে মাকড়াপাথরের বিশাল শিবলিঙ্গ। বিষ্ণুপুরের পাশেই দরকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত আরেকটি শৈবতীর্থ - ডিহর। ডিহরে দ্বি হরের অবস্থান, একজন শৈলেশ্বর, অন্যজন ষাঁড়েশ্বর। প্রতিষ্ঠাফলক অনুযায়ী ডিহরে রাজা পৃথ্বীমল্লের পৃষ্ঠপোষণায় এই শৈবতীর্থের গড়ে উঠে। মল্লরাজারা শাক্ত ও শৈবশাখার দেবদেবীদের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বৈতলে রয়েছেন ঝগড়াই চন্ডী। এখানের একটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, মল্লরাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহ (৯৬৫ মল্লাব্দ) তাঁর এক সফল যুদ্ধের জন্য (ঝগড়াই - যুদ্ধের) চন্ডীমন্দিরটি নির্মাণ করেন ও বিগ্রহ পূজার ব্যবস্থা করেন।

শিব ও শক্তির পর ভক্তির বন্যায় ভেসে গিয়েছিলে মল্লভূম। বৈষ্ণব পুঁথি সম্ভার লুণ্ঠনের

মধ্য দিয়ে বিষ্ণুপুরে প্রবাহিত হল এক নতুন ভাবালুতা। যে তিনজন আচার্যের অধীনে বৃন্দাবন থেকে সেই মূল্যবান গ্রন্থরাজি বঙ্গদেশের পাঠানো হয়েছিল তাঁরা ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রিত শ্রীনিবাসের মল্লভূমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল তরঙ্গ আছড়ে পড়েছিল মল্লরাজধানীর বুকে। রাজা বীরহাম্বীর (১৫৯১-১৬১৬/১৬২২) ও রাজমহিষী সুলখানা শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ফলে রাজার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণব ধর্মের সেই স্রোত রাজদরবার, সুধীজন বা শিক্ষিত জন সম্প্রদায় ছাড়িয়ে একেবারে আমজনতার স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। নব প্রচারিত ধর্মের বিশিষ্ট উৎসব ছিল রাস। উৎসবকে রাজকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মনেপ্রাণে বৈষ্ণব হয়ে ওঠা নৃপতি বীরহাম্বীর যে অনন্যসাধারণ সৌধটি নির্মাণ করেছিলেন সেটি 'রাসমঞ্চ' (১৬০০ খ্রি.)। রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হত কার্তিক মাসে। সে সময়ে বিষ্ণুপুররাজ প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বিগ্রহগুলিকে রাসমঞ্চে আনা হত। ঐশ্বর্যে আড়ম্বরে মঞ্চটি তখন অপূর্বশ্রী ধারণ করত। রাসের সময় বৃন্দাবনে যেমন ষট্ (গোস্বামী ও অপর ভক্তদের নিয়ে রাসযাত্রা অভিনীত হত সেই রীতিকে মেনেই বিষ্ণুপুরে রাসের সময় মল্লরাজা স্বয়ং, মল্লরাজ পরিবারের সদস্যরা, তাঁদের মন্ত্রী, মহাপাত্র, আচার্যশ্রীনিবাস তাঁর পরিবারবর্গ যাত্রাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। লুণ্ঠিত পুঁথিগুলির মধ্যে 'গোবিন্দমামৃত' গ্রন্থটিও ছিল। বীরহাম্বীর যদুনন্দনকে দিয়ে সেই গ্রন্থটির বাংলায় অনুবাদ করান এবং সেটি অভিনীত হত। রাসমঞ্চে অভিনীত মল্লরাজ পরিবারের রাসযাত্রাই সম্ভবত রাঢ়বঙ্গের প্রথম যাত্রাভিনয় এবং প্রথম প্রাকৃত ভাষা তথা বাংলায় অভিনয়। এই বীরহাম্বীরের সময় থেকেই বিষ্ণুপুর শিল্প সংস্কৃতি শিক্ষায়, সংগীতে ও ঐশ্বর্যে লক্ষণীয়ভাবে এগিয়ে যেতে থাকে। বীরহাম্বীরের পর বীরসিংহ (ধাড়ী হাম্বীর) রাজা হলেন (১৬২০/২২-১২৬ খ্রি.)। এই সময় নানা দিক দিয়ে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টেরাকোটার সুচারু কাজ, সেই নীরব ধ্রুপদশৈলী, মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির সেই অমর কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর আমলেই। বলা যায় তাঁর নন্দনচেতনার ফসল হিসেবেই।

তখন বিষ্ণুপুরের আকাশে বাতাসে কীর্তনের সুর, ধ্রুপদের মূর্ছনা, রাজা ও আমত্যদের সক্রিয় সহযোগিতায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য ভক্তি-রসের প্রাবল্য। কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিজধর্ম পালনে বিষ্ণুপুরের রাজারা কখনও বিরোধিতা করেন নাই। সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ছিল তার নিজস্ব ধর্ম পালনের, ধর্মীয় উৎসব, আচার-অনুষ্ঠানের এটা মল্লরাজাদের ধর্মবিশ্বাসের, উদারতার ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় – যা আজও আমাদেরকে বিস্মৃত করে। আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে এই রাজবংশ ব্যাক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের উর্দ্ধে থেকে বিভিন্ন ধর্মের বহু বিচিত্র মতকে ও পথকে অত্যন্ত সহিষ্ণুতার চোখে দেখেছিলেন, মানুষের বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক মিলনমেলায় পরিণত করেছিলেন।

তথ্যসুত্র

১। রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম খন্ড), – মানিকলাল সিংহ।

২। বাঁকুড়া দর্শন স্মরণিকা ৯২, রজত জয়ন্তী সংখ্যা, অতীতের পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠা -৩৫-৪২।

৩। The Indian Buddhist Iconography --বিনয় ভট্টাচার্য।

৪। Archaeological Survey of India. Annual Report, (1910-11).

তারাশঙ্করের নির্বাচিত ছোটগল্প : অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের জীবনচর্যা

ড. দিলীপ কুমার দিগার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অজস্র সৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিপুল সৃষ্টিসম্ভার সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে বীরভূমের লাভপুরে জন্ম ও সেখানেই তিনি মানুষ হয়েছেন। কাজেই জন্মসূত্রে রাঢ় অঞ্চলের মানুষদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন, মিশেছেন ও চিনেছেন। গড়ে উঠেছিল মানুষের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ। তাই বীরভূমের লাভপুর গ্রাম তারাশঙ্করের মানস গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। তাঁর আত্মীয়তা মাটি ও মানুষের সঙ্গে। আর এই সূত্রেই গ্রামের মানুষ ও জীবনের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ও দুর্বার আকর্ষণ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বহু উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন। এই দুই ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর সব্যসাচীর মত ক্ষমতা। তাঁর গল্পগুলি গ্রাম বাংলার জল-হাওয়া-মাটি-মানুষ মিলেমিশে এক অভিন্ন যোগসূত্র রচনা করেছে। তিনি জমিদার বংশের ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও সর্বস্তরের মানুষকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁর বহু গল্পের মধ্যে বেশ কিছু গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনকথা রয়েছে। হাড়ি, মুচি, ডোম, বাউরি, বাগদী, কাহার, সাঁওতাল, বেদে প্রভৃতি অন্ত্যজশ্রেণির কথা। যারা সমাজের উপর তলার মানুষের দ্বারা নানাভাবে অপমানিত, অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত হয়ে যন্ত্রণাময় জীবনভোগ করেছে।

বাস্তববাদী ও মানবতাবাদী লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলীয়দের মত পশ্চিমী ঘেঁষা না হয়ে এবং নগরকেন্দ্রিক জীবন বাদ দিয়ে একেবারে গ্রামবাংলার অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের জীবনালেখ্য এঁকেছেন তাঁর একাধিক ছোটগল্পে। অর্থাৎ অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের জীবন কথাকে গল্পকার বলিষ্ঠভাবে অকৃত্রিম ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বিশেষ করে 'ডাইনী', 'বেদেনী', 'তারিণী মাঝি', 'তিন শূন্য', 'মতিলাল', 'আখড়াইয়ের দীঘি', 'কবি' এই নির্বাচিত গল্পগুলির আলোচনার মধ্য দিয়ে তা দেখার প্রয়াসে সচেষ্ট হলাম।

'আখড়াইয়ের দীঘি'-তে অন্ত্যজশ্রেণির মানুষ কালিচরণ বিপর্যস্ত জীবনের করুণ মর্মস্পর্শী পরিণতির কথা উঠে এসেছে। এদের জীবনযাত্রায় নেশা হিসেবে মদ ব্যাপক হারে চলত। তারাচরণ বাগদী যখন বলে— "জাতি বাগদী আমরা হুজুর, সকলেই আমাদের লাঠিয়াল। আর ছোটজাতের আমোদ-আহ্লাদে মদই হল হুজুর প্রধান জিনিস। বড় বড় জোয়ান সব দিবারাত্র মদ খেয়েছে আর ঘাঁটি খেলেছে।"[১] কালীচরণের কথাতেই সেই মদের কথা— "মদের নেশায় মাথার ভেতরে আগুন ছুটত। সে নেশা ঝিমিয়ে আসতে পেত না। পাশেই থাকত মদের ভাঁড়।"[২]

কালীচরণ বাগদী প্রথম দিকে নবাবের পল্টনে কাজ করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই কাজে তাকে আর রাখা হল না। কোম্পানীর রাজত্বে, থানা-পুলিশের রাজত্বে সবাই এক হয়ে গেল। অপরের বাড়িতে কাজে গিয়েও অপমানিত হতে হয়। তাই চুরি ও ডাকাতির পথে যেতে হয়। সেকথা উল্লেখ — ''এখন নীচ কাজ করতে হয়, গাড়ু বইতে হয়, জুতো ঘুরিয়ে দিতেও হয় হুজুর, তাই আমরা এই পথ ধরি।''[৩] এতেই স্পষ্ট হয় যে, এক প্রকার বাধ্য হয়েই কালীচরণ বাগদী খুন-ডাকাতির পথে এসেছে। সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা বাগদীদেরকে ছোট চোখে দেখে, অবহেলা ও ঘৃণা করার ফলে তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। বাধ্য হয়েছে ডাকাতি খুনের মত পেশায় নেমে পড়তে— যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক।

কালীচরণ বাগদী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঁচার তাগিদে খুন ডাকাতি করে মানুষের সবকিছু কেড়ে নিত। দুর্ধর্ষ লেঠেলগিরি করা মানুষটি নেমে পড়ে ভয়ংকর রকমের হিংস্র-নগ্ন রূপের খেলায় মানুষ খুন করে তার সবকিছু কেড়ে নেওয়া- জীবননেশার এ ছবি নিষ্ঠুরতার ছবি। ''অন্ধকারের মধ্যে পথিক দেখতে পেলে বাঘের মতো লাফ দিয়ে উঠতাম। হাতে থাকতো ফাবড়া শক্ত বাঁশের দু'হাত লম্বা লাঠি, সেই লাঠি ছুঁড়তাম মাটির কোণ ঘেঁষে। সাপের মতো গোঙাতে গোঙাতে সে লাঠি ছুটে গিয়ে পথিকের পায়ে লাগলে আর তার নিস্তার ছিল না। তাকে পড়তেই হত। এরপর একখানা বড় লাঠি তার উপর চেপে দাঁড়াতাম, আর পা দুটো ধরে দেহটা উল্টলে ঘাড়টা ভেঙে যেত।''[৪]

আখড়াইয়ের দীঘির ধারে দীর্ঘদিন ধরে কালীচরণ এইভাবে মানুষ খুন করেছে। ডাকাতির জন্য সে করে থাকে। আর সেখানেই ডাকাতির জন্য যখন না জেনে নিজের ছেলে তাড়াচরণকে খুন করে, সে নিষ্ঠুরতা অতীব ভয়ংকর। গল্পে তার উল্লেখ— ''মানুষের সাড়া পেয়ে চুমুক মেরে অভ্যাস মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে চলন্ত মানুষ নড়ছিল — মারলাম ফাবড়া, লাশ পড়ল। চিৎকার করে সে কি বললে কানে এল না। ছুটে গিয়ে গলায় লাঠি দিয়ে উঠে দাঁড়াব, শুনলাম, বাবা-বাবা-আমি কথাটা কানেই এল, কিন্তু মনে গেল না। তার গলা আমি চিনতে পারলাম না। লাঠির উপরে দাঁড়িয়ে বললাম এসময়ে বাবা সবাই বলে।''[৫] তারপর নিজের ছেলের দেহকে, দীঘিতে পুঁতে দেয়, যেখানে পূর্বে এই ধরনের কাজ করেছে, ঠিক সেই জায়গাতে নিজের ছেলেকে মেরে পুঁতে দিল অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের এমন ভয়ংকর পরিণতি জীবন সত্যের ছবিটা সমাজের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

'তারিণী মাঝি'— গল্পে মাঝি পরিবারের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। খেয়া পারাপার করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিপদগ্রস্ত মানুষকে ময়ূরাক্ষী নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচিয়েছে। যতটুকু টাকা-পয়সা সে পায় তা দিয়ে সংসার চালায়। আর পায় ফাঁদি নথ, শাড়ি— এগুলি সে প্রিয়তমা সুখীকে দেয়। কঠোর পরিশ্রম করেই তাদের বেঁচে থাকা। নেশার জন্য মদ যেমন ছিল, আবার মদের বিকল্পরূপে ভাতের আমানিও খেয়েছে। আর প্রয়োজনীয় খাবারের অপ্রতুলতায় পেটের খিদে দূর করার জন্য পাকা তাল খেয়েছে। বসবাসের ঘরখানিও ছিল বাঁশের খুঁটি দেওয়া একখানি চালাঘর। কিন্তু অভাবের মধ্যেও স্ত্রী সুখীকে নিয়ে তাদের প্রেমক্রীড়া আনন্দেই চলত। এক প্রকার উদ্দামজীবন পিপাসা তাদের মধ্যে ছিল।

ময়ূরাক্ষী নদীর রূপ বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের গতি হারিয়ে যেত। বৃষ্টি না

হওয়ার ফলে ময়ূরাক্ষী শুকিয়ে যেত। তখন জীবনে বেঁচে থাকার আশা নিয়ে শহরে যেতে হতো। কিন্তু হঠাৎ প্রবল বৃষ্টিতে যখন ময়ূরাক্ষীতে বান আসতে তখনও তাদের জীবনে বিপদের আশঙ্কা। অভিজ্ঞ তারিণী বৃষ্টি আসার আগাম আগাম বুঝতে পারে পিঁপড়ের মুখে করে ডিম বহন করা দেখে। একটা সময় প্রচন্ড বৃষ্টিতে ময়ূরাক্ষীতে বান দেখা দিল। সেই প্রবল বানে ঘরখানি ডুবে যায় এবং তারা দুজনে বন্যার প্রবল ঘূর্ণিতে ডুবতে বসেছিল। বাঁচার তাগিদে সুখী তারিণী মাঝিকে নাগপাশের তীব্র আদিম তাড়নায় সে প্রিয়তমা সুখীর গলা টিপে ধরে— ''দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ। হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মতো টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সেটা ভাসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল।''[৬]

বাস্তবিকই এমন পরিণতি বেশ ভয়ংকর। যেখানে নিজের বাঁচার প্রবল ইচ্ছা কাজ করেছে। আর সেজন্য তারিণী ভালোবাসার মানুষটিকে হত্যা করেছে। জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচতে হবে প্রবৃত্তির এই অমোঘ ও অনিবার্য পরিণতি দেখা গেছে। তারিণী হত্যা করল প্রেম ও মনুষ্যত্বকে। আসলে এক্ষেত্রে প্রেম পরাজিত হয়ে বাঁচার প্রবৃত্তি প্রবল বিক্রমে জয়ী হয়েছে। তবে এটা নিশ্চিত যে, তারিণীর সুখীহারা জীবন আর সুখের আনন্দের হবে না। এ জীবন তার জীবন্মৃত অবস্থার সামিল। তাকে প্রতি মুহূর্তে ও প্রতিক্ষণে দগ্ধ করবেই। প্রবৃত্তি তাড়িত নিয়তির কাছে মানুষ যে কত অসহায় এ ঘটনা তার প্রমাণ। তারাশঙ্কর এভাবেই গল্পটির মধ্য দিয়ে মাঝির বাঁচার তাগিদকে বড়ো করেছেন— যা জীবনের অনিবার্য পরিণতি।

'মতিলাল' গল্পেও দেখি সহজ-সরল-সাদাসিধে মতিলাল হাড়ির উপর সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষের অত্যাচার নেমে আসার ফলে তার জীবনে হতাশার গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। গরীব হাড়ি পরিবারের এই মানুষটি বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে সঙ সেজে সকলকে আনন্দ দেয়। এটাকেই সে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে— ''মতিলালের ওই পেশা, খাটুনির নাম নাই, খায় আর ঘুমায়, যাত্রার দলের ভার বয়, তামাক সাজে আর মাঝে মাঝে সঙ সাজিয়া বেড়ায়।''[৭]

তবে সংসারের বেশির ভাগটাই স্ত্রী ভুবনের রোজগারেই চলে। তার স্বামীর কেবলমাত্র সঙ সাজার মধ্য দিয়ে আনন্দ দান করে রোজগার তা সংসার চালানোর ক্ষেত্রে মোটেই যথেষ্ট ছিল না।

মতিলাল হাড়ির সঙ সেজে প্রধানত বাচ্চাদের আনন্দ দান করত। আর স্ত্রী ভুবনকে নিয়ে ছোট ঘরে ছিল সংসারজীবন। অভাব থাকলেও তারা দুজনে আনন্দেই থাকতো। কিন্তু সে আনন্দটুকুও কেড়ে নিল উচ্চশ্রেণির মানুষের অত্যাচার ও পীড়ন। ঠেলে দেওয়া হল বঞ্চনাময় হতাশার অন্ধকারে। সঙ সেজে গ্রামের মধ্যে ঢুকলে চাপরাশির দ্বারা অপমানিত হয়। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে আনন্দদানের কাজটি সে করত। বিশেষ করে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের প্রতি তার স্নেহের টান ছিল। নিঃসন্তান হওয়ার ফলেই এ টান প্রবল ছিল। তাই শিশুদের কাছে পাবার জন্য সে কাতর ছিল। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। মতিলাল দেখতে কুৎসিত ও বৃহদাকার হওয়ায় শিশুরা ভয় পায়। একদিন মুখুজ্জেদের ছোটো পার্বতী মতিলালকে দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়, ফলে মতিলালকে অনেক অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

মতিলালের অপরাধ সে দেখতে কুৎসিত ও বৃহদাকার। তার মধ্যে শিশুদের মজা দান ও সন্তান বাৎসল্যের দিকটি স্পষ্ট হয়। তাই তো সে মুখুজ্জেদের শিশু পার্বতীকে দেখতে গিয়েছিল কিছু পেয়ারা নিয়ে। তার পরিবর্তে মতিলালের কপালে জুটেছিল— ''দরজা খুলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মতিলালের মাথায় পড়ল এক লাঠি। লাঠি মারিয়া মুখুজ্জে বলিল, বেরো শালা বেরো।''[৮] শুধু এখানেই থেমে যায়নি। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের হুকুমে মতিলালের গ্রামে প্রবেশও চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এ আদেশ শিশুপ্রিয় মতিলালের কাছে বড়ই মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক। তাই তো অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের গভীর আঘাতে তার মন থেকে চিরতরে সন্তান কামনায় ধারণ করা মাদুলি পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলতে হয়।

কাজেই মতিলাল হাড়ির মতো সহজ-সরল-সাদাসিধে মনের মানুষকে উঁচু শ্রেণির ভদ্রবাবুদের জন্য সাধের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে দিল না। প্রশ্ন এখানেই, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ বলেই কি এই পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। না কি খারাপ চেহারার এই শ্রেণির মানুষের বেশি চাওয়া ? আর তা যদি না হয়, তাহলে মতিলালের মন থেকে সন্তান স্বপ্ন মারা গেল কেন ? তাই তো গভীরবেদনা ও হতাশা নিয়ে স্ত্রীকে বলে—''আমাদের ছেলে আমাদের মত কুচ্ছিত হবে তো ভোবন, কাজ নাই।''[৯] সত্যিই এ বড় মর্মান্তিক—যা সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষের দ্বারা এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কাজেই অন্ত্যজশ্রেণির মানুষ মতিলালের প্রতি বর্বরোচিত ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই গোটা হাড়ি পরিবারের সন্তান নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা সব শেষ করে দিল।

'তিনশূন্য'- গল্পটিতে দুর্ভিক্ষপীড়িত মুচিদের জীবনকথাকে তুলে ধরেছেন। যাদের জীবন অত্যাচার জর্জরিত করুণ ও বীভৎস এবং সহায়-সম্বলহীন। এদের খাবার মনুষ্যেতর প্রাণীর খাদ্যতালিকাভুক্ত। এদের অভাব-অনটন এতটাই যে, বেঁচে থাকার জন্য ফলের বীজ, নর্দমায় গড়িয়ে পড়া ফ্যান, গরুর ডাবায় পচা ভাত, অন্যের উচ্ছিষ্ট এঁটোকাঁটা খাবার। থাকার জন্য অন্যের ভাঙা ঘরে, পড়ো ঘরে কিংবা রাস্তার ধারে কোনও মতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকে। আর লজ্জা নিবারণের জন্য পরণের পোশাক হল শ্মশান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এক টুকরো নেকড়া— ''নগ্ন দেহ, পরনে কোমরে শ্মশান থেকে কুড়িয়ে নেওয়া রক্তচিহ্নময় এক টুকরো নেকড়া।''[১০] আর সকলের চেহারা কঙ্কালের মত। পর্যাপ্ত খাবার না পেয়ে তাদের হাড় জিরজিরে হতে হয়। অপুষ্টির অভাবই মানুষগুলোকে এমন করে দিয়েছে।

কাজেই এটা স্পষ্ট যে, আলোচ্য গল্পে অন্ত্যজশ্রেণির মানুষ মুচিদের জীবন কতটা অভাব অনটনে ভরা। যার ফলে তাদের কতটা অসহায় হয়ে এই বিপর্যস্ত ও যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন কাটাতে হয়। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এদের পশুর মত বেঁচে থাকতে হয়। তারা যেন আর মানুষ থাকে না— মনে হয় মনুষ্য বহির্ভূত কোনও জন্তু বা পশু। ভিক্ষা করে খাবার অধিকারও তাদের নেই। যখনই গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি গেছে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। তার উপর জুটেছে তিরস্কার, অবহেলা ও ঘৃণা। গৃহস্থ বাড়ির চাকররা পর্যন্ত অপমান করে ঘৃণাভরে তাড়িয়ে দেয়— ''চাকরটা ঘৃণাভরে মাটিতে থুথু ফেলে বলে, হারামজাদীকে দেখলে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে, বেরো বেটার ছেলেরা!''[১১] কিংবা তেষ্টার জল চাইতে গিয়ে তাদের পড়তে হয়েছে জাতের প্রশ্নে— ''কাদের ছেলে বটিস ? মুচিদের মশায়। ... ভাগ হারামজাদা ভাগ''[১২]

আশ্চর্যের হল এই যে, একজন যুবতী মেয়ের কিছু জৌলুস রয়ে গেছে এবং তার যৌবনপুষ্ট দেহ, আর সেই দেহ পাবার লোভে তখন মুচি বলে ঘৃণা নয়— দেহ ভোগ করতে পারলেই হল। এক উচ্চশ্রেণির ভদ্রবাবু একখানি পুরোনো কাপড় ও এক ঠোঙা খাবারের টোপ দিয়ে সম্ভোগের অত্যাচারে মেতে ওঠে বারবার— ''মেয়েটা সভয়ে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু মুহূর্তে সে চিৎকার বন্ধ হয়ে যায়, মুখের উপর হাত চাপা পড়ে।''[১৩] এভাবেই উচ্চবর্গের মানুষের কুকর্মে অন্ত্যজশ্রেণির মেয়েকে শেষ হতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে জাতপাতের আর বালাই নেই। নারীর দেহ হলেই চলবে। যদিও পঙ্গু জন্তুসম ল্যালা একদিন খাবারের খোঁজে একটি বাড়িতে ঢুকে চোদ্দ-পনের বছরের এক মেয়েকে বলাৎকার করে, ঠিক যেমন তার মাকে একদিন উচ্চশ্রেণির মানুষের কুকর্মে এমনই হতে হয়েছিল। ল্যালা যেন তা সমান সমান করে দিল। গল্পের সেই অনবদ্য অংশ— ''অদৃশ্যলোকে, বিধাতার খাতার হিসেব-নিকেশ মুহূর্তের জন্য বন্ধ নেই। সেখানে জমা-খরচের একটি হিসেবে সেদিন দুই দিকেই দাঁড়ি টানা যায়। একটা হিসেব শেষ হল। নীচে পড়ল তিনটে শূন্য।''[১৪]

'বেদেনী'- গল্পে যাযাবর বেদেরা সমাজে বাজিকর রূপেই চিহ্নিত হয়। এরা নিজেদের মতো করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বেদে সম্প্রদায়ের বিচিত্র জীবনচর্যার কথা গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। এই সম্প্রদায়ের একটি মেয়ে যার নাম রাধিকা। অতি সাধারণ খাবার পাশাপাশি অতি অবশ্যই মদ খেতেই হবে। বেদেদের তাঁবুতেই জমিয়ে মদের আড্ডা বসে। চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে পাখির মাংসের টুকরো টুকরো হাড়কুচি ও মুড়ি— ''একটা পাতায় এখনও খানিকটা মাংস, আর একটায় কিছু মুড়ি, পেঁয়াজ, লঙ্কা, খানিকটা নুন, দুইটি খালি বোতল গড়াইতেছে, একটা বোতল অর্ধসমাপ্ত।''[১৫]

বেদে মানুষের তাঁবু ছাড়া নির্দিষ্ট বাসস্থানের কোনো উল্লেখ নেই। তাঁবু তাদের থাকার একমাত্র আশ্রয়। বেদেনী রাধিকা সহ শম্ভু বেদে, কিষ্টো বেদে ও শিবপদ বেদেরা রোজকারের জন্য সাপের খেলা, বাঁদরের খেলা, ঘোড়ার খেলা প্রভৃতি খেলা দেখায়। শম্ভু বেদে ও রাধিকা বেদেনী মেলাতে সার্কাস খেলায় বাঘ দিয়ে আরো আকর্ষণ করে— ''বাঘটাকে বাইরে আনিয়া তাহার উপরে শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বাঘের চুমা খায়, সর্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপন প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটা পুরিয়া দেয়, মনে হয় মাথাটাই মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল।''[১৬] এভাবেই তারা নানা জীবজন্তুর খেলা দেখিয়ে রোজকার করে। প্রধানত গ্রামীণ মেলায় ঘুরে ঘুরে ভোজবাজি সার্কাস দেখিয়ে অর্থোপার্জন করে।

জৈবপ্রবৃত্তি প্রধান এই গল্পে আদিম জৈবকামনা সমাজের নিন্দনীয় হলেও রাধিকা কেমন দুরন্ত ও স্বচ্ছন্দ গতিবেগে একের পর এক পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছে। কোনো সংস্কারের বন্ধনকে সে স্বীকার করেনি, স্বীকার করেছে আদিম জৈবপ্রবৃত্তির ডাককে। কেবল উদ্দাম ও দুরন্ত যৌবনের তাগিদে যেখানে তার প্রেম ত্যাগ ও মহিমার উপর ভিত্তি করে নয়, আদিম জীবনের উদগ্র লালসার ওপর ভর করে বেড়ে উঠেছে। সেখানে কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। সে আগুনে ঝাঁপ দেয় শুধু রাধিকাদের মতো মেয়েরা। সমাজের চোখে তা বিকৃত হলেও বেদেরা নিজেদের জীবনাবেগ নিয়েই এগিয়ে চলে যতই নগ্ন ও বর্বর বলে মনে হোক না কেন।

যাযাবর বেদে জীবনের যে উদগ্র কামনা বাসনার পাশাপাশি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও

প্রতিহিংসহার ছবি দেখি, তা সামাজিক আচার আচরণের সব সমাজকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের কোনও হেলদোল নেই। ভোগসর্বস্বতা বেদেদের জীবনবেদ। কাম উত্তেজনায় উন্মত্ত রাধিকা একের পর এক পুরুষকে নিজের কাছে টেনেছে। জীবনকে সে নগদে পেতে চেয়েছিল। তার জীবগতিতে ভোগই বড় হয়ে উঠেছে। দেখা গেছে, উদগ্র জীবন পিপাসা তথা যৌন তেষ্টা মেটাতে একাধিক পুরুষের সঙ্গলাভ করেছে। কোনো নীতিবোধের ধার ধারেনি। এটা স্পষ্ট যে উদগ্র জীবন পিপাসা জীবনের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়েছে।

'ডাইনী' গল্পে একটি অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের তথা এক ভাগ্যগত নারীর জীবনের কথা গল্পকার অপূর্ব মমতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। আর পাঁচটা নারীর মত সুস্থ-স্বাভাবিক-সুন্দর জীবন সে পায়নি। যাকে ডাইনী বলা হয়েছে সে আসলে পিতৃমাতৃহীন দশ-এগারো বছরের এক ডোমকন্যা। যার জীবন পরিণতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও করুণ। ডোমকন্যার ডাকনাম সরা, আর সম্পূর্ণ সোরধনী। ছোটো মাটির খড়ো ঘরে তার বসবাস। ভিক্ষে করে পাওয়া চাল ফুটিয়ে মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে যার অতিকষ্টে কোনও রকমে চলে যেত। অর্থাৎ এভাবেই তার বেঁচে থাকা।কিন্তু বাধ সাধল তার তীব্রতীক্ষ্ণ ক্ষুধার্তদৃষ্টি।আর সেই ক্ষুধার্ত দৃষ্টিকে 'ডাইনী-দৃষ্টি' বলে চিহ্নিত করল উচ্চ শ্রেণির মানুষ।

প্রতিদিনের মত ডোমকন্যা সোরধনী ভিক্ষা করতে বেরিয়েছিল। ব্রাহ্মণ হারু চৌধুরীর ছেলে যেদিন আম দিয়ে মুড়ি খেয়ে পেটের যন্ত্রণা হয়েছিল, সেদিন ছেলের খাবারে নজর দেওয়ার অজুহাতে হারু চৌধুরী হঠাৎ ডোমকন্যার চুলের মুঠি ধরে সানবাঁধানো সিঁড়িতে আছাড় মেরে বলেছিল— ''হারামজাদী ডাইনী, তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছো ? তোমার এতবড় বাড় ? খুন করে ফেলবো হারামজাদীকে।''[১৭] তারপর থেকে সোরধনী ডাইনী হয়ে গেল, ক্রমে তারও বিশ্বাস জন্মালো সে ডাইনী, এভাবেই সরাকে 'ডাইনী' বলে সমাজে দেগে দেওয়া হল।

আসলে সোরধনীর অভাব-অনটন ছিল, দরিদ্র তার নিত্যসঙ্গী। পর্যাপ্ত খাবার খেতে না পেরেই তো তার খাদ্যের প্রতি তীব্র তীক্ষ্ণ লোলুপ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু উচ্চশ্রেণির মানুষ সেসব দিকে গুরুত্ব না দিয়ে তাকে ডাইনী অপবাদ দিল। আর সেই অপবাদের বোঝা সোরধনীকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হল। সাবিত্রীর শিশুসন্তানের মৃত্যু, স্বামীর যক্ষ্মারোগে মৃত্যু— সবেতেই সারাকেই দায়ী করল উচ্চশ্রেণির মানুষ। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার আর কোনও পথ সে পায়নি।

ডোমকন্যা সোরধনী তো আর পাঁচজনের মত বাঁচতে চেয়েছিল। তার জন্য সে অনেক চেষ্টা করেছে, প্রয়োজনে নিজেকে সংযত করেছে, এমন কি গ্রাম ছেড়ে বারংবার সে পালিয়েছে। বাঁচার আর্তিতেই তার বাসা বদল ঘটেছে। তবুও তার যন্ত্রণার অবসান ঘটেনি, জীবন হয়েছে বিষময়। তাই তো দেখি শেষে বাঁচার আশা নিয়ে পালাতে গিয়ে ছাতিফাটার মাঠে তার বীভৎস মৃত্যু ঘটেছে। যারা তাকে ডাইনী বানিয়ে দিয়ে এভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল, শুধুই কি তাদের অন্ধ বিশ্বাস ? তা কিন্তু নয় বলেই আমার মনে হয়, কেননা এর মধ্যে আছে ছোটজাতের প্রতি উচ্চজাতের ঘৃণ্য মনোভাব। আর সেটাই এখানে প্রবলভাবে কাজ করেছে বলে মনে হয়, কিন্তু সোরধনী যদি ব্রাহ্মণ মেয়ে হতো তাহলে এত সহজে ডাইনী বানানো যেত ? যখন হারু চৌধুরীর ছেলের পেটের যন্ত্রণা কমে গেল তারপরে কেন প্রকৃত সত্যতা মেনে নিল না যে, সরার ডাইনী দৃষ্টির জন্য নয়, খাবারের বদ হজমজনিত কারণেই ছেলেটির পেটের যন্ত্রণা হয়েছিল। তাই প্রশ্ন এখানেই যে,

ডোমজাতির কন্যা বলেই কি তাকে এত সহজে ডাইনী বানিয়ে দিল ? তার ফলে বাঁচার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। শুধু সমাজের 'ডাইনী প্রথা' বলে দায় ও দোষ এড়ানো যায় না। মনের ভিতর উচ্চনীচ জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কাম্য-জাতি একটাই তাহলে মানবজাতি।

'কবি' গল্পে অন্ত্যজশ্রেণির মানুষ নিতাই হাড়ির জীবনকথা উঠে এসেছে। গরীব নিতাই স্টেশনে কুলিগিরি করে কোনও মতে দিন গুজরান করে। তার মাঝে সে যতটুকু সময় পায়, গানের রেওয়াজ করে। কায়িক শ্রম দ্বারা তার জীবন সংগ্রাম চলতে থাকে। কোনও রূপ খারাপ কাজে সে থাকে না। যা বংশ পরম্পরায় চুরি বা ডাকাতি ছিল সে পদে নিতাই হাঁটেনি। আর পাঁচজনের মত সুস্থ সামাজিক পথে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে সম্মানের সাথে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু তাতেও তাকে নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়তে হয়েছে। আর তা নেমে এসেছে সমাজের উপরতলার মানুষের কাছ থেকে।

হাড়িজাতির মানুষ নিতাই স্টেশনে কুলিগিরি করেও যতটুকু সময় পেত সে মন দিয়ে গানচর্চা করত। আর এটাই তার অপরাধ। তাই তো নিতাইকে শুনতে হয়েছে অনেক ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। অপমানিত করা হয়। মহাদেব কবিয়ালের সঙ্গে দোয়ারকি করার কথা বলা হলে ভূতনাথ অপমান সহযোগে ব্যঙ্গ করে বলে— ''নে-তাই কাক কেটেই আমোদ হোক, কাক-কাকই সই।''[১৮] নিতাই একথা শুনে আঘাত পায়। তার চোরবংশের কথা তুলে সংবোধনও করা হয়। অনেকে আবার তাকে 'কবি' না বলে 'কপি' অর্থাৎ হনুমান বলেছে। অর্থাৎ অন্ত্যজশ্রেণির মানুষেরা কবি হবে— এ কথা উচ্চশ্রেণির মানুষেরা মেনে নিতে পারেনি। নিতাই দুঃখে-অপমানে ব্যথাহত হয়ে ঠাকুরঝিকে বলেছে— ''ওই বামুনরা, আমি ছোটজাত বলেই ঠাট্টা করলে।''[১৯] কিংবা মহাদেব কবিয়ালও তাকে 'নীচুজাত' বলে অপমান করেছে।

আসলে নিতাইয়ের কবিগানে যে কবি প্রতিভা তা উচ্চশ্রেণির মানুষ মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তার কবি প্রতিভা বা দক্ষতাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে শেষ পর্যন্ত করেছে জাতিকে। নিতাই ছোটজাতের মানুষ বা অন্ত্যজশ্রেণির মানুষ বলে দমিয়ে রাখতে চেয়েছে কিংবা স্বীকৃতি দিতে নারাজ। আজও বর্তমানে সমাজে এই কৌশল বা হাতিয়ার উচ্চশ্রেণির মানুষের মধ্যে বেশ ভালোভাবেই দেখা যায়। এতেই স্পষ্ট হতে যায় নিতাইয়ের প্রতি সমাজ বৈষম্যের দিকটি।

নির্বাচিত গল্পগুলির আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখা যায় অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র অত্যন্ত করুণ। ডোম, মাঝি, বেদে, হাড়ি, বাগদী প্রভৃতি অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের জীবন যন্ত্রণায় ভরা। দারিদ্র যেন তাদের নিত্যসঙ্গী। তবুও তারা লড়াই জারি রেখেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের এই যে সমাজস্থ উচ্চশ্রেণির মানুষের কাছ থেকে সহায়তা ও সহানুভূতি পায়নি। পেয়েছে কেবল অবহেলা, অসম্মান, লাঞ্ছনা, অত্যাচার আর ঘৃণা। তাদের অপরাধ অন্ত্যজশ্রেণির মানুষ তারা। তাই যেন ভবিতব্য হয়ে গেছে তাদের এমনতর জীবনে। বারংবার নানা অজুহাতে পেষণ করা হয়েছে। আর তা করেছে সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষ। গল্পগুলি তারই প্রমাণ দেয় যে যেন উচ্চশ্রেণির মানুষের অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য গল্পকার ব্রাহ্মণ হয়েও অন্ত্যজশ্রেণির মানুষদের প্রতি গভীর মমতা ও সহানুভূতি জানিয়েছেন সাহিত্যে তাদের মর্যাদার সাথে স্থান দিয়েছেন। নিজের একান্ত আপনজন করে নিয়েছেন।

কিন্তু একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়ে আজও জাতি-বর্ণ-বৈষম্যের ছবি থেকে গেছে। বিরাট কিছু বদল ঘটেনি। বাহ্যিকভাবে না হলেও মনের ভেতরকার জিজ্ঞাসায় আজও উচ্চশ্রেণির কোপে পড়তে হয় অন্ত্যজশ্রেণির মানুষকে। আর তা যদি না থাকত তাহলে এখনো ভারতবর্ষে দলিত বিক্ষোভ দলিতদের দাবী উঠে আসতো না। এতেই স্পষ্ট হয়ে যায় অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের জীবন যন্ত্রণার সুরাহা আজও হয়নি। আশাবাদী প্রকৃত শিক্ষার আলো উচ্চ-নীচ উভয়ের ক্ষেত্রে পড়লে এ অভিশাপ থেকে আমরা মুক্তি পাব।

তথ্যসূত্র :

১। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খণ্ড) : আখড়াইয়ের দীঘি, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-খ, দশম মুদ্রণ, জুলাই ২০১০, পৃ. ২৯১।

২। ঐ, পৃ. ২৯২।

৩। ঐ, পৃ. ২৯২।

৪। ঐ, পৃ. ২৯২।

৫। ঐ, পৃ. ২৯৩।

৬। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খণ্ড) : তারিণী মাঝি, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-খ, দশম মুদ্রণ, জুলাই ২০১০, পৃ. ৪৬৭।

৭। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খণ্ড) : মতিলাল, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-খ, দশম মুদ্রণ, জুলাই ২০১০, পৃ. ৪৮৯।

৮। ঐ, পৃ. ৪৯৩।

৯। ঐ, পৃ. ৪৯৪।

১০। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খণ্ড) : তিনশূন্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-খ, দশম মুদ্রণ, জুন ২০০৮, পৃ. ৫৮।

১১। ঐ, পৃ. ৫৮।

১২। ঐ, পৃ. ৫৮।

১৩। ঐ, পৃ. ৬১।

১৪। ঐ, পৃ. ৬৩।

১৫। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খণ্ড) : বেদেনী, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-খ, দশম মুদ্রণ, জুন ২০০৮, পৃ. ২৩৬।

১৬। ঐ, পৃ. ২৩৪।

১৭। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খণ্ড) : ডাইনী, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-খ, দশম মুদ্রণ, দশম মুদ্রণ, জুন ২০০৮, পৃ. ২৪৪।

১৮। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খণ্ড) : কবি, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-খ, দশম মুদ্রণ, জুন ২০০৮, পৃ. ৩১৬।

১৯। ঐ, পৃ. ৩২৩।

প্রান্তজনের প্রতিবাদ (বৈতালিক, মায়ামৃদঙ্গ)

ড. দীপক দাস

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'চিরকালই, মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে, সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধা সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।'—

আধুনিক কবিরা যখন সকলেই আধুনিক নগর চেতনায় উদ্বুদ্ধ, যান্ত্রিক সভ্যতার জটিলতায় যন্ত্রণাবিদ্ধ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ তখন চিরায়ত গ্রামীণ জনপদ, আবহমান লোকজ ঐতিহ্যের সুস্মিত ধারায় পরিস্নাত এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী সৃজনশীলতায় ভাস্বর। বাংলার গ্রামীণ জনপদ, নদীনালা, খালবিল, মাঠ প্রকৃতির ভুবন ভোলানো রূপ, তার ঋতুবৈচিত্র, মাঠে মাঠে সোনার বরণ ধান, মাঠের সবুজ শ্যামল ক্ষেত্র, কলমীর দাম, রাখাল ছেলের মনোহর বাঁশির সুর, পল্লিকুমারীর শ্যামছায় স্নিগ্ধ, তার উদ্দাম কেশরাশি রঙিন নায়ের মাঝি, সেই সব গতিময় জীবনের প্রেরণাদাত্রী চারণ কবিগান ও আলকাপ, আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় অসাধারণ ভাবে এই দুই কবির উপন্যাসে ফুঁটে উঠেছে লোকজ শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে ও লোকায়ত জীবন স্বভাবের অন্তরের বর্ণনায় উভয়েই অনন্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ, তারাশঙ্কর-মানিক বিভূতিভূষণের ঠিক পরপবর্তী পর্যায়ের কবি নারায়ণ বাবু সমকালে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। উপন্যাসের সংখ্যাও অনেক। তিনি নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা, নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা সমালোচনা-সাহিত্যে দক্ষতা এই সব নিয়ে কথাসাহিত্যের জগতে এসেছিলেন। নিজের লেখা নিজেই সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস তাঁর ছিল। তাই তিনি পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন বৃহত্তর সমাজ জীবন নিয়ে তাঁর কারবার। সংসারের সীমানা প্রথম থেকেই তিনি পেরিয়েছিলেন। মানুষের ব্যক্তি জীবনের ঘটে পাকানো অভ্যন্তরের ভাবনা নিয়ে আবর্তিত হওয়া তাঁর অভিপ্রায় নয়। সমাজের অবস্থা ও বিবর্তনকে গুরুত্ব দিয়ে মানুষের জীবন ও ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি সরাসরি রাজনীতিকে উপন্যাসের মূল আলোচ্যরূপে গ্রহণ করেছেন

বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সামাজিক জীবনের সঙ্গে মিশে যায় তাঁর রাজনৈতিক চেতনা। মার্কসবাদে তিনি গভীর আস্থাশীল ছিলেন, একটা দেশ কালব্যাপী বড় ক্যানভাসের পটভূমি আছে আনেক লেখায়। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, তিনি দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ এবং উত্তর পশ্চিমবঙ্গের দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক, তাঁর মধ্যে বাস করা মানুষদের নিয়ে উপন্যাস লিখতে গিয়ে আঞ্চলিকতাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। দলবদ্ধ মানুষের আচার আচরণকে, নানা ধরনের আদিবাসী গোষ্ঠীকে উপন্যাসে গুরুত্ব দিয়েছেন। লেখক যে এইসব শোষিত মানুষের পদভূক্ত তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিকে' দিনাজপুরের একটি মুচি প্রধান অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ও শ্রমজীবি মানুষের অত্যন্ত নিচের দিকের একটা গোষ্ঠী বেছে নিয়েছেন। এই উপন্যাসটিতে তিনি স্থানীয় কথ্য ভাষা রীতিকে অবলম্বন করেছেন অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে। উপন্যাসটির প্রাথমিক কাঠামো ১৩৫৪ 'শারদীয়া স্বরাজে' প্রকাশিত হয়েছিল। কবিগুরু যে তারাশঙ্কর তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 'কবি' উপন্যাসে ডোম কবিয়াল নিতাইয়ের প্রেরণায় যে বৈতালিকে আলকাপ গাইয়ে যোগেন মুচির পরিকল্পনা তা পড়লেই বুঝতে পারা যায়। উপন্যাসটিতে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন রয়েছে, মুচিদের পল্লী জীবনকে আশ্রয় করে তা সমাজের প্রান্তবর্গের দলিলে পর্যবসিত হয়েছে। 'কবি' উপন্যাসেও রাঢ় এর ডোম-মুচিদের জীবন অর্থাৎ প্রান্তবর্গ সমানভাবে ব্যক্তিগত হৃদয় তরঙ্গের সঙ্গে ওতপ্রত ভাবে চওড়া তুলির টানে চিত্রিত নারায়ণ বাবুর এই উপন্যাসে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমকালে লেখা। লেখক ভূমিকায় বলেছেন—

'বইয়ের ঘটনাকাল ১৯৩৪ সাল। যখন বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের সমাপ্তি যুগ আর গণ আন্দোলন আসবার পূর্বাভাস'।

'বৈতালিক' উপন্যাসটি যতই রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে রূপদেবার লেখা হোক না কেন, তা আসলে আমাদের সমাজের সেই সব মানুষের কথা যারা ভদ্র ভাষায় প্রান্তজন নামে পরিচিত। এখানে বিপ্লবী বংশীমাষ্টার 'রুইদাস' সম্প্রদায়ের মানুষ গুলোকে নাড়া দিয়ে জাগাতে চেয়েছে। যোগেন, সুশীলা, ধলহি, মহিন্দর, ভূষণ রুইদাস, সুরেন রুইদাস সবাই সেই তথাকথিত প্রান্তজন। এরা অবশ্য নিজেদের অবস্থান— পিতৃ প্রদত্ত নাম— নিয়ে বেশ গর্বিত। প্রাইমারী স্কুলের গুরু, ট্রেনিং স্কুলের পোস্টমাষ্টার বংশী পরমানিক নাম দস্তখত করতে শিখিয়েছে এদের। অনেক বুঝিয়েছেন বংশী মাষ্টার মহিন্দর কারো নাম হয় না, ওটা হবে মহেন্দর। শুনে চটে মহিন্দর বলেছে—

'তুই ইটা কী কহিছেন হে মাস্টার ? বাপ যিটা নাম দিলে, ওটাই বদলুম কেমন করি ? হামি মহিন্দর আছ; মহিন্দরই থাকিবা চাহি। বাপের নাম ছাড়িবা কহোছ। কেমন মানুষখানা হে তুমি ?'

দীর্ঘদীন ধরে চলে আসা অভ্যাস নিয়ম কার্যত প্রথায় পরিবর্তিত হয়েছে। সারা

জীবন এরা সমাজের উঁচু স্তরের মানুষদের কাছে অবহেলার পাত্রই রয়ে গেছে। এদের জীবন মূলত নির্ভর চামড়া, জুতো প্রহারের সহ্য করাতে, এমনিতেই এরা যে পরিবেশে বাস করে সেটাও লেখক দেখিয়েছেন—

'দুধের চামড়া ধোয়া পচা জলের উৎকট গন্ধ, এদিকে ওদিকে কাঠি দিয়ে আঁটা টান করা চামড়া শুকোচ্ছে রোদে, দরজার গোড়ায় ঝুলছে সমাপ্ত অসমাপ্ত জুতোর রাশ, দুটো একটা ঢাক পড়ে আছে এদিকে ওদিকে একটা পাঁটার ট্যাং নিয়ে শুরু হয়েছে তিন চারটে কুকুরের কলহ ...।'

বুঝতে অসুবিধা হয় না এরা সমাজের একেবারে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষ। অবশ্য এদের ছাড়াও সমাজের একদিনও চলে না। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে জেলে পাড়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক ব্যঙ্গ করে বলেছেন— 'ঈশ্বর থাকেন দূরে ঐ ভদ্রপল্লিতে...।'

শিক্ষার অধিকার এদের নেই তা নয়, কিন্তু সেটা তাদের পাওয়া হয়ে ওঠেনি। সারাটা জীবন শুধু উদয়াস্তু পরিশ্রম, পেট ভরে খাওয়াও জোটে না, অবশ্য শোষণ নিপিড়ন অবহেলা প্রাণ ভরে আস্বাদনে করে চলে। তাইতো সারাদিনে ক্লান্তি, অপমান ভোলার ব্যর্থ চেষ্টায় আশ্রয় নেয় সোমরস ওরফে পচাই, চোলাই, তাড়ির সাময়িক আবেশে। উপন্যাসে ভূষণ রুহিদাসের বাড়ির মদ— নাচ গানের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে দশবারোটা তিরিশেক বোতল, পচহিয়ের ভাড়গুলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। নেশায় বুঁদ হয়ে নাচ গান বেশ জমিয়ে তুলেছে।—

নাগর হে, ইটা তুমার কেমুন আজ,
লিয়ে করে মোহন বাঁশি
কুল-মান দিল্যা নাশি,
পরানে পয়হিল্যে ফাঁসি
কুনঠে বা মুই রাখিম লাজ
হে, ইটা তুমহার কেমুন কাজ'—

বোঝা যায় বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ নই, এদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম ভালোবাসা সেটা বৈধ হোক অবৈধ হোক সবই সুন্দর ভাবে নির্দেশিত।

উপন্যাসটিতে বংশীমাষ্টার যোগেনকে তাঁর রাজনৈতিক অভিসন্ধির হাতিয়ার করার চেষ্টা করেছে। যোগেনও একজন রুইদাস সম্প্রদায়ের মানুষ। অবশ্য সে কিছুটা শিক্ষিত, মনে মনে কবিয়াল স্বপ্ন দেখেছে। আর বংশী মাষ্টার তাকে প্রতিবাদী আলকাপ ওয়ালা করে গড়ে তুলতে চেয়েছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে সুশীলার কথা বলা বড় প্রয়োজন কেন না তাঁরই সংযোগে সংরাগে যোগেন প্রতিবাদী আলকাপ ওয়ালা হয়ে উঠেছে। যোগেনের প্রেমের গান।—

'বধূর লাগি মাথায় নিলাম কলঙ্কের ডালা
সেই কলঙ্ক ফুল হল মোর গলার মালা।'

একদিকে আমারা পাই প্রেমিক যোগেনকে, যার মনের শরতের শিউলি চালে ঝাঁকুনি লেগেছে। ফুল ঝরেছে রাশি রাশি। পরী রাজ্যের রাজকন্যা নেমে এসেছে তার জীবনে। সুশীলার কানে কানে তার প্রেমের কথা সুর হয়ে ঝরে পড়েছে।

'তুমি আমার পরান হে কইণ্যা,
সাপের মাথার মনি
তুমারে আগুলি রাখি দিবস রজনী।
দিনে তুমি দিনের আলো
রহিতে ঘুচাও রহিতের কালো,
মরিব মরিব কন্যা—
তোমা হারাইমু যখন—'

অবশ্য এই সুর আধুনিক শিক্ষিত মার্জিত সমাজের যুবকের নয়, যারা তথাকথিত ভদ্দরলোক নয়। এরা একেবারে মাটির কাছের মানুষ, যারা জীবনের রসদ মাটি থেকেই আহরণ করে বেঁচে থাকে। ঔপন্যাসিক একেবারে দিনাজপুরের মুচি সম্প্রদায়ের মুখের ককনি বুলিকে তুলে ধরেছেন এইসব মানুষগুলো প্রতিনিয়ত প্রতাড়িত হতে হতে একেবারে জীবন শক্তি হীন হয়ে পড়েছে। অবশ্য নিজেদের মধ্যে অশ্রাব্য গালি গালাজ করে অনেকটা স্বস্তি অনুভব করে। সুরেনকে বলতে শোনা যায়—

'কুনটে গেইছে হারামজাদা ?
হামি কহিবা পারি না
সিটা পারিবা ক্যানে ? খাছ, দাছ, গায়
ফুঁ দিই বেড়াছ।'

যারা একেবারে সমাজে কোন মূল্য পায় না, সমাজে মানুষ বলে গণ্য নয় সমাজ উচ্চবৃত্ত শ্রেণি যাদের মাথায় – পা রেখে সভ্যতার উঁচু মিনারকে স্পর্শ করছে তাদেরকে বংশী মাস্টার হাতিয়ার করে নিয়েছে। তিনি খুব ভালো করেই জানেন এই সর্বশান্ত শ্রেণিই পারে সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে। তাইতো প্রান্তজনের প্রতিনিধি হিসাবে খোকনকে বেছে নিয়েছেন। এই খোকন প্রান্তজনের প্রতিবাদী করে তোলার জন্য আলকাপ নামক এক লোকনাট্যকে হাতিয়ার করে তুলেছে। চাষীর বঞ্চনার কথা তার আলকাপে।—

'ক্ষাত ক্ষাত ফসল ভরা
হামার সোনার মাটি।
সেই ফসলের হতাশ লিয়ে
মিছাই মরি ঘাটি।
গায়ের লোহু হৈল পানি,
ভুখার জ্বালায় যায় পরানি

আর ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলিয়া
তুমি খাছ ক্ষীরের বাটি,
হায়রে বরাত হাইরে—'

আবার এই যোগেনই গেয়ে উঠেছে—

'প্যাটের জ্বালায় জ্বলি গেলরে দিনমান।
কাঁদি কাঁদি জীবন যাবে, গরীবের নহি ভগবান।
বড়লোক রসের ঠাকুর,
মোরা হইনু পয়ের কুকুর
লাথি জুতার বরাত করি সহি ক্যাতে অপমান,
কাঁদি ক্যানে ফুলাছ চোখ, গরীবের নাই ভগবান-'

সবইতো সমাজের প্রান্তজনদের কথা। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদেও অনুরূপ প্রান্তজনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে দেখা যায়—

'নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই যাই সো বাহ্মণ নাড়িয়া।'—

চর্যাপদের ডোম ডোমনীরা সমাজের প্রান্তজন ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অবশ্য 'বৈতালি'কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শুধু প্রান্তজনদের অবস্থান, জীবিকা, শোষণ-পীড়ন শুধু চিত্রিত করেননি পাশাপাশি এই প্রাক্তজনদের প্রতিবাদী সত্তাকেও উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শেষে তারা আর অসহায় নয়, প্রতিবাদী—

'হায়বে হায়, দ্যাশের একি হাল,
কুনবা পাপে এমন করি
পুড়িলে কপাল ?
মহাজন রক্ত চোষা
জমিদার ফোঁস মনসা
দারোগা সে লাটের ছাওয়াল
মোদের হৈল কাল
...   .
বাঁচার নামে বিষম জ্বালা,
সকল হৈল ঝালাপালা-
ওই তিনটি শালাক মারি খ্যাদাও
ঘুচুক এ জঞ্জাল
আর কতকাল সহিবা ভাই
দ্যাশের পোড়া হাল।'

বুঝতে অসুবিধা হয় না 'বৈতালিক' উপন্যাসে সমাজের একান্তই প্রান্তজনরা তাদের অভাব অভিযোগ প্রেম প্রতিবাদ নিয়ে সত্যিই অনবদ্য। আশা করা যায়

আধুনিক বাক্সবাড়ি কালচারে অভ্যস্ত মানুষেরা উপন্যাসটি পড়ে প্রান্তজনদের খুব কাছ থেকে দেখতে পাবে।

দ্বিতীয় উপন্যাসটির লেখক সদ্যপ্রয়াত সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, উপন্যাস 'মায়ামৃদঙ্গ'। ১৯৩০ সালে ১৮ অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার খোশবাসপুর গ্রামে সিরাজের জন্ম। বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌশী। ছোটবেলা থেকেই সিরাজের জীবনটা বৈচিত্র্যে ভরা। কখনও সিরাজের বিচিত্র খেয়াল আবার কখনও কঠোর বাস্তব সিরাজকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে দেশে, বিদেশে, গ্রাম বাংলার কোনায় কোনায়। তাঁর সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে— কখনো উপন্যাসের পাঁজরে পাঁজরে কখনও বা ছোটগল্পের চোখের কোনে। আর তাঁর অনেক লেখাই এগারো ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে ছুঁয়ে ফেলেছে আপামর ভারতীয় এবং বিশ্বের পাঠক হৃদয়।

সিরাজের শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল গোকর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারপর গোকর্ণ প্রসন্নময়ী হাইস্কুলে। কিন্তু তার বোহেমিয়ান জীবনের কারণে তাঁকে পরে ভর্তি করা হয়েছিল বর্ধমানের এক হাইস্কুলে। মাট্রিকুলেশন পাশ করার পর ভর্তি হন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি চলে যান চাকরি নিয়ে। আবার চাকরি ছেড়ে চলে আসেন। তারপর বাংলার জনপ্রিয় লোকনাট্য, আলকাপ দলের সঙ্গে ঘুরতে লাগলেন মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, বর্ধমান, চব্বিশপরগণার অলিতে গলিতে। খুব তাড়াতাড়ি প্রতিভাবান সিরাজ হয়ে উঠলেন আলকাপের দলের বাঁশিবাদক থেকে নাচ ও অভিনয়ের শিক্ষক অর্থৎ স্থানীয় ভাষায় আলকাপ দলের ওস্তাদ- তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নীল ঘরের নটী' প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। কলকাতায় এসে তাঁর সমসাময়িক কবি সাহিত্যিক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি সমান তালে তাল রেখে এগিয়ে চলল সিরাজের সাহিত্যের বিজয় রথ।

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের ফেলে আসা অতীত জীবন ধরা পড়তে লাগলো তাঁর লেখা উপন্যাসে, গল্পে। জীবনের শুরু থেকে বাকি জীবনে অনেকটা সময় তাঁর কেটে ছিল কান্দি মহকুমার দ্বারকা নদীর অববাহিকায় উন্মুক্ত প্রাকৃতিক শোভা দিয়ে ঘেরা হিজল এলাকায় সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের একাধারে আত্মজৈবনিক এবং ডকুমেন্টারী উপন্যাসটি হল 'মায়ামৃদঙ্গ'। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। যখন তিনি উপন্যাসটি লিখছেন তখন তিনি কলকাতায় চলে এসেছেন, এবং সেই মায়াময় লোকসংস্কৃতির জগত থেকে নির্বাসিত। জীবনের অভিজ্ঞতাকে লোকনাট্য আলকাপের ছাঁচে বেঁধেছেন উপন্যাসটিতে। আমরা প্রত্যেকেই জানি লোকসাহিত্য লোকনাট্য সমাজের সেইসব মানুষদের হাতিয়ার যারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদ করতে পারে না, নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাতে পারে না। লোকনাট্য তাদের কাছে পরমাত্মীয়ের মত। উপন্যাসটিতে তিনি কতকগুলি চরিত্র পাত্রের মাধ্যমে 'আলকাপকে' তুলে

ধরেছে। এখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নীচুতলার মানুষদের সখ আহ্লাদের চিত্রই চিত্রিত।

আলকাপ সৃষ্টির সূচনা লগ্নে যে আলকাপের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় গ্রামে কিছু একেবারে নীচুতলার মানুষ গ্রামের দূরে কোন বাঁশবাগানে একত্রিত হয়েছে। তারপর নিতম্বে ও মুখে চুনকালি মেখে নিজেদের দুঃখের কথা যন্ত্রণার কথা সুরের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। মালদহ জেলার একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য গম্ভীরার কথা সকলেই জানেন। সেখানে মানুষকে শিব সাজিয়ে আর সকলকে তার সামনে সারা বছরের দুঃখের কথা বর্ণনা করা হয়। আসলে নিজের দুঃখের কথা অধিকারের কথা শুধুমাত্র সমাজের এইসব মানুষরাই বলতে পারেন না যারা সমাজের পটে অপরিহার্য হলেও ব্রাত্য অর্থাৎ প্রান্তজন মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসে আমার মুচি, ডোম, বাগদী, নিম্নবর্ণের মুসলমান সমাজের মানুষের কথাই পায়। যারা সারা বছর চামড়ার কাজ করে মাঠে কায়িক প্ররিশ্রম করে আর আলকাপের সিজিনে গান বাজনা করে। ঔপন্যাসিক আলকাপের নাচিয়ে ছোকরাদের বর্ণনায় বলেছেন—

> ‘বলেছে মহাশয়গন। জন্ম যদিও অভাজন চাঁই কুলে,
> মাতৃভাষা ঘোট্টাই বুলি, পেশা কিনা নগণ্য
> সব্জীচাষ, বাস মা জাহ্নবী কুলে—।’

বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না এরা কারা। এরা যাদের পৃষ্টপোষকতায় গানে আসর বসায় তারা হলেন জুয়াড়ী। আসলে জুয়াড়ীরা জুয়ার আসরে লোকটানার জন্য এই আলকাপ গানের পালা বসাতেন। সারারাত জেগে নাচ গান চলতো আর লোকচক্ষুর আড়ালে হত জুয়া মদের আসর। উপন্যাসে চন্দ্র জুয়াড়ীর বিনোদিঘীর মেলার কথা পাওয়া যায়। গালাগালি এদের ঠোটে যেন লেগেই আছে মধুর বচনের মত। এরা বাধা ধরা নিয়মের ধার ধারে না—

> ‘জামা পাজামা সব খুলে আন্ডার প্যান্ট পরে গন্ডা
> কালো জ্বলে নেমেছে শান্তিচরণ। আলকাপদলের
> মানুষেরা বড় নিলাজ হয়...।’

রাত যত গভীর হোক, পথ যত দুর্গম হোক বিরূপ তবু স্বভাবে ওরা তুখোড় আর দুল্লোড়বাজ। চলতে চলতে ওরা গান গায়, কোমর দোলায়, পথেই ‘কাপের’ ভাষায় কথা বলে। ওদের রসিকতা শ্লীলতার চোখরাঙান আদালতি হুকুম মানে না। দিন দুপুরে পথের উপর হিসি পেলে, শিশুর মত সবার চোখের সামনে অকাজ সারতেও অনেক তুখোর আলকাপওয়ালা পিছপা হয় না। আর এমন সব শাস্ত স্তব্ধ ঘুমন্ত রাত পেলে ওদের তো ষোলকলা পূর্ণ। চেঁচামেচি করে সবার ঘুম ভাঙিয়ে পথ চলে। চকিত বিরক্ত গেরস্থ মানুষ একটু পরেই বুঝতে পারে আলকাপেরা যাচ্ছে।

উপন্যাসটিতে ঝাঁকসু, ধনঞ্জয় সরকার, বনমালী ওস্তাদের কথা বর্তমান। গোপাল ওস্তাদের দলের ছোকরার ‘কাপে’ প্রান্তিক বর্গের মানুষের বেলেল্লাপানার ইঙ্গিত বর্তমান।

গায়ের দুষ্টু ছেলে আঁকড়ি— বাবা-মা তার বিয়ে দিচ্ছে না। তাই সে একদিন বাবা-মা কে জব্দ করতে গিয়ে, মায়ের অনুপস্থিতিতে বাবাকে বলেছে—

'বলব কী আর দুঃখের কথা, পিতা
মা মজেছে নানা রঙ্গে
ওপাড়ার এক মোড়লের সঙ্গে
কইছে কথা, পিতা...।'

অনুরূপ ভাবে ফিল্মের ফেড অডিট ফেডহিন ঢঙে ছেলেরূপী জাগু মাকে বলেছে—

'বলব কী আর দুঃখের কথা, মাতা
পিতা মজেছে নানা রঙ্গে
ওপাড়ার এক ছুড়ির সঙ্গে
কইছে কথা, মাতা ...।'

অশ্লীল ধরনের এক উত্তেজনা ফেটে পড়েছে আসরে। অমার্জিত ভাষা, চাষাড়ে ইতরামি শুধু মনে হয়। এরা অবশ্য শুধু এই সবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের দোশ ত্রুটি গুলিও বিচক্ষণতার সঙ্গে উদ্ঘাটন করেছেন। মানুষের বিভেদকে মুছে ফেলতে চেয়েছে—

'হেথা, বাদশা ফকির সবাই সমান
হিন্দুরা শ্মশান বলে, মুসলমানে গোরস্থান।।
আবার- এই খানেতে যিনি খোদা
সেই খানেতেই ভগবান
সনাতন রায় ভেবে বলে
মুদলে চক্ষু যাব চলে
হিন্দু ভাইরা বলুন হরি, আল্লা বলুন মুসলমান।।'

আবার ওস্তাদ ঝাকসা বলেছেন—

'আমরা যত মাঠের কবি, কবি তুমি রাজসভার
ধন্য ধন্য বিশ্ব কবি বিশ্বেরো মাঝার।
(আমারা) ছোটলোকের ছোট কবি
বড়লোকের তুমি রবি
দশদিকে যদি করলে আলো
আমরা কেন অন্ধকার
হায়গো, আমরা কেনঅন্ধকার।

সত্যিই প্রান্তজনের মধ্যে আজও অন্ধকার রয়েই গেছে যা হয়তো কখনই দূর

হবে না, আসলে এরা 'সভ্যতার পিলসুজ' – এরা উপরের সবাইকে আলো দান করে কিন্তু নিজেরা সারাজীবন অন্ধকারেই থেকে যায়, এদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। আসলে যেখানে পাপ, জঘন্যতা, প্রতিমার বুকের ভেতর শুকনো পাঁক খড় আবর্জনা সেখানেই এই প্রান্তজনেরা শান্তি, ধনঞ্জয়, ঝাঁকসা, ফজল, সুবর্ণ, অধীর, সনাতন, সুধা, কাদু, গঙ্গা, সবাই সমাজের সেই প্রান্তজন। আসলে ঔপন্যাসিক সিরাজ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি চয়ে ফেলেছিলেন। এদের মাঝে থেকেছেন, এদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছেন। তাইতো মাটির মানুষ সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের 'বৈতালিক' প্রান্তজনদের আত্মপ্রকাশের মঞ্চ হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বৈতালিক, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম স্ট্রীট, কলকাতা ১২, চৈত্র ১৩৫৪ পৃ. ৫০।

২. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, ১৯৯৫, পৃ. ২২-২৩।

৩. মহবুব ইসলাম, নবাবগঞ্জের আলকাপ গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪।

৪. লোকশ্রুতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ১১২।

৫. মোহিত রায়, বোলান লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, নভেম্বর, পৃ. ২।

৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গণদেবতা, ২০ কার্তিক, ১৩৪৯ (১৯৪২ সাল)।

৭. অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী, লোকনাট্য বোলান, লোকশ্রুতি, ষষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯৬৯ (মার্চ ১৯৯০)।

ভারতবর্ষে আবহাওয়ার ইতিহাস চর্চার গতি প্রকৃতি

ড. দীপান্বিতা দাশগুপ্ত

সুদূরাতীত কাল থেকে মানুষ আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে সচেতন। বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, হিমানী সম্প্রপাত, অগ্নুৎপাত, অতিবৃষ্টি ও তীব্র বায়ুপ্রবাহ অথবা দাবদাহ মানব সমাজের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। আবহাওয়ার ইতিহাস ও তার গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে চর্চা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে। বিশ্বযুদ্ধ শুধু বিনাশই ঘটায়নি, যুদ্ধ মানব চিন্তা ধারায় বিস্তর পরিবর্তন এনেছিল। সেই পরিবর্তনের সূত্র ধরে শুরু হয় নতুন জ্ঞান চর্চার ধারা। যুদ্ধোত্তর কালে একাধিক নতুন ধরনের ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত ঘটে পশ্চিমে। ১৯৬০ এর দশক থেকে সূত্রপাত ঘটে নারীবাদী ইতিহাস, আফ্রিকান-আমেরিকান ইতিহাস, চিকানো ইতিহাস এবং গে-লেসবিয়ান ইতিহাস চর্চার।[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কালে স্কটিশ ও ব্রিটিশ মেডিক্যাল জিওগ্রাফার মূলত এডওয়ার্ড গ্রিন ব্যালফোর, হিউ ক্লেগহর্ন, উইলিয়াম রক্সবার্গ, আলেকজান্ডার গিবসন অভিমত ব্যক্ত করেন যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মূলত বন্যা, খরা, অগ্নুৎপাত ও তীব্র বায়ু প্রবাহ সাথে রোগ জীবাণুর প্রাদুর্ভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[২] পরবর্তীকালে এক গোষ্ঠীর ভূগোলবিদ, যারা সারস্বত সমাজে জিওগ্রাফিক্যাল ডিটারমিনিস্ট রূপে পরিচিত ছিলেন, অভিমত পোষণ করেন যে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধারার অনুসারী স্যার হালফোর্ড ম্যাকিন্ডার, হান্টিংটন ও গর্ডন ইস্ট তাদের লেখনীর মাধ্যমে ব্যক্ত করেন যে ইউরোপের ঔপনিবেশিক আধিপত্য কারণ ছিল ইউরোপের শীতল প্রাকৃতিক পরিবেশ আবার অন্যদিকে প্রাচ্যের পশ্চাৎপদতার কারণ ছিল প্রাচ্য দেশগুলির উষ্ণ আবহাওয়া।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালে অ্যানাল স্কুলের ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে আবহাওয়ার ইতিহাস চর্চার এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়। অ্যানাল স্কুলের ইতিহাসবিদ চার্লস গ্ল্যাকেন, ইমানুয়েল লাদুরি ও ফার্ননান্ড ব্রডেলের নেতৃত্বে আবহাওয়ার ইতিহাস একটি স্বীকৃত ইতিহাস চর্চার ধারায় রূপান্তরিত হয়। তারা তাদের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন

যে আবহাওয়ার ইতিহাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের এক অনন্য সাধারণ প্রভাব রয়েছে মানব সভ্যতার ইতিহাসের উপর।[৩]

উপনিবেশিকতাবাদের অবসানে দক্ষিণ এশিয়ার সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলিতে আবহাওয়ার ইতিহাস চর্চার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়, বিংশ শতকের শেষের তিনটি দশকে। এই সময়কালে রামচন্দ্র গুহ ও মাধব গ্যাডগিলে আলোচনার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক বন আইন। তারা তাদের একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন যে ঔপনিবেশিক বন আইনের ফলে ভারতবর্ষের অরণ্যচারীগণ, যারা স্মরণাতীত কাল থেকে বনজ সম্পদ সংগ্রহের বংশানুক্রমিক অধিকার লাভ করেছিল, তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। রামচন্দ্র গুহের মতে ব্রিটিশ বন আইনের উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশিক শোষণকে সুনিশ্চিত করা।[৪] রামচন্দ্র গুহ ও মাধব গ্যাডগিলের মতের বিরুদ্ধে রিচার্ড গ্রোভ অভিমাত ব্যক্ত করেন যে উপনিবেশিক বন আইনের উদ্দেশ্য ছিল বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ও সুপরিকল্পিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করা। তিনি আরও বলেন বিশ্বব্যাপী মরুভূমির বিস্তার সম্পর্কে ধারণা ও বাৎসরিক খরা এবং অনাবৃষ্টি ব্রিটিশ সরকারকে প্ররোচিত করেছিল বন সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন করতে।[৫] রিচার্ড গ্রোভ আরও উল্লেখ করেন যে বন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের কোন সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী উদ্দেশ্য ছিল না কেবলমাত্র বনজ সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতবর্ষের আইন প্রবর্তন করে, যথেচ্ছ বনজ সম্পদের ব্যবহার বন্ধ করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে মহেশ রঙ্গরাজন মনে করেন পৃথিবী ব্যাপী শুষ্ক অঞ্চলের বৃদ্ধি ভারতবর্ষে বন আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে স্বল্প প্রভাব বিস্তার করেছিল। অজয় সকাড়িয়ার মতে বন আইন প্রবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শোষণকে নিশ্চিত ও সুদৃঢ় করা।

বিগত কিছু বর্ষে আবহাওয়ার ইতিহাস চর্চার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। শুধুমাত্র বনজ সম্পদ ছাড়াও জীবজগৎ পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, মহামারী, অতিমারি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে আবহাওয়ার প্রভাব ফুটে উঠেছে ইতিহাসবিদদের গবেষণায়। শেষের দুই দশকে সংখ্যাগত দিক থেকে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আবহাওয়ার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা সংখ্যা অনেক বেশি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি, আসাম ইউনিভার্সিটি, গৌহাটি ইউনিভার্সিটি, মিজোরাম ইউনিভার্সিটি এবং নাগাল্যান্ড ইউনিভার্সিটি এদের মধ্যে অগ্রণী। খুব অল্প সময়ের মধ্যে, আবহাওয়ার ইতিহাসের ওপর এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঞ্চাশটিরও বেশি গবেষণা সফলভাবে সংগঠিত হয়েছে অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্তী, সজল নাগ, মহুয়া সরকার, শুভাশিস বিশ্বাস ও রূপ কুমার বর্মণ প্রমুখের অধীনে। উত্তর ও উত্তর পূর্ব ভারত বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা যেমন পরিপূর্ণ তেমনি প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে আসছে। ফলে বিভিন্ন সময়ে

ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে আবহাওয়া জলবায়ু তথা প্রাকৃতিক পরিবেশ।

নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটিতে যেমন গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে গারো পাহাড়ের ভূমিরূপের বিবর্তনের ইতিহাস, খাসি পাহাড়ের বনাঞ্চলের বিনাশের ইতিবৃত্ত অথবা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় জলাভূমির ইতিহাস, তেমনি আবার আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে মনিপুরের মানব সমাজের ওপর জলবায়ুর প্রভাব, আসামের বন্যা ও দুর্ভিক্ষের ইতিহাস, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার শিকারের ইতিহাস। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আবহাওয়ার ইতিহাস চর্চার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে।

তথ্যসূত্র :

১. ইসেনবের্গ, এন্ড্রু সি, দ্যা অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ এনভারনমেন্টাল হিস্ট্রি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪, পৃ. ৬।

২. এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উইলিয়াম রক্সবার্গ (১৭৫১-১৮১৫), জেমস জনসন (১৭৭৭-১৮৪৫), স্যার জেমস রেনেল মার্টিন (১৭৯৬-১৮৭৪), আলেকজান্ডার গিবসন (১৮০০-১৮৬৭) প্রমূখ।

৩. চার্লস গ্ল্যাকেনের The Great Loochoo', `Traces on the Rhodian Shore: Nature and the Culture in Western Thought, From Ancient Times to End of the Eighteenth Century, ইমানুয়েল লাদুরির History of France Regions (2001), History of the French peasants of the Black Death to the Revolution (2002), Histoire humaine et comparée du climat (2004) ও ফার্নান্ড ব্রডেলের The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II (1949) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪. রামচন্দ্র গুহ ও মাধব গ্যাডগিলছাড়াও এলিজাবেথ উইথকম, মহেশ রঙ্গরাজন, বীণা আগারওয়াল, রঞ্জন চক্রবর্তী ও সজল নাগ প্রমূখ আবহাওয়ার ইতিহাস চর্চায় উল্লেখ্য অবদান রেখেছেন।

৫. বিশ্বব্যাপী মরুভূমির বিস্তার সম্পর্কে ধারণাটি বিংশ শতকের প্রথমদিকে ইউরোপ আমেরিকা ও ভারতবর্ষের চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রভাব বিস্তর করে ছিল।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. মাধব গেডগিল ও রামচন্দ্র গুহ, দিজ ফিসাড ল্যান্ড : আন ইকোলজিকাল হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৮।

২. রিচার্ড গ্রোভ, গ্রীন ইম্পেরিয়েলিসম, কলোনিয়াল এক্সপানশন, ট্রপিক্যাল ইডেন'স এন্ড দ্যা অরিজিন অফ এনভাইরনমেন্টালিসম, ১৬০০-১৮০০, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

৩. জে. ডি.হুগস, আন ইনভারমেন্টাল হিস্ট্রি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড: হিউম্যানকাইন্ড চেঞ্জিং রোল ইন দ্যা কমিউনিটি অফ লাইফ, রাউথলেজ, ২০০৯।

বরাক উপত্যকার শ্রীহট্টীয় মূলের ব্রত 'রূপসী': প্রসঙ্গ আচার ও গীত

ড. কালীপদ দাস

উত্তরপূর্ব ভারতের দক্ষিণ অসমের কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে অধুনা বরাক উপত্যকা নামেই অভিহিত করা হয়। বরাক উপত্যকা মূলত তৎকালীন সুরমা উপত্যকারই খণ্ডিত অংশ। এ অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, লোকায়ত জীবনশৈলী শ্রীহট্টীয় চেতনার উত্তরাধিকারী।

শ্রীহট্টীয় জীবন ধারার সঙ্গে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক, ভাষিক, লৌকিক ও মনস্তাত্ত্বিক উত্তরাধিকার অভিন্ন ও এক। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ও লোকজীবনের নানা আচার অনুষ্ঠান শ্রীহট্টীয় প্রভাবে আন্দোলিত। তারা তাদের জীবনচর্যায়, নানাবিধ আচার ও ব্রতঅনুষ্ঠানে শ্রীহট্টীয় প্রভাব বহন করে চলেছেন।

বরাক উপত্যকা তথা সমগ্র হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে প্রধানতঃ দু'প্রকার ব্রতের প্রচলন রয়েছে (১) শাস্ত্রীয় ব্রত (২) অশাস্ত্রীয় ব্রত। অশাস্ত্রীয় ব্রতের মধ্যে মেয়েলি ব্রতই প্রাধান্য লাভ করেছে। আবার কখনও কখনও শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় ব্রতের যুগলমূর্তিও পরিলক্ষিত হয়। 'বৃ' ধাতু থেকে ব্রত শব্দ (√বৃ + অত(অতক্)= ব্রত) উৎপন্ন। ব্রত কথাটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে নিয়ম বা সংযম। ব্রতের মধ্য দিয়ে মানুষের ইহলৌকিক কামনা বাসনার প্রকাশ ঘটে। নীহার রঞ্জন রায় 'ব্রত' সম্পর্কে বলেছেন : 'ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক-বৈদিক আদিবাসী কৌমদের সময় হইতে প্রচলিত ছিল এ সম্বন্ধে সংশয় বোধ হয় নাই।'[১] মানুষের কামনা বাসনা পূরণের জন্য কৃত্য সম্পাদনই হল ব্রত। ব্রত হল ধর্মের গার্হস্থ্য রূপ।

শ্রীহট্টীয় প্রভাবে প্রভাবিত বরাক উপত্যকার লোকজীবনে পালিত মেয়েলি ব্রতগুলি হল : মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, বিপদতারিণী ব্রত, ষষ্ঠী ব্রত, লক্ষ্মী ব্রত, ফুলকর ঠাকুরের ব্রত, সূর্য ব্রত, সিদল নাটাই ব্রত, আট আনাজ ব্রত, সঙ্কটরাণী ব্রত, সঙ্কটা ব্রত, শিতলী ব্রত, বসন্তরা ব্রত, আচম্বিত ঠাকুরের ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত ও রূপসী ব্রত ইত্যাদি।

বরাক উপত্যকায় পালিত শ্রীহট্টীয় মূলের ব্রতগুলির মধ্যে 'রূপসী' ব্রত অন্যতম। এই ব্রতের আচার ও গীত আলোচ্য প্রবন্ধের উপজীব্য। মেয়েলি ব্রতগুলির

মধ্যে অন্যান্য ব্রত বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হলেও রূপসী ব্রত একমাত্র শ্রীহট্টীয় মূলের মায়েরাই পালন করে থাকেন। এই মেয়েলি রূপসীব্রতটি শ্রীহট্টীয় মূলের হিন্দু বাঙালি মায়েদের নিজস্ব সম্পদ।

বরাক উপত্যকায় আঞ্চলিক উচ্চারণে 'রূপসী' ব্রতকে 'রূফসীবর্ত'ও বলা হয়। সবরকম শুভ অনুষ্ঠানের আগে বরাক উপত্যকার সধবা মহিলারা এই ব্রত পালন করেন। বিশেষ করে সন্তানের মঙ্গল কামনায়, সন্তান জন্মের আগে ও সন্তান জন্মের পরে এই ব্রত পালিত হয়। এছাড়া সন্তানের বিয়ের আগে প্রত্যেক শ্রীহট্টীয় মূলের হিন্দু মায়েরা এই ব্রত পালন করে থাকেন।

বরাক উপত্যকায় সন্তানসম্ভবা মাকে সাধ দেওয়ার রীতি রয়েছে। যাকে সাধভক্ষণ বলা হয়। এই সময় অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে রূপসী ব্রতও অবশ্য পালনীয় আচার হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যদিও রূপসী ব্রত মেয়েলি ব্রত, তবুও এই ব্রতে সধবা মহিলা ছাড়া অন্য কেউ অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। সন্তানসম্ভবা মায়ের সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় যাতে কোন ধরনের বিপদ না হয়, এই মঙ্গল কামনায় ব্রতটি পালন করা হয়। সন্তানসম্ভবা মা সন্তান জন্ম দেওয়ার একমাস বা তিনমাস পূর্বে সাধভক্ষণের অনুষ্ঠানে যখন রূপসী ব্রত করা হয়, একই সঙ্গে মাধাই ব্রতও করা হয়। মাধাই আসলে রূপসীরই বর্ধিত রূপ। 'মাধাই' শব্দটি মা+ধাই অর্থাৎ সন্তান জন্মের সময় একজন ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ মহিলার প্রয়োজন হয়, এজন্যেই বোধহয় রূপসীর সঙ্গে মাধাই ব্রতটিও করার নিয়ম রয়েছে। সন্তান জন্মানোর একুশ দিন বা তিরিশ দিন পর আবার রূপসী ব্রত করতে হয়। পুত্র সন্তান জন্ম হলে একুশ দিনের দিন ও কন্যা সন্তান জন্ম হলে একত্রিশ দিনের দিন সন্তানের মা ও অন্যান্য সধবা মাতৃস্থানীয় মহিলারা মিলে এই ব্রতটি পালন করেন।

শ্রীহট্টীয় মূলের মায়েরা বা মাতৃস্থানীয়রা সন্তানের বিয়ের সময়, বিয়ের অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে রূপসী ব্রতটি অবশ্যই পালনীয় কৃত্য হিসেবে গণ্য করেন। এই সময় রূপসীর বর্ধিত রূপটি 'চূড়া রূপসী' ব্রত হিসেবে পালন করা হয়।

'রূপসী' শব্দের আভিধানিক অর্থ যাই হোক না কেন, শ্রীহট্টীয় সংস্কৃতিতে এই অঞ্চলে শেওড়া গাছের লোকায়ত নাম 'রূপসী'। রূপসী লোকায়ত দেবীর সঙ্গে লোকায়ত ষষ্ঠীদেবীর অনেকটা সাদৃশ্য থাকলেও রূপসীব্রতের আচার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ষষ্ঠী ব্রতে ব্রতীরা সন্তান প্রাপ্তি ও সন্তানের মঙ্গলের জন্য ষষ্ঠী দেবীকে মাতৃ জ্ঞানে আরাধনা করেন আর রূপসীকে ব্রতিনীরা বোন বা সখী জ্ঞানে আরাধনা করে সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন এবং বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রীহট্টীয় মূলের মায়েরা বিভিন্ন গীত উপস্থাপন করে রূপসীদেবীর ব্রত সম্পন্ন করেন। ব্রতটি শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় রীতির যুগলবন্দী হলেও অশাস্ত্রীয় বা লোকায়ত আচারই এই ব্রতের প্রধান উপজীব্য। বরাক উপত্যকায় রূপসীব্রত একান্তভাবেই অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠী প্রভাবিত অনুষ্ঠান, কারণ অষ্ট্রিকদের আরাধনার উপাদানগুলো

বৃক্ষপূজা, পাথর পূজা, নদী, ভূমি পূজা ইত্যাদিই প্রাধান্য লাভ করেছে। লোকায়ত এই রূপসী ব্রতের সঙ্গে ব্রাহ্মাণ্য প্রভাব পরবর্তী সময়ে সংমিশ্রণ ঘটেছে মাত্র।

'সুরমা-বরাক উপত্যকায় ইসলাম-আগমনের অনেক আগে ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এদের সাথে অষ্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষের ধীর-বিক্ষেপিত পরিচয়ের পর এখানে মিশ্র সংস্কৃতির ঊষালোক বিচ্ছুরিত হতে থাকে, এক স্বচ্ছন্দ ও সুষম জীবন-বৃত্তি গড়ে ওঠার প্রবণতা চিরন্তন সৃজনীবৃত্তিকে ঋদ্ধ করে। ফলে এরা বস্তু-পদার্থের উপর দেবত্ব আরোপ করে শাস্ত্রহীন, ক্রিয়াকাণ্ডহীন, অজটিল লোকাচার ও লোকমত-অনুসারী পুজো করত। গাছ, পাথর, ঝর্ণা, কূপ, নদী, পশু-পাখি ইত্যাদি ছিল তাদের পুজোর পবিত্র আধার। এখনও শুধু খাসিয়া, মুণ্ডা, শবর, সাঁওতাল কৌমের মধ্যেই নয়, বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে শেওড়া ও বটগাছ পূজার বহুল প্রচলন রয়েছে।'[২]

এই ব্রতের প্রধান উপকরণ হচ্ছে কলাগাছ। পুরোহিত বা ব্রতী মহিলারা ব্রতের দিন স্নান করে কলাগাছের ভিতরের অংশ ও ডোঙ্গা (মাইজ) দিয়ে একটি ভেলার মত মান্দাস তৈরি করেন, যাকে শ্রীহট্টীয় ভাষায় ভেড়ুয়া বলে। কলাগাছের কাণ্ডের খোসা পরতে পরতে খুলে নিয়ে ভিতরের যে মোটা অংশ বের হয়, তাই দিয়ে মোটামোটি আট বা দশ ইঞ্চি পরিমাপের সাতটি টুকরো, পর পর বাঁশের কাঠি গেঁথে ভেড়ুয়া তৈরি করা হয়। ভেড়ুয়ার মাপ অনুযায়ী চারটি কাঠি গেঁথে দিতে হয় ও পাটাতনের মত জুড়ে দেওয়া হয়, যাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। পাটাতনের মতো জুড়ে দেওয়া কলা গাছের মান্দাসের চারটি কোণায়, চারটি একফুট পরিমাপের কলাগাছের ডাটা দিয়ে খুঁটির মতো করে, ঘরের আকৃতি দেওয়া হয়। এবং বিভিন্ন ধরনের ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সাজানো ভেড়ুয়াটি দেখতে অনেকটা ছোট্ট রথের মত মনে হয়। এই ব্রতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কিছুটা ভূমিকা থাকলেও এটি মূলত মেয়েলি আচার। ব্রত অনুষ্ঠানে মূল ব্রতী সহ পাঁচজন বা সাতজন সধবা মহিলা এই ব্রতের মূল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ব্রতীরা উপবাস করে ব্রত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন।

রূপসী ব্রতের নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন, ব্রতীরা বাড়ীর পাশে থাকা গ্রামের শেওড়া বৃক্ষের কাছে গিয়ে নিমন্ত্রণ করেন এবং গাছটির চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নির্দিষ্ট দিনের জন্য ব্রত উপযোগী করে আসেন। এই শেওড়া বৃক্ষকে মায়েরা রূপসী জ্ঞানে পূজা করেন। গ্রাম বরাকের প্রায় সর্বত্রই এই শেওড়া বৃক্ষ দেখা যায়, তবে শহরাঞ্চলে এই বৃক্ষের অভাবে শ্রীহট্টীয় মূলের মায়েরা কোন গ্রাম থেকে শেওড়া বৃক্ষের পত্র সহ শাখা এনে বাড়ীর আঙ্গিনায় বা দালানবাড়ীর কোন শুদ্ধ জায়গায় অস্থায়ীভাবে রোপন করেন।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত রূপসী ব্রতের আরোপিত শাস্ত্রীয় দিকটি সম্পন্ন করতে গিয়ে দুর্গা মন্ত্র উচ্চারণ করে রূপসী দেবীর পূজা করেন। পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্রতী

মহিলারা পূজার স্থান ত্যাগ করেন না। রূপসীকে দুর্গার বিকল্প রূপ হিসাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ধ্যান মন্ত্র উচ্চারণ করেন। দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্র কেন যে এই ব্রতে উচ্চারিত হয়, তা এখনও অজ্ঞাত। মহাভারতের বিরাট পর্বের ও ভীষ্ম পর্বের যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকৃত দু'টি দুর্গাস্তব পুরোহিত অনেক সময় উচ্চারণ করেন। বিরাট পর্বে যুধিষ্ঠিরকৃত স্তব—

দুর্গাত্তারয়সে দুর্গে তত্ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।
যে স্মরন্তি মদাদেবি ন চ সীদন্তিতে নরাঃ।।
নৃণাঞ্চ বন্ধনং মোহং পুত্রনাশং ধনক্ষয়ম্।
ব্যাধিং মৃত্যুং ভয়ঞ্চৈব পূজিতা নাশয়িষ্যসি।।
ত্রাহি মাং পদ্ম পত্রাক্ষি সত্যে সত্যা ভবস্ব নঃ।
শরণং তব মে দুর্গে শরণ্যে ভক্ত বৎসলে।।[৩]

ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত অর্জুনকৃত স্তব—

ও দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম।
সর্বলোক প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবমে।।
মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্।
বিশেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্।।[৪]

এই স্তব দু'টিতে দুর্গাকে প্রণাম জানিয়ে বিশ্বমাতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই বোধ হয় সন্তান-সন্ততি, পরিবার ও বংশবৃদ্ধির জন্য মঙ্গলদায়িনী দেবী দুর্গার স্তব রূপসী দেবীর ক্ষেত্রেও আরোপিত করা হয়েছে।

এই ব্রতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দুর্গামন্ত্র উচ্চারণ করলেও পূজার উদ্দেশ্যে নির্মিত সুসজ্জিত ভেড়ুয়াকে পূজার অবলম্বন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এবং পুরোহিত মূলত ভেড়ুয়াকেই নানা উপচারে পুজো করেন। উপচার হিসাবে ধান্য, দুর্বা, তেল, সিঁদুর, সুতো, গামছা, শাড়ি, কাচা দুধ, চালের গুড়ি নির্মিত ডিম্বাকারের বল, পান, তাম্বুল, কর্পূর, অগুরু, খৈ, দৈ, চিড়ে, বাতাসা, পুষ্প-বিল্বপত্র, নৈবিদ্য ফলাদি ও পানের খিলি ইত্যাদি। এছাড়া ভেরুয়ার ভিতরে নৈবিদ্য হিসাবে চালের গুড়ি নির্মিত ডিম্বাকারের বলটি রাখা হয় এবং দু'টি কলাপাতার 'থাইত' (কলাপাতার অগ্রভাগ ছয় থেকে আট ইঞ্চি পরিমাপের টুকরো, যার মধ্যে ফলমূল ও নৈবিদ্য রাখা হয়) তৈরি করে এর মধ্যে ফল মিষ্টি নৈবিদ্যাদি দিয়ে সাজানো হয়। একটি থাইত পূজা শেষে ভেরুয়ার ভিতর রেখে প্রধান ব্রতী ভেড়ুয়াকে মাথায় করে তুলে নিয়ে রূপসী বৃক্ষ মূলে যান। এবং অন্যান্য ব্রতী ও সধবা মহিলারা রূপসীর বন্দনা গীত গাইতে গাইতে বৃক্ষ তলে উপস্থিত হন। বৃক্ষ তলে বসে তারা নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে গীত পরিবেশন করেন। আচারগুলির মধ্যে যে কৃত্যগুলি থাকে তা হল— প্রথমে মূল ব্রতীর মাথা থেকে ভেড়ুয়াকে নামিয়ে রূপসী বৃক্ষের সংলগ্ন করে রাখা হয়। এরপর রূপসী বৃক্ষের কাণ্ডকে জল ও দুধ দিয়ে স্নান করানো হয়, ভেড়ুয়ায় থাকা চালের গুড়ো দিয়ে নির্মিত

ডিম্বাকারের বলটি ভেঙে বৃক্ষমূলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, ধান-দুর্বা দিয়ে স্বাগত জানিয়ে মহিলারা উলুধ্বনি করেন। সঙ্গে আনা সাদা সুতো বৃক্ষের কাণ্ডে বেঁধে দেওয়া হয়, একই সঙ্গে কাপড় বা গামছা বৃক্ষের কাণ্ডে পরিয়ে দেওয়া হয়। পানের খিলি, তেল ও সিঁদুর অর্পণ করা হয়, গাছে স্পর্শ করানো সিঁদুর সধবা মহিলারা মস্তকে ধারণ করেন। এছাড়া সঙ্গে করে আনা নৈবিদ্যাদি নিবেদন করে ব্রতিনীরা রূপসী বৃক্ষের সঙ্গে সইয়ালা (বন্ধুত্ব বা সখীত্ব) স্থাপন করে, আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন এবং ব্রতিনীরা একটি ছড়া উচ্চারণ করেন—

'আমি তোমার জড়ো দিলাম মাটি
তুমি দিও আমার জড়ো মাটি'।[৫]

এই ছড়াটি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ব্রতিনীর সন্তানের সঙ্গে প্রকৃতির মেলবন্ধন বা সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয় এবং নিজের বংশবৃদ্ধির ইঙ্গিতও বহন করে।

বৃক্ষ তলে সমস্ত লোকাচার সম্পন্ন হওয়ার পর আবার গীত গাইতে গাইতে ব্রতিনীরা বাড়ীতে ফিরে আসেন। বাড়ীতে থাকা অন্য 'থাইতে'র (কলাপাতার পাত্র) যে নৈবিদ্যাদি থাকে, তা উপবাসী ব্রতিনীরা প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করেন।

শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় ব্রতের যুগলমূর্তি রূপসী ব্রতে যেভাবে পুরোহিত রূপসীকে দুর্গা জ্ঞানে পূজা করেন, শাস্ত্রীয় আচার মেনে ঠিক তেমনি পূজার সাথে সাথে মেয়েলি আচার ও সমবেত গীত পরিবেশন করা হয়। পূজার আরম্ভ থেকে বৃক্ষ তল থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের গীত ব্রতী এবং অন্যান্য সহযোগী মহিলারা পরিবেশন করে থাকেন। এছাড়া সন্তান জন্মানোর আগে পালিত রূপসী মাধাই, সন্তান জন্মের পর রূপসী ও সন্তানের বিয়ের সময় চূড়া রূপসী ব্রতের পরিবেশিত গীতের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লক্ষিত হয়, কিন্তু মূল গীতগুলি প্রায় একই থাকে। গীতগুলি শ্রীহট্টীয় ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণে পরিবেশিত হয় এবং কিছু কিছু খাঁটি শ্রীহট্টীয় শব্দ ও উচ্চারণ গীতগুলিকে সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে।

নির্দিষ্ট দিনে পুরোহিত ভেড়ুয়ারূপী রূপসীকে দুর্গা মন্ত্রে অর্চ্চণা করেন আর লোকায়ত সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে গ্রাম বরাকের মহিলারা সমবেত কণ্ঠে রূপসী গীত পরিবেশন করেন। প্রথমেই রূপসী জন্মের গীত পরিবেশন করা হয়—

রাউল তপস্বী মাধাই তপবনে যাইতে/ রাজ পন্থে ডোমের নারী আসিয়া মিলায়/ ছলে বলে মহাদেবে বোজারে লঙিঘয়া/ দশ মাস দশ দিনে রূপসী জন্ম হইলা/ স্বর্গেরও মহামায়া নারীচ্ছেদ করিলা/ স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে জয়ের ধ্বনি পড়িল/ রূপসী দেখিয়া মহাদেবে ভাবইন মনে মনে/ কোন স্থানে থইতাম রূপসী নির্ণয়ও না পাই/ শ্বেত শেওড়ার তলে নিয়া রূপসীকে স্থাপনও করিলা/ থাকো থাকো রূপসী গো আসনও করিয়া/ মর্ত্যেরও সেবক সকলে তোমার পূজিবা চরণ।

তারপর নিমন্ত্রণগীত পরিবেশন করা হয়—

নারদ করি নিবেদন/ কৈলাশেতে রূপসীকে কর নিমন্ত্রণ/ এই কথা শুনিয়া নারদ করিলা গমন/ রূপশ্বেরীর বাসরে দিলা দরশন/ করজোড়ে নারদ মুনি নিমন্ত্রিলা যত দেবগণ/ রূপসীর সহিতে দিলা মাধাইর নিমন্ত্রণ/ যার যে বাহনে আইলা যত দেবগণ/ সাকট বাহনে আইলা রূপসী মাধাই।

এছাড়া অন্য একটি গীতে রূপসীকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে, তা এরকম—

নারদ করি নিবেদন কৈলাশেতে রূপসীকে কর নিমন্ত্রণ/ এই কথা শুনিয়া নারদ করিলা গমন/ রূপসীর বাসরে গিয়া দিলা দরশন। জোড় হস্তে নারদমুনি করইন নিমন্ত্রণ/ শিশুর মায়ে (আবার সন্তানের বিয়ের সময় এই চরণটি কইন্যার মা বা জামাইর মা বলা হয়) পাঠাইয়া দিছইন তোমার নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণও পাইয়া রূপসী আনন্দিত হইলা/ বত্রিশ অলংকার দিয়া সাজনও করিলা/ পুষ্প রথে রূপসী করিলা গমন/ শিশুর বাবার (বিয়ের রূপসী ব্রত হলে চরণটিতে কইন্যা বা জামাইর বাবার বলে গাইতে হয়) বাড়ীত আসিয়া দিলা দরশন/ শিশুর বাবার বাড়ীত আছে শানের বান্ধাইল ঘাট/ সেই ঘাটে রূপসীয়ে করইন মহাস্নান/ স্নান করিয়া রূপসী গো মাণ্ডবে বসিলা/ বত্রিশ অলংকারও দিয়া রূপসী সাজিলা।

গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে রূপসীর মহাস্নানের বর্ণনা গ্রাম বরাকের মহিলারা প্রাঞ্জল ভাষায় তোলে ধরেছেন অন্য আরো একটি গীতে—

দুধেরও পুস্কুনীগুলি স্বরের বান্দাইলঘাট/ তারই মাজে রূপসী মাধাই করইন মহাস্নান/ স্নান করিয়া রূপসী মাধাই ঝারিয়া বান্দোইন কেশ/ সেবকের মন্দিরে আসিয়া করিলা প্রবেশ/ রূপেশ্বরী ঘটের তলে আলিপনা দিয়া/ স্বর্গত থাকিয়া কাচার ঠাকুমায় কইন ডাক দিয়া/ আইস মাগো রূপেশ্বরী মোরে করো দয়া/ আরেকবার করিমু পূজা নানাবিধ উপচার দিয়া/ আইসো মাগো রূপেশ্বরী মোরে করো দয়া/ আরেকবার করিমু পূজা রক্তজবা দিয়া।

মহাস্নানের পর রূপসীর সাজসজ্জার গান পরিবেশিত করা হয় এই ভাবে—

পূজার দ্বারে বসিয়া মায়ে খলখলাইয়া হাসতেছে/ কৈলাসে থাকিয়া সদা শিবে সিথের সিন্দুর যাচতেছে/ কাজ নাই আমার সিথের সিন্দুর দেওনি তোমার গঙ্গাকে/ সেবকে আনিয়াছে সিন্দুর পরাইয়া দিতে আমারে/ পূজার দ্বারে বসিয়া মায়ে খলখলইয়া হাসতেছে/ কৈলাসে থাকিয়া শিবে মাজার শাড়ি যাচতেছে/ কাজ নাই আমার মাজার শাড়ি/ দেওনি তোমার দুর্গারে/ সেবকে আনিয়াছে শাড়ি পরাইয়া দিছে আমারে।

ভেড়ুয়ারূপী রূপসীকে সাজাতে গিয়ে গ্রাম বরাকের মায়েরা শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপ্লুত হন এবং গেয়ে উঠেন—

সবের আনন্দিত মন/ সব রমণী বসিয়া পূজে রূপসীর চরণ/ কাটিয়া কদলীর ডাল, বেরুয়া গঠন/ শ্বেত রক্ত জবা ফুলে বেরুয়া সাজন/ থাইতে থাইতে কলার পাতে পাতিয়া আসন/ খই দৈ উকুরা দিলা তাহারও উপর/ উত্তম শালীর চাউলে নৈবিদ্য সাজাইয়া/ মিষ্ট রম্ভা কলা দিলা চৌদিকে সাজাইয়া/ ধুপ, দীপ গন্ধ পুষ্প অগুরু চন্দন/

বেদমন্ত্রে অভয়ারে করিলা অর্চ্চণ/ দ্বিজ শ্যামানন্দে বলে মনেতে ভাবিয়া/ পুত্র কইন্যার বর লও চরণে ধরিয়া।

পুরোহিত দুর্গামন্ত্র উচ্চারণ করে রূপসীর অর্চ্চণা করার সাথে সাথে গ্রাম বরাকের মায়েরা পূজার গীত পরিবেশন করতে থাকেন এই ভাবে—

আজি কৌশিল্যা কামিনী/ ভক্তি ভাবে করে পূজা রূপসী ভবানী/ সুবর্ণের কুর্শি খানা আনে ততক্ষণ/ যতনে রূপসী মায়ের পাতিলা আসন/ রাজ আইজ্ঞ্যা পাইয়া আসে চারিটি নফর/ চারুচিত্র চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইলা উপর/ রক্তজবা, রক্তপদ্ম, গোলাপ রঙ্গন/ নীলজাতি স্বর্ণঘন্টা তুলিলা কাঞ্চন/ পান কদলী আম্র ইক্ষু শশা বেল/ নানা জাতি ফল দিলা কমলা নারিকেল/ নৈবিদ্য পায়েস মধু দধি দুগ্ধ চিনি/ ক্ষির মিশ্রি সন্দেশ দিলা আরও কত আনি/ পুষ্পপাত্রে পুষ্প-বিল্ব দুর্বাদি চন্দন/ আতপ তণ্ডুল রেখে করিলা সাজন/ ধূপ ধুনা জ্বালাইয়া দিলা অগুরু চন্দন/ স্বর্ণ চাটায় ঘৃতের দশী, দিলা নারীগণ/ বসিলেন কুসাশনে কুলের ব্রাহ্মণ/ বেদমন্ত্রে অভয়ারে করিলা অর্চ্চণ।

ব্রতীরা একটি পর্যায়ের গানেই সন্তুষ্ট থাকেন না, তারা বিভিন্ন পর্যায়ে গীত পরিবেশন করেন। গীতগুলির মধ্যে বাঙালি লোকজীবনের ও ভারতীয় পুরাণ সংস্কৃতির নানাবিধ মিথ্ বারবারই ঘুরে ফিরে আসে—

(১) বাজেরে মঙ্গল ধ্বনি অতি সুমধুর/ কৌশল্যা করেন পূজা দেবী রূপসীর। ঢাক ঢোল, কাঁসী ঘন্টা কত বাদ্য বাজে/ নারীগণে করে গান সাজী নানা সাজে/ নানা পুষ্প বিল্ব-পত্র করি আয়োজন/ শাস্ত্র মতে পূজে দেবী হয়ে একমন/ নৈবিদ্যাদি একে একে করিলা অর্পণ/ নারীগণে উলু দেয় হরষিত মন।

(২) চল চল এগো সখী অযোধ্যা নগরী/ রূপসীরে পূজা করেন কৌশল্যা সুন্দরী/ সুবর্ণ খচিত কুর্শি আনিয়া যতনে/ আসন পাতিয়া দিলা অতি সাবধানে/ গোলাপ মালঞ্চ আর করবী রঙ্গন/ রক্ত জবা, রক্ত পদ্ম আনিলা কাঞ্চন/ নানাবিধ ফলমূল করি আয়োজন/ নৈবিদ্য সাজাইয়া দিলা হরষিত মন/ ধূপ ধুনা জ্বালাইয়া অগুরু চন্দন/ স্বর্ণ চাটায় প্রদীপ জ্বালি দিলা নারীগণ/ কুশাসনে বসি পুরোহিত করিলা পূজন/ কাঁসী ঘণ্টা ঢাক ঢোল বাজে অগনন।

(৩) ঐ আসিয়াছে দশভূজা/ বালকের মাতায় করইন রূপসীর পূজা/ পুত্র কইন্যা পাইবার আশায় মনে মনে/ ভক্তি ভাবে করে পূজা, ধূপ ধূনা নৈবিদ্যাদি তাম্বুলও সহিতে/ রূপসীর পূজা করইন শাস্ত্র বিধি মতে/ ভাবিয়া সুনিতি বলে পুজো ওই মায়ের রাঙ্গা চরণ।

(৪) জয় দেবী ভবানী গো ত্রিজগতের মাতা/ অকুমারী পুত্র কইন্যা দাতা/ উত্তম শালীর চাউলে নৈবিদ্য সাজাইয়া/ সারি সারি কলা দিলা নৈবিদ্য বেরিয়া/ খণ্ড খণ্ড নারিকেল বাটারে ভরিয়া/ নৈবিদ্যের উপরে দিলা তাম্বুলের খিলা/ কুলের পুরোহিত আসিয়া পূজা আরম্ভিলা/ শাস্ত্র মতে খৈ দৈ চিটাইয়া দিলা/ পূজার পরে রূপসীকে করিয়া প্রণাম/ পুত্রের বর লইয়া রাণি রূপসীর স্থান/ পূজা খাইয়া রূপসী ভাবইন

মনে মনে শিশুর মাকে দিলা শিশুর বর/ দণ্ডবৎ প্রণামও করইন বর্তিগনে/ পুত্র কইন্যার বর লইয়া রূপসী পূজিলা।

(৫) কর জোরে স্তুতি ভক্তি করিগো মা রূপসী/ সেবকে তোমাকে দিতা পুষ্প চন্দন তুলসী/ পঞ্চগুড়ি দিয়া মাগো আকিলা মণ্ডলী/ স্বর্ণঘট বসাইলা করি কৌতুহলী/ সুগন্ধী চন্দন দ্বীপ জ্বালাইয়া ঘৃতের দশী/ নারিকেল ফল আদি নৈবিদ্য সারি সারি/ স্বর্গ হইতে তুমি মাগো পূজা লও আপনে/ মধু বলে দিও দেখা এ চূড়া রূপসী। (সন্তানের বিয়ের সময় চূড়া রূপসী ব্রতের গীত)

পূজা সম্পন্ন হলে প্রধান ব্রতী সহ অন্যান্য ব্রতী এবং মহিলারা ভেড়ুয়া মাথায় করে রূপসী বৃক্ষের অভিমুখে যাত্রা করেন আর সমবেত কণ্ঠে গাইতে থাকেন—

(১) চল সখী রঙ্গ দেখি গিয়া/ রূপসীর বইনারী যাইনরে ফুলের বেড়ুয়া লইয়া/ চল সখী রঙ্গ দেখি/ রূপেশ্বরীর বইনারী যাইন মাজার শাড়ি লইয়া/ রূপসীর বইনারী যাইনরে হস্তে শঙ্খ লইয়া/ চল সখী রঙ্গ দেখি গিয়া/ রূপসীর বইনারী যাইনরে পানের খিলি লইয়া/ রূপসীর বইনারী যাইনরে ফুলের মালা লইয়া/ চল সখী রঙ্গ দেখি গিয়া।

(২) বল না বল না কোকিলরে/ কোকিল সুমধুর বাণী/ কোন রাস্তায় যাইতাম আমি বইনারীর বাড়ী/ অউ যে দেখ পন্থপারে চাম্পা সারি সারি/ সেই না রাস্তায় যাইও তোমার বইনারীরও বাড়ী/ সাজিলা বইনারীর বইন গো বত্রিশ অলঙ্কারে/ ফুলেরও ভেড়ুয়া লইয়া মস্তকের উপরে/ আগে পাছে সব সখী মধ্যে কাচার মা/ ধীরে ধীরে চলিয়া গেলা বইনারীরও বাড়ী/ বইছইন বইনারীর বইন গো রত্ন সিংহাসনে/ আনন্দিত হইলা তাইন দেখিয়া তান বইনারীরে।

যাত্রাপথের ক্লান্তি দূর করতে মহিলারা গীতের বিস্তার ঘটাতে থাকেন এই ভাবে—

চল চল আরে সখী তরিত করিয়া/ অরণ্যে রূপসী দেখি চল দেখি গিয়া/ অরণ্যে রূপসী ক্ষুধায়ও কাতর/ ভেড়ুয়া সাজাইয়া তুলইন মাথার উপর/ পুষ্প চন্দন বিল্বপত্র লইলারে সাজাইয়া/ মায়ের চরণে দিতা অঞ্জলি ভরিয়া/ নৈবিদ্যের যত দ্রব্য থইলারে সাজাইয়া/ জামাইর মাগো (সাধভক্ষণের পূর্বে ও সন্তানের জন্মের পরে রূপসী ব্রত করা হলে, বলা হয় শিশুর মা) ভেড়ুয়া মাথে লইয়া/ রূপসীর তলাতে আসিয়া/ জয়ের ধ্বনি দিলা।

প্রধান ব্রতীর মস্তক থেকে ভেড়ুয়া নামাতে নামাতে ব্রতীরা গান করেন এরকম—

লামাও লামাও বইনগো ফুলেরও পসার/ সিথের সিন্দুর হস্তের শঙ্খ/ কানের কুণ্ডল আনিয়াছি বইনগো/ তোমার লাগিয়া/ গলার হার বস্ত্রাদি আনিয়াছি বইনগো/ তোমার লাগিয়া।

রূপসী বৃক্ষের নীচে নানা আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে করতে ব্রতীরা গাইতে থাকেন—

(১) কিয়ানন্দ হইলগো সই শ্বেত শেওড়ার তলে/ জবা ফুলে আমার বইনে

সিন্দুর বদল করে/ কিয়ানন্দ হইলগো সই শ্বেত শেওড়ার তলে/ আইজ না কি আমার বইনে শঙ্খ বদল করে/ দুই বইনে শঙ্খ বদল ধর্ম সাক্ষী করে/ আইজ না কি আমার বইনে/ শাড়ি বদল করে/ দুই বইনে শাড়ি বদল ধর্ম সাক্ষী করে।

(২) দেখো বইনয়ালার সাজ/ বইনয়ালা করিতে আইলা দেবতার সমাজ/ পাট্য বস্ত্রে পাটের শাড়ি বত্রিশ অলঙ্কার/ নারীগন মিলিয়া যাইন দেবতার সমাজ।

(৩) গাছের তলার মাঝে কিসের বাদ্য বাজে/ ধর্মের বইনারী আইছইন শ্বেত শেওড়ার তলে/ তৈল সিন্দুর লইয়া তারা ললাটে পরে/ বদল করিয়া নানান কৌতুহলে/ শঙ্খ বদলাইয়া, দিলা পরাইয়া শাড়ি/ হেলে চলে লইয়া বইনে/ পানের খিলি মুখে তুলিয়া দিলা/ মধু বলে দুইজনে সইয়ালা করিলা।

(৪) সবে আনন্দিত হইলা/ জামাইর মা যাইন আজি করিতা সইয়ালা/ শুদ্ধ জলে রূপসীর চরণ ধুআইলা/ অঞ্চলে মুচাইয়া পাও তৈল সিন্দুর দিলা/ দধি দুগ্ধ মিষ্টি দ্রব্য নৈবিদ্যাদি দিলা/ তৈল সিন্দুর পানের খিলি বদল করিলা/ সবে মিলিয়া নারীগণে জয়ের ধ্বনি দিলা/ বস্ত্র অলংকার সবে বদল করিলা/ করজোরে হরিষে মজিলা/ ক্ষিরোধ বলে সমাদরে আর্শীবাদও নিলা।

রূপসী ব্রতের মূল উদ্দেশ্য রূপসীর সঙ্গে মায়েদের সখীত্ব স্থাপন এবং সন্তানের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা। নানা উপচার সহ লোকাচারের দিকটি সম্পন্ন করতে করতে মায়েরা বোন রূপসীর সঙ্গে শঙ্খ-সিঁদুর ও পানের খিলি বিনিময় করে সখীত্ব (বইনয়ালা) স্থাপন করেন। আচার সম্পন্ন হওয়ার পর ব্রতী ও অন্যান্য সহযোগী মহিলারা রূপসী বৃক্ষের কাছে বিদায় প্রার্থনা করে নিজ গৃহে ফিরে আসেন আর গীত পরিবেশন করেন—

(১) 'বিদায় দেও বিদায় দেও বইনারির বইনগো/ বিদায় দেও আমারে/ কোলের ছাবালে বইনগো কান্দে উচ্চস্বরে।

রূপসী আবার ব্রতী বোনের উদ্দেশ্যে বলেন - যাইও যাইও ওগো বইন বইনারীর দোকানে/ বাছিয়া বাছিয়া সিন্দুর লইয়া যাইও নিজো ঘরে/ যাইও যাইও বইনগো সাবিত্রী নগরে/ বাছিয়া বাছিয়া শঙ্খ, পরিয়া যাইও নিজো ঘরে।

(২) আজি পরাণের বইন ঘরে যাও/ বাটায় আছে পান সুপারি তারে তুলিয়া খাও/ গাছের তলায় বসিয়া কোকিলায় করে রাও/ বাটায় আছে লং এলাচি তারে তুলিয়া খাও/ প্রণাম করিয়া সবে রূপসীরও পাও/ বিদায় লইয়া সবে টানে চালাইন পাও/ রবির কিরণে বইনারীর গাও/ মধু বলে মন পবনে দিলা বাও।

ব্রতী ও তার সহযোগী ব্রতী সকল গৃহস্থ ঘরে মৃদু মন্দ গতিতে গান গাইতে গাইতে ফিরে এসে বিশ্রাম করেন। থাইতে থাকা রূপসীর প্রসাদ ভক্ষণ করে উপবাস ভঙ্গ করেন এবং বিশ্রামের গীত পরিবেশন করেন—

আনরে টাটেরা গুয়া বাটারে ভরিয়া/ আইলা গিয়া কাচার মায়ে (বিয়ের রূপসী ব্রত হলে কাচার মায়ের পরিবর্তে বলা হয় জামাইর বা কইন্যার মা)। বইনালা

করিয়া/ আনরে টাটেরা গুয়া বাটারে ভরিয়া/ আইলা গিয়া বরতি সকলে বইনালা করিয়া।

বিশ্রামের গীত পরিবেশন শেষে ব্রতিনীরা ধান-দুর্বা সহযোগে সন্তানদের আর্ঘন অর্থাৎ আশীর্বাদ করেন—

(১) 'আয় লো কৌশল্যা তোর রামধন লইয়া কোলেতে/ শীতল পাটি পাতিয়া থইছি তোর রামধনকে বসাইতে/ ধান্য দুর্বা তুলিয়া থইছি তোর রামধনকে আরঘিতে/ সরলবনী আনিয়া থইছি তোর রামধনকে খাওয়াইতে।

(২) অযোধ্যা নগরের মাঝে জয়ের ধ্বনি দেইন গো সবে/ গুরু আসিয়া দেইন আর্শীবাদ/ চরণ ধূলি দেইন গো মাথে/ পুরোহিতে আসিয়া দেইন আর্শীবাদ/ চরণ ধূলি দেইন গো মাথে/ মায়ে আসিয়া দেইন আর্শীবাদ, সোনারূপা দেইন হস্তে। (কন্যা সন্তানের জন্য রূপসী ব্রত হলে কৌশল্যার পরিবর্তে জনকরাণী, রামধনের পরিবর্তে সীতা, অযোধ্যা নগরের পরিবর্তে মিথিলা নগর ব্যবহার করা হয়)।

(৩) চল চল এগো সখী/ চল যাইয়া দেখি/ নবদ্বীপে শচীর দুলাল আর্ঘে ব্রজনারী। হংসে ব্রহ্মা, খরগে বিষ্ণু, গোবিন্দ শঙ্করী/ ঐরাবত বাহনে আইলা দেব পুরন্দর/ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে কলি আইলা রথে/ শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে। তলেতে চিকনপাটি উপরে চান্দুয়া/ তাহার উপরে বইছন ননীর পুতুলা/ সোনার বাটায় ধান্য দুর্বা, হীরার বাটায় লইয়া/ আর্ঘন আর্ঘিতে আইলা শতেক এয়ো লইয়া/ আর্ঘন আর্ঘিয়া তারা কি না দিলা বর/ হাতে দিলা মনি মানিক্য/ মুখে দিলা সর/ বাচিয়া থাকরে শচীর দুলাল এক লক্ষ বছর।

(৪) ঝলমল করে দুর্বারে/ দুর্বা দেখিতে সুন্দর মনে লয়/ লক্ষ্মীন্দরে করিতাম আর্ঘন/ তলেতে চিকন পাটি উপরে চান্দুয়া/ তার উপরে বইচইন পূর্বমুখী হইয়া/ সোনার বাটায় ধান্য দুর্বা/ হীরার বাটায় লইয়া/ আর্ঘন আর্ঘিতে আইলা মা মাসি মিলিয়া/ আর্ঘন আর্ঘিয়া তারা মুখে দিলা সর/ বাচিয়া থাকরে লখাই এক লক্ষ বছর।

গীতগুলির সুর ও কথা মূলত শ্রীহট্টীয় জীবনধারার ফলশ্রুতি, তাই গীতগুলি রচনায় তৎসম, তৎভ্রব, ও অর্ধতৎসম শব্দ চয়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহট্টীয় আঞ্চলিক শব্দগুলির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন উকুরা (চাল, খৈ ও চিড়ের গুড়ো), বোজারে লঙিয়া (ডিঙিয়ে যাওয়া), স্বর্ণ চাটা (প্রদীপের তৈলাধার), আলিপনা (আলপনা), পুস্কুনী (পুকুর), কাচার মা (নব জাতকের মা), বইনয়ালা (সখীত্ব পাতানো), বইনয়ারী (সখী বা বোন সম্পর্ক), আর্ঘন (আশীর্বাদ করা), টাটেরা গুয়া (শুকনো সুপারি), বাটারে ভরিয়া (পান তাম্বুল পূর্ণ পাত্র) অউ (এই), ইত্যাদি। এই শ্রীহট্টীয় আঞ্চলিক শব্দগুলি গীতের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে শ্রীহট্টীয় ভাষা ও সংস্কৃতির ধারাকে বজায় রেখেছে ও গীতগুলি সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

গীতগুলি রচনার ভনিতায় যে সকল কবি বা রচনাকারের নাম পাওয়া যায়,

তারা হলেন দ্বিজ সদানন্দ, দ্বিজ মধু, ক্ষিরোদ ও সুনিতি সহ নানা অজানা গীতিকার। গীতগুলির সাংগীতিকরূপ, প্রকরণ ও বিষয়বস্তু দেখে অনুমান করা যায়, গীতগুলি সম্পূর্ণ রচনা কোনো বিশেষ কবি বা গীতিকারের নাও হতে পারে, এর সঙ্গে মিশে রয়েছে শ্রীহট্টীয় মায়েদের কল্পনার নানা বিস্তার ও বৈভব। কারণ মায়েরা অনেক সময় মুখে মুখে অনেক গীত রচনা করে পরিবেশন করে থাকেন। এছাড়া অনেক সময় মূল গীতের কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে গীতগুলিকে শ্রুতিমাধুর্য করে তুলেন। আবার অনেক সময় তাদের স্বরচিত গীত কোন খ্যাত বা অখ্যাত কবি-গীতিকারদের নামে চালিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

তথ্যসূত্র :

১। বসাক, ড. শীলা – বাংলার ব্রতপার্বণ, (তৃতীয় মুদ্রণ), কলকাতা, ২০০৮,পৃ. ২।

২। বসু, ড. শিবতপন – বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি, (প্রকাশ স্থান- অজ্ঞাত), ২০০১, পৃ. ১২৯।

৩। তদেব, পৃ. ১২৯-১৩০।

৪। তদেব, পৃ. ১৩০।

৫। নিজস্ব পারিবারিক সংগ্রহ।
প্রবন্ধে থাকা রূপসী ব্রতের গীত ও নানা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন– পারুল মজুমদার, পেশা– গৃহবধু, বয়স– ৬০ বছর, গ্রাম- দীননাথপুর, জেলা- কাছাড়, অসম।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। বসাক, ড. শীলা – বাংলার ব্রতপার্বণ, (তৃতীয় মুদ্রণ), কলকাতা, ২০০৮।

২। বসু, ড. শিবতপন – বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি, (প্রকাশ স্থান-অজ্ঞাত), ২০০১।

৩। সেন, গৌরী – শ্রীহট্ট-কাছাড়ের মেয়েলি আচার ও গান, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৩।

উত্তরবঙ্গের মেচ উপজাতির ধর্মীয় রূপান্তর : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

ড. মনদেব রায়

ভূমিকা :

উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন উপজাতি হল মেচ। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা ইন্দো-মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি শাখা। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক চারুচন্দ্র সান্যালের মতে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বহু বছর আগে একদল মোঙ্গল জাতি বার্মার মধ্যদিয়ে পাত ?কোই পর্বত অতিক্রম করে উত্তরপূর্ব আসামে উপনীত হয়। সেখান থেকে তারা তিন দিকে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হয়। একদল দক্ষিণে কাছাড় পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে কাছারী নামে পরিচিত হয়। একদল ব্রহ্মপুত্র নদীর উপকূল দিয়ে আসামে প্রবেশ করে বোডো বা বোদো নামে অবিহিত হয় এবং এখানে তারা আবার চারটি গোষ্টিতে বিভক্ত হয়ে যায়। এই চারটি গোষ্টি হল মেচ, কোচ, রাভা ও গারো।[১] একদল হিমালয়ের সানুদেশ দিয়ে পশ্চিম দিকে নেপালের মেচী নদীর তীরে বসবাস শুরু করে। তাদের নাম হয় মেচীয়া বা মেচ। এরাই মেচী নদী অতিক্রম করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বসবাস শুরু করে এবং অনেকে পুনরায় আসামের দিকে অগ্রসর হয়।[২] তবে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল মেচ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবনা তথা রীতিনীতির রূপান্তর। প্রকৃতির পূজারি উত্তরবঙ্গের এই মেচ উপজাতি কিভাবে ইস্লামধর্ম, খ্রিস্টানধর্ম, হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম এবং অনুকুল ঠাকুরের প্রদর্শিত ধর্মমত গ্রহণ করে তার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা হল এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

ঐতিহ্যগত ধর্মমত :

আদিতে মেচরা প্রকৃতির সমস্ত শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। তাদের মতে যিনি উপকারী বা উপকার করেন বা মদত দেন, তিনিই দেবতা যার অর্থ হল 'মাদায়'। সমস্ত জীবের সৃষ্টি, স্হিতি এবং বিনাশ তিন দেবতা কতৃক নিয়ন্ত্রিত- মেচরা এই মতে বিশ্বাসী ছিল। এই তিন দেবতা বোঝাতে তারা 'অবাং লাউরি' কথাটি ব্যবহার করতেন। 'অ' অর্থাৎ যার কাজের শেষ নেই। আর এই তিন দেবতার কাজ আদি অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। এখানে উল্লেখ্য সনাতন হিন্দু ধর্মের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর (সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ)- এর সাথে মেচদের 'অবাং'-এর মিল পাওয়া যায়। এর থেকে অবশ্য বোঝা যায় যে সনাতন হিন্দু ধর্ম হল প্রাক-আর্য বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে বৈদিক আর্য গোষ্ঠীর ধর্মের সংমিশ্রণ।[৩]

বিভিন্ন পূজা-পার্বণে মেচরা তাদের আরোধ্য দেবতাকে মদ, কলা, পান সুপারী, পশু-পাখি ইত্যাদি নিবেদন করত এবং ধূপকাঠি ও প্রদীপ জ্বালাত। তাদের পূজা-পার্বনে বলি প্রথার প্রচলন ছিল। মেচদের প্রধান দেবতা ছিল বাথৌএবং দেবী ছিল মাইনাও।[৪] মেচদের ধর্মকে বাথৌ ধর্মও বলা হয়।[৫] বাথৌ শব্দের অর্থ হল পঞ্চ দেবতার দর্শন। মাটি, জল, বাতাশ, অগ্নি ও আকাশ- এই পঞ্চদেবতার প্রতিক হিসাবে মেচরা বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে বেদী তৈরি করে সিজু গাছ লাগাতো। সিজু গাছের নিচের বেদীটি গোলাকার রাখা হত; কারণ সূর্য গোলাকার, চন্দ্র ও তারা গোলাকার, এবং চারিদিকে তাকালে গোলাকার দেখায়। মেচদের বিশ্বাস অনুযায়ী পূজা চলাকালীন দেবতারা এসে ভূপৃষ্ঠে বসেন এবং সেদিক বিবেচনা করেও তারা বেদীটিকে গোলাকার রূপ দিত। জায়গাটি পবিত্র রাখার জন্য তারা তুলসি গাছ লাগাত এবং তুলসি পাতা জলে ডোবাত।[৬] উত্তরের রান্না ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে মাটির সাধারণ বেদী তৈরি করে মেচরা তাদের প্রধান দেবী মাইনাও এর পূজা করত। এছাড়াও মেচরা মহেশ ঠাকুর, বিষহরি, কালী ইত্যাদি দেবতার পূজা বাড়ীতে এবং বাড়ীর বাইরে পবিত্র স্থানে করত। ১লা বৈশাখ শুভ নববর্ষ হল মেচদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন। কারণ সেদিন মেচ সমাজে প্রথম বাথৌ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা সমাজবদ্ধ সভ্য মানবজাতিতে উপনিত হয়। তারা এই দিনটিকে বারোরা শুভ নববর্ষ দিন হিসাবে পালন করে।

ধর্মীয় রূপান্তর :

ভারতবর্ষে সুলতানী শাসনকালেই প্রকৃতির পূজারী এই মেচ উপজাতির ধর্মনীতিতে পরিবর্তন এসেছিল। কেননা সুলতানী যুগে ইসলাম শাসনের প্রভাবে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুরি জেলার অন্তর্গত মাল ব্লকের কাঠামবাড়ি এলাকায় অল্প সংখ্যক মেচ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনাকাল থেকে উত্তরবঙ্গের মেচ উপজাতির ধর্মনীতিতে ব্যপক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ক্রমে এই মেচ উপজাতি খ্রিস্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, ব্রহ্মধর্ম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে অনেকে আবার অনুকুলচন্দ্র চক্রবর্তী (অনুকুল ঠাকুর) প্রবর্তিত সৎসঙ্গ আন্দোলনের অনুগামী হয়।

ইসলাম ধর্মে রূপান্তর :

ভারতবর্ষে সুলতানী যুগের সূচনায় সুলতান ইলতুৎমিসের যোগ্য পুত্র গৌরেড় শাসক নাসিরুদ্দিন মহম্মদ এর রাজত্বকালে (১২২৮) উত্তরবঙ্গে কিছুদিনের জন্য ইসলামিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে[৭] হরগোবিন্দ কাঠাম নামে এক মেচ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং ঐস্লামিক আনুগত্যে বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে নিজ শাসন কায়েম করে। আজও মাল ব্লকের কাঠামবাড়িতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মেচ উপজাতির বসবাস লক্ষ্য করা য়ায়।[৮] "Imperial Gazetteer of India" তে উল্লেখ আছে, "The proportion of Muhamadan has declined since 1872 when they formed 34.6 percent of the population. They are chiefly Shaikhs and Nasyas, and are for the most part, converts from the aboriginal Koch and Mech races."[৯]

খ্রিস্টান ধর্মে রূপান্তর :

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ইংরেজদের আগমনের সাথেসাথে এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল বিভিন্ন মিশনারী গোষ্ঠী। তারা মেচদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করতে থাকে। বিভিন্ন মিশনারী গোষ্ঠী ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় মিশনারী স্কুল স্থাপন করে, যেমন আলিপুরদুয়ার মহকুমার শামুকতলায় স্থাপিত হয় সান্তালপুর মিশন হাইস্কুল, মহাকালগুড়িতে গড়ে ওঠে মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুল, শামুকতলার কিছু দূরেই স্থাপিত হয় লোকনাথপুর মিশন হাইস্কুল। এইভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন আদিবাসি অধ্যুসিত এলাকায় একাধিক খ্রিস্টান মিশনারী স্কুল স্থাপিত হয়। এসব স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে মিশনারীরা খ্রীষ্টধর্মের বিস্তারের পথ বেছে নেয়। আলিপুরদুয়ার মহকুমার আদিবাসী অধ্যুষিত বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন চার্চ ও গীর্জা। এরকম গীর্জা রয়েছে মেচ অধ্যুষিত মহাকালগুড়ি, খোয়ারডাঙ্গা এবং আরও অনেক স্থানে। স্বভাবতই অনেক মেচ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে ও খ্রিস্টান ধর্ম অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালনা করতে থাকে।

উত্তরবঙ্গের মেচদের মধ্যে প্রথম খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন জগৎসিং বসুমাতা। কথিত আছে জগৎসিং বসুমাতা পূজাপাঠ করে কোনদিন মনের শান্তি পাননি। বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করার পরেও তাঁর যথার্থ আর্তত্তৃপ্তি ঘটেনি। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে অকস্মাত আমেরিকার ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে রেভারেন্ড জেমস এর কাছে তিনি ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের যাবতীয় কাহিনী শুনে মুগ্ধ হন এবং যীশুখ্রীষ্টকেই ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করতে তিনি মনস্থ করেন। রেভারেন্ট জেমসের কাছে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আওলাৎ সিং এবং ভগ্নীপতি দেবী সিং নার্জিনারীকে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেন।[১০] উত্তরবঙ্গের মেচদের মধ্যে প্রথম পাস্টার জগৎসিং বসুমাতার মৃত্যু হলে (২১ শে মার্চ, ১৯১৪) বিধবা ভগ্নী কদমশ্রী মেচদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। উত্তরবঙ্গের মেচদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রথম মহিলা প্রচারিকা রূপে কদমশ্রীর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কদমশ্রীর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র রেভারেন্ড জে. এন. নার্জিনারী খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও বিস্তারের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের মেচসমাজকে একটি শৃঙ্খলাপরায়ণ সমাজে পরিনত করেন। রেভারেন্ড ম্যাকলারেন ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে জে. এন. নার্জিনারীকে মহাকালগুড়ি খ্রিষ্টীয় মন্ডলির প্রাচীন পদে নিযুক্ত করেন। তারপর বাইবেল ট্রেনিং প্রদানের পর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে রেভারেন্ড ম্যাকলারেন জে. এন. নার্জিনারীকে পালকীয় পদে অভিষিক্ত করেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে ৪৫ বছর ধরে জে. এন. নার্জিনারীর পালক পদে থাকাকালীন খ্রিষ্টীয় মেচ মন্ডলীর ইতিহাসে শুরু হয় একটি স্মরণীয় অধ্যায়। স্থানীয় বিশিষ্ট উদ্যোগী মেচদের সহযোগিতায় ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত উপজাতি এলাকায় তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মহাকালগুড়ি মিশন উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁর অদম্য আত্মবিশ্বাস এবং একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ দারিদ্রক্লিষ্ট উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার জনগণের ভাগ্যে উচ্চশিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর রেভারেন্ড

নার্জিনারী দেহত্যাগ করেন। রেভারেন্ড নার্জিনারীর পাশাপাশি জিতনাল নার্জিনারী, নয়নসিং মোছারী, চন্দ্রসিং ঈশ্বরারী প্রমুখ প্রাচীন পদে দায়িত্ব গ্রহণ করে সমগ্র উত্তরবঙ্গের মেচ সমেজে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার করেছিলেন।[১১]

যে খ্রীষ্টধর্মের বীজ উত্তরবঙ্গের মেচ সমাজে জগৎসিং বসুমাতা বপন করেছিলেন রেভারেন্ড নার্জিনারীর সেবা ও পরিচর্যায় তা বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মেচদের মধ্যে আজ নানা মত ও বিভাজন সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্ম অনুসরণে মেচদের মধ্যে প্রেরণাদায়ী ও প্রথম কর্ণধাররূপে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

বিভিন্ন সময়ে যে সকল বিশিষ্ট মিশনারীগণ উত্তরবঙ্গের বর্তমান আলিপুরদুয়ার জেলার মহাকালগুড়ি এবং পাশ্ববর্তী এলাকায় মেচদের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নকল্পে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন তাঁদের মধ্যে রেভারেন্ড বিট্‌টল, রেভারেন্ড প্যারী, রেভারেন্ড ম্যাকউইলিয়াম, রেভারেন্ড ম্যাকহাকিংসন, রেভারেন্ড ব্রুডি, রেভারেন্ড উইলসন (স্বামী-স্ত্রী) এবং মিস ম্যাকলীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিস ম্যাকলীন মেচদের কাছে রুমুদি নামে পরিচিত এবং অত্যন্ত আদরণীয়া ছিলেন।[১২] মিশনারীদের পাশাপাশি বহু বিভাজিত খ্রিষ্টীয় শাখা সংস্থাসমূহ অবহেলিত প্রত্যন্ত এলাকার অনুন্নত মেচদের মধ্যে শিক্ষা-স্বাস্থ্য তথা সামগ্রিক সমাজ উন্নয়নের কাজ আজও করে চলেছে। এইভাবে উত্তরবঙ্গের বহু মেচ খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। তবে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও মেচদের মধ্যে স্বজাতীয় ভাষা, পোশাক পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য তারা আজও বজায় রেখে চলেছে।[১৩]

হিন্দুধর্মে রূপান্তর :

ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের পাশাপাশি বহু মেচ হিন্দু ধর্মের সংস্পর্শে আসেন এবং হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন। হাড়িয়া মন্ডল বা হাড়িয়া মেচ এর পুত্র বিশু বা বিশ্ব সিংহ যিনি কোচ রাজবংশের পত্তন করেছিলেন উত্তরবঙ্গের বৃহত অংশ জুড়ে, তিনিও হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তার উত্তরাধিকারীরা হিন্দু হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। শুভজ্যোতি রায় লিখেছেন, "The link betwwen formation of a royalty among the Koches and the replacement of the tribal belief systems with that of `Hindu' practice is clearly shown in the stories surrounding the origin of the famous Kamakshya temple near Guwahati. Biswa Singha is credited with having built this temple over a mound where the inhabitants of the nearby Nilachal hills used to sacrifice pigs, owls and other animals and birds, and with having imported numerous Brahmans from Kanauj and Benaras and other centres of learning to run it."[১৪] অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, বৈদিক যুগের প্রারম্ভকালের মঙ্গোলীয় বড়ো (মেচ) রাজা (আর্যগণ কতৃক অসুর আখ্যায়িত) নরকাসুর শিবের উপাসক ছিলেন। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী শিবের অনুগ্রহে নরকাসুরকে প্রদত্ত কামাখ্যাদেবীর অভিশাপের মেয়াদ লাঘব হয়। সূত সংহিতা-র ব্যাখ্যানুযায়ী মঙ্গোলীয় রাজা বাণাসুর ও ভগদত্তত্ত শিবের উপাসক ছিলেন। এমনকি

একমাত্র প্রহল্লাদ ছাড়া তাদের সকল বংশধর শিবের ভক্ত ছিলেন। প্রহল্লাদই একমাত্র হরি বা বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। শিব সর্বপ্রাচীন ও সর্বশক্তিমান প্রকৃতি পুরুষ রূপে পূজিত।[১৫] সেই কারণেই মেচদের মধ্যে বাংলার শৈব রাজা শশাঙ্কের ন্যায় শিবের উপাসক শৈব পদবিধারী মেচ জাতির অস্তিত্ব আজও বর্তমান।[১৬] তথ্য সংগ্রহকালে বর্তমান গবেষক জানতে পেরেছেন যে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় বহু মেচ আছেন যারা অতীতে মেচ ছিলেন, বর্তমানে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। অনেক মেচ আছেন যারা বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ করে মেচ থেকে আলাদা হয়ে হিন্দু হওয়ার চেষ্টা করেছেন, যেমন- জ্ঞ্যানেন্দ্র চন্দ্র রায় (দক্ষিণ সাতালী) প্রকৃত নাম জ্ঞান্দ্রা নার্জিনারী, পবন রায়, প্রকৃত নাম পবন নার্জিনারী, উপেন রায় (উপেন নার্জিনারী), কিশোরী মোহন রায় (কেতর সিং চম্রসারী) প্রভৃতি।[১৭] বর্তমান আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্গত জটেশ্বরের কাছাকাছি মেচরা পুরোপুরি হিন্দু রাজবংশী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। আজ পর্যন্ত কত মেচ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে রাজবংশী পরিচয় দিচ্ছে তার কোনো হিসাব নেই। কোচবিহার জেলার দিনহাটার মহকুমাতে বেশ কিছু মেচ এখন মোদক নামে পরিচিত। আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের দক্ষিণ সাতালীতে বিশ্বাস, দাস ইত্যাদি উপাধির মেচও আছে। উপাধি পরিবর্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসী থেকে নিজেদের সরিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দু হিসাবে প্রমাণ করা।[১৮] বিভিন্ন আদমসুমারিতে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার মেচ জনসংখ্যা হ্রাসের একটি অন্যতম কারণ হল মেচদের হিন্দু পদবি গ্রহণ করে হিন্দু ধর্মে মিশে যাওয়া।[১৯]

বিভিন্ন আদমসুমারিতে প্রাপ্ত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার মেচ জনসংখ্যা—

সাল	জলপাইগুড়ি/আলিপুরদুয়ার	দার্জিলিং	কোচবিহার
১৮৯১	২১,৬০৮	-------	৩৭৭৮
১৯০১	২২,৩৫০	৩৪২	৫৫৭
১৯১১	১৯,৮৯৩	--------	-------
১৯২১	১০,৭৭৭	--------	-------
১৯৩১	৯,৫১০	৩৭৯	৭৭
১৯৪১	৬,৮৮৬	২৭২	-----
১৯৫১	১০,৫০৭	২২৪	৫৬
১৯৬১	১৩,১৭৮	২৩৭	১৫৩
১৯৭১	১০,৩৮৭	২৫৩	৬৮

তথ্যসূত্র : দাস, অশেষকুমার, “মেচ জনজাতির কথা”, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৬১-১৬২।

ব্রাহ্মধর্মে রূপান্তর :

ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী বড়ো তথা মেচদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমাজ

সংস্কারক এবং ব্রহ্মধর্মের গুরু হিসাবে গুরুদেব কালীচরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক কালে আসাম রাজ্যের বড়োদের মত পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গের মেচ (বড়ো) উপজাতি বিভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত এবং বাঙ্গালী সমাজের মূলধারার সঙ্গে মিশে যেতে আরম্ভ করলে বড়ো তথা মেচ সমাজের নেতা এবং ধর্মীয় গুরু কালীচরণ ব্রহ্মের আবির্ভাব ঘটে। কালীচরণ গুরুদেব শ্রীমত শিবনারায়ণ পরমহংস স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় সাক্ষ্যাৎ করে ব্রহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেই ধর্ম বড়ো তথা মেচদের মধ্যে প্রচারের কাজে মনোনিবেশ করেন।[২০]

কালীচরণ ব্রহ্মের প্রধান উদ্দ্যেশ্য ছিল ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মে মেচদের ধর্মান্তকরণ বন্ধ করা। এছাড়াও বহু দেবদেবীর পূজা বন্ধ করার পাশাপাশি মূর্তিপূজা বিহীন শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের এক স্মরণীয়া ধর্মে বড়ো তথা মেচদের মিশে যাওয়ার বিরুদ্ধেও তিনি প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। কালীচরণ তাঁর গুরু পরমহংস স্বামীর কাছে ব্রহ্মধর্মে ধর্মান্তিরিত বড়ো তথা মেচদের 'ব্রহ্ম পদবি' গ্রহণের অনুমতি গ্রহণ করেন এবং তিনি ব্রহ্মধর্মে ধর্মান্তিরিত বড়ো তথা মেচদের 'ব্রহ্ম পদবি' গ্রহণের কথা বলেন। আজও উত্তরবঙ্গে 'ব্রহ্মপদবিধারী' বেশ কিছু মেচদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।[২১] আসাম রাজ্যের মতই পশিমবঙ্গের অন্তর্গত উত্তরবঙ্গে ব্রহ্মধর্মের যে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছিল সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। উত্তরবঙ্গে ব্রহ্মধর্ম গ্রহণকারী মেচদের মধ্যে পথিকৃৎ ছিলেন বঙ্কনাথ চম্প্রমারীর (তৎকালীন বিশিষ্ট পঞ্চায়েত) জ্যেষ্ঠপুত্র মণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম। তারপর মণীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশী মেচদের মধ্যে একে একে ব্রহ্মধর্মে ধর্মান্তরিত হন। এপ্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম (প্রাক্তন বিধায়ক), খড়্গনাথ ব্রহ্ম, গাবরসিং ব্রহ্ম, মেহেরসিং ব্রহ্ম, মনোরঞ্জন ব্রহ্ম, বীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, হরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, সুরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম (তৎকালীন বিশিষ্ট পালোয়ান ও ব্রহ্ম পুরোহিত), মুদুরাম ব্রহ্ম (পুরোহিত), ডঃ বারেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, অজেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, মঙ্গলসিং ব্রহ্ম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।[২২] যাইহোক, গুরুদেব কালীচরণ ব্রহ্ম প্রবর্তিত ব্রহ্মধর্মের শ্রেণিবৈষম্যহীন ধর্মীয় আদর্শ, উদারতা, অনাড়ম্বর, সংস্কার বর্জিত, সহজ, সরল সামাজিক রীতিনীতি উত্তরবঙ্গের মেচ সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।

সৎসঙ্গ ধর্মমতে রূপান্তর :

অনুকুলচন্দ্র চক্রবর্তী (অনুকুল ঠাকুর) এর অনুগামী আনিল গাঙ্গুলি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পাবনা জেলা থেকে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের বারোবিশায় সৎসঙ্গ আন্দোলন প্রচারের উদ্দ্যেশে আসেন। অতঃপর তিনি কুমারগ্রাম ব্লকের বেশ কিছু জনগণকে অনুকুল ঠাকুরের শিষ্যে পরিনত করেন, যারা পরবর্তিকালে সৎসঙ্গ ধর্মমত উত্তরবঙ্গ ও আসাম রাজ্যের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে প্রচার করেন। এই সময় অনিল গাঙ্গুলির নেতৃতে বারোবিশার বিনোদবিহারি বর্মন নামে এক রাজবংশী ব্যক্তি সৎসঙ্গ ধর্মমত গ্রহণ করেন এবং উত্তরবঙ্গ ও আসামের মেচ সম্প্রদায়ের মধ্যে সৎসঙ্গ ধর্মমত প্রচারের চেষ্টা করেন। সৎসঙ্গ আন্দোলনের একজন

ঋত্বিক (সক্রিয় সদস্য ও নতুন শিষ্য গঠনের অধিকারী) এবং পাঞ্জাধারী (ধর্মের প্রচারক) হিসাবে বিনোদবিহারি বর্মন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চকোয়াখেতি ও লোকনাথপুর গ্রামের বেশকিছু মেচ জনগণকে অনুকুল ঠাকুর প্রবর্তিত সৎসঙ্গ ধর্মমতে ধর্মান্তরিত করেন।[২৩] ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার জেলার অন্তর্গত মেখলীগঞ্জ ব্লকে জামালদহ সৎসঙ্গ বিহার স্থাপনকালে সৎসঙ্গ আন্দোলন সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসামে ছড়িয়ে পড়ে। সৎসঙ্গ ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে অনুকুলচন্দ্র চক্রবর্তী (অনুকুল ঠাকুর) এর জ্যেষ্ঠপুত্র অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারের জামালদহ সৎসঙ্গ বিহারে আসেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত পরিভ্রমণ করেন। এইসময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারের অনেক মেচ বিনোদবিহারি বর্মনের নেতৃত্বে সৎসঙ্গ ধর্মমত গ্রহণ করেন।[২৪] আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সামুকতলা থানার অন্তর্গত লোকনাথপুর গ্রামের পিয়ন এবং পাঞ্জাধারী (ধর্মের প্রচারক) ফলেন নার্জিনারী ঐ গ্রামের মেচদের মধ্যে সৎসঙ্গ ধর্মনীতি প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।[২৫] অনুরূপভাবে লোকনাথপুর গ্রামের নরেশ ঈশ্বরারি সৎসঙ্গ ধর্মমত গ্রহণ করেন। আলিপুরদুয়ার হাই স্কুলের শিক্ষক বিমল সিং নার্জিনারী বিনোদবিহারি বর্মনের নেতৃতে সৎসঙ্গ ধর্মমত গ্রহণ করেন এবং কুমারগ্রাম ব্লকের অন্তর্গত নারারথলি গ্রামের মেচ সম্প্রদায়কে সৎসঙ্গ ধর্মমত গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন। স্বভাবতই এই গ্রামের কিছু মেচ পরিবার সৎসঙ্গ ধর্মমত গ্রহণ করেন। অনুরুপে চকোয়াখেতি গ্রামের বিমল কার্জী, ফনিন্দ্রনাথ কার্জী, সান্তিরাম কার্জী, রমেশ কার্জী এবং অন্যান্য আরো অনেকেই অনুকুলচন্দ্র চক্রবর্তী প্রবর্তিত সৎসঙ্গ ধর্মমতের অনুগামীতে পরিনত হন। এই ভাবে আলিপুরদুয়ার জেলার ৪৫০ (চার শত পঞ্চাশ) টি মেচ পরিবারের প্রায় ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচ শত) সদস্য সৎসঙ্গ ধর্মমত গ্রহণ করেন।[২৬]

সৎসঙ্গ ধর্মমত গ্রহণের পর ধর্মান্তরিত মেচ সম্প্রদায় তাদের ঐতিহ্যগত সামাজিক রীতিনীতি থেকে সরে আসে। তখন তারা আর্য সমাজ কতৃক প্রবর্তিত অধিকাংশ সাংস্কৃতিক রীতিনীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। এই ধর্মমত গ্রহণের পর তারা জুয়া খেলা ছেড়ে দেয়, মাছ ও মাংস ভক্ষন ত্যাগ করে, 'জৌ' (বাড়িতে তৈরি পানীয় উত্তেজক) পান করা ত্যাগ করে, ঐতিহ্যগত জোরপূর্বক বিবাহপ্রথা ত্যাগ করে, এমনকি বহু দেবদেবীর পূজাও তারা বন্ধ করে। ধর্মান্তরিত অনেক মেচ অবশ্য সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার নিরামিষ আহার গ্রহণের রীতি চালু করে এবং ক্রমে ক্রমে নিরামিষভোজীতে পরিনত হয়।[২৭] এসবের পাশাপাশি তারা তাদের ঐতিহ্যগত শূকর প্রতিপালন বন্ধ করে দেয়। সমবেত ধর্মোপাসনার জন্য তারা মাঝে মাঝে কোন শিষ্যের বাড়িতে কিংবা কোন সামাজিক ভবনে মিলিত হতেন। মেচদের সৎসঙ্গ সংক্রান্ত বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সম্মেলনে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সৎসঙ্গ অনুগামীরাও মিলিত হতেন। ফলে মেচ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হয়। অনুকুল ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে এই ধর্মান্তকরনের প্রচেষ্টা উত্তরবঙ্গের মেচ সমাজে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এইভাবে সৎসঙ্গ আন্দোলন ধর্মান্তরিত মেচ সমাজকে এক উন্নত সংস্কৃতি প্রদান করে।[২৮]

উপসংহার :

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির পূজারী মেচ উপজাতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে ধর্মান্তরিত হয়। কখনো মুসলমান আক্রমণ, কখনো খ্রিস্টান মিশনারীদের নানারকম প্রলোভন, কালীচরণ ব্রহ্ম কর্তৃক ব্রহ্ম আন্দোলনের প্রভাব, কখনো হিন্দু বাঙ্গালীর সংস্পর্শ, আবার কখনো অনুকুল ঠাকুরের শিষ্য কর্তৃক সৎসঙ্গ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার উত্তরবঙ্গের মেচ সমাজকে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে দেয়। আর এই ধর্মীয় পরিবর্তনের ফলে মেচ উপজাতির নিজস্ব সত্তা আজ এক সংকটের মুখে এসে দাঁড়ায়। যে মানুষরা ছিল একই পরিচয়ে পরিচিত, সেই মানুষদের মধ্যে আজ বিভিন্ন ভেদাভেদ। এটা হয়তো ইতিহাসেরই পরিণতি। তবে এ থেকে উত্তরবঙ্গের মেচ উপজাতির মানুষদের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে তার আভাস পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রান্তে। কোন একটি জনজাতির মানুষ যখন তার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে তখন তার মধ্যে যেমন একটা ব্যথা অনুভূত হয়, তেমনি তার মধ্যে ক্ষোভও পুঞ্জিভূত হয়।

তথ্যসূত্র :

১। নাথ, প্রমোদ, মেচ সংস্কৃতির আঙ্গিনায়,প্রভা প্রকাশনী,কলকাতা,২০০৬,পৃষ্ঠা-৮।

২। মন্ডল, সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাদক- বনি নার্জারি), বড়োদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সাতালি মন্ডলপাড়া, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ২০১১, পৃষ্ঠা-৯৪।

৩। সুত্রধর, কার্তিক চন্দ্র, "উত্তরবঙ্গে মেচ সংস্কৃতিঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ", ড. আনন্দগোপাল ঘোষ ও ড. অসীম কুমার সরকার সম্পাদিত, ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, মালদা, ২০১১, পৃষ্ঠা-৫৬।

৪। নাথ, প্রমোথ, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনজীবনে পূজা-পার্বণ, অর্পিতা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা-১১।

৫। সুত্রধর, কার্তিক চন্দ্র, "উত্তরবঙ্গে মেচ সংস্কৃতিঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ", ড. আনন্দগোপাল ঘোষ ও ড. অসীম কুমার সরকার সম্পাদিত, ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬।

৬। সাক্ষাৎকারঃ মজেন নার্জিনারী, বয়সে- ৭৫, গ্রাম+পোঃ- মধ্য কামাক্ষাগুড়ি, ব্লক- কুমারগ্রাম, জেলা- আলিপুরদুয়ার, তারিখঃ ০১, ০১, ২০২১।

৭। Debnath, Sailen, The Dooars in Historical Transition, N.L. Publishers, Shive Mandir, West Bengal, 2010, pp.25-26.

৮। সাক্ষাৎকারঃ মনোজ কাঠাম, বয়স- ৭৩, গ্রাম+পোঃ- কাঠামবাড়ী, ব্লক-মাল, জেলা- জলপাইগুড়ি, তারিখঃ ০২, ০২, ২০২১।

৯। The Imperial Gazetteer of India, Vol- XIV, Jaisalmer to Kera, Oxford, Clarendon Press, 1908, p.36.

১০। মন্ডল, সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাদক- বনি নার্জারি), বড়োদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি,

পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২৪।
১১। তদেব, পৃষ্ঠা-২২৫-২২৬।
১২। তদেব, পৃষ্ঠা-২২৬।
১৩। সাক্ষাৎকারঃ বাবু নার্জিনারী, বয়স-৬৫, গ্রাম+পোঃ- তালেশ্বরগুড়ি, ব্লক-আলিপুরদুয়ার-২, জেলা- আলিপুরদুয়ার, তারিখঃ ০১, ০১, ২০২০।
১৪। Roy, Subhajyoti, Transformations on The Bengal Frontier: Jalpaiguri 1765-1948, Routledge Curzon Publication, London, 2002, p.44.
১৫। মন্ডল, সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাদক- বনি নার্জারি), বড়োদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১৬।
১৬। সাক্ষাৎকারঃ গজেন শৈব, বয়স-৬০, গ্রাম+পোঃ- সাতালি, ব্লক-কালচিনি, জেলা- আলিপুরদুয়ার, তারিখঃ ০৫,০২,২০২০।
১৭। সাক্ষাৎকারঃ উপেন রায়, বয়স-৫৫, গ্রাম+পোঃ- দক্ষিণ সাতালি, ব্লক-কালচিনি, জেলা- আলিপুরদুয়ার, তারিখঃ ০৫,০৫,২০২০।
১৮। সুত্রধর, কার্তিক চন্দ্র, "উত্তরবঙ্গে মেচ সংস্কৃতিঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ", ড. আনন্দগোপাল ঘোষ ও ড. অসীম কুমার সরকার সম্পাদিত, ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮।
১৯। দাস, অশেষকুমার, "মেচ জনজাতির কথা", রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৬১-১৬২।
২০। মন্ডল, সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাদক- বনি নার্জারি), বড়োদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২৯।
২১। সাক্ষাৎকারঃ নরেন ব্রহ্ম, বয়স-৬০, গ্রাম+পোঃ- সাতালি, ব্লক-কালচিনি, জেলা- আলিপুরদুয়ার, তারিখঃ ০১, ০২, ২০২০।
২২। মন্ডল, সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাদক- বনি নার্জারি), বড়োদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৩।
২৩। সাক্ষাৎকারঃ বেদদ্যুতি বর্মন, বয়স-৫০, পিতা- বিনোদবিহারি বর্মন গ্রাম+পোঃ- বারোবিশা, ব্লক-কুমারগ্রাম, জেলা- আলিপুরদুয়ার, তারিখঃ ০৬, ০১, ২০১৯।
২৪। ঐ।
২৫। সাক্ষাৎকারঃ বিমল কার্জী, বয়স-৫৫, শিক্ষক এবং সৎসঙ্গ ধর্মমতের প্রচারক, গ্রাম+পোঃ- চকোয়াখেতি, ব্লক-আলিপুরদুয়ার, জেলা- আলিপুরদুয়ার, তারিখঃ ০৫, ০১, ২০১৯।
২৬। ঐ।
২৭। সাক্ষাৎকারঃ বেদদ্যুতি বর্মন, পূর্বোক্ত।
২৮। সাক্ষাৎকারঃ ভুবন নার্জিনারী, বয়স-৭০, গ্রাম+পোঃ- তালেশ্বরগুড়ি, ব্লক-আলিপুরদুয়ার-২, জেলা- আলিপুরদুয়ার, তারিখঃ ০১, ০১, ২০১৯।

রবীন্দ্র ভাবনায় বিজ্ঞান ও শিক্ষা - বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

ড. মিনারা ইয়াসমিন

সারসংক্ষেপ :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এইসব প্রবন্ধে তিনি সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, সাহিত্যতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, সঙ্গীত ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন। তার শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার কথা প্রকাশ করেছেন 'শিক্ষা' (১৯০৮) নামক গ্রন্থটিতে। বিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭) নামক তথ্যমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিশাল কর্মকান্ডের মধ্য থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া যায় তার সকলই বর্তমান বিজ্ঞান শিক্ষায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি ভাববাদী ও প্রকৃতিবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তার দর্শন চেতনায় মানবসংসারের জয়গানের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি বৃহত্তর জনসাধারণের স্বনির্ভরতা ও বৌদ্ধিক উন্নতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে বিজ্ঞানশিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা ও পদ্ধতি হবে কর্মমুখী ও জীবনমুখী — প্রকৃতির কোলে উন্মুক্ত পরিবেশে স্বাভাবিক নিয়মে ঘটবে শিক্ষণ পদ্ধতি। তিনি সমগ্র বিশ্বের মানবতা ও সৌভ্রাতৃত্বের আবেশ রচনার জন্য সমন্বিত পাঠক্রম প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশ্বভারতীতে কবি সনাতন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্রম্মচর্য ও গুরু প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন।

মূল শব্দ :

রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞান, শিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা

প্রতিপাদ্য বিষয় :

ভূমিকা :

রবীন্দ্রনাথ একাধারে ছিলেন বিখ্যাত কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, চিত্রকর, নাট্যকার, সঙ্গীতকার তেমনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী ও বিজ্ঞানপ্রেমী। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত ঠাকুরপরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মগুরু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবী। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ব্রাহ্ম আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, বাড়িতে ছিল স্বদেশী ভাবনা। ১৯২১ সালে গ্রামোন্নয়নের জন্য তিনি শ্রীনিকেতন নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠান করেন। ১৯২৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমগ্র জীবনব্যাপী সারা বিশ্বে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেন। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ তথা দার্শনিক অমর্ত্য সেন রবীন্দ্রনাথকে এক 'হিমালয় প্রতিম ব্যক্তিত্ব ও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক ও বহুমাত্রিক সমসাময়িক দার্শনিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন অপ্রতিরোধ্য আবিষ্কারক ও অসাধারণ একজন কারিগর। তার কবিতা মোহময়ী, যাদুকরী, ভালোবাসার ছোঁয়ায়, বিশ্বজনীন মানবতাবাদ, এক সুন্দর ইন্দ্রিয়চেতনা সমৃদ্ধ, প্রকৃতির সহিত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত ও তীব্র চেতনাবোধে আপ্লুত, এতদ্‌সত্ত্বেও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অসাধারণ আগ্রহ ও উদ্যম তার বহু লেখায় প্রতিফলিত। ১৯৪১ সালে কলকাতার পৈত্রিক বাসভবনেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আলোচ্য বিষয় সূচির উদ্দেশ্য :

১। বর্তমান বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা ফুটিয়ে তোলা।

২। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষকের ভূমিকা, শিক্ষার্থীর চেতনাবোধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটানো।

বিষয়সূচির পদ্ধতি :

আলোচ্য বিষয়সূচীটির তথ্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, কবিতা, প্রবন্ধ, রবীন্দ্ররচনাবলী ও ইন্টারনেট তথ্য অর্থাৎ মূলতঃ গৌণ উৎস দ্বারা সংগৃহীত এবং এটি বর্ণনামূলক ও গুণবাচক।

বিজ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্য :

NCF 2005 অনুযায়ী বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর চিন্তন ও যুক্তিক্ষমতার পুঁজিভূত সম্পদের প্রসারণ ও সমৃদ্ধিকরণ। এই প্রধান উদ্দেশ্যটিকে সামনে রেখে চরিতার্থ করতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি অত্যাবশ্যকীয় :

১। ব্যবহারিক উদ্দেশ্য - দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞানকে প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগাবার ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করা। সেজন্য বহুবৃত্তির উপযোগী মৌলিক জ্ঞান যেটুকু প্রয়োজন তা সুনিশ্চিত করা। সামাজিক জীবনে অর্থ ব্যবস্থাপনা সময় ব্যয়ের ক্ষেত্রে সঠিক মূল্য নির্ধারণে সাহায্য করে।

২। কৃষ্টিমূলক উদ্দেশ্য - আধুনিক চিন্তাধারা ও জীবনবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলস্বরূপ। পূর্ত, কৃষি, রেলপথ, গৃহনির্মাণ, নোটচালনা, জরিপের কাজ প্রভৃতি বৃত্তিতে বিজ্ঞান ও গণিতের অবদান অপরিহার্য।

৩। শৃঙ্খলামূলক উদ্দেশ্য - বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার ফলে এমন কতকগুলি বিশেষ ধরনের চিন্তাধারায় আমরা অভ্যস্ত হই সেগুলি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। যেমন বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্যক উপলব্ধি করার ক্ষমতা, নানাবিধ ঘটনার মধ্যে থেকে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করা। যেকোনো জটিল পরিস্থিতিতে প্রকৃত তথ্যটি সাবধানতা ও যত্নের সঙ্গে বেছে নিতে হয়। এজন্য আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায়, আত্মসংযম গড়ে তোলা দরকার এবং নতুন তত্ত্ব ও অবিষ্কারের সত্ত্বা জাগিয়ে তোলা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের মতে -

১। "চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যদি মানুষের মতো মানুষ হতে হয় তবে এই দুটি পদার্থ জীবন হতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না, একথা অতি পূরাতন।" - (শিক্ষার হেরফের পৃ. ১০)

২। "শিক্ষা সম্বন্ধে সবচেয়ে স্বীকৃত এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটা জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে। বেঁচে থাকার নিয়ত ইচ্ছা ও সাধনাই হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রকৃতিগত লক্ষণ। যে সমাজে প্রাণের জোর আছে সে সমাজটিকে থাকবার স্বাভাবিক গরজেই আত্মরক্ষাঘটিত দুটি সর্বপ্রধান প্রয়োজনের দিকে অক্লান্তভাবে সজাগ থাকে, অন্ন আর শিক্ষা, জীবিকা আর বিদ্যা।" (শিক্ষার সাঙ্গিকরণ)

৩। "ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে - দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃক্ষ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানাদিক থেকে আমাদের বারংবার ব্যর্থ হতে হবে।" (তপোবন -পৃ: ১০)

৪। "প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে; এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, যা দূর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়।" (তপোবন -পৃ: ১০)

পাঠক্রম :

বিজ্ঞান ও গণিত পাঠক্রম নকশা তৈরীর ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও কৌশল ও মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরো প্রয়োজন এবং এই নকশা তৈরী পাঠক্রম নির্বাচন ও পাঠক্রম বিন্যাসের দ্বারা ঘটে থাকে। এখন পাঠক্রম নির্বাচনে যে নীতিগুলো গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তা হল—

১। পাঠক্রম হবে শিশুকেন্দ্রিক।

২ পাঠক্রম হবে গতিশীল।

৩। পাঠক্রম হবে প্রাত্যহিক জীবনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

৪। পাঠক্রম হবে যুক্তিনির্ভর।

৫। পাঠ্যক্রম 'living for learning' এর পরিবর্তে 'learning for living' এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলবে।

৬। পাঠক্রম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সঞ্চরণে সাহায্য করবে।

৭। পাঠক্রম হবে নমনীয়।

৮। পাঠক্রম হবে সমন্বিত।

আবার পাঠক্রম বিন্যাসের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিগুলো অনুসরণ করা হয়:

১। অনুবন্ধনীতি

২। কাঠিন্যমাত্রা বিন্যাসের নীতি

৩। মনোবিজ্ঞান ও যুক্তি সম্মত নীতি

৪। কর্মসম্পাদনের নীতি

৫। ব্যক্তিবৈষম্যের নীতি

রবীন্দ্রনাথের মতে -

“জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশোনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল, অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে। জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়, সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক; কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকে কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।” (শিক্ষার বাহন)

‘এই জন্য যখন এমনতর প্রশ্ন শুনি ’আমরা কি শিখিব, কেমন করিয়া শিখিব, শিক্ষার কোন প্রণালী কোথায় কীভাবে কাজ করিতেছে’ - তখন আমার এই কথাই মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই দুটো কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড় জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না। (লক্ষ্য ও শিক্ষা পৃ. ১৩১)

“আজকের দিনে যেসব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাববিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সবকিছুরই পরে তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিরশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে। ...

বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি ও মাধ্যম :

বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণত যে পদ্ধতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল :

১। কর্মসম্পাদনভিত্তিক পদ্ধতি

২। আবিষ্কারকের পদ্ধতি

৩। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের পদ্ধতি

৪। সমস্যা সমাধান পদ্ধতি

৫। পরীক্ষাগার পদ্ধতি

৬। প্রজেক্ট পদ্ধতি

এই সবকটি পদ্ধতিতেই শিশুর চাহিদা, ক্ষমতা, আগ্রহ, সমস্যা, কৌতুহলো আনুসন্ধিৎসাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় ও জাগিয়ে তোলা হয়। রবীন্দ্রনাথের মতেও শিক্ষণ পদ্ধতি হবে প্রকৃতির সহিত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত যা উন্মুক্ত পরিবেশে ক্রিয়াশীল।

রবীন্দ্রনাথের মতে -

"নিজের অবস্থাকে নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার মতো দীনতা আর কিছু নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার বেগকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ, ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র প্রলুব্ধতা হইতে উপরের দিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই তাহার এমন কোনো বাহ্য অবস্থাই নাই যাহার মধ্য হইতে সে বাড়িয়া উঠিতে পারে না; এমনকি সে অবস্থায় বাহিরের দারিদ্র্যই তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে।" (লক্ষ্য ও শিক্ষা পৃঃ ১৩৪)

তাই তো শুনি,

"আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।"

"বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে, কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফতানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে। ... আমরা ভরসা করিয়া এপর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দেব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে। বিজ্ঞান শিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহুরে এক বিজ্ঞান সভা খাঁড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্য দেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতেই সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসিন্যের স্মরণস্তম্ভের মতো স্থানু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠীন বৈ কি। সেইজন্যই কঠোর সংকল্প চাই। বলা বাহুল্য, ইংরেজি আমাদের শেখা চাই-ই, শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন, ফরাসি জার্মান শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে একথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না, সেই লক্ষ লক্ষ বাংলা ভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, একথা কোন মুখে বলা যায়?..."

শিক্ষকের ভূমিকা :

সমাজ শিক্ষককে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে দেখতে চায়। বিজ্ঞান শিক্ষককে

হতে হবে নিজ বিষয়ে জ্ঞানী, দক্ষ, সাবলীল। এছাড়া তিনি হবেন সৎ, নিষ্ঠাবান, ধৈর্যশীল, আত্মবিশ্বাসী নেতৃত্বপরায়ণ ও চরিত্রবান। মানবসমাজের ভবিষ্যৎ কর্ণধারের দায়িত্ব তাঁর উপর। শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, মানসিক বয়স, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষমতা, অতীত জ্ঞান, সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করবেন। বিজ্ঞান ও গণিতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে এবং উপলব্ধির ক্ষমতা বিকশিত করতে শিক্ষক সচেষ্ট থাকবেন। বিজ্ঞান ও গণিতের সমস্যাগুলিকে বাস্তব ও জীবনভিত্তিক করতে সচেষ্ট থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

"শিক্ষার সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস-আদালতের বা কলকারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনই সে মানুষ না হইয়া মাস্টারমশাই হইতে চায়; তখনই সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি। বর্তমানকালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই। তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক সকলদিকেই আমরা মানুষকে চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালির বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।" (শিক্ষাবিধি পৃঃ ১২৮)

শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক :

শিক্ষকের ছাত্রদের প্রতি ব্যবহার হবে সহানুভূতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের কথায় -

"রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।"

"ছাত্ররা গড়িয়া উঠিতেছে; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণখোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই;

তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেইজন্যই সৎগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে উর্ধ্বের দিকে উৎঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণরেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না, যারা নিজের বিদ্যা পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত তারা গুরু পদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না।" (ছাত্র শাষণতন্ত্র)

উপসংহার :

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভান্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই ...

শিশুর প্রতি মায়ের ঔৎসুক্য আছে কিন্তু ডাক্তারের মতো তার বিদ্যা নেই। বিদ্যাটি সে ধার করে নিতে পারে কিন্তু ঔৎসুক্য ধার করা চলে না। এই ঔৎসুক্য - শুশ্রূষায় যে রস যোগায় সেটা অবহেলা করবার জিনিস নয়।" (বিশ্বপরিচয়)

অর্থাৎ বিজ্ঞান হল অনুসন্ধিৎসা ও ঔৎসুক্যের খোরাক। তাই বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের চাহিদা পুরণের অন্যতম হাতিয়ার। তবে, বিজ্ঞানের অপব্যবহার সম্বন্ধে তিনি সতর্ক থাকতে বলেছেন। যান্ত্রিক সভ্যতার রুক্ষতায় ক্লান্ত কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর।"

তাই পরিশেষে বলা যায়, প্রকৃতির সহচর্যে, বিজ্ঞানের অবদানে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক সুন্দর পৃথিবী হোক আমাদের স্বপ্ন।

কবির ভাষায়— "নিঃসঙ্কোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে
মুক্তির বিকাশে।"

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯০৮), শিক্ষা, কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।
২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৭), বিশ্বপরিচয়, কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।
৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৮৮৩), বিবিধ প্রসঙ্গ, কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।
৪। উইকিপিডিয়া(২০১৭),রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,মুক্তবিশ্বকোষ।https://bn.wikipedia.org/s/lk7
৫। Majumdar, S.K. (2011)ñ Rabindranath's Thoughts on Scienceñ Frontierñ Vol. 44ñ Issue No. 11.

রবীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনা : প্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা

ড. মিঠু দেব

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। কবি সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। কিন্তু এর পাশাপাশি তাঁর আরেকটি বড় পরিচয় তিনি মানব প্রেমিক। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের সুলুক সন্ধান করতে গেলে তাঁর পরিচিত সাহিত্যসাধক রূপের বাইরে দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ এক দেশ-দরদী মহামানবের ছবি ধরা পড়ে। ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠে একজন সাহিত্যসাধক হওয়ার পাশাপাশি যথার্থ অর্থেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিক মানবদরদী এই কবি সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। তাঁর অজস্র লেখা ও বক্তৃতায় বারবার উঠে এসেছে সে কথা। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ভারতবর্ষীয় সমাজের নানা সমস্যার যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন তেমনি সেই সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্ম aesthetic অনুভূতি দিয়ে সমসাময়িক সামাজিক বিষয়গুলিকে দেখেছেন। দৃষ্টি দিয়েছেন সমাজের প্রতিটি আনাচে-কানাচে। তাঁর মনে হয়েছে ‘‘আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে— আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকল প্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে।’’[১] স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর লোভাতুর দৃষ্টি ও আত্মগরিমাকে তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সমাজের হিত সাধনের নামে এক শ্রেণীর ধনী মানুষের স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। রূপসী বাংলার বুকে আর্থিক দৈন্য ও অভাবী চাষী, খেতমজুর ও নিম্নবর্ণের মানুষের যন্ত্রণাক্লিষ্ট রূপ প্রত্যক্ষ করে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। শ্রেণী-বর্ণ-ধর্মের বিভাজন, জাতপাতের বিভেদ কীভাবে সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তার স্বরূপ উপলব্ধি করে যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়েছেন তিনি। ভারতীয় সমাজের সামগ্রিক হতশ্রী রূপ দেখে কবি তাই চুপ করে থাকতে পারেননি। ভারতীয় সমাজের সামগ্রিক সংকট অনুধাবন করে তাঁর মনে হয়েছে :

‘‘আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভুক্ত স্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমন কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরেজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্তনীয় রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি— কোনো আপত্তি করি নাই। এ পর্যন্ত হিন্দু সমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে

বিশেষ বিশেষ আচার-বিচারের প্রবর্তন করিয়াছে, হিন্দু সমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরেজের আইনে বাঁধিয়া গেছে— পরিবর্তন মাত্রেই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্মস্থান– যে মর্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এত দিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই আমাদের অন্তরতম মর্মস্থান— আজ অনাবৃত অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ, জলকষ্ট বিপদ নহে।''[২]

রবীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনা বিশ্ব মানবতাবোধ প্রসূত। তাঁর সামাজিক বোধের ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি ও গভীরতা সমগ্র মানবজাতির কাছেই অমূল্য উদাহরণস্বরূপ। একজন সমাজ সচেতন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কবি শিল্পী সাহিত্যিকের মতই সমাজকে জানতে চিনতে সচেষ্ট থেকেছেন তিনি। একজন যথার্থ সমাজ বিশ্লেষকের মতই সূক্ষাতিসূক্ষ্মভাবে সমাজের প্রতিটি সমস্যার বিশ্লেষণ করেছেন। যন্ত্রণাক্লিষ্ট এই সমাজের মুক্তির উপায় সন্ধান করেছেন সারাজীবনব্যাপী। আলোচ্য প্রতিবেদনে রবীন্দ্রনাথের সেই সমাজ ভাবনার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ আদর্শ সমাজ বলতে বুঝতেন এমন একটি সমাজ যেখানে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার থাকবে, সকল মানুষ সমানভাবে বেড়ে উঠবার সুযোগ লাভ করবে, কোনরকম সামাজিক বৈষম্য থাকবে না। সাম্প্রদায়িকতাকে একটি আদর্শ সমাজের বিষ বলে তিনি মনে করতেন। তৎকালীন যুগসামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ঠাকুরবাড়ির চৌহদ্দিতে অবস্থান করেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা কর্মের মধ্য দিয়ে এমনি একটি সুন্দর সুষ্ঠু আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ কারণেই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় সকল মানুষকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস তাঁকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। যদিও সেখানে ঘটে যাওয়া দু-একটি বিষয়ে তিনি আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন তথাপি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার নানা কার্যকলাপ তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে সামাজিক ব্যাধিগুলি সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রেখেছে তার নিরাময় দরকার। সেই সামাজিক ব্যাধিগুলিকে যে কোনো মূল্যে সমাজ থেকে দূরে রাখতে হবে। তবে প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙতে গেলে সমাজের ভিতটাই কেঁপে গিয়ে সর্বনাশ হতে পারে। তাই মানুষের মনে বারবার আঘাত করে প্রাচীন সংস্কারের জগদ্দল পাথরকে তিনি সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সমাজের দুর্বল মানুষদের ক্ষমতায়নের পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করতে গেলে এ কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। যারা সম্পদে ও ক্ষমতায় ধনী তারা ধনের গর্বে দরিদ্রের দুঃখ ও অসহায়তাকে সাময়িকভাবে উপেক্ষা করতে পারে কিন্তু সেই উপেক্ষার মধ্যে যে তার নিজের বিপদের বীজ লুকানো আছে তা তারা বোঝে না। তাই একজন সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক বৈষম্যের বিষময় ফলের প্রতি কবি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের দেশের দরিদ্র মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকায় তারা হয়ত অন্যায় অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সমাজের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের দুস্তর ব্যবধান সমাজকে একদিন সর্বনাশের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করবে। ইতিহাস থেকে সেই শিক্ষা আমরা বারবার পেয়েছি কিন্তু সমাজের সেই রক্তক্ষয়ী বিভীষিকা কবির প্রার্থিত নয়। সাধারণ মানুষের প্রতি

ঘৃণা, দুর্বল মানুষের প্রতি অবজ্ঞা, তাদের অধিকার হরণের প্রচেষ্টা যে নিজেরই অপমান— এই সহজ সত্যটুকু আমাদের মনে থাকে না। তাই দীন-দরিদ্রকে দূরে সরিয়ে পতিত বলে ঘৃণা করে, দেবতার মূর্তি তৈরি করে তাদের পূজায় মেতে থাকে মানুষ। এইরকম হীনমন্যতাবোধের ফলে সমাজ পঙ্গু হতে বাধ্য। তাই কবি লিখেছেন :

''হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান!
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।''[৩]

কবি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের সামাজিক সমস্যাগুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভারতবর্ষের অগ্রগতির পথে বড় বাধা। এ সমস্যা একদিনে তৈরি হয়নি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ এতটাই মারাত্মক যে শেষ অবধি তা আমাদের দেশটাকেই খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ দেশভাগের মর্মান্তিক পরিণতি দেখে যান নি। কিন্তু জীবদ্দশাতেই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গার ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছেন। এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছিল। এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি নিরাময়ের জন্য তিনি অসীম উৎকণ্ঠায় সভা করেছেন, সাধারণ মানুষদের বুঝিয়েছেন এবং তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। 'ধর্ম মোহ' নামক কবিতায় ধর্মকারার প্রাচীরে আবদ্ধ ধর্মবিকারগ্রস্থ সমাজকে কবি আঘাত করে লিখেছেন :

''ধর্মের নামে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।''[৪]

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে হিন্দুরা কখনোই মুসলিমদের ভাই বলে ভাবতে পারেনি। তাই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে তারা সমর্থন করেনি বরং বিরোধিতা করেছে। 'মুসলিম লীগ' সৃষ্টি হবার পিছনে একটা বড় কারণ ছিল যে কংগ্রেসে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব ছিল নামমাত্র। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন হিন্দু ও মুসলমানদের ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন সাম্প্রদায়িক বিভেদকেই বড় করে তুলবে। এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি সামাজিক ক্ষতিও হবে সাংঘাতিক। তাই রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ছিল যারা দেশের সেবা করতে চান সেই সব যুবকদের দল বেঁধে গ্রামে যেতে হবে। এবং প্রতিটি দলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও মিলন একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের গোড়ায় যখন রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগদান করেন তখন 'রাখীবন্ধন' উৎসবের মধ্য দিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িক মিলন প্রচেষ্টাকেই ফলপ্রসূ করতে

চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন একটি আদর্শ সমাজ গঠনের প্রথম ধাপটি হলো নারী শিক্ষার বিস্তার। বিদ্যাসাগরও একথা বুঝেছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলার সমাজ গঠনের আরেক মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের মনোভাবের অনেকটাই মিল রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল নারীই হল সমাজের চালিকা শক্তি। এই নারীকে পঙ্গু করে কোনও জাতির উন্নতি হতে পারে না। প্রথম জীবনে ইংল্যাণ্ডের সমাজে অনেকটা সময় অতিবাহিত করার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন নিজের দেশের মেয়েদের জীবন কত দুর্বিষহ। 'ভারতী' পত্রিকায় সে বিষয়ে লিখেও ছিলেন তিনি। নারী সমাজের শিক্ষা ও স্বাধীনতার পক্ষে লেখালেখি করে এবং নিজের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে নারীকে স্বাবলম্বী করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে 'শ্রীনিকেতনে'র কর্মপরিকল্পনায় নারীদের স্বনির্ভরতার শিক্ষা শুধু নয় সমাজ পরিচালনায় নারী যাতে যোগদান করতে পারে সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথার বিরোধিতা করে অজস্রবার কলম তুলে নিয়েছিলেন। বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথার বিরোধিতা করে অজস্রবার কলম তুলে নিয়েছিলেন তিনি। এমনকি নিজ পুত্রের বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। এবং শিক্ষিত বঙ্গসমাজ এই বিধবাবিবাহ তেমনভাবে গ্রহণ না করায় তিনি বেদনাবোধ করেছেন।

নারীকে পুরুষের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে বঙ্গসমাজে প্রথম পাশ্চাত্য দেশের মত ছেলে-মেয়ের একসঙ্গে সহশিক্ষার প্রচলন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝামাঝি সময়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে যখন রক্ষণশীল মনোভাব দেখিয়েছে তখনও শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সহ শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। সেই সময় এ নিয়ে নিন্দা অপবাদও কম সহ্য করতে হয়নি তাঁকে। অথচ সমাজ পরিকল্পনার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগটি আজকের দিনে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের যথার্থ স্বরূপ নিহিত রয়েছে গ্রামের মধ্যে। তাই তাঁর সমাজভাবনায় একটা বড় অংশ জুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে গ্রামীণ ভাবনা। ভারতবর্ষের বহু গ্রাম এখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর তখন তো এই গ্রামগুলির অবস্থা ছিল আরও বেহাল। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন কিছু আদর্শ গ্রাম তৈরি করতে যেখানে পানীয় জল থাকবে, খাদ্যের অভাব থাকবে না, রাস্তাঘাট থাকবে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন উন্নয়নের ক্ষেত্রে শহরই প্রাধান্য পায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গ্রামের মধ্যেই তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষকে খুঁজে পেয়েছিলেন। গ্রামীণ ভারতবর্ষের উন্নতি ছাড়া কখনোই ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভব নয়— এই সহজ সত্যটি তাঁর বুঝতে অসুবিধে হয়নি। তাঁর উপলব্ধি ছিল :

''সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোট গ্রাম। এদের মনেক পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন

কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ তৈরি হবে— এই কথা তখন মনে জেগে ছিল, এখনো সেই কথা মনে হচ্ছে।

এই ক'খানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে— সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল ক'খানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি করে দাও। আমি বলব এই ক'খানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা হলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।''[৫]

তিনি চেয়েছিলেন নিচুতলা থেকে দেশের উন্নয়নের কাজ শুরু করতে। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা আজও সমান প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনায় শিক্ষা সংস্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁর শিক্ষাভাবনার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের মধ্যে আত্মশক্তির জাগরণ। যে শিক্ষা মৌলিক কোনও ভাবনায় ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করে না, যে শিক্ষা শুধুমাত্র অনুকরণ করতে শেখায় সে শিক্ষাকে তিনি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেননি। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি ছিল :

''... বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনওমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না।''[৬]

ইংরেজরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তন করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল কেরানি তৈরি করা। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিপরীত এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা থেকে ছাত্রদের মুক্তি দেওয়ার জন্য তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না। বিভিন্ন সময়ে তাই তিনি পাঠক্রমের বই লিখেছেন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নানা পরিকল্পনা করেছেন।

স্বদেশী সমাজ গঠনে কৃষির সঙ্গে শিল্পকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই 'শ্রীনিকেতনে' বহুবিধ শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। তিনি বুঝেছিলেন শুধু কৃষির মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের সার্বিক প্রয়োজন সাধিত হতে পারে না। তার জন্যপ্রয়োজন কৃষির পাশাপাশি শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা। ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে যে শিল্পায়নের প্রসার চলেছে তাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে সমর্থন করেছেন। শুধু কৃষিকার্যে যে সারা বছর দুই বেলা পেট ভরার মত খাবার পল্লীবাসীর জুটতে পারে না বহুকাল পূর্বেই তা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন :

''কিছুকাল হইল বোলপুরের কাছে এক গ্রামে বেড়াইতে গিয়েছিলাম। এক চাষী গৃহস্থের বাড়িতে যইতেই সে আমাদিগকে বসিবার আসন দিল। নানা কথার পরে সে অনুরোধ করিল যে, অন্তত তাহার একটি ছেলেকে আমার বিদ্যালয়ে চাকরি দিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার তো চাষের কাজ আছে, তবে অমন জোয়ান ছেলেকে সাত-আট টাকা

মাহিনায় অন্য কাজে কেন পাঠাইতে চাও।' সে বলিল, হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, চাষে আমাদের কুলায় না। একদিন ছিল যখন ইহাতে আমাদের অভাব স্বচ্ছন্দে মিটিত, কিন্তু এখন সে দিন গিয়াছে।''

...চাষী বলিতেছে, জমিতে তাহার অভাব মিটে না। তাহার একটা মস্ত কারণ এই যে চাষীর অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ছাতা জুতা কাপড় আসবাব তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বুঝিয়াছে সেগুলি নইলে নয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশের খরিদ্দার আসিয়া তাহার দ্বারে ঘা দিয়াছে। তাহার ফসল জাহাজ বোঝাই হইয়া সমুদ্রপারে চলিয়া যাইতেছে। তাই, দেশে চাষের জমি পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইয়াছে, অথচ সমস্ত জমি চাষিরাও সমস্ত প্রয়োজন মিটিতেছে না।''[৭]

বৃহৎশিল্প সেইসময় বাংলাদেশ ছিল না বললেই চলে। তবু দুই একটি শিল্প যেগুলি সেই সময় গড়ে উঠেছিল সেগুলিকে রক্ষা করবার কথা বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই একই সঙ্গে শ্রীনিকেতনে চাষের প্রতীক 'হলকর্ষণ' উৎসব ও শিল্পের প্রতীক শিল্পোৎসবের প্রচলন করে গেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তায় উৎসবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই তিনি যে স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায় উন্নয়ন ও সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে উৎসবকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। উৎসবের মূলে সাধারণত থাকে ধর্মীয় রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার ধর্মীয় অনুশাসনের ঊর্ধ্বে উঠে চিরকালই উৎসবকে দেখেছেন এক বৃহৎ মিলনের প্রেক্ষিতে ও সামাজিক মানুষের পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা প্রসারের ক্ষেত্র হিসেবে। ১৩১২ সালে 'উৎসব' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন :

''...উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুল-পাতার দ্বারা সাজাই, দীপ মালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সংগীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি।

এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণি স্বরূপ করিয়া তুলি। যিনি আনন্দের প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে প্রকাশমান— আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি— উৎসবের দিনে তাঁহারি উপলব্দি দ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এই দিনে সে অনুভব করিবে, সে ক্ষুদ্র নেহ, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেম তহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন— ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই।''[৮] পৌষ উৎসব, রাখীবন্ধন উৎসব, শারোদৎসব, বসন্তোৎসব, বৃক্ষরোপণ উৎসব, নবান্ন উৎসব, মাঘোৎসব, বর্ষ শেষ উৎসব, নববর্ষ উৎসব প্রভৃতি উৎসবের কোনো কোনোটি নিজের হাতে সূচনা করে, আবার কোন কোনটির সঙ্গে নিজে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থেকে মানুষের মধ্যে মিলন মেলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি এইসব উৎসব অনুষ্ঠানের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতেন গ্রামবাসীদের হাতে।

রবীন্দ্রনাথ গত হয়েছেন অনেকদিন। কিন্তু এখনও আমরা রবীন্দ্রনাথকে আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারিনি। হ্যাঁ, বাহ্যিকভাবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু তার বেশিরভাগটাই অনুষ্ঠান নির্ভর। তাঁর সমাজ উন্নতির নিদানকে এখনো আমরা যথার্থভাবে আত্মস্থ করতে পারিনি। তাই হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সম্পর্ক আগের থেকে হয়তো কিছুটা উন্নত হয়েছে কিন্তু চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এখনো অধরাই রয়ে গেছে। তাই এখনও দিকে দিকে সাম্প্রদায়িক অশান্তির আওয়াজ ওঠে, উন্নয়নের প্রশ্নে শহরই প্রাধান্য পায়, গ্রাম থেকে যায় সেই অনুন্নয়নের বেড়াজালেই। দিকে দিকে আওয়াজ ওঠে বঞ্চনার, জঙ্গলমহলের মানুষ, চা বাগানের শ্রমিক না খেতে পেয়ে মরে, কৃষকের আত্মহত্যার মতো অমানবিক ঘটনা ঘটে চলে। এইরকম একটা সময়ে দাঁড়িয়ে সত্যিই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যদি আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকতেন...।

তথ্যসূত্র :

১। ভারতবর্ষীয় সমাজ, আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬২৩।
২। তদেব, পৃ. ৬২৯।
৩। গীতাঞ্জলি, ১০৮, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৩।
৪। ধর্মমোহ, পরিশেষ, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২০৭।
৫। শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ, পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৩৮০।
৬। শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৬৬।
৭। ভূমিলক্ষ্মী, পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৩৫৯।
৮। উৎসব, ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪৫১।

বিবেক মননে বৌদ্ধধর্ম

ড. মুকুল মন্ডল

সারসংক্ষেপ :

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীর কাছে আধ্যাত্মিক মার্গের এক বিশেষ পরিচিত মুখ। এই আধ্যাত্মিক পরিসরের বাইরেরও অনেক বিষয়ের প্রতিও তিনি সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন। জগতের এমন কোনও বিষয় নেই যা তাঁর দৃষ্টি অগোচর থেকে গেছে। তাঁর পান্ডিত্য, আধ্যাত্মিক চেতন, দরদী মনোভাব, সামাজিক দায়িত্ববোধ, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং মানসিক দৃঢ়তা তাকে নরেনদ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দে পরিণত করেছিল। তাঁর জীবন ও দর্শন অনেক মনীষীকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং নিজেও একাধিক মহানমানবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার মধ্যে বুদ্ধদেব অন্যতম। যার দ্বারা স্বামীজী গভীর ভাবে অনুপ্রানিত হয়েছিল। এবং বুদ্ধের জীবন ও তাঁর প্রচারিত ধর্ম তাঁর কাছে এক নবতম শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। বিশেষ করে বুদ্ধের হৃদয়বত্তা স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। বুদ্ধের জীবন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর ব্যক্ত অভিমতের মধ্যেই তা স্পষ্ট। প্রত্যেক ধর্মের একটা নিজস্বতা বতর্মান, তবে ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাবার্থের বিষয়াদি জীব ও জগতের মঙ্গলার্থ নিয়োজিত হয়। তেমনি জীবজগতের হিতার্থে বৌদ্ধধর্মও এক সার্বজনীন ধর্ম। এই ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং বৈষ্ণবধর্মের একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত স্বামীজী স্বীকার করেছেন। স্বামীজীর মতে, সাধক মানুষের মুক্তি সাধনে ও সাধারনের সুশ্রী জীবন যাপনে পথেয় হিসাবে এই ধর্মের বাণী ও তথ্যাদি বিশেষ ভাবে অপরিহার্য। এখন, লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতি ও স্বরূপকে স্বামীজী কিভাবে তাঁর আর্দশনিষ্ঠ অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করেছেন-যা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

মূলশব্দ :

বৌদ্ধধর্ম, সার্বজনীনধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম ও স্বামীজী।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

'বিবেকমননে বৌদ্ধধর্ম'-এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি আলোচলার পূর্বে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের প্রতি স্বামীজীর অনুভূতির জায়গটুকু একবার পরোখ করে নেওয়া যাক। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তার রূপরেখা তৈরীতে মনে হয় এই ধারণাটি সহায়ক হবে। কেননা, ধর্ম প্রবর্তকদের প্রচারিত ধর্মে তাঁর নিজস্ব জীবনের একটা ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই বুদ্ধের জীবনদর্শন তাঁর প্রচারিত ধর্মকে প্রভাবিত করবে বিষয়টি

সমর্থিত। এই মহামানবটিকে স্বামীজী কিরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন তার আলোচনায় উল্লেখ্য যে, তিনি নিজেকে বুদ্ধের দাসানুদাসেরও দাস বলে অভিহিত করতেন। বুদ্ধের প্রতি এই অনুরাগ আমাদের এটা বুঝিয়ে দেয় যে, তিনি ছিলেন বুদ্ধের পরম ভক্ত। বুদ্ধের প্রতি স্বামীজীর এই আন্তরিক অভিবাদন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একটি উক্তির মধ্যে— "আমি বুদ্ধের দাসানুদাসের দাস। সেই মহাপ্রাণ প্রভুর মতো কেউ কি কখনো হয়েছে? তিনি নিজের জন্য একটিও কর্মও করলেন না, তাঁর হৃদয় দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেছিলেন। সেই রাজকুমার এবং সন্ন্যাসীর এত দয়া যে, তিনি একটা সামান্য ছাগ-শিশুর জন্য নিজের জীবন দিতে উদ্যত হলেন, তাঁর এত ভালবাসা যে, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর সামনে নিজেকে সঁপে দিলেন, একজন অন্ত্যজের আতিথ্য গ্রহণ করে তাকে আশীর্বাদ করলেন। আমি যখন সামান্য বালক মাত্র তখন আমি তাঁকে ঘরে দর্শন করেছিলাম এবং তাঁর পদতলে আত্মসমর্পণ করেছিলাম, কারণ আমি জেনে ছিলামযে, তিনি সেই প্রভু স্বয়ং"[১]। এবং বুদ্ধের আর্দশ ও নীতিকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে স্বামীজি ঘোষণা করেন— "বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ না-তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি"[২]।

জগতের মাঝে কর্মযোগের শিক্ষাকে বুদ্ধদেব বাস্তবায়িত করেছিলেন এবং প্রচলিত লোকায়ত দর্শনের প্রভাব থেকে ভারতবর্ষকে তিনি মুক্ত করেছিলেন। মানবজাতির মুক্তি কিভাবে সম্ভব —এই উদ্দ্যেশেই তিনি ধ্যানমগ্ন হয়েছিল। সকলের সমনাধিকারের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ। স্বামীজীর মতে— "যিনি যশ-অর্থ বা অন্য কোন অভিসন্ধি ব্যতীতই কর্ম করেন, তিনি সর্বপেক্ষা ভাল করেন; এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সর্মথ হইবে, তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহার ভিতর হইতে এরূপ কর্মশক্তি উৎসারিত হইবে, যাহা জগতের রূপ পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে। এরূপ ব্যক্তিই কর্মযোগের চরম আদর্শের দৃষ্টান্ত"[৩]। বুদ্ধের মতো এমন কর্মযোগীর প্রয়োজন যিনি সকলের মঙ্গল কামনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। সকলের কল্যাণ সাধন ও সমস্যার সমাধান করাই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা।

প্রচলিত অনুষ্ঠান পদ্ধতি, জাতিভেদ প্রথা এবং অধিকার ভোগের বিধির প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। এবং সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অপকৌশলগুলির প্রতি তিনি সবর্দা বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। বুদ্ধদেবের এই মহিমা ব্যক্ত করতে গিয়ে স্বামীজি বলেছেন— "অবশ্য আমি তাঁহার সকল মত সমর্থন করি না। আমার নিজের জন্যই আমি দার্শনিক বিচারের যথেষ্ট আবশ্যকতা বোধ করি। অনেক বিষয়ে তাহার সহিত সম্পূর্ণ মতভেদ আছে বলিয়া যে আমি তাঁহার চরিত্রের তাঁহর ভাবের সৌন্দর্য কোন রূপ বাহিরের অভিসন্ধি ছিল না। অন্যান্য মহাপুরুষের সকলেই নিজদিগদের ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গেছেন আর ইহাই বলিয়া গেছেন আমাকে যাহারা বিশ্বাস করিবে তাহারা স্বর্গে যাইবে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ শেষ নিঃশ্বাসের সহিত কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন কেহই তোমাকে মুক্ত হইতে সাহায্য করিতে পারে না, নিজের সাহায্য নিজে

কর, নিজের চেষ্টায় দ্বারা নিজের মুক্তি সাধন কর"[৪]।

এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, বুদ্ধদেবকে পরম পূজণীয় ব্যক্তি রূপে, একজন দক্ষ সমাজ সংস্কারক এবং আদর্শবান কর্মযোগী সন্ন্যাসী হিসাবে গ্রহণ করে হৃদয়ের অন্তহীন শ্রদ্ধা স্বামীজী নিবেদন করেছেন। তাই, এই মহামানবের প্রচারিত ধর্মের প্রতি তাঁর অন্তরের টান থাকাটা স্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য।

এই পৃথবীতে নিজস্ব মহিমার কারণে যে ধর্মগুলি এক উচ্চতর আসন লাভ করেছে তাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম এক এবং অন্যতম। এই ধর্মটি অন্য ধর্মের অধঃপতন সংশোধক রূপে অবতীর্ন হয়েছিল। ব্যাহিক তথাকথিত বিষায়দির প্রতি এই ধর্মের উদাসীনতা রয়েছে। মানবের কল্যাণে ধর্মের বাণীগুলি যেন নিয়োজিত। এই ধর্মের গরিমা জ্ঞাপণে স্বামীজি বলেছেন— "বৌদ্ধ ধর্ম একটি নতুন ধর্ম রূপে স্থাপিত হয় নাই, বরং উহার উৎপত্তি হইয়াছিল সেই সময়কার ধর্মের অবনতির সংশোধক রূপে। বুদ্ধই বোধ করি একমাত্র মহাপুরুষ যিনি নিজের দিকে বিন্দুমাত্র না তাকাইয়া সকল উদ্দম পরহিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মানুষের দুঃখকষ্ট রূপ ভীষণ ব্যক্তির ঔষধ অন্বষণের জন্য তিনি গৃহ এবং জীবনের সকল ভোগ সুখ বর্জন দিয়াছিলেন। সে যুগে পন্ডিত এবং পুরোহিতকূল ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বৃথা তর্ক বিতর্কে ব্যস্ত, বুদ্ধ সেই সময়ে মানুষ যাহা খেয়াল করে না, জীবনের সেই একটি বিপুল বাস্তব সত্য আবিস্কার করেছিলেন— দুঃখ অস্তিত্ব। আমরা অপরকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে চাই এবং আমরা স্বার্থপর বলিয়াই পৃথিবীতে এত অনিষ্ট ঘটে। সে মুর্হূতে জগতের সকলে নিঃস্বার্থ হইতে পারিবে, সেই মুহূর্তে সকল অশুভ তিরোহিত হইবে। সমাজ যতদিন আইন-কানুন এবং সংস্থান মধ্যে অকল্যাণের প্রতিকার করতে সচেষ্ট, ততদিন এই প্রতিকার অসম্ভব। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জগৎ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছে, কোন ফল হয় নাই। হিংসা দ্বারা হিংসা জয় করা যায় না। নিঃস্বার্থপরতা দ্বারাই সকল অশুভ নিবারিত হয়। নতুন নতুন নিয়ম না করিয়া মানুষকে পুরাতন নিয়মগুলি পালন করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর প্রথম প্রচারশীল ধর্ম, তবে অপর কোন ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম শিক্ষা। সাম্প্রদায়িক মানবগোষঠীর পারস্পরিক সংঘর্ষ আনিয়া কল্যান শক্তি হারাইয়া ফেলে"[৫]।

এই ধর্মের উৎস এবং ভাবার্থ নিয়ে স্বামীজী তাঁর প্রদত্ত একটি বক্তৃতায়, এই ধর্ম সম্বন্ধে নব তথ্য প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— "এক এক ধর্মে আমরা এক এক প্রকার সাধনার বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্মে নিষ্কাম কর্মের ভাবটাই বেশী প্রবল। আপনারা বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে ভুল বুঝিবেন না, এদেশে অনেকেই ঐরূপ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, বৌদ্ধধর্ম সনাতনধর্মের সহিত সংযোগহীন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, ইহা আমাদের সনাতন ধর্মেরই সম্প্রদায়বিশেষ। গৌতম নামক মহাপুরুষ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তৎকালিক অবিরত দার্শনিক বিচার, জটিল অনুষ্ঠান পদ্ধতি, বিশেষতঃ জাতিভেদের উপর তিনি অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, 'আমরা এক বিশেষ কুলে জন্মিয়াছি; যাহার এরূপ বংশে জন্মে নাই, তাহাদের

অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ।' ভগবান বুদ্ধ জাতিভেদের এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন। তিনি পুরোহিত-ব্যবসায়ীদের অপকৌশলেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করিলেন, যাহাতে সকাম ভাবের লেশমাত্র ছিল না, আর তিনি দর্শন ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ আলোচনা করিতে চাহিতেন না; ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন"[৬]।

এই ধর্মটি কোন কোন পরিসরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সক্ষম— এই বিষয়ে স্বামীজী খুবই আশাবাদী ছিলেন। এই ধর্মের ভাবার্থের মধ্যে এক সদর্থক অর্থ অন্তর্নিহিত। অশোকের শিলালিপি হতে জানা যায়। বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে এই ধর্ম দেশ-দেশান্তরে প্রসারিত হয়েছিল। বুদ্ধের অনুগামীগণ অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এই ধর্ম প্রচার করে, ভারতবর্ষকে এক মহান তীর্থস্থান রূপে বিশ্ববাসীর কাছে উন্মুক্ত করেছিল। এই ধর্মের মৌলিকতার বিষয়টি স্বামীজীর দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়নি, এই বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করে তিনি বলেছিলেন— "বুদ্ধের প্রত্যেকটি বাণী বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত-গ্রন্থে এবং অরণ্যের মঠসমূহে লুক্কায়িত সত্যগুলিকে যাঁহারা সকলের গোচরীভূত করিতে চাহিয়াছেন, বুদ্ধ সেই সকল সন্ন্যাসীর একজন"[৭]।

'বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই পরিপূরক'-নামক বক্তৃতায় স্বামীজী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্পর্কের গভীরতার মাত্রা নির্দেশ করেছেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকে একে অপরের পরিপূরক রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই দুই ধর্মের মধ্যবর্তী সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছেন— "বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে না, হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাঁচিতে পারে না। —ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শন শাস্ত্রের সাহায্যে না লইয়া বৌদ্ধেরা দাঁড়াইতে পারে না এবং ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দাঁড়াতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই ভারতের অবনতির কারণ"[৮]।

এই ধর্মের প্রভাব ও প্রসারের বিয়যে স্বামীজী এই ধর্মটিকে অভিনবত্ব এবং প্রভুশক্তির অধিকারী হিসাবে এক প্রচারশীল ধর্ম রূপে আখ্যা দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের কথা স্বামীজীর বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে তিনি বলেছেন- "বৌদ্ধধর্ম বৈদিক পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে নব-গঠিত ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ। বৌদ্ধধর্ম হইতে উহার সার গ্রহণ করিয়া লইয়া হিন্দু উহা পরিত্যাগ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সকল আচার্যের প্রচেষ্টা ছিল, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ের মধ্যে মিলন-স্থাপন। শঙ্করাচার্যের উপদেশের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব দেখা যায়। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশ এতদূর বিকৃত করিয়া ছিলেন যে, পরবর্তীকালের কোন কোন সংস্কারক আচার্যের অনুগামিগণকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন— ইহা ঠিকই হইয়াছে"[৯]।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্বন্ধের এই গভীরতা থাকা সত্ত্বেও স্বামীজী স্বীকার করেন যে এই দুটি ধর্মের মধ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে মতবিরোধ বর্তমান। বিভেদের মুখ্য বিষয়টি হল এই যে বৌদ্ধধর্ম জগতের সমস্ত কিছুকে ভ্রম বলে জানতে শেখায়। কিন্তু এই ভ্রমের মধ্যে রয়েছে সত্য হিন্দুধর্ম তার শিক্ষা দেয়। যদিও এর সত্যতা প্রমাণে হিন্দুধর্ম কোন যুক্তি প্রদানে সক্ষম হয়নি। সন্ন্যাস-ধর্মের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনগুলিকে

জীবনে ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু হিন্দুধর্মের অনুশাসনগুলিকে জীবনের যেকোন পরিস্থিতে অনুসরণ করা অসম্ভব নয়। বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসি-সঙেঘর ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু হিন্দুধর্ম সন্ন্যাস-জীবনকে এক উচ্চতর স্থান প্রদান করলেও জীবনের প্রাত্যহিক কর্তব্যপালনকে ঈশ্বর-লাভের প্রধান পথ হিসাবে নির্দেশ করেছে।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের সম্বন্ধই আছে এমন নয় স্বামীজী এই ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের সম্বন্ধের কথাও স্বীকার করেন। বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গে তিনি এই ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ভাবের আদান-প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ্য করে স্বামীজী বলেছেন— "বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম আলাদা নয়। বৌদ্ধধর্ম তার কতগুলি নিয়ে নিজেদের ভেতর ঢুকিয়ে আপনার করে নিয়েছিল। ঐ ধর্মই এখন ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম বলে বিখ্যাত। অহিংসা পরম ধর্মঃ- বৌদ্ধধর্মের এই মত খুব ভালো। তবে অধিকারী বিচার না করে রাজশাসনের দ্বারা ঐ মত জনসাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের মানটি একে বারে মেরে দিয়ে গেছে"[১০]।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মেরও একটা সম্বন্ধ রয়েছে আমেরিকায় এক সভায় প্রদত্ত বক্তব্যে স্বামীজী তা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, এটা সত্য যে খ্রীষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্মের থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে এবং বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টধর্মের আগে এই জগতে অবির্ভূত হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্ম অনেকাংশে বৌদ্ধধর্মের পথ অনুসরণ করেছে। তাই স্বামীজী বলেছেন— "খ্রীষ্টধর্মের উপর ভারত প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যীশুখ্রীষ্টের উপদেশগুলির উৎসমূলের সন্ধান করিলে দেখানো যাইতে পারে যে, উহা বুদ্ধের বাণীর ভিতরেই রহিয়াছে। ... যীশুরজন্ম, গৃহত্যাগান্তে নির্জন বাসঅন্তরঙ্গ-শিষ্যসংখ্যা, এবং নৈতিক শিক্ষাদান, তাঁর আবির্ভাবের বহুশতবৎসর-পূর্বেকার বুদ্ধজীবনের ঘটনারই অনুরূপ। খ্রীষ্টধর্ম যে বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। ভারত-সম্রাট অশোকের সম্প্রতি-আবিষ্কৃত শিলালিপিতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোক ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তিনি গ্রীক-সম্রাটগণের সহিত সন্ধিপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে যে সকল অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রসার লাভ করে, সম্রাট অশোকের প্রেরিত প্রচারকগণ সেই সকল স্থানেই একদা বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাবিস্তার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, -খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ এবং ভারতীয় নীতিতত্ত্ব কি করিয়া প্রবিষ্ট হইল; এবং কেননই-বা আমাদের দেশের দেবমন্দিরের পূজার্চনার সাথে আপনাদের ক্যাথলিকগির্জার মাস (২১) এবং আশীর্বাদ প্রভৃতি ধর্মীয় আচার-আচরণের এতটা সাদৃশ্য দেখা যায়। খ্রীষ্টধর্মের বহুপূর্বে বৌদ্ধধর্মে এই জাতীয় অনুষঠান প্রচলিত ছিল"[১১]।

আবার খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি এবং নীতি ও আদর্শ প্রসঙ্গে স্বামীজী বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা এবং অবদানকে স্বীকার নিয়েছেন। তিনি মনে করেন, খ্রীষ্টধর্মের (ক্যাথলিক সম্প্রদায়) পরিচিতি লাভের এবং প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে কারণ স্বরূপ বৌদ্ধধর্মকেই চিহ্নিত করতে হয়। প্রসঙ্গেক্রমেঃ উল্লেখ্য তিনি বলেছিলেন— "বৌদ্ধধর্মই খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি। ক্যাথলিক সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম হইতেই উদ্ভূত। খ্রীষ্টানদের ব্যপ্টিজম-সংস্কার অন্তঃশুদ্ধিয় প্রতীকরূপে

একটি বাহ্য শুদ্ধির ব্যাপার। বৌদ্ধধর্ম থেকেই এর উৎপত্তি। (Inspired Talks-আমেরিকা) এই যে খ্রীষ্টনীতি খ্রীষ্টধর্মের (প্রচার ও প্রসার) এই যে ক্যাথলিক চার্চ এ-সবই বৌদ্ধধর্ম থেকে নেওয়া। কিভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল একফোঁটা রক্তপাত না করে”[১২]।

বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা করেই স্বামীজী ক্ষান্ত হননি সেই সঙ্গে এই ধর্মের বিকৃত রূপের প্রতিও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর ‘আমার সমরনীতি’ নামক বক্তৃতায় স্বামীজী এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন— “আজকাল এদেশে বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্মও তার অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা এসব আলোচনা করেন, তাঁরা বোধ হয় স্বপ্নেও ভেবে দেখেন না, যে অধঃপতনের মধ্যে আমরা এখন রয়েছি তা বৌদ্ধধর্মের অবদান। বৌদ্ধধর্ম থেকে এই উওরাধিকারই আমরা পেয়েছি। বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস কখনো অনুশীলন করেননি এমন ব্যক্তিদের লেখা বইতেই তোমরা পড়ে থাকো। বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের মূলে রয়েছে গৌতম বুদ্ধের অপূর্ব চরিত্র এবং অপূর্ব ধর্মনীতি। প্রভু বুদ্ধ সম্বন্ধে আমার সর্বপ্রকার ভক্তিশ্রদ্ধা রয়েছে, কিন্তু আমার এই কথা খেয়াল করো বৌদ্ধধর্মের বিস্তার সেই মহান আচার্যের চরিত্র ও ধর্মনীতির জন্য ততটা হয়নি যতখানি হয়েছে, বৌদ্ধদের দ্বারা নির্মিত মন্দির, তাতে স্থাপিত মূর্তি ও অঙ্গাঙ্গি আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের জন্য। জাতির সামনে শেষোক্ত জিনিসগুলিই এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওদের দরুন বৌদ্ধধর্মের বিস্তার। ঐসব আড়ম্বর বহুল অনুষ্ঠান এবং মন্দিরগুলি ঐশ্বর্য সম্ভারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পূর্বেকার গৃহরক্ষিত ক্ষুদ্রহোম কুন্ড ও তাতে আহুতি ব্যাপার টিকতেই পারিনি। কিন্তু ক্রমে ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠাগুলিতে বিকার এসে যায়, তা এমন নোংরা জঞ্জাল হয়ে দাঁড়ায় যে, তার বিষয়ে সভাস্থলে দাড়িয়ে কিছু বলতে আমি অসমর্থ। যাঁরা এসব বিষয়ে কিছু জানতে চান, তাঁরা যেন দক্ষিন ভারতের ভাস্কর্যপূর্ণ বৃহৎ মন্দিরগুলি দেখে নেন। বৌদ্ধদের কাছে, এই তো আমাদের উত্তরাধিকার”[১৩]।

স্বামীজীর মতে, জীবে দয়ার প্রচার, সমুচ্চ নীতিধর্মের উচ্চারণ এবং নিত্য আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে চুল চেরা বিস্তার সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের মূলরূপটি অক্ষত থাকেনি। তাছাড়া এই ধর্মের বিস্তারের স্বার্থে নির্মিত মন্দিরে স্থাপিত মূর্তি ও আনুসঙ্গিক রীতিনীতি গুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এগুলির বিকৃত পরিনতি এই ধর্মকে অবনতির দিকে ঠেলে দেয়। এই ধর্মের সম্ভ্রমপূর্ণ মানষিকতার প্রতি স্বামীজী অবগত থাকলেও এই ধর্মের যে একটা অসম্পূর্ণতা রয়েছে সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। মিঃ লুইস জেনসকে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠির মধ্যে তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর রচিত ‘পরিব্রাজক’ এবং ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ প্রভৃতি গ্রন্থেও তিনি এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

তবে, একথা সত্য যে, স্বামীজীর জীবনে এই ধর্মের অপরিসীম ভূমিকা আছে। তাঁর বাস্তবিক জীবনে, ধর্মচিন্তায় এবং সর্বপরি তাঁর বিশ্বমৈত্রীর চেতনায় এই ধর্মের অপরিমেয় অবদান অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। আবার এই ধর্মের সাম্যের ভাবনা,

মানবপ্রেম ও সেবামূলক নীতিগুলি প্রভৃতি মহৎ বিষয়গুলি স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি এই ধর্মের সদর্থক দিকের পরিচয় দিতে গিয়ে ধর্মের গঠনমূলক রূপের উল্লেখ্য করেছেন। যে রূপটি মানবের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন— "বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে প্রথম মূক ইতর প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি ঘোষণা করে এবং মানুষে-মানুষে বিভেদ-সৃষ্টিকারী আভিজাত্য-প্রথাকে ভাঙ্গিয়া দেয়"[১৪]। এবিষয়ে তাঁর অন্য একটি উক্তি এখানে প্রাসঙ্গিক উক্তিটি হল— "বৌদ্ধধর্মের সেই সমাজসংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি অপূর্ব সহানুভূতি ও দয়া, সর্বসাধারণের মধ্যে এক অদ্ভুত উন্মাদনার ভাব বহাইয়া দিয়াছিল; যাহার ফলে ভারতীয় সমাজ এতদূর উন্নত ও মহান হইয়া উঠিয়াছিল যে, তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিক (মেগাস্থিনিস) বলিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন-কোনো হিন্দু মিথ্যা বলে, বা কোনো হিন্দুনারী অসতী-এ কথা শোনা যায় না"[১৫]।

তথ্যসূত্র :

আমেরিকা বক্তৃতা-১৮৯৪আমেরিকা বক্তৃতা-১৮৯৫আমেরিকা বক্তৃতা-১৮৯৩।

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দশম খন্ড, পৃ. ২২৭।

২। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২৪৮।

৩। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, অষ্টম খন্ড, পৃ. ২১০।

৪। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, অষ্টম খন্ড, পৃ. ২০৩।

৫। ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর বাণী, স্বামী বিবেকান্দ, পৃ. ৫৪।

৬। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ড্রেট্রয়েটে প্রদত্ত বক্তৃতা আমেরিকা বক্তৃতা-১৮৯৫।

৭। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দশম খন্ড, পৃ. ১০৬।

৮। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ভূমিকা, ১/৩২।

৯। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দশম খন্ড, পৃ. ২০৯।

১০। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খন্ড, পৃ. ১৫১।

১১। আমেরিকা বক্তৃতা-১৮৯৫।

১২। আমেরিকা বক্তৃতা-১৮৯৪।

১৩। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শঙ্করী প্রসাদ বসু, চতুর্থ খন্ড, পৃ. ২৫০।

১৪। আমেরিকা বক্তৃতা-১৮৯৫।

১৫। আমেরিকা বক্তৃতা-১৮৯৩।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বহুমুখী জীবনবোধ

ড. নির্মল কুমার বর্মন

সারসংক্ষেপ

অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কথাসাহিক্যিক কিশোর সাহিত্যিক, নাট্যকার, সমালোচক ও সাংবাদিক হিসাবে বিশাল খ্যাতি অর্জন করেছেন। যৌবনে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। নিজস্ব ধর্ম ও সাম্যবাদ ভাবধারায় আপ্লুত ছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ, পটভূমি ও মানব সভ্যতার ঐতিহ্য আমরা পেয়ে থাকি, 'উপনিবেশ' উপন্যাসে তেঁতুলিয়া নদীর অগ্রভাগে জেগে ওঠা চর ইসমাইলে নানাজাতি, বিচিত্র মানুষের ভিড়, তাদের হাতে নির্মিত সমাজ ও পৃথিবীর প্রসারণ মুলসুর। সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী উপন্যাসে কামার সম্প্রদায়ের চলচ্চিত্র সুবিদিত। লালমাটি আহীর ও জেলে সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র চিত্রায়িত। 'মহানন্দা' উপন্যাসে হিমালয়ের বুক থেকে প্রবাহিত নদীর 'মহানন্দা' নাম গ্রহনের পর তীরে জনপদের বসতি স্থাপন এই উপন্যাসের মুল থিম। মন্ত্রমুখর উপন্যাসে আগষ্ট আন্দোলন, মহকুমা শহর নিশ্চিন্ত নগরকে কেন্দ্র করে তৎকালীন বিপ্লব, রাজনীতি, উত্তাল জনগারণের প্রেক্ষিত প্রকাশিত। 'ট্রফি' ও 'আসিধারা' উপন্যাসে মানব জীবনের জটিল ও বিড়ম্বিত জীবনচিত্র প্রতিফলিত।

সূচক শব্দ

ছন্দনাম, নৈরাজ্যবাদ, প্রতিচ্ছবি, আবিষ্কার, কুট, বরেন্দ্রভূমি, সংগ্রাম, পঞ্চরাস্থি, রামকেলি, প্রেমতৃষ্ণা, কাব্যচর্চা, স্বরভঙ্গ , ছিন্নমস্তা,

প্রতিবাদ্য বিষয়

১৯১৮ সালে তারশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের অসাধারন যোগ্য উত্তরসূরি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পৃথিবীর আলো দেখেছি লেন। বর্তমান ২০১৮ সাল। স্বভাবতই শতবর্ষ। তারই প্রেক্ষিত নারায়ণ আলোতে স্মৃতি রোমন্থন মাত্র।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কথা সাহিত্যিক, কিশোর সাহিত্যিক, নাট্যকার, সমালোচক, সাংবাদিক ও অধ্যাপক হিসেবে বিশাল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রতিনিয়ত লিখতেন। 'দেশ' পত্রিকাতে 'সুনন্দ' ছদ্মনামেও বহু লিখেছেন। প্রকৃত নাম তারকনাথ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তরুণ বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেছেন এবং পরাধীন ভারতের দুর্বিসহ যন্ত্রনা আত্মিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। সমাজ সচেতন শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সাম্যবাদী ভাবধারায় আপ্লুত ছিলেন।নিজস্ব দর্শন ও মতবাদ সম্বন্ধে তিনিনিজেই মন্তব্য করেছেন –

''যে কোনো রাজনীতিক মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রয়োগফল এবং দেশের প্রসঙ্গে তার শুভাশুভের প্রেক্ষিতেই মাত্র তাকে গ্রহণ বা বর্জন করবো। মানুষের জন্যই রাজনীতি, রাজনীতির জন্য মানুষ নয়। যেখানে দেখবো দেশের কল্যান, দেখবো শুভচেতনা তাকে সানন্দে স্বীকার করবো। নিছক মতবাদের রুদ্ধ প্রাচীরে শিল্প ব্যক্তিত্বকে আমি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নই।''

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে নকশালবাড়ি আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা, পুঁজিবাদী শক্তির করাল গ্রাস, নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি তাঁর সাহিত্যে বলিষ্ঠভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর সাহিত্যে সময়ের শোণিত স্রোত, সময়ের প্রসার ও মতবাদ, মতবাদের ভ্রষ্টতা, মানুষের যন্ত্রনা ও ক্রন্দনের প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। নারায় গঙ্গোপাধ্যায 'উপনিবেশ' উপন্যাসটি স্পষ্ট বলেছেন –

''উপন্যাসে লেখার কথা সেই দিনই আমার মনে এসেছিল –

যেদিন প্রথম অনুভব করেছিলাম পৃথিবীঠা অনেক বড়ো। ......প্রকৃতি আমার মন ভুলিয়ে ছিল চোখ মেলার সাথে সাথেই। ....আমার মন দিয়ে প্রকৃতিকে আমি দেখিনি। প্রকৃতিই আমার মননকে গড়েছে।''

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ, পটভূমি ও বিষয়বস্তুর বিশালতা লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে মানব সভ্যতার ঐতিহ্য পরম্পরার নিদর্শন আমরা জানতে পারি। বিশেষকরে সুন্দরবন সংলগ্ন মানব সভ্যতার বিস্তার, সামগ্রিক মূল্যায়ণ ও বৈচিত্র্য এই উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে। তেঁতুলিয়া নদীর অগ্রভাগে জেগে ওঠা চার ইসমাইলে নানাজাতি, বিচিত্র মানুষের ভিড়, তাদের তৈরী সমাজ ও পৃথিবী প্রসারিত হচ্ছে, সেই গোষ্ঠী জীবনের প্রসারে মানবতার বিচিত্র বাস্তব রূপায়ন প্রতিফলিত। বাংলা সাহিত্যের গবেষক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য -

''এই উপন্যাসে ত্রয়ীতে তিনি বাঙালীর রক্তে আদিম বন্য

প্রাণোচ্ছলতার দুর্বার আবেগটি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।''

উপন্যাসের প্রথম খন্ডে - চর ইসমাইলের সৃষ্টি হওয়া উপনিবেশ। ২য় খন্ডে - প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক পরিবেশে গঞ্জালেস, লিসি, ডিসুজা, জোহাণ, বলরাম, কবিরাজ প্রমুখ জনপদ গড়ে ওঠা। তৃতীয় খন্ডে - দশ বছর পরের ঘটনার মধ্যে চর জীবনের বিস্তার, বিপর্যয়, অর্থনৈতিক সংকট, চোরাকারবারিদের বন্য পশু হত্যা, মহাজন ও আড়তদারদের কুট চক্তান্ত, কৃষকদের শোষণ, কৃষক আন্দোলন, বিক্ষোভের বাস্ত জ্বলন্তচিত্র প্রতিফলিত। তাই প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন –

''উপনিবেশের মদির বিহ্বল, স্বপ্ন উদভ্রান্ত চক্ষে এক সুনিশ্চিত প্রৌঢ় বাস্তবতার শান্ত বিষন্ন স্বীকৃতি স্থিরদীপ্তির প্রদীপ জ্বালাইয়াছে।''

'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসে রূপাপুরের কামারগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার চিত্রকলা চিত্রিত হয়েছে। 'লালমাটি' লেখক অন্যতম উপন্যাস। এই উপন্যাসে আহীর ও জেলে সম্প্রদায়ের

জীবনচিত্র চিত্রায়িত। বরেন্দ্রভূমির লালমাটি তথা বাংলার প্রাচীনতম মাটি। লালমাটির মানুষদের সংগ্রাম, কীর্তি, প্রতিষ্ঠা ও পতনের ইতিহাস নিষ্ঠার সহিত আলোচিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন –

''লালমাটি শুধু তো মৃত কালের একটি স্তব্ধ সমুদ্রই নয়।
বরিন্দের মাঠে শুধুই তো আকীর্ন নেই মৃত সংস্কৃতির পঞ্জরাস্থি।''

'মহানন্দা' উপন্যাসের থিম ইতিহাস, হিমালয়ের বুক থেকে প্রবাহিত নদীর 'মহানন্দা' নাম গ্রহনের পর তীরে জনপদের বসতি স্থাপন এই উপন্যাসের পটভূমি। এই উপন্যাসে চমৎকার ব্যঞ্জনার স্বরূপ প্রতিফলিত। দৃষ্টান্ত উপন্যাস থেকেই সংগৃহীত –

''মহাপ্রভুর সেই পদচিহ্ন বহন করেছে এই জেলা, রামকেলি, গৌড়, সাদুল্লাপুরের ঘাট, রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীর চেনা। এখানকার প্রতিটি জলবিন্দুতে, এখানকার মাটির প্রত্যেকটি পরমাণুতে হরিপ্রেমের অমৃত মিশে আছে।''

'মন্ত্রমুখর' উপন্যাসটির পটভূমি আগষ্ট আন্দোলন। মহকুমা শহর নিশিন্ত নগরকে কেন্দ্র করে তৎকালীন বিপ্লব, রাজনীতি, উত্তাল জনজাগরণের স্বরূপ চিত্রিত। সমকালীন রাজনীতি মূল ভিত্তিভূমি সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শহুরে মধ্যবিত্ত ছেলে মেয়েদের রাজনৈতিক বিপ্লববাদ লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন। উপন্যাসে ব্রজেন, পূরবী, প্রমোদদের মত যুবক যুবতীরা বিপ্লববাদের চিন্তায় মশগুল। আগামীদিনে স্বাধীন ভারত গড়ার সত্য, শপথও শান্তির ললিতবানী উচ্চারিত হয়েছে –

''বাঁধ যখন ভেঙেছে তখন তাকে ঠেকাবার সাধ্য আর কারোনাই।''

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম বহু আলোচিত উপন্যাস 'স্বর্ণসীতা' সাঁওতালদের নিয়ে দেশসেবামূলক জীবন গড়ার অনুপম প্রয়াস রয়েছে, উপন্যাসের নায়িকা অনুপমা কিন্তু প্রেমের উন্মোষে নায়কের সঙ্গী না হয়ে নায়ককে প্রত্যাঘাত করেছে।

'ট্রফি' উপন্যাসে বিক্রমজিতের বিচিত্র ও বিড়ম্বিত জীবনচিত্র প্রকাশিত। অবাঙালি হয়েও বিক্রমের বাঙালি হওয়ার সাধনা, কাব্যচর্চা, প্রেমতৃষ্ণা, বাঙালির মনিকোঠায় প্রবেশের অসার্থক প্রচেষ্টা। সবশেষে কলেজের সহপাঠী মণিকা সেন তার জীবনের শেষ আশ্রয়। 'কৃষ্ণপক্ষ' উপন্যাসে শিল্পী জীবনের আবেগ, আকৃতি, উদার মানসিকতা, শিল্প সাধনার স্তর সফলতার উত্তরণে বাধা বিঘ্ন সমন্বিত ছাপ ও ছক প্রতিফলিত। উপন্যাসটি বাস্তব জীবন বোধের রেখাচিত্র, 'বিদূষক' উপন্যাস জীবন যাত্রার সূক্ষ বিবর্তন ও পরিণতির ছাপ রয়েছে। এক করূপ, বিকৃতদেহ বালকের দৈহিক জ্বালাযন্ত্রনা কীভাবে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার হাসিক সৃষ্টি করতো এবং সেই সাথে হাসি কিভাবে সার্কাস দলের ম্যানেজারের দৃষ্টি নিবন্ধ করল তার ভরপুর কাহিনি উপন্যাসে প্রতিফলিত। পকেটমার দলে থাকা সত্ত্বেও একটি যুবক সম্পূর্ণ নিজস্ব করিশ্মায় নিজের জীবনকে গড়ে। পদ্মা ও রাধা দুজনেই সার্কাস কন্যার আকর্ষণ ও বিকর্ষণে এক সার্কাস ভাঁড়ের জীবনের সকরুণ পরিণতি ঘটেছিল, তারই সফল বাস্তবায়ণ এই উপন্যাসে রয়েছে। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত শহুরের মানসিকতার স্বরূপ, প্রেম ও যৌণ জটিলতার বাস্তব রূপ উপহার দিয়েছেন।

'অসিধারা' উপন্যাসে রয়েছে মানব জীবনের চর্তুদিকের পরিবেশের জটিল জীবনযাত্রার মূল্যায়ণ। অসিধারা মূলত একটি প্রাচীন ব্রত। এই ব্রত যদি কোন দম্পতি পালণ করেণ তাহলে তাদের সংযত জীবন যাপণ করতে হয়। গান পাগল সুপ্রিয়ার জীবনে বহু পুরুষ এলেও গলার রোগ স্বরভঙ্গ হলে তার সেই ঘোর দুর্দিনে পাশে ছিল অতীশ। সুপ্রিয়ার প্রধান শর্ত ছিল নতুন কোন সাধনায় সিদ্ধি লাভের প্রত্যাশায় পরিপূর্ণতা লাভ না ঘটলে তাদের মিলন সম্ভবপর নয়। শর্ত পরিপূর্ণ করার জন্য অতীশ স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে অসিধারা ব্রত গ্রহণ করেছিল, চেয়েছিল নবজীবন।

'পদসঞ্চার' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের পদধ্বনি উপলব্ধি করেছেন। ডিমেলো ঐতিহাসিক চরিত্র। ডিমেলোর চট্টগ্রামে আগমন, মামুদ শাহের ক্রোধে বন্দীজীবন, পর্তুগীজদের সহিত সন্ধিস্থাপন, বাংলাদেশের পর্তুগীজদের স্থায়ীভাবে বাণিজ্যে অধিকার লাভ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা স্থান লাভ করেছে আলোচ্য উপন্যাসে। তারপর হোসেন শাহ থেকে মামুদ শাহ পর্যন্ত নবাবিরা ইতিহাস, সাসারামের বাঘ শেরশাহের ক্ষমতাবৃদ্ধি। চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খানের বিশ্বাসঘাতকত ইত্যাদি দৃঢ়তার সহিত আলোচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সাথে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঘটনা যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচর ও প্রতিষ্ঠা, চৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থান ও তিরোধান, রায় রামানন্দের পদরচনা, দেবদাসীর নাচগান ইত্যাদি ঘটনা উপন্যাসের সামাজিক মর্যাদাকে দুদৃঢ় করেছে।

'অমাবস্যার গান' উপন্যাসটিও ইতিহাসভিত্তিক, তবে উপনিবেশ বা 'পদসঞ্চার' এর মতো এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য তত গভীর নয়, রাজনৈতিক প্রাধান্য আরোপিত।

ফরাসী উপন্যাসের আঙ্গিকের বদান্যতায় সমকালীন নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অন্তমুর্খিতা ইত্যাদি বিষয়ে ঔপন্যাসিক যে উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত - 'নির্জন শিখর', 'তৃতীয় নয়ন', 'কাচের দরজা', 'মোহনার নৌকো', 'হাঁসের আকাশ' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত। ব্যক্তির পরাজয়ের বেদনা ও অসহায়তা রূপলাভ করেছে 'সন্ধ্যার সুর' উপন্যাসে। 'কাচের দরজা'তে মূল্যবোধহীনতার মধ্যে লেখক জীবনযন্ত্রনার মানে খুঁজতে চেয়েছেন। সাহিত্য, রাজনীতি ও মূল্যবোধ নিয়ে রচিত সাগরিক উপন্যাসটি। উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে –

''সাহিত্যিক তো চিরকাল সাধনা করে এসেছে মানুষ আর জীবনের জন্যেই। মানুষের কল্যাণচেতনার ওপর আমাদের সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিত্বের মুক্তি সামাজিক বন্ধন মোচন।''

ঔপন্যাসিক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে কাদের কথা লিখবেন তাও তিনি পরিস্কার ভাবে জানিয়েছেন –

''আমি বাঙালি আর ভারতবাসীর কথা লিখবো- লিখবো তাদের দুঃখের কাহিনী বেদনার রূপ, সংগ্রাম ইতিহাস।''

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন –

''মানুষ যেমন ইতিহাস গড়ে, তেমনি ইতিহাসও মানুষ গড়ে।''

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যক্তি জীবনে সক্রিয় রাজনীতি না করলেও রাজনীতিতে বিশ্বাস

করতেন - কারণ মানুষকে ভালোবাসার জন্য। তাই ১৯৬৭-৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের টালমাটাল অবস্থাকে দৃঢ়ভাবে উদার কন্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রাজনীতির ভয়ংকর ছিন্নমস্তা রূপ। সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুব, মধ্যবিত্তদের দুরবস্থা মোচনে রাজনীতির অবক্ষয় দেখে সোচ্চার হয়েছেন ঔপন্যাসিক । কোনদিনই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। অসহনশীলতা কে সহ্য করতে পারেননি যা আজও শতবর্ষের আলোকে প্রাসঙ্গিক।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির তালিকা নিম্নরূপ ঃ –

'উপনিবেশ' (তিনপর্ব) ১৯৪৪, 'তিমিরতীর্থ' ১৯৪৪, 'মন্দ্রমুখর' ১৯৪৫, 'স্বর্ণসীতা' ১৯৪৬, 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' ১৩৫১, 'সূর্যসারথি' ১৯৪৮, 'বৈতালিক' ১৯৪৮, 'ট্রফি' ১৯৪৯, 'বিদিশা' ১৯৪৯, 'শিলালিপি' ১৯৪৯, 'পদসঞ্চার' ১৯৪৯, 'লালমাটি' ১৯৫১, 'মহানন্দা' ১৯৫১, 'কৃষ্ণপক্ষ' ১৯৫১, 'অসিধারা' ১৯৫৭, 'মেঘরাগ' ১৯৫৯, 'বিদূষক' ১৯৫৯, 'নিশিযাপন' ১৯৬০, 'ভস্মপুতুল' ১৯৬২, 'অমাবস্যার গান' ১৯৬৫, 'সন্ধ্যার সুর' ১৯৬৬, 'পাতাল কন্যা' ১৯৬৬, 'নির্জন শিখর' ১৯৬৮, 'তৃতীয়নয়ণ' ১৯৬৯, 'কাচের দরজা' ১৯৭০, 'অলোকপর্ণা' ১৯৭০ প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র:

১. দেশ-হর্ষ দত্ত।
২. শনিবারের চিঠি-সজনীকান্ত দাশ।
৩. উপনিবেশ -নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. দেবেশ কুমার আচার্য।

প্রসঙ্গ : আঞ্চলিক কবিতা

ড. পরিতোষ মাহাত

মানুষের ভাষা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ও যোগাযোগের উপায় বা মাধ্যম। সভ্যতার শুরুতে ভাষাহীন মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছিল কতকগুলি 'মৌখিক শব্দ'। পরবর্তীকালে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা পরিণত হয় 'ভাষা'য়। ধীরে ধীরে সেইসব ভাষাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষাবিজ্ঞান।[১]

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে ভাষার মূলত দুটি রূপঃ একটি মৌখিক বা কথ্য অর্থাৎ মুখের ভাষা, অন্যটি লিখিত অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষা। মানুষের মননশীলতার প্রকাশ এই ভাষাকে আশ্রয় করেই। বলাবাহুল্য, ভাষার মৌখিক প্রকাশের বিষয়টিই প্রাচীনতম। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদেরও সর্বাধিক আকর্ষণ ও কৌতূহল এই শাখাটিকে নিয়েই। ভাষার লিখিত রূপের নিদর্শন যে কোন ভাষার ক্ষেত্রেই তুলনায় অর্বাচীন কালের ব্যাপার। তবু ভাষায় লিখিত রূপের ক্ষেত্রে মৌখিক রূপে কোনটিকে কতটুকু আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হবে সে ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক বাদ-প্রতিবাদ চলে এসেছে। যাইহোক, মৌখিক কথ্য বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপ অর্থাৎ উপভাষাকে অবলম্বন করেও যে কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তাকেই আমরা আঞ্চলিক কবিতা হিসেবে সুচিহ্নিত করেছি।

ভাষার সঙ্গে কবিদের চিন্তা-চেতনা, মনন, আঙ্গিক ও শৈলীভাবনা, এবং অভিজ্ঞতা ও দর্শনের বিন্যাস আঞ্চলিক কবিতাকে অগ্নিময় সম্ভাবনায় পৌঁছে দিয়েছে। বাংলার পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় আঞ্চলিক কবিতার সমধিক চর্চা হয়ে থাকে। আঞ্চলিক কবিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে সুস্নাত জানা বলেছেন যে, আঞ্চলিক কবিতায় কোন বিশেষ অঞ্চলের বাকরীতি, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সেই অঞ্চলের সামগ্রিক রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে।[২] আমরা বলতে পারি যে, আদর্শভাষার বাইরে গিয়ে, স্থানিক উচ্চারণ প্রবণতাকে মান্যতা দিয়ে যে কবিতা রচিত হয় তাকেই আঞ্চলিক কবিতা হিসেবে ধরা হয়। কোনো অঞ্চলের স্থানিক ভাষা-ভঙ্গি এং শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং ভাব-অনুষঙ্গ আহরণ করে এ জাতীয় কবিতা রচনা করা হয়ে থাকে।

আঞ্চলিক কবিতার বৈশিষ্ট্য –

১. কোন এক বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনের সামগ্রিকতার রূপায়ণ;

২. আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ;

৩. প্রবাদ-প্রবচনের সুললিত ব্যবহার;

৪. আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন;

৫. শৈলীতে লোকাভরণ অনিবার্য;

৬. অঞ্চলগত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি।

আঞ্চলিক কবিতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন যে, 'বাংলাভাষাকে আরও বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে আঞ্চলিক ভাষাকে কাব্যে সাহিত্যে করার কথা বহু ভাষাবিদ ও পণ্ডিত গবেষকগণ বলে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জসিমুদ্দিন, বন্দে আলি মিঞা, নজরুল এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কোনো কোনো কবিতায় আঞ্চলিক ভাষার শব্দ প্রয়ো করে কবিতাকে হৃদয়গ্রাহী ও রসোত্তীর্ণ করে তুলেছিলেন। তাতে ওইসব কবিতার কোনো সৌন্দর্যহানি তো ঘটেই নি পরন্তু শব্দসম্ভার, প্রবাদ প্রবচন লোকগীতি ইত্যাদি থেকে মণিমুক্তা আহরণ করে বাংলাভাষার সাহিত্যকে আরো পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তোলার দায়িত্ব তো কবি সাহিত্যিকদেরই। গ্রামে গঞ্জে প্রত্যন্ত পল্লীতে এখনও লোকউৎসব, লোকনৃত্য, ব্রত, পাঁালি আছে - আছে টুসু ভাদু ঘেঁটু করম ঝুমুর বাঁদনা প্রভৃতি লোকগানের মহড়া। ওইসব লোকসাহিত্য থেকে শব্দ নিয়ে পুরানো ঐতিহ্যকে নতুন সংস্কৃতির আলোকে রূপান্তরিত ও উজ্জ্বল করে তোলাই হচ্ছে আঞ্চলিক কবিতার বৈশিষ্ট্য।[৩] তরুণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, –

''আঞ্চলিক ভাষার কবিতার মূল লক্ষ্য গ্রামীণ বা প্রান্তিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা ব্যক্ত করা। সেইসঙ্গে দেশকালের বিপর্যয়, অনিয়ম, অনাচার ও ভ্রষ্টাচারকে তাঁরা ব্যঙ্গবিদ্ধ করেন। এক্ষেত্রে সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি - তিন-ই তাঁদের কবিতার উপাদান। প্রতিবাদের ভাষ্য রচনা করলেও আঞ্চলিক কবিরা দীনহীন জীবনের যে পাঁচালি রচনাকরেন, তার বাস্তবতা ও মূল্য অনেকখানি। আমরা যারা শহুরে মানুষ কিংবা উঁচু তলার মানুষ, নিচুতলার খোঁজ রাখি না। তাদের হাসি কান্নার এমন বিশ্বস্ত দলিল অন্য কোনো কবিতায় সুলভ নয়; বিশ্বাস্য নয়। বানানো জীবনকথা ও দরদের প্রান্তিক মানুষ বিশ্বাস করে না।''[৪]

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা রচনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য অধিকসংখ্যক আঞ্চলিক মানুষের কাছে পৌঁছানো। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত নাগরিক পাঠকের বৃত্তকে ভেঙে পাঠক সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা। এরই অন্যতম কারণ কবিতায় আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার এবং আঞ্চলিক বা প্রান্তিক মানুষের বক্তব্যকে তাদেরই মুখপত্র স্বরূপ কবির ব-কলমে উপস্থাপন। তাই নাগরিক, মর্জিত কবিতায় যেখানে কবির বক্তব্যের প্রাধান্য, আঞ্চলিক কবিতায় প্রান্তিক মানুষের দুঃসহ অবস্থা, অবর্ণনীয় দারিদ্র, অসহনীয় অপমান, অন্তহীন ক্লেশের বিবরণ। আঞ্চলিক কবিতার cotext শ্রোতা বা উপজীব্য মানুষের দ্বারাই বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত।[৫] আঞ্চলিক কবিতা উচ্চধারার সাহিত্যের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে লৌকিক জীবনবোধের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। প্রচলিত মূলধারার সাহিত্যের কৃত্রিম জীবনচর্চার সঙ্গে আঞ্চলিক কবিতার মৌলিক পার্থক্য জীবযাপনের স্বাভাবিকতায়। এই কবিতার কবিরা সাধারণত সমাজের ব্রাত্য পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। একদিকে তাঁদের যেমন থাকে আর্থ-সামাজিক চেতনা, তেমনি অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবে অধিকারবোধও থাকে। আঞ্চলিক কবিতায় আঞ্চলিক বাচনভঙ্গি, আঞ্চলিক শব্দভাণ্ডার এবং শব্দবিন্যাস, প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারাকে মান্যতা দেওয়া

হয়ে থাকে।

বাংলা আঞ্চলিক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে অনেক কবির অবদান রয়েছে। কালিদাস ভদ্র বাংলা সাহিত্যের সূচনা লগ্ন থেকেই আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত করতে গিয়ে লিখেছেন-

''ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে বহুকাল আগেই ভাষায় কবিতা চর্চার শুরু। বাংলা ভাষার আদি পর্যায়ে দৃষ্টান্ত 'চর্যাগীতি' নিশ্চিতভাবে কোনো উপভাষার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। চর্যাপদের পর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কাব্যভাষাকেও আঞ্চলিক বলা হয়ে থাকে। সীমান্ত রাঢ়ী বা ঝাড়খণ্ড, মেদিনীপুর অঞ্চলের বাংলা ভাষ্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে আঞ্চলিক তাৎপর্য দিয়েছে। ময়মনসিংহ গীতিকার মধ্যেও আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়।''[৬]

অধ্যাপক দেবব্রত সিংহ আঞ্চলিক কবিতার প্রথম রূপকার হিসেবে আধুনিক কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিহ্নিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন —

''বাংলা কথাসাহিত্যে শৈলজানন্দ ও তারাশঙ্করের হাত ধরে উঠে এল নিম্নবর্গের ব্রাত্য মানুষদের কথা। তারাশংকর তাঁর 'কবি' উপন্যাসে নিতাই কবিয়াল রূপী সতীশ ডোমকে সশরীরে হাজির করলেন আমাদের সামনে। নিতাইয়ের মুখে উচ্চারিত হল সেই বিখ্যাত গান, 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ ক্যান।' এই লোকায়ত গানের মধ্য দিয়ে সূচনা হল বাংলা লোককবিতার এক নতুন যুগের। একালের বাংলা লোককবিতার প্রথম রূপকার তারাশংকর (১৮৯৮-১৯৭১)। 'হাঁসুলি-বাঁকের উপকথা'য় সৃজন করলেন ডোম, কাহার, বাগদি প্রমুখ অচ্ছুত মানুষগুলির অকৃত্রিম লোকজীবনের কথকতা। মহানগরী পণ্ডিত সমালোচকরা কাল বিলম্ব না করে তাঁকে 'একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী আঞ্চলিক কথাসাহিত্যিক' এই অভিধায় ভূষিত করলেন।''[৭]

গবেষক ড. উৎপলকুমার মণ্ডল তাঁর গবেষণা পত্রে লিখেছেন যে, দেশে বিদেশে দীর্ঘ সময় ধরে কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধের বেড়াজাল কাব্য জগতকে সংকীর্ণ করে রেখেছিল। কবিতাকে মনে করা হত স্বর্গীয় বা মহার্ঘ্য একটি বিষয়। কবিরা বিশেষ দৈবী-প্রতিভাসম্পন্ন সত্তা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যে কারণে কবিতার রসাস্বাদনে বা কবিতার চর্চায় সাধারণ মানুষেরা কোনো প্রকার অধিকার ছিল না। সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষ সাধারণত যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখতেন, তারাই পেতেন মূলধারার কবিতা চর্চার অধিকার। আর এর বাইরের বিশাল সংখ্যক জনসমষ্টির সাহিত্য বা সংস্কৃতিচর্চার অধিকার ছিল নিজের অঞ্চলে লোকসংস্কৃতিতে।

তিনি আরো বলেছেন যে, মূল ধারার সাহিত্যের অধিকারহীন মানুষগুলির দ্বারা চর্চিত এবং লালিত সাহিত্য শিল্পই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে একটি জাতির বা একটি সভ্যতার মৌলিকতার পরিচয়। মূল ধারার সাহিত্যের কৃত্রিম ভাবনাধারা, মৌলবাদী রক্ষণশীলতা, বিবর্তিত সমাজজীবনের যথাযথ চিহ্নগুলিকে, প্রবণতাগুলিকে ধরতে পারে না বলেই, উপযোগিতার প্রেক্ষিতেই একদিন সে চলে যায় পেছনের সারিতে। অন্যদিকে সজীব লৌকিক জীবনভাবনার মধ্যে যেহেতু একটি দেশ বা জাতির মৌল-প্রবণতা তথা অস্তিত্বের সঠিক উপাদানগুলির সন্ধান

পাওয়া যায়, তাই ক্রমশ সেগুলিই সাহিত্যের প্রাণভমরা হয়ে উঠে, এমনকি ইতিহাসেরও জরুরি উপাদানে পরিণত হয়।[৪]

আঞ্চলিক কবিতা আন্দোলনের মূল প্রবণতা হল এ পর্যন্ত চলে আসা অলঙ্কারশাস্ত্রের বা নন্দনতত্ত্বের অনুগামিতা ছেড়ে একদমই লৌকিক বা ব্যক্তিগত উপলব্ধিজাত ভাবনার দ্বারা কবিতার দর্শন তৈরি করা। আধুনিক কবিতা আন্দোলন দেবকল্প, অলৌকিক জীবনভাবনার বিরুদ্ধে গিয়ে বাস্তবানুগ কাব্যভাষা তৈরিতে সচেষ্ট হয়েছিল। আঞ্চলিক কবিতার ক্ষেত্রে একথা আরো বেশী করে প্রযোজ্য। আঞ্চলিক কবিদের এই কাজে অন্যতম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে তাঁদের লৌকিক জীবন ও লোকসংস্কৃতি সঞ্জাত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা। মূলধারার কাব্য-সাহিত্যের জগতে যে কেন্দ্রীয়-প্রবণতা সক্রিয় ছিল, তার থেকে নবতর দিগন্তে উত্তরণের আকাঙ্খা কবিদের ভিন্নধর্মী কাব্য রচনায় প্রাণিত করেছে। কেন্দ্রীয় শিল্পভাবনা থেকে অন্যতম রূপ ও মাত্রার সাধনায় আঞ্চলিক কবিরা সন্ধান করে নিয়েছেন ভাষা ও শেকড়ের, যার প্রাণ-প্রবাহে সঞ্জীবিত ও স্নাত হয়ে চলেছে লোকজীবন। আর বিষয় ও উপাদান নির্বাচনে পেয়ে গেছেন আঞ্চলিক জনজীবনের অসীম প্রান্তর। নতুন ভাবনা আর অনুভূতির প্রকাশে সহায়ক হয়েছে নিশ্চিতভাবে দেশজ প্রাণধারা এবং একই সঙ্গে কারো কারো ক্ষেত্রে মার্কসীয় দর্শন।

ড. উৎপলকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, ‘আধুনিক কবিতার একটি মূল প্রবণতা লৌকিক তথা আঞ্চলিক অনুভূতিসম্পন্ন কবিতাচর্চা। আধুনিক কবিতা আন্দোলন রবীন্দ্রভাষাবিশ্ব থেকে সরে আসতে গিয়ে যে যে দিকে মনোনিবেশ করেছিল তার মধ্যে আঞ্চলিকতার চর্চা একটি প্রধান দিক। আঞ্চলিকতার চর্চা বা আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়ায় ঔপনিষদিক কৃত্রিম জীবনভাবনা থেকে কবিতা একদম মাটির কাছাকাছি পৌঁছুতে পেরেছিল। চর্যাপদের কথা মনে করলে বলা যায় এটি আসলে শিকড়ে ফিরে যাবারই সাধনা। আর আঞ্চলিক কবিতা ধীরে ধীরে মান্যতা পাচ্ছে।’[৯]

আঞ্চলিক কবিদের মূলত দুটি ধারায় বিভক্ত করা যায়। যথা –

(ক) সাধারণ ধারার আঞ্চলিক কবি,

(খ) মৌলিক ধারার আঞ্চলিক কবি।

(ক) সাধারণ ধারার আঞ্চলিক কবি – এই ধারার কবিরা মূলত আদর্শ বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন বা করে থাকেন। কখনো কখনো আঞ্চলিক কবিতা রচনা করেছেন। যেমন, ‘কল্লোল’ যুগের অন্যতম কবি মনীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯) আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন তাঁর ‘কুড়ানি’ কবিতায়। –

‘‘পঞ্চদশী গৌরী আজ, দিঠিতে তাহার
নেমেছে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের সম্ভার।
....
গাছের ডালেতে মাখি কাঁঠালের আঠা।
কখনো সখনো ধরি শালিক টিয়াটা।
কুড়ানিকে দিতে গেলে করে প্রত্যাখান।

'আমি কি অহনো আছি কচি পোলাপান।'
অভিমানে ভরে বুক। পারি না কসাতে
সেদিনের মত চড়, অথবা শাসাতে।''[১০]

আধুনিক কবিতা আন্দোলনের 'কৃত্তিবাস' পর্বের অন্যতম প্রধান কবি শঙ্খ ঘোষও আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। যথা –

''বাপজান হে
কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে
আমিই কিছু জানি না
আমারে কেহ পুছত না
কইলকাত্তার পথে ঘাটে সবাই দুষ্ট বটে
নিজে তো কেউ দুষ্ট না।''[১১]

বাংলার আধুনিক কবিতার মূলধারার কবিদের মধ্যে আঞ্চলিক মনীশ ঘটক ('কুড়ানি'), শঙ্খ ঘোষ ('কইলকাত্তায়'), ছাড়াও পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩৩-১৯৯৭), জসিমউদ্দিন (১৯০৩-১৯৭৬), অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০-২০১২), শামসুর রহমান (১৯২৯-২০০৬), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬), আল মাহমুদ (১৯৪৩), মুহম্মদ নূরল হুদা (১৯৪৯), আবিদ আজাদ (১৯৫২), আব্দুল হাই শিকদার (১৯৫৭), মাহমুদ কামাল (১৯৫৭), মল্লিকা সেনগুপ্ত (১৯৬০-২০১১), সুকুমার চৌধুরী (১৯৬২), উল্লেখযোগ্য। এই কবিরা সাধারণত শহরবাসী হয়ে থাকেন। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলধারার কবিতা চর্চার অনুষঙ্গেই তাঁরা আঞ্চলিক পরিবেশ, জনজীবন বা আঞ্চলিক শব্দভাণ্ডার থেকে অনেকটাই সরে আসেন। তবে প্রতিভাবান কবিরা যখন আঞ্চলিক কবিতা লেখেন তখন তা সত্যি সত্যিই মহার্ঘ্য হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আমরা কবি জসিমউদ্দিন, বা কবি শামসুল হকের নাম নিতে পারি।

(খ) মৌলিক ধারার আঞ্চলিক কবি – আঞ্চলিক কবিদের মধ্যে আমরা এই ধারার কবিদের যথার্থ অর্থেই আঞ্চলিক কবি বলতে পারি। এই সমস্ত কবিরা যথার্থ অর্থেই ভূমিপুত্র। এঁরা সাধারণত কর্মব্যস্ত নাগরিক জীবনপ্রবাহের বাইরের অধিবাসী। পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে এদের চিন্তা-চেতনার জগৎ পরিবর্তিত হয়ে যায় নি। ইউরোপিয়ান সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ছোঁয়া বাঁচিয়ে তাঁদের নিজস্ব আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ধরে রেখে কবিতা চর্চা করেন নিজস্ব সংস্কৃতির প্রেরণায়। এই কবিদের বলা যায় খাঁটি আঞ্চলিক কবি।[১২] এই ধারার আঞ্চলিক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবি ভবতোষ শতপথী (১৯৩৪-২০১৭), ভরতচন্দ্র মাহাতো (১৯৩৩), মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৭), ছত্রমোহন মাহাত (১৯৩৯), ওমর আলী (১৯৩৯-২০১৫), অনিল মাহাতো (১৯৪৯), যুগলকিশোর মাহাত (১৯৫১-২০১৭), কৃষ্ণদুলাল চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৭), তারাশংকর চক্রবর্তী (১৯৫৪), দেবব্রত সিংহ (১৯৫৬), ভূপেন চন্দ্র মাহাত (১৯৭১), জয়ন্ত মাহাত (১৯৭০), অমিয় মাহাত (১৯৭৪) প্রমুখ।

আঞ্চলিক কবিতার চর্চা শুরু সত্তরের কবিদের হাতে। তবে প্রথম আঞ্চলিক কবিতার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন কবি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ('সাঁঝ বিহান', ১৯৮৬)। কবিতায়

আঞ্চলিক ভাষা হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ আলাদা একটি আলোক বিচ্ছুরণ। কাব্যজগতকে কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত করে জীবন্ত সমাজের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

বিদেশের আঞ্চলিক কবি

জীবন্ত ভাষারূপ হিসেবে উপভাষাই আমাদের কাছে সবচেয়ে গ্রহণীয়। একটি বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই পৃথিবীর প্রায় সব উল্লেখযোগ্য ভাষার যেমন উপভাষা রয়েছে তেমনি সেই সব উপভাষায় কম বেশি সাহিত্যও রচিত হয়েছে। বিদেশের কবিদের মধ্যে আমেরিকান কবি Paul Laurence Dunbar (1872-1906)[13], William Barnes (1801-1886) , James Whitcom Riley (1849-1916) , আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইংরাজীতে ল্যাঙ্কশায়ার উপভাষায় কবিতা রচনা করেছেন – Samuel Laycok (1826-1893), Sam Fitton of Rochdale (1868-1923), Joseph Ramsbottom (1831-1901), Michael Wilson of Manchester (1763-1840, Benjamin Brierley (1825-1896), Nicholas Freeston (1907-1978), প্রমুখ। ইটালিয়ান কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে, - Carlo Porta (1775-1821), Cesare Pascarella (1858-1940), Carlo Alberto Salustri (1871-1950), Ignazio Buttitta (1899-1997), Albino Pierro (1916-1995), Pier Paolo Pasolini (1922-1975), Andrea Zanzotta (1921-2011), Tom Leonard (1944), প্রমুখ আঞ্চলিক কবিতা রচনা করেছেন এবং সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ইটালিয়ান কবি হলেন পাওলো পাসোলিনি। দুরন্ত এক যুবক, প্রাণোন্মদনায়, আবেগের প্রাচুর্যে টগবগ করে ফুটতে থাকা উজ্জ্বল দীপ্তময় এক তরুন কবি পাসোলিনি। যদিও একজন চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্বহিসেবে তাঁর খ্যাতি, তবু জীবনের কর্মক্ষেত্রের সুবিশাল আঙিনায় তিনি সে যুগের এক বিস্ময়। মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত সাম্রাজ্যের ভস্ম থেকে তাঁর জেগে ওঠাটাও কম বিস্ময়কর নয়। সাংস্কৃতিক থেকে রাজনৈতিক - এমনই বৃহত্তর পরিসরে তিনি নিজেকে জড়িয়েছিলেন, তাই বিতর্কও তাঁর পিছু ছাড়েনি।

পাওলো পাসোলিনি (১৯২২-১৯৭৫) একজন ইতালীয় চলচিত্র পরিচালক, কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবী ছিলেন। কবি, সাংবাদিক, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার চলচ্চিত্রনির্মাতা, সংবাদপত্র এবং পত্রিকা লেখক, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী প্রভৃতি সত্তা তাঁর ব্যক্তিত্বের অনন্য এবং অসাধারণ সাংস্কৃতিক বহুমুখিতার নিদর্শন। আমেরিকান সাহিত্য সমালোচক হ্যারল্ড ব্লুম কবিকে বিংশ শতাব্দীর প্রধান ইউরোপিয় কবি হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি ইতালীর বোলোনাতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি মূলত বামপন্থী ছিলেন।

১৯৪১ সালে তাঁর নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘Versi a Cesarsa’। সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী ও সমালোচকেরা এই কাব্যটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই কাব্যটি রচনায় তিনি ইটালিয়ান dialect -এর আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই ডায়ালেক্ট ফ্রিউলান। ক্যাসারসা কবির মাতৃভূমি ছিল। প্রতিটি গ্রীষ্মে সেখানে তাঁরা বেড়াত যেতেন। কবির কথায় – ‘‘poor holiday with relatives that the meager official salary of my father allowed us to.’’ তাঁর কবিতায় ক্যাসারসা অপূর্ব সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে উদ্ভাসিত

হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার কবি খুব সচেতন ভাবেই তাঁর কাব্য প্রকরণে উপভাষাকে নির্বাচন করেছেন। এতে তাঁর শুধু আবেগ জড়িত ছিল না, ছিল বৌদ্ধিক দর্শনও। আসলে এ ছিল কবির জাতীয়তাবাদী-ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক চরম আঘাত ও স্রোতের বিপরীতে হাঁটার দুরন্ত সাহস এবং চাপিয়ে দেওয়া ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতিকে সপাট প্রত্যাখ্যানের নিদর্শন। এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, কারণ প্রাণে-মনে তিনি মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনার লালন করেছেন। জাতীয় তথা মান্য প্রমিত ভাষার বিপরীতে এই সজীব ভাষার অস্তিত্বকে যে অস্বীকার করা যায় না, সেটা আবিষ্কারের আনন্দও কবিকে নিশ্চয়ই প্রাণিত করেছিল। ফ্রিউলান উপভাষায় এতাবৎ লোকে কথা বলে এসেছেন, কিন্তু যখন কবিতায় এর ব্যবহার প্রথম করলেন কবি তখন তাঁর আবেগোচিত উত্তেজনা জানতে পারি কবির কথায়। গ্রামীন, দরিদ্র মানুষের এই ভাষা কবিতায় অনাস্বাদিত মিষ্টতা, গীতিময়তাকে তুলে ধরেছে। কতখানি ভাবপ্রকাশে সক্ষম ছিল এই জীবন্ত-প্রাণবন্ত ভাষা তা তাঁর কবিতায় চোখ রাখলেই বোঝা যায়।[১৪]

দেখা যাচ্ছে সাহিত্যের বিষয় আঙ্গিক ভাষা প্রয়োগের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে অনন্য ভূমিকা নিতে পারে। অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ ভাষার কথ্যরূপ, উপভাষা তথা Dialect-এর যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন। আসলে Dialect বা উপভাষার গুরুত্বকে বা সাহিত্যে তার প্রবেশকে কিছুতেই অস্বীকার বা উপেক্ষা কোনোটাই করা যায় না। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, দেশে যে বিপুল জনমানুষ তাদের ভাষা ব্যবহার - সাহিত্য যত এগোবে ততই সে ভাষার প্রভাব পড়তে বাধ্য। কেননা জীবন্ত ভাষারূপ হিসেবে উপভাষাই আমাদের কাছে সবচেয়ে গ্রহণীয়। একটি বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই পৃথিবীর প্রায় সব উল্লেখযোগ্য ভাষার যেমন উপভাষা রয়েছে তেমনি সেই সব উপভাষায় কম বেশি সাহিত্যও রচিত হয়েছে। বাংলার উপভাষায় রচিত আঞ্চলিক কবিতা বাংলা কাব্যধারায় নিঃসন্দেহে অভিনব ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

তথ্যসূত্র :

১। মণ্ডল, নমিতা 'বাঁকুড়াকেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা' । বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি, বাঁকুড়া। ২য় মুদ্রণ ১৯৬৪। (মুখবন্ধ অংশ)।

২। জানা, সুস্নাত। 'আবৃত্তির তত্ত্বরূপ ও আঞ্চলিক বাংলা কবিতা'। দ্রঃ 'আঞ্চলিক ভাষার কবিতা' (সম্পাদনা - ভট্টাচার্য, পীতম)। নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ-২০১২। পৃ-৩২

৩। গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন। 'বাংলা আঞ্চলিক কবিতা' কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০০৬। পৃ-৮

৪। মুখোপাধ্যায়, তরুণ। 'শুধু কবিতার জন্য'। রক্তকরবী, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ - ২০০৭। পৃ-৬৯

৫। চক্রবর্তী, বরুণকুমার। 'প্রসঙ্গঃ আঞ্চলিক কবিতা।' সাহা, বীজেশ সম্পাদিত 'প্রতিভাসের

কবিতা প্রতিমাসে।' দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা। (বাংলা আঞ্চলিক কবিতা সংখ্যা)। প্রতিভাস, কলকাতা। এপ্রিল, ২০০৭। পৃ- ১৯
৬। ভদ্র, কালিদাস। 'আঞ্চলিক ভাষার আবৃত্তির সেরা কবিতা'। এস বি এস পাবলিকেশন, কোলকাতা-৯। তৃতীয় প্রকাশ-বৈশাখ, ১৪২১ (প্রথম প্রকাশ - বৈশাখ, ১৪১৮)। পৃ-৩
৭। সিংহ, দেবব্রত। 'বাংলা আঞ্চলিক কবিতা সংগ্রহ'। প্রতিভাস, কলকাতা-২। প্রথম প্রকাশ- মে, ২০১০। পৃ-৮-৯
৮। মণ্ডল, উৎপলকুমার। গবেষণাপত্র, 'বাংলা কবিতা আন্দোলনের সত্তর বছর' (১৯২১-১৯৯০)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৪। পৃ-১২৮ http://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/164229 (site accessed on 16 September 2017)
৯। মণ্ডল, উৎপলকুমার। পুর্বোক্ত। পৃ-১২৯
১০। ঘটক, মনীশ। 'কুড়ানি'। দাশ, উত্তম সম্পাদিত 'আঞ্চলিক ভাষার কবিতা'। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৬ মুদ্রণ (প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি ১৯৯৪) ISBN: 81-8261-015-X. পৃ-১৭
১১। ঘোষ, শঙ্খ। 'শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩।পরিবর্ধিত দে'জ দ্বাদশ সংস্করণ - মে ২০০৮। (প্রথম প্রকাশ - এপ্রিল ১৯৭০) ISBN 81-7079-334-3. পৃ-৬৭
১২। মণ্ডল, উৎপলকুমার। পূর্বোক্ত। পৃ-১৩০
১৩। "Dialect Poetry."' Encyclopedia of African-American Culture and History. Encyclopedia.com. 15 Oct. 2017 <http://www.encyclopedia.com.
১৪। মাহাত, পরিতোষ। 'বারান্দার কবিতা ও কবি পাসোলিনি।' FOCUS, vol.-VIII. Mahishadal, Purba Medinipur, July, 2014. (ISSN: 2231-1408). P.-107

বাংলা সাহিত্যে নীল আন্দোলন

ড. পীযূষ মণ্ডল

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের শিকড় নীল বিদ্রোহের মধ্যে নিহিত আছে। 'অমৃত বাজার' প্রত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ নীলবিদ্রোহকে প্রথম বৈপ্লবিক আন্দোলন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাৎপর্যের দিক থেকে নীল বিদ্রোহ ভারতবর্ষে মহাবিদ্রোহের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু নীল বিদ্রোহ অন্যদিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মহাবিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, আর বাংলাদেশে নীল বিদ্রোহ সার্থকতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অবশ্য কৃত্রিম নীলের আবিস্কার এক্ষেত্রে অনেক সহায়তা করেছিল।

১৮৫৮-৬০ সালে নীল চাষীদের সংগ্রামের মূলে রয়েছে নীলকরদের অমানুষিক শোষণ, উৎপীড়ন, হত্যা, ধ্বংসলীলা ইত্যাদি। এসম্পর্কে প্রমোদ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

'নীল বিদ্রোহ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ বিদ্রোহ ১৮৫৭-এ ভারতব্যাপী মহাহিদ্রোহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। নীল বিদ্রোহের উপর মহাবিদ্রোহের প্রভাবও সুস্পষ্ট। মহাবিদ্রোহের সময় বাংলার অনেক জমিদার ও শিক্ষিত শ্রেণীর একটা অংশ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে তথা শ্রেণীস্বার্থে ইংরেজ সরকারকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু তারাই তখনকার বাংলার প্রতিনিধি নয়। বাংলার কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে তখন বিদেশি সরকার সম্বন্ধে অসন্তোষ ও বিরোধী মনোভাবের মোটেই অভাব ছিল না। ফরিদ পুরের দাদুমিঞার মতো কৃষক ও জনসাধারণের অনেক নেতাকে বিদ্রোহের সময় জেলে আটক রাখা হয়েছিল। সরকার, মহাজন, জমিদার, নীলকরদের অত্যাচারে বাঙালী জনসাধারণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। অন্য প্রদেশের মতো বাংলাতেও জাতীয় বিদ্রোহের অনেক উপকরণই জমা হয়েছিল এবং তাতে সিপাহী ও কৃষকদের একটা সম্মিলিত বিদ্রোহ সংগঠিত করা বাংলাদেশে কঠিন কাজ হত না।' (নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, পৃ. ১৪৫)

নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, যশোহর, খুলনা, পাবনা, ফরিদপুর ইত্যাদি অঞ্চলের কৃষকেরা সক্রিয়ভাবে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ে আবেদন নিবেদন এবং ধর্মঘটের মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা হলেও অবশেষে তা সশস্ত্র সংগ্রামে পরিনত হয়। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার নীলবিদ্রোহে 'মহাত্মা গান্ধীর' নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ করেন। কিন্তু ১৮৬০ সালে 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে এই বিদ্রোহের সশস্ত্র সংগ্রাম ও প্রস্তুতির কথা বর্ণিত হয়েছে। হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

লিখেছেন—

'Bengali might well be proud of its peasantry. In no other country in the world is to be found in the tiller of the soil the virtues whish the ryots of Bengali have so prominently displayed over since the Indigo agitation has began. Waiting power, wealth, political knowledge and ever ledership the peas antry of Bengali have brought a revolution inferior in magnitude and impor tance to none that has happend in social history of any other country.' (Jogesh chandra, Bengal present Revolution in Bengaliu. page- 48)

সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের অধিকাংশই বিদেশী নীলকরদের সহায়তা করা শ্রেয় বলে বিবেচনা করেছেন। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে মহুর্মুহু যে কৃষক অভ্যুত্থান হয়েছিল তার সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি কোনদিনই একাত্ম হতে পারেনি। বরং ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ইত্যাদি সংস্কারমূলক আন্দোলনের সঙ্গে তারা জড়িত হয়েছেন। কারণ সমাজ সংস্কার এবং ধর্মীয় আন্দোলন অনেক বেশি নিরাপদ বলেই, আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রবল সমর্থন এবং আকর্ষণ তার প্রতি। তাছাড়া জাতীয়তাবোধের উন্মেষের প্রাথমিক পর্বে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ নয়। ফলে হরিসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশই সক্রিয়ভাবে এই আন্দোনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন নি।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত এবং ব্যাপক সমর্থন যে নীলবিদ্রোহ কেন্দ্রীক সাহিত্যের অপ্রতুলতা। কিন্তু নীলবিদ্রোহ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ, এবং ঐতিহাসিক ঘটনা গুলির অন্যতম তা তত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে নীল বিদ্রোহ কেন্দ্রীক সাহিত্যের সংখ্যা খুবই কম।

সুতরাং সংবাদপত্রের তথ্য গুলিকে দূরে সরিয়ে রাখলে নীলবিদ্রোহ কেন্দ্রিক সাহিত্যের সংখ্যা খুবই নগন্য। কিন্তু ছড়ায় গানে ব্যঙ্গ নাটকে, উপন্যাসে বাংলাদেশের মানুষের সম্মিলিত বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের চিত্রটিও একেবারে অনুপস্থিত নয়। ছড়ার ছন্দ ও সুরে জনমানসের প্রতিবাদ কণ্ঠটি ধরা পড়েছে—

'নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
কল্লে এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ মোল
লংয়ের হল কারাগার
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার ...।'

বাংলার সাধারণ মানুষের দ্বারা রচিত ছড়াটি নীল আন্দোলন কেন্দ্রীক সাহিত্যের নিদর্শন।

পরাধীনতার অন্তর্জ্বালা এবং বাঙালীর মজ্জাগত কাপুরুষতা ঈশ্বরগুপ্তের 'দেশজ'

রীতির কবিতাটিতে প্রকাশিত। তেমনি নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদে 'মহারানী ভিক্টোরিয়া' কে উদ্দেশ্য করে মানুষের ক্ষোভ যা যুগমানসেরই পরিচায়ক—

'তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি সিং বাঁকানো
কেবল খাব খোল বিচালী ঘাষ
যেন রাঙা গামলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না
আমরা ভূসি পেলেই খুশি হব
ঘুসি খেলে বাঁচবো না।।'

'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকা নীলকরদের দাদনের বিরুদ্ধে রায়তদের সতর্ক করে দিয়ে লেখা হল—

'A Warning to the Ryot'
'He gives 'advances' - maney lends, Take care!
This debt to grandson e'en descends
Beware! Beware!
Trust him not,
He will ruin thee'

পত্রিকায় প্রকাশিত এইসব তথ্য সাহিত্য নয়। তবে নীলকর ও প্রজাদের ক্রিয়াকলাপের এসব বাস্তব চিত্র নীলকেন্দ্রীক সাহিত্যের মূল্যবান উপাদান।

নীলকরদের নির্মম অত্যাচার পুরুষানুক্রমে ভোগ করে এসেছে সাধারণ মানুষ। তাই ছড়া তৈরি করে গা বেঁধে নিজেদের হৃদয়ের বেদনাকে ভাষা দিতে চেয়েছেন তারা। বিদ্রোহের সময় বা তার আগে পরে গ্রামবাসীরা এই সব গান রচনা করেছেন। 'বিদ্যাভুনী' নীলকরদের সম্বোধন করে গানের মধ্যে দিয়ে বলেছেন—

"হে নিরদয় নীলকরগন!
আর সহে না প্রাণে এ নীল দহন।।
কৃষকের ধনে প্রানে, দহিলে নীল আগুন,
গুণরাশি কি কুর্দিনে, কল্পে হেথা পদার্পন!
দাদনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে,
লুটেছে সকল তোহে, কি আর আছে এখন।'

নীলকরদের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বসিয়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় রচিত গান যা লঙ শুনেছিলেন—

'হোল নীলকরদের অনারারি মেজেস্টারি ভার।
... ...
পড়েছে সব পাতর বক্ষে অভাগা প্রজার পক্ষে

বিচারে বক্ষে নাহকো আর।

... ...

কুটিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী
বানরের হাতে হোল কলের খোস্তা নোস্তা জলে চাষ।
হোল ডাইনের কোলে ছেলে সোঁপা, চিলের বাসায় মাছ
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে শুনেনি কেউ শুনবে না।।'

অন্যত্র আরেক কবি আরো সোজাসুজি বলেছেন—

'হোলে ভক্ষকের রক্ষাকর্তা, ঘটে সর্বনাশ।
কালসাপ কি কোন কালে দয়াতে ভেককে পালে?
টপাটপ অমনি করে গ্রাস।।'

নীলের প্রভাবে প্রজার সর্বনাশের বিবরণ বার বার লিপিবদ্ধ হয়েছে এইসব রচনায়—

'আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে, এখন মা প্রাণ নিয়ে সংশয়।
গেল গরু জরু, তৃণ তরু, কিছু নাহি আর।'

আবার

'নীল করের কি অত্যাচার।
এই নীলে সকল নিলে এদের নিলে বোঝা ভার।।
ও নীলের দাদন, বিষম বাঁদন, নাহিক নিস্তার।
বেচলে ভিটে না যায় মিটে, কিবে মিঠে সদ্ব্যবহার।।
ও জোর করে বিচ ছড়ায় মাঠে, ঠড়ায় কর্ম-আর।
হোল না ধান, গেল যে মান, প্রাণ বাঁচান হোলে ভার।।
ও সুদে সুদে কেবা সোদে তিন পুরুষের ধার।
বেচলে পাঠা, না যায় লেঠা, কতো বেটা গঙ্গাপার।।'

নিষ্ঠুর নীলকরদের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই, তারা কোন অনুরোধ রাখে না। নীলদস্যুরা—

'জমি চুনবে, দিন গুনবে, কেবল বুনবে বীজ;
দোহাই না শুনবে একটি বার।।
নীলের দাদন, ঠেঙ্গার গাদন, বাঁধন চমৎকার;
কবে ভিটেমাটি চাটি সার।।'

নীলকরদের প্রধান কাজ প্রজা পীড়ন। তারা কোন দোহাই মানে না। নির্বিচারে তারা দৈহিক নির্যাতন করে চলে—

'প্রজা ধরছে আর মারছে তারা এককালে,
পিঠেতে মারছে খুব কোড়া।
কাটা ঘায়ে লুনের চিটে, পোড়ার উপর পোড়া,

যেন গোদের উপর বিষফোড়া।'

কালীগঙ্গা ইছামতী বেয়ে স্টীমার যাত্রার সময় গ্র্যান্টের কাছে প্রজাদের আবেদন পৌঁছে দেবার প্রয়াস—

'গারনাল এলো বাংলা পরে, ধূমাকলে নৌকা চলে
... ...
দোহাই ধর্ম-আবতার তুমি কর সুবিচার
ঝাঁপ দিল সব ইছামতী জলে।'

নীলকরদের স্বরূপ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানুষের কাছে—

'কুটেল সব সাহেবজাদা, ধপ্‌ধপে বাইরে সাদা
ভিতরে পচা কাদার ভরভড়ানি পেঙ্কো গন্ধ তায়।'

অবশেষে প্রজারা ঘুড়ে দাঁড়ায় প্রত্যাঘাতের জন্য সংঘবদ্ধ হয়—

'রাইয়তেরা তৈরী এবার মুখ বুঁজে মার খাবে না,
লাটিয়ালের সঙ্গে লড়াই, না মেরে জান দেবে না।'

কবি ধিরাজ নীল আন্দোলনের প্রভাব শহরে কিভাবে পড়েছে তা চিত্রিত করেছেন। নীলদর্পনের অনুবাদে লংসাহেব লিখেছেন- হরিশচন্দ্রের অকাল মৃত্যু—

'তাই নিয়ে বারবার লিখে হরিশ মরেছে।'

'ঈডেন গ্র্যান্ট' এর প্রজাহিতৈষণা—

'ঈডন গ্র্যান্ট মহামতি, ন্যায়বান উভয়ে অতি'

'ইন্ডিগো কমিশনের' রিপোর্ট—

'ইন্ডিগো রিপোর্ট পড়ে কেনা অন্তরে পোড়ে;'

বিচারক 'ওয়েল্‌স্' এর অবিচার লঙ্‌ এর জেলে জরিমানা—

'ওয়েলস্‌, পিকক বসিয়া বিচারাসনে,
লংয়ের হাজার টাকা ফাইন করেছে,
সিংহবাবু দয়াগুনে হাজার টাকা দিল গুনে,
ওয়ালটার ব্রেট তাই তাক হয়েছে,'

এই বিচার আসলে প্রহসন তার সূত্র ধরে আইনের আসল চেহারার আত্মপ্রকাশ—

'রেস্‌ হেট্রেড খুব চেগেছে?'

লঙ সাহেবের বিচারকে কেন্দ্র করে কলকাতা শহরের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী ধীরাজের গানে ধরা পড়েছে। অবশেষে 'মহারানী ভিক্টোরিয়া'র কাছে ধীরাজের আবেদন—

'মহারানী তোমার প্রতি এই ক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েলস্‌ পাপে দেও মুকতি, ধীরজ এই বলিতেছে।'

নীল অত্যাচার প্রজাসাধারণের দুর্দশা, তার পাশাপাশি জমিদারদের দুর্গতির প্রসঙ্গ

তুলে এনে মহারাণীর কাছে কবি জানিয়েছে—

'মা তোমার সাধের বাঙাল, হোলো কাঙ্গাল, সয়না অত্যাচার
বোগারে হয় রেয়োত যারা, জমিদার পড়ে মা মারা,
লাটের দিন খাজনা হয় না আর।'

অবশেষে মহারাণী নিজের হাতে শাসনভার তুলে নেওয়ায় কবি আনন্দিত, তার প্রকাশ কবির ভাষায়—

'তুমি বিশ্বমাতা ভিক্টোরিয়া থাকো বিলাতে।
আমারা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন।
শুভদিন মা ভারতে।।
কোম্পানীরাজ উঠিয়ে নিলে, কে বুঝে মা তোমার লীলে?
নিলে মা ভারতের ভার, পেয়ে শুভ সমাচার।'

তখন কবির প্রার্থনা নীলের চাষ তুলে নিয়ে নীলভূমিকে অন্নভূমিতে রূপান্তরিত করে প্রজার প্রাণ রক্ষা করা—

'ভালো কার্য্যটি ধার্য্য করে যদি গো
এই রাজ্যটি করেছ মা খাসা।
এসে এ দেশেতে বসত কর, অন্নপূর্ণা মূর্তি ধর,
অন্নদানে বাঁচাও প্রজার প্রাণ।
সব অন্নভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলার চাষ
কোথা মা পায়ে ধরি, হয়ে রাজরাজেশ্বরী
সন্তানের পুরাও অভিলাষ।।'

গান ছড়ার পাশাপাশি নীলের অত্যাচার নিয়ে লেখা হয়েছিল ছোট ছোট গ্রন্থ। সংলাপের আকারে গদ্য পদ্যে লেখা হয়েছিল 'বাপরে বাপ! নীলকরের কি অত্যাচার' (১৮৫৬)। দুর্গাদাস এই গ্রন্থটি রচনা করেন। নীল কমিশনের কাছে গ্রন্থটি পেশ করেন। পাবনা জেলার গোলকপুর গ্রামের মানুষের প্রতি অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থে। কলকাতার শিক্ষিত যুবক শ্যামচাঁদ ঘোষ ও অবিনাশচন্দ্র ঘোষের কথোপকথনে নীলকরের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। অসহায় মানুষের প্রতি দেশবাসীর সহানুভূতি সঞ্চয় করা ছিল গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থের শেষে বর্ণিত হয়েছে—

'হে দেশজ ভ্রাতৃবর্গ! বঙ্গীয় দীনহীন প্রজাপুঞ্জের এতাদৃশ যন্ত্রণা সন্দর্শন করিয়া তোমাদের পাষাণসম সুকঠিত হৃদয়ে কি করুণারসের আবির্ভাব হয় না? মুখোস ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নীলের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন পুস্তিকাটির সফল প্রচেষ্টা 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর দৃষ্টি এড়ায়নি।'

প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে জমিদার নীলকরের সংঘর্ষ বর্ণিত হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রজাদের ওপর নীলকরের জুলুম, জোর করে লাঙ্গল, গরু ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া, জমিদার এবং নীলকরের লাঠিয়ালদের লড়াই, অসহায়

প্রজাদের বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। জজ ম্যাজিষ্টেটের সঙ্গে কুঠিয়ালদের সখ্যতা।

নীলকরদের প্রভাবে ফসলী জমিতে জোর করে নীলবোনা, লেঠেল দিয়ে দাঙ্গা করা, নিষ্ক্রিয় পুলিশ প্রশাসনের চিত্র, বিচারকের পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি সামগ্রিক চিত্র লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। জমিদার ও নীলকরদের মধ্যে কে বেশী অত্যাচারী সে প্রসঙ্গেও লেখক সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন— 'জমিদারেরা জুলুম করে বটে কিন্তু প্রজাকে ওতনে বজায় রেখে করে, প্রজা জমিদারের বেগুনক্ষেত। নীলকর সে রকমে চলে না— প্রজা মরুক বাঁচুক তাহাতে তাহার বড় এসে যায় না— নীলের চাষ বেড়ে গেলেই সব হইল— প্রজা নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত।'

নীল আন্দোলনের সামগ্রিক চেহারা প্রস্ফুটিত হয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটকে। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল এই নাটক। নাটকের একদিকে নীলকরের অত্যাচারের বিচিত্ররূপ অন্যদিকে অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের প্রতিরোধ এই পরস্পর বিরোধী দুটি বাস্তব দিক ফুটে উঠেছে।

নাটকের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র বাস্তব থেকে নেওয়া হয়েছে। যশোহরের মোল্লাহাটি নীল কনসার্ন ও নদীয়ার বাঁশবেড়িয়া নীলকুঠিতে অনুষ্ঠিত নানা প্রকারের অত্যাচারের ঘটনা নাটকের মূল ভিত্তি। বাঁশবেড়িয়া কুঠি নাটকে 'বেগুনবেড়ের কুঠি' আর কৃষ্ণনগর হয়েছে 'অমরনগর'। বাঁশবেড়িয়া কুঠির নৃশংস নীলকর উইলিয়াম হোয়াইট-এর দৈহিক পীড়নে শীতল তরফদারের প্রাণ হারাতে হয় কুঠির গুদামে বন্দী অবস্থায়। নীলদর্পন নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম গভাঙ্কের অন্তর্গত 'বেগুনবেড়ের কুঠির গুদামঘরে' এক মুমূর্ষ মানুষের ক্ষীনকণ্ঠ ভেসে আসে। নাটকে এই মৃত্যু পথযাত্রী বন্দী মজুমদার নামে অভিহিত। আসলে ইনি হলেন বাস্তবের শীতল তরফদারের প্রতিরূপ। ক্ষেত্রমণিকে রোগসাহেবের ঘরে নিয়ে আসার দৃশ্যটির প্রতিরূপ। ক্ষেত্রমণিকে রোগসাহেবের ঘরে নিয়ে আসার দৃশ্যটির বাস্তব ভিত্তি হল কাচিকাটা কুঠির নীলকর আর্চিবল্ড হিলস্ কর্তৃক হরমণিকে ধরে আনার ঘটনা। আর্চিবল্ডের লোকজন নদীর পথ থেকে হরমণিকে জোর করে কাচিকাটা কুঠিতে নিয়ে আসে। পরে মেয়েটিকে তার কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে দিয়ে আসে। নাটকে আমরা দেখি ক্ষেত্রমণিকে সাহেবের ঘর থেকে নবীনমাধব ও তোরাপ দুজনে মিলে উদ্ধার করে। এসব বাস্তব ঘটনার নাট্যিক রূপান্তর ঘটেছে নীলদর্পন নাটকে। যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট জোতদার গিরিশ মৌলিক ও নদীয়ার ডুমুর হুদার এসিস্টেন্টের হাত কাফিলোদ্দি নামে এক কৃষকের একাদশ আইনের ৫ ও ৬ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। নাটকেও গোলক বসু এই একই ধারায় অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

নীলকরদের বিরুদ্ধে সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষক থেকে শুরু করে জমিদার মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত নিরক্ষর সবাই একজোট হয়ে এক জায়গায় হয়ে মিলিত হয়েছিল। নাটকেও তেমনি গোলক বসুর মত অবস্থাপন্ন কৃষক, স্বল্পপরিমানে জমির মালিক সাধুচরণ ও রাইচরণ, তোরাপের মত ভূমিহীন কৃষক কলেজের পন্ডিত, আদালতের

মোক্তার, শিক্ষিত সাংবাদিক নীলকণ্ঠবাবু সকলেই নীলকর বিরোধী। নীলকৃষকদের দুঃখ পাদরী সাহেব যত আন্তরিক বেদনাহত হলেন ততই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বাড়তে লাগলো। রায়তেরা পরস্পর বলাবলি করতো—

'এক ঝাড়ের বাঁশ বটে - কোনখনায় দুর্গাঠাকুরণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।'

ডাক্তার ও ইনস্পেকটর-এর এই সংলাপে পাদরী সাহেবদের কৃষকদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার।

কৃষক সমর্থিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' আর নীলকর সার্থবাহী পত্রিকা 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার পারস্পরিক সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় মেলে গোপীনাথের তোষামদিতে—

'আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জেলার কাছে ঠাণ্ডা জলের কুঁজো।'

পরোপকারী, প্রতিরোধী নেতৃত্বের নায়ক নবীনমাধব চরিত্র কিছুটা বিশ্বাস ও ভ্রাতৃত্বের আদলে রচিত। নাটকে মোক্তারের বিবরকণাতে অনুরূপ আভাস পাওয়া যায়। মোক্তার জানায়—

'নবীনমাধব বসু করাল নীলকর নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাষাদিগের রক্ষা করিতে প্রানপনে যত্ন করিয়া থাকেন, একথা স্বীকার করি, এবং তিনি উড্ সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেকবার সফলও হইয়াছেন তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে।'

শোষিত নিপীড়িত যে মানুষদের নেতৃত্ব দিয়েছেন নবীনমাধব, তোরাপ তাদেরই একজন। এই গ্রাম্য যুবকের দেহ নীলকরদের অত্যাচারে পড়ে ধাতুর মত কঠিন হয়ে উঠেছে। সে নবীনমাধবকে ছায়ারমত অনুসরণ করে এবং সুযোগ পেলেই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'আঙ্কল টমস্ কেবিন'-এর সঙ্গে নীলদর্পন নাটকের তুলনা করা হয়। 'হ্যারিয়ট বিচার স্টো' তাঁর আঙ্কল টমের কাহিনি আশ্রয়ে আমেরিকার দাসপ্রথা কবলিত কালো মানুষদের ওপর সাদা মানুষের বিশেষ করে প্ল্যান্টারদের, বর্বরোচিত অত্যাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। নীলকৃষকদের মতো দাসদের নিয়ে গিয়ে তাদের বিক্রি করা হত। আইন, প্রশাসন সমস্তই ছিল নীলকরদের মত ওদেশের শ্বেতপ্রভুদের পক্ষে।

নীলদর্পনের আদর্শ অনুসারে জীবনের নানাক্ষেত্রে পীড়ন অত্যাচার শোষণ বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরতে পরবর্তী বহু 'দর্পন' নাটক লেখা হয়েছিল।

নীলকরদের অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে প্রজাবিক্ষোভের ছবি আঁকা আছে মীর মশাররফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯১) আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থে। নীলবিদ্রোহের সময় মীর মশাররফ প্রজাবিক্ষোভের যে সব চিত্র দেখেছেন অকপটে তা তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। মীর মশাররফ হোসেন জীবন সায়াহ্নে সাহিত্যিক 'জলধর সেন'কে লিখেছেন—

'তোমাকে নীলবিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক নোট দিয়া যাইবো। তুমি একখানি ইতিহাস আমি এ বয়সে আর পারিলাম না।'

(জলধর সেন - কাঙ্গাল হরিনাথ (১ম খণ্ড) পৃ: ৩৮)

মীর মোশাররফ হোসেন নীলবিদ্রোহ সম্পর্কে যতখানি সচেতেন ছিলেন তৎকালিন, অন্যান্য রাজনৈতিক তরঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন। 'ড. মুহম্মদ আবদুল হাই' লিখেছেন—

'কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবে তিনি জড়িত ছিলেন না। কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত না থাকার জন্যে তিনি যে তাঁর সমকালীন গুণী ব্যক্তিদের গুণ গ্রহণ করেননি তাও নয়।'

(মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আধুনিক যুগ, পৃ: ৭৮)

নীলকর 'কেনী'র (T. L. Kenny) কুঠি ছিল কুষ্টিয়ার কালীগঙ্গার ধারে শালঘর মধুযায়। প্যারীসুন্দরীর জমিদারীর দখল করার চেষ্টা করেন কেনী। ফলে উভয়ের মধ্যে চলে সংঘর্ষ। দুর্বল প্রজাদের শায়েস্তা করতে কেনির নিষ্ঠুরতা ছিল চরম পরিমানে। পৈত্রিক সম্পত্তি লিখে না দেওয়ার জন্য কাজী সামসের আলীকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়। কেনীর গারদের বন্দীদের—

'প্রাতে প্রতিদিন একসের ধান পায়। সেই ধান হইতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চাল বাহির করে। সেই চাল আর সন্ধ্যার সময় এক ঘটি জল ইহাই মালখানার কয়েদিদের আহারের ব্যবস্থা। কেনীর গারদ বড়ই কঠিন স্থান। যাহার ভাগ্য সে গারদ বাসের অবসর হয় তাহার জীবন সংশয়। পাঁড়ে, দোবে, চোরের অত্যাচারে অর্থপিশাচদের অমানুষিক ব্যবহারে প্রাণ আর বাঁচে না।'

কালীগঙ্গার বুকে 'গ্র্যান্ট'-এর স্টীমার এলে প্রজারা তার কাছে নীলকর অত্যাচারের যে বর্ণনা দিয়েছিল সেদিন তার প্রত্যক্ষদর্শির বিবরণ মেলে মশাররফের লেখায়—

'কালীগঙ্গার দুই ধারে সহস্রাধিক প্রজা স্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল তাহা নহে— সহস্র মুখে বলিতে লাগিল দোহাই ধর্মাবতার। আমরা মারা গেলাম। ... আমাদিগের রক্ষা করুণ।'

লাটসাহেব শনিবার পাবনায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে বললেন। প্রজারা যাতে অভিযোগ জানাতে না যেতে পারে তার ব্যবস্থাও করেছিল কেনী। কিন্তু সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে প্রজারা রাজদরবারে হাজির হল—

'দশহাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হল- দোহাই ধর্মাবতার। আমরা মরিলাম। নীলের জুলুমে আমরা মারা গেলাম। আমাদের পেটে ভাত নাই। ধানের জমিতে জবরানে নীল বুনিয়া লয়। আমরা কি খাইয়া বাঁচি?'

লাটসাহেব লিখিত অভিযোগ জানাতে বললেন—

'এত প্রার্থনা পত্র দাখিল হইলো যে লাটবাহাদুরের দুই পার্শে দুইটি কাগজের স্তুপ খাড়া হইলো। একটি মানুষ সেই স্তুপের পার্শ্বে অনায়াসে গা ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।'

অবশেষে লাটসাহেব ঘোষণা করলেন জোর করে নীল বোনা যাবে না।

কেনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল দুজন জমিদার। 'সা গোলামাজ্জম' এবং 'রমাকান্ত রায়'। রমাকান্ত রায়— 'তিনি দেশের মধ্যে সর্বসাধারনের নিকট মহামানবীয় সকলেই তাহার বিশ্বাস করে, সকলেই তাঁহার কথা শুনে।' নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'রামকান্ত রায়' বলেছেন—

'নীলকরদের অত্যাচারে আমরা সকলে অস্থির হইয়াছি। জমীদার, তালুকদার, মহাজন, জোতদার, কৃষক, মধ্যশ্রেণী, ধর্মযাজক, গুরুদেব, গোঁসাই, পীর, ফকির এমন কি মুটে মজুর পর্য্যন্ত কেনীর অত্যাচারে অস্থির।'

—লাটবাহাদুর প্রজাদের দুঃখে দুঃখিত হলেও সমবেত প্রতিরোধের সুর তৈরী করেছিলেন তিনি।

এর ফলস্বরূপ প্রজারা নীলচাষ বন্ধ করে দেয়। নীলের চারা জলে ভাসিয়ে দেয়। ফলে— 'জলের দিকে দৃষ্টি পড়িতে সকলের চক্ষেই পড়িল যে বোঝা বোঝা নীল— গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। ... নদীর জল ঢাকিয়া খণ্ড খণ্ড নীলক্ষেত সকল ভাসিয়া যাইতেছে ... কুঠিময় সোর পড়িয়া গেল যে নীল জলে ভাসিয়া যাইতেছে ...।' প্রজা বিক্ষোভের এসব চিত্র তুলে ধরেছেন মির মোশাররফ হোসেন তার 'উদাসীন পথিকের মনের কথায়'।

'আমার জীবনী' শীর্ষক গ্রন্থে মীর মশাররফ হোসেন লিখেছেন— কেনীর কুঠির অন্তর্গত মীরপুরের নীলকর সাহেব একদিন মাঠে নীল দেখতে যাওয়ার সময় একটি স্ত্রীলোককে গৌরী নদী থেকে জল নিয়ে যেতে দেখেন। সাহেব খবর নিয়ে জানতে পারে স্ত্রীলোকটি মধ্যবিত্ত পরিবারের কুমারী কন্যা। নীলকর সাহেব হুকুম জারি করে 'মেয়েটিকে আমার চাই' অবশেষে মেয়েটির বিয়ের দিন দুইশত লাঠিয়াল এসে তাকে তুলে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না। কিছুদিন পরে কন্যার পিতামাতা—

'কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই সন্ধান করিল না। ... এদিকে মীরপুর কুঠির প্রসাদ নীলকরের বিলাসগৃহ ... এই ঘরে সেই সময় ইংরেজ নীলকর কর্তৃক যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে।'

সেদিনের গ্রামবাংলার এই মর্মান্তিক ট্র্যাজিক কাহিনি বর্ণনার শেষে মীর মোশাররফ হোসেন মন্তব্য করেছেন—

'এই প্রকার কত অত্যাচার কত দৌরাত্ম এই বাঙ্গালা মুলুকে স্থানে স্থানে ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশের সাধ্য কাহারও নাই। দৌরাত্ম্য, অবিচার, স্বার্থপরতার শেষ সীমা পর্যন্ত না পৌঁছালে সাধারণ প্রজার মনে একতার উদয় হয় নাই।

প্রজা নীলকুঠির দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিলে জোটবদ্ধ হইল। শেষে কার্য্যত করিল, সফলকামও হইল।'

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'বিশ্বনাথ'রবিনহুড গাথার আদলে রচিত। বিশ্বনাথ সাধারণ মানুষের কাছে মুক্তিদূত— 'ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে এদেশে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিত, তফনকার 'মানসুবে' ও ডাকাতের দল তাহার প্রমাণ। এই ঘোর অরাজকতা, আমাদের বোধহয় দুইটি কারণে ঘটিয়াছিল। প্রথম নিম্নশ্রেণির অতি দারিদ্র্য, দ্বিতীয় তাহাদের উপর উচ্চতর সম্প্রদায়ের অত্যাচার।'

আর শাসকের অত্যাচারের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করাই বিশ্বনাথের প্রধান কাজ। 'সুকুমার মিত্র' তাই লিখেছেন—

'সুলিখিত এই উপন্যাসে নীলকর সাহেব ও জমিদারের সঙ্গে বিশ্বনাথের সংঘর্ষের কাহিনি একটি গল্পের ছকে ফেলে বর্ণনা করা হয়েছে।' (ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র, ১৩৬৬, পৃ: ৭১)

নীলবিদ্রোহ শেষ হবার পঞ্চাশ বছর পর শিবনাথ শাস্ত্রী 'বিধবার ছেলে' প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গ্রন্থটি রচিত। গ্রন্থে নীলকর প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে—

'ওদিকে আর একটা কাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। চুয়াডাঙ্গার কয়েক ক্রোশের মধ্যেই নীলকর সাহেবদের একটি কুঠি আছে। সেখান হইতে সংবাদ আসিল যে সাহেবরা জোর করিয়া প্রজাদিগর নীল বুনাইতেছেন; জোর করিয়া খাটাইতেছেন; নামমাত্র মজুরি দিতেছেন; অবাধ্য হইলে ধরিয়া কয়েদ করিতেছেন। শুনিয়া মহেশের মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য গোপনে ঐ সকল গ্রামে লোক পাঠাইয়া বাহির হইয়া সংবাদ জানিয়া আসিলন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা কলিকাতার হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের সম্পাদককে হস্তগত করিয়া প্রবন্ধ সকল লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। এই সকল প্রবন্ধ বাহির হইতে আরম্ভ হইলে চারিদিকে হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল; 'কে লেখে কে লেখে' করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ হইলো।'

(বিধবার ছেলে, পৃ: ৭৭-৭৮)

'নীলদর্পন' নাটক অত্যাচারীর রূপ উদঘাটনের ও অত্যাচারিতের প্রতি গভীর মানবিক সমবেদনার যে পথ প্রদর্শন করেছিলেন সেই ধরাতেই 'জমিদারদর্পন' (১৮৭৩) নাটকের আবির্ভাব। রূপকথার মায়াবী জগৎ মশাররফ হোসেন কঠিন মৃত্তিকার ভূমিতে এসে দাঁড়ালেন 'জমিদারদর্পনে'। যেখানে অত্যাচারী জমিদারের লালসার আগুনে নুরুন্নেহার মতে নারীদের সতীত্ব লুণ্ঠিত হয়, অন্তসত্ত্বা নারীকে নিক্ষিপ্ত করা হয় খেজুর বাগানে, বিচার ব্যবস্থা শোষকের দাস, তিলকধারী বৈষ্ণব আর নামাজ পড়া পীড়ের দল যেখানে জমিদারের নারীমাংস শিকারের সহযোগী শোষকের অত্যাচারে হিন্দু ও মুসলিম কৃষকেরা আজ গৃহহীন। গভীর বাস্তবতাপূর্ণ জীবনযাত্রার চিত্রাঙ্কনে মশাররফ হোসেনের আবির্ভাব।

ইউসুফশাহী পরগণা মুসলমান প্রধান অঞ্চল। সরকারি খাজানা বাকি পড়ায় ঐ জমিদারী নীলাম হয়ে যায়। খন্ড খন্ড অবস্থায় নতুন জমিদারেরা কিনে নেয়। এর মধ্যে ঠাকুর পরিবারও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারীর অন্তর্গত সাজাদপুর থেকেই পাবনা কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয়। ইউসুফসাহী পরগণাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র জমিদারেরা নানা কৌশলে খাজনা বৃদ্ধি করত। ঠিক সেই সময় সিরাজগঞ্জের জমিদারেরা নতুন মাপ প্রণালী চালু করল, রায়তদের বারো বিঘা জমিকে পনের বিঘা বানিয়ে বিঘাপ্রতি অতিরিক্ত খাজনা দাবী করতে থাকে। তাছাড়া বাজে আদায়, পথকর, শিক্ষাকর, নজরানা ও সেলামি ইত্যাদির সঙ্গে শারীরিক অত্যাচারতো ছিল উপরি পাওনা। 'জমিদারদর্পনে'র প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে তার নমুনা পাওয়া যায়। এসব কারণেই পাবনায় প্রজাবিদ্রোহ দেখা দেয়।

'পাবনা জেলার ইতিহাস' থেকে জানা যায় এই সময় জমিদারেরা খাজনা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছিল ও পুরানো রায়তদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চাইছিল। ফলে রায়ত ও ভূস্বামীরা জমিদারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হতে শুরু করে। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো সিরাজগঞ্জের জমিদারেরা ভয়ে পাবনা শহরে পলায়ন করতে থাকে এবং তারা সরকারি সাহায্য প্রার্থনা করে। ক্যাম্পবেল অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিশবাহিনী পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা করেন। অবশেষে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে পরে।

গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে 'জমীদারদর্পন' বিদ্রোহ সংশ্লিষ্ট কোনো কথা নেই। নাটকের রায়ত চরিত্র গুলো সাধারণভাবে জমিদারের অত্যাচারের বিষয়ে কথা বলেছে। জমিদার হায়ওয়ান আলী গৌরী সেতু অথবা পাবনার বিধবা বিবাহ ঘটিত গোলযোগের কথা বলেছেন। কিন্তু প্রজাবিদ্রোহের কথা একবারও বলেননি। নীলদর্পনে'র ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখেছি বিদ্রোহকালীন ঘটনার সঙ্গে নাটকটি সম্পৃক্ত, কিন্তু 'জমিদারদর্পনে' আমরা সেরকমটি দেখি না।

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে তখন জমিদাররা সবসময় তাদের সার্থের অনুকূল বিচার পায়নি। এরই প্রতিক্রিয়ায় 'জমিদারদর্পন' নাটকেও দেখা যায়, বিলাসপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে হায় ওয়ান আলির বিচারকারী ম্যাজিস্টে যথাসম্ভব ন্যায় বিচার করে অনুপস্থিত জমিদার হায়ওয়ার আলি ও তার সঙ্গীদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেছে। একথাঠিক শ্রেণিগত অবস্থানের কারণেই মশাররফ পাবনা কৃষক বিদ্রোহের কোন রূপই নাটকে পরিস্ফুট হয়নি। ভূমিকর্ষণকারী রায়তেরাই ছিল এ বিদ্রোহের মূল শক্তি।

১৮৭২-৭৩ সালে পাবনায় প্রজাবিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় যখন জমিদার, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ও পত্র-পত্রিকাগুলি 'সর্বস্ব গেল' রব তুলেছিল যখন রায়তেরা হিংস্র দুর্বিত্ত, এবং জমিদাররা সজ্জন ভদ্র, প্রজারাই লুন্ঠনকারী, অগ্নিসংযোগকারী। এরকম উত্তপ্ত পরিবেশে মীর মোশাররফ হোসেন লিখলেন 'জমিদারদর্পন'। বাংলাদেশের মানুষকে প্রত্যক্ষ ঘটনা চিত্রিত করে দেখালেন। প্রজা নয় জমিদাররাই অত্যাচারী,

লুন্ঠনকারী, নারী ধর্ষণকারী। বাংলার রায়তরা সৎ, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়। এ এক সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি বিপরীত প্রচার। এই বৈপরীত্যই 'জমিদারদর্পনে'র অনন্য গৌরব।

নাটকের শুরুতেই নাট্যকার সূত্রধারকে দিয়ে বলিয়েছেন—

'মফস্বলে একরকম জানোয়ার আছে, তারা শহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর, তারা বিনা পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দ মনের সুখে কাল কাটায় তাদেরই নক্সা রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করা হবে। তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে।' এই জমিদাররূপী জানোয়রের ছবি অঙ্কন করতে গিয়ে কদর্যতা যদি কিছু স্থান পায় তবে তা ওই শ্রেণিরই কদর্যতা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কদর্যতা। মীর মোশাররফই বাংলা সাহিত্যের প্রথম শিল্পী - যিনি একটি পরিপূর্ণ অত্যাচারী জমিদারকে নাটকের বিষয়ীভূত করেছেন।

ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে নীলকাহিনি বর্ণনা দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র বসু (১৮২৪-১৮৯৮) তাঁর 'সেকালের দারোগার কাহিনী' বইতে। গ্রন্থটির পুরোটাই নীলবিবরণী নয়। বিশেষভাবে 'নীলকুঠি' শীর্ষক অধ্যায়ে নীলকর, নীলচাষ, নীলচাষী ইত্যাদি সম্পর্কে তার ধারণা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

'যদি কেহ এই প্রদেশের বিমানে উঠিয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের স্ত্রীলোকের চটের উপরে বড়ি দিলে যেরূপ দৃশ্য হয়, ঠিক সেইরূপ ভাবে কৃষ্ণনগর জেলার মাটির উপরে নীলকুঠি গুলি দৃষ্ট হইত।' ('সেকালে দারোগার কাহিনী': গিরিশচন্দ্র বসু, অলোক রায়, অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ: ৫৫)

এই বর্ণনার মধ্য দিয়েই লেখক গ্রন্থের সূচনা করেছেন। তাঁর মতে 'দীনবন্ধুর পুস্তকে অনেক সত্য বৃত্তান্ত আছে' একথা নিয়েও তিনি লিখেছেন—

'সকল নীলকরই মিত্রজার বর্ণিত সাহেবদের ন্যায় পামর এবং অত্যাচারী ছিলেন, তাহা নহে। নীলকর সাহেবদিগের যেমন দোষ ছিল, তেমনি পক্ষান্তরে অনেক গুণও ছিল এবং তাঁহাদের প্রাধান্যের সময় তাঁহারা দেশের অনেক উপকারও করিয়াছিলেন। অনেক নীলকর যেমন নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিল, তেমন অনেকে খুব দয়াশীল ও ধর্মভীত ছিলেন। আমি নাটক কিম্বা কবিতা লিখিতেছি না, সাদা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য; অতএব আমি পক্ষপাত না করিয়া নীলকর সাহেব দিগের দোষ গুণ সমভাবে বিবৃত করিতে বাধ্য এবং তাহা করিতেও সাধ্যমত চেষ্টা করিব।'

গিরিশচন্দ্র বসু নীলকরদের দোষ এবং তার পাশাপাশি তাদের গুণগুলিও সংক্ষেপে তাঁর গ্রন্থের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

'প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়' (১৮৫৫-১৯১৭)

'নিজের চোখে নীলকর সাহেবদের যে সব অত্যাচার দেখেছেন তাহার বিবরণ 'তেত্রিশ বৎসরের পুলিশ কাহিনী' বা 'প্রিয়নাথের জীবনী' নামক আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন।'

(হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, প্রথম খণ্ড, সুধীর কুমার মিত্র, পৃ: ১২৩)

'দারোগার দপ্তর' প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা। 'দারোগার দপ্তর' নবম বর্ষের দুটি সংখ্যায় 'কুঠিয়াল সাহেব অর্থাৎ সেকেলে নীলকর সাহেবের ভীষণ অত্যাচার কাহিনী' তুলে ধরেছেন তিনি।

নীলের দাদন যাকে একবার স্পর্শ করে বংশ পরম্পরায় তার থেকে রেহাই মেলে না। তার সঙ্গে প্রিয়নাথ দেখিয়েছেন কেমন করে সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রজাদের দাদন নিতে বাধ্য করা হত। তাঁর নিজের গ্রাম জয়রামপুরে তিনি যা দেখেছেন তার বিবরণ রেখে গেছেন তিনি। সেখানে নতুন বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করতে থাকে নীলকরেরা। যারা দাদন নিতনা তাদের বাড়ির চারপাশে নীল ছিটিয়ে দেওয়া হত। নীলের চারায় গরু বাছুর মুখ দিলেই তাদের খোঁয়ারে পাঠিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নানা ভাবে অত্যাচার শুরু হলো। যে জমিতে ধান বুনছে কৃষক সেই জমিতেই নীল বুনে কৃষকের বিরুদ্ধেই নীল ভেঙে ধান চাষ করার অভিযোগ মামলা করতো। এর পরেও কৃষকেরা কথা না শুনলে অবাধ্য কৃষকদের 'সুন্দরী স্ত্রীলোক' অপহরণ করে, ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে বাধ্য করতো দাদন নিতে।

একজন বিচারপ্রার্থীকে প্রথমেই কম করে চার টাকা বার আনা ব্যয় করতে হত। তারপর কুঠির আদালতে যে যত বেশি টাকা প্রণামী বা 'কোমর ধোলানী' দিতে পারতো জয় তারই হত। দেওয়ান বা নায়েরের পরামর্শ মত বিচারের রায় হত।

প্রিয়নাথের রচনায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের চিত্রও পাওয়া যায়। অস্ত্র শস্ত্র সুসজ্জিত হয়ে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হতো তারা। প্রজারা চাঁদা তুলে মোকদ্দমা লড়তে লাগলো। অবশেষে ঐক্যবদ্ধ প্রজাশক্তির কাছে নীলকররা নতিস্বীকার করলো।

বাংলার নীলকেন্দ্রিক আঞ্চলিক রচয়িতাদের লেখায় নীল প্রসঙ্গ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। শতীশচন্দ্র মিত্র-র 'যশোহর খুলনার' ইতিহাস গ্রন্থে 'নীলচাষ ও নীলবিদ্রোহ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে নীল তৈরীর প্রক্রিয়া, নীলের ব্যবসা ও বাণিজ্য, নীল কনসার্ণ ও নীলকুঠি, নীলকরের অত্যাচার, প্রজাবিদ্রোহ, বিদ্রোহের স্থানীয় নেতৃত্ব ও তাঁদের ভূমিকা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে। যশোহর, খুলানায় নীলের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সতীশচন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায়।

সুধীরকুমার মিত্র 'নীলের চাষ' শিরোনামে 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ'-এ হুগলী জেলার নীলকুঠি ও তাদের পরিচিতি এবং নীলকরের অত্যাচারের নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন। তিনি লিখেছেন— 'বাঁশবেড়িয়া নীলকুঠির অত্যাচার হইতেই দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন নাটকের উপাদান সংগৃহীত হয়।' 'হুগলী জেলার ইতিহাসে' নীলবিষয়ক আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যনির্ভর।

কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনি'তে নদীয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের নীলচাষের তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন। নদীয়ার চাপড়া থানার ভাতছালা গ্রামের বিশ্বনাথ সর্দারের কার্যকলাপের বিবরণ আছে 'নদীয়া কাহিনীতে'। সরকারি নথিতে বিশ্বনাথ ডাকাত

নামে চিহ্নিত ছিল। বিশ্বনাথ ডাকাতির পথ অবলম্বন করেছিল কৃষকদের রক্ষা করার জন্য। বিশ্বনাথ 'ফেডির' কুঠি আক্রমণ করার পর তাকে বন্দীকরা হয়। তার পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন। বিশ্বনাথের মৃত্যুদন্ড ঘোষিত হয়। বিশ্বনাথের প্রকাশ্যে ফাঁসী হয়। কুমুদনাথ লিখেছেন—

'এইভাবে নদীয়া জেলার কৃষক আন্দোলনের বীরনেতা বিশ্বনাথ সহীদ হন। চাপড়া-কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিশ্বনাথের কর্মক্ষেত্র ছিল। বিশ্বনাথের স্মৃতিবিজড়িত 'ডাকাতগাড়ির মাঠ' আজও বর্তমান।'

ড. সৌমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী'র 'নীলকর বিদ্রোহ' গ্রন্থে 'মেসার্স মিডনাপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড'-এর মতো ব্যবসায়ী কুঠিয়ালরা বিলিতি যব আর নীলচাষ উপলক্ষে যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে তার বিবরণ এবং তার পাশাপাশি এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজসাহী, নদীয়া, পাবনা, মুর্শিদাবাদের কৃষকেরা যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে।

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাস জুড়ে নীলকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মোল্লাহাটির বড় সাহেব শিপ্‌টন, ছোটসাহেব ডেভিড, দেওয়ান রাজারাম, আমীন প্রসন্ন চক্রবর্তী উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে দেখা যায়। নীলের দাদন, ভালোজমিতে নীলচাষে বাধ্যকরা, 'শ্যামচাঁদে'র প্রহার প্রজাদের জব্দ করা, চুনের গুদামে বন্দী করা গ্রাম জ্বালানো, খুন ইত্যাদি নীলের যাবতীয় বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নীলকর সাহেবদের বন্ধুত্ব, আইন, দারগা সবই নীলকরদের পক্ষে- এসব প্রসঙ্গত এসেছে উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক ভবানী বন্দোপাধ্যায় নীলকুঠির দেওয়ান রাজারামের তিনবোন তিলু, বিলু ও নীলুর স্বামী। ভবানীর সংসারের চারপাশে আবর্তিত হয় নীলকরদের শাসন শোষণ অত্যাচার অতিষ্ঠ প্রজাবিদ্রোহ। শিপটনের কুঠিতে বিদ্রোহীদের দমন করার আলোচনা চলে, ইছামতীর ধার বেয়ে বিদ্রোহীদের লাঠি, ষড়কি, মশাল নিয়ে এগিয়ে আসা। রাজারামের নেতৃত্বে বিদ্রোহী কৃষকদের মৃত্যু, লাশ গুম করে অবশেষে অত্যাচার আর খুনের প্রতিশোধে রাজারামের হত্যা দিয়ে নীলকাহিনির পর্বের সমাপ্তি হয়।

—এগারো হাজার টাকায় বিক্রি হয় মোল্লাহাটির কুঠি। লালমোহন পাল ও সতীশ সাধুখাঁ কুঠি কিনে নেয়। শিপ্‌টন সাহেব ও রাজারামের যুগ পেরিয়ে লালুপালের মত ব্যবসায়ীদের ভেতর দিয়ে যুগান্তরের ইসারা ফুটে ওঠে উপন্যাসে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'আনটা বাংলা' গল্পে—

'আকাশে নীলের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পায়নি এইসব নিরীহ মানুষ। কিন্তু নীলকুঠির বড় বড় চৌবাচ্চায় দেখেছে গোলা নীলের সমুদ্র, বহু পরিচিত আত্মীয় স্বজনের দেহ দেখেছে নীল 'কালশিরার দাগ'। নীলায় বিচ্ছুরিত আলোকে প্রতিফলিত বুদ্বুদের কেন্দ্র ছিল প্ল্যান্টার্স ক্লাব, জেলার লোক যাকে বলত 'আনটা বাংলা'। নেপাল তারাইয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নীলচাষ, নীলকুঠি, আর তার সাহেবদের প্রমোদনিকেতন

এই প্ল্যান্টার্স ক্লাব বা 'আনটা বাংলা'।'

নীলকরদের প্রতাপের দিনে সমস্ত সরকারি দপ্তর তাদের কথায় উঠতো বসতো। সব সাহেব, কালেক্টার মেম্বার হত প্ল্যান্টার্স ক্লাবের। হর্ণ সাহেব সদস্য পদ না নেওয়ায় তাকে বদলি হতে হয়েছে অন্য জায়গায়। রবিবারে মেমের দল এসে উপস্থিত হত, মদের ফোয়ারা ছুটতো ক্লবের 'বাররুমে'।

সেই বাররুমটিকে নতপন করে ঠিক করে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। ক্লাবের সেক্রেটারী বেঞ্জামিন। ওলটেন রাজমিস্ত্রি গাঁথে, বিরসা ওঁরাও মিস্ত্রিকে ইটেরা যোগান দেয়, আর তার পুত্রবধু গাঁথনীর কাদা গোলে।

বিরসা বেঞ্জামিনের তিনপুরুষের আধিয়াদার- চার বিঘা 'বাটাই' জমির তিনবিঘায় নীলচাষ করে। পাদরীর উপদেশ মেনে সেদিন রবিবার বিরসা আর তার পুত্রবধূ বাংলোর গাঁথুনির কাজে হাজির হয় না।

এই অপরাধে বোগনভিলার কাঁটাওলা ডাল দিয়ে তাকে প্রহার করা হয়। তারপর খান আটেক ইটের বোঝ মাথায় চাপিয়ে রোদে অনড় সূর্যমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার হুকুম জারি করে বেঞ্জামিন। অবশেষে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায় বিরসা। জ্ঞান আর ফেরেনা তার।

সময় পরিবর্তন হয়। ক্লাবের আধিপত্য কমে যায়। নীলকুঠি জমিদারী একে একে বিক্রি হতে থাকে, খরচের আভাবে আনটা বাংলার বাররুম বন্ধ হয়ে যায়। ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ে আনটা বাংলা। দেওয়ালে দাঁড়িয়ে থাকে 'নীলকুঠি যুগের কঙ্কলের মতো'।

আনটা বাংলার ভাঙা দেওয়াল, ইট, কাঠ, পীরমল কিনে নেয়। ট্রাকে করে সমস্ত বয়ে নিয়ে যায় বিরসার নাতি ট্রাক ড্রাইভাব বোটরা। একদিন হাত পড়ল বাররুমের সেই বেদীর ইটটিতে, যে বেদী গাঁথতে গিয়ে তার ঠাকুরদা বিরসা অত্যাচারের বলি হয়েছিল। বেদীর ইট পাতা হল রাস্তায়।

সেদিন বিরসার মৃত্যুদিন। ঠাকুরদার কবরে ফুল দিয়ে এসে রোড রোলার চালাচ্ছিল বোটরা। প্রতিবার বোগনভিলা দেয়, এবার অন্য ফুল। বোটরার অবসন্ন শীতল দেহটা স্টিয়ারিং থেকে ছিটকে গিয়ে মুখ থুবরে পড়ে রাস্তায় পাতা বাররুমের বেদীর সেই ইটের ওপরে।

'আনটা বাংলার ইটের গুঁড়ো উড়িয়া মিশিয়া যায়। সঙ্গে উড়াইয়া লইয়া যায় ইওয়ানো- ডনের যুগের মত এক যুগের স্মৃতি অবশেষ।'

সে স্মৃতি অবশ্যই নীলের নির্মম স্মৃতি।

নীলকাহিনি সাহিত্যের প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে দীর্ঘ দেড়শ বছর ধরে। পাশাপাশি ইতিহাসেরও উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং ভবিষ্যতের লেখক সাহিত্যিকদেরও প্রেরণা দেবে, কারণ—

মুহুর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;

যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমার চেয়ে,
যখন জাগিবে তুমি তখন সে পালাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখন সে
পথ কুক্কুরের মত সঙ্কোচে সন্ত্রাসে যাবে মিশে।'
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অথবা

'Rise like lion after slumber,
In unvanquishable number-
She your chains to earth like dew
Which in sleep has fallen on you
You are many, they are few.'
(P. B. Shelley)

শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসহায় মানুষের যে মহামন্ত্র এই সব কবিতায় তারই বাস্তব প্রতিধ্বনি, নীলবৃত্তান্ত।

তথ্যসূত্র :

১. করিম, মোঃ রেজাউল, যশোহর জেলার নীলচাষ নীলকর সম্পর্ক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০।

২. ঘোষ, তপোবিজয়, নীল আন্দোলন ও হরিশচন্দ্র, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৩।

৩. ঘোষ, অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ, কলকাতা, ২০০৫।

৪. চন্দ, পুলক, নীল বিদ্রোহ, লেখনী প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০।

৪. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা, ২০০৪।

৫. মল্লিক, কুমুদনাথ, নদীয়া কাহিনী, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮।

৬. দাস, পুলিন, নীলবৃত্তান্ত, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

৭. শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ পাবলিসার্স, কলকাতা, ২০০৭।

৮. সান্যাল, শ্রী ভবানী গোপাল, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন, মর্ডান বুক এজেন্সী, করকাতা, ১৯৯৫।

৯. সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গ গোপাল, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩।

১০. হোসেন, মীর মোসারফ, উদাসীন পথিকের মনের কথা, রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৮।

বিংশ শতাব্দীর গুরু তখেলচংবম অমুদোন শর্ম্মারদ্বারা একক মণিপুরী নৃত্য মঞ্চে প্রচার

ড. রিঙ্কি মাহাতো

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর,
গুরু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।।
(https://www.vedicsanatanhinduism.com)[১]

গুরুর মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতার মিলিত রূপ বিরাজমান। গুরু সান্নিধ্যের অর্থ এই সকল দেবতার আশীর্বাদ পাওয়া। বলা যায় মানব জীবনের গঠনের মধ্যে যে পঞ্চপিতা আছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন গুরু। গুরু স্থান আমাদের কাছে দেবতার সমান। মণিপুর রাজ্যে গুরু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। মণিপুর রাজ্যে গুরুরা অভাব-অনটনের মধ্যে থেকেও বংশ পরম্পরায় নৃত্যকে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। আমাদের মত নৃত্যশিল্পীদের প্রাচীণ সংস্কৃতি কিংবা ঐতিহ্যবাহী নৃত্যকলার সাথে পরিচয় ঘটেছে নৃত্য গুরুদের আশীর্বাদে। একজন শিষ্য গড়ে ওঠার পেছনে থাকে গুরুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আশীর্বাদ। গুরুর তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে কোন কিছুই ছাড় পায়না। গুরুর তীক্ষ্ণ নজর শিষ্যদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে দেন, তিনি যেমন দেখান ন্যায়ের পথ, তেমনি দেখান সত্যের পথ। আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আমাদের পিতা মাতা। গুরু কেও সেই পিতা-মাতার ন্যায় সম্মান করা উচিত। গুরুর প্রতি সম্মান ও ভক্তির ফলস্বরূপ একজন শিষ্য সাফল্যের পথে পৌঁছায়। আর তাঁর এই সাফল্যে সবথেকে বেশি খুশি হন গুরু।

মণিপুরের সকল নৃত্য গুরু একান্ত ভাবে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন নৃত্যে। মণিপুর বাসিরা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দিয়ে যেরূপ ভগবানকে পূজিত করেন, সেভাবেই তাঁরা গুরু কেও পূজা করেন। মণিপুর রাজ্যের ঐতিহ্যগত ভাবে গুরু শিষ্য পরম্পরা সাথে যুক্ত। মণিপুর এক অনন্য রাজ্য যেখানে গুরুরা গানে, নৃত্যে বিশেষত রাস, সংকীর্তনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেখানে অসংখ্য শিল্পীরা বাস করেন। সকল শিল্পীরাই গুরুকে দেবতার স্থান দিয়ে থাকে।

মণিপুরী সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মণিপুরী নৃত্য। মণিপুরে সমকালীন নৃত্য

পদ্ধতিটির ১৯৩০ সালে পূর্বে থেকে শুরু হয়েছিল। এই পদ্ধতিটির মূলে ছিলেন মাইস্নাম গুরু অমুবী সিং। সমকালীন শিক্ষা পদ্ধতিটি হল মণিপুরী শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় কঠিন নৃত্যকে ভেঙে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সুষাম্য বজায় রেখে নতুন ভাবে নৃত্য নির্মিত করা।

১৯২১ সালে মহারাজ চূড়াচান্দের রাজত্ব কালে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ কলকাতায় আসেন। রাজা গুরু অমুবী সিংহকে ডেকে বলেন "রাস নৃত্যকে ছোট করে তৈরী করে একটি দল নিয়ে কলকাতায় নৃত্য পরিবেশন করতে যাওয়ার জন্য"। প্রথমে গুরুজী রাজি না হলেও পরে অনেক বিবেচনা করে গুরুজী রাজি হন কলকাতায় যাবার জন্য। গুরুজী তাঁর শিষ্যদের নিয়ে রাস নৃত্যকে ১৫ মিনিটের একটি রাস নৃত্যে রূপ দিলেন এবং কলকাতায় গেলেন প্রিন্স অফ ওয়েলস্ এর সামনে নৃত্য পরিবেশন করতে। ১৫ মিনিটে রাস নৃত্যটি করলেও তাতে কোন ভাবেই গুরুজী রাসের মান বর্জন করেননি তা বজায় রেখেই নৃত্যটি নির্মিত করা হয়েছিল। এটি ছিল প্রথম মণ্ডপ গণ্ডি পেরিয়ে মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শন।

বিংশ শতাব্দীর দিকে তাকালে এটি প্রত্যেকটি মানুষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেছে যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় মণিপুরী নৃত্য এক নতুন মাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছিল এবং মণিপুরের গণ্ডি ছেড়ে বহির্জগতের সাথে পরিচয় ঘটেছিল।

১৯১৯ সালে কবিগুরু সিলেট জেলায় প্রথম মণিপুরী রাসলীলা উপভোগ করেন এবং মণিপুরী নৃত্যের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মায়। শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মণিপুরী নৃত্য প্রশিক্ষণের জন্য তিনি ত্রিপুরা থেকে প্রথমে বুদ্ধিমন্ত সিংহ ও পরে নবকুমার কে আমন্ত্রণ করেন। নৃত্যনাট্য রচনার প্রারম্ভের সময়কালে ১৯২৬ সালে "পূজারিণী" কবিতাটি নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে "নটীর পূজা" হিসাবে। গুরুদের ৬৫ তম জন্মদিনের সন্ধ্যায় মণিপুরী নৃত্য আঙ্গিকে তা পরিবেশিত হয় শান্তিনিকেতনে, কবি স্বয়ং উপালির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, শ্রীমতির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন 'গৌরী দেবী'। গৌরী দেবীর অভিনয়টি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ছিল। শান্তিনিকেতনের প্রবর্তিত নৃত্যধারা মণিপুরী নৃত্য আঙ্গিকে সুচারু রূপে আত্তীকরণের বহমান ধারায় কবির নৃত্য ভাবনা ক্রম উত্তরণের মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছেছিল এক অতীন্দ্রিয় শিল্প লোকে (ড. স. ঘোষ-২০০৯, পৃষ্ঠা- ১১২)[২]। এটি সত্য যে কবিগুরুর প্রচেষ্টায় প্রথম মণিপুরী নৃত্য মণিপুরের বাইরে পা রাখার সুযোগ পেয়েছিল। যার ফল স্বরূপ মণিপুরী নৃত্য যেন কায়ায় ধরা পড়েছিল। কবিগুরু বহু গান রচনা করেছিলেন যেখানে তিনি মণিপুরী নৃত্য ব্যবহার করেছিলেন। কবি গুরু ছাড়াও মণিপুরী নৃত্য একক নৃত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে যেসকল গুরুদের অবদান আছে তাঁরা হলেন-

(১) গুরু মাইস্নাম অমুবী সিংহ

(২) গুরু তখেলচংবম অমুদোন শর্ম্মা

(৩) গুরু হাওবম অতোম্বা সিংহ

এনারা তিনজনেই বিংশ শতাব্দীর গুরু। গুরু মাইস্নাম অমুবী সিংহ যে শুধু মণিপুরী নৃত্য মণ্ডপ গণ্ডি থেকে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন তা নয় একক নৃত্যের ক্ষেত্রেও এনার অবদান অসীম। কর্মক্ষেত্রে বাইরে থাকার দরুন এবং দাদা উদয়শঙ্করের সান্নিধ্যে থাকার জন্য ওনার চিন্তা ভাবনা একটু ভিন্ন ছিল। নৃত্য নির্মাণ তে তিনি তাঁর নতুন পন্থা ব্যবহার করতেন। মণিপুরী একক নৃত্যে গুরুজীর অবদান হেতু গুরু তখেলচংবম অমুদোন শর্ম্মার বিষয়ে সকলের সম্মুখে তুলে ধরার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেছি। এই সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে সামান্য কিছু তথ্য সকলের কাছে পৌঁছাবে আশা করা যায়। যদিও গুরু তখেলচংবম অমুদোন শর্ম্মার মণিপুরী একক নৃত্যে অবদান থাকলেও এই গুরুর সম্পর্কে সেইরূপ কোন লিখিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি।

গুরু তখেলচংবম অমুদোন শর্ম্মা :

মাইস্নাম অমুবী সিংহের সময় কালের একজন গুরু ছিলেন গুরু তখেলচংবম অমুদোন শর্ম্মা। ১৮৮৬ সালে বৃহস্পতিবার ইম্ফলে অবস্থিত ব্রহ্মপুরে ওনার জন্ম হয় (শ্রী.অ.চি.শর্ম্মা-২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৭)[৩]। গুরুজীর পিতা তখেলচংবম খোমদন শর্ম্মা রাসধারী ছিলেন এবং মাতা থোরা দেবী। পুং, বাজনা, নৃত্য, গান তিনি বংশ পরম্পরায় শিখেছিলেন কারন বংশ পরম্পরায় গুরুজীর পরিবার রাসধারি ছিলেন। গোবিন্দজির মন্দিরে রাসধারি হিসাবে গুরুজী ও তাঁর পূর্ব পুরুষরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। গুরু খোমদন শর্ম্মা ও গুরুজীর দাদু কানাই শর্ম্মার কাছে থেকে গুরুজী পুং-নৃত্য-গীত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। কুঞ্জরাস, মহারাস, বসন্ত রাস, গোষ্ঠলীলা, উদুখল লীলা এই সকল বিষয়ে গুরুজীর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। গুরুজী শুধু নৃত্যে নয় পুং এও পারদর্শী ছিলেন। গুরু তখেলচংবম অমুদোন শর্ম্মা গুরু অপোকপা খোমদোন শর্ম্মা, গুরু অরিবম উপাসনা শর্ম্মা ও অমসুং অরিবম প্রশিক্ষিত দেব শর্ম্মার কাছে থেকে পুং শেখেন (শ্রী.অ.চি.শর্ম্মা-২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৮)[৪]। গুরুজী ছোট বেলা থেকেই তাঁর পিতা খোমদোন শর্ম্মার কাছে পুং ও নৃত্য চর্চা শুরু করে ছিলেন। পুং বাজনার পারদর্শী হওয়ায় তিনি নট পালায় 'হনজাবা' উপাধি পেয়েছিলেন। 'হনজাবা' উপাধিটি গোবিন্দজির মন্দির থেকে পুং এ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে এমন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। গোবিন্দজির মন্দিরে অনুষ্ঠিত 'বামন পালা' গুরুজী নিজে পরিচালনা করতেন। 'বামন পালা' কেবল মাত্র ব্রাহ্মণরাই করে থাকেন। গুরুজী ভালো পুং বাজাতে পারতেন, লয়ের ওপর ওনার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তালেও উনি পারদর্শী ছিলেন, ওনার অসামান্য এই পারদর্শিতা দেখে রাজা বোধচন্দ্র তাকে সম্বর্ধনা করেছিলেন-শোনার বালা, খামু চপ্পল, তান চিঙবি মনা (মণিপুরে এক বিশেষ ধরনের কাপড়) দিয়ে। গুরুজী মণিপুরী পুং ও নৃত্যের ক্ষেত্রে এক নিজস্ব নৃত্যশৈলী তৈরী করে ছিলেন (শ্রী.অ.চি.শর্ম্মা-২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৮)[৫]। মণিপুরী নৃত্যে এবং পুং বাদনে

গুরুজী এক বিশেষ দিক দেখিয়ে ছিলেন। গুরু অমুদোন শর্ম্মা একাশিনি দেবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন গুরু অমুদোন শর্ম্মা সংকীর্তনে 'পুংয়ৈবা' ছিলেন। গুরুজী ছোট বেলা থেকেই বাবা খোমদন শর্ম্মার সাথে মণিপুরের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করতেন। গোবিন্দজির মন্দিরের পরম্পরা বজায় রেখে শ্রী মহান সিংহ নান্দৈবম লৈকাইতে ১৯৪৯-১৯৫০ সালে 'মণিপুর কলা ভবন' নামে একটি নৃত্য গীত ও বাদ্যের প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন। সেই প্রতিষ্ঠানে গুরু অমুদোন শর্ম্মা প্রধান গুরু হিসাবে ছিলেন। ১৯৬৩ সালে গুরু সবিতা বেন মেহতা গুরু অমুদোন শর্ম্মাকে মুম্বাই পোরবন্দরে অবস্থিত 'পরিমল অ্যাকাডেমীতে' আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে গুরুজী মুম্বাই গেছিলেন পুং-বাদক হিসাবে সঙ্গে 'রাসবিহারী শর্ম্মা' গেছিলেন। গুরু সবিতা বেন মেহতা গুরুজীর কাছে থেকে মুম্বাইয়ে 'পরিমল অ্যাকাডেমীতে' নৃত্য চর্চা শুরু করেন। মুম্বাই থেকে ফিরে ১৯৫৪ সালে ২০ তারিখে গুরু অমুদোন 'গোবিন্দজি নর্তনালয়ে' প্রধান গুরু হিসাবে যোগদান করেন (শ্রী.অ.চি.শর্ম্মা-২০১৯, পৃষ্ঠা- ২২)[৬]। 'জওহরলাল নেহেরু মণিপুরী ডান্স অ্যাকাডেমী'তে তিনি ভিজিটিং গুরু ছিলেন। 'সঙ্গীত কলা সঙ্গমের' সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন। মণিপুরে মাইস্নাম অমুবী সিং এর প্রতিষ্ঠান 'জগোই মরুপের' সাথেও তিনি কাজ করেছিলেন। গুরুজী তাঁর পুং বাদক হিসাবে 'রাসবিহারী শর্ম্মা' কেই বেছে নিয়েছিলেন।নৃত্যে অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে মণিপুরের চিফ কমিশনার শ্রী রাবল আমর সিংহ ১৯৫০ সালে জানুয়ারি ২৩ তারিখে নৃত্যের উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৩ সালে মহারাজ বোধচন্দ্র সিংহ 'নিত্যাচর্য' শিরোমণি সম্মান দিয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে ফেব্রুয়ারি ২১ তারিখে 'সঙ্গীত নাটক' অ্যাকাডেমী পুরস্কার পান। ১৯৭২ সালে ৩০ শে জুলাই মণিপুর সাহিত্য পরিষদ থেকে 'নৃত্যরত্ন' উপাধি পান। ২৫ শে মার্চ ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি.বি.গীরিজীনা 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ওনাকে ভূষিত করেন। গুরুজীর রচিত রাধা নর্ত্তন তাঞ্চপ-মাত্র-৮

নৃত্যতি রসবতী ধূমকিটি ধাধা
ঘতিন্ত কিটিধা অঙ্গ বিভঙ্গঁ
ঘতিন্ত কিটিধা বঙ্কিম গীত
ধূমকিটি ধা ধা। নৃত্যতি
খিত্র খিত্র খিত্রধা খিত্রধা খিত্রধা
বৃষভানু দুলারী
চালিত পদগতি ঘতিন্ত কিটিধা
শত শত ভানু
নখ সুরিরাজিত পদগতি ধা ধা।।
নাচত চন্দবদনী পঙ্কজ নয়নী
নৃত্যতি চিত্রক টাটা টাথৈ টাথৈ

মোর ঘিঙিঘনী ঘটক নূপুর রুনু ঝুনু বাজে।।
(চালি বিলম্বিত)
বীন পরিবাদিনী চরণে নূপুর ধ্বনি
রতি রসে পুলকিনি জগমোহিনী হায় হায়।। বীন পরি
অলং। নাচে রাধা সুন্দরী কৃষ্ণমনহলাদিনী
মহাভাব স্বরাপিনী
কৃষ্ণ নর্ত্তন নৃত্যের সময় চালির গান-
ব্রজেন্দ্রনন্দল রূপ জগজন অভিলাষ
কাঁচা কাঞ্চণ আদুরেগো চিকন কালা অঙ্গে।
হেরি হেরি প্রাণ নিলেরে।।
বৃন্দাবনের ভাগ্য কে কহিত পারে
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ রেখা চরণেতে লাগ
কি পুন্য বৃন্দাবন ভুমি
ভাগ্যবতী বসুমতী।। ধ্বজ
বঞ্চতি ইহজনম একেলা গোবিন্দদাস
(শ্রী.অ.চি.শর্ম্মা-২০১৯, পৃষ্ঠা- ৫৪-৫৫)[৭]।।

গুরুজী নিজেই গান করে, মুখে মৃদঙ্গের বোল বলে নাচ শেখাতেন। ওনার নৃত্য শেখানোর পদ্ধতি অন্যান্য গুরুদের তুলনায় ভিন্ন ছিল। নৃত্য শেখানোর সময় তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিজেও নৃত্য করতেন। গুরুজীর শিষ্যরা পরবর্তী কালে প্রত্যেকেই খ্যাতি অর্জন করে ছিলেন নৃত্যে। এই মহান গুরুর সান্নিধ্যে যে সকল মণিপুরী নৃত্য গুরুরা পেয়েছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন নিম্নরূপে:

গুরু কলাবতী দেবী তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন— "গুরু অমুদোন শর্ম্মার সঙ্গে নৃত্য চর্চা কালীন দেখেছি উনি নৃত্যের সময় হাতের সাথে সর্বদা চোখের দেখার উপায়, শরীর চালনা ও হাঁটুকে সুন্দর উপায়ে চালনার কথা বলতেন। তিনি বলতেন নৃত্য করার সময় হাঁটুকে সামান্য প্রসারিত করা সব সময় প্রয়োজন তা লাস্যই হোক কিংবা তাণ্ডব।

গোবিন্দজী নর্তনালয়ে থাকাকালীন তিনি বসন্তরাসকে নতুন ভাবে সংযোজন করে ছিলেন। তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন 'গুরু ক্ষেত্রিতোম্বি দেবী'। ওই সময়ের রচিত বসন্তরাস আজও গোবিন্দজী নর্তনালয়ে হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর শিষ্য গুরু বিপিন সিং এর সাথে মিলে 'তানুম তাল' নির্মাণ করেছিলেন। গুরুজী বলতেন "তানুম তাল" পুরোপুরি মনে করতে পারলে একজন নৃত্যশিল্পী সহজেই নৃত্য করতে সক্ষম হবে। এরকম ভাবেই গুরু অমুদোন শর্ম্মা ও বিপিন সিং একত্রিত হয়ে 'তানুম' ও 'ননিচুরী' নৃত্যটি নির্মাণ করেছিলেন। নিজে মৃদঙ্গ বাদক হওয়ার দরুন নতুন নতুন বোল নৃত্যে সংমিশ্রণ করতেই থাকতেন।" (J.N.M.D.A-2019, PP-68)[৮]

দর্শনা ঝাভেরি বলেছেন- "Before Becoming Rasdhari, Agya Amudon Sharma was first a Natpala Guru hence. He had a vast knowledge of Talas, rhythm patterns, Taal prabandhas and dance movements. He has a scientific attitude in teaching and executing dance movements. His demonstrations of neck and eue movements along with the stress of the punglongs (Syllabus of the drum) were very beautiful. His chali hasta and body movements were graceful and unforgetlable.

She, also said that- I remember as Rasdhari, Ayga Amudon Sharma would sometimes borrow and take inspiration from dance movements of Nata Sankirtan and beautifully incorporated in the krishna Tandav dance, especially in the last portion of "Krishna Nartan" in Taal Tanchep or in prastars of Tandav Menkup in pungloi Jagoi. He would play the pung (drum) as we were learning dance.

It is due to the blessing of Sri Sri Govindajee that we could see and learn the nuances of Manipuri Dance from the great Guru Agya Amudon Sharma in Manipur during 50s. We are happy that we are able to continue his Gharana through Guru Bipin Singh." (শ্রী.অ.চি.শর্ম্মা-২০১৯, পৃষ্ঠা- ৬৮)[৯]

গুরু থাম্বালতোম্বি দেবী-"গুরু অমুদোন শর্ম্মার শিষ্য ছিলেন। তিনি বলেছেন- "আমার নৃত্য গুরু ছিলেন অমুদোন শর্ম্মা। তিনি আমার বাবার খুব কাছের বন্ধু ছিলেন। তিনি "শ্রী গোবিন্দ নর্তনালয় নৃত্য কলেজের প্রচারক ছিলেন। আমি ওনার কাছে ছোট বেলা থেকে নৃত্য শিখেছি। বাবার বন্ধু হওয়ার দরুন তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। তিনি আমাকে বাড়িতেও নৃত্য শেখাতেন। গুরু অমুদন শর্ম্মা নৃত্য শেখানোর পদ্ধতি অন্যান্য গুরুদের দিয়ে ভিন্ন। তিনি গান ও মৃদঙ্গের বোল মুখদিয়ে বলে নৃত্য শেখাতেন। গুরুজী যেমন বকতেন তেমনি ভালোও বাসতেন। নৃত্য করার সময় গান করা, নৃত্যের সাথে শরীর চালনা, নৃত্যে চলনের গতি, প্রভৃতি আমি গুরুজীর কাছে থেকেই শিখেছি। গুরুর কাছে থেকে শেখা নৃত্যগুলি যথাক্রমে-

কুঞ্জরাস- গোপী অভিসার, কৃষ্ণ অভিসার, রাধা অভিসার, কৃষ্ণ নর্তন, ভঙ্গী, প্রার্থনা।

মহারাস- প্রার্থনা, কৃষ্ণ অভিসার, রাধা অভিসার, কৃষ্ণ নর্তন, রাধা নর্তন, ভঙ্গী অচৌবা।

বসন্তরাস- গোপী অভিসার, প্রার্থনা, কৃষ্ণ অভিসার, রাধা অভিসার, কৃষ্ণ নর্তন, ভঙ্গী।

এই সকল নৃত্য এখনো গোবিন্দজী নর্তনালয়ে শেখানো হয়।" (J.N.M.D.A-

2019, PP-68)[১০]

গুরু মাইস্নাম অমুবী সিংহের সাথে কাজ করে ছিলেন গুরু তখেলচংবম অমুদোন শর্ম্মা তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে গুরু মাইস্নাম অমুবী সিংহ একক নৃত্য প্রতিষ্ঠার যা স্বপ্ন দেখে ছিলেন তাতে কোন না কোন ভাবে গুরু তখেলচংবম অমুদোন শর্ম্মাও জড়িত ছিলেন। মণিপুরে একক নৃত্যে ওনার দান অবিশাস্তাবি আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। গুরু বিপিন সিং গুরু অমুদোন শর্ম্মার কাছে নৃত্য করতেন ও গুরু বিপিন সিংহ বহু একক নৃত্য নির্মাণ ও প্রচার করেন। গুরুর দ্বারা শিক্ষা পেয়েই তো সম্ভব এক শিষ্যের নতুন ভাবে কিছু নির্মাণ করা, গুরু বিপিন সিং নৃত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে সব সময় গুরুজীর সাথে আলোচনা করতেন। তারা দুজনে মিলে "তানুম ও ননিচুরি" নৃত্য দুটি নির্মাণ করেছিলেন। গুরু বিপিন সিং ঘরানায় এই দুটি নৃত্যই খুবই জনপ্রিয় নৃত্য। সেক্ষেত্রে মণিপুরী একক নৃত্য প্রতিষ্ঠাতে গুরু অমুদোন শর্ম্মার অবদান অসীম। পুং এ পারদর্শী হওয়ায় তিনি তাঁর শিষ্যদের মৃদঙ্গের সাথে দেহ কিভাবে চালিত করতে হবে সে শিক্ষাও দিতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের মৃদঙ্গ শেখাতেন। গুরুজীর শেখানো রাস গুলির মধ্যে-কৃষ্ণ অভিসার, রাধা নর্ত্তন প্রভৃতি একক নৃত্য গুলি ছিল। যদিও এই নৃত্য গুলি কখনোই একক নৃত্য হিসাবে দেখা হয় নি এই নৃত্য গুলি রাসের অন্তর্গত। কিন্তু পরবর্তী কালে এ সকল নৃত্য একক নৃত্য হিসাবে মঞ্চে উপস্থাপনা করা হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে এই মহান গুরুর দেহাবসান হয়"।

এই মহান গুরুর মণিপুরী নৃত্যে অবদান থাকা সত্ত্বেও গুরুজীর সম্বন্ধে সে ভাবে লিখিত কোন পুঁথি ছিল না বললেই চলে। কিন্তু প্রত্যেক মণিপুরী শিল্পী এর গুরুত্ব বুঝেছিলেন তাঁরা সকলেই গুরুজীর জীবনী লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। গুরু দেবযানী চালিহা মাইস্নাম গুরু অমুবী সিংহের সান্নিধ্যে থাকা কালিন গুরুজীর সাক্ষাৎ কার নিয়ে ছিলেন। সেই সাক্ষাৎকার ও গুরুজী শিষ্যদের কাছে তথ্য সংগ্রহ করে মাইস্নাম অমুবী সিং এর একটি জীবনী লেখেন 'গুরু অমুবী সিং' নামে, যেখানে গুরুজীর ছোট থেকে বড় সমস্ত খুঁটি নাটি তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরপরে 'গুরু হাওবম অতোম্বা সিংহ' ও 'গুরু অমুদোন শর্ম্মার' সম্বন্ধেও মণিপুরী ভাষায় পুস্তক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'ত্রিমূর্তি' নামে আর একটি বই হিন্দি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে এই তিনজন গুরুর সম্বন্ধেও লেখা হয়েছে। অধ্যাপিকা ড. শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় 'Manipuri Dance' বইটিতে গুরুজীদের জীবনী আলোচনা করেছেন। মণিপুরেও অনেক জার্নালে গুরুজীদের জীবনী পাওয়া যায়। বহু ছাত্র-ছাত্রী ও গুরুজীদের সম্বন্ধে গবেষণা করছে, আরও কিছু নতুন তথ্য আনার প্রচেষ্টায়। এনাদের সম্বন্ধে যত জানা যায় ততই কম বলে মনে হয়। এই সকল সম্মানীয় গুরুরা দেবতার আসনে বিরাজমান, মণিপুরী নৃত্যে একক নৃত্যের এক নতুন ধারা প্রবর্তন করে মণিপুরী নৃত্যকে এক নতুন স্থান করে দিয়ে ছিলেন গুরুরা। যার ফলে বহু শিল্পী

একক নৃত্য হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করার পথ খুঁজে পাচ্ছে। গুরুজীর দেখা স্বপ্ন কোন ভাবেই বিফল হতে পারেনা। তাই আমার পত্রিকায় এই বিষয় বেছে নেওয়ার মূল কারন এটাই একক নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা, এই পত্রিকার মাধ্যমে আশা করা যায় একক নৃত্য তাঁর একটি নির্দিষ্ট স্থান পাবেই।

তথ্য সূত্র :

১। https://rb.gy/andqjd

২। ঘোষ ড. সুজিত কুমার, মণিপুরী নৃত্যের আলোকে রবীন্দ্র নৃত্যশৈলীর নান্দনিক প্রকাশ ও তার অবকাশ, গবেষক- সঙ্গীত ভবন, বিশ্বভারতী ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১১২।

৩। শর্ম্মা শ্রী অরিবম চিত্রেশ্বর, গুরু তখেলচংবম অমুদোন শর্ম্মা, জওহরলাল নেহেরু ডান্স মণিপুর একাডেমিক ইম্ফল, ২০১৯ এপ্রিল, পৃষ্ঠা: ১৭।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা: ২২।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা: ৫৪-৫৫।

৮। ত্রিমুর্তি, জওহরলাল নেহেরু মণিপুর ডান্স একাডেমিক ইম্ফল, ২০১৯ সেপ্টেম্বর ১৪ই, পৃষ্ঠা: ৭২।

৯। শর্ম্মা শ্রী অরিবম চিত্রেশ্বর, গুরু তখেলচংবম অমুদোন শর্ম্মা, জওহরলাল নেহেরু ডান্স মণিপুর একাডেমিক ইম্ফল, ২০১৯ এপ্রিল, পৃষ্ঠা: ৬৮।

১০। ত্রিমুর্তি, জওহরলাল নেহেরু মণিপুর ডান্স একাডেমিক ইম্ফল, ২০১৯ সেপ্টেম্বর ১৪ই, পৃষ্ঠা: ৬৮।

কবি প্রয়োগ সমূহের সাধুত্ব নিরূপণ

ড. সত্যবতী ব্যানার্জী

ভূমিকা :

আলঙ্কারিক দণ্ডীর মতানুসারে সমগ্র জগৎ ভাষার আলোয় আলোকিত। ভাষা ব্যতীত সমগ্র জগৎ অন্ধকা। সেই ভাষা গঠিত হয় শব্দের দ্বারা। তাই শব্দই হল বাগ্-ব্যবহারের মূল বা কারনস্বরূপ। এখানে একটি বিষয় বলতে হয় যে, শব্দ বলতে একমাত্র সাধুশব্দকেই বোঝানো হয়েছে, অপশব্দ বা অসাধু শব্দকে নয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে - 'একঃ শব্দঃ সম্যগ্-জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি'। স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসার উদয় হয়, কোনগুলি বা কারা সাধুশব্দ, কোনগুলোই বা আসাধুশব্দ। উত্তরে বলা হয়, যে সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন, অর্থাৎ যাদের প্রকৃতি-প্রত্যয় ব্যাকরণসম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়, তারা সাধুশব্দ, এর বিপরীতগুলি অপশব্দ বা অসাধুশব্দ রূপে গণ্য। শাস্ত্রসমালোচকেরা বলেন যে কবিমাঘ একশত, মহাকবিভারতি তিনশথ এবং মহাকবি কালিদাস নাকি সংখ্যাতিরিক্ত অপশব্দের ব্যবহার করেছেন তাঁদের রচনাতে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বুঝতে হবে যে, এইসব কবিদের লেখনীতে সেগুলি সাধারণদৃষ্টিতে অপশব্দ বলে মনেহলেও শাস্ত্রকারেরা, টীকাকারেরা তাঁদের স্বপ্রতিভার দ্বারা সেগুলিকে সাধুশব্দরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন এবং কবিদের অপযশ দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমান নিবন্ধতে কারক অনুসারে শব্দের বিভক্তিনিরূপণ প্রসঙ্গে কয়েকটি শব্দের সাধুত্ব ব্যাখ্যাকারেরা যেভাবে দেখিয়েছেন, সেগুলি ব্যাখ্যাসহকারে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ

মেঘদূত খণ্ডকাব্যের উত্তরমেঘ অংশে চৌষট্টি নম্বর শ্লোকে **'যে তৎ ক্ষীরশ্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ'** - এই অংশে 'দক্ষিনেন' পদে তৃতীয়া বিভক্তিপ্রসঙ্গে **'প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্'**, এই বার্তিক অনুযায়ী তৃতীয়া -অনেকের মতে। কিন্তু টীকাকার মল্লিনাথ এখানে ভিন্ন অভিমত পোষণ করেন - ''**অত্রাপি করণত্বস্য প্রতীয়মানত্বাৎ কর্তৃকরণয়োরেব তৃতীয়া, 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' ইত্যেব সিদ্ধমিতি ভাষ্যকারঃ**''। অর্থাৎ তাঁরমতে করণত্বের বোধ হওয়ায় **'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'** সূত্রানুসারে করণে তৃতীয়াই যুক্তিযুক্ত, এবিষয়ে ভাষ্যকারেরও যে সমর্থন যে আছে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ

মেঘদূতখণ্ডকাব্যের উত্তরমেঘপ্রকরণে ত্রয়োদশসংখ্যক শ্লোকে **'ধনপতিগৃহাদুত্তরেণ'** - ইত্যাদি বাক্যে 'ধনপতিগৃহাৎ' - পদে কেন পঞ্চমি বিভক্তির ব্যবহার করেছেন কবি এবিষয়ে

আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কারণ 'ধনপতিগৃহাৎ' পদটি 'উত্তরেণ' পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় **'এনপা দ্বিতীয়া'** -সূত্রানুসারে এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তিই সঙ্গত হয়। অথবা ষষ্ঠীবিভক্তির প্রাপ্তি আছে। এইপ্রকার স্থলে টীকাকার মল্লিনাথে অভিমতটি উল্লেখযোগ্য **''উত্তরণে - ইতি নৈনপ্ প্রত্যয়ান্তং কিন্তু 'তোরণেন' - ইত্যস্য বিশেষণং তৃতীয়ান্তম্। ধনপতিগৃহাদুত্তরস্যাং দিশি যৎ তোরণং তেনলক্ষিতমিত্যর্থ''** অর্থাৎ যদি 'উত্তরেণ' পদটি এন্প প্রত্যয়ান্ত হোত, তবে তার যোগে 'ধনপতিগৃহাৎ' পদে দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠীবিভক্তির প্রাপ্তি হয়। মহাকবির প্রয়োগটির সাধুত্ব উপপাদনের জন্য যে সমাধান ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথ দিয়েছেন সেটি অবশ্যই সমর্থন যোগ্য। কারণ 'তোরণেন' এক তৃতীয়ান্ত পদটির বিশেষণরূপে পদটি'উত্তরেণ' পদটি যদি ব্যবহার করা হয় তবে, সেটি এন্প না হওয়ায় তার যোগে 'ধনপতিগৃহাৎ' পদে দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাপ্তি না থাকায় পঞ্চমি বিভক্তি প্রয়োগে কোনো বাধা থাকে না।

দুর্ঘটবৃত্তিকার শরণদেবের এপ্রসঙ্গে অভিমত হল - **''উত্তরেণেতি বিভক্তিপ্রতিরূপকো নিপাতঃ। 'প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্' ইতি তৃতীয়া, একমুনিপক্ষে উত্তরেণ পথা গত্বেত্যর্থঃ এবঞ্চ করণে তৃতীয়''** ।

এখানে ব্যাখ্যাকারদের দ্বারা তিনপ্রকার সমাধান উক্ত হয়েছ যেখানে টীকাকার মল্লিনাথের সঙ্গে শরণদেবের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শেষপক্ষে পথ শব্দের অধ্যাহার করে তার বিশেষণরূপে 'উত্তরেণ' পদে **'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'** - সূত্রানুসারে করণে তৃতীয়া ব্যাখ্যাত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ

উত্তরমেঘপ্রকরণে চৌত্রিশ শ্লোকে - **'মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যাতি'** - এই পদ্যাংশে **'তল্যার্থৈরতুলপমাভ্যাং তৃতীয়ান্যতরস্যাম্'** -এই সূত্রানুসারে 'তুলা' শব্দের ব্যবহার থাকায় 'শ্রিয়া' পদে তৃতীয়াবিভক্তির প্রাপ্তি না থাকায় কিভাবে 'শ্রিয়া তুলাম্' - এইপ্রকার তৃতীয়াতৎ পুরুষ সমাস হয়ে 'শ্রীতুলাম্' - পদটির ব্যবহার যোগ্য হয় - এপ্রকার শঙ্কা উপস্থিত হলে তার সমাধান প্রসঙ্গে বলা হয় - উপমাবাচক তুলাশব্দযোগে তৃতীয়াবিভক্তির নিষেধ করা হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের অপযশ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মল্লিনাথের সমাধানসরণীটি হল - **''মীনচলনাৎ চলস্য কুবলয়স্যশ্রিয়া শোভয়া তুলাং সাদৃশ্যম্, ইত্যত্র সদৃশপর্যায়রস্য তুলশব্দস্য প্রতিষেধাদত্র চ সাদৃশ্যবাচিত্বাৎ তদ্ যোগেহপি তৃতীয়া''**। অর্থাৎ **'তুল্যার্থৈরতু.....'** এই সূত্রে সদৃশপর্যায়বাচক তুলা শব্দের গ্রহণ থাকায় তার যোগে তৃতীয়াবিভক্তির নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু শ্লোকে 'শ্রিয়াতুলাম্' এই পদে সাদৃশ্যবাচক তুলা শব্দের গ্রহণ হওয়ায় 'শ্রিয়া' পদে তৃতীয়াবিভক্তি যুক্তিযুক্ত - ব্যাখ্যাকারের অভিমত।

এই প্রকার তৃতীয়বার ব্যবহার নৈষধচরিতে, কুমারসম্ভব মহাকাব্যেও দৃষ্ট হয়। যেখানে মল্লিনাথ 'সহ' শব্দের যোগে তৃতীয়াকে সমর্থন করেছেন।

শিশুপালবধ মহাকাব্যের প্রথমসর্গের চুতর্থ শ্লোকে **'স্ফুটোপমং ভূতিসিতেন শম্ভুনা'** - এখানে উপমা শব্দের যোগে 'শম্ভুনা' পদে তৃতীয়া বিভক্তির সমাধানে মল্লিনাথ একই মত পোষণ করেন।

এবিষয়ে শরণদেবের অভিমত হল - ''**সহবিবক্ষায়াং তৃতীয়া, সূত্রং তু ষষ্ঠ্যর্থং সহভাবাবিবক্ষর্থঞ্চ। শম্ভুনেত্যত্র তু তুল্যার্থস্যাপ্রাধান্যাচ্চ ন প্রতিষেধঃ**''।

চতুর্থতঃ

মহাকবিভারবির কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের পঞ্চমাধ্যায়ের চুতুর্দশ শ্লোকে '**ত্রিপুরদাহং মুহুরনুস্মরয়ন্তম্**' - এই প্রয়োগে '**অধীগর্থদয়েশাং কর্মণি**' সূত্রানুসারে 'ত্রিপুরদাহম্' পদে ষষ্ঠীবিভক্তির প্রাপ্তি থাকায় কেন ষষ্ঠীবিভক্তি হয়নি - এরূপ প্রশ্ন ওঠে। এ প্রসঙ্গে আচার্য মল্লিনাথের সমাধান হল যে, শেষ বিবক্ষাতেই '**অধীগর্থদয়েশাংকর্মণি**' সূত্রদ্বারা কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি বিহিত। উদাহরণে শেষের বিবক্ষা না থাকায় '**কর্মণি দ্বিতীয়া**' - সূত্রানুসরে দ্বিতীয়া বিহিত।

পঞ্চমতঃ

উত্তরমেঘের চৌত্রিশনম্বর শ্লোকে '**আত্মনশ্চোপকর্ত্তুম্**' এই অংশে 'আত্মন্' শব্দে ষষ্ঠীবিভক্তিপ্রসঙ্গে মল্লিনাথের সমাধান হল যে - সম্বন্ধমাত্র বিবক্ষায় ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ দোষাবহ নয়, - ''**আত্মনঃ স্বস্য উপকর্তুঞ্চ পরোপকারণে আত্মনং কৃতার্থয়িতুম্ ইত্যর্থঃ, উপকারক্রিয়াংপ্রতি কর্মত্বেহপি তস্যোপকরতি ইত্যাদিবৎ সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষায়ামাত্মনঃ ইতি ষষ্ঠী ন বিরুদ্ধতে। যথাহ ভারবি - 'সা লক্ষ্মীরুপকুরুতে যথঅ পরেষাম্' - ইতি**''। এইপ্রকার ষষ্ঠীবিভক্তির ব্যবহার কালিদাস ব্যাতীত ভারবি, শ্রীহর্ষ তাঁদর রচনাতেও মেলে।

ষষ্ঠতঃ

ভট্টিকাব্যের তৃতীয়সর্গের পঞ্চম শ্লোকে '**দিশশ্চ বিচিত্রৈঃ পুষ্পৈঃ চকরুঃ**' - এইপ্রকার উদাহরণ পাওয়া যায়। যার অর্থ হল - '**দিক্ষু পুষ্পানি বিচিক্ষিপুরিত্যর্থঃ**'। অর্থানুসারে 'দিশঃ' পদের ষষ্ঠীর স্থলে সপ্তমী, 'পুষ্পৈ' শব্দে তৃতীয়াস্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি সঙ্গত হয়। এখানে মহাকবির অপপ্রয়োগকে সাধুত্বের মর্যাদা দেবার লক্ষ্যে মল্লিনাথের ব্যাখ্যা হল - ''**সর্বশক্তিযোগিত্বাদ্ বৈবক্ষিকী কারকোৎপত্তিঃ, তদুক্তম্ 'অনেকশক্তিযুক্তস্য বিশ্বস্যানেককর্মণঃ সর্বদা সর্বথাভাৎ ক্বচিৎ ক্বচিদ্ বিবক্ষ্যতে' ইতি**''। অর্থাৎ কোনো কারকের ক্ষেত্রে অপাদানাদি সকল কারকের প্রয়োগ দোষাবহ নয়। অতএব সপ্তমীস্থলে ষষ্ঠী, তৃতীয়া স্থানে দ্বিতীয়াও সাধুরূপেই গণ্য হবে।

সপ্তমতঃ

কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের নবমসর্গে তিপান্ন নম্বর শ্লোকে '**যূনঃ কুপ্যতঃ**' এই অংশে প্রশ্নওঠে যে 'যূনঃ' পদে কোন চতুর্থী না হয়ে ষষ্ঠীবিভক্তির ব্যবহার করেছেন কবি ? এবিষয়ে মল্লিনাথের সমাধান হল যে '**ক্রুধদ্রুহ**.........' সূত্রদ্বারা যার প্রতি প্রকৃতপক্ষে কোপ করা হয় সেই ব্যক্তিতে সম্প্রদানে চতুর্থী হয়, এখানে কোপ হচ্ছে লাক্ষণিক বা কৃত্রিম তাই এখানে ষষ্ঠীবিভক্তির ব্যবহার দোষাস্পদ নয়। ''**নাত্র ক্রুদ্ধদ্রুহ ..... কোপঃ ইত্যাদিনাং যূনাং সম্প্রদানে চতুর্থী। তস্য যংপ্রতি কোপঃ ইতি নিয়মাৎ। অত্র কোপস্তবৎ কৃত্রিম ইতি**''।

অষ্টমতঃ

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের দ্বিতীয়সর্গের পঞ্চান্ননম্বর শ্লোকে '**বিষবৃক্ষোহপি সম্বর্দ্ধ্য**

স্বয়ং ছেত্তুমসাপ্রন্তম্' - এখানে বিষবৃক্ষ পদে প্রথমাবিভক্তি বিষয়ে মল্লিনাথ বলেন - ''**অনভিহিতে কর্মণি দ্বিতীয়াভিধানাদত্র 'অসাম্প্রতম্'** ইত্যনেন নিপাতেন অভিহিততত্ত্বাদ্ বৃক্ষ ইতি দ্বিতীয়ান্তো ন ভবতি। যদাহ্ বামনঃ - **'নিপাতেনাপি অভিহিতে কর্মণি ন কর্মবিভক্তিঃ পরিগণনস্য প্রায়িকত্বাৎ'- ইতি''**। এরূপ অন্য কাব্যেও দৃষ্ট হয়।

নবমতঃ

নৈষধচরিত মহাকাব্যে ষষ্ঠসর্গের ছিয়াশিসংখ্যক শ্লোকে 'নলাশামৃতে.....' এই উদাহরণে 'ঋতে' শব্দযোগ পঞ্চমী বিভক্তির প্রাপ্তিতে কেন দ্বিতীয়া বিভক্তির ব্যবহার করেছেন কবি - এবিষয়ে আশঙ্কা ওঠায় মল্লিনাথের সমাধানরীতি হল - **'অন্যারাদিতরর্তে....'** এই নিয়মে 'ঋতে' শব্দযোগ পঞ্চমীবিভক্তির ব্যবহারের নির্দেশ থাকায়, মতান্তরে দ্বিতীয়বার বিধান থাকায় উভয় প্রয়োগই সমর্থনযোগ্য।

দশমতঃ

কুমারসম্ভবম মহাকাব্যে সপ্তমসর্গের একচল্লিশ নম্বর শ্লোকে **'তদ্ দুকুলাদবিদুরমৌলি....'** পদ্যাংশে **'দুকূলাদ্' পদে পঞ্চমীবিভক্তি প্রসঙ্গে মল্লিনাথের দ্বারা ঘোষিত হয় - ''তদ্ দুকূলাদিত্যত্র 'দূরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠ্যাতরস্যাম্' ইতি দূরার্থযোগে বিকল্পেন পঞ্চমী''**। দক্ষিণাবর্তনাথের বক্তব্য হল **'অন্যারাৎ....'** ইত্যত্র **'আরাচ্ছব্দস্যার্থগ্রহণার্থত্বাৎ পঞ্চমীতি তদনাকরম্'।**

মল্লিনাথপূর্ববর্তিটীকাকার দক্ষিনাবর্তনাথের মতে 'আরাৎ' শব্দের অর্থগ্রহণ করে **'অন্যারাদিতরবর্তে....'** এই সূত্র দ্বারা উপরোক্তপ্রয়োগের পঞ্চমীবিভক্তি সমর্থন করেন। যেহেতু আরাৎ শব্দের অর্থ দূর হয় এবং নিকট উভয়ই। মল্লিনাথ এবিষয়ে সহমত পোষণ করেন না। তাঁর মতে **'দূরান্তিকার্থৈঃ....'** এই বিকল্পাত্মক সূত্রটি **'অন্যারাত্.....'** সূত্রের অপবাদ হওয়ায় **'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্'** এই নিয়মে **'দূরান্তিকার্থৈঃ.....'** সূত্র দ্বারা সর্বদাই পঞ্চমীবিভক্তি প্রাপ্তিতে কখনও **'অন্যারাৎ.....'** সূত্রের অবকাশ থাকে।

একাদশতঃ

নৈষধচরিত মহাকাব্যে সপ্তমসর্গের তিয়াত্তরসংখ্যক শ্লোকে **'নর্মদায়া অভিতো দৃশ্যা বাহুলতা মৃণালী'** - এই প্রয়োগে অভিতঃ শব্দযোগে **'অভিতঃ পরিতঃ ....'** বার্তিক দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রাপ্তিতে ষষ্ঠীবিভক্তি প্রসঙ্গে মল্লিনাথ বলেন - 'অভিতঃ' পদের সঙ্গে 'মৃণালী' পদের সাক্ষাৎ অন্বয় হওয়ায় 'নর্মদা' পদের সঙ্গে 'অভিতঃ' পদের সাক্ষাৎ অন্বয় না থাকায় মহাকবির ষষ্ঠীপ্রয়োগ সাধুরূপেই গণ্য **''অত্র নর্মদাবিধেয়প্রাধান্যাদ্ মৃণাল্যাঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধাদ্ 'অভিতঃ' ইত্যাদিনা দ্বিতীয়া নাস্তি।''**

দ্বাদশতঃ

'শিববলস্য ভয়েহপ্যুপস্থিতে' এই শ্লোকাংশটি কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের দ্বাদশসর্গে সাতচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে বর্তমান। এখন প্রশ্ন হল ভয়ের যে হেতু 'শিববল' - পদে কেন ষষ্ঠীবিভক্তিকে প্রয়োগ করেছেন ? **'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ'** - সূত্রানুসারে পঞ্চমীবিভক্তি কেন হয়নি ? এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথের সমাধান হল - এখানে সম্বন্ধমাত্রের বিবক্ষা থাকায়

ষষ্ঠীবিভক্তির ব্যবহার। অন্যথায় **'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ'** - সূত্রানুসারে পঞ্চমী বিভক্তিরই প্রাপ্তি। সম্বন্ধমাত্রের বিবক্ষা থাকায় **'শেষে ষষ্ঠী'** - সূত্রানুসারে ষষ্ঠীবিভক্তি হয়েছে। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে নিয়ম আছে - 'বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি ভবন্তী'তি।

শেষতঃ

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের পঞ্চমসর্গের তৃতীয় শ্লোকে **'মুনিব্রতাৎ নিবারয়ন্তি'** - এই পদে উদাহরণ অপাদানত্ববিষয়ে মল্লিনাথের অভিমতটি হল – **''মুনিব্রতাদিত্যতত্র যদ্যপি মুনিব্রতস্য মেনকায়া অনীপ্সিতত্বাদ্ 'বারণার্থানামীপ্সিতঃ' ইতি ন অপদানত্বং, তথাপি কৃতোদ্যমামিতি মানসপ্রবেশোক্তত্বাদ্ 'ধ্রুবমপায়েহপাদানম্' ইতি অপাদানত্বমেব স্যাৎ; যথা হি ভাষ্যকারঃ ''যচ্চ মিথ্যা সম্প্রাপ্য নিবর্ততেতচ্চ ধ্রুবমপায়েহপাদানমিতি প্রসিদ্ধম্''** ।

এই বক্তব্যের সমর্থন হল - 'মুনিব্রতাদ্' পদের অপাদান সংজ্ঞা হয়েছে **'ধ্রুবমপায়েহপাদানম্'** সূত্র দ্বারা **'বারণার্থানামীপ্সিতঃ'** সূত্রে নয়, যেহেতু অপাদান সংজ্ঞা নিকটে মুনিব্রত অনীপ্সিত। বারণক্রিয়ার কর্তার যদি ইপ্সিত হয়, তবে **'বারণার্থানামীপ্সিতঃ'** সূত্র দ্বারা অপাদান সংজ্ঞা হলে **'অপাদানে পঞ্চমী'** সূত্রে পঞ্চমী হোত। ভাষ্যকারমতে প্রকৃত প্রবেশ বা প্রাপ্তি না থাকলেও সেখান থেকে নিবৃত্তি বোঝালে **'ধ্রুবমপায়েহপাদানম্'** সূত্র দ্বারা অপাদান হতে কোন বাধা নেই। মুনিব্রতের সঙ্গে পার্বতীর মনসংযোগ আছে, মেনকা সেই সম্বন্ধ থেকে পার্বতীকে নিবৃত্ত করতে চাইছেন, তাই **'ধ্রুবম**.....' সূত্র দ্বারা অপাদানত্বের কোন বাধা নেই।

স্রোতস্বিনী নদীর হিত বহমানা সংস্কৃতভাষা কখনও ব্যাকরণের সুত্রের দ্বারা, বার্তিকের দ্বারা নিয়মিত হয়না। ব্যবহারের দ্বারা এবং কালক্রমে অন্যান্য শব্দের অনুপ্রবেশের ফলে সে ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হতে থাকে। ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের সাধুত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র হল ব্যাকরণ। ব্যাকরণ সেই শব্দের স্বরূপকে প্রকাশ করে মাত্র। কথিত আছে **'নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ'** বাগ্-ব্যবহারে তাঁদের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া দেওয়া আছে। বাগ্-ব্যবহারে স্বাধীনতা থাকায় কখনও কখনও মহাকবিদের প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত হয়না। সে কারণেই প্রচলিত উক্তিটি হল - **'রচনাসু মাঘস্য শতং, ভারবেঃ শতত্রয়ং, কালিদাসস্য সংখ্যাতীতানামপশব্দানাং ব্যবহারো দৃশ্যতে।'** এটা ঠিক যে লেখনীতে সেইসব ছন্দোবদ্ধ অপশব্দগুলি তাঁদের জ্ঞানের অভাবে নয় বরং কাব্যের এবং রসের উৎকর্ষ বৃদ্ধির কারণেই সেই প্রয়োগ বলে বুঝতে হবে। শরণদেব, মল্লিনাথ আদি টীকাকারদের বিচারশৈলীতে অপশব্দও সাধুরূপেই ব্যাখ্যাত হয়েছে, সাধুত্ব উপাদানের জন্য কোথাও ব্যাখ্যাকারেরা সূত্রের বা বার্তিকের প্রসিদ্ধ অর্থকে পরিত্যাগ করে পৃথক অর্থের অভিধান করেছেন, কোথাও বা শ্লোকর পদসমূহের অন্বয়ে বৈচিত্র্য আনয়নপূর্বক শব্দের সাধুত্ব রক্ষা করেছেন। এইসব ব্যাখ্যাতৃদের ব্যাখ্যাই কবিদের অপযশ দূর করতে সমর্থ হয়েছে। এই ধরনের প্রয়োগ কেবল কারকেই নয়, অন্য প্রকরণেও উপলব্ধ হয়। প্রবন্ধের কলেবর সংকোচনের জন্য তাদের উদাহরণ দেওয়া হয়নি।

ইতি শিবম্।

শিশুসাহিত্যের অঙ্গনে কথাসাহিত্যিক বাণী বসু : অনন্য প্রতিভার বিচ্ছুরণ

ড. শুদ্ধসত্ত্ব বর্মণ

লেখক বাণী বসুর কথাসাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে 'আনন্দমেলা'তে ছোটদের জন্য লেখার মধ্যে দিয়ে। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যে গল্পটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার নাম 'বজ্রপাতের পরে'। এই গল্পটির নামকরণ করেছিলেন এই পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। লেখক বাণী বসু তাঁর লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন এই কবিকে। 'আনন্দমেলা'র দপ্তরে কবিতা নিয়েই পৌঁছেছিলেন তিনি। কিন্তু, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁকে গল্প রচনায় উৎসাহ দেন। তারই ফলস্বরূপ বেশ কিছু ছোটদের গল্প প্রকাশিত হয় এই সময়ে। এই গল্পগুলি পরে 'ছোটদের গল্প সমগ্র' (২০১০ খ্রি.) নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটদের জন্য রচিত গল্প— 'মোচার ঘণ্ট', 'গঙ্গা থেকে ভলগা', 'উৎসবের দিন', 'পিতূর ভোট দেওয়া', 'আইসক্রিম', 'জগন্নাথের মন্ত্রতন্ত্র', 'জগু ও অ্যালিস', 'জগু যাবে বেড়াতে', 'তাতানের আপাং', 'দেওয়াল বনাম তাতান', 'তাতানদের অ্যাডভেঞ্চার' প্রভৃতি।

ঔপন্যাসিক বাণী বসুর ছোটদের জন্য লেখার মধ্য দিয়ে লেখালেখির জগতে আত্মপ্রকাশ কীভাবে ঘটল, সে সম্বন্ধে জানিয়েছেন 'ছোটদের জন্য লেখা, সেভাবে ভাবিনি, হয়ে গেল। তখন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'আনন্দমেলা'-র সম্পাদক। ...বললেন, ...গল্প লেখো। বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে?...আমার যাইয়েদের বাচ্চারা ছিল। আমার ছেলেমেয়ে— তারাও তখন ছোট। তাদের মনগড়া গল্প অনেক শুনিয়েছি। বললাম সেকথা। উনি বললেন, তবে তুমি পারবে।'[১] এবং এই ভরসাপূর্ণ বাক্য নিশ্চয়ই লেখক হিসেবে বাণী বসুর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ সাহস যুগিয়েছিল। এবং জহুরি রত্ন চিনতে ভুল করেননি। তাই প্রথম দিকে ছোটদের জন্য লেখা গল্প উপন্যাসগুলি তাঁর লেখনীকে শক্তিশালী করেছে। আমাদের মধ্যে গড়পড়তা একটা ধারণা থাকতে পারে যে, শিশুদের জন্য যারা সাহিত্য রচনা করেন, সেই শিশু সাহিত্যিকদের প্রতিভা বা মননশীলতা হয়তো বড়দের জন্য যারা লেখেন তাদের তুলনায় কম। এবং এই ধারণা থেকেই শিশুদের মনোজগৎ ও তাদের ভাবনাগুলো

আমরা খাটো করে দেখি। কিন্তু, শিশুরদেরও আলাদা একটা ভাবনার জগৎ রয়েছে, তাকে ধরতে না পারলে এ ধরনের লেখা কখনও সফল হতে পারে না। শিশু সাহিত্যিক তো আর নিজে শিশু নন। তাই তাঁর শৈশবের স্মৃতি, মনোভাবই তাঁর লেখায় গুরুত্ব পায়। এবং লেখককে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হয় এই ধরনের রচনার বিষয়বস্তু ও তার আঙ্গিকের বিষয়ে।

ছোটদের লেখক ও বড়োদের লেখকের ভাবনার জগতের এই পার্থক্যটি গুরুত্ব দিয়ে লেখক উল্লেখ করেছেন, 'দুটি মনোজগৎ একেবারে আলাদা। একই লোক দুই-ই লিখতে পারেন। তবে তাঁকে এক জগৎ থেকে বেরিয়ে অন্য জগতে প্রবেশ করতে হবে।'[২] আর এই কাজে যাঁরা সফল, তাঁরাই ছোটদের লেখায় তাঁদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায় প্রমুখের নাম করা যেতে পারে।

বাণী বসু ছোটদের জন্য অনেক ছোটগল্প লিখলেও আমরা তাঁর ছোটদের জন্য লিখিত একটি উপন্যাসকে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি। 'অরিন্দম' ও 'দ্বিতীয় পৃথিবী' নামে দুটি উপন্যাস একত্রে 'অপারেশন অরিন্দম' নামে গ্রন্থাকারে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অনতি বৃহৎ এই দুটি উপন্যাস কল্প-বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস। এই দু'টির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ 'অরিন্দম' উপন্যাসটির উপরই এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। 'অরিন্দম' উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র পিতৃমাতৃহীন বালক অরিন্দম। উত্তর প্রদেশের বিজনেস ম্যাগনেট হরকিষণ চোপরার নাতি অরিন্দম। একটি বিমান দুর্ঘটনায় অরিন্দমের বাবা ও মা উভয়েই মারা গেলে এবং ঠাকুরদা হরকিষণের মৃত্যু ঘটলে, বর্তমানে তার অভিভাবক হয়েছেন তার জ্ঞাতি কাকা জগজিৎ এবং তার স্কুলের প্রিন্সিপাল ফাদার জোনাথন। ফাদার জোনাথন হরকিষণ চোপরার অর্থানুকূল্যে মুসৌরীতে একটি কনভেন্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন যা দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। এই স্কুলের ছাত্রদের পরিচয় সম্বন্ধে জানানো হয়েছে, 'সারা ভারতের শিল্পপতি ফরেন সার্ভিসের ডিপ্লোম্যাট, বড় বড় সরকারি চাকুরে, কাজের খাতিরে যাদের যখন তখন পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াতে হয়, তাঁদের ছেলেরাই পড়ে গ্রীন হিল কনজারভেটরিতে। ভ্রাম্যমান বাবা মায়েদের সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত রাখাই স্কুলের মুখ্য উদ্দেশ্য।'[৩] এই স্কুল ছাত্রদের শুধুমাত্র বিদ্যা-শিক্ষাই দেয় না, তার সঙ্গে সঙ্গে নীতিশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এমনকি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের থাকবার স্থানও বদলে বদলে দেওয়া হয়। যেমন একদম প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙ্কে শোওয়ার ব্যবস্থা, একটু বড় হলে ডরমিটরিতে, আর মাধ্যমিক পর্যায় থেকে আলাদা আলাদা ঘর। আসলে এর মধ্য দিয়েও শিশু মনে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা। প্রাথমিক অবস্থায় একসঙ্গে সবাই মিলেমিশে থাকার শিক্ষা আর বড় হলে একা থেকে সেই একাকীত্বকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, তার শিক্ষা— এই ব্যবস্থার মধ্যে দেওয়া হয়।

এরকম সুব্যবস্থিত নিয়মশৃঙ্খলাপূর্ণ একটি স্কুলের ছাত্রাবাস থেকে অরিন্দম হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। ফাদার জোনাথন এই ঘটনায় অত্যন্ত বিমর্ষ, তাঁর এতদিনের বিদ্যালয় জীবনে এ ঘটনা আগে ঘটেনি। তিনি অরিন্দমের তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যদিও তারা অরিন্দমের নীচের ক্লাসে পড়াশুনা করে, সেই সূনৃত, পৃথ্বীশ ও জিত-কে তাদের বন্ধুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এবং তাদেরও খোঁজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর ঘটনাক্রম যেদিকে মোড় নিয়েছে, তাতে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে, যাতে প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে, এটি একটি গোয়েন্দা উপন্যাস। কারণ রহস্য আরও ঘনীভূত হয়, যখন জানা যায় অরিন্দমকে তার কাকা আর বেশি দূর পড়াশুনো না শিখিয়ে তাদের নিজেদের ব্যবসা সামলানোর জন্য, দায়িত্ব নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। এবং সেই সঙ্গে মুসৌরির একটি হোটেলের মালিকের নাতি ছোট্ট মুফদ্দর এবং কলকাতা থেকে আসা তিনটি মেয়ে একে একে অপহৃত হয়। পরে যদিও তিনটি মেয়ের মধ্যে দু'জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান র্যাচেলকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অরিন্দম আর পাঁচজন ছেলের থেকে একটু আলাদা। বিজ্ঞান তার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। সে বড়ো হয়ে বিজ্ঞান গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে চায়। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানমূলক অভিনব ভাবনার পরিচয় তার কাছ থেকে পাওয়া গেছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মনস্তত্ত্বকে জুড়ে দিয়েছে। তার বন্ধু পৃথ্বীশ রঙ্গচারী অরিন্দমের বলা কথাগুলিকে স্মরণ করে, 'ও বলছিল, জৈব-অজৈব যৌগের ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাওয়া আবহাওয়া দূষণ নিয়ে আমরা এত চিন্তিত। কিন্তু মানুষের ইভিল থট্স আরও সূক্ষ্ম উপায়ে এবং আরও ভয়াবহভাবে পৃথিবীর আবহ দূষিত করে চলেছে। এর ফলে জন্মাবে অপূর্ণ শিশু, যে কোনও মুহূর্তে জঘন্য ক্রাইম করে বসবে, খাদ্যের ফুড ভ্যালু কমে যাবে।'[৪]

সমগ্র উপন্যাসটি পাঠে বোঝা যায়, এই ভাবনাটিকেই লেখক কাহিনির মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত লোভই তাদের যাবতীয় কুকর্মের কারণ। অরিন্দম নিজে তার বন্ধুদের জানিয়েছিল সে মানুষের শরীর থেকে নির্গত তরঙ্গগুলি বুঝতে পারে, কোনটা শুভ আর কোনটা অশুভ। এবং এই তরঙ্গগুলোকে পরিমাপের একটি যন্ত্র সে ইতিমধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছিল। সেই অদ্ভুত যন্ত্রটি তার বন্ধুরা পায়। এবং জানা যায় অরিন্দম আদৌ অপহৃত হয়নি, বরং সে বৌদ্ধ লামাদের কাছ থেকে এই তরঙ্গকে আরও ভালো করে বোঝার-জানার জন্য গৃহত্যাগ করেছে। অন্যদিকে মুফদ্দর ও র্যাচেলকে অপহরণ করেছে অরিন্দমের কাকা জগজিৎ। এত প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়েও নিঃসন্তান জগজিতের লোভ তাকে এই অপরাধের জগতে টেনে এনেছে। ছোট্ট মুফিকে অপরাধীরা সুইজারল্যান্ড, সুইডেনের মতো দেশের নিঃসন্তান দম্পতির হাতে তুলে দিতে চায়। বিদেশীরা ফর্সা, সোনালি চুলের কিন্তু রাস্তার ভিখিরি ছেলে চায়। কিন্তু রাস্তার ভিখিরিদের চেহারা অমন না হওয়ার জন্য তারা

এরকম দেখতে বাচ্চাদের চুরি করে। আর যাতে তাদের অপুষ্টিতে ভোগা রাস্তার ভিখিরি বলে মনে হয়, তার জন্য এই শিশুগুলিকে তারা প্রায় না খাইয়ে রাখে। এই নিষ্ঠুরতা হতবাক করে তোলে। আর র্যাচেলের মতো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বড়ো মেয়েদের তারা অপহরণ করে যে কারণে তাও জেনে আমাদের হাড় হিম হয়ে যায়। র্যাচেল উদ্ধার হওয়ার পর জানিয়েছে, 'জানেন খান্না সাহেব, জানেন আলি কাকা, আমার বেলায় ওদের ব্যবস্থা ছিল সামান্য অন্যরকম। আমি তো আর বাচ্চা নই যে, কোনও নিঃসন্তান বিদেশি দম্পতি আমায় দত্তক নেবে! তাই ওরা ঠিক করেছিল, ওদের ব্যবসার আর একটা শাখায় আমায় কাজে লাগাবে। আমার পেট-টেট চিরে পাকস্থলী, ইনটেসটাইন, লিভার ইত্যাদি সব বার করে নিয়ে সে জায়গায় ঠেসে দেবে নিরেট সোনা, কিংবা কোকেন, কোনটা আমি জানি না অবশ্য। নাটকটা হল মার্কিন হিপি মেয়ে ইন্ডিয়া বেড়াতে এসেছিল। সাপ, বাঘ আর বিষাক্ত জলের দেশে বেচারি মারা গেছে স্বাভাবিকভাবে। তাই তার মৃতদেহ তার বাবা মার কাছে আমেরিকায় ফেরত পাঠানো হচ্ছে, এই আর কি!'[৫]

পূর্বেই বলা হয়েছে, কাহিনিটি যেভাবে এগিয়েছে, তাতে এটি গোয়েন্দা উপন্যাস হিসেবে অনেকেই ভাবতে পারেন। কিন্তু, এই উপন্যাসে সেরকম কোনও গোয়েন্দা নেই। সূনৃত, রঙ্গরাজন বা জিত কিংবা দূর্বা, তিস্তা এমনকি র্যাচেল— এরা সবাই চেষ্টা করেছে সমস্যার সমাধান করার। কিন্তু, কারো একক দক্ষতায় নয়, বরং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই বিপদের হাত থেকে সবাই উদ্ধার পেয়েছে। এবং অরিন্দমের সৃষ্ট 'যন্তর-মন্তর' ও অরিন্দম নিজে, যে তৃতীয় চক্ষু তার সাধনার মাধ্যমে পেয়েছে— তা-ই এই বিপদ থেকে সবাইকে উদ্ধার করেছে। জানা গেছে পুলিশ অফিসার মিঃ খান্নাও এই ষড়যন্ত্রে জগজিতের সঙ্গে যুক্ত। তাই অরিন্দম একসঙ্গে এত অশুভ তরঙ্গ সহ্য করতে পারেনি। সে নিজের চিন্তা তরঙ্গের মাধ্যমে ইতিমধ্যে বহু আলোকবর্ষ দূরের একটি গ্রহ জীবুসের সঙ্গে সংযোগ করতে পেরেছিল। আর সেই গ্রহ থেকে উন্নত প্রাণীরা এসে অরিন্দমকে এই দূষণ-গ্রস্ত পৃথিবী থেকে নিয়ে গেছে।

উপন্যাসের মধ্যে কল্পবিজ্ঞানের যে বিষয়টি উঠে এসেছে, তার মধ্য দিয়ে একটা বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমাদের এই পৃথিবীর মানুষের দৈনন্দিন বর্ধিত লোভ-লালসা অশুভ চিন্তাই আমাদের চূড়ান্ত ক্ষতি করছে। আমরা শুধু নিজের আখের গোছানোতেই ব্যস্ত। আর তার জন্য আমরা সবই করতে পারি। সেখানে অরিন্দমের মতো মুষ্টিমেয় ভালো মানুষের সংখ্যা প্রতিদিন কমে যাচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর মানসিক দূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে আমাদের ভেতরকার শুভ সত্তাকে জাগ্রত করার প্রয়োজন। যদিও কোনও উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কোনও বার্তা দেন না, তবু ছোটদের জন্য লেখা এই উপন্যাসে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার পথটি প্রদর্শিত হয়েছে।

কথাসাহিত্যিক বাণী বসু ছোটদের জন্য লেখা এই উপন্যাসগুলিতে শিশু-কিশোরদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিষয় নির্বাচন করেছেন এবং রচনারীতির মধ্যেও সেই

একই মনোভাব বজায় রেখেছেন। এমনিতেই বাণী বসুর তথাকথিত বড়দের লেখাতেও শিশু মন ও মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'গান্ধর্বী'-র পরিশেষ অংশে আমরা জানতে পারি, এই উপন্যাসের কাহিনি অপালার কন্যা সাহানা ও সোহিনীর জবানবন্দি। এই উপন্যাসে অপালার ছেলে রণোর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি নিপুণভাবে বিধৃত হয়েছে। 'শ্বেত পাথরের থালা' উপন্যাসে বন্দনার ছেলে অভিরূপ চরিত্রটিও শিশু চরিত্র হিসেবে মনে দাগ কাটে। আর 'অষ্টম গর্ভ' (১ম খণ্ড) উপন্যাসের কাহিনি বুনবুন-পুনপুন-বুবু— এই তিন শিশুর চোখে দেখা ঘটনার বিবরণ ও বিশ্লেষণ। লেখক বাণী বসুর ছোটবেলার ঘটনাবলী এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। লেখক নিজে তাঁর শৈশব কালকে প্রভূত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরই অন্যতম উপন্যাস 'উজান যাত্রা'-র অন্যতম চরিত্র কস্তূরী মেহ ?তার মুখের কথাই যেন তাঁরই স্বগতোক্তি, '...ছুটবেলাই সব বেলা। ... ছুটবেলাই আমাদের গোড়ে। সোব কিচুর রুটস ছুটবেলায়।'[৬] তাই হয়তো ছোটদের জন্য রচিত সাহিত্যে বাণী বসুর লেখক সত্তায় তাঁর নিজের শৈশবকাল মিশ্রিত হয়ে তাকে সজীব-প্রাণবন্ত-সহজ করে তোলে। তাই ছোটদের জন্য এই কাহিনিগুলি রচিত হলেও এই কাহিনি শুধু তাদেরই উদ্বুদ্ধ করে না, বড়রাও খুঁজে পান চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করার উপাদান।

যদিও ছোটদের লেখার মধ্যে দিয়ে লেখক বাণী বসুর আত্মপ্রকাশ, এবং এই ধরনের লেখায় তাঁর সার্থকতা প্রশ্ন-হীনভাবে স্বীকৃত, তবুও দীর্ঘ দিন তিনি সেভাবে আর ছোটদের জন্য লেখেন না। এর পেছনে একটা কারণ যদি হয় যে সব কচিকাঁচা ছেলে-মেয়ে তাঁর চারিদিকে সেসময় ঘুরে বেড়াত, পরিবারের সেইসব খুদে সদস্যরা কালের অলঙঘনীয় নিয়মে বড় হয়ে গিয়েছে, তাই তাগিদটাও আর তেমন ভেতর থেকে পান না। তবে দ্বিতীয় কারণটা আরও গুরুতর। 'আনন্দমেলা'র সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সরে গেলে নতুন সম্পাদকের কাছে নিজের জন্য তোষামোদি করতে তাঁর মন চায়নি। তাই বাহ্যিক চাপটুকু আর অনুভূত না হওয়াতেও ছোটদের জন্য গল্প যার উৎসমুখে এক সময় বান ডেকেছিল, তা অচিরেই শুকিয়ে গেল। বর্তমানে বাংলা শিশু-সাহিত্যের কী ভয়াবহ সংকট অনুভূত হয় ! আট থেকে বারো অর্থাৎ কৈশোরের ঠিক আগেকার গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমায় ছোটদের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে তাদের জগতটাকে আনন্দে ভরিয়ে দেওয়ার মতো আয়োজন এখন প্রায় নেই। আর একটি প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে চাই। বাণী বসু যখন ছোটোদের জন্য লিখছেন সেই সময়, অর্থাৎ বিগত শতকের আটের দশকে আরও বেশ কিছু অত্যন্ত শক্তিধর লেখকেরও শিশু-কিশোরদের জন্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে অন্যতম সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে এঁরা যে ধরনের লেখা লিখছিলেন, তার বেশির ভাগটাই গোয়েন্দাকাহিনি-নির্ভর। যেমন সমরেশ বসু গোয়েন্দা গোগোল ও গোয়েন্দা অশোক ঠাকুরকে সৃষ্টি করলেন। সমরেশ মজুমদারের সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র অর্জুন।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নিয়ে অনেক লেখা লিখলেন। নারায়ণ সান্যাল গোয়েন্দা গোগোল এর মতো শিশু চরিত্রকে গোয়েন্দা হিসেবে উপস্থিত করলেন, সে হলো শার্লক হেবো। তবে এঁদের মধ্যে পূর্বসূরী অবশ্যই সত্যজিৎ রায়। কারণ তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ফেলুদার প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের সন্দেশ পত্রিকায়। তবে বাণী বসু প্রচলিত এই গোয়েন্দা কাহিনির ছক থেকে সচেতনভাবেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। গোয়েন্দা কাহিনি তিনি লেখেননি ঠিকই, তবে কাহিনির মধ্যে একটা আকর্ষণীয় উৎকণ্ঠা সব সময় অনুভূত হয়েছে যার জন্য কেউ একবার তাঁর লেখা পড়তে শুরু করলে শেষ না করে থামতে পারেন না। পাঠককে দিয়ে পড়িয়ে নেওয়া লেখকের একটি অন্যতম গুণ। এর পেছনে যেটি কাজ করেছে সেটি হল লেখকের গভীর অনুসন্ধিৎসু মন। আমরা যে উপন্যাসটির আলোচনা করেছি তাতেও তাঁর লেখনীর অভিনবত্বের এই পরিচয়টুকু সম্যকভাবেই ধরা পড়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. 'বাণী বসুর সাক্ষাৎকার', তিলোত্তমা মজুমদার, "বইয়ের দেশ", সম্পা. হর্ষ দত্ত, এবিপি প্রা. লি., কলকাতা, পৃপৃ. ১৩২-১৩৩।

২. তদেব, পৃ. ১৩৩।

৩. বাণী বসু, 'অপারেশন অরিন্দম', আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ০৯।

৪. তদেব, পৃ. ১২।

৫. তদেব, পৃ. ৪২।

৬. বাণী বসু, 'নানা রসের ৯ টি উপন্যাস', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩২৫।

স্বপ্ন ও বাস্তবের ফেরিওয়ালা বিভূতিভূষণ

ড. সুজিত কুমার বিশ্বাস

জীবিতাবস্থায় বিভূতিভূষণ রবীন্দ্র পুরস্কার পাননি, খুব বড় কাগজে তাঁর নাম বেরোয়নি, খুব বড় প্রকাশক তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেননি প্রথম দিকে তবু আজ তিনি বিশ্বজোড়া বিস্ময়। দেখতে দেখতে আমরা তাঁর জন্মের একশ পঁচিশ বছর পার হয়ে এলাম। আজও তবু বিভূতিভূষণ আমাদের মাঝখানে সহস্রায়ু হয়ে আনে। সত্যজিৎ তাঁর 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে না আনলেও বিভূতিভূষণ বিভূতিভূষণ হয়েই থাকতেন।

জন্ম ১৮৯৪, ১২ই সেপ্টেম্বর (২৮শে ভাদ্র, ১৩০১ বঙ্গাব্দ) কাঁচড়াপাড়ায় মাতুলালয়ে। পিতা মহানন্দ, মা মৃণালিনী। ওঁরা তিনভাই তিন বোন। বিভূতিভূষণ সকলের চেয়ে বড়। বিভূতিভূষণের পর তাঁর পিতা-মাতার প্রভাব ছিল। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছিলেন। নানারকমের চাকরি করেছেন তিনি। শিক্ষক হিসেবে বিভূতিভূষণের সুনাম হয়েছিল। প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবী, দ্বিতীয়া রমা বা কল্যাণী দেবী। কল্যাণী দেবীর মতে, বিভূতিভূষণ যেমন গৃহস্থ মানুষ ছিলেন, তেমনি ছিলেন স্বপ্নের ফেরীওয়ালা। ৫৬ বছর বয়সে ১৯৫০-এর ১লা নভেম্বর ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণের দেহান্ত হয়।

গবেষক লিখেছেন—

"'বিচিত্রা' অফিসের অন্দরমহলে তখন বিরাট আড্ডার আসর বসেছে। সম্পাদক এসে বললেন— একটু বাইরে আসবেন ? এক ভদ্রমহিলা 'অপরাজিত' পড়ছেন আর অঝোরে কাঁদছেন।"

এই ঘটনা প্রমাণ করে দেয় জীবিতাবস্থায় বিভূতিভূষণ তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার পেয়ে গিয়েছেন। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মত, মোহিতলালের মত, সজনীকান্তের মত, সুনীতিকুমারের মত মানুষেরা ছিলেন বিভূতিভূষণের পৃষ্ঠপোষক। এঁদেরই সম্মিলিত চেষ্টায় 'পথের পাঁচালী' আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিভূতিভূষণের সান্নিধ্যে এসে আচার্য সুনীতিকুমার মনে করেছিলেন— 'বাঙলায় বিভূতিভূষণ তাঁর বিভিন্ন রচনায় যেন ছিলেন আরণ্য-সূক্তের বা ভূমি-সূক্তের দ্রষ্টা দিব্যভাবযুক্ত এ যুগের এক নবীন ঋষি'।[১]

বিভূতিভূষণ যখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আবির্ভূত হলেন তখন রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রের যুগ পার হয়ে গেছেন, পল্লীসমাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন যে শরৎচন্দ্র তিনি রচনা করেছেন 'পথের দাবী', হয়ত 'শেষ প্রশ্ন'-র জন্য তৈরীও হচ্ছেন। অন্যদিকে তখন 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' তৈরী করে দিয়েছে এক অশান্ত কোলাহল। ওঁর ঠিক করে নিয়েছেন সাহিত্যে রবীন্দ্র ব্যবসার দিন শেষ হয়ে গেছে। ফলে আজকের কবিতায়, আজকের

গল্পে রোমান্সের রাজহংস হয়ে থাকা বৃথা। গোর্কি আর ফ্রয়েডকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিলেও কল্লোলীয়েরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন বাংলাদেশের শহরে, বস্তিতে, খনির অপরিচিত অস্পষ্টতায়। 'পথের পাঁচালী' যখন লেখা হল সেই সময় 'বিচিত্রা'য় 'যোগাযোগ' শেষ হয়েছে, 'শেষের কবিতা' শেষ হয়েছে 'প্রবাসী'তে। 'বিচিত্রা'র শূন্যমন্দিরে এলেন বিভূতিভূষণ; এলেন এবং জয় করলেন। কতবড় জয় সেটা ব্যাখ্যার জন্য 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে রবীন্দ্র সমীক্ষা দাখিল করা যেতে পারে —

''পথের পাঁচালীর আখ্যানটাও অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালী যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, নতুন জিনিস ঝাপসা হয়নি, মনে হয় খুব খাঁটি, উঁচু দরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তা দরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে।''[২]

১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যার 'পরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ যখন এই মূল্যায়ণ করছেন ঠিক তার ছ'বছর আগে আমাদের সাহিত্যের সংসারে ফের বিতর্কের শুরু হয়েছিল। সজনীকান্ত দাস জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন নজরুল-নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে। বাণিজ্যিক স্বার্থেই সজনীকান্ত জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যিকদের আক্রমণ করে বললেন, ওঁরা মনে করে

''ভাষাটাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ।''[৩]

নির্মমভাবে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

''আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে-সাজানো বাঁধি বুলি আছে— অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর-একটা লালসার অসংযম।''[৪]

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের আসর জমে ওঠে। বিরোধীরা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করতে দেরী করেন না। অতঃপর বিতর্কের অবসান ঘটানোর জন্য ১৩৪৪ এর চৈত্র মাসের চার ও সাত তারিখে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে সভা হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ নবযুগের সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেন। দু'দিনের আলোচনায় উভয়পক্ষের কথোপকথন থেকে আধনুনিক সাহিত্য সম্পর্কে নানা স্বাস্থ্যকর মন্তব্য বেরিয়ে এল। আর ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস থেকে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে 'শেষের কবিতা'। শেষের কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন আধুনিকতা কাকে বলে।

আমাদের বিভূতিভূষণ, 'নবীন ঋষি বিভূতিভূষণ' এইসব বিতর্ক থেকে শতহাত দূরে ছিলেন। মণীন্দ্রনাথ বসু, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রমুখের ড্রয়িংরুম বিলাস ছেড়ে বিভূতিভূষণ তাঁর পাঠককে নিয়ে গেলেন এক স্বপ্নের দেশে, নিশ্চিন্দিপুরের আম বাগানে।

দূরদেশের অরণ্যে, কাশীর ঐতিহ্যময় গঙ্গার ঘাটে অথবা ইছামতীর কিনারে। বিভূতিভূষণ প্রথম প্রমাণ করলেন বনকল্‌মি, ভাঁটফুল, বৈঁচিঝোপ, আসসেওড়ার ঘন জঙ্গলের মধ্যেই পাওয়া যায় অপরিচিতের ঘ্রাণ। বিভূতিভূষণ শিল্পীর অন্বেষিত বাস্তবতার সীমাকে অনেকদূর প্রসারিত করে দিলেন। বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতাকে অবাধ করে তুললেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করে দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন—

'আমি কোনো বড়ো ঘটনায় বিশ্বাসবান নই দৈনন্দিন ছোটখাটো সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মতো মন্থর বেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চলেছে— আসল নো কৃত্রিম প্লট সাজানো, প্যাঁচকষা, কৃত্রিম জিনিসটা সেখানে। কোনো সিচুয়েশন তৈরি করা– আমি মানি না। নভেল কেন কৃত্রিম হবে ?''

কৃত্রিমতার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বিভূতিভূষণ শান্তরসের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। পাহাড়-পর্বত অরণ্য বা বন্ধুর ভূখণ্ড কোনো কিছুর মধ্যেই তিনি ভীমকান্ত সৌন্দর্যকে দেখেননি। দেখেছেন স্নিগ্ধ-সুন্দরকে।

''রোজ নদীর কালোজলে গিয়ে সন্ধ্যায় নামি কালও কুঠীর মাঠ বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যায় স্নান করতে নামলাম... রাঙা মেঘ করেচে সারা আকাশময়, ওপারের সাঁইবাবলা গাছটার ফাঁকে ফাঁকে রাঙা আলো যেন আটকে আছে।... সাদা-সাদা বক চরচে ঘন সবুজ কচুরিপানার দামে। এ জগতে যেন যুদ্ধ নেই, অশান্তি নেই, চালের দোকানে দীর্ঘ শ্রেণী নেই, উড়ন্ত এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণ নেই।''

('হে অরণ্য কথা কও')

১৯৩০ সালের দেশব্যাপী লবণ আন্দোলনের সময় গোপাল হালদারকে বলেছিলেন— ওসব আমাদের কিছু নয়। আমরা সাহিত্যিক, আমরা জীবনের অনেক গভীরতর দেশকে দেখি। জীবনের এই গভীরতর দেশকে প্রদক্ষিণ করার জন্য বিভূতিভূষণ হয়ে উঠেছেন প্রকৃতির কবি। নিসর্গের মধ্যে তিনি ডুব দিয়েছেন। বিভূতিভূষণের সমগ্র রচনায় আমরা একটা আশ্চর্য তপোবনকে খুঁজে পাই। এবং সেই তপোবনের তিনটে স্তর আছে।

ক। পথের পাঁচালী। এই পর্যায়ে প্রক্যৃতি ও মানুষ যেন পরস্পরের পরিপূরক।

খ। আরণ্যক। এই পর্যায়ে প্রকৃতি মানব নিরপেক্ষ।

গ। দেবযান। এই পর্যায়ে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিচিন্তা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন আধ্যাত্মচিন্তায়।

পরিচিত জগতের মধ্যে বসে অপরিচয়ের নাম উচ্চারণ করতে করতে বিভূতিভূষণ প্রেম ইত্যাদি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাননি। 'বিপিনের সংসার'কে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে নিলে দেখা যাবে বিভূতিভূষণের উপন্যাসের যৌনতা বা অপরাধবোধ স্থান পায়নি। জানতেন দুঃখের নগ্নমূর্তিখানি বড় ভয়ংকর, অশনি সংকেতের সাক্ষী তিনি; জমিদার ধনী, প্রজারা নিরন্ন, হোমলেস্‌, লক্ষ্মীছাড়া। ওরা নানাভাবে শোষিত বলেই 'অপরাজিত'র অপু বই লেখার আগে ভাবে—

''কাদের কথা বইয়ে লেখা থাকিবে ? — কত লোকের কথা। গরীবদের কথা।

ওদের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় না। পথেঘাটে, হাটে, গ্রামে, শহরে, রেলে কত অদ্ভুত ধরনের লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে জীবনে কত সাধু-সন্ন্যাসী, দোকানী, মাস্টার, ভিখারী, গায়ক, পুতোল-নাচওয়ালা, আমপাড়ানি, ফেরিওয়ালা, লেখক, কবি, ছেলেমেয়ে- এদের কথা।''

'আরণ্যক'-এর 'প্রস্তাবনা'তে আছে— 'শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম'। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এই কতরকমের মানুষের ছবি যে আছে তার ইয়ত্তা নেই। বিভূতিভূষণ কৃষকের কথা বলেছেন ('আরণ্যক'), শ্রমিকের কথা বলেছেন ('আদর্শ হিন্দু হোটেল'), শিক্ষকের কথা বলেছেন ('অনুবর্তন')।

তবু বলবো বিভূতিভূষণ তাঁর সময়ের কাছে এক বেমানান শিল্পী। সময়ের তাৎক্ষণিক উত্তেজনা তাকে প্রলুব্ধ করেনি। কোনোরকম রাজনৈতিক বিতর্কে তিনি অংশগ্রহণ করেননি, বিপরীতের জগতে তিনি একা পথ পরিক্রমা করেছেন। আজকের আলোয় এই বিভূতিভূষণকে আমরা আধুনিককালের মহত্তম শিল্পী, ঔপন্যাসিক বলে চিহ্নিত করতে চাই। কারণ বিভূতিভূষণ সাহিত্য সমগ্র এখনও আমাদের কাছে বিস্ময়ের ভাণ্ডার।

তাঁর রচনাবলী:

'পাঁচালী' (১৯২৯), 'অপরাজিত' (১৯৩২), 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরণ্যক' (১৯৩৯), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০), 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'দুইবাড়ি' (১৯৪১), 'অনুবর্তন' (১৯৪২), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'কেদার রাজা' (১৯৪৫), 'ইছামতী' (১৯৫০)।

১৯২৯ থেকে ১৯৫০ এই সময়ের মধ্যে বিভূতিভূষণ একাধিক গল্পগ্রন্থ লিখেছেন, ছোটদের উপন্যাস লিখেছেন, 'আইভ্যান হো'র অনুবাদ করেছেন, লিখেছেন অভিনব বাংলা ব্যাকরণ, ভ্রমণ কাহিনী এবং তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৫৯ সালে বেরিয়েছে উপন্যাস 'অশনিসংকেত'। এছাড়াও আছে 'স্মৃতির রেখা'র মত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কোনো কোনো সমালোচক বলেন বিভূতিভূষণ আজীবন একটি উপন্যাস লিখেছেন 'পথের পাঁচালী'। এই বিতর্কে জড়িয়ে না পড়েও বলা যায় 'পথের পাঁচালী' আধুনিক সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্র। 'পথের পাঁচালী'র মধ্যে সত্যিকারের Rhythm আছে, শ্রী অরবিন্দ যাকে বলেছেন 'Soul of Rhythm'। প্রকৃতি, সমাজ, মানুষ, বিশ্বলোক ও মহাকালের এক বিচিত্র বন্ধন তৈরি করেছেন বিভূতিভূষণ। এই অখণ্ড ভাবনার লব্ধ ফল হিসেবেই এই উপন্যাসের সর্বত্র সারাজীবনের পথ চলার পাঁচালীগান ঝঙ্কৃত হয়েছে। পথের দেবতাই একদিন পথের পাঁচালীর বালক অপুকে বলেছিল— ''মূর্খ বালক, পথ তো তোমার শেষ হয়নি... পথ আমার তখনও ফুরায় না ... চলে...এগিয়েই চলে... অনন্তদিন ধরে... চিরযুগ ধরে।'' নীরদচন্দ্র চৌধুরী 'পথের পাঁচালী' এই নামটাতেই আপত্তি করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল নামটি বড় সেকেলে। বিভূতিভূষণ সে আপত্তি শোনেননি। না শুনে ভালোই করেছেন।

বিভূতিভূষণ এক ব্যাকুল জীবনজিজ্ঞাসার দীপাগ্নিশিখায় তাঁর দৃষ্টিপ্রদীপ জ্বালিয়ে যাত্রা করেছেন বিস্ময়-বিসর্পিত রহস্যময় পৃথিবীতে। যে পৃথিবীতে জীবন মৃত্যুর দ্বারা খণ্ডিত নয়। অন্তহীন ধারাবাহিকতায় চলিষ্ণু। জীবন এক সুদূরাভিসারী পথ। সেই পথে অনাদ্যন্তভাবে

প্রবাহিত হয়ে চলে যে অপরাজেয় জীবন, তাই তো 'অপরাজিত'। 'অপরাজিত' উপন্যাসের অপু বন্দীজীবনের সিংহদ্বার থেকে মেঠো গ্রামের মুক্তির পথে এসে জানলো 'মানুষকে ভালোবেসে আমার লাভ বৈ ক্ষতি হয়নি।' আরো জানলো পথ কী বিষণ্ণ, কী বাস্তব। মনসাপোঁতাতে ষষ্ঠী-মাকাল পূজায় পুরুতগিরি করে জীবন কাটাতে হবে একথা ভেবে অপু অস্বস্তি বোধ করেছে। আর এই অস্বস্তি শেষপর্যন্ত তাকে তাড়না করেছে।

'দৃষ্টিপ্রদীপ' যেন 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'-র সারাংশ। কোনো দিক থেকেই এ বই পূর্বাপরের কাছাকাছি নয়, অথচ দুটি বইয়ের সবটাই এখানে আছে। গ্রন্থের জিতু অপুরই ভাবসম্প্রসারণ।

'আরণ্যক' এর স্রষ্টা বলেন অরণ্য আছে দূরদেশে; সেখানে পতিত পক্ক জাম্বুফলের গন্ধে গোদাবরী তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। 'আরণ্যক' সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের সৃষ্টি। রাজশেখর বসু 'কথাসাহিত্য' (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭) পত্রিকায় বলেছিলেন— 'এ বই পড়লে ঘরে বসেই হাওয়া বদলের কাজ হয়।'[৫] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে— 'ইহা এক অভিনব উপনিষদ' (শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭)।[৬] সত্যচরণের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ রচনা করেছেন 'a novel on forests'। ফরেস্টের উপন্যাস হলেও 'আরণ্যক' মানুষের ইতিহাস সমৃদ্ধ উপন্যাস। আর এই কারণে আজ অন্যভাবে বিভূতিভূষণকে নতুন করে জরিপ করা দরকার। তাই ধাতুরিয়া, রাজু পাঁড়ে, মটুকনাথ পণ্ডিত, কুন্তা, ধাওতাল সাহু, সুরতিয়া, গিরিধারীলাল— এদের একান্ত সাধারণ জীবনযাপনের কথাও অনবদ্যভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে 'আরণ্যক' উপন্যাসে। যে দৈনন্দিন জীবন অরণ্যে হাজার হাজার বছর ধরে সকাল-সন্ধ্যা যাপিত হয়েছে তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার গল্প, তাদের 'বুকের স্পন্দনের ইতিহাস'-ই আরণ্যকের কথাবস্তু। এখানে যেমন অরণ্যের কোনও একটি গাছের পৃথক পূর্ণ ইতিহাস নেই, তেমনই এখানে নানা মানুষের মধ্যে পৃথক কোনও একটি মানুষের ইতিহাস পাওয়া যায় না। প্রকৃতি ও মানুষ মিলেই তাদের পূর্ণতা। তাদের পূর্ণতার ইতিহাসই রচনা করেছেন বিভূতিভূষণ। সমালোচক ঠিকই বলেছেন, আরণ্যক "Lyric in the Frame- work of a novel". সাহিত্যের ইতিহাসে তাই এ উপন্যাস সোনার পাথরবাটি নয়।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' বিভূতিভূষণের বয়স্কমনের এক রূপকথা। হাজারী এ রূপকথার নায়ক। সত্যকে সম্বল করে হাজারী এক গভীরতর আনন্দ লাভ করেছে। বেচু চক্রবর্তীর হোটেলে পদ্ম-ঝি এর মুখনাড়া খেয়েও হাজারী হেরে যায়নি। কন্যা টেঁপিকে সে তুলে দিয়েছে নরেণের হাতে। আর এই সুখের ছবিটি দেখতে দেখতে তাঁর মনে হয়েছিল সে কী স্বপ্ন দেখছে।

'বিপিনের সংসার'এ মনে হয় বিভূতিভূষণ একটু দলছুট হয়েছেন। বিপিনের পারিবারিক বেদনাকে বিশ্লেষণ করতে করতে বিভূতিভূষণ 'compound narration' তৈরী করেছেন। উপন্যাসের শেষে একটা শান্ত পরিণাম যখন রচিত হয় তখন আমরা বুঝতে পারি প্রমথনাথ বিশীর কথাই যথার্থ— 'ঠিক ধূলোকে সোনায় পরিণত করেছেন বিভূতিভূষণ, বাস্তবকে পৌঁছে দিয়েছেন অতি বাস্তবে'।[৭]

'দুই বাড়ি' এক প্রসন্ন মনের সৃষ্টি। গল্পের নায়ক নিধু মোক্তার আদালতের জীবনকে

সে সহ্য করতে পারেননি, সাক্ষীকে মিথ্যে তালিম দেওয়ার অভ্যাস তার অপছন্দ। তবু নিধু বাধ্য হয়ে সেইসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। তার মন কিন্তু পড়ে থাকে কুড়ুলগাছিতে।

'অনুবর্তন'-এ খেলাত মেমরিয়াল ইনস্টিটিউশনের স্মৃতি যেমন আছে তেমনি আছে শিক্ষকজীবনের সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনপূর্ণ ছবি। বিভূতিভূষণ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষক জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন। উপন্যাসের শেষদিকে আছে জীবনকে বৃথা যেতে দেওয়া যায় না।

'দেবযান' অন্যবর্গের উপন্যাস। মৃত্যুর আগে স্বামীকে রমাদেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন— 'দেবযান সত্যি ?' উত্তরে বিভূতিভূষণ সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়েছিলেন। আসলে 'দেবযান' লিখছেন যে বিভূতিভূষণ তিনি 'innocence'এ পৌঁছে গিয়েছিল। ইনিই রচনা করেছিলেন 'কেদার রাজা', 'ইছামতী'— এঁরই সৃষষি 'অশনিসংকেত'ও। লক্ষণীয়, অশনিসংকেত-এর স্রষ্টাও একটা ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলেছেন 'What Man has made of man?' 'অশনিসংকেত' শুধু মন্বন্তরের উপন্যাস নয়, বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসেও মানুষকে খুঁজেছেন। মানুষের মধ্যে অতলশায়ী যে সত্য সেটাই তো বিভূতিভূষণের অন্বেষার বিষয়।

জানি, 'পথের পাঁচালী'র শেষদিকটা নিয়ে সমালোচক মহলে আপত্তি আছে। 'অপরাজিত' উপন্যাসের অপু কেন অপরাজিত তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। নীরেন্দ্রনাথ রায় একদা অভিযোগ করেছিলেন বিভূতিভূষণের দৃষ্টি অগভীর, তাঁর অভিজ্ঞতা স্বল্প, শক্তি ক্ষী, সাফল্য সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। বিভূতিভূষণ আপনমনে 'এপিক কাব্য' লিখে চলেছেন, তাঁর মধ্য আছে অসামান্য বালক সত্তা। তাই ইছামতী'র ভবানী বাঁড়ুয্যে জগতের রহস্যে ডুব দিয়েছেন। অস্তায়মান সূর্যকে তাঁর মনে হয়েছে রহস্যের অংশ।

বিভূতিভূষণ সম্পর্কে যে অভিযোগই থাকুক না কেন আজ আমরা তাঁর সাহিত্যসমগ্রের নিবিড় পাঠ নিতে জেনেছি, সস্তা রাংতার সাজ ব্যবহার করে তিনি মানুষের মন ভোলাননি। মানুষের ইতিহাসকে, কঠিন বাস্তবকে জানতেন, চিনতেন। প্রমাণ 'আরণ্যক', প্রমাণ 'অনুবর্তন', 'অশনিসংকেত'।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে জৌলুস নেই। আছে হৃদয়ের অকপট অনুভূতির প্রকাশ। এরই হাত ধরে তিনি বরাবর চলেছেন। মানুষের মর্মান্তিক দারিদ্র্যকে তিনি যেমন চিনেছেন, তেমনি আমাদের চিনিয়েছেন। উপন্যাসের বাস্তবতাকে বৃহত্তর ও মহত্তর করেছেন। সে বাস্তবতা বাইরে স্ফীত হয়নি। ভিতর থেকে বড় হয়ে উঠেছে। তাই 'পথের পাঁচালী'র অপু বলেছে— 'তোকে আমি ভুলিনি দিদি'। নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাবার সময় অপু যখন দিদির চুরি করা সোনার কৌটোটা ফেলে দিয়ে যায় জঙ্গলে তখন আমরা বুঝতে পারি কিশোরের গভীর গোপন কথাটি, কিশোরীর চুরি করার বৃত্তান্তটি একইসঙ্গে বুকে লালন করেছেন বিভূতিভূষণ।

''তার মনে হইল সে দীন নয়, দুঃখী নয়, তুচ্ছ নয় ওটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়। সে জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মা... এই বিপুল নীল আকাশ, অগোণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ... এই শত, সহস্র শতাব্দী তার পায়ে চলার পথ...।''

('অপরাজিত')

বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত'এর অপুকেই শুধু নয়, জিতুকে, হাজারী ঠাকুরকে, যতীনকে পথের পথিক করে তুলেছেন। আর এই গতিশীলতা দিয়েই তিনি দেশকালের প্রসারিত অনুভবকে উপন্যাসের পাতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। যে শিল্পী কথাসাহিত্যে অনুভবের ব্যাপ্তি ঘটান, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যান প্রাত্যহিকীকে তাঁকে 'পলাতক' বা 'Escepist' বলতে আমাদের রুচিতে বাঁধে। শতায়ু বিভূতিভূষণ নিশ্চয়ই, ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর পাঠকের কাছে তিনিই তো সহস্রায়ু। সন্তোষকুমার ঘোষ যথার্থই বলেছেন— ''জগতে যত প্রাণ উদ্ভিজ্জ এবং স্থানু, যত প্রাণ সঞ্চরণশীল এবং সরব, তাদের সমবেত সঙ্গীত শুনিয়েছেন তিনি। অস্থির অথচ সরল, স্থিত কিন্তু সন্ধানী, এমন কোনও শিল্পীর নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে যদি থাকে, তবে তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।''[৮]

তথ্যসূত্র :

১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গ-ভারতী-সঙ্গীতি, ''বনশ্রী-রাগ'' ও বিভূতি বন্দ্য', বিভূতি রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিচয় পত্রিকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য নবত্ব' : আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যে নবত্ব' : আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ

৫। রাজশেখর বসু, 'কথাসাহিত্য' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

৬। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

৭। প্রমথনাথ বিশী, ভূমিকা, বিভূতি রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

৮। সন্তোষকুমার ঘোষ, 'পথের পাঁচালীর বিভূতিভূষণ', 'কথাসাহিত্য', ৪১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৯।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘সত্যাসত্য’: সময়ের অভিজ্ঞান

ড. রথীনকুমার পাল

অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন এবং সমস্ত শাখাই তাঁর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর সাহিত্যচেতনা গড়ে উঠেছিল ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে। প্রাচ্য সাহিত্যের ঐতিহ্য ও ইউরোপীয় সাহিত্যের নবজাগরণের চেতনা, তাঁর দৃষ্টিতে এই দুই ধারার অনবদ্য সমন্বয় ঘটেছে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্কররের ছিল অফুরন্ত জিজ্ঞাসা ও কৌতুহল। তিনি ছিলেন সমাজ সচেতন, ছিলেন সময় সচেতন। তাঁর সাহিত্যে যে সমাজের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়েছে সেই সমাজ সময়ের চিহ্নকে বহন করে। অন্নদাশঙ্কর ত্রিশের দশকের কথাকার। আমরা যারা বংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত তারা সকলেই জানি এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে একটা পালাবদল শুরু হয়েছিল। সেটা কাব্য-কবিতা, গল্প-উপন্যাস বেশি করে ধরা পড়ছিল। এই ত্রিশের দশকেই অন্নদাশঙ্করা রায় কথাসাহিত্যিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন। বাংলা কথাসাহিত্যে যে বুদ্ধিপ্রধান মননশীল উপন্যাসের ধারা, সেই ধারাতেই তিনি একজন সফল কথাকার হয়ে উঠলেন। অথচ তাঁর নিজের কথায় তিনি কবি হতেই চেয়েছিলেন, ঔপন্যাসিক নয়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের রনচাবলী ২য় খন্ডে জানিয়েছেন, ‘‘আমি কবি হতেই চেয়েছিলুম, ঔপন্যাসিক হতে চাইনি। তার জন্য কোনো প্রস্তুতিই ছিল না। ইউরোপ প্রবাসের সময় পাশ্চাত্য তথা আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল থেকে বিশ্বব্যাপার নিরীক্ষণ করে আমার মনে যে আলোড়ন ঘটে তার একটা রেকর্ড রাখার কথা মাথায় আসে। কবিতা তার মাধ্যম হতে পারে না, যদি না মহাকাব্যে হাত দিই। এ যুগে মহাকাব্যের স্থান নিয়েছে উপন্যাস।’’[১] তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় ভ্রমণকাহিনি ‘পথে প্রবাসে’র পর উপন্যাস লেখার কাজে নিয়োজিত হলেন। তাঁর আদর্শ হল রম্যা রলাঁর ‘জাঁ ক্রিস্তফ’ ও টমাস মানের ‘ম্যাজিক মাউন্টেন’। লেখক যেহেতু বেশকিছু কাল ইংল্যণ্ডে কাটিয়েছিলেন, ইউরোপকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তাই দেশে ফিরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা বিশ্লেষণী পরিচয়কে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই পরিচয়ই লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর ‘সত্যাসত্য’ (১৯৩২-১৯৪২) উপন্যাসে।

অন্নদাশঙ্কর যে ‘সত্যাসত্য’ উপন্যাস রচনা করেন তার কয়েকবছর পূর্বেই পৃথিবীতে একটা মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে। সমগ্র ইউরোপ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অতিমাত্রায়

ভোগলিপ্সার পরিণতি মানুষ দেখল। আধুনিক সামরিক শক্তিতে বলীয়ান দেশগুলোর ক্ষমতার উন্মত্ততা পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তারা অস্তিত্বহীনতার আশঙ্কায় বিচলিত। অথচ ইউরোপের উত্তাপ তখনো কমেনি। তলে তলে আরও একটা বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি, দেশে দেশে দেখা দিচ্ছে ডিক্টেটরশিপ। পরাধীন দেশ হিসেবে ভারত দূর থেকে হলেও এর পরোক্ষ ফলভোগী। অন্যদিকে ভারত তখন উত্তাল, পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির মন্ত্রে ভারতবাসী উদ্বেল। গান্ধিজির নেতৃত্বে একের পর এক আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানে মেরুকরণ তৈরি হল। এইরকম একটা প্রেক্ষাপটে অন্নদাশঙ্কর তাঁর 'সত্যাসত্য' উপন্যাসটি রচনা করলেন। মধ্যবিত্ত ছাপোষা বাঙালির ক্ষুদ্র জীবনকেন্দ্র থেকে একটা বৃহত্তর পরিসরে নিজেদের দেখে নেওয়ার অবকাশ তৈরি হল। এর আগে এমন আন্তর্জাতিক যোগ বাঙালির জীবনে তেমনভাবে ঘটেনি। এই সময়েরই ফসল 'সত্যাসত্য'। এ এক জীবনবীক্ষা, সত্যকে জানার অকুণ্ঠ প্রয়াস। বিভিন্ন চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন পথে এই সত্যের অনুসন্ধান করেছে।

একদিক থেকে উপন্যাসটি 'Novel of ideas', বিশেষ একটি ভাব বা আইডিয়ার প্রকাশ। এই উপন্যাস সম্পর্কে লেখক তাঁর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে বলেছেন, ''বিশ্বব্যাপারের সর্বত্র যে দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তি সর্বদা সক্রিয় রয়েছে প্রাচীনরা তাদের দেবাসুর আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশান্তরে তারাই God এবং Satan; তদের নিয়ে প্যারাডাইস লস্ট রচিত হয়েছে। আধুনিক মন ওসব নাম পছন্দ করে না, তাই তাদের বলে সত্যাসত্য।''[২] কিন্তু সেখানে দেশকালের পরিচয় আছে; কাহিনি বয়ন ও চরিত্র নির্মাণেও বাস্তবতা আছে, ফলে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। এই উপন্যাসে যে সময়ের কথা আছে তা বিশ শতকের বিশের দশক। ৬খণ্ড বিশিষ্ট 'সত্যাসত্য'উপন্যাসের ১ম খণ্ড 'যার যেথা দেশ' থেকে জানা যায় দুই বন্ধু বাদল ও সুধী যখন ইংল্যাণ্ডে যায় সেই সময়টা ছিল ১৯২৮ সালের গোড়ার দিক। আর উপন্যাসের সমাপ্তি বাদলের মৃত্যুতে - সেটা ১৯২৯ সালের শরৎকাল। মোটামুটিভাবে এই দুই বছরের সময়সীমার মধ্যে উপন্যাসের ঘটনাধারা আবর্তিত-বিবর্তিত হয়েছে।

'সত্যাসত্য' উপন্যাসটি রচনা করতে গিয়ে লেখক এর কাহিনিকে একটি মহাকাব্যিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যদিও একে তিনি epic novel বলতে চাননি। টলস্টয়ের মতোই জীবনকে একটু বড়ো ক্যানভাসে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। 'সত্যাসত্য', 'রত্ন ও শ্রীমতী' ও 'ক্রান্তদর্শী' এই বৃহদায়তনের উপন্যাসগুলি দেখে অন্তত সেটাই বোঝা যায়। 'সত্যাসত্য' উপন্যাসটি রচনা করতে অন্নদাশঙ্কর সময় নিয়েছেন বারো বছর। অবশ্য এই বারো বছরে লেখকের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারায় একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ এই সময়পর্বে উঠে এসেছে। এখানে বহু মানুষের ভিড়। বিচিত্র তাদের জীবনজিজ্ঞাসা। তারা সত্যসন্ধানী। উপন্যাসের বাদল, সুধী ও উজ্জয়িনী সকলেই নিজের কালে দাঁড়িয়ে নিজের মতো করে সত্যের কাছে পৌঁছতে চেয়েছে। সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে তাদের বিশ্বদর্শন লাভ হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে সত্যের পরিচয় পেয়েছে বলে মনে হয় না।

অন্নদাশঙ্কর রায় সমকালীন বিশ্বরাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ

ওয়াকিবহালল ছিলেন। জাতীয় রাজনীতির পটভূমিটি সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কর্মজীবনে প্রথম পর্যায়ে তিনি শাসন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলে তাঁকে কিছুটা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলতে হয়েছে। দেশ পরাধীন, তিনি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে। এজন্য তাঁর অন্তর্বেদনা ছিল, ছিল মানসিক যন্ত্রণা। তাঁর সাহিত্যে সেই পরিচয় আছে। লেখক নিজেই জানিয়েছেন তাঁর রাজনীতির যন্ত্রণা। তাঁর সাহিত্যে সেই পরিচয় আছে। লেখক নিজেই জানিয়েছেন তাঁর রাজনীতির পাট ছেলেবেলা থেকেই। ধীমান দাশগুপ্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার তিনি বলেছিলেন, ''নানা বিষয়ে আগ্রহ আমার ছেলেবেলা থেকে। ছেলেবেলা থেকে আমি সংবাদপত্রের মনোযোগী পাঠক। দেশ-বিদেশের খবরের সঙ্গে আমি সবসময় তাল রেখে চলতে চাই। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চাই। ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি - নানা বিষয়ের বই প্রথমে আমাকে পড়তে হয়েছিল সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতায় নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য, পরে সে সব আমি পড়ি পাঠের বিচিত্র আনন্দের জন্য।''[৩] 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে লেখকের ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতি - সচেতনতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে।

বাদল ও সুধী বিশ শতকের ভারতীয় যুবক। তাদের চিন্তা-ভাবনার, কাজ-কর্মে ও নানবিধ প্রবণতায় বিশ্বমুখীনতা লক্ষ করা যায়। বাদল সুধীরা সময়ের সৃষ্টি। রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, এক ব্যাপক চর্চা, নানাপ্রকার মতবাদ উপন্যাসটির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর পেতে এরা জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করেছে। মূলত মানুষের মঙ্গল কীসে সেটারই অনুসন্ধান তারা করেছে। তার জীবনে সত্য ও সুন্দরের অন্বেষণে রত। সুধী'র মানসিক গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে এসে গেছেন গান্ধিজি। ১৯২০ সালে সুধী যখন দশম শ্রেণির ছাত্র সেই সময় গান্ধিজির ভারতকে স্বরাজ করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে স্বরাজ আশ্রমে ভর্তি হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতো সুধী ও তার সতীর্থ রতন ভারতবর্ষের গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছে। গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভবন করে তারা। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি। তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সুধী কৌশলে পুলিশের খপ্পর থেকে খালাস পেলেও রতনের জেল হয়ে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সুধী পিতৃবন্ধু মহিমচন্দ্র সেনের বাড়িতে থেকে বি.এ. পাশ করে। পরে ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দেয়। মূলত দেশ পুনর্গঠনের কাজে নিজেকে যুক্ত করা, দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধনই তার জীবনের একমাত্র ব্রত। সেই লক্ষ্যেই বিলেতে যাওয়া। দূর থেকে দেশকে দেখা, মুক্তিদৃষ্টি নিয়ে দেশের কাজের প্রস্তুতি নেওয়াই সুধী'র লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনীতির সামগ্রিক পরিচয় 'সত্যাসত্য' উপন্যাস থেকে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় দেশগুলিতে ক্ষমতার প্রতিযোগীতা বিশ্বরাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এই পটভূমিতেই রাশিয়াতে নতুন দিনের অভ্যুদয় হয়। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাওয়ার ফলে রাশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। শ্রমিক, কৃষক মেহনতি মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদ, সোশ্যালিজম

শব্দবন্ধগুলি রাশিয়ার সমাজজীবনের সঙ্গে, তাদের রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে যে বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব হয় তারা এই সোশ্যালিজমের জুজুতে তখন তটস্থ। স্বাভাবিক ভাবেই বাদল তারাপদ কুণ্ডুর কমিউনিস্ট দলে যোগ দিয়েছে। একটা মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে। তার বিভীষিকা মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কেন করে যুদ্ধ ও বিপ্লব ছাড়াই এর ফল ভোগ করা যায় বাদল সে কথায় চিন্তা করে। কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি থাকলেও কমিউনিজমে তার আস্থা ছিল। সুধীকে উদ্দেশ্য করে সে বলেছিল, ''কমিউনিজম আমাদের শেষ আশা। এ স্বপ্ন যেদিন চূর্ণ হবে সেদিন মানুষ হবে স্বপ্নহীন, আশাহীন, ধৈর্যহীন, হৃদয়হীন, মনুষ্যত্বহীন। ইতিহাসের সেই হচ্ছে শেষ অধ্যায়।''[৪] কিন্তু বাদল শেষপর্যন্ত কমিউনিজমে আস্থা হারিয়েছে, শ্রেণিসংগ্রামের পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে।

ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য যে ক্রমশ ক্ষীয়মান, একথা কলিন্সের মতো সে দেশের অনেক নব্য যুবকই মনে করে। পৃথিবীতে বৃহৎ শক্তির তকমা সে যে হারাতে বসেছে এ নিয়েও সংশয়ের অবকাশ নেই। কলিন্স বিশ্বাস করে পলিটিক্সই ইংল্যাণ্ডের সর্বনাশের কারণ, এতে ওদেশের মঙ্গল হওয়ার নয়। বরং বড়ো ইকনমিস্ট, বড়ো বৈজ্ঞানিক ও বড়ো বিজনেস আইডিয়ালিস্ট সমবেতনভাবে ইংলণ্ডকে রক্ষা করতে পারে বলে তার ধারণা। যুদ্ধ্ পরবর্তী ইলংণ্ড সংকটের মুখোমুখি। কেউ কেউ অভিমত দেয়, ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, একে একে তার সকল দেউটি নিবতে শুরু করেছে। পঞ্চাশ বছর পরে এদেশে হয়তো একটা দ্বিতীয় শ্রেণির শক্তিতে পরিণত হবে। আমেরিকা ও রাশিয়া ক্রমে সেই জায়গায় উঠে আসবে। বাস্তবে এটাই হয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষীকাময় রূপ সমগ্র ইউরোপকে ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দেখা দিয়েছে মানুষের অস্তিত্বের সংকট। আর্থার, সুধী, মিস মেলবোর্ন হোয়াইট এঈ মহাযুদ্ধের ভয়ংকর পরিণাম এবং স্থায়ী যুদ্ধবিরতি যে অসম্ভব সেই তর্কে সামিল হয়েছে। অন্নদাশঙ্কর গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উপন্যাসের সমকালীন বুদ্ধির সঙ্কটকে অনুভব করেছেন। বাদল চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সেই সঙ্কটাপন্ন মানুষের চালচিত্র অঙ্কন করেছেন। এই প্রসঙ্গে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতটি উল্লেখ রকা যেতে পারে, ''ম্যাজিক মাউন্টেনের লেখক বুঝেছিলেন যে, যুদ্ধপূর্ব ইউরোপ রোগজীর্ণ। যুদ্ধ এল আর ঘনিয়ে এল সঙ্কট তা নয়। নান খাত ধরে সঙ্কটের স্রোত এসেছে বলেই যুদ্ধ।জোয়াকিম যেমন নিজের সমস্ত রুগ্ন শারীরিতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে সাহসী সৈনিকের মতো, হান্স কাস্টর্প এরে শেষতম পরিণতিতেও হয়তো তারই ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। আমাদের বাদল দেখেছিল যুদ্ধদীর্ণ ইউরোপকে।''[৫] বাদলের সঙ্গে ওয়েলির কথোপকথনেও এই যুদ্ধদীর্ণ ইউরোপের হতাশ্বাস শুনতে পাই। সর্ববিস্তারে শূন্যতা তার করাল ছায়া বিস্তার করছে ভবিষ্যতের পথে। মারউডের স্মৃতিতেও ভেসে ওঠে প্রথম মহাযুদ্ধের বীভৎস দিনগুলি।

'সত্যাসত্য' উপন্যাদে দেখা যায় সুধী একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, তার প্রাজ্ঞ প্রদিপ্ত বৌদ্ধিক

প্রত্যয় আমাদের সচকিত করে। তার ইল্যাণ্ড বাস তাকে দেশকে বুঝতে শিখিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশ থেকে ভারতবর্ষকে দেখলেই তাকে পুরোপুরি চেনা যায। সে উপলব্ধি করেছে ভারতের শক্তি নিহিত আছেঅন্ত্যজশ্রেণির মানুষের চরিত্রমাহাত্ম্যে। তাকেই করতে হবে ইতর-ভদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধন। তা নাহলে গ্রাম্য সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব নয়। সুধী'র উদ্দেশ্যই ছিল মুক্তদৃষ্টিতে দূর থেকে দেশকে দেখা। নতুন দেশ ও জাতি গঠনে তার মুক্তিদৃষ্টি সহায়ক হবে। ভারতের পুনর্গঠনের ভাবনা যেমন তার আছে বিশ্বের ভাবনা। যুদ্ধদীর্ণ ইউরোপের শান্তিবাদী বৈঠকে সুধী ও কয়েকজন ইউরোপীয় সমবেত হয়েছেন। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল তারই প্রতিক্রিয়ায় এই শান্তিবাদী আলোচনা। এই বৈঠকের সকল সদস্যই যুদ্ধ, যুদ্ধের উপকরণ, যুদ্ধকৌশল এবং যুদ্ধ এড়িয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উপায় অন্বেষণ বা শান্তির প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেছেন।

বিশ শতকের ইংল্যাণ্ড তথা ইউরোপের সমাজজীবনে পারিবারিক জীবনের গড়নও দিন দিন বদলে যেতে থাকে। পারিবারিক গড়ন ক্রমে পরিবারকে অতিক্রম করতে চাই। এভাবে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি সংক্ষিপ্ত হতে হতে বিলুপ্ত হওয়ার পথে। কয়েক হাজার বা কয়েক শ' বছর পরে কোনো চিহ্ন থকবে কিনা এ নিয়ে গভীর সংশয় আছে। বহু ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী একত্রে কাটাতে পারে না. মাঝে মাঝে দেখা হয়। হয়তো সন্তানাদিও আছে কিন্তু সন্তানকে স্কুলে দিয়েও দায়িত্ব শেষ। তাই ইউরোপের একজন পুরুষের একজন স্ত্রী নামমাত্র। কেউ কারও স্বামী - স্ত্রী নয়, অন্তত দৈনন্দিন জীবনে নয়। ইউরোপের এই জীবনচিত্র, সেখানকার সমাজ-পরিবারের গড়ন যে সমকালের জীবন-আশ্রয়ী সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'সত্যাসত্য' উপন্যাসের আখ্যান এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের বিশাল ব্যস্ত পটভূমির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। এই উপন্যাস সমাজের সব স্তরের মানুষ ও মতবাদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ও তাদের বিচিত্র জীবন-ভাবনা আলেখ্য সুমুদ্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। উপন্যাসটির কেন্দ্রস্থলে আছে একটা বিশেষ সময়ে ঔপন্যাসিকের জীবনজিজ্ঞাসা। যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ ধুঁকছে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ প্রমাদ গুণছেন। তলে তলে আরও এক যুদ্ধের প্রস্তুতি। অন্যদিকে গান্ধিজির নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারতের জাতীয় জীবনের আশা-ভরসার স্থল হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসের চরিত্রেরা বাঙালিজীবনের ক্ষুদ্র সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বমঞ্চে নিজেদের তুলে ধরতে চেয়েছে। 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের বিশাল পটভূমিতে বাদল, সুধী ও উজ্জয়িনী আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করেছে। যদিও তিনজনই একই সত্যের অভিসারী। প্রত্যেকের কাছে সত্যের অন্বেষণটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। বাদলের জীবনসাধনা আসলে বিশ্ববাসীর কল্যাণসাধনা। সে নানা বিশ্বাস নানা আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছে , কিন্তু কোথাও থিতু হতে পারেনি। যে বাদল একদিন ডিকটেটরশিপের বিরোধিতা করত সে-ই নিজে হয়ে উঠেছে ডিক্টেটর। তার বিশ্বাস গেছেকেবল ইচ্ছেটুকু আছে। এই বিশ্বাসহিন ইচ্ছা

মিছিলের উপর খাটে না। জীবনের সত্যকে আবিষ্কার করতে গিয়ে বাদলকে মরতে হল। মৃত্যুর পূর্বে তার জবানবন্দী, ''সুধীদা, আমি সরে দাঁড়ালুম। বিবর্তনের মিছিল চলছে, চলতে থাক, আমি তাতে নেই।''[৬] বিশ্বাসহীন ইচ্ছা নিজের উপর খাটে না বলেই সে নিজের উপর প্রয়োগ করল। বাদল বিবর্তনের মিছিল থেকে সরে দাঁড়াল।

তথ্যসূত্র:

১. ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী (২য় খন্ড) তে লেখকের ভূমিকা, বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৯৯৯

২. ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী (২য় খন্ড) তে লেখকের ভূমিকা, বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৯৯৯

৩। ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), মনস্বী অন্নদাশঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর রায়ে সঙ্গে ধীমান দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০২, পৃ-১

৪। ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড), বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ-১৯৬

৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ২৮৮-২৮৯

৬। ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড), বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ-৪৫২

দুর্গা মুখোপাধ্যায় : এক বিস্মৃতপ্রায় বঙ্গ নারী

ড. অমলেশ পাত্র

উনিশ শতক বাঙালি জাতির আত্মজাগরণের কাল। মধ্যযুগীয় সামাজিক কাঠামো আর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নতুন চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের সংঘাতে সৃষ্টিহয় আধুনিকতার জয়যাত্রা। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন এই সময়কার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষিত বাঙালি পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে এক ধরনের অনাস্বাদিত জীবনবোধের সঙ্গে পরিচিত হয়। ফলে সমাজজীবনে নতুন চাহিদার জন্ম নেয়। সেই চাহিদার আর এক দিক-বহুদিন থেকে চলে আসা অর্থহীন দেশাচার লোকাচার থেকে মুক্তি। এই বিরাট কর্মযজ্ঞ তথা আগামীর পথ চলায় বাঙালির অন্তঃপুরবাসিনীরাও অপাংক্তেয় রইল না। বহুকাল পর এই অসুর্যস্প্যারা দেখল নতুন সুর্যোদয়। প্রথম দিকে অবশ্য সংখ্যাটা ছিল হাতে গোনা। পরে সেটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সমাজে নারীর উন্নয়ন যে আসলে উন্নত সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান শর্ত, শিক্ষিত বাঙালি তা অনুধাবন করে। অশিক্ষা কুশিক্ষা কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীনপ্রথা ইত্যাদির কবলে পড়ে সমাজে বাঙালি নারীর অবস্থা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। এক দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা তাদের শিরোধার্য করে নিতে হত। এতদিনে পশ্চিমি শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির অভিঘাতে এদেশে শুরু হলনারীমুক্তির বিবিধ প্রচেষ্টা। পুরুষের পাশাপাশি নারীও এগিয়ে এল একাজে। সমাজের নানা ক্ষেত্রে নারী তার স্থান অর্জন করতে লাগল। বিশেষ করে, বাংলার সমাজে নারীদের প্রগতিশীল ভূমিকা ক্রমশ মুক্ত বিশ্বের দিকে নিয়ে যায় বাঙালি নারীদের। এই ভূমিকা কিন্তু বিশ শতক পর্যন্ত প্রসারিত। এই দু'শ বছরের সুদীর্ঘ কালসীমায় অগণিত নারীর মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট হয়েও হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির গহ্বরে। দুর্গা মুখোপাধ্যায় (১৯২৪-১৯৯৯) এমনই এক বিদুষী নারী। সাহিত্য, সংগীত, পুষ্পসজ্জা ও চিত্রকলার মতো আর্টের চর্চা করেও লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছেন। তিনি ছিলেন এক কালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাহিত্যিক, দৃষ্টিপাত (১৯৪৭) রচয়িতা যাযাবরের স্ত্রী। রাগাশ্রয়ী গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীতের ভক্ত ছিলেন তিনি। চর্চাও করতেন। যামিনী রায়ের ঘরানায় ছবি আঁকার হাতও ছিল চমৎকার। এশিয়া ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রাণ ভরে। দেশ-বিদেশের শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঝুলি হয়েছে স্ফীত। সেসবের প্রকাশ ব্যাকুলতাকে স্থির থাকতে দেয়নি। তাই

হাতে তুলে নিয়েছেন লেখনী। লিখেছেন বই। নাম 'পুস্পপট' অভিনব এর বিষয়বস্তু। প্রকাশভঙ্গিমাও অনবদ্য। বাংলা ভাষায় ফুল সাজানো বিষয়ে প্রথম বই এটি। বিশিষ্ট লেখক সাধন দাশগুপ্ত যাযাবর ও দুর্গা মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন— "পোশাকের ব্যবহারে বড় ফিটফাট ছিলেন তিনি। তিন বা বৌদি কে যে বেশি সুশৃঙ্খল, তা নিয়ে গবেষণা চলতে পারতো। বাইরে বেরুতে হলে ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া পরতেনশাদা ট্রাউজার্স আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে পাওয়া বুশশার্ট। সব সাদা। বৌদিও সাদা ভালোবাসতেন। দুজনের আরও একটি প্রিয় বিষয় ছিল ফুল। বৌদি লিখেছিলেন বাংলা ভাষায় ফুল সাজানো নিয়ে প্রথম বই - পুষ্পপট। আর যাযাবর জানতেন গোলাপ সম্পর্কে উনকোটি তথ্য। তা ছাড়া দুজনে জানতেন, শুনতেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত।"১

দুর্গা মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেকালের প্রথম সারির সরকারি আমলার স্ত্রী। স্বামী বিনয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রথমে ডেপুটি সেক্রেটারি, পরে প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি। এবং স্বাধীন ভারতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সেক্রেটারি হিসাবেও কাজ করেছেন বহুদিন। নেহরু, ইন্দিরা সহ বহু প্রথম সারির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল তার। থাকতেন দিল্লির বসন্তবিহারে সস্ত্রীক। স্ত্রী দুর্গা মুখোপাধ্যায়ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার মন, মনন ও রুচিবোধের গড়ন ছিল অনেক উঁচু তারে বাঁধা। জীবনে অবকাশ ছিল প্রচুর। বিভিন্ন শিল্পকলার চর্চা করেছেন প্রচুরতর। বস্তুত তার পারিবারিক Ethos ছিল শিল্প সাহিত্য-সঙ্গীতের চর্চা। দেশ বিদেশের শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতকলা বিষয়ে তাঁর জানকারি ছিল যথেষ্ট। ছবি আঁকার পাশাপাশি ফুল সাজানোর (ইংরেজিতে বলে ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জমেন্ট) মতো একটা অভিনব শিল্পকলার প্রতি তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শিল্পটির প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই তিনি পুষ্পপট' নামে নতুন ঘরানার একটি নতুন বই বাংলা ভাষার পাঠককে উপহার দিয়েছেন। এদেশে শিল্পকলার জগতে 'পুষ্পপট' একটি ল্যাণ্ডমার্ক বিশেষ। প্রকাশক নিউ এজ পাবলিশার্স। প্রকাশকাল ১৯৬১ সাল। পুষ্পপট' ছোট আকারের বই। তার ভূমিকা আরও ছোট। লেখিকা শুরু করেছেন এইভাবে— "বহুদিন মনে ছিল আশা, বলে কবিগুরু যে সব জিনিষের তালিকা দিয়েছেন, তার গোড়াতেই পুষ্প সৌরভের উল্লেখ আছে। কিন্তু চামেলীর গন্ধটুকু জানলার ধারে শুধু কবিকুলেরই কাম্য নয়, আমরা সাধারণ মানুষেরাও সেটা পছন্দ করে থাকি। বাস্তবিক সংসারে এমন কোনো বস্তু যদি থাকে যা সবারই ভালো লাগে তবে সে হচ্ছে ফুল। পাশে কেউ কবিতা পড়লে উসখুস করেন জগতে এমন মানুষের অভাব নেই। গান শুনে হাই তোলেন এমন মানুষও অসংখ্য। কিন্তু ফুল দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেন এমন স্ত্রী বা পুরুষের কথা কেউ কখনও শোনেনি।"২

পুষ্পবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ঘরানার ললিতকলার সৃষ্টি ব্যাপারটা তখনো আমাদের দেশে শুরু হয়নি বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এদেশে সেই অভিনব শিল্পাঙ্গিক নিয়ে এলেন দুর্গা মুখোপাধ্যায়। এশিয়া ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের

ফলে ফুল সাজানোর শিল্পকলা বিষয়ে তিনি অনেক প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। এ বিষয়ে বিপুল উৎসাহ ছিল তার। একটা অনন্য শিল্পকলা সম্বন্ধে তিনি তাঁর লব্ধ জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন নিজের লেখা বইটিতে। বিষয়ের অভিনবত্ব সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন— "ফুল যে শোভা বৃদ্ধি করে সেকথা জানি বলেই উৎসবের দিনে আমরা ঘরের দরজায় ফুলের মালা ঝোলাই, ভিতরে ফুলের তোড়া রাখি। বিদেশে গৃহিনীরা শুধু উৎসবের দিনে নয়, প্রতিদিনই ঘরে ফুল রাখেন। সেখানে বসার ঘরে টিপাইতে কিম্বা খাবার টেবিলে দু'চারটি ফুল সাজিয়ে রাখা প্রায় আমাদের দেশের সন্ধ্যায় ধুননা দেওয়া বা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালার মতোই নিত্যকর্ম।

ঘরে ফুল রাখার এই রীতি ও দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশেগিয়েছে। ধীরে ধীরে তাকে কেন্দ্র করে একটা সম্পূর্ণ নতুন ললিতকলার উদ্ভবহয়েছে। তার নাম আর্ট অব ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জিং। বাংলায় তাকে পুষ্পসজ্জার বা পুষ্পবিন্যাসের শিল্প বলা যেতে পারে।"৩

দুর্গা মুখোপাধ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দেশ বেড়িয়েছেন। শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি নানা দেশের নানা দ্রষ্টব্য জিনিস দেখেছেন। সোৎসাহে দেখেছেন তার নিজের বড় প্রিয় বিষয় পুষ্প বিন্যাসের শিল্পটিকে। এই পুষ্পবিন্যাস বা ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জিং-এ জাপান তার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'পুষ্পপটে'র এক জায়গায় তিনি লিখেছেন,— "ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জমেন্ট সবচেয়ে বেশি চলিত হয়েছে জাপানে। ঘরকন্নার কাজ, সেলাই ও গান-বাজনার মতোফুল সাজানোর আর্টও জাপানী মেয়েদের একটা আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয়। যে মেয়ে ফুল সাজাতে জানেনা জাপানে সে মেয়ের বিয়ে হওয়াইদায়।"৪

আগেই বলেছি নানা ঘরানার শিল্পাঙ্গিক নিয়ে দুর্গা মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞান ও চর্চা ছিল। পুষ্পপট'-এ ফুল সাজানোর রীতি বা পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমের কথাও বলেছেন। কখনো-বা টেনেছেন একের সঙ্গে অন্যের তুলনা। সবটাই দেখিয়েছেন তার সচেতন শিল্পবোধের ভেতর দিয়ে। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে গোটা বই জুড়ে অর্ধশতাধিক প্রাসঙ্গিক স্কেচ ও ছবির সংস্থাপন করেছেন। ফুল সাজানোর পদ্ধতিগত শ্রেণিবিভাজনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন— "রেখা বিন্যাস অর্থাৎ লাইন এ্যারেঞ্জমেন্টের সব চেয়ে সুবিধা এই যে তাতে খুব কম ফুল লাগে। দুতিনটি ফুল, এমনকি একটি ফুল গুটি দুই পাতা দিয়েও লাইন এ্যারেঞ্জমেন্ট করা চলে। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এ জাতের পুষ্পসজ্জায় লাইন অর্থাৎ রেখাটাই আসল। ফুলের শোভার চাইতে রেখার সৌন্দর্যের উপরেই জোর দেওয়া হয়। ক্ল্যাসিকাল বা সিমেটিকাল এ্যারেঞ্জমেন্টকে যদি রবি বর্মার ছবির সঙ্গে তুলনাকরা যায় তবে লাইন এ্যারেঞ্জমেন্টকে বলা যেতে পারে যামিনী রায়ের আট।"৫

'পুষ্পপট' ফুল সাজানো বিষয়ক বই অর্থাৎ একদিক থেকে শিক্ষামূলক বই হলেও সাহিত্যের পাঠকের কাছে এর উপভোগ্যতা এতটুকু কম নয়। বইটির ছত্রে ছত্রে রয়েছে সাহিত্যগুণ। এর উপস্থাপনাভঙ্গি তথা ভাষারীতি উপাদেয় সাহিত্যের ভাষার সমতুল।

আমরা জানি সাহিত্যে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সাহিত্য আদতে ভাষা-নির্ভর শিল্প। সাহিত্যিক ভাষা দিয়েই নানা ছবি আঁকেন। ভাষার বৈচিত্র্যপূর্ণ ও দক্ষ রূপায়ণের মধ্যেই সাহিত্যিকের যাবতীয় কীর্তি নিহিত থাকে। প্রতিপাদ্য বিষয়ের ধরন ধারনের পাশাপাশি লেখকের ব্যক্তিত্ব, রুচি, মেধা, মনন ও ভাষা জ্ঞানের দ্বারা রচনার ভাষা নির্ধারিত হয়। বিষয়ের সঙ্গে ভাষার ভারসাম্য দক্ষ লেখক খুঁজে নেন। সেই মতো ভাষা সৃষ্টি করতে পারলেই তিনি সফল। দুর্গা মুখোপাধ্যায় সে অর্থে সাহিত্যিক ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু যে ভাষারীতির মাধ্যমে পুষ্পপট' বইখানি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা সাহিত্যের ভাষার কেবল সজাতি নয়, সগোত্রও। বইখানি পাঠকালে বারংবার তাঁকে জাত-লিখিয়ে মনে হয়।

দুর্গা মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পুষ্পপট'-এ এক দক্ষ ভাষাশিল্পীর ছাপ রেখেছেন। নিপুণ রম্যরচনাকারের মতো তার ভাষা পাঠককে টানে। পুষ্পপট'-এর পাতায় পাতায় রম্যরচনার নানা গুণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রম্যতার কারণেই তার রচনা পাঠকে ধরে রাখে। ভাষার সরসতা, পরিবেশনার অনিন্দ্য ভঙ্গি, বুদ্ধির দীপ্তি ইত্যাদিতে পাঠক সহজেই বাঁধা পড়ে। একটা বৈঠকী মেজাজও তাঁর রচনায় লক্ষ করা যায়। পাঠকের কাছে তার লেখা হয়ে উঠেছে মজাদার, লোভনীয় ও উপভোগ্য।

দৃষ্টান্ত (১)— "যদিও বিদেশে কয়েকজন পুষ্পরসিক ভদ্রলোক ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জিং-এ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তবুও পুষ্পসজ্জা হচ্ছে প্রধানতঃ মেয়েদের আর্ট। অনেকে হয়তো বলবেন, সেকী কথা ? ট্রামে বাসে লেডিজ সীটের মতো আর্টেও আবার মেয়ে পুরুষের আলাদা ক্ষেত্র আছে নাকি ? তা অবশ্য নেই। সব আর্টেই ছেলে মেয়ের সমান অধিকার। তবে কতগুলি আর্ট আছে যেমন ছুঁচের কাজ, আলপনা, নৃত্য ইত্যাদি মেয়েদের শিল্পরূপেই গণ্য। রান্না পুরুষেরাও করে। বড় বড় হোটেল রেস্তোরাঁয় শেফ অর্থাৎ বাবুর্চী প্রায় সবই ব্যাটাছেলে। কিন্তু তবুও রান্নাটাকে মেয়েলী শিল্পই ধরা হয়। পুষ্পসজ্জাও তেমনি।"[৬]

দৃষ্টান্ত (২)— "জগতে কোনো আর্টেরই নিয়ম বলে কিছু নেই। নিয়ম থাকে অঙ্কের, নিয়ম আছে কেমিস্ট্রির। দু'ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে একভাগ অক্সিজেন মেশালে জল পাওয়া যায়,এ তত্ত্ব আমাদের স্কুলের বিজ্ঞানের বইয়ে আছে। কিন্তু কতখানি ভাবআর কতগুলি কথা মিশিয়ে কবিতা হয় তার হদিশ কোনো কবি সম্রাটের জানা নেই। কোন নিয়মে কালিদাসের কাব্য বাবিটোফেনের সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে তা কেউ বলতে পারে কি ? পুষ্পবিন্যাসও শিল্পসৃষ্টির বিষয়। এ্যালজাব্রার ফরমূলারমতোতার কোনোছক নেই।

শিল্পসৃষ্টির পিছনে কোনো নিয়ম নেই বটে, কিন্তু তা বলে কোনো ললিতকলাই একটা এলোপাথাড়ি ব্যাপার না। সামঞ্জস্য বা সুসঙ্গতি না থাকলে কোনোকিছুই সুন্দরের পর্যায়ে ওঠেনা।"[৭]

বাস্তবিক ফুল সাজানোর শিল্পীদের সঙ্গে যাঁদের সবচেয়ে বেশি মিল তার হলেন চিত্রশিল্পী। উভয়েই এক রাজ্যের বাসিন্দা। ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জমেন্ট আসলে ফুল দিয়ে গড়া শিল্প। চিত্রশিল্পীর রঙ তুলি ক্যানভাসের জায়গায় পুষ্পশিল্পী হাতে তুলে নেন ফুল পাতা

ফুলদানি। পুষ্পবিন্যাসের শিল্পে চিত্রশিল্পীর কম্পোজিশন থাকে। পাকা পুষ্পশিল্পীরা অনেক আপডেটেড। চিত্রশিল্পীর মতো তারাও ফুল দিয়ে নানা ভাব বা থিম প্রকাশের প্রয়াস পান। ভাব বা থিম নির্মাণের বিষয়ে চিত্রশিল্পী ও পুস্পশিল্পীর কাজের তুলনা করতে গিয়ে দুর্গা মুখোপাধ্যায় বলেছেন,— "শিল্পীর আঁকা ছবিতে একটা বিষয়বস্তু থাকে। ছবির নামকরণে সেই বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা হয়। দ্বিপ্রহর" নামের চিত্রখানায় হয়তো শিল্পী এঁকেছেন একটা বিরাট বটগাছ। তার ছায়াতে গোটা দুই গরু শুয়ে জাবর কাটছে। গাছের গুড়িতে গা এলিয়ে দিয়ে এক ভিখারী ঘুমিয়ে আছে, এক পাশে হয়তো বা পড়ে আছে তার ভিক্ষার ঝুলি আর লাঠিটি। চারিদিকের কর্মব্যস্ততা ক্ষান্ত হয়েছে পৃথিবীতে, একটা বিশ্রাম ও নিস্তব্ধতার ছাপ পড়েছে। রং-এর রেখায় আর তুলির আঁচড়ে দুপুর বেলার এই অলস শান্ত ভাবটি প্রকাশ করাই চিত্রকরের উদ্দেশ্য। এক জোড়া দাঁড়কাক একটা সজনে গাছের ডালে বসে ভিজছে। এইটুকু এঁকে চিত্রশিল্পী যে বিষয়বস্তু ইংরেজীতে যাকে বলে থিম প্রকাশ করতে চাইছেন তার নাম বর্ষা। পুষ্পশিল্পীরাও আজকাল ফুল দিয়ে ঐরকম এক একটা 'থিম্' গড়ে তুলছেন।"[৮]

সংস্কৃত সাহিত্যে ৯টি রসের কথা বলা আছে। সে সাহিত্যে হাস্যরস আছে কেবল নামেই। বিদূষকের হাসি হাসি নয়, ভঁড়ামো। ইংরেজি সাহিত্যে সহাস্যরসের স্থান অনেক উঁচুতে। আর মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এক ভারতচন্দ্র ছাড়া ও জিনিসের যথার্থ স্বাদ মেলা ভার। তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যেই হাস্যরসের প্রকৃত উন্মেষ, বিকাশও পরিপুষ্টি। বঙ্কিম, ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাতকুমার থেকে এর সূচনা।বিশশতকে একরাশ হাস্যরসের লেখককে পেয়ে বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা আপ্লুত। দুর্গা মুখোপাধ্যায়ের লেখায় রম্যতা আছে বলে খুব স্বাভাবিকভাবেই হাস্যরসের একটা স্নিগ্ধ ছোঁয়া তাতে অনুভব করা যায়। সে হাসি স্মিত হাসি।কিন্তু তা হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত— "ঘাড় মটকে পড়াফুল নিয়ে অনেক মন ভুলানো আকার, অথচ ডাঁটার মাথায় নেতিয়ে আছে বলে তাকে এ্যারেঞ্জমেন্টে ব্যবহার করতে পারছিনে,এতে কার না রাগ হয়?"[৯]

বাংলা ভাষার ওপর দুর্গা মুখোপাধ্যায়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল যথেষ্ট। ভাষা কেমন সংহত, মেদ বর্জিত, ঝকঝকে চকচকে হতে পারে তার নজির আছে তার এই একটিমাত্র বইতে। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীও ভাষার এই সংহতি ও মেদহীনতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। মনে হয় দুর্গা মুখোপাধ্যায়ও ব্যাপারটাকে অনুধাবন করেছিলেন। ভাষার সংহতি ঠাস বুননের পরীক্ষায় তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক একটি ঘটনা বা বিষয়কে তিনি গুটিকয় শব্দ খরচ করেই ব্যক্ত করতে পেরেছেন। সামান্য বিষয়ও তার চিত্তাকর্ষক ভাষা সৃজনের জন্য অসামান্যতা পেয়েছে। চমৎকার লিখনশৈলীর গুণে তার রচনা বেশ উপভোগ্য হয়েছে। ভাষা ও শৈলীর গুণেতার রচনা তন্ময় হয়ে পড়তে হয়। তার ভাষার অনেক জায়গাতেই জুড়ে থাকে মননের রেশ। পাঠকের চেতনাকে নাড়িয়ে দিয়ে যায় তার বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল মন্তব্যগুলো। এ সবের পেছনে আছে তার নিজস্ব একটা জীবনদৃষ্টি,— "পুরী, ওয়াল্টেয়ার ও অন্যান্য সমুদ্রতীরে ছোট ছোট ঝিনুক

কুড়ানো ছেলেমেয়েদের শখ। মায়েরা অনেক সময় এই ঝিনুকের বোঝা বাক্সে বয়ে আনতে আপত্তি করেন। তাই নিয়ে ছোটদের কান্নাকাটির অন্ত থাকে না। এবার থেকে খুকির মা ঝিনুককে অত হেলাফেলা করবেন না যেন। কারণ হোল্ডার ঢাকা দেওয়ার কাজে ঝিনুক খুব কাজে লাগে। একমুঠো ঝিনুক হোল্ডারটার উপরে চাপা দিয়ে দিন। কয়েকটি তার আশে পাশে ছড়িয়ে দিন। শুধু যে পুষ্পধারক চোখের আড়াল হবে তাই নয়, পুষ্পসজ্জার বাহারও অনেকখানি বেড়ে যাবে। পুষ্প শিল্পীরা রথ দেখতে গেলে কলা বেচার কাজটাও করবেন, সে কথা বলিনে। কিন্তু পুরী বা ওয়াল্টেয়ারে বেড়াতে গেলে নানা রং-এর ও নানা আকারের ঝিনুক কুড়িয়ে আনতে ভুলবেন না, পুষ্পসজ্জার ঝাপিতে সেগুলি দরকারী উপকরণ হয়ে থাকবে।”[১০]

আধুনিক সাংস্কৃতিক জগতের নানা ক্ষেত্রে দুর্গা মুখোপাধ্যায়ের যথেষ্ট আনাগোনা ছিল। সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পের চর্চা ছিল তার। তার স্বামী যাযাবর ওরফে বিনয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেকালের প্রথম সারির সরকারি আমলা এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক। স্বামীর পরিচয়ই স্ত্রীর পরিচয়— এমন সনাতন ধারণায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। এমন ধ্যান ধারণার বিপরীত মেরুতে ছিল তার অবস্থান। তার নিজেরও যথেষ্ট প্রতিভা ছিল। কিন্তু তিনি খুবই প্রচারবিমুখ ছিলেন। সঙ্গত কারণেই খুব বেশি বাঙালি তাকে জানেন না। যাঁরা জানতেন তারাও তাঁকে সেভাবে মনে রাখেননি। দৈবাৎ দু'একজন তাঁর সম্পর্কে দু'চারটি কথা ছাপার অক্ষরে লিখে গেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন বিশিষ্ট লেখক সাধন দাশগুপ্ত। দুর্গা মুখোপাধ্যায় চিত্রশিল্পী হিসাবেও কতখানি যেদক্ষ ছিলেন সাধনবাবুর কথার ভেতর দিয়ে তা জানা যায়,— “বাড়িতে বসার জায়গায় যামিনী রায়ের আঁকা দুটি বৃহদাকার ছবি ছিল। শুনলাম যার একটি মৌলিক, স্বয়ং যামিনী রায়ের উপহার। অন্যটি অনুকৃতি। বৌদি দুর্গাদেবী যামিনী রায়ের শৈলীতে ছবি আঁকতেন। ওঁদের প্রশ্ন করেছিলাম কোন্ ছবিটি বৌদির আঁক? এখানেও মানুষটি হেসে বললেন, ‘কৌতুহল ভালো। তবু সব প্রশ্নের উত্তর জুটে গেলে জীবন বড় আলুনি হয়। কিছু কিছু অজানা থাকা ভালো। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রসিক মানুষটি মজা করে গেলেন। পরে জেনেছি, ছবি দুটিই বৌদির অনুকৃতি। আসল নকলে প্রভেদ প্রায় নেই বললেই চলে।[১১]

বিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর মরণপণ সংগ্রামের পর দেশবাসী ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়। যদিও যে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন দেশব্রতীরা সেই স্বাধীনতা আসেনি। একটা খণ্ডিত স্বাধীনতা পেয়েছিলাম আমরা। তখনো দেশ শিক্ষা-দীক্ষায় তত এগোয়নি। বিশেষ করে সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। নারীরা না অবহেলিতই ছিল। তাদের শিক্ষার হারও ছিল মারাত্মকভাবে কম। বাংলা তথা ভারতবর্ষে উচ্চ শিক্ষিত নারীর সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। সেই সেদিনেও বাঙালি ঘরের মেয়ে দুর্গা মুখোপাধ্যায় এদেশের সাংস্কৃতিক জগতে সত্যিই বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি দেশ বিদেশের নানা স্থান ঘুরে দেখেছেন। জগৎ ও জীবনকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টিছিল তার। ধনীর গৃহিনী হয়েও

বিলাস-বৈভবে গা-ভাসাননি। মন ও মস্তিষ্ককে খাটিয়েছিলেন, শান দিয়েছিলেন মননশীলতায় ও সৃজনশীলতায়। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্পে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন বিদুষী। সে-যুগে একজন নারীর পক্ষে এতখানি সারস্বত সাধনা সামান্য কথা নয় বইকি। কিন্তু কালপ্রবাহে আজ তাকে ক'জনই বামনে রেখেছে! আজ তিনি এক বিস্মৃতপ্রায় বিদুষী বঙ্গনারী।

তথ্যসূত্র :

১। সাধন দাশগুপ্ত, বিনয় মুখোপাধ্যায়', দ্র. সমতট'-১৩৫ (সম্পা. অকুসুম দত্তগুপ্ত, কলকাতা, ৩৪ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ২০০৩, পৃ. ২৪৫)।

২। দুর্গা মুখোপাধ্যায়, 'পুষ্পপট',১ম প্রকাশ,কলকাতা,নিউ এজ পাবলিশার্স,১৯৬১, পৃ. ৯।

৩। তদেব, পৃ. ১২। ৪। তদেব, পৃ. ১৩। ৫। তদেব, পৃ. ৭২।

৬। তদেব, পৃ. ১৫। ৭। তদেব, পৃ. ১৮। ৮। তদেব, পৃ. ১২২-১২৩।

৯। তদেব, পৃ.১১৪-১১৫। ১০। তদেব, পৃ. ১১৭।

১১। সাধন দাশগুপ্ত, 'বিনয় মুখোপাধ্যায়', দ্র. সমতট'-১৩৫ (সম্পা. অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত, কলকাতা, ৩৪ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ২০০৩, পৃ. ২৪৫)।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। দুর্গা মুখোপাধ্যায়, 'পুষ্পপট', ১ম প্রকাশ,কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৬১।

২। যাযাবর, 'যাযাবর অমনিবাস', ৮ম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।

৩। অজিতকুমার ঘোষ,'বঙ্গ সাহিত্যেহাস্যরসের ধারা',৪র্থ সং,করুণা প্রকাশনী, ২০০২।

৪। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়,'বীরবল ও বাংলা সাহিত্য',২য় সং,দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫।

৫। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, বাংলা কথাসাহিত্য : প্রকরণ ও প্রবণতা, ১ম সং, কলকাতা, পুস্তকবিপণি, ১৯৯১।

৬। নবেন্দু সেন, বাংলা গদ্য স্টাইলিটিকস্, ২য় সং, বারুইপুর, মহাদিগন্ত, ২০০১।

৭। নারায়ণ চৌধুরী, 'বরণীয় লেখক স্মরণীয় সৃষ্টি', ১ম সং, অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৮২।

৮। শুভাশিষ দাস, 'কথা সাহিত্যিক যাযাবর', ১ম প্রকাশ,কলকাতা, দে পাবলিশার্স,

পত্রিকা :

১। 'দীপন', অবহেলায় শতবর্ষ, ১৪ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, জুন ২০১১, এন জুলফিকার (সম্পা.), কলকাতা।

২। 'দেশ', ২৪ এপ্রিল, ১৯৯৩, সাগরময় ঘোষ (সম্পা.), কলকাতা।

৩। 'সমতট' (১৩৫) ৩৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ২০০৩, অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত (সম্পা.), কলকাতা।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর ব্লকের নাড়াজোল গ্রামের পট ও পটসঙ্গীত

ড. সঞ্জীব কুমার ঘোষ

নাড়াজোল এখন প্রায় পরিত্যক্ত একটি আধাশহর। এটি দাসপুর থানার ১ নং ব্লকের মধ্যে অবস্থিত। এর উত্তরে ঘাটাল, দক্ষিণে ডেবরা ও পাঁশকুড়া, পূর্বে হাওড়া এবং পশ্চিমে কেশপুর অবস্থিত। ১৮৭২ সালের সেন্সাস অনুযায়ী এই পরগণার আয়তন ছিল ৮ হাজার ৯৯৭ একর। এতে মোট ৭১ টি গ্রাম ছিল। বর্তমানে নাড়াজোল দুটি গ্রামে বিভক্ত হয়েছে। একটি হল কিসমত নাড়াজোল এবং অপরটি হল নিজ নাড়াজোল। এই নাড়াজোল গ্রামে প্রাচীন নাড়াজোল রাজপরিবারের গড় ও রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। কাছাকাছি লঙ্কাগড় দিঘীটি রাজা মহেন্দ্রলাল খানের দ্বারা নির্মিত। নাড়াজোল রাজপরিবারের রথ সুপ্রাচীন। সেই নাড়াজোল গ্রামের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত প্রায় বারোটি পরিবারের প্রায় পঁচানব্বই জন শিল্পী পটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই শিল্পীদের মধ্যে বেশিরভাগই অল্পশিক্ষিত। তবে বর্তমানে অনেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন।

লোকশিল্পের মধ্যে পট একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। আজকাল বাংলা ‘পট’ কথাটি ব্যাপক অর্থে চিত্র বোঝায়। ‘পট’ শব্দটি ব্যঞ্জনাময়। আবার “প্রাচীন সংস্কৃতে ‘পট্ট’ শব্দটির অর্থ কাপড়। যে কাপড়ের উপর চিত্র লেখা হত সেই কাপড়টিকেই পট বলা হত। এই কারণে যাঁরা এই পট আঁকেন তাদের পটুয়া ছাড়াও পট্টকার, পট্টিদার ইত্যাদি হরেকরকম নামে অভিহিত হতে দেখা যায়।”[১]

সুদূর অতীতকাল থেকেই বিশ্বব্যাপী পটের প্রচলন ছিল। আমাদের দেশে পটশিল্প কত প্রাচীন এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। পটের প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে মিশরে; বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু গল্প নিয়ে আঁকা জড়ানো পটের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলি পাওয়া গেছে ইজরায়েলের এক পর্বত গুহায়। চীন, জাপান, নেপাল, তিব্বতেও বৌদ্ধ জাতকের কাহিনি নিয়ে আঁকা জড়ানো পট আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন পুঁথিতেও পটের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পটশিল্পের শ্রেণিবিভাগ :

কাপড়ের উপরে যাঁরা ছবি আঁকেন তাদের পটুয়া বলা হয়। বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গ বিভিন্ন ধরনের পট নিয়ে আলোচনা করলেও এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গুরুসদয় দত্ত।

পটসঙ্গীতের উপর নির্ভর করে তিনি পটকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন।[২]

১) লীলা কাহিনি বিষয়ক।

২) পাঁচকল্যাণী বিষয়ক।

৩) গোপালন বিষয়ক।

আবার পট কে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে[৩]—

১) আকার অনুযায়ী

ক) জড়ানো পট

খ) চৌকো পট

২) বিষয়বস্তু অনুযায়ী

i) ধর্মীয় পট

ক) পৌরাণিক পট

খ) লৌকিকপট

ii) ধর্মনিরপেক্ষ পট।

পটসঙ্গীত :

পট চিত্র প্রাচীন ভারতের অন্যতম চিত্রশিল্প। পটুয়াদের গানও সুপ্রাচীন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল শিল্প ও সঙ্গীত হিসাবে যথেষ্ট মূল্যবান ও মর্যাদাযোগ্য হলেও সেগুলি ছিল অবহেলিত ও লোকসাধারণের দৃষ্টির প্রায় অগোচরে। তবুও পট কিংবা পটের গান কিছুটা হলেও আমাদের মধ্যে টিকে আছে। আগের ব্যাপকতা এখন আর নেই।

পটসঙ্গীত হল অন্যতম লোকসঙ্গীত। পটের গান পটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পটচিত্র উন্মোচিত হলে তার পরিপূরক গানের আবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে যায়। এই পটসঙ্গীতের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য— প্রথমত: পট কথাটি পটুয়াদের মনের খুব কাছাকাছি। দ্বিতীয়ত: পট কথা বা পটসঙ্গীত সহজ, সরল, সর্বজনবোধ্য। তৃতীয়ত: পটসঙ্গীতের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক চিত্র যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। পটুয়াদের দ্বারা গীত যে গান তাই হল পটের গান। পট বাদ দিলে এই গানের কোনো পৃথক অস্তিত্বই থাকে না।

অঞ্চলভেদে পটের গানের বিষয়বস্তু এবং বর্ণপ্রকরণের নানান প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। পটের গানগুলি মূলত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়। চরণের শেষে মূলত অন্তমিল থাকে। এই গানগুলি পড়ার মধ্যে একটি বিশেষ টান থাকে। গানগুলির সবক্ষেত্রেই মাত্রা, লয়, অন্তমিল রক্ষা করা হয় এমনটা নয়। কখনো কখনো গান গুলি ছড়ার মতো হয়ে থাকে। কিছু কিছু গানে পটুয়াদের নাম ঠিকানা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়।

পটের গানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল জীবিকার সন্ধান, নীতি শিক্ষাপ্রচার এবং সমসাময়িক জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রতিফলন ঘটানো। গানগুলির শেষে সাধারণত পুণ্যের জয়, অধর্মের পরাজয় এবং পাপীর নরকবাস, যমযন্ত্রণা ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সামাজিক বিষয় গুলির থেকে পটের কাহিনিতে পৌরাণিক কাহিনিগুলি বেশি জনপ্রিয়। পটুয়ারা নিজে নিরক্ষর কিন্তু বংশপরম্পরায় শেখা পটের গান

গেয়ে তাঁরা জীবনের মহাসত্য গুলি জনসাধারণের হৃদয়ে মুদ্রিত করে দিতেন।

গানের পরিবেশনভঙ্গি অবশ্য তেমন আকর্ষণীয় নয়। এটি একক সঙ্গীত। পটুয়া গানের গায়কের বিচিত্র সুরজাল সৃষ্টি করার দিকে প্রয়াস থাকে। এ গানের অপর বৈশিষ্ট্য এর সুরযন্ত্র ও বাদ্যযন্ত্র হীনতা। এই গানের গায়কের আন্তরিকতাই প্রাণ। গায়ককে সর্বদা সচেতন থাকতে হয় দর্শক-শ্রোতার মনোরঞ্জনের দিকে। নতুবা দর্শক আগ্রহ হারিয়ে ফেললে গায়েনের আর্থিক ক্ষতি হয়।এই গানে গায়েন নারী পুরুষ উভয়েই হয়।

নাড়াজোল গ্রামের পট ও পটসঙ্গীত :

এই শিল্পকলা মূলত জীবিকার তাগিদে সৃষ্টি হয়েছিল। তখনকার পটুয়ারা পৌরাণিক ঘটনাকে চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলত এবং এই চিত্রগুলিকে মানুষের কাছে বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য গানও করত।এই গান ও ছবি তারা জনসাধারণের কাছে গিয়ে এক প্রকার ভিক্ষে করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। তখন কিন্তু তারা শিল্পীর প্রকৃত মর্যাদা পেতনা। তারা কেবল মানুষের চোখে ভিখারি বলেই পরিচিত ছিল। কিন্তু যখন থেকে মানুষের মনে শিল্পের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হল; তখন থেকেই আমাদের এই পুরানো ঐতিহ্যবাহী শিল্পকার্য Folk Art-এ পরিণত হল।

নিজ নাড়াজোল গ্রামের পটুয়া পাড়ার শিল্পীরা বংশপরম্পরায় তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন হিসেবে এই পটশিল্পকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এঁরা শুধু পুরাণকে অবলম্বন করেই গান রচনা করেননি, একইসঙ্গে সাঁওতালদের জীবনের কিছু কাহিনি, কিছু কাল্পনিক কাহিনি যেমন— মাছের বিয়ে, সাপের রাজা ইত্যাদি বিষয়ে ছবির সঙ্গে সঙ্গে গানও রচনা করে থাকেন। এছাড়া বর্তমানের কিছু জ্বলন্ত সমস্যা যেমন— পণপ্রথা, নারী নির্যাতন এবং কিছু কিছু রোগসংক্রান্ত যেমন— এডস, পোলিও ইত্যাদি বিষয় নিয়েও ছবি ও গান রচনা করে থাকেন। এছাড়া সাম্প্রতিককালের কিছু ঘটনা যেমন— সুনামি, তাজ হোটেলে বিস্ফোরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও পট ও পটের গান রচনা করে থাকেন।

পটের গান সম্পূর্ণ পটুয়াদের নিজস্ব সৃষ্টি। এগুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়। তবে এই গানগুলির মধ্যে চরণান্তিক মিল সব সময় লক্ষ্য করা যায় না। কাহিনি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই পটেরগান প্রয়োজন। নাড়াজোলের পটুয়াদের কাছ থেকে সংগৃহীত পটের গানগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

পৌরাণিক বিষয় নির্ভর পটসঙ্গীত :

পুরাণের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে পটুয়ারা পটের সঙ্গে গান রচনা করেছেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক গান—

তরুতলে কৃষ্ণ ওগো মুরলি দিল টান
যত ব্রজেরও বাঁশি না ধরে পরাণ
কেহ গায় কেহ নাচে কেহ বলে হরি
ভবেরি রাধিকা খাইগো ধুলায় গড়াগড়ি

জল আনিতে যায় গো রাধে ঘোমটা টানিয়া
আর ঠামুকো ঠুমুকো চলে রাধা বিনোদিয়া
হস্ত মাঝে পুকুর ঘাটে কানাই দেখা দিল
কানাইকে দেখে রাধা ঘোমটা টানিল
আমায় দেখে দিলি ঢাকা কত রাজার ধন
আপনার স্তন রে কানাই আপনি ঢাকা দিলাম
বলে সম্পর্কের ভাগ্না রে তুই আমি তোর মামি
আমার সঙ্গে রসিকতা কেন করো তুমি
আসুক দেখি আয়ান ঘোষ ভেঙে দেবো ভুল
বেচবো গোয়ালের গরু দরপ করব চুর
যাক পাছে গরু বাছুর গরু কিনে নেব
তোমার মতো সুন্দরী মামি কোথায় গেলে পাব
পরের রমণী দেখে লোভ কেন করো
গলায় কলসি দিয়ে জলে ডুবে মর
কলসি কিনতে রাধে কোথায় পাব কড়ি
আর কলস বাঁধতে রাধে কোথায় পাব দড়ি।

কৃষ্ণ রাধাকে প্রেম নিবেদন করায় রাধার যে ক্রোধ তা প্রকাশিত হয়েছে এই গানটির মধ্য দিয়ে।

আবার রামচন্দ্রের বিবাহের পর সীতার বনবাস কে কেন্দ্র করে এরা গান রচনা করেছেন। পঞ্চবটী বনে সন্ন্যাসীবেশে রাবণের আগমন; সীতার লক্ষ্মণকে ভৎর্সনা, লক্ষণগণ্ডি অতিক্রম করে সীতা হরণ প্রভৃতি ঘটনাকে সাজিয়ে নিয়ে মানুষকে সহজে বোঝাবার জন্য এরা যে গান রচনা করেছেন সেটি নিম্নরূপ।

সীতার বনবাস :

বিয়ে হল রামচন্দ্র হইলেন অধিবাস
পিতৃসত্য পালিতে রাম যায় বনবাস
আগে চলে রামচন্দ্র পশ্চাতে জানকী
তাহার পশ্চাতে চলে লক্ষ্মণ অধিপতি
উপনীত হইলো গিয়া পঞ্চবটী বনে
বাঁধিলো পথে কুঁড়ো ভাই দু'জনে
পঞ্চবতী বনে রাম তুলিল হাওয়ালী
রাম সীতা পাশাখেলে লক্ষ্মণ প্রহরী
সূর্পনখা এল একদিন পুষ্প আহরণে
ধরিয়া নাক কান কাটে ঠাকুর লক্ষ্মণে
এসোগো ঋষির কন্যা সত্য করে মোরে

দণ্ডীর আকার দিয়া যাব কুঁড়েরই বাহিরে
দণ্ডীর আকার বাহিরে দেবী দেখবে যার মুখ
ত্রিভুবন টলিবে গো পশ্চাতে পাবি দুঃখ
না-হেসো করে বল চটাই নাহেস করে বল
মিত্র বধূ সীতা আছে রথেরই ভিতর
উড়িতে উড়িতে রথ করিল গমন
রথ গিয়ে থামিল গো অশোক কানন
চার পাশে চেরীগন করেন চারণ
কৃত্তিবাস রচিত গীত রামায়ণ।

মঙ্গলকাব্য বিষয়ক পটসঙ্গীত :

পটুয়ারা চন্ডীমঙ্গলের কাহিনি অবলম্বন করে পটের গান রচনা করেছেন।

চন্ডীমঙ্গলের গান :

দুর্গে দুর্গে তারে মাগো দুঃখ বিলাসিনী
দুর্গায় দক্ষিণাকালী নগেন্দ্র নন্দিনী
চণ্ডী মায়ের দশ বাহু দশ দিকে সাজে
ত্রিনয়ন জ্বলছে ভালো কপালেরও মাঝে
লক্ষ্মী সরস্বতী বামে কার্তিক গণেশ
সিংহ অশুর জয় বিজয়া চলে মায়ের সাথে
একদিন ভগবতীর হয়েছিল দয়া
ডালিম তলায় রত্ন দিল দেখাইয়া
ডালিম তলায় রত্ন কালকেতু পেল
গুজরাটে বনকেটে নগর বানাইল
ভারবন্দী কালকেতু লয়ে যায় ঘরে
খুল্লনা সুন্দরী দেখে কুড়রী দুয়ারে
শ্রীমন্ত জন্ম নিল খুল্লনারই ঘরে
বারো বছর ছিল সাধু বন্দী কারাগারে।

সামাজিক বিষয় নির্ভর পটসঙ্গীত :

বিভিন্ন সমাজের বিষয় নিয়েও এরা পটের গান রচনা করেছেন। সামাজিক বিষয়ের মধ্যে আছে শাশুড়ি-বউ এর ঝগড়া, পুত্র-কন্যার সমান অধিকার, ছোট পরিবার সুখী পরিবার, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি।

এখানে স্বাধীনতার গানটি উদ্ধৃত করা হলো—

স্বাধীনতা :

১৯৪৭ সালে পেলাম স্বাধীনতা ভেবেছিলাম সুখে দিন
কাল কাটবে মোদের ঘুচবে মনের ব্যথা

কিন্তু হায় মনের ব্যথা বলতে কথা প্রাণটা কেঁদে ওঠে।
স্বাধীনতা আসার পর কোন ট্রেন এল ছুটে
হায় হায় ঘরে ঘরে ভাত-কাপড়ের তরে পড়লো হাহাকার
ফুড কমিটির মেম্বার বাবুর পায়ে নমস্কার
হায় হায় দলে দলে যাচ্ছে চলে ডিলার বাবুর দ্বারে
কার্ড লয়ে চলেছে তারা পায়ে হাতে ধরি
এক পুরা চাল এক খানা ধুতি নাতিপুতি অনেক আছে ঘরে
বউমা উলঙ্গ বেশে আছে বসে রান্নাশালের ঘরে
তাইতো তোমার পায়ে পড়ি ভাত-কাপড়ের তরে।

(অসম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত)

সাম্প্রতিক ঘটনা বিষয় নির্ভর পটসঙ্গীত :

দু হাজার চার সালের ছাব্বিশে ডিসেম্বর সুনামিতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

তাকে কেন্দ্র করেও এখানকার পটুয়ারা পটচিত্র এঁকেছেন এবং গানও রচনা করেছেন।

সুনামি :

অভিশপ্ত সুনামি যে কেড়ে নিলো প্রাণ
কি দোষের দোষই আমরা বলো ভগবান বা, বা, বান
আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে কাঁদছে বসে পাখি
নৃশংস হত্যা করলে আর কি বাকি
দয়াল আরকি রইল বাকি।
অভিশপ্ত সুনামি যে কেড়ে নিলা প্রাণ
মারচে নাকো জেঠি কাকি করেছে অপমান মা, মা, মা, মান
মরছে কত অবোধ শিশু কারো মরল পিতা
অভিশপ্ত সুনামি যে কেড়ে নিলো প্রাণ
অকালেতে প্রাণ হারাল গর্ভধারিণী মাতা
দয়াল গর্ভধারিণী মাতা
অন্তরের কত ব্যথা বিধি হলো, বা, বা, বান
অভিশপ্ত সুনামি যে কেড়ে নিলো প্রাণ
দেশে-বিদেশে মাতা-পিতা কাঁদিয়া আকুল
সর্বগ্রাসী সুনামিতে ভাঙল নদীর কুল
দয়াল ভাঙল নদীর কুল
হেলিকপ্টার উড়ে আকাশে টিভিতে প্রমাণ
প্রতি জেলায় গ্রামে খবর এসে গেল
অভিশপ্ত সুনামি যে কেড়ে নিলো প্রাণ

বেসরকারি সরকার এল দেখিতে
তারা আসিয়া দেখিলো
যারাই তাদের দেখেছিল
তারাই পেল দাম
অভিশপ্ত সুনামি যে কেড়ে নিলো প্রাণ
কি দোষের দোষই আমরা বলো ভগবান বা, বা, বান।

সমাজ সচেতনতা বিষয় নির্ভর পটসঙ্গীত :

মানুষকে সচেতন করার জন্যে এঁরা পট এঁকে থাকেন এবং গানও রচনা করে থাকেন। যেমন পোলিও টিকা না নিলে যে শিশু এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে সে বিষয়ে সচেতনতা জাগিয়ে তুলেছেন গান রচনার মাধ্যমে।

পোলিও দূরীকরণ :

শুনুন শুনুন বন্ধুগণ শুনুন দিয়া মন
পোলিও রোগের কথা করিব বর্ণন।।
শিশুর-স্বাস্থ্য দেশের কাজ
বলে সর্বজন।।
শিশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখতে
দিন সবাই মন।।
পোলিও রোগ হলে বন্ধু
সারে না তো আর।।
পঙ্গু হয়ে দিন কাটান
এ রোগ হয় যার।।
ভারত সরকার উদ্যোগ নিয়েছে
এ রোগ দূরীকরণে।।
দু'ফোঁটা পোলিও খাওয়াতে হবে
রাখবে ওটা স্মরণে।।
পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত পোলিও
টিকা দেওয়া চাই।।
এ রোগ দূরীকরণে এ ছাড়া আর অন্য
উপায় নাই।।
সব শিশুকে একসাথে পোলিও টিকা
খাওয়াতে হবে।।
তবেই তো ভারত আমার
পোলিওমুক্ত দেশ হবে।।

কৌতুক রসাত্মক পটসঙ্গীত :

এইসব বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও পটুয়ারা কৌতুক রসাত্মক পটচিত্র অঙ্কন এবং সেই চিত্রের উপযোগী করে গান রচনা করেছেন। যা বেশ আনন্দ দেয়।

সিংহ হয় রাজা :

পশুরা সব মিটিং করে সিংহ হয় রাজা
সুখের প্রতিপালন করে পশুরা সব হয় প্রজা
সিংহ হয় রাজা
পশুরা সব মিটিং করে সিংহ হয় রাজা
খরগোশ চলে ভাওন জুড়ে ভালুক মশাই কেন পাজি
খরগোশ কে ধরে হাইরে খরগোশ কে ধরে
খরগোশ ছুটে ভীষণ জোরে বনের রাস্তা নেই সোজা
সিংহ হয় রাজা
পশুরা সব মিটিং করে সিংহ হয় রাজা
বাঘ বেশিরভাগ হরিণকে ধরে-মেয়ে হরিণ ছুটে
ভীষণ শিংয়েতে জোড়ে লতা শিংয়েতে জোড়ে
হালুম করে পড়ল ঘাড়ে মাংস খেতে পাই মজা
সিংহ হয় রাজা
পশুরা সব মিটিং করে সিংহ হয় রাজা।

নাড়াজোল গ্রামের কয়েকজন পটুয়ার পরিচয় :

১. নাড়াজোল গ্রামে গৌরী চিত্রকর নামে এক অতি বৃদ্ধ মহিলা পটশিল্পী আছেন। ইনি কারুশিল্পী হিসেবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

২. নাড়াজোল গ্রামের এক অন্যতম খ্যাতনামা পটুয়া হলেন হারু চিত্রকর। তিনি বারুইপুর এক্সপেরিমেন্ট অফিস থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পেয়েছেন। ব্যাঙ্গালোরের পটের মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন।

৩. এমালি চিত্রকরও এই কাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই যুক্ত আছেন। তিনি পট আঁকার সাথে গানও করেন। ডি.সি হ্যান্ডিকার্পট অফিস থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন।

৪. বলাই চিত্রকর পট শিল্পের সাথে কুড়ি বছর ধরে যুক্ত আছেন। রাজ্যের বিভিন্ন মেলায় পট দেখিয়ে থাকেন। তিনি মহকুমা থেকে একটি শংসাপত্র পেয়েছেন।

৫. এছাড়া পট শিল্পের সঙ্গে নাড়াজোল গ্রামের আরো অনেকে জড়িয়ে আছেন। তাঁরা হলেন নুরজাহান চিত্রকর, আলেখজান, বুল্টা চিত্রকর, আনন্দ চিত্রকর, কাঞ্চন, মিতা চিত্রকর প্রমুখ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পটুয়ারা কোন কাহিনিকে তাদের নিজের মত করে প্রথমে চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং তারপর সেই চিত্রকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য গান রচনা করেছেন। তাই 'পট' এবং 'গান' একটি অপরটির পরিপূরক।

পটুয়াদের গানে সব সময় ছন্দ যতির মিল থাকে না। তা সত্ত্বেও এর মাধুর্য কম নয়। সমীক্ষায় দেখা যায় খুব কম পটুয়া গান রচনা করতে পারে। বেশিরভাগ পটুয়া এই গানগুলিকে বংশপরম্পরায় ব্যবহার করতে থাকেন। এই সমস্ত পটুয়ারা বেশিরভাগই নিরক্ষর।

পটের গান লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে কাজ করে। এই গানগুলির শেষে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব, ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকে। এইসব গানের মূল প্রতিপাদ্য মানুষকে অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত করা।

পটুয়ারা তাদের রচিত গানকে লোকসঙ্গীতের আদলে প্রকাশ করলেও এই গান গুলিকে লোকসঙ্গীতের অবিভাজ্য ধারা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে না। বাংলার লোকসঙ্গীত অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসার এবং অন্যান্য কারণে পটেরগান বিলুপ্তপ্রায়। পটুয়ারা বর্তমান সামাজিক সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু পট আঁকছেন এবং গান তৈরি করেছেন। এ ব্যাপারে সরকারি তরফ থেকেও উৎসাহ দেয়া হয় পটুয়াদের। তবে ক্ষেত্রানুসন্ধানে দেখা গেছে সামাজিক পটের চেয়ে পৌরাণিক পটই বেশি বিক্রি হয়। এছাড়া যখন পটুয়ারা পণপ্রথা, নিরক্ষরতার অভিশাপ কিংবা পরিবেশ দূষণের মতো বিষয় নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পট ও পটের গান রচনা করেন, তখন নিঃসন্দেহে তা অকৃত্রিম লোকসংস্কৃতির উপাদানের মর্যাদা লাভের অধিকারী হয়।

লোকশিল্প ক্রমশ অবলুপ্ত হতে চলেছে। মেদিনীপুর জেলার বয়ন শিল্প, মৃৎ-শিল্পের মত চিত্রশিল্প তথা পট শিল্পেও সেই অবলোপনের চিহ্ন বর্তমান। পটুয়া শিল্পীরাও তা থেকে নিস্তার পাবেন না। তবুও জেলার অন্যান্য লোকশিল্পের তুলনায় পটশিল্প এবং পটুয়া সমাজ এখনও অস্তিত্ব রক্ষায় তৎপর। এই শিল্পের অতীত গৌরব, সামাজিক প্রেক্ষিত এবং বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনা করে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের সকলেরই আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাদিত): বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৭, পৃ. ২৮৩।

২. দত্ত, গুরুসদয় (সম্পাদিত): পটুয়া সঙ্গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯, পৃ. ১৭-১৮।

৩. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাদিত): বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৭, পৃ. ২৮৩-২৮৪।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মধুসূদনের পত্রাবলী

ড. স্বপন মাল

প্রাচীনভারতীয় অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী কবিবিরচিত কাব্যকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা— দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য। শ্রব্যকাব্যের বিবিধ ভেদের মধ্যে দূতকাব্য এক বিশেষ শ্রেণির কাব্য। যে কাব্যে কবি মনোজগতের একস্থান থেকে আরেক স্থানে বিশেষ সংবাদ বা সন্দেশ প্রেরণ করেন। এই শ্রেণির কাব্যে কবির কাল্পনিক রূপমাধুর্যসম্পন্ন প্রতিভা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যেমন মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতকাব্য। বাংলা সাহিত্যেও এই ধরণের শাখা দেখা যায়। যদিও স্থান-কাল-পাত্রভেদে তার রূপ-রসাদির বিবর্তন ঘটেছে। সেই তপোবনসমৃদ্ধ কবিদের অপেক্ষা আধুনিকযুগের বাংলাসাহিত্যের কবিরা উন্নত যোগাযোগ ও প্রযুক্তির সুযোগ পাওয়ার ফলে সেইভাবে তৎকালীন দূতকাব্য সৃষ্টি না করে অজান্তেই পত্রসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। পত্রসাহিত্যিকেরা পত্ররচনায় কল্পনার প্রয়োগ কম করে সঠিক তথ্য বা মনোজগতের বিচিত্র ভাবনা জানাতে অধিক মনোযোগী হয়েছেন। সুতরাং, কবির মনোজগতের সঠিক অবস্থান জানার জন্য কোনো বৃহৎ মহাকাব্য, উপন্যাস, নাটকাদি অধ্যয়ন না করেও শুধুমাত্র বিভিন্নজনকে লেখা তাঁর চিঠিপত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করলেই পত্রলেখকের সুস্পষ্ট মানসিক অবস্থান অনুধাবন করা যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে, কবিকে পাবে না তাঁহার জীবনচরিতে। জীবনচরিতে জীবনের ঘটনা থাকে, জীবনের ব্যঞ্জনা বুঝি থাকে না। কিন্তু কবি যেখানে অকৃপণ অন্তরঙ্গ অসঙ্কোচ অবারিত ও অকুণ্ঠ, সেইখানে জীবনের ব্যঞ্জনা বেজে ওঠে। কবিকে পেতে হলে আমাদের সেইরকম রচনার সম্মুখীন হতে হবে। এখানে তৃতীয়পক্ষ নেই।

মননশীল কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে পরিচিত হবার অন্যতম প্রধান উপায় তাঁর পত্রাবলী। সমকালীন যুগজীবন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, শিক্ষানীতি বিষয়ে তাঁর অভিমত, তাঁর সমাজচিন্তা ও রাজনৈতিক চেতনা, তাঁর স্বজাতি ভাবনা এগুলির পরিচয় পাবার দুটি উপায় আছে। প্রথমতঃ যে সব ইংরেজি পত্রিকার তিনি সম্পাদনা করেছেন এবং যেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাতে কবির যে সব লেখা প্রকাশ পেয়েছে তার বিষয় বিশ্লেষণ, দ্বিতীয়তঃ তাঁর পত্রাবলী, দুইয়ের সংযোগেই মাত্র অভীষ্ট ফললাভ সম্ভব।[১]

কবি মধুসূদনের মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ বসু

কর্তৃক রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মধুসূদন কর্তৃক রচিত পত্রাবলী সংযোজিত হবার প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞাপিত করে তিনি প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনায় বলেন— কোনো ব্যক্তিকে জানিতে হইলে তাঁহার নিজের কথায় তাঁহাকে যেরূপ জানিবার সম্ভাবনা, অপরের কথায় সেরূপ জানা সম্ভব নয় বলিয়া তাঁহার লিখিত নানা বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি।[২]

কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী গ্রন্থে গ্রন্থকার ক্ষেত্র গুপ্ত সর্বমোট ১৪৩খানি পত্র সংকলিত করেছেন। যার বেশিরভাগ পত্রই গৌরদাস বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু ও মনোমোহন ঘোষকে লেখা। ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় কবি মধুসূদনের পত্রাবলীকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন—

প্রথম অধ্যায়ে - কলকাতায় (১৮৪১-১৮৪৮ খ্রি:) - বিদ্রোহী উচ্ছল যৌবন,

দ্বিতীয় অধ্যায়ে - মাদ্রাজে (১৮৪৮-১৮৫৬ খ্রি:) - অজ্ঞাতবাস,

তৃতীয় অধ্যায়ে - কলকাতায় (১৮৫৬-১৮৬২ খ্রি:) - সৃষ্টির মহাযজ্ঞ,

চতুর্থ অধ্যায়ে - য়ুরোপে (১৮৬২-১৮৬৭ খ্রি:) - কামনার মোক্ষধামে, বেদনার দাবদাহে,

পঞ্চম অধ্যায়ে - কলকাতায় (১৮৬৭-১৮৭৩ খ্রি:) - মহাপ্রস্থান।

চতুর্থপর্বের সূচনায় পূর্বপর্বের ভারসাম্য বিচলিত হয়েছে। কবি কাব্যজগৎ থেকে স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন গ্রহণ করেছেন। কবির এতদিনের অটল ধৈর্য্য, অসীম আত্মসংযম প্রভৃতিতে ভাঙন ধরেছে। কবি যখন প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ শিখরে, প্রতিভার বিকাশে বাংলার সাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল তখন কীভাবে কবির অন্তরের গভীরে ভবিষ্যতের কাব্যসৃষ্টির বন্ধ্যাত্ব অনুভব করলেন, তা ভাবলে বিস্মিত ও বিচলিত হতে হয়। চতুর্থ পর্বের পত্রগুলির বেশিরভাগ কবির দারিদ্র্যতা-লাঞ্ছনার সংবাদে পরিপূর্ণ। এই চিঠিগুলি বিদ্যাসাগরমহাশয়কে লেখা। এই পত্রসমূহের মধ্য থেকে কবির মন এবং চরিত্রের যে বিশিষ্টতার সাক্ষাৎ অনুভব করি তা হল— বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে কবির বেশ স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি চিত্তচর্চায় এবং কাব্যচর্চায় প্রবৃত্তিমার্গের পথিক। যে পথ ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সে পথ কেবল বীর্য্যবানের কাছেই উন্মুক্ত। শুধুমাত্র ভাব ও মননের দিক থেকেই তিনি একে গ্রহণ করেন নি, বাস্তব জীবনেও তিনি এই আদর্শের অনুসরণ করতেন। সতর্ক মানুষ হয়তো তিনি খুব ছিলেন না, তাই আয় ও ব্যয়ের ক্ষুদ্রতাকে তিনি সমভাবে ঘৃণা করতেন। কিন্তু এই সমুন্নত চিত্তের সঙ্গে পার্থিব বস্তুবিষয়ক যে ঔদাসীন্য সচরাচর জড়িত থাকে, তা তাঁর চরিত্রে ছিল না। তিনি নিজেও জমিজমার বিলি-বন্দোবস্ত, অর্থাদিসংক্রান্ত হিসাবপত্র ব্যাপারে যে দক্ষ ছিলেন পত্রাবলীতে তার প্রমাণ আছে। এবিষয়ে তাঁর স্ত্রীর বুদ্ধি হয়তো আরও বাস্তবমুখী ছিল। কিন্তু কবিও সংসার ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। ফ্রান্সের ভার্সাই থেকে ২রা আগষ্ট, ১৮৬৪ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখলেন— My Dear friend, ... My poor wife expects to be confined every day and I haven't got more than 20Rs. In the

house! If I were inclined to joke, I would quote and Sing —

কারে কব লো যে জ্বালা আমার!

কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার।

But I am not in a mood of mind to be gay. God help me! My great hope now is in you, and I am sure you will not disappoint me. If you do, I must work my way back to India to commit one or two murders- ..., premeditated murders and to be hanged!

য়ুরোপে গিয়ে কবি যে অর্থাভাবে পড়েছিলেন, যেসব গ্লানিকর অবস্থার মধ্যে তাঁকে প্রবেশ করতে হয়েছিল, বিবিধ ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ ও সাহায্য গ্রহণে তাঁকে যে অবমাননাকর তীব্র জ্বালা অনুভব করতে হয়েছিল, তার পরিচয় পত্রগুচ্ছে আছে। কিন্তু ভীষণ অপমানজনক অবস্থা তাঁকে অবনমিত করতে পারে নাই। তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং চরিত্রবীর্য্যের চিহ্নের মধ্য দিয়ে তাঁর বিরল আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ট্রাজিক নায়কের মত তাঁর অবক্ষয়মুখী মহিমা, শুধুমাত্র করুণা বা সহানুভূতি সেখানে স্তম্ভিত হয়ে যায়। লক্ষণীয়, কবি বিদ্যাসাগরমহাশয়ের কাছেই মাত্র সাহায্যের ভিখারী হয়েছিলেন। বিস্ময়করভাবে নীরব থেকেছেন মনোমোহন ঘোষের কাছে, এমনকি প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাসকে একটি চিঠিতে আর্থিক দুর্যোগের সংবাদ শোনালেও কাতর ক্রন্দন সেখানে ধ্বনিত হয় নি। ঋণের দায়ে ফরাসী জেলে বন্দী হবার আশঙ্কায় আর্ত হয়ে উঠেছেন। বিদ্যাসাগরের নিকটে লেখা অজস্রপত্রে সে কথা বারবার প্রকাশিত হয়েছে। ঋণে জর্জরিত মধুসূদন ১৮ই জুন, ১৮৬৪ সালে ভার্সাই থেকে বিদ্যাসাগরকে জানালেন মর্মকথা— My Dear Friend, ... If I hadn't little helpless children and my wife with me, I should kill myself. একই চিঠিতে শেষের দিকে কবি মধুসূদনের জীবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অমোঘ অবদান অকপটভাবে ঘোষণা করেছেন— My heart is full of bitterness, rage and despair. So, you must excuse mistakes and the ... dull tone of this letter. With my best regards I remain, My dear Vidyasagara, your affectionate but unfortunate. I hope you will write to me in France, and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara but Karunasagara also! ১৮৬৬ সালের ১৮ই জুন তারিখে বিদ্যাসাগরকে লেখেন— I tell my wife that when I get back to Calcutta, you will give me a little room in your house and a lot of rice to keep body and soul together. এর চেয়ে তীব্র বেদনাদায়ক চিত্তবিদীর্ণকারী আর্তনাদ আর কী হতে পারে! বিপর্যস্ত মহাকবির অবশ্য ভাঙে নি আশার স্বপ্ন। তিনি লেখেন— I wish to leave my children behind, they being to go backwards and forwards and I want them to be thoroughly

Europeanized.[৩] কবি এত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও আপন মহিমাকে নিঃশেষিত হতে দেন নি। ভগ্নপ্রায় লতাগুল্মাচ্ছাদিত হয়েও এই ব্যক্তিত্বের জয়স্তম্ভ পত্রগুচ্ছের পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। বিদ্যাসাগরের কাছে নিজের চরম অর্থকষ্ট এবং অন্নের জন্য ফরাসী কারাগার এড়িয়ে যাবার কাহিনী যে চিঠিতে আছে, সেখানেই আছে— I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of Languages – if not Spanish and Portuguese before I leave Europe.[৪]

কবির পত্রগুলিতে মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মিত্র এবং কদাচিৎ দিগম্বর মিত্র সম্বন্ধে কটূক্তি প্রকাশ পেয়েছে। কখনও কখনও তীব্র ক্রোধকে যথোচিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন, ভদ্রতার মুখোশ রাখবার প্রয়োজন মনে করেন নি। বিদ্যাসাগর এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কবি কিন্তু চিত্তের উত্তাপকে বিন্দুমাত্র প্রশমিত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আবার বিদ্যাসাগরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও কবির সমগ্র প্রাণ ও মন আবেগাপ্লুত। মধুসূদনের হৃদয় শোকে, আনন্দে, প্রীতিতে, ঘৃণায় ও ক্রোধে তরঙ্গায়িত হয় প্রবলভাবে, মরুভূমির মত অনুভূতির তারল্যকে আত্মসাৎ করে ফেলে না।

মনোমোহন ঘোষের নিকটে লেখা চিঠিতে কবি হাল্কা হতে চেয়েছেন। তাঁর মনে সমকালীন জীবন যে গুরুতর ভার এবং বেদনা চাপিয়ে দিয়েছিল, তার স্পর্শ মনোমোহন ঘোষকে দেন নি। সেখানে হ্যাম্পটন ফোর্ট ভ্রমণ, কিউয়ের রাজোদ্যান বর্ণনা, ফরাসী সম্রাটকে দেখে উল্লাস, জার্মানসাহিত্যরাজ্যে বিচরণের আনন্দ প্রকাশিত হয়ে অর্থাভাবের গ্লানি থেকে পলায়নকারী চিত্ত এখানে ধরা পড়েছে।

গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠিগুলি পলায়নকামী নয়, যদিও অর্থাভাব প্রসঙ্গ একটিমাত্র চিঠিতে স্থান পেয়েছে কিন্তু প্রাধান্য পায় নি। ১০২ সংখ্যক চিঠিতে কবি গৌরদাসকে লেখেন— I have neglected some terms, and will have to remain in Europe a little longer, but that it is not to be regretted at all. I wish I would live here all the days of my life...[৫] গৌরদাসকে লেখা চিঠিগুলিতে প্রধানতঃ কবির কাব্যাত্মস্বরূপত্ব প্রকাশিত হয়েছে। কারণ, গৌরদাসের পক্ষে তাঁকে সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। কবির কাছে দারিদ্র্যই কাব্যচর্চার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সংবাদ দিয়ে তিনি বলেছেন— Believe me, my fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such as us, owing to early defective education know little of it, and have learnt to despise, are miserably wrong. It is or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation, but as we know, I have not sufficient means to lead a literary life.... ঐ একই চিঠির অন্যত্র তিনি

বলেছেন— Make money, my boy, make money! If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done.[৬]

যুরোপীয় সভ্যতাকে শুধু সাহিত্যিক আদর্শের মধ্য দিয়ে নয়, জীবনাদর্শের মধ্যেও কবি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাই, জীবনে ভালোবাসা ও পার্থিব ভোগবাসনা জীবনের পরম পুরুষার্থ বলে গণ্য হতে লাগল। মধুসূদনের কাছে যুরোপ সেই কামনার মোক্ষধাম। কবিজীবনের পঞ্চমপর্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, মধুসূদনের অনায়ত্ত আর কিছুই নাই। মহাকাব্যও রচিত হইয়াছে, ব্যারিষ্টারও তিনি হইয়াছেন। তবে কেন এমন ট্রাজেডি ? এদুটি কাম্যবস্তু আয়ত্ত করিতে যে ঋণ তাঁহাকে করিতে হইয়াছে এবার তাহা শুধিবার পালা। সেই ঋণের দায়ে সর্বস্ব বিকাইয়া গিয়া ট্রাজেডির নায়কের পতন ঘটিল। সাফল্যের এমন নিষ্ফলতা একান্ত দুর্লভ। অদৃষ্টের কি নিদারুণ Irony! মানুষের জীবন যে এমন গ্রীক ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।[৭]

সন্দর্ভসূচী :

১. ক্ষেত্র গুপ্ত, কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, গ্রন্থ নিলয়, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৮।
২. তদেব, পৃষ্ঠা ৯।
৩. সুশীল রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রাবলী, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রা. লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পত্রসংখ্যা ৯৯।
৪. ক্ষেত্র গুপ্ত, কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, গ্রন্থ নিলয়, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৯৩।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১০২।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ১১০।
৭. দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃষ্ঠা ৪২।

বিনয় মজুমদারের 'গায়ত্রীকে' : পাঠ-পাঠান্তর

ড. আশিস অধিকারী

সংক্ষিপ্তসার :

বিশ শতকের বাংলা কবিতায় এক কাল জয়ী কবি বিনয় মজুমদার। যিনি পাঠকের কবিতা পাঠের উপলব্ধির বিন্দুতে এখনও জায়গা জুড়ে নেই। ব্রাত্য। বলা চলে, কোনো কবির কাব্যগ্রন্থের পাঠ-পাঠান্তরে উঠে আসে অনেক তথ্য। সেই কবির অন্য কাব্যগ্রন্থের সমান্তরাল পাঠে উদ্ঘাটন হয় অনেক অজানা খবর। তেমন-ই বিনয় মজুমদারের 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থ।

সূচক শব্দ :

উপলব্ধি, প্রেম, প্রত্যাখ্যান, মানুষী, নারী, কবি হৃদয়, উপেক্ষা, সংশয়, পীড়িত।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

বিনয় মজুমদারের 'গায়ত্রীকে' : পাঠ-পাঠান্তর :

বাংলা সাহিত্যে এক শক্তিমান কবি বিনয় মজুমদার। এখনও প্রায় অনালোচিত তাঁর কবিতা। কোনও কাব্যগ্রন্থের নিবিড় পাঠে এবং অন্য কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় উঠে আসে অনেক অজানা তথ্য। বিনয়ের 'গায়ত্রীকে' ও প্রসঙ্গক্রমে তাঁর 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থ মিলিয়ে পড়লে জানা যায় অনেক অজানা দিক।

'গায়ত্রীকে' (মার্চ, ১৯৬১) বিনয় মজুমদারের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৬৭; মার্চ, ১৯৬১ সালে। প্রকাশক- দেবকুমার বসু, গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জীস্ট্রিট, কোলকাতা - ১২। মুদ্রাকর : নির্মলকৃষ্ণ পাল, নির্মল মুদ্রণ, ৮ ব্রজদুলাল স্ট্রিট, কোলকাতা-৬। মূল্য : ০.৭৫ পয়সা। 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থে আছে মোট ১৪টি শিরোনামহীন কবিতা। কবিতাগুলি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত। এই গ্রন্থের কোনও উৎসর্গপত্র নেই। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল লিটল্ ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে। দ্বিতীয়বার ছাপা হয়েছিল ৮ই আষাঢ়, ১৩৯৫, ২৩ জুন, ১৯৮৮ সালে। প্রকাশক হলেন, বুলবুল দত্ত, হার্দ্য, ১৮ / এম ট্যামার লেন, কোলকাতা ৭০০০০৯ থেকে।[১]

বিনয়ের কালজয়ী 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের নাম হল 'গায়ত্রীকে'। 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের মোট ১৪ টি কবিতার মধ্যে পরবর্তীকালে 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থে কিছু কবিতা সরাসরি কবি নিয়েছেন, কিছু পরিমার্জন করেছেন এবং কয়েকটি কবিতা বাদ দিয়েছেন। এই গ্রহণ ও পরিমার্জন হলো এই রকম :

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'রও প্রথম কবিতা। স্তবক

বিন্যাসে পরিবর্তন ছাড়া এই কবিতায় ১৩ সংখ্যক পংক্তিটি পরিবর্তিত হয়েছে। 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার ১৩ সংখ্যক পংক্তিটি হলো :

ক্লান্ত ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত করে।[২]

'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম কবিতার ১৩ সংখ্যক পংক্তিটি পরিবর্তিত হয়েছে :

দীর্ঘ-দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত করে;[৩]

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ২ সংখ্যক কবিতাটি পরিমার্জনা ছাড়াই 'ফিরে এসো, চাকা'-তে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাটি দুটি স্তবকে বিভক্ত। আর 'ফিরে এসো, চাকা'তে এই কবিতাটির কোনও স্তবক বিন্যাস নেই।

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ৩ সংখ্যক কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের ৩ সংখ্যক কবিতা। কিন্তু এই কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'-তে প্রথম দুটি লাইন বাদ গেছে। লাইন দুটি হলো: অনেক সন্ধান ক'রে নীতি নয়, প্রেম নয়, সার্থকতা নয়, পেয়েছি আহত ক্লান্তি- ক্লান্তি, ক্লান্তি শুধু।[৪]

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ৩ সংখ্যক কবিতাটির তৃতীয় লাইন থেকে 'ফিরে এসো, চাকা'র ৩ সংখ্যক কবিতাটি শুরু হয়েছে। শুরুতে শুধু 'শিশুকাল' শব্দটি যোগ করা হয়েছে :

শিশুকালে শুনেছি যে কতিপয় পতঙ্গশিকারী ফুল আছে।[৫]

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ৩ সংখ্যক কবিতায় ছিল দুটি স্তবক। কিন্তু 'ফিরে এসো, চাকা'র ৩ সংখ্যক কবিতাটিতে স্তবক বিন্যাস নেই। এছাড়া, এই কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাটিতে দুটি লাইন পরিমার্জিত হয়েছে। 'গায়ত্রীকে'-তে ছিল :

১. হায়রে, পায়রা ছাড়া অন্য কোনো ওড়ার ক্ষমতাবতী পাখি[৬] (১৩ সংখ্যক পংক্তি)

২. সপ্রতিভভাবে এসে হাত থেকে দানা খেয়ে ফের উড়ে যায়।[৭] (১৫ সংখ্যক পংক্তি)

'ফিরে এসো, চাকা'-তে ৩ সংখ্যক কবিতার ঐ দুটি লাইনের পরিমার্জিত রূপ এই রকম :

১. অথচ পায়রা ছাড়া অন্য কোনো ওড়ার ক্ষমতাবতী পাখি[৮] (১১ সংখ্যক পংক্তি)

২. সপ্রতিভভাবে এসে দানা খেয়ে ফের উড়ে যায়।[৯] (১৩ সংখ্যক পংক্তি)

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ৪ সংখ্যক কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের ৭ সংখ্যক কবিতায় স্থান পেয়েছে। কোনো পরিবর্তন ছাড়াই এই কবিতাটি নেওয়া হয়েছে। 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ৫ সংখ্যক কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থে ৬ সংখ্যক কবিতা হিসাবে স্থান পেয়েছে। 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতায় ৭ ও ৮ নম্বর লাইন 'ফিরে এসো, চাকা'-তে বাদ দেওয়া হয়েছে। লাইন দুটি হলো :

ভালোবেসে বয়োপ্রাপ্ত জিহ্বা লালাসিক্ত হলে এখন মানুষ মনে মনে লজ্জা পায়- সুন্দর কৌতুক স্নিগ্ধ লজ্জা পেয়ে থাকে।[১০]

এছাড়া 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের এই ৫ সংখ্যক কবিতার ৯ নম্বর পংক্তিতে 'অতিস্থূল, অর্থহীন'[১১]– 'ফিরে এসো, চাকা'র ৬ সংখ্যক কবিতাতে বদলে গিয়ে হয়েছে 'অর্থহীন, অতিস্থূল'।[১২]

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ৬ সংখ্যক কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের ২৫ সংখ্যক কবিতায় গৃহীত হয় নি। কিন্তু এই দুটি কবিতার মিল এইভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে :

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ৭ সংখ্যক কবিতা :

যারা চিত্রকর নয়, তাদের শৌখিন শিল্প আলেখ্যের মুখে নাক, চোখ, ওষ্ঠ, চুল— মানুষের এ-সকল বস্তু আঁকা হয়; কিন্তু তবু সে মুখের অধিকারিণীর রূপ আলেখ্যে আসে না। সেহেতু সাধনা আছে, উত্তাপ প্রদান আছে, ডুবুরি রয়েছে। তোমার কি মনে, এ-ও কি অপরিণত ফল ?

অথবা যৌগিক কথা— সেসব প্রাণীর লোম সহজে ওঠে না তাদের শবের ত্বক পরিধেয় বস্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হবে ?[১৩]

পাশাপাশি, 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের ২৫ নম্বর কবিতাটি এই রকম :

যারা চিত্রকর নয়, তাদের শৌখিন শিল্পায়ণে আলেখ্যের মুখে চুল, ওষ্ঠ— সব কিছু আঁকা হয় কিন্তু তবু সে-মুখের অধিকারিণীর স্নিগ্ধ রূপ আলেখ্যে আসে না; ফলে সাধনা ও ডুবুরী রয়েছে। তোমার কী মনে হয় ? এও কি অপরিণত ফল ? অথবা যৌগিক কথা যে- প্রাণীর রোম দৃঢ়মূল পরিধেয় বস্ত্রাদিতে তার ত্বক ব্যবহৃত হবে ?[১৪]

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ৮ সংখ্যক কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'-তে গৃহীত হয় নি। 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ৯ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের ১৮ সংখ্যক কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় :

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ৯ সংখ্যক কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি এই রকম :

কখনো অপরিচ্ছন্ন দেয়ালের দিকে চেয়ে মনোযোগ দিলে : বিশৃঙ্খলা থেকে কোনো মানুষীর মুখ ফুটে ওঠে। পৃথিবীতে ফুল আছে, মাংস আছে, স্নানাগার আছে, তবুও কেবলি সেই শিরীষ শাখার কথা ভাবি। পালিত পায়রাদের কী যে আছে; দল বেঁধে ওড়ে, স্তবকে স্তবকে হাঁটে— এ-সব মানুষ ভালোবেসে। শীতের বিকেলবেলা মন ঘরমুখো হতে চায়।[১৫]

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাটি দুটি স্তবকে বিভক্ত ছিল। কিন্তু 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের ১৮ নম্বর কবিতায় স্তবক বিন্যাস নেই। তবে মিল এই রকম :

... কদাচিৎ কখনো পুরোনো দেয়ালে তাকালে বহু বিশৃঙ্খল রেখা থেকে কোনো মানুষীর আকৃতির মতো তুমি দেখা দিয়েছিলে। পালিত পায়রাদের হাঁটা, ওড়া, কূজনের মতো তোমাকে বেসেছি ভালো; তুমি পুনরায় চ'লে গেছো।[১৬]

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থে গ্রহণ করেন নি কবি। 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ১১ সংখ্যক কবিতাটির সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা' 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ১১ সংখ্যক কবিতা :

আকাশের সুদূরতা ছাড়া আর কোনো দৃশ্য নেই। সূর্য পরিক্রমারত জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে শুধু উল্কাগুলি অগ্নিময় এবং আশ্চর্য রূপবতী।[১৭]

'ফিরে এসো, চাকা'র ১৯ সংখ্যক কবিতায় আছে :

নেই, কোনো দৃশ্য নেই, আকাশের সুদূরতা ছাড়া সূর্য পরিক্রমারত জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে শুধু ধূমকেতু প্রকৃতই অগ্নিময়ী।[১৮]

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ১২ সংখ্যক কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের ২৩ সংখ্যক কবিতার মিল লক্ষ্য করা যায় :

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ১২ সংখ্যক কবিতা :

বুঝবে না— এই ভেবে প্রত্যক্ষ হাতের দ্বারা আক্রমণ ক'রে প্রজাপতি ধরা হয়, তবুও আঙ্গুল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে থাকে। প্রজাপতি উড়ে যায়, অপ্রতিভ হাত নুয়ে আসে।[১৯]

'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের ২৩ সংখ্যক কবিতা :

যেন প্রজাপতি ধরা— প্রত্যক্ষ হাতের অতর্কিত আক্রমণ ক'রে ব্যর্থ; পুর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের অবকাশে ফুটে ওঠা পিপাসার্ত তারাদের মতো অন্যান্য সকলে আছো; অথচ আমি নিরুপায়।[২০]

'গায়ত্রীকে'কাব্যগ্রন্থের ১৩ সংখ্যক কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের ২২ সংখ্যক কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় লাইন প্রায় একই :

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ১৩ সংখ্যক কবিতা :

নিকটে অমূল্য মণি, রত্ন নিয়ে যদি পথ চলো
কী এক উৎকণ্ঠা যেন সর্বদা পীড়িত ক'রে থাকে।[২১]

'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের ২২ সংখ্যক কবিতাটি হলো :

নিকটে অমূল্য মণি, রত্ন নিয়ে চলার মতোন কী এক উৎকণ্ঠা যেন সর্বদা পীড়িত ক'রে থাকে।[২২]

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ১৪ সংখ্যক কবিতার ৬ নম্বর পংক্তির অংশ বিশেষ ও ৭ নম্বর পংক্তি এবং 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের ২১ সংখ্যক কবিতার ২ নম্বর পংক্তির অংশ বিশেষ ও ৩ নম্বর পংক্তি প্রায় একই :

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ১৪ সংখ্যক কবিতা এই রকম :

. . . বাতাসের নীলাভতা হেতু আকাশের অবয়ব দিবালোকে নীল মনে হয়।[২৩]

আর 'ফিরে এসো, চাকা'র ২১ সংখ্যক কবিতা :

. . . বাতাসের নীলাভতাহেতু দিনে আকাশকে নীল মনে হয়।[২৪]

'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের নাম প্রসঙ্গে জানা যাচ্ছে :

"'গায়ত্রীকে' পুস্তিকাটির নামকরণ প্রসঙ্গে বিনয় মজুমদার আমাকে লিখেছেন : গায়ত্রী চক্রবর্তী প্রেসিডেনন্সি কলেজে পড়তো। এবং ১৯৬০ কি ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথমা হয়ে পাশ করেছিল। সে-ই আমার কবিতা বুঝতে পারবে ভেবে তাকেই উদ্দেশ্য করে 'গায়ত্রীকে' বইখানি লেখা। সেইহেতু বই-এর নাম 'গায়ত্রীকে' রেখেছিলাম।''[২৫]

বিনয় মজুমদারের 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থ আসলে এক প্রচ্ছন্নপ্রতিমার অবয়ব ।এক প্রেমিকের আবেগ ও উপলব্ধি। তাতে মিশে আছে প্রেমিকের আত্মদহন আর দেহাতীত প্রেমের শিল্প সুষমা। প্রেমিকের অর্ঘ্য সেখানে পূজার সমার্থক হয়ে উঠেছে। আর অন্য দিকে প্রবল অভিমানে ভেঙে খান খান হয়ে যায় সে শিল্প সুষমা। মনের অন্তর মহলে জেগে ওঠে এক দাহ। যার অন্য নাম 'গায়ত্রীকে'।

তথ্যসূত্র :

১। বিনয় মজুমদার, গ্রন্থ পরিচয় অংশ, কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা : শ্রী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩০ জানুয়ারি, ২০০০, পৃ. ১৫২।

২। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ১ সংখ্যক কবিতা, গায়ত্রীকে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।
৩। বিনয় মজুমদার,কাব্য সমগ্র, ১ম খণ্ড, ১ সংখ্যক কবিতা, ফিরে এসো, চাকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২।
৪। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ৩ সংখ্যক কবিতা, গায়ত্রীকে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।
৫। বিনয় মজুমদার,কাব্য সমগ্র,১ম খণ্ড, ৩সংখ্যক কবিতা, ফিরে এসো, চাকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।
৬। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ৩ সংখ্যক কবিতা, গায়ত্রীকে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।
৭। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ৩ সংখ্যক কবিতা, গায়ত্রীকে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।
৮। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র,১ম খণ্ড, ৩ সংখ্যক কবিতা,ফিরে এসো,চাকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।
৯। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র,১ম খণ্ড,৩ সংখ্যককবিতা, ফিরে এসো, চাকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।
১০। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ৫ সংখ্যক কবিতা, গায়ত্রীকে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।
১১। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ৫ সংখ্যক কবিতা, গায়ত্রীকে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।
১২। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র,১ম খণ্ড,৬ সংখ্যক কবিতা, ফিরে এসো, চাকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।
১৩। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ৭ সংখ্যক কবিতা, গায়ত্রীকে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।
১৪। বিনয় মজুমদার,কাব্য সমগ্র,১ম খণ্ড,২৫ সংখ্যক কবিতা,ফিরে এসো,চাকা,পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।
১৫। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ৯ সংখ্যক কবিতা, গায়ত্রীকে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।
১৬। বিনয় মজুমদারকাব্য সমগ্র, ১ম খণ্ড,১৮সংখ্যক কবিতা,ফিরে এসো,চাকা,পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।
১৭। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, ১ম খণ্ড, ১১ সংখ্যক কবিতা,গায়ত্রীকে, চাকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।
১৮। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র,১ম খণ্ড,১৯ সংখ্যক কবিতা,ফিরে এসো,চাকা,পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।
১৯। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ১২ সংখ্যক কবিতা, গায়ত্রীকে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।
২০। বিনয় মজুমদার,কাব্য সমগ্র, ১ম খণ্ড,২৩ সংখ্যক কবিতা,ফিরে এসো,চাকা,পূর্বোক্ত,পৃ. ৫২।
২১। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ১৩ সংখ্যক কবিতা, গায়ত্রীকে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।
২২। বিনয় মজুমদার,কাব্য সমগ্র,১ম খণ্ড,২২ সংখ্যক কবিতা,ফিরে এসো, চাকা,পূর্বোক্ত,পৃ. ৫১।
২৩। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ১৪ সংখ্যক কবিতা, গায়ত্রীকে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।
২৪। বিনয় মজুমদার,কাব্য সমগ্র,১ম খণ্ড,২১ সংখ্যক কবিতা,ফিরে এসো,চাকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।
২৫। বিনয় মজুমদার, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয় অংশ, সম্পাদনা : শ্রী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩০ জানুয়ারি, ২০০০, পৃ. ১৫৩।

লেখক পরিচিতি

১. অদিতি ভট্টাচার্য্য :অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজ, হাওড়া, প.ব.।

২. বিপ্লব কুমার ভট্ট : গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়, চাইবাসা, ঝাড়খণ্ড

৩. দশরথ পাল : গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া,প.ব.।

৪.দীপক বর্মণ :স্যাক্ট-১, বাংলা বিভাগ, ঘোক্সাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়,প.ব.।

৫.দৃপ্তা মূখার্জী চক্রবর্তী : গবেষক, নৃত্য বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বি টি রোড ক্যাম্পাস, কলকাতা,প.ব.।

৬.জয়দেব নায়েক : সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ, শিলদা, ঝাড়গ্রাম,প.ব.।

৭.মৃদুলা আচার্য্য : অধ্যাপিকা, রসায়ন বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ,বাঁকুড়া,প.ব.।

৮.প্রিয়ঙ্কা মাইতি (দাস) : সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, গভর্মেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১,প.ব.।

৯.সঞ্জীব রজক : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সুশীল কর কলেজ,প.ব.।

১০.সঞ্জিত মন্ডল : সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, শালবনী, প.মেদিনীপুর,প.ব.।

১১. সরোজ কুমার সরকার : সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, গুসকরা মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান,প.ব.।

১২. শ্রাবণী চ্যাটার্জী : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, এম. এড. সেমেসটার-১, এডুকেশান (বাংলা), ইনস্টিটিউট অব্ এডুকেশন ফর ওমেন, হেস্টিংস হাউস, নিউ আলিপুর, কলকাতা,প.ব.।

১৩.সুদীপ মণ্ডল : সহকারী অধ্যাপকি, বাংলা বিভাগ,আশুতোষ কলেজ, কলকাতা, প.ব.।

১৪.অলোক বিশ্বাস : সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ, শান্তিপুর, নদিয়া, প.ব.।

১৫.অনিমেষ কুমার মাহাত : গবেষক,বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি,ঝাড়খন্দ।

১৬.অঞ্জন কর :জুনিয়র রিসার্চ ফেলো (এন. টি.এ., ইউ.জি.সি.)গবেষক, কন্ঠসঙ্গীত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প.ব.।

১৭.অনুপম দাস : সহকারী অধ্যাপক, পূর্বস্থলী কলেজ,প.ব.।

১৮.বিজয় কুমার স্বর্ণকার : গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর,প.ব.।

১৯.ইমাম হোসেন :সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ বনহুগলী, কলকাতা,প.ব.।

২০.প্রণব মিস্ত্রী : সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গভর্মেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ কালনা-১, পূর্ব বর্ধমান,প.ব.।

২১.সরমা নায়েক : সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়, গোতান, পূর্ব বর্ধমান,প.ব.।

২২.সোমনাথ চ্যাটার্জী : গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়,কোচবিহার,প.ব.।

২৩.সৌমিত্র কুণ্ডু : গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুড় মঠ, হাওড়া,প.ব.।

২৪.সুদীপ কোলে : গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুড় মঠ,প.ব.।

২৫.সুশান্ত বেরা :গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়,রাঁচি,ঝাড়খন্দ।

২৬.মোজাফ্ফর রহমান :পিএইচডি গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির,স্বামী বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বেলুড় মঠ, হাওড়া,প.ব.।

২৭.বিদিশা চক্রবর্তী : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক,সহ শিক্ষিকা,প.ব.।

২৮.মাণিক কিস্কু :সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১, মুড়াগাছা, মেদ্গাছি, পূর্ব বর্ধমান,প.ব.।

২৯.রেজমান মল্লিক :সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ,ভট্টর কলেজ,দাঁতন, প.মেদিনীপুর,প.ব.।

৩০.সিদ্ধার্থ দত্ত : গবেষক,বাংলা বিভাগ,সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক (স্যাক্ট) রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া,প.ব.।

৩১.সোমেন পাল : সহকারি অধ্যাপক, উইমেন্স কলেজ তিনসুকিয়া,আসাম।

৩২.স্বপন সরকার :অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,পি.আর. ঠাকুর গভমেন্ট কলেজ, উত্তর ২৪ পরগণা, প.ব.।

৩৩.অজন্তা জানা :অ্যাওয়ার্ডেড পি.এইচ.ডি. হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল মিউজিক (ভোকাল) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,প.ব.।

৩৪.মহ সেখ মারুফ আজম : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, পাতেণ্ডা, গোবরহাটি, কান্দী মুর্শিদাবাদ, প.ব.।

৩৫.তারক মজুমদার :সহ অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,পি.আর.ঠাকুর গভঃ কলেজ,,ওত্তর চব্বিশ পরগণা, প.ব.।

৩৬.অশোক কুমার জানা : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক,লাইব্রেরিয়ান,প.ব.।

৩৭.হাসানুর আলম :এম.ফিল গবেষক, দর্শন বিভাগ,উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,প.ব.।

৩৮.হরেকৃষ্ণ সরকার :পিএইচ. ডি. গবেষক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, প.ব.।

৩৯.মধুমিতা পাল :অনু-গবেষক,পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়,বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগণা,প.ব.।

৪০.মৌসুমী সরকার : সহ-অধ্যাপিকা,শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ,কালিয়াচক কলেজ,প.ব.।

৪১.মুহাম্মদ জিন্নাতুল্লাহ শেখ :সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মুজফ্ফর আহমদ মহাবিদ্যালয়, সালার, মুর্শিদাবাদ,প.ব.।

৪২.পার্থ সারথী দাস :সহকারী অধ্যাপক,সোনাদা ডিগ্রী কলেজ,প.ব.।

৪৩.সনৎ পান :এম.ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ,প.ব.।

৪৪.শীলা রাণী বসাক : সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা ১, প.ব.।

৪৫.অরূপ সিং :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নারায়ণগড় সরকারী মহাবিদ্যালয়, নারায়ণগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর, প.ব.।

৪৬.ড.চন্দন মণ্ডল :সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর,প.ব.।

৪৭. ড. চৈতালী মান্ডি : সহকারী অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, প.ব.।

৪৮.ড. দিলীপ কুমার দিগার : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়। সুভাষনগর, বেঙ্গাই, হুগলী, প.ব.।

৪৯.ড.দীপক দাস :সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ সুভাষচন্দ্র বোস সেনটিন্যারি কলেজ, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ,প.ব.।

৫০.ড.দীপান্বিতা দাশগুপ্ত :সহকারী অধ্যপিকা, ইতিহাস বিভাগ,কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়,কোচবিহার,প.ব.।

৫১.ড.কালীপদ দাস :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,রাধামাধব কলেজ, শিলচর, অসম।

৫২.ড. মনদেব রায় : সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কার্শিয়াং কলেজ, কার্শিয়াং, দার্জিলিং,প.ব.।

৫৩.ড.মিনারা ইয়াসমিন :সহ অধ্যাপিকা, শিক্ষা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৪.ড. মিঠু দেব : বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, গাজোল মহাবিদ্যালয়, মালদা,প.ব.।

৫৫.ড.মুকুল মন্ডল : সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ, মগরা, হুগলী,প.ব.।

৫৬.ড. নির্মল কুমার বর্মন : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও কবি,অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ,দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়, কাঁথি,প.ব.।

৫৭.ড.পরিতোষ মাহাত : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহিষাদল গার্লস কলেজ, পূর্ব মেদিনীপুর,প.ব.।

৫৮.ড.পীযূষ মণ্ডল :সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ,সুভাষচন্দ্র বোস সেনটিন্যারি কলেজ, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ,প.ব.।

৫৯.ড.রিঙ্কি মাহাতো :সহায়ক শিক্ষক ,মৈতৈ জগোই মণিপুরী নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিষয়- মণিপুরী নৃত্য,প.ব.।

৬০.ড.সত্যবতী ব্যানার্জী : প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, রাজবাটী,প.ব.।

৬১.ড.শুদ্ধসত্ত্ব বর্মণ : সহকারী অধ্যাপক, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়,মালিগ্রাম, প.মেদিনীপুর,প.ব.।

৬২.ড.সুজিত কুমার বিশ্বাস : সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ, শিলিগুড়ি কলেজ, শিলিগুড়ি,দার্জিলিং,প.ব.।

৬৩.ড.রথীনকুমার পাল : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চন্দ্রকোনা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়, চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, প.ব.।

৬৪.ড.অমলেশ পাত্র :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,খেজুরী কলেজ,প.ব.।

৬৫.ড.সঞ্জীব কুমার ঘোষ :সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ,কে. ডি. কলেজ অফ কমার্স অ্যান্ড জেনারেল স্টাডিজ,মেদিনীপুর,প.ব.।

৬৬.ড.স্বপন মাল : সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর,প.ব.।

৬৭. ড.আশিস অধিকারী : অধ্যাপক, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়,চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর,প.ব.।

বি.দ্র.-অনবধানতা জনিত কারণে পরিচিতি বিষয়ে কোন অসম্পূর্ণতা /ভ্রান্তি থাকলে প্রকাশন সংস্থা মার্জনা প্রার্থী।